শারীরবিজ্ঞান

যোগেন দেবনাথ

পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত
ষষ্ঠ সংস্করণ
স্নাতক ও চিকিৎসাশাস্ত্রের
ছাত্রছাত্রীদের জন্য

শারীরবিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

যোগেশ দেবনাথ
অধ্যক্ষ
চন্দ্রকোণা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়

হিন্দুস্থান পাবলিশিং কন্‌সার্ন
১৫৭/৪ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

ষষ্ঠ সংস্করণের কথা

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সংগে সংগতি রেখে শারীরবিজ্ঞানের এই ষষ্ঠ সংস্করণকে নূতনভাবে ঢেলে সাজাতে হয়েছে। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্যগুলোকেও সযত্নে এই সংস্করণে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

শারীরবিজ্ঞান মানুষের দেহসম্পর্কিত বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যার রহস্যের চাবিকাঠি এখনও সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানীদের করায়ত্ব হয়নি। বিজ্ঞানীরা এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোর রহস্য-উদ্‌ঘাটনে এখনও নানাভাবে গবেষণায় ব্রতী রয়েছেন। ফলে এই বিজ্ঞানের নিত্যনতুন তথ্যাবলীর উপর আলোকপাত ঘটছে। এসব নতুন তথ্যাবলী শারীরবিজ্ঞানের নানাপ্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অর্থে এই বিজ্ঞানটি গতিময় ও আপেক্ষিক অর্থে পরিবর্তনশীল। তাই এই বিজ্ঞানের কোন বই-এর সংস্করণ প্রকাশের সময় এর সর্বশেষ তথ্যাবলী আহরণে প্রখর দৃষ্টি দিতে হয়। উপরিউক্ত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এই বিষয়ের পঠনপাঠনের বেশ রদ-বদল হয়েছে। এসব কথা মনে রেখে বইখানাকে নূতন কলেবরে, বর্ধিত ও মার্জিত আকারে প্রকাশ করা হল। ছাপার কাজ অনেকদিন আগে শুরু, হলেও বিভিন্ন কারণে বইয়ের কাজ খানিকটা শ্লথ গতিতে চলছিল যা আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। এ ব্যাপারে অনেক চিঠিপত্র ও অনুযোগ আমরা পেয়েছি। অভিভাবক ও শিক্ষাবিদ্‌দের কাছ থেকেও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি; এর জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। অন্য দিক দিয়ে আমরা আনন্দিতও হয়েছি, এই ভেবে যে, মাতৃভাষাই যে বিজ্ঞানশিক্ষার বাহন হওয়া উচিত, এসব অভিযোগ-অনুযোগের মধ্য দিয়ে তা যেন ফল্গুধারার মতই উচ্চারিত হয়েছে।

ষষ্ঠ সংস্করণেও সব বিষয়ের সর্বশেষ তথ্যাবলীসহ বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে। চিত্রসহ নূতন সংযোজনও প্রচুর। পাঁচজন শারীর-বিজ্ঞানীর জীবন ও তাঁদের বৈজ্ঞানিক অবদান বিষয়ে একটি নূতন অধ্যায় রচিত হয়েছে। কিছু অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে লিখে সাজাতে হয়েছে। অন্যসব অধ্যায়কেও যথাসম্ভব পরিমার্জিত করা হয়েছে। বইখানাকে সর্বপ্রকার আকর্ষণীয় করে তুলার সবিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

বইখানার ষষ্ঠ সংস্করণে অনেকে অনেকভাবে সহায়তা করেছেন। তাদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশের গুরুদায়িত্ব বহন করে প্রকাশিকা শ্রীমতী কল্পনা গাঙ্গুলী যেভাবে সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। পরিশেষে যাদের কাছে এই বইয়ের সমাদর আশা করি তারা উপকৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

বার্জ টাউন, মেদিনীপুর

যোগেশ দেবনাথ

প্রথম সংস্করণের কথা

বিদেশী ভাষা যে বিজ্ঞানশিক্ষার অন্তরায় শিক্ষাবিদ্ মাত্রেই তা অবগত আছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয় এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং বিজ্ঞানের দুরূহ তথ্যকে সহজ ও সরল বাংলাভাষার মাধ্যমে বোধগম্য করে বিজ্ঞানশিক্ষার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছিলেন। বহুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'ইংরেজী ভাষায় অবগুণ্ঠিতা বিদ্যা .. আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্য আমরা যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে।' বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুও বিজ্ঞান-

শিক্ষার ব্যাপারে মাতৃভাষার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেও দেখেছি, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়গুলো ক্লাসে বুঝিয়ে দিলে ছাত্রেরা যত সহজে বুঝতে পারে, ইংরেজীতে তা পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ও এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে কোন ছাত্র বাংলাভাষায় প্রশ্নপত্রের উত্তর-দান করতে পারে।

গ্রন্থখানি ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে সহজ, সরল ও বোধগম্য ভাষায় লিখিত হয়েছে। ছোট ছোট অধ্যায়ে গ্রন্থখানিকে বিভক্ত করে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রচুর চিত্র ও প্রতি অধ্যায়ের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। পরিভাষার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পরিভাষাগ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। পরিভাষা যাতে বিষয় বোঝার পক্ষে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি না করতে পারে তার জন্য ইংরেজী প্রতিশব্দও পাশাপাশি রেখে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থখানি স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাসের ভিত্তিতে লিখিত হলেও চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্রছাত্রীরাও সমানভাবে উপকৃত হবে আশা করি।

যে সকল শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমহাশয় গ্রন্থখানি প্রণয়নে প্রেরণা জুগিয়েছেন, নামোল্লেখ করে তাঁদের আমি ছোট করতে চাই না। তাঁদের কাছে আমি সবসময়েই ঋণী। আমার সহকর্মীরা এ ব্যাপারে যে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন, তার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া যাঁদের কাছ থেকে আমি নানাভাবে সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেছি, তাঁদের মধ্যে ডঃ অজয় চ্যাটার্জী, অধ্যাপক স্বরদীপ দত্ত ও বন্ধুবর গবেষক শ্রীসুধাংশুশেখর জানার নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। সাম্মানিক বিভাগের আমার দুজন প্রিয় ছাত্র শ্রীমান অমিত গোস্বামী ও সৌমেন কুণ্ডু আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে এবং আমাকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করেছে।

গ্রন্থখানি দ্রুত ও ব্যস্ততার মধ্যে ছাপাতে হয়েছে। নবম অধ্যায় থেকে শুরু করে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত যাবতীয় চিত্র নিজেই অংকন করেছি। এর মধ্যে দুখানি ছবি শ্রীমান অমিত গোস্বামীর হাতের আঁকা।

বই প্রকাশের বিরাট দায়িত্ব বহন করার জন্য যিনি নির্দ্বিধায় ও অকপটে বন্ধুর হাত এগিয়ে দিয়েছিলেন এবং বইখানির দ্রুত প্রকাশের জন্য কাজের মধ্যে নিজেকে একাত্মভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, সেই শ্রদ্ধেয় প্রকাশক শ্রীজয়দেব গাঙ্গুলী মহাশয়কে আমার কৃতজ্ঞতা না জানালে সবই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বইখানার মুদ্রণবিষয়ে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। বইয়ের সম্বন্ধে সমালোচনা, ত্রুটিবিচ্যুতি ও পরিভাষা সম্বন্ধে সবরকম মতামত জানালে সাগ্রহে গ্রহণ করব।

পরিশেষে যাদের জন্য বইখানি লিখিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

মেদিনীপুর কলেজ,

যোগেন দেবনাথ

শারীরবিজ্ঞান ও প্রাণরসায়নে ব্যবহৃত একক ও মাপ

গিগা (giga) = 10^9, মেগা (mega) = 10^6, কিলো (kilo) = 10^3

মিলি (milli) = 10^{-3}, মাইক্রো (micro) = 10^{-6},

ন্যানো (nano) = 10^{-9}, পিকো (pico) = 10^{-12}

ভর (Mass)

গ্রাম = gm, কিলোগ্রাম = kg, মিলিগ্রাম = mg

মাইক্রোগ্রাম = μg

1 kg = 2.20 lb.

1 lb = 453.6 gm.

দৈর্ঘ্য (Length)

মিটার = m, সেণ্টিমিটার = cm, মিলিমিটার = mm.

মাইক্রোন = μ, মিলিমাইক্রোন = mμ, অ্যাংস্ট্রোম = $\mathring{A}$

1 m = 10^2 cm = 100^2 mm = $10^6\mu$ = 10^9mμ = $10^{10}\mathring{A}$

1 μ = 0·001 mm = 10,000$\mathring{A}$

1mμ = 0·001μ = 10$\mathring{A}$

1$\mathring{A}$ = 0·1 mμ = 0·0001μ

1$\mathring{A}$ = 10^{-7} mm.

1 cm = 0·394 m

1 m = 2·54 cm

1 কিলোমিটার = 0·62 মাইল

1 মাইল = 1·61 কিলোমিটার

আয়তন (Volume)

1 ঘনমিলিমিটার = 1 cu.mm., লিটার = 1, ঘনসেণ্টিমিটার = cc., মিলিলিটার = ml, মাইক্রোলিটার = μ1

1ml. = 1·0000·2 cc. 11 = 1000ml, 1ml = 10^{-3}1, 1ml = 1000μ1

তাপ (*Heat*)

সেল্‌সিয়াস (°C) ও ফারেন্‌হাইটের (°F) সম্পর্ক :

$$9/5C = F - 32$$

$0°C = 32°F$

$100°C = 212°F$ $\quad$ $37°C = 98·6°F$

সাধারণ অম্ল ও ক্ষার

(Common acids and alkali)

তীব্র অ্যাসিড			লঘু দ্রবণের প্রস্তুতিকরণ	
নাম	আপেক্ষিক গুরুত্ব	আনুমানিক তীব্রতা	তীব্র থেকে লঘু দ্রবণ	আনুমানিক তীব্রতা
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসি (HCl)	1·	12N	(i) 430 মি. লি.+570 মি. লি. জল (ii) 9 মি. লি.+991 মি. লি. জল	5N N/10
সালফুরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)		36N	(i) 140 মি. লি.+860 ম. লি. জল (ii) 28 মি. লি.+972 মিলি জল	5N N/10
নাইট্রিকঅ্যাসিড (HNO_3)	1·42	16N	310 মি. লি +690 মি. লি. জল	5N
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($NaOH$)	কঠিন পদার্থ	×	220 গ্রাম+জল =1000 মি. লি.	5N

সূচীপত্র

এক

ভূমিকা

INTRODUCTION

মানবদেহ ও প্রাণীদেহের জৈবিক কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে মানুষের অনুসন্ধিৎসা সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই শুরু হয়েছিল। চীন, ভারত, গ্রীক ও রোমের প্রাচীন দার্শনিক ও চিকিৎসকদের লিখাতে মানবদেহের শারীরস্থান ও শারীরবিজ্ঞানের উল্লেখ দেখা যায়। তাঁরা একদিকে যেমন দেহ সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন, অপর দিকে তেমনি উদ্ভট মতবাদ ও ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি করে গেছেন। তবে প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণায় মানুষ বা প্রাণীদেহকে নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোন-প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার আভাস পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান হিসাবে শারীরবিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভের (William Harvey) 'রক্তসংবহনের' আবিষ্কার থেকে। অসংখ্য পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে 1628 সালে

হার্ভে প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও রক্তসংবহন সম্বন্ধে সঠিক ও সুস্পষ্ট তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁর এই আবিষ্কার শারীরবিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান হিসাবে পরিগণিত। হার্ভে তাই শারীরবিজ্ঞানের পথিকৃৎ।

1-2নং চিত্রঃ হার্ভের রক্তসংবহনের একটি পরীক্ষা।

হার্ভের পূর্বে রক্তসংবহনতন্ত্র সম্বন্ধে যেসব ধারণা ছিল সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে

পর্যালোচনা করলেই তার আবিষ্কারের গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে। গ্যালেন (Galen) নামক রোমের একজন গ্রীক চিকিৎসক (130—200 ? AD) প্রাণীর শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে মত প্রকাশ করেন যে শিরারক্ত অনবরত যকৃতে উৎপন্ন হয়, এরপর তেজ বা শক্তির (spirit) সংগে সংমিশ্রিত হয় এবং দেহের শিরাতে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর আরও ধারণা ছিল, রক্ত কিছুসংখ্যক ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের এপাশ থেকে ওপাশে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়; ধমনীতেও একই পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। 1555 সালে ভেসালিয়াস (Vesalius) প্রমাণ করলেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কোন ছিদ্র নেই। কলম্বো (Colombo) এরপরই পরীক্ষার দ্বারা দেখালেন, রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে যায় এবং পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। ফেব্রিসিয়াস (Fabricius) প্রথমে শিরাতে কপাটিকার (valves) অস্তিত্ব দেখতে পান, কিন্তু তাদের কি কাজ তিনি বুঝতে পারেন না। শিরাস্থিত এসব কপাটিকার সূত্র ধরেই হার্ভে রক্তসংবহনতন্ত্রের কার্যপ্রণালী অনুধাবন করতে সমর্থ হন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখালেন, হাতের শিরারক্ত শুধুমাত্র হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রবাহিত হয় এবং ফেব্রিসিয়াস দৃষ্ট কপাটিকাসমূহ রক্তের বিপরীত প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে (1-2নং চিত্র)। তিনি লক্ষ্য করলেন শিরাতে রক্তপ্রবাহ থামিয়ে দেবার জন্য চাপসৃষ্টি করলে অনুরূপ ধমনীতেও রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এই সহজ পরীক্ষার দ্বারা ধমনী ও শিরার মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া হার্ভে কতৃক রক্তপ্রবাহের বেগ নির্ধারণের ফলে রক্তসংবহনপ্রণালী সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তার নিরসন ঘটে। এছাড়াও হার্ভের কাছ থেকেই প্রাণীর উপর সত্যিকারের পরীক্ষা পদ্ধতি শুরু হয়।

শারীরবিজ্ঞান
Physiology

ফিজিওলোজির সমার্থক শব্দ হিসাবে বাংলায় শারীরবিজ্ঞান শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ফিজিওলোজির উৎপত্তি গ্রীক শব্দদ্বয় phusis=(প্রকৃতি) এবং logos (=বিজ্ঞান) থেকে। গ্রীকশব্দের সমার্থক ল্যাটিন শব্দ ফিজিও-লোজিয়া (physiologia) থেকে এসেছে ফিজিওলোজি। প্রাথমিকভাবে বা ব্যুৎপত্তিগতভাবে ইহা 'প্রকৃতজাত জ্ঞান'কে বুঝাত। 1542 সালে ফরাসী চিকিৎসক জিন ফারনেল (Gean Fernel) এই শব্দের ব্যবহার করেন। বর্তমানে ফিজিওলোজি বা শারীরবিজ্ঞান বলতে প্রাণীদেহের স্বাভাবিক

কার্যপ্রণালী সম্পর্কীয় বিজ্ঞানকেই বুঝায়। অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় প্রাণীদেহের অংগপ্রত্যংগ, তন্ত্র, কলা, কোষ এবং কোষ-উপাদানের জৈবিক কার্যপ্রণালী এবং প্রতিটি কার্যপ্রণালীর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী অবস্থাকে জানা ও বোঝার জ্ঞানকে **শারীরবিজ্ঞান** বলা হয়। জৈবিক কার্যপ্রণালীর মধ্যে একটি গতিময় সম্পর্ক বর্তমান; প্রাণীদেহের বিভিন্ন অবস্থায় এবং অনবরত পরিবর্তনশীল পরিবেশে তার পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে প্রাণী নিজেকে পরিবেশের উপযোগী করে তোলে। এ সবকিছুর তথ্যই যুগিয়ে থাকে শারীরবিজ্ঞান।

1. **শারীরবিজ্ঞানের শাখা (Divisions of Physiology) :** শারীরবিজ্ঞান বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। যেমন : ভাইরাসসম্পর্কীয় শারীরবিজ্ঞান (viral physiology), রোগজীবাণুবিষয়ক শারীরবিজ্ঞান (bacterial physiology), কোষবিষয়ক শারীরবিজ্ঞান (cell physiology), উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞান (plant physiology), প্রাণী শারীরবিজ্ঞান (animal physiology), মানবিক শারীরবিজ্ঞান (human physiology) ইত্যাদি। **মানবিক শারীরবিজ্ঞান** সুস্থ মানবদেহের স্বাভাবিক জৈব কার্যপ্রণালী সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে। মানবিক শারীরবিজ্ঞানও বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। এই শাখাসমূহের ব্যবহারিক গুরুত্ব খুব বেশী। যেমন : শ্রমশারীরবিজ্ঞান (work physiology), খেলাধুলা ও ব্যায়ামসংক্রান্ত শারীরবিজ্ঞান, পুষ্টিবিষয়ক শারীরবিজ্ঞান (nutritional physiology) ইত্যাদি। শারীরবিজ্ঞানের গণ্ডি তাই সুদূরপ্রসারী। ডাক্তার বা চিকিৎসককে মানবিক শারীরবিজ্ঞান পড়তে হয় শুধুমাত্র দেহের অসুস্থ অবস্থা বা রোগব্যাধিকে বোঝার জন্য। অথচ শারীর বিজ্ঞান পুষ্টি, জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ, খেলাধুলা, ব্যায়াম, কলকারখানা ও ক্ষেতখামারে শ্রমবণ্টন, শ্রমপ্রয়োগবিদ্যা প্রভৃতির সংগে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। শারীর বিজ্ঞানের জ্ঞান তাই শুধুমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রের পঠনপাঠনের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। চিকিৎসাশাস্ত্রের গণ্ডি পেরিয়ে শারীরবিজ্ঞান তাই **মৌল বিজ্ঞান** (basic science) হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এখন এর দৃপ্ত পদচারণা গতিশীল রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

2. **মানবিক শারীরবিজ্ঞান ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :** ভারতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথমে মানবিক শারীরবিজ্ঞান মৌল বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি পায়। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজে শারীরবিজ্ঞানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু হয়। অবসর

গ্রহণের পর তিনিই 1938 সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে শারীরবিজ্ঞান বিভাগ চালু করেন। সেই থেকে ভারতে শারীরবিজ্ঞানের পদযাত্রা শুরু হয় এবং **ভারতীয় শারীরবিজ্ঞান পরিষদ** (Physiological Society of India) গঠনের মাধ্যমে ইহা আরও মূর্ত হয়ে ওঠে।

অন্যান্য বিষয়ের সংগে শারীরবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation of physiology with other subjects) : শারীরস্থান (anatomy), কলাবিদ্যা (histology) এবং কোষবিদ্যার (cytology) সংগে শারীরবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুব নিবিড়, কারণ অংগসংস্থান ও শারীরবৃত্তীয় ঘটনাবলী অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। দেহের অংগপ্রত্যংগ, তন্ত্র, কলা ও কোষের চাক্ষুষ, আণুবীক্ষণিক ও পরাণুবীক্ষণিক গঠনের সুস্পষ্ট ধারণা ও সক্রিয় অবস্থায় এদের মধ্যকার পরিবর্তন সম্বন্ধে অবহিত না থাকলে শারীরবৃত্তীয় কার্যপ্রণালীর সঠিক অনুশীলন আদৌ সম্ভবপর নয়। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের জ্ঞানও শারীরবিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রয়োজন। দেহ বা দেহাংশের জৈবিক ক্রিয়াকলাপের ভৌত ও রাসায়নিক ঘটনাবলী এই দুই বিষযের সূত্রাদির প্রয়োগ ব্যতিরেকে অনুশীলন করা যায় না। এই দুই বিষয় এবং শারীরবিজ্ঞানের সমন্বয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে **প্রাণপদার্থবিদ্যা** (Biophysics) এবং **প্রাণরসায়ন** (Biochemistry)। ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব উপাত্তের সমন্বয়ে গঠিত শারীরবৃত্তীয় অনুশীলনই শারীরবিজ্ঞানের পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করতে পারে।

সাধারণ জীববিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা (embryology) ও অভিব্যক্তিবাদের (theory of evolution) উপরও শারীরবিজ্ঞান অনেকাংশে নির্ভরশীল। যে কোন প্রাণীদেহের জৈবিক কার্যপ্রণালী অনুশীলন করতে গেলে তার জাতিজনিগত (phylogenetic) ও ব্যক্তিজনিগত (ontogenic) বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

5. **শারীরবিজ্ঞানের অনুশীলন :** শারীরবিজ্ঞান একটি প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞান। ভৌত, রসায়ন ও প্রায়োগিক পরীক্ষাপদ্ধতি ও যন্ত্রেরসাহায্যে এই বিজ্ঞানের অনুশীলন করা যায়। জৈব ঘটনাবলীর অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ থেকে কোষ, কলা, অংগ ও প্রাণীদেহে সংঘটিত কার্যাবলী ও ঘটনাবলীর তথ্য জানা যায়। তবে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন করেই শারীরবিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হতে পারেন না, কারণ পর্যবেক্ষণ শুধুমাত্র প্রাণীদেহে কি ঘটছে না ঘটছে তার উত্তর

দিতে সক্ষম ; কিভাবে বা কেন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া বা ঘটনাবলী সংঘটিত হয়, তার জবাব দিতে পারে না। শারীরবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে নূতন নূতন পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্য নেন, যার দ্বারা প্রাণীদেহে পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি করে অনুশীলন চালান হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন অংগকে স্বস্থানে অনুশীলন করা হয়, আবার কখনও দেহ থেকে অন্তরিত করে বা দেহের অন্যস্থানে স্থাপন করে তার শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর পরিবর্তন সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করা হয়। শারীরবিজ্ঞানের পরীক্ষাপদ্ধতির রকমফের ঘটাতে হয়। সে উদ্দেশ্যে গবেষণার প্রয়োজন দেখা দেয়, পরীক্ষাপদ্ধতিও সেভাবেই নির্দিষ্ট করতে হয়।

দুই

বিজ্ঞানীর জীবন ও অবদান

LIFE AND CONTRIBUTIONS OF SCIENTISTS
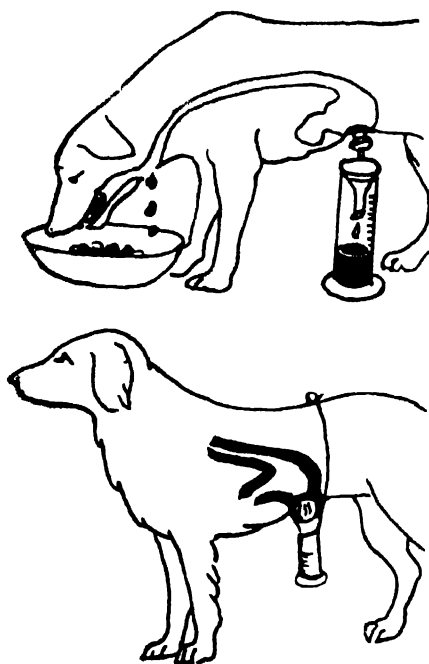
যে সময় থেকে রক্তসংবহনের অনুশীলন আরম্ভ হয়, বলা যায় তখন থেকেই শারীরবিজ্ঞানের বিবর্তনের সূত্রপাত। গ্রীক পণ্ডিতেরা রক্তনালীর উপর যেসব কাজ করেছিলেন অ্যারিস্টটল (Aristotle), 384 322 B.C) তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেন এবং তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার ভিত্তিতে এবং সম্ভবত প্রাণীর উপর ব্যবচ্ছেদ করে তার পরিমার্জনা করেন। হৃৎপিণ্ড যে কেন্দ্রীয় যন্ত্র হিসাবে রক্তপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ করে তিনিই প্রথম তা বুঝতে পারেন। তাঁর মতে হৃৎপিণ্ড ছিল জীবনের অত্যাবশ্যক ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্রস্বরূপ। তাছাড়া

রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকেই জান্তব তাপ (animal heat) গ্রহণ করে। তাঁর মতে ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে আসে বিশেষ বায়ু (pneuma) বা তেজ (spirit) যা রক্তের সংগে মিশলে স্পন্দন শুরু হয়। স্পন্দনকে (pulsation) স্ফুটন প্রক্রিয়া (boiling) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলেক্সান্ড্রিয়ার একজন শারীরস্থানবিদ্ (anatomist) হেরোফিলাস (Herophilus) ধমনীস্পন্দন গণনা করে হৃৎপিণ্ডের ছন্দ ও হার নির্ধারণ করেন। তিনি হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার (valves) কাজও বর্ণনা করেন। ইরাসিস্ট্রাটাস (Erasistratus) নামক আলেক্সান্ড্রিয়ার আর একজন শারীরতত্ত্ববিদের মতে হৃৎস্পন্দন ও দেহউষ্ণতার উৎস হল সেই বিশেষ বায়ু বা নিউমা (pneuma)। তিনি দেহকে নিয়ন্ত্রণকারী নানাধরনের তেজ বা শক্তির (spirit) শ্রেণীবিন্যাস করেন। তাঁর মতে জীবনী শক্তিকে (vital spirit) বহন করে রক্ত এবং জান্তব শক্তিকে (animal spirit) বহন করে স্নায়ুতন্ত্র।

গ্যালেন (Galen, A.D. 130-200) অ্যারিস্টটলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পূর্বসূরীদের কাজের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেন এবং মেষ, কুকুর, শূকর, বানর প্রভৃতি প্রাণীর উপর তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তুকে তাতে যোগ করেন। তিনি মহাধমনী ও প্রধান শিরাসমূহের বর্ণনা দেন। হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন। তবে তাঁর ধারণা ছিল এগুলো হলো রক্ত গরম করার তাপনস্থান (fire places) বা উনান, কেননা রক্তের উত্তাপ বৃদ্ধি ঘটে হৃৎপিণ্ডে। তবে গ্যালেনের শারীরতত্ত্বীয় ধ্যানধারণা ছিল বেশ জটিল। তাঁর মতে খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে উত্তাপে সেদ্ধ হয় এবং এরপর যকৃতে পৌঁছে রক্তে রূপান্তরিত হয়। যকৃৎ থেকে রক্ত দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডে পৌঁছয় এবং তার একাংশ হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে চলে যায়। ফুসফুস এই রক্তকে নিজের কাজে ব্যবহার করে, ফলে তা হৃৎপিণ্ডে আর ফিরে আসে না। রক্তের সামান্য অংশ সেপটামের সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড থেকে বাম হৃৎপিণ্ডে পৌঁছয় ও নিউমা বা বিশেষ বায়ুর সংগে সংমিশ্রিত হয়। নিউমা পৃথকভাবে ফুসফুস থেকে ফুসফুসীয় ধমনীর মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। রক্ত ও নিউমার সংমিশ্রণ মহাধমনীর মধ্য দিয়ে নির্গত হয় এবং রক্তনালীর মধ্য দিয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে ও পুষ্টি জোগায় (2-2 নং চিত্র)। অ্যারিস্টটলের মত গ্যালেনও বিশ্বাস করতেন ধমনীতন্ত্রই দেহে জীবনীশক্তির বণ্টন করে। বায়ু বা বায়ুর যে বিশেষ অংশকে নিউমা বলা হত শ্বাসনালী ও ফুসফুসের মধ্য দিয়েই

তাকে গ্রহণ করা হয় এবং ফুসফুসীয় শিরার মধ্য দিয়ে তা বাম হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়। এদের গঠন শিরার মত হলেও তাদের ধমনী তন্ত্রের অংশ হিসাবে ভাবা হত এবং শিরাসদৃশ ধমনী বলা হত। বাম নিলয়ে নিউমা কিছু পরিমাণ রক্তের সংগে মিশে গিয়ে জীবনী শক্তি তৈরী করে যা মহাধমনী ও ধমনীতন্ত্রের
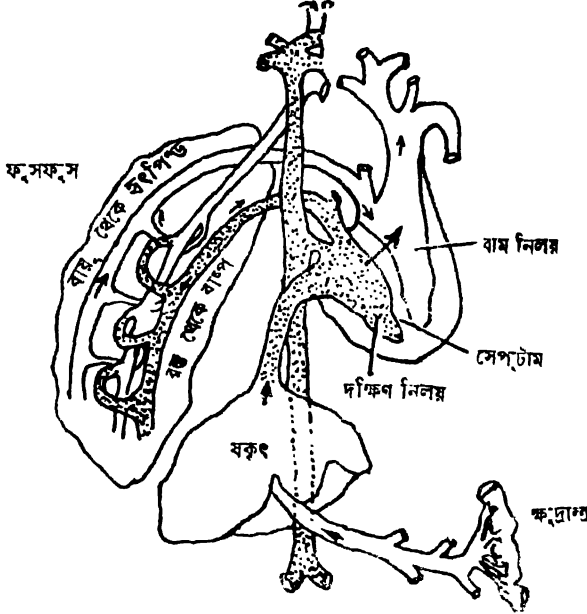
2-2নং চিত্র : গ্যালেন বর্ণিত রক্তসংবহনের ছক।

মাধ্যমে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। ফুসফুসের কাজ হৃৎপিণ্ডে বায়ু চলাচল বজায় রেখে তাকে ঠাণ্ডা রাখা। বুকের উঠানামা ও হৃৎপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণকে একই কাজ হিসাবে ভাবা হত।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াপ্রণালীকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝা হয়েছিল। ধারণা করা হত সক্রিয় অবস্থা বা সিস্টোলের সময় হৃৎপিণ্ড বায়ু ও রক্তকে শুষে নিত এবং প্রসারণ বা ডায়াস্টোলের সময় তাদের ছেড়ে দিত। অ্যানড্রিয়াস ভেসালিয়াস (Andreas Vesalius, 1515-1564) মানুষের শারীরস্থান সম্বন্ধে গ্যালেনের যেসব ত্রুটি ছিল তার অনেক কিছু সংশোধন করেন এবং রক্ত চলাচল সম্বন্ধে যে ভুল বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে সে সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে পড়েন। ভেসালিয়াস হৃৎপিণ্ডকে ব্যবচ্ছেদ করে সেপটামের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ থেকে বাম

হৃৎপিণ্ডে যখন কোন ছিদ্র দেখতে পেলেন না তখন বিস্মিত হলেন। যেহেতু তাঁর কাছে কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না তাই তিনি ধরে নিলেন ছিদ্রগুলো খালি চোখে দেখা যায় না।

পাদুয়াতে কলোম্ব (Colombo, R., 1559) ছিলেন ভেসালিয়াসের উত্তরাধিকারী। রক্তসংবহন সম্বন্ধে তার মতামত হল রক্ত ফুসফুসের মধ্য দিয়েই হৃৎপিণ্ডের ডান দিক থেকে বাঁদিকে যায়। ভেসালিয়াসের ছাত্র মাইকেল সারভেটিয়াস (Servetius, 1511-1553) তাকেই হ্রস্বতর সংবহন (lesser circulation) হিসাবে প্রথম বর্ণনা করেন। মাইকেল সারভেটিয়াস ফুসফুসীয় ধমনী ও ফুসফুসীয় শিরার পার্থক্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তবে, জীবনীশক্তির ডান নিলয় থেকে বাম নিলয়ে যাওয়া সম্বন্ধে যে পুরনো ধারনা ছিল নিজেও তা পোষণ করতেন। আবার রক্ত কিভাবে ফুসফুসীয় ধমনী বা মহাধমনীতে নিক্ষিপ্ত হয় সে সম্বন্ধে কোন ধারণার সৃষ্টি করতে পারেননি। সারভেটিয়াস হয়ত পরীক্ষার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে পারতেন, কিন্তু সে সময়ে জীবন্ত প্রাণীর ব্যবচ্ছেদ (vivisection) নিষিদ্ধ হয়।

উইলিয়াম হার্ভে
William Harvey.

উইলিয়াম হার্ভে 1578 সালে ইংল্যাণ্ডের ফলকেস্টোন (Folkestone) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং 1657 সালে 79 বৎসর বয়সে লণ্ডনের কাছে ভাতৃগৃহে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হার্ভে যখন ছোট ছিলেন তখন স্থানীয় একজন কসাই প্রাণীর একটি হৃৎপিণ্ড তাঁকে উপহার দেয়। এই হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে তরলের প্রবাহ হয়ত তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন এবং নিঃসন্দেহে এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ থেকেই তিনি হৃৎপিণ্ডের শারীরস্থান ও সংবহন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আহরণ করেন। পরবর্তী জীবনে হার্ভে যখন একজন পরিণত চিকিৎসক তখন রাজা প্রথম চার্লস শিকারীদের আদেশ দিয়েছিলেন হার্ভের পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনে যেসব জিনিস দরকার তারা যেন তাঁকে সেসব সরবরাহ করে।

হার্ভে ক্যান্টারবারী গ্রামার স্কুলে পড়া শুরু করেন এবং সেখান থেকে 16 বৎসর বয়সে ক্যাম্ব্রিজের গনভিলে অ্যাণ্ড কেইয়াস কলেজে (Gonville and

Caius College) প্রবেশ করেন। 1597 সালে উক্ত কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। 1599 সালের শেষের দিকে তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Padua) ভর্তি হন এবং অ্যাকুয়া-পেনডেনটির হাইয়ারোনিমাস ফেব্রিসিয়াস (Hieronymus Fabricius of Aquapendente) এবং গ্যাব্রিলি ফেলোপিয়াসের (Gabriele Fallopius) এর সংগে পড়াশুনা করেন। শেষোক্ত দুজনই পাদুয়াতে ভেসালিয়াসের চিন্তাধারার ধারক ও বাহক ছিলেন।

তুলনামূলক শারীরস্থানের স্কলার ও প্রভাবশালী শিক্ষক হিসাবে ভেসালিয়াসের পরই ফেব্রিসিয়াসের স্থান। ফেব্রিসিয়াস পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 60 বছরেরও বেশী দিন ধরে শিক্ষকতা ও গবেষণামূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। হার্ভের পাদুয়াতে আসার পূর্বেই ফেব্রিসিয়াস রক্তের শিরায় কপাটিকা বা ভালভের (valves) উপস্থিতি সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করেন এবং রক্তের সংবহন সম্বন্ধে অন্যান্য আরো কিছু মতামত ব্যক্ত করেন।

1602 সালে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হার্ভে তার ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন এবং পুনরায় লণ্ডনে ফিরে আসেন। লণ্ডনে ফিরেই তিনি প্রাইভেট প্রাকটিস শুরু করেন। একই সালে তিনি মেডিসিনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন এবং 1604 সালে 'কলেজ অব ফিজিসিয়ানের' ফেলোশিপ লাভ করেন। এরপর 1608 সালে 30 বৎসর বয়সে সেণ্ট বারথোলোমিউ (St. Bartholemew) হাসপাতালে সহকারী সার্জেনের পদে অধিষ্ঠিত হন। 1909 সালে একই হাসপাতালে ফিজিসিয়ান বা চিকিৎসক পদে উন্নীত হন।

1615 সালের আগষ্ট মাসে হার্ভে 'কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ অ্যাণ্ড সার্জনস'-এ অ্যানাটমি বা শারীরস্থানের লুমলেইয়ান অধ্যাপক (Lumleian Professor) নিযুক্ত হন। লর্ড জন লুমলি (Lord John Lumley) দ্বারা অধ্যাপকের এই পদটি সৃষ্টি হয় এবং এর খরচ বহন করার জন্য একটি ফাণ্ডও গঠন করা হয়। 1616 সালের 16ই এপ্রিল হার্ভে একটি হলঘরে ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে তাঁর প্রথম লুমলেইয়ান লেকচার শুরু করেন যা দিন তিনেক স্থায়ী হয়েছিল। হার্ভের এটিই ছিল সাধারণ মানুষের সামনে প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা, যে আলোচনায় তিনি প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করেন।

1628 সালে 50 বৎসর বয়সে হার্ভে ল্যাটিন ভাষায় 72 পৃষ্ঠার একখানা বই লিখেন। প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও রক্তের সঞ্চালনের উপর তার 12 বছরের অভিজ্ঞতা এই বইতে লিপিবদ্ধ আছে। হার্ভে এছাড়া আরও দুখানা বই প্রকাশ করেন, যার

একটি হল, ফ্রান্সের যেসব ডাক্তার তাঁর কাজের সমালোচনা করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে লিখা এবং অপরটি প্রাণীর উদ্ভবের উপর লিখা।

প্রথম চার্লসের সিংহাসনে আরোহণের পর রাজপরিবারের সংগে হার্ভের ঘনিস্টতা স্থাপিত হয়। তিনি চার্লসের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত হন। হার্ভের শারীরস্থানিক গবেষণার প্রতি প্রথম চার্লসের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। তিনি হার্ভের কাজের প্রতি উৎসুক্য প্রকাশ করেন এবং হার্ভের পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণী পেতে যাতে কোন অসুবিধে না হয় তার জন্য রাজকীয় শিকারী-দের প্রাণীসরবরাহের আদেশ দেন। চার্লস হার্ভের কিছু কিছু ব্যবচ্ছেদ প্রত্যক্ষ করেন এবং এসব পরীক্ষা যাতে আরও বিস্তৃতভাবে করা সম্ভব হয় তার সুযোগ করে দেন।

প্রথম চার্লসের সময়ই গৃহযুদ্ধ (civil war) শুরু হয়। গৃহযুদ্ধের পুরো সময়ই হার্ভে রাজার সংগে ছিলেন, এবং রাজদরবার যখন লন্ডন থেকে অক্সফোর্ডে

2-3 নং চিত্র ঃ উইলিয়াম হার্ভে।

স্থানান্তরিত হয় তখন তিনিও সেখানে চলে যান। রাজকীয় বাহিনীর পরাজয়ের পর চার্লসের সংগীসাথীরা যখন বাইরে পালিয়ে যান তখন হার্ভে তাদের সংগে না গিয়ে লণ্ডনের কাছাকাছি তাঁর ভাইদের সংগে বসবাস করতে থাকেন। 1657 সালে 79 বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

হার্ভের বৈজ্ঞানিক অবদান

Scientific contributions of Harvey

পদ্ধতিগত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বৈজ্ঞানিক কোন সমস্যার সমাধানে প্রথমে প্রকল্প বা হাইপোথেসিস রচনা করতে হয়। এই প্রকল্প বা হাইপোথেসিসের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষাপদ্ধতি ঠিক করা হয়। পরীক্ষা থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ হয় তার পর্যালোচনা থেকেই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠার সোপান তৈরী হয়। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাও এসেছে সেভাবে, বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম হার্ভের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। হার্ভে তাই আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের বিবর্তনের পথিকৃৎ। তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে বিবৃত হল ঃ

1. **শারীরবিজ্ঞানে পদ্ধতিগত পরীক্ষার প্রচলন** (Initiation of Experimental Approach in Physiology) ঃ উইলিয়াম হার্ভে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর এই বাস্তব চিন্তার ফসল হিসাবেই শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছে। হার্ভে আধ্যাত্মিক বা অবাস্তব শক্তির (incorporeal spirit) ধারণার পরিপন্থী ছিলেন। তিনি মনে করতেন এসব প্রচলিত ধারণার উপর ভিত্তি করে শারীরতত্ত্বের কার্যপ্রণালীর যেসব ব্যাখ্যা করা হয় তা যেমন সম্পূর্ণ অবাস্তব তেমনি অজ্ঞতারই নামান্তর মাত্র। তার পূর্বসূরী কিছু বৈজ্ঞানিক শারীরতত্ত্বের উপর কিছু কিছু পরীক্ষা সম্পাদন করে থাকলেও প্রচলিত ধারণার বাইরে তাঁরা তাদের চিন্তাধারাকে নিয়ে যেতে পারেন নি, তাই বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। জীবন্ত প্রাণী ও মৃত প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য আছেই। দেহের মধ্যে দিয়ে যে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হয় তা কসাই এর দোকানের মেঝে পড়ে থাকা জমাট বাঁধা রক্তের থেকে নিশ্চয়ই আলাদা। কিন্তু পার্থক্য কেন এবং আলাদাই বা কেন তা নিয়ে ভাববার মানসিকতা তখন একমাত্র হার্ভের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। ব্যবচ্ছেদ ও জীবন্ত প্রাণীর উপর সহজ সরল পরীক্ষার সমন্বয়ে তিনি শারীরবিজ্ঞানে পদ্ধতিগত পরীক্ষার প্রচলন করেন এবং শারীরতত্ত্বের প্রাচীন ধ্যানধারনাকে ভেংগে দিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন।

2. **অবিরাম রক্তসংবহনের আবিষ্কার** (Discovery of Continuous Crculation) ঃ হার্ভের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার রক্তের **অবিরাম সংবহন**। রক্ত যে 'বদ্ধ সংস্থা' (closed system), রক্তনালীর মধ্য দিয়ে অনবরত সারা দেহে

প্রবাহিত হয় তা তিনি অসংখ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন। পাদুয়ায় তাঁর অভিজ্ঞতা অবিরাম রক্তসংবহনের ধারণাকে জোরদার করে। একদল ছাত্রের সংগে ঝগড়াঝাটির সময় হার্ভের এক বন্ধু ছুরিকাহত হন। তাঁর ঊর্ধ্ববাহুর একটি ধমনী কেটে যায় এবং তার মধ্য দিয়ে রক্ত ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসে। দেখে মনে হচ্ছিল একটি সক্রিয় পাম্প সেখানে কাজ করছে। হার্ভে জানতেন শিরার ভেতর দিয়ে রক্তের প্রবাহ ধীর বা বিন্যস্ত। এর থেকে তিনি প্রমাণ পেলেন ধমনীর রক্ত স্পন্দনধর্মী এবং পাম্পক্রিয়ার মাধ্যমে তা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। হার্ভে ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও রক্তসংবহনের উপর পরীক্ষা চালান। এছাড়া যেসব অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত প্রতিবছর সেরকম ছটি দেহ ব্যবচ্ছেদ করা হত। হার্ভে তার থেকেও রক্ত সংবহনের তথ্য সংগ্রহণ করতেন। তুলনামূলক শারীরস্থানিক পর্যবেক্ষণও তাকে সাহায্য করে। এছাড়া শিরার মধ্য দিয়ে রক্তের একমুখী প্রবাহ, কব্জি, কপালের পার্শ্ব ও ঘাড়ের পাশে রক্তস্পন্দনের অনুভূতি, রক্ত পরিমাণের নির্ধারণ প্রভৃতি তাকে অবিরাম রক্ত সংবহন সম্বন্ধে নিশ্চিত করে। হার্ভে দেখতে পেলেন সবরকম মেরুদণ্ডী প্রাণীতে একইভাবে ও হৃৎপিণ্ডের পাম্পক্রিয়ার জন্য রক্ত সমগ্র দেহে অবিরাম প্রবাহিত হয়।

1616 সালের 17ই এপ্রিল হল ঘরে ব্যবচ্ছেদকরা মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে হার্ভে তাঁর প্রথম লুম্‌লেইয়াম লেকচারের দ্বিতীয় দিনে সমবেত জনতার সামনে প্রদর্শনের মাধ্যমে যে বক্তব্য রাখেন তার একাংশ নিম্নরূপ ঃ হৃৎপিণ্ডের গঠন থেকে প্রমাণিত হয় যে রক্ত অনবরত ফুসফুসের মাধ্যমে মহাধমনীতে সঞ্চালিত হয় যেমন করে একটি জলীয় হাপর (water bellows) জলকে উপরে তুলার সময় বার দুই বকবক করে ওঠে। সুতো দ্বারা বেঁধে প্রমাণ করা গেছে যে রক্ত ধমনী থেকে শিরায় প্রবাহিত হয়। অতএব এর দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণই রক্তকে অনবরত চক্রাকারে আবর্তিত করে।

3. **হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার পরীক্ষা** (Experiments on the Action Heart) ঃ প্রধানত ঠাণ্ডা রক্তের মেরুদণ্ডী প্রাণীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে হার্ভে প্রমাণ করেন যে হৃৎপিণ্ড মানুষসমেত সবরকম মেরুদণ্ডী প্রাণীতে কেন্দ্রীয় পাম্প হিসাবে কাজ করে এবং অবিরাম রক্তসংবহনকে বজায় রাখে। হৃৎপিণ্ড যে পাম্প হিসাবে কাজ করে তার প্রমাণ পান তাঁর ছুরিকাহত বন্ধুর ঊর্ধ্ববাহুর ধমনী থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত নির্গমন দেখে। ব্যাঙ, সরীসৃপ প্রভৃতি ঠাণ্ডা রক্তের

প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকে হাত-লেন্সের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হার্ভে পর্যবেক্ষণ করেন। এর আগে তাঁকে শেখানো হয়েছিল যে হৃৎপিণ্ডের সব অংশ একই সংগে সংকুচিত হয়, কিন্তু তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি দেখতে পেলেন হৃৎপিণ্ডের উর্ধ্বাংশ প্রথমে স্পন্দিত হয় এবং নিচের অংশের স্পন্দন পরে হয়। তুলনামূলক শারীরস্থানিক পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পৌছেন যে সবরকম মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড সাধারণভাবে মোটামুটি এক এবং হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহের প্রদর্শন করা সম্ভব। হার্ভে এরপর হৃৎপিণ্ড এক মিনিটে কতবার স্পন্দিত হয় এবং প্রতি স্পন্দনে কতটুকু রক্ত মহাধমনীতে উৎক্ষেপ করে তা নির্ধারণ করেন। তাঁর নির্ধারিত নাড়ীস্পন্দন মিনিটে 33 বার এবং বাম অলিন্দের প্রতি স্পন্দনে রক্ত উৎপাদ তিন আউন্সের (1 আউন্স = 28·57 মিলিলিটার) মত, কারণ তিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন বাম নিলয় 2 আউন্সের বেশী রক্ত ধারণ করতে পারে।

ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণীর জীবন্ত হৃৎপিণ্ডের উপর পর্যবেক্ষণ করে তিনি তার সক্রিয়তার বিভিন্ন পর্যায়কে আরও ভালভাবে সনাক্ত করেন। তিনি দেখতে পান হৃৎপিণ্ডের সবচেয়ে শান্ত সময়ে যখন সে প্রসারিত হয় তখন হৃৎপিণ্ড রক্তের দ্বারা পূর্ণ হয়। রক্ত প্রথমে অরিকলে (অলিন্দে) প্রবেশ করে, অরিকল এরপর সংকুচিত হয় এবং রক্তকে ভেণ্ট্রিকেলে (নিলয়ে) ঠেলে দেয়। হৃৎপিণ্ডের প্রধান কাজ হল নিলয়গুলোর সংকোচন ঘটানো, সংকোচনের সময় হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগ উপরের দিকে উত্থিত হয়। ছিদ্রগুলো ছোট হয় এবং সমগ্র হৃৎপিণ্ড বৃহদাকার ও অধিকতর সংকীর্ণ হয়ে ওঠে; এর ফলে নিলয়ের রক্ত ফুসফুসীয় শিরা (যা ধমনীর মত দেখতে) ও মহাধমনীতে উৎক্ষিপ্ত হয়।

এছাড়াও তিনি প্রমাণ করলেন, ভ্রূণাবস্থায় দুটো নিলয়ের মধ্যে সংযোগ থাকলেও বয়স্ক হৃৎপিণ্ডে উভয় নিলয়ের অন্তর্বর্তী সেপটাম অভেদ্য, ফলে রক্ত বা কোন তরলপদার্থ দক্ষিণ নিলয় থেকে বাম নিলয়ে সরাসরি যেতে পারে না, ফুসফুসের ভেতর দিয়ে ঘুরে আসতে হয়।

4. **হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার কাজ** (Function of Valves of Heart): হার্ভে পরীক্ষার সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকা বা ভালভের কাজ কি তা নির্ধারণ করেন। তিনি প্রমাণের সাহায্যে দেখালেন তরল পদার্থ অরিকল থেকে মহাশিরাতে বা অরিকল থেকে শিরাসদৃশ ফুসফুসীয় ধমনীতে ফিরে যেতে

পারে না, অথবা নিলয় থেকে অলিন্দে ফিরে যেতে পারে না। এসব কপাটিকার জন্যই রক্তের প্রবাহ একমুখী।

5. **রক্তের একমুখী প্রবাহ** (One-way traffic of blood) **:** দেহের রক্ত যে রক্তনালীতে একই দিকে প্রবাহিত হয় এবং শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের দিকে এবং ধমনীর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে দূরে প্রবাহিত হয় হার্ভে তা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন। ফেব্রিসিয়াস শিরাতে কপাটিকা বা ভালভের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন, কিন্তু তাদের কি কাজ তিনি তা বুঝতে পারেন না। হার্ভে এসব কপাটিকার সক্রিয়তা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখতে পান এরা রক্তের বিপরীত প্রবাহে (back flow) বাধা দান করে। তিনি লক্ষ্য করেন, কোন শিরার অন্তর্বর্তী স্থানে আঙুল দিয়ে চাপ সৃষ্টি করলে তার কিছু অংশ খালি হয়ে যায়: যেমন, নিম্নবাহুর 1 ও 2 নং স্থানের মধ্যে আঙুল দিয়ে চাপসৃষ্টি করলে শিরাটি খালি হয়ে যায় (1-2 নং ও 2-4 নং চিত্র)। আবার আঙুলের চাপ 1 নং স্থান থেকে 3 নং স্থানে সরিয়ে নিলে তার অন্তর্বর্তী স্থানটি রক্তে
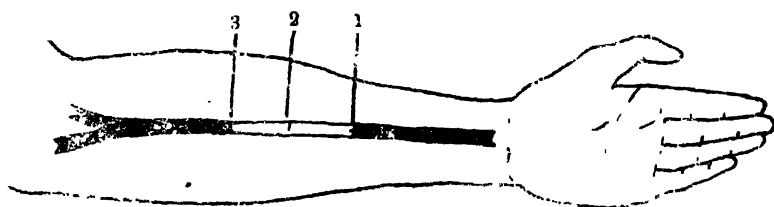
2-1 নং চিত্র : নিম্নবাহুর শিরাতে কপাটিকার উপস্থিতির পরীক্ষা।

ভরে ওঠে। এ জাতীয় পরীক্ষার দ্বারা হার্ভে প্রমাণ করেন শিরানিহিত কপাটিকাগুলো রক্তের বিপরীত প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে এবং রক্তের প্রবাহকে একমুখী করে তুলে। হার্ভে জীবন্ত প্রাণীর উপরও পরীক্ষা করেন। জীবন্ত প্রাণীকে উন্মুক্ত করে তার মহাশিরাকে বেঁধে দিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন, বাঁধের আগের অংশ এবং হৃৎপিণ্ডের দূরবর্তী অংশ রক্তে ভরে ওঠে কিন্তু হৃৎপিণ্ড ফেকাশে ও মন্থর হয়ে পড়ে। এই উভয় প্রকার পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পৌছান যে শিরারক্ত হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে প্রবাহিত হয়।

হার্ভে প্রাণীর ধমনীগুলোকে সুতো দিয়ে বেঁধে লক্ষ্য করেন হৃৎপিণ্ডের দূরবর্তী অংশ ফেকাশে ও রক্তশূন্য হয়ে পড়ে, কিন্তু হৃৎপিণ্ড ও বাঁধের অন্তর্বর্তী অংশ

রক্তে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় রক্ত ধমনীর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয়।

6. **হ্রস্বতর ও দীর্ঘতর সংবহন** (Lesser and Greater Circulation) : মাইকেল সারভেটিয়াস (Michael Servetius) হ্রস্বতর সংবহনের উল্লেখ করলেও রক্ত কিভাবে হ্রস্বতর সংবহনে সঞ্চালিত হয় তা জানতেন না। হৃৎপিণ্ড কিভাবে কাজ করে তা প্রতিষ্ঠিত করার পর উইলিয়াম হার্ভে বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ফুসফুসীয় সংবহনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি প্রমাণ করে দেখালেন ভ্রূণাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের উভয় নিলয়ের মধ্যে সংযোগ থাকলেও বয়স্ক হৃৎপিণ্ডে এধরণের কোন সংযোগ বা ছিদ্র নেই। ফলে রক্ত দক্ষিণ নিলয় থেকে ফুসফুসের মধ্যদিয়ে বাম অরিকল বা অলিন্দে পৌঁছয়।

হ্রস্বতর সংবহন বা ফুসফুসীয়* সংবহনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবার পর হার্ভে দীর্ঘতর সংবহন বা তন্ত্রীয় সংবহন (systemic circulation) সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। হার্ভে হৃৎপিণ্ড প্রতিমিনিটে কতবার স্পন্দিত হয় তা গণনা করেন এবং একটি কর্তিত হৃৎপিণ্ড কতটুকু রক্ত ধারণ করতে পারে তা নির্ধারণ করেন। এরপর সহজ গণনা পদ্ধতির ব্যবহার করে দেখান হৃৎপিণ্ড খুব অদক্ষ হলেও এবং নির্ধারিত রক্তের পরিমাণের খুব সামান্য অংশকে উৎক্ষেপ করলেও প্রতিঘণ্টায় যে-পরিমাণ রক্ত মহাধমনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তা মোট দেহতরলের থেকে অনেক বেশী হয়। এই গণনা থেকে হার্ভে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে মহাধমনীর মধ্য দিয়ে যে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে নির্গত হয় সেই পরিমাণ রক্তকে মহাশিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে। এছাড়া মহাশিরা ও ধমনীতে সুতোর বাঁধ দিয়েও হার্ভে এই তন্ত্রীয় সংবহনের সপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করেন। রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে মহাধমনীর মাধ্যমে নির্গত হয়ে সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুনরায় শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

7. **ফুসফুসীয় রক্তনালী সম্বন্ধে বিভ্রান্তির অবসান** (Removal of Confusion Concerning Pulmonary Vessels : ফুসফুসীয় ও তন্ত্রীয় সংবহনের কার্যপ্রণালী নূতনভাবে উপলব্ধি করার পর ফুসফুসীয় রক্তনালী সম্বন্ধে যে বিভ্রান্তি ছিল তার অবসান ঘটালেন উইলিয়াম হার্ভে। তাঁর মতে দক্ষিণ নিলয় ও ফুসফুসকে সংযোগকারী নল গঠনগতভাবে ও কার্যগতভাবে একটি বিশুদ্ধ ধমনীবিশেষ, কারণ এই রক্তনালীর মধ্য দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে প্রবাহিত হয়। হার্ভে তাই এই রক্তনালীর নাম দেন ফুসফুসীয়

ধমনী (Pulmonary artery)। একইভাবে যে রক্তনালী ফুসফুস ও বাম অলিন্দকে সংযুক্ত করে হার্ভে তার নাম দিলেন **ফুসফুসীয় শিরা** (pulmonary vein), কারণ এই রক্তনালীর মধ্য দিয়ে রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত হল, রক্ত দক্ষিণ নিলয় থেকে ফুসফুসের মধ্য দিয়ে বাম অলিন্দে ফিরে আসে এবং বাম অলিন্দ থেকে ধমনী, শিরা ও মহাশিরা হয়ে পুনবায় দক্ষিণ অলিন্দে ফিরে আসে। তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভাবে হার্ভে রক্তজালিকার অস্তিত্ব সনাক্ত করতে পারেননি, তাই ধমনী ও শিরার মধ্যে যে সরাসরি সংযোগ রয়েছে তা দেখাতে সমর্থ হননি।

8. **রক্ত সম্বন্ধে হার্ভের ধারণা** (Concept of Harvey about Blood) : হার্ভের অধ্যাপকেরা বলতেন দেহের রক্ত দুধরনের : প্রথম প্রকারের রক্ত যকৃৎ থেকে উৎপন্ন হয় এবং তা দেহের পুষ্টি সরবরাহ করে। এই রক্ত আসলে জন্তু শক্তি (animal spirit)। আবার হৃৎপিণ্ড থেকে যে রক্ত উৎপন্ন হয় তাঁদের মতে তা স্পন্দনধর্মী এবং তা দেহের তাপ ও শক্তির সরবরাহের জন্য দায়ী, এর নাম জীবনী শক্তি (vital spirit)। রক্তের এই পার্থক্যকে হার্ভে স্বীকার করার কোন যুক্তি খুঁজে পাননি। তিনি উভয় উৎসের রক্তকে আস্বাদন করে একই ধরণের স্বাদ পান। তাঁর মতে এই সমধর্মী রক্তই পাম্পক্রিয়ার মাধ্যমে সমগ্র দেহে প্রবাহিত হয়।

9. **প্রাণীর প্রজনন** (Animal Reproduction) : হার্ভে তাঁর পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে, 1651 সালে একখানা বই লিখেন। বইখানা তাঁর মৃত্যুর বছর কয়েক পরে প্রকাশিত হয়। এই বই থেকে জানা যায় প্রজনন সম্বন্ধে হার্ভের ধারণা তেমন স্পষ্ট ছিল না। তাঁর বইয়ের সবচেয়ে স্মরণীয় অংশ হল : **সবরকম প্রাণীই একটিমাত্র ডিম্বাণু থেকে জন্মায় :** (Ex ovo omnia)। বর্তমানে ডিম্বাণু বলতে যা বোঝায় হার্ভের সেরকম কোন ধারণা ছিল না। অতএব হার্ভের বর্ণিত ডিম্বাণু ছিল আলাদা, ভ্রূণকেই তিনি ডিম্বাণু হিসাবে মনে করতেন। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম্বাণু দেখার সুযোগ হার্ভের আসেনি, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর ধারণা অনুসারে শুক্র শক্তিবর্ধক হিসাবে কাজ করে।

10. **গ্রন্থ রচনা** (Writing of Books) **:** হার্ভে তাঁর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তিনখানা বই রচনা করেন। এই তিনখানা বই হল : (a) **এক্সারসিটাটিও অ্যানাটমিকা ডি মোটু করডিস এট সাংগুইনিস ইন অ্যানিম্যালিবাস** (Exercitato anatomica de motu cordis et sanguinis in animalıbus)। বাংলা মানে, প্রাণীর রক্ত ও হৃৎপিণ্ডের চলনের উপর শারীরস্থানিক অনুশীলন। ল্যাটিন ভাষায় লিখিত 72 পৃষ্ঠার এই সুবিখ্যাত বইখানা 1628 সালে প্রকাশিত হয়। (b) দ্বিতীয় বইখানা তাঁর সমালোচক ফরাসী ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে লিখিত। 1649 সালে প্রকাশিত এই বইখানা খুবই ছোট। (c) তৃতীয় বইখানা আকারে বড়। প্রজনন বিষয়ে তাঁর ধ্যানধারণা এই বইয়ে লিপিবদ্ধ আছে। 1651 সালে বইখানা তিনি রচনা করেন। বইয়ের নাম প্রাণীর প্রজননের অনুশীলন (Exercises on the Generation of Animals)।

এছাড়াও হার্ভে পুস্তক রচনার জন্য রোগগ্রস্থ শারীরস্থানের উপর বিষয়বস্তু সংগ্রহে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পেশীর কার্যপ্রণালীর উপর অনেক নোট প্রস্তুত করেছিলেন, তবে এগুলো তখন প্রকাশিত হয়নি।

ক্লড বার্নার্ড
Claude Bernard

ক্লড বার্নার্ড গত শতাব্দীর একজন নাম করা ফরাসী শারীরতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তিনি 1813 সালে দক্ষিণ ফ্রান্সে জন্ম গ্রহণ করেন এবং 1878 সালে সেখানেই যক্ষ্মা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যান্য যেকোন বৈজ্ঞানিকের চেয়ে শারীরবিজ্ঞানে তার মৌলিক অবদান অনেক বেশী। আট বৎসর বয়সে একজন পাসী যাজকের তত্ত্বাবধানে তার পড়াশুনা শুরু হয়। অল্প বয়সেই তিনি ল্যাটিন ও অন্যান্য ভাষা আয়ত্ব করেন। পরে জেসুট স্কুলে (Jesuit School) পড়ার সময় অবসর সময়ে বাড়ীতে তাঁর কাছে আসা ছাত্রদের ভাষা ও গণিত শেখাতেন।

বার্নার্ডের বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই 18 বৎসর বয়সে তাকে স্কুলের পড়া ছাড়তে হল। 1832 সালে তিনি পাশাপাশি একটি শহরে চলে যান এবং একজন ওষুধ বিক্রেতার কাছে শিক্ষানবিস হিসাবে যোগ দেন। সেখানে তার দৈনন্দিন কাজ ছিল দোকান ঝাড় দেওয়া, বোতল ধুয়ে পরিষ্কার

করা, কাগজের ছাপ তৈরী করা বা ওষুধের ব্যবস্থাপত্র বিলি করা ইত্যাদি। এই ওষুধের দোকানের অনতি দূরেই পশুচিকিৎসার স্কুল ছিল। ক্লড বার্নার্ড প্রায়ই সেই স্কুলে ওষুধ নিয়ে যেতেন। জীবন্ত প্রাণীর উপর যেসব অস্ত্রোপচার করা হত তিনি তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন। জ্যান্ত প্রাণীর উপর এসব অস্ত্রোপচার তার মনে খুব গভীর রেখাপাত করেছিল। এনিয়ে তিনি তাঁর নিয়োগকর্তার সংগে আলোচনাও করতেন। নিজের কাজে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির পর নূতন কিছু প্রস্তুত করার সুযোগও তাকে দেওয়া হয়েছিল। 'সু-পালিশ' প্রস্তুত করে তিনি গর্বের সংগে বলেছিলেন "এখন তাহলে আমি কিছু তৈরী করতে পারি, আমি এখন একজন পুরুষ"।

2-5 নং চিত্র: ক্লড বার্নার্ড।
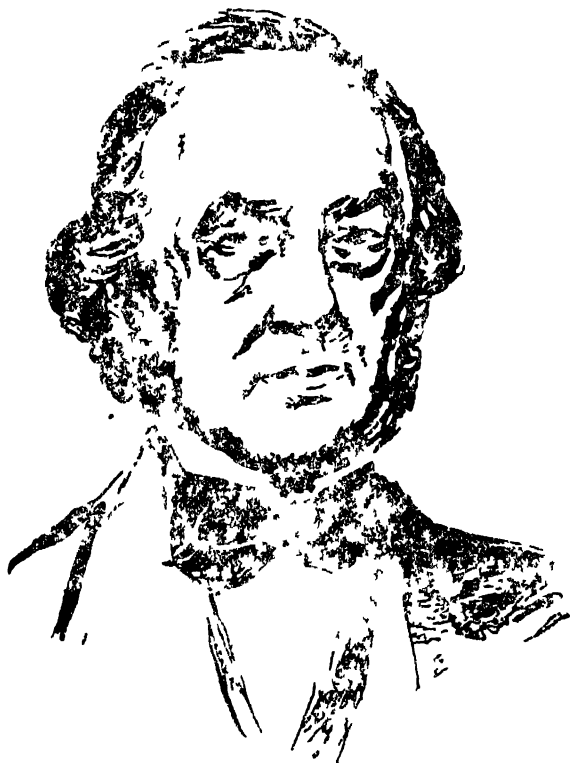
ক্লড থিয়েটার দেখতে খুব ভাল বাসতেন। থিয়েটার দেখে তার ধারণা হল তিনিও তো নাটক লিখতে পারেন। তাঁর প্রথম চেষ্টা হিসাবে লা রোজ ডু রোন (La Rose du Rhone) নামক একটি ছোট নাটক লিখেন। তাঁর

সময়কার একটি জনপ্রিয় ওষুধ থেরিয়াক (theriac) এর উপর লিখা নাটকটি ছিল একটি কমেডি। প্রায় 60টি বিভিন্ন ওষুধের সমন্বয়ে থেরিয়াক তৈরী। এর মধ্যে আফিম, মধু, মদ, পদ্মফুলের গাছের রস প্রভৃতি উপাদান মেশান হত। এসব উপাদান ছাড়াও যেসব ওষুধ নষ্ট হয়ে যেত বা বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকত তাও থেরিয়াকে মেশানো হত। বার্নার্ড একশত ফ্রাংকে তাঁর নাটকটি বিক্রি করেন এবং লিওনস (Lyons) নামক ছোট থিয়েটারে সাফল্যের সংগে সেটি অভিনিত হয়। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে বার্নার্ড পাঁচ অঙ্কের একখানা নাটক রচনার মনোনিবেশ করেন। ফলে দোকানের কাজে ভাটা পড়ে। দোকানদার বছর দেড়েক পরে তাঁকে আর রাখতে রাজী হয় না। বার্নার্ড তাঁর অসমাপ্ত নাটকের পাণ্ডুলিপি সংগে নিয়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে চলে যান। সেখানে সেইন্ট মার্ক গিরার্ডিন (Saint-Marc Girardin) নামক এক ব্যক্তি তাঁকে নাটক লিখায় নিরুৎসাহ করেন এবং উপদেশ দেন 'বাপুহে, পড়াশুনা করে কোন পেশায় নিজেকে আগে দাঁড় করাও, এরপর অবসর সময়ে নাটক নোবেল লিখার কথা ভাব।' ক্লড বার্নার্ড তাঁর এই উপদেশ গ্রহণ করেন এবং 1832 সালে ফ্রান্স কলেজের মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন।

1839 সালে ইনটার্নশিপের ফল যখন বেরোল তখন দেখা গেল লর্ড বার্নার্ড পরীক্ষায় ভাল করতে পারেননি। 29 জন ছাত্রের মধ্যে তার স্থান ছিল 26। তাঁর নিজের অন্যমনস্কতার জন্যই হয়ত তিনি ভাল ফল করতে পারেননি। ফলাফল ভাল না হলেও বার্নার্ডের ল্যাবরেটরীর কাজে নৈপুণ্য ছিল। তখনকার একজন বড় শারীরতত্ত্ববিদ্ ম্যাজেনডাই (Magendie) তাঁকে তাঁর ল্যাবরেটরীতে একজন সহকারী হিসাবে গ্রহণ করেন। ম্যাজেনডাই ছিলেন সন্দেহপ্রবণ, অসহিষ্ণু, ব্যঙ্গাত্মক; ছাত্র বা সহকারীদের প্রতি তিনি ধৈর্যশীল ছিলেন না। তবে তিনি মৌলিক গবেষণার কাজে অনুরাগী ছিলেন এবং ছাত্রদের পড়াবার সময় সব সময়ই ব্যবচ্ছেদ করে দেখাতেন। ক্লড বার্নার্ড এই পরিবেশেও দীর্ঘদিন সহকারী হিসাবে কাজ করেন। প্রায় 35 বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি সহকারীই ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পদ পাবার জন্য বার বার চেষ্টা করেন কিন্তু সাফল্যলাভ করেননি। একজন ভাল চিন্তাবিদ ও নিপুণ প্রযুক্তিবিদ হিসাবে তাঁর সুনাম ছিলেও ক্লড বার্নার্ড সুবক্তা ছিলেন না।

পরিশেষে 1854 সালে সরবোনিতে (sorbonne) সাধারণ শারীরবৃত্তের

অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। 1858 সালে ফ্রান্স কলেজে মেডিসিনের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন এবং এভাবে ম্যাজেনডাই-এর স্থলাভিষিক্ত হন। শেষোক্ত নিযুক্তির 2 বছর পরে 47 বৎসর বয়সে বার্নার্ড যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় অবসর গ্রহণ করে তাঁর জন্মস্থান দক্ষিণ ফ্রান্সে ফিরে আসেন।

বার্নার্ডের বৈজ্ঞানিক অবদান

Scientific Contributions of Bernard

বার্নার্ড কখনও চিকিৎসকের পেশায় বসেননি। গবেষণা ও রচনাতেই তিনি সব সময় নিয়োজিত থাকতেন। গবেষণাব কাজে তার অধ্যবসায়ের ফলে তিনি শারীরতত্ত্বের বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার কবেন। শারীরবিজ্ঞানে তাঁর অবদান ও আবিষ্কার সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হল ঃ

1. **পরীক্ষাপদ্ধতির সুবিখ্যাত উদ্ভাবক** (Great Experimentalist) ঃ ক্লড বার্নার্ড শারীরবিজ্ঞানে পরীক্ষাপদ্ধতি ব্যবহারেব মূলনীতি উদ্ভাবন করেন। জৈব ও অজৈব জগতের কার্যপ্রণালী যে প্রাকৃতিক নিয়মে চলে তার উপর শ্রদ্ধাশীল থেকেই বার্নার্ড তাঁর গবেষণা কাজ চালান। অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি *1865 সালে পবীক্ষাপদ্ধতির মূলনীতির উপব যে বইখানা প্রণয়ন কবেন তা পড়লেই বোঝা যায় তিনি গবেষণার কাজে পরীক্ষা পদ্ধতিব উপব কতটুকু গুরুত্ব* আরোপ করতেন। বইখানার নাম *'পরীক্ষামূলক মেডিসিনের প্রস্থাবনা'* (Introduction to Experimental Medicine)। বই-এর শেষে তিনি যা লিখেছেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

"সৃজনশীল মৌলিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা, মনের সবচেয়ে ভাল এই গুণগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই আমি এক কথায় বিশ্বাস করি যে সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শ্বাসরোধী পরিস্থিতির উদ্ভব না করেই মনকে আবদ্ধ করে, নিজের সম্মুখীন হবার জন্য যতদূর সম্ভব তার লাগাম ছেড়ে দেয় এবং সঠিক পথের নির্দেশ দেয়। *নূতন নূতন ধারণা ও চিন্তাভাবনার স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতার মধ্য দিয়েই* বিজ্ঞান এগিয়ে যায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এমনভাবে যত্নশীল হতে হবে যাতে যে জ্ঞান মনকে নাড়া দেয় তা যেন তাকে ভারাক্রান্ত না করে তোলে এবং যেসব নিয়মকানুন মনের দুর্বল অংশগুলোকে পোষণ করে তা যেন তার সবল ও উর্বর অংশকে বিনষ্ট না করে। এখানে এর চেয়ে আর কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতে চাই না ; নিজেকে সীমিত রাখতে চাই জীবনবিজ্ঞান ও পরীক্ষামূলক

মেৌডীসনকে আগেভাগে সাবধান করে দিয়ে যাতে তারা পাণ্ডিত্যকে অতিরঞ্জিত না করে এবং তন্ত্রসমূহের দ্বারা আক্রান্ত ও প্রভাবিত না হয়, কারণ যেসব বিজ্ঞান এসবের কাছে আত্মসমর্পণ করে তারা তাদের উদ্ভাবনী শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং মনুষ্যত্বের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য যেমন তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-বোধকে পরিত্যাগ করে।"

2. **করডা টিমপ্যানি নার্ভের সনাক্তকরণ** (Identification of Chorda Tympani Nerve) ঃ বার্নার্ড তাঁর ধৈর্য ও দক্ষতার দ্বারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম নার্ভকেও অনেক দূর পর্যন্ত সনাক্ত করতে পারতেন। এভাবে তার প্রথম আবিষ্কার করডা টিমপ্যানি নার্ভ যা স্বাদকুঁড়ি, জিহ্বার সম্মুখ দুই-তৃতীয়াংশ ও অধঃচোয়াল গ্রন্থিতে স্নায়ুসরবরাহ করে। এই নার্ভকে তিনি সপ্তম করোটি স্নায়ু পর্যন্ত খুজে বের করেন এবং দেখতে পান এটি তারই একটি শাখা।

3. **আনুষংগিক সুষুম্নাস্নায়ুর সনাক্তকরণ** (Tracing of Spinal Accessory Nerve) ঃ বার্নার্ড আনুষংগিক সুষুম্নাস্নায়ুর বর্ণনা দেন এবং ভেগাস নার্ভের সংগে তার সম্পর্কের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেন।

4. **অগ্ন্যাশয়ের সংগে স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের সম্পর্ক** (Relation of Sympathetic Nervous System with Pancreas) ঃ বার্নার্ড তাঁর বেশ *কিছু গবেষণা প্রবন্ধে স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের সংগে অগ্ন্যাশয়ের সম্পর্ক নির্দেশ করে* দেখান।

5. **পাকস্থলী জারকরস ও পরিপাক** (Gastric juice and digestion) ঃ 1843 সালে বার্নার্ড পাকস্থলী জারকরস ও পরিপাকের উপর তাঁর ভূমিকা কি তার উপর তাঁর গবেষণাপত্র (thesis) লিখেছিলেন। এই গবেষণা কার্যে তিনি পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর পরিপাকের বিষয় বর্ণনা করেন।

6. **অগ্ন্যাশয়ের দ্বারা পরিপাক** (Pancreatic digestion) ঃ বার্নার্ডের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল এনজাইম ***স্টিয়েপসিন*** (steapsin) বা লাইপেজের (lipase)। এই স্টিয়েপসিন এনজাইমের পরিপাক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। এই অনুশীলনের সময় তিনি আরও দেখতে পান যে অগ্ন্যাশয় জারকরসে একাধিক এনজাইমের উপস্থিতি রয়েছে যারা কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিনের উপর সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। এসব কিছু এনজাইমও তিনি সনাক্ত করেন।

7. **যকৃতে গ্লাইকোজেন সঞ্চয়** (Storage of glycogen in liver) : বার্নার্ড একটানা 12 বছর ধরে খুব সতর্কতার সংগে প্রাণীজ স্টার্চের (animal starch) উৎপাদনের উপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালান এবং পরিশেষে দেখতে পান কার্বোহাইড্রেট যকৃতে গ্লাইকোজেন হিসাবে সঞ্চিত হয়। ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগের সনাক্তকরণে ও নিরাময়ের ব্যাপারে এই গবেষণা তখন খুব প্রয়োজনীয় ছিল। মৌলিক শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই গবেষণা আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল এজন্য যে এর দ্বারা প্রমাণিত হল প্রাণীদেহ জটিল রাসায়নিক পদার্থকে যেমন ভাংগতেও পারে তেমনি সংশ্লেষণ ও করতে পারে।

8. **অন্তঃস্থ ক্ষরণ** (Internal Secretion) : বার্নার্ড রাসায়নিক পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা করে দেখান যে যকৃৎ গ্লুকোজকে সরাসরি রক্তে মুক্ত করতে পারে। যকৃতের দ্বারা গ্লুকোজের রক্তে এজাতীয় নিঃসরণকে অন্তঃস্থ ক্ষরণ নামে অভিহিত করেন।

9. **বাহনিয়ামক স্নায়ু** (Vasomotor nerve) : বার্নার্ড বাহসংকোচক (vasoconstrictor) ও বাহপ্রসারক (vasodilator) স্নায়ু প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখতে পান, এই স্নায়ুগুলো র‍্যাবিটের কানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালীর আকৃতির নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই রক্তনালীগুলোতে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র স্নায়ু সরবরাহ করে। এছাড়া বার্নার্ড রক্তে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি সনাক্ত করেন। এসব পদার্থ বাহনিয়ামক স্নায়ুসমূহকে সক্রিয় করে তুলে ও রক্তচাপকে প্রভাবিত করে।

10. **দেহে ঔষধ ও বিষের ক্রিয়া** (Actions of drugs or poisons on the body) : দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা কুরারে (curare) নামক যে রাসায়নিক পদার্থকে তীরের ফলায় বিষ হিসাবে ব্যবহার করত ক্লড বার্নার্ড তার শারীরবৃত্তীয় ধর্ম পরীক্ষা করেন। তিনি সতর্কতার সংগে পরীক্ষা করে জানতে পারেন এই পদার্থটি নার্ভ যেখানে পেশীতে প্রবেশ করে সেখানে কাজ করে। বর্তমানে পদার্থটিকে জীবন্ত প্রাণীর উপর অস্ত্রোপচারের সময় নার্ভকে নিস্তেজ করার কাজে শারীরবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে ব্যবহার করা হয়। কার্বন -মনোক্সাইডের (CO) বিষক্রিয়া সম্বন্ধেও বার্নার্ড পরীক্ষা করেন এবং জানতে পারেন কার্বনমনোক্সাইড O_2-কে প্রতিস্থাপন করে হিমোগ্লোবিনের সংগে স্থায়ী যোগ তৈরী করে, ফলে রক্তের O_2-বহন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

11. **মেলিউ এক্সারিউর এবং মেলিউ ইনটারিউর** (Milieu exterieur and Milieu interieur) ঃ 1859 সালে ক্লড বার্নার্ডই প্রথম নির্দেশ করলেন যে প্রাণীরা দুটো পরিবেশে বাস করে। এর একটি হল বাইরের পরিবেশ (external environment), যা সজীব ও নির্জীব এই উভয় বস্তুর ক্ষেত্রেই এক এবং আরেকটি হল প্রাণীর অভ্যন্তরের তরল পরিবেশ (internal fluid environment), যাতে দেহের কোষ ও কলা ডুবে থাকে। শেষোক্ত পরিবেশের বিশেষত্ব প্রাণী কি প্রকারের তার উপর নির্ভর করে এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকে। ক্লড বার্নার্ডের বক্তব্য হল প্রাণী সঠিক অর্থে বাইরের পরিবেশ বা **মেলিউ এক্সারিউর**-এ বাস করে না, বাস করে '**মেলিউ ইনটারিউর**'-এ ; কারণ শেষোক্ত তরল পরিবেশে দেহের কলা ও কোষ ডুবে থাকে এবং এর মাধ্যমেই কলাকোষের মধ্যে খাদ্য ও বর্জ্য পদার্থের বিনিময় হয় ও বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক বার্তাবাহক (chemical messengers) ছড়িয়ে পড়তে পারে। বার্নার্ডের মতে, 'মেলি ইনটারিউর' এর স্থিতিশীলতাই মুক্ত ও স্বাধীন জীবনের পরিবেশ এবং যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াসমূহের (যতটুকুই তারা পরিবর্তিত হোক না কেন) একমাত্র লক্ষ্য হল অন্তঃস্থ পরিবেশে জীবনের অবস্থাকে স্থিতিশীল অর্থাৎ বহির্জগতের পরিবর্তন যাই হোক না কেন অন্তর্জগতের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। ক্যানন (W. B. Cannon) একেই **হোমিওস্টেসিস** (Homeostasis) নামে অভিহিত করেন।

চার্লস স্কট শেরিংটন

CHARLES SCOTT SHERRINGTON

চার্লস স্কট শেরিংটন একজন বিখ্যাত ইংরেজ স্নায়ুশারীরতত্ত্ববিদ্ (neurophysiologist) ছিলেন। স্নায়ুশারীরতত্ত্বের শুধু দিকপালই তিনি ছিলেন না এই বিষয়ের এমন কোন দিক নেই যার উপর তিনি কাজ করেননি।

1857 সালের 27শে নভেম্বর শেরিংটন লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। লণ্ডনেই তিনি স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন এবং 'কেইনস' (Cains) কলেজে ইংরেজী নিয়ে 1883 সালে বি. এ. পাস করেন। বি. এ. তে তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান। এরপর তিনি সেণ্ট থোমাস হাসপাতালে অনুশীলন করেন এবং 1885 সালে কেমব্রিজ কলেজ থেকে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। এই কেমব্রিজে তিনি 1881 থেকে 1885 সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শারীরবিজ্ঞানী

স্যার মাইকেল ফস্টারের (Sir Michael Foster) ছাত্র ছিলেন। 1886 সালে তিনি বার্লিনে যান এবং জার্মান বিজ্ঞান রুডোল্ফ ভিরকো (Rudolf Virchow) ও রবার্ট ককের (Robert Koch) অধীনে কাজ করেন। কক ছিলেন তখনকার একজন স্বনামধন্য ব্যাক্টিরিওলজিস্ট (bacteriologist) বা রোগজীবাণুবিদ্। ভিরকোর উপদেশ অনুসারেই শেরিংটন তাঁর অধীনে কাজ করেন। এছাড়াও তিনি আরও অনেক বৈজ্ঞানিকের সংস্পর্শে আসেন। প্যাগেট (Paget), সিমোন (Simon), বুকানান (Buchanan), গাল (Gull), রিচার্ড কুয়াইন (Richard Quain) এবং শারপে (Sharpey) প্রভৃতি নিদানতত্ত্ববিদের (Clinicians) সংস্পর্শে এসে তিনি নিদানতাত্ত্বিক স্নায়ুশারীরতত্ত্বে (clinical neurology) উৎসাহিত হন। স্পেইন ও ইটালীতে কলেরা মহামারী হিসাবে দেখা দিলে তিনি কিছুকাল সেখানে রোগজীবাণুর উপর গবেষণায়ও লিপ্ত হন। এরপর 1887 সালে কেইনস্ কলেজে ফেলো নিযুক্ত হন এবং পরে সেণ্ট থোমাস হাসপাতালে শারীরবৃত্তের লেকচারার হিসাবে কাজে যোগদান করেন। 1893 সাল পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। একই বছরে তিনি এফ. আর. এস. (F R.S.) হিসাবে নির্বাচিত হন। এরপর তিনি শারীরবৃত্তের ব্রাউন প্রফেসর নিযুক্ত এবং একই সংগে, লণ্ডনের 'ব্রাউন অ্যানিম্যাল স্যানিটরিয়াম এণ্ড ইনস্টিটিউশন' এর অধীক্ষক (superintendent) হন।

1895 সালে শেরিংটন লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে হল্ট প্রফেসর (Holt professor) হিসাবে যোগদান করেন। 1913 সাল পর্যন্ত সেই পথে অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপর শারীরবৃত্তের অধ্যাপক হিসাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং 1935 সাল পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এসব ছাড়াও শেরিংটন আরও বহু সংস্থার সংগে যুক্ত ছিলেন। 1887 থেকে 1905 সাল পর্যন্ত তিনি শারীরতত্ত্ব পরিষদের (physiological society) সচিব (secretary) হিসাবে কাজ করেন। 1920 থেকে 1923 সাল পর্যন্ত, লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। 1926 সাল থেকে 1934 সাল পর্যন্ত জার্নাল অব ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি এর সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া বিশ্বের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যাকাডেমি থেকে নানাপ্রকার সম্মান, ডিগ্রি ও মেডেল লাভ করেন। 1932 নিউরোনের কার্যাবলী সম্পর্কীয় আবিষ্কারের জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।

1952 সালের 4ই মার্চ সাসেক্সের ইস্টবোর্নে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শেরিংটনের বৈজ্ঞানিক অবদান
Scientific Contributions of Sherrington

শেরিংটনের প্রধান কাজ স্নায়ুতন্ত্রের উপর। তাঁর কাজের উপরই বর্তমানকালের স্নায়ুশারীরতত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে যদিও স্নায়ুশারীরতত্ত্বের প্রায় প্রতিটি বিভাগেই তাঁর কাজ আছে তবু তাঁর সবচেয়ে অনুরাগ ছিল গুরুমস্তিষ্ক ও তাঁর নিয়ামক কার্যাবলীর উপর। অবশ্য তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশী সময় অতিবাহিত করেছেন সুষুম্নাকাণ্ড ও প্রতিবর্তীক্রিয়ার রহস্য উদঘাটনে। শেরিংটনকে স্নায়ুতন্ত্রের উইলিয়াম হার্ভে বলা হয়।

শেরিংটনের বৈজ্ঞানিক অবদান সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

1. **অনিয়ন্ত্রমস্তক পেশীকাঠিন্য** (Decerebrate Rigidily) : 1898 সালে শেরিংটন অনিয়ন্ত্রমস্তক পেশীকাঠিন্য প্রদর্শন করেন। সুপিরিয়র ও ইনফিরিওর কলিকুলাসের মধ্যবর্তী স্থানে মস্তিষ্ককাণ্ডকে কাটলে বা গুরুমস্তিষ্ককে থালামাস সমেত অপসারণ করলে, প্রসারক পেশীতে (extensor muscle) যে অস্বাভাবিক পেশীটানের উদ্ভব হয় তাকে **অনিয়ন্ত্রমস্তক পেশীকাঠিন্য** নামে অভিহিত করা হয়। শেরিংটনের মতে পেশীকাঠিন্য পেশীটান প্রতিবর্তের (stretch reflex) অতিসক্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, কারণ-পেশীর সংগে চেষ্টীয় স্নায়ুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলে বা পেশীস্পিনডেল থেকে উৎপন্ন সংজ্ঞাবহ স্নায়ুপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করলে পেশীকাঠিন্য লোপ পায়।

2. **পেশীর স্নায়ুসরবরাহ** (Nerve Supply to the Muscle) : শেরিংটন 1894 সালে দেখতে পান পেশীতে সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয় এই উভয়প্রকার স্নায়ুসরবরাহ রয়েছে।

3. **ব্যতিহার প্রতিরোধ** (Reciprocal Inhibition) : 1896 ও 1897 সালে শেরিংটন দেখতে পান যখন একটি পেশী সংকুচিত হয় তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী পেশী (antagonist muscle) প্রসারিত হয়। তিনি এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার নাম দেন **ব্যতিহার প্রতিরোধ** (reciprocal inhibition)। তিনি এই প্রতিরোধকে একটি সক্রিয় পদ্ধতি হিসাবে উল্লেখ করেন। প্রাণীর চলাফেরা, ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি কার্যে এজাতীয় সক্রিয়তার বিশেষ প্রয়োজন।

শেরিংটনের সূত্র : যখন এক প্রস্থ পেশীকে উদ্দীপিত করা হয় তখন সেই পেশীর কাজের বিরোধী পেশী স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

4. **দেহভংগির নিয়ন্ত্রণ** (Maintenance of Posture): 1898 সালে শেরিংটন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখালেন সমন্বয়ধর্মী প্রতিবর্তীক্রিয়ার সম্মিলিত সক্রিয়তাই দেহভংগির নিয়ন্ত্রণ করে বা দেহভংগি বজায় রাখে।

5. **স্নায়ুতন্ত্রের সমন্বয়মূলক কার্য** (Integrative Action of Nervous System): শেরিংটন 1906 সালে আমেরিকার নিউটাউনের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে (Yale University) একটি বক্তৃতায় স্নায়ুতন্ত্রের সমন্বয়মূলক কাজের উপর জোর দেন। পরে তাঁর এই বক্তব্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর মত ছিল স্নায়ুতন্ত্র একটি একক হিসাবে কাজ করে। তিনি কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি প্রাণীর গুরুমস্তিষ্ক অপসারণ করে প্রমাণ করেন বিভিন্নপ্রকার প্রতিবর্তীক্রিয়ার সমন্বয়ের মাধ্যমেই স্নায়ুতন্ত্র একটি একক হিসাবে কাজ করে। সমন্বয়মূলক কার্য মানেই প্রতিবর্তীক্রিয়াসমূহের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া (interaction)। শেরিংটন দেখালেন একটি একক গ্রাহকের সংজ্ঞাবহ স্নায়ুপথ তার নিজস্ব, কিন্তু উদ্দীপিত হলে একাধিক ক্রিয়াঅংগের সংগে যুক্ত চেষ্টীয় স্নায়ুকে উদ্দীপিত করতে পারে; আবার প্রতিটি প্রতিবর্তী আর্কের (arc) সর্বশেষ নিউরোন, হল ক্রিয়াঅংগের একমাত্র স্নায়ুপথ বা সর্বশেষ স্নায়ুপথ।

6. **গ্রাহকের শ্রেণীবিন্যাস** (Classification of receptors): শেরিংটন উদ্দীপনার উৎস ও অবস্থানের ভিত্তিতে গ্রাহককে 4 ভাগে বিভক্ত করেন: (a) **টানগ্রাহক** (Propioceptor): পেশী, কণ্ডরা ও সন্ধিস্থলে এদের অবস্থান। কণ্ডরা বা পেশীটানের পরিবর্তনে এরা উদ্দীপিত হয় এবং স্থানগত-ভাবে দেহের পেশীচলন ও অবস্থান কী হবে সে সম্বন্ধে প্রাণীকে সজাগ করে তুলে। (b) **বহিঃগ্রাহক** (exteroceptors): দেহচর্মে এসব গ্রাহকের অবস্থান। এরা সন্নিহিত বহিজর্গতের পরিবর্তনে উদ্দীপিত হয় এবং প্রাণীকে পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ করে তুলে। (c) **অন্তঃগ্রাহক** (interoceptors): আন্তরযন্ত্রে এদের অবস্থান। আন্তরযন্ত্রীয় পরিবর্তনকে এরা গ্রহণ করে। (d) **দূরগ্রাহক** (telereceptors): চোখ, কান, নাক প্রভৃতি স্থানে এদের অবস্থান। অধিকতর দূরবর্তী আবহজগতের পরিবর্তনে এরা উদ্দীপিত হয় এবং এই পরিবর্তন সম্পর্কে প্রাণীকে ওয়াকীবহাল করে তুলে।

7. **অভৌতিক দেহ ও মন** (Apsychical body and Mind): শেরিংটন বেশ জোরের সংগে বলেন প্রাণীর দুটো সত্তা: (a) অভৌতিক দেহ,

পার্থিব ও মৌশনের মত, যা বহির্জগতের সংকেতের (signals) বিরুদ্ধে সঠিক প্রতিবর্তের মাধ্যমে সাড়া দেয় এবং (b) একটি মন, অন্যান্য কাজ ছাড়াও যা প্রাণীর আচরণের সংশোধন করে ও তাকে পরিচালনা করে।

8. **প্রতিবর্তীক্রিয়া স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে সহজতম পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া** (Reflex Action is the simplest complete reaction of nervous system) : শেরিংটনের মতে একটি প্রতিবর্তীক্রিয়া হল স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে সহজতম পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া। তাঁর মতে একটি প্রতিবর্তীক্রিয়া তখনই শুরু হয় যখন পরিবেশ উদ্দীপক হিসাবে কোন স্নায়ুর উপর কাজ করে। উদ্দীপিত স্নায়ু এই উদ্দীপনাকে সংযোগস্থাপনের মাধ্যমে অন্যান্য স্নায়ুতে সঞ্চালিত করে ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছে দেয়। এই পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল প্রাণীর কোন একটি অংশের সংগে অপর অংশের এমনভাবে সংযোগ ঘটানো যাতে বহির্জগতের উদ্দীপকের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

9. **সংকোচক ও প্রসারক প্রতিবর্ত** (Flexor and Extensor Reflexes) : অক্সফর্ডে 1917 সালে তিনি সংকোচক ও প্রসারক প্রতিবর্ত সমূহের ধর্মাবলী বিস্তৃতভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে অনুশীলন করেন।

10. **প্রতিবর্তীক্রিয়ার তুলনা** (Comparision of Reflexes) : 1919 সালে শেরিংটন প্রমাণ করেন যে বিড়াল, ব্যাঙ, বহিঃকর্ণ এবং চোয়াল প্রভৃতিতে প্রতিবর্তীক্রিয়া উৎপন্ন করা যায়। স্নায়ুসম্পর্কীয় প্রক্রিয়ার তুলনামূলক অনুশীলনের দিক থেকে এ জাতীয় মূল্যায়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ।

11. **টানপ্রতিবর্তের উপর অনুশীলন** (Study on stretch reflexes) : 1925 সালে শেরিংটন টান প্রতিবর্তের উপর নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। টান পড়লে পেশীতে সংকোচনের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এজাতীয় প্রতিবর্ত যে দেহভংগি ও দেহের ভারসাম্যের নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাও তিনি বিস্তারিতভাবে অনুশীলন করেন। এছাড়াও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে টান প্রতিবর্তে অবশ্যই একটি গ্রাহকস্থান, সংজ্ঞাবহ শাখা, কেন্দ্র ও চেষ্টীয় শাখা থাকবে।

12. **অংকশাখার ভূমিকা** (Role of ventral root) : সুষুম্নাকাণ্ডীয় প্রতিবর্তে অংকশাখা যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তা 1932 সালে শেরিংটন বিশেষভাবে অনুশীলন করেন।

13. **সুষুম্নাসর্বস্ব প্রাণী** (Spinal animal) : সুষুম্নাকাণ্ডের প্রতিবর্তীক্রিয়া বা কার্যাবলীকে অনুশীলন করার জন্য শেরিংটন ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ডকে মস্তিষ্ক থেকে আলাদা করেন। এধরণের প্রস্তুতিকে সুষুম্নাসর্বস্ব প্রাণী বলা হয়। এজাতীয় প্রাণীর উপর তিনি সুষুম্নাকাণ্ডের বিভিন্নধরণের কার্যাবলীর অনুশীলন করেন।

14. **ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী স্নায়ুপথ** (Ascending and descending tracts) : কেইনস কলেজ ও কেমব্রিজে থাকাকালীন শেরিংটন সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগকারী কিছু ঊর্ধ্বগ ও নিম্নগ স্নায়ুপথের অনুশীলন করেন।

15. **নিউরোন ও স্নায়ুসন্নিধি** (Neuron and synapse) : শেরিংটনই স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুকোষের সংযোগস্থল বোঝাতে নিউরোন ও সাইন্যাপ্‌স (স্নায়ু-সন্নিধি) এই দুটো শব্দের ব্যবহার করেন। এছাড়াও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে কিছু শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় সন্নিধিগত সঞ্চালন (synaptic trasmission) সংঘটিত হয়। এভাবে তিনি স্নায়ুসন্নিধির মধ্য দিয়ে স্নায়ু-প্রবাহের সঞ্চালনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

আরনেস্ট হেন্‌রি স্টার্লিং

Ernest Henry Starling

আরনেস্ট হেন্‌রি স্টার্লিং একজন ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। 1866 সালের 17ই এপ্রিল তিনি লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্যানটারবারির কিংস কলেজ স্কুলে পড়াশুনা করেন এবং 1882 সালে গাইস হাসপাতালে (Guy's hospital) ভর্তি হন। 1890 সালে এই হাসপাতাল থেকে স্নাতক হন এবং এম ডি. ডিগ্রিও লাভ করেন। একই বছরে তিনি গাইস হাসপাতালে শারীর-বৃত্তের লেকচারার নিযুক্ত হন। 1900 সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে শারীরবৃত্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সেখানেই তিনি তাঁর জীবনের দিনগুলো কাজের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন।

স্টার্লিং 1922 সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং রয়েল সোসাইটিতে গবেষক অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। **'সিক্রেটিন'** আবিষ্কারের জন্য তিনি 1902 সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্টার্লিং রয়েল আর্মি মেডিকেল কলেজে গবেষণা পরিচালক

বা রিসার্চ ডাইরেক্টর (research director) হিসাবে কাজ করেন। 1914 থেকে 1916 সাল পর্যন্ত তিনি এই কাজে নিযুক্ত থাকেন এবং বিষ গ্যাস বা পয়জন গ্যাসের (poison gas) বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার পদ্ধতি আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন। পরবর্তীকালে (1917-1929) স্টার্লিং রয়েল সোসাইটি ফন্ড কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি খাদ্য-মন্ত্রনালয়ের সংগে যুক্ত বিজ্ঞানবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

1927 সালে আরনেস্ট হেনরি স্টার্লিং মারা যান।

স্টার্লিং-এর বৈজ্ঞানিক অবদান

Scientific Contributions of Starling

স্টার্লিং তার সময়কার একজন স্বনামধন্য শারীরতত্ত্ববিদ ছিলেন। শারীরবৃত্তের সেইসব প্রক্রিয়াসমূহের প্রতি তাঁর সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ ছিল যেগুলোকে ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

স্টার্লিং শারীরবিজ্ঞানে যেসব অবদান রেখে গেছেন নিম্নে তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া গেল :

1. **ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলন** (Movement of small intestine) : বেইলিস ও স্টার্লিং (1899-1900) ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলনের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তাঁরা দেখতে পান ক্ষুদ্রান্ত্রে স্থানগতভাবে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে যে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ : উদ্দীপনা প্রয়োগের উপরে মসৃণ পেশী সংকুচিত হয়, কিন্তু নীচে শ্লথ হয়। তাঁরা এই পরিবর্তনকে 'অন্ত্রের সূত্র' (Law of intestine) নামে অভিহিত করেন, কারণ উদ্দীপনার বিন্দু থেকে সংকোচন-তরংগ এবং অগ্রবর্তী প্রতিরোধ (inhibition) অন্ত্র বরাবর নিম্নাভিমুখে স্বাভাবিক দিকে এগিয়ে যায়। বেইলিস ও স্টার্লিং-এর মত হল আন্ত্রিক ক্রমোসংকোচন অন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক তরংগের দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত। খাদ্যবস্তু উদ্দীপনা হিসাবে কাজ করে এবং উদ্দীপনার উপরে সংকোচন ও পরবর্তী অংশে প্রসারণ ঘটে। এর ফলে খাদ্যবস্তু স্বাভাবিক দিকে অগ্রসর হয়। নূতন স্থানে খাদ্যবস্তু একইভাবে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

2. **সিক্রেটিন ও অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণ পদ্ধতি** (Secretin and Mechanism of Pancreatic Secretion) : বেইলিস ও স্টার্লিং-এর দ্বারা সিক্রেটিনের (secretin) আবিষ্কারের (1902) একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, কারণ

তাঁরা এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেন যা সরাসরি রক্তে ক্ষরিত হয় এবং রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে দূরবর্তী অংগে গিয়ে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। স্টার্লিং রক্তে সরাসরি ক্ষরিত এজাতীয় পদার্থের নাম দেন **হরমোন**। তাঁরা আরও প্রমাণ করেন যে সিক্রেটিন অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ করে।

3. **পরিপাকের উপর স্নায়ুর প্রভাব** (Influence of nerve on digestion) : 1906 সালে স্টার্লিং দেখতে পান স্বতন্ত্র স্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে পরিপাকরসের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু স্বতন্ত্র স্নায়ুসমূহকে ব্যবচ্ছেদ করলে ক্ষরণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

4. **জালকস্থানে পরিস্রাবণ ও পুনর্বিশোষণ—স্টার্লিং প্রকল্প** (Capillary filtration and reabsorption Starling hypothesis) : জালকস্থানে কিভাবে পরিস্রাবণ ও পুনর্বিশোষণ সংঘটিত হয় স্টার্লিং 1906 সালে সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি দেখতে পান রক্তনালীর আভ্যন্তরীণ জলচাপ ও অভিস্রবণ চাপ জালকস্থানে পরিস্রাবণ ও পুনর্বিশোষণের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে।

৫. **হার্দ ফুসফুসীয় প্রস্তুতি** (Heart lung preparation) : স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয় একথা আগে থেকেই জানা ছিল। কিন্তু হৃৎপিণ্ডকে স্বস্থানে রেখে তার বিশ্লেষণ সম্ভব ছিল না। স্টার্লিং 1910 ও 1912 সালে এই অবস্থার মোকাবিলায় হার্দ ফুসফুসীয় প্রস্তুতির ব্যবস্থা করেন এবং এভাবে বিড়াল ও কুকুরের হৃৎপিণ্ডের উপর বিভিন্ন অবস্থায় কি কি পরিবর্তন সাধিত হয় তার অনুশীলন করেন। প্রান্তীয় বাধার বৃদ্ধি, শিরা রক্তচাপ, রক্তপূর্তির হার, তাপমাত্রা প্রভৃতির পরিবর্তনে হৃৎপিণ্ডের কি ধরণের পরিবর্তন আসে তা তিনি বিশেষভাবে অনুশীলন করেন।

6. **হৃৎপিণ্ডের স্টার্লিং সূত্র** (Starling's law of heart) : হার্দ উৎপাদ পেশীসংকোচনের বলের সংগে সমানুপাতিক; অর্থাৎ নিলয় পেশীর সংকোচন বল বৃদ্ধি পেলে হার্দ উৎপাদও বৃদ্ধি পায়। স্টার্লিং-এর মতে 'সংকোচন বল বা সংকোচনের শক্তি হৃৎপেশীর প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক'। এই সম্পর্ককে **হৃৎপিণ্ডের স্টার্লিং সূত্র** বলা হয়। এই সূত্র **ফ্র্যাংক স্টার্লিং সূত্র** (Frank-Starling law) নামেও পরিচিত।

হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে নিলয়পেশীর প্রাথমিক দৈর্ঘ্য, তাঁর প্রসারণ শেষের রক্ত পরিমাণের (end diastolic volume) সংগে সমানুপাতিক, অর্থাৎ প্রসারণের

সময় নিলয়ে রক্তের পূর্তি বেশী হলে হৃৎপেশীর প্রাথমিক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। নিলয়ের প্রসারণ-বিরতি (diastolic pause) বৃদ্ধি পেলেও রক্তের পূর্তি বৃদ্ধি পায় এবং হৃৎপেশীর প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটায়।

7. **হার্দ উৎপাদের স্টার্লিং সূত্র** (Starling law of cardiac output) : 1918 সালে স্টার্লিং হার্দ উৎপাদের সংগে হৃৎপেশীর প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের যে সম্পর্কের উল্লেখ করেন তাকে **হার্দ উৎপাদের স্টার্লিং সূত্র** নামে অভিহিত করা হয়। এই সূত্রের বক্তব্য হল, 'শারীরবৃত্তীয় সীমার মধ্যে প্রাথমিক দৈর্ঘ্য অধিকতর বৃদ্ধি পেলে সংকোচন বলও অধিকতর শক্তিশালী হবে'। প্রাথমিক দৈর্ঘ্য রক্তপূর্তির হারের সংগে সমানুপাতিক। রক্তপূর্তি আবার শিরারক্তের প্রত্যাবর্তনের (venous return) উপর নির্ভরশীল।

8. **অন্তরিত কিড্‌নি** (Isolated Kidney) : 1920 সালে স্টার্লিং সূক্ষ্ম পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীর কিড্‌নি বা বৃক্ককে সাফল্যের সংগে এমনভাবে অন্তরিত বা আলাদা করতে সমর্থ হন যেখানে দেহের সব রকম প্রক্রিয়ার সংগে তার সম্পর্ক বজায় থাকে। এভাবে কিড্‌নি বা বৃক্কের যাবতীয় ক্ষরণক্রিয়া সম্বন্ধে নূতন ও সঠিক তথ্যসংগ্রহ সম্ভব হয়।

ইভান পেট্রোভিচ প্যাভলোভ

Ivan Petrovich Pavlov

1849 সালে ইভান পেট্রোভিচ প্যাভলোভ মস্কো থেকে প্রায় 150 মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত রিয়াজান (Ryazan) নামক রাশিয়ার একটি ক্ষুদ্র শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন কৃষককুলের গির্জার একজন গরীব যাজক এবং প্যাভলোভ ছিলেন তাঁর বড় ছেলে। এগার বৎসর বয়সে তিনি রিয়াজান ইক্লসিয়াস্টিক্যাল হাইস্কুলে (Ryazan Ecclesiastical High School) পড়াশুনা শুরু করেন এবং সেখান থেকে একটি স্থানীয় চার্চস্কুলে ভর্তি হন। রাশিয়ার এসব শিক্ষায়তনগুলো তখনকার দিনে বিভিন্নপ্রকার বৈপ্লবিক চিন্তা-ভাবনার প্রাথমিক ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করত। 1860 সালে জার দ্বিতীয় আলেক-

জাতারের তুলনামূলক উদারপন্থী রাজত্বে বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রেরা বর্তমানে প্রগতিশীল ম্যাগাজিন বলতে যা বোঝায় তা পড়াশুনার সুযোগ পেত। এসব বইতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা সর্বশেষ উন্নত চিন্তাভাবনার প্রবণতা (intellectual trend) প্রভৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগ ছিল। 1860 সালের এজাতীয় রচনা প্যাভলোভের উপর গভীর রেখাপাত করে। বিশেষত পিসারেভের (Pisarev) রচনা। প্যাভলোভ পিসারেভের রচনা থেকেই প্রথম ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ (theory of evolution) সম্বন্ধে অবহিত হন এবং এই ধারণা পোষণ করেন যে তিনিও বৈজ্ঞানিক হলে খুসী হবেন।

রিয়াজানের শিক্ষায়তন ছেড়ে 1870 সালে প্যাভলোভ সেণ্ট পিটারসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে উঠে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে শারীরবিজ্ঞান নিয়েই তিনি পড়াশুনা চালিয়ে যাবেন। 1875 সালে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শেষ হয়।

2-6 নং চিত্র : ইভান পেট্রোভিচ প্যাভলোভ।

প্যাভলোভ সেবছরই মেডিকো-সারজিক্যাল অ্যাকাডেমিতে মেডিসিনে ভর্তি হন এবং 1879 সালে তার স্নাতক হন। এরই মধ্যে তিনি একজন গবেষক হিসাবে

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন, ফলে অ্যাকাডেমির মেডিকেল ক্লিনিকের ডাইরেক্টর প্রফেসর বটকিন (Botkin) প্রাণীর উপর পরীক্ষার জন্য তাঁর নিজের নূতন প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটরীর দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপর অর্পণ করেন। 1879-তে তিনি এম. ডি.-তে ভর্তি হন এবং 1883 সালে এম. ডি. ডিগ্রিলাভ করেন। সেবছরই তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন, প্রফেসর হিসাবে স্বীকৃতি পান এবং স্কলারশিপ নিয়ে জার্মানী ঘুরে আসেন। 1886 থেকে 1890 সালে সেণ্ট পিটারবার্গে একটি গবেষণামূলক ল্যাবরেটরী ও মেডিক্যাল ক্লিনিক স্থাপন করেন। এরপর সেণ্টপিটারবার্গে পরীক্ষামূলক মেডিসিনে যে নূতন ইন্‌ষ্টিটুট স্থাপিত হয় তিনি তার ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন।

প্যাভলোভের জীবনের পরবর্তী অধ্যায় শুধু তার গবেষণা, পরীক্ষা এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মতবাদে ভরা। এর প্রথম অধ্যায় বিশুদ্ধ শারীরবৃত্তীয়, শতাব্দীর শেষ অবধি তা স্থায়ী ছিল। প্যাভলোভ এই সময়ের মধ্যে যেসব কাজ সম্পূর্ণ করেন তার উপর ভিত্তি করেই তাঁকে নোবেল পুরস্কার (1904) দেওয়া হয়। তিনিই প্রথম রুশীয় যাকে এই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। পুরস্কারের বিষয় ছিল, পরিপাক শারীরবৃত্তের কাজের উপর স্বীকৃতি যা আমাদের জ্ঞানকে সুপ্রসারিত করে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরই তিনি তাঁর প্রধান অবদান **সাপেক্ষ প্রতিবর্তের** (conditioned reflexes) উপর কাজ শুরু করেন। তাঁর আগে তিনি রক্তসংবহন ও পরিপাক গ্রন্থির উপর কাজ করার সময় যেসব পরীক্ষাপদ্ধতির ব্যবহার করেন সাপেক্ষ প্রতিবর্তই অনুশীলনে তা বিশেষ সহায়ক হয়। সাপেক্ষ প্রতিবর্তের অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি মস্তিষ্কের সক্রিয়তা, মন ও আচরণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের উল্লেখ করেন। মন ও আচরণ নিয়ে তাঁর এই বস্তুবাদী ধারণা বলশেভিকদের কাছে এক সহজাত ব্যাপার হিসাবে তখন গণ্য হত। বলশেভিকরা রাশিয়ার ক্ষমতায় আসে 1918 সালে। রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়ায় তখনও অশান্ত অবস্থা চলছে, কিন্তু নূতন রুশ কর্তৃপক্ষ প্যাভলোভ ও তার ল্যাবরেটরীর নানা রকম সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন। 1921 সালে লেনিনের সইকরা নির্দেশ নামায় বলা হয় প্যাভলোভ এবং তাঁর সহকারীদের বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের নিরাপত্তার প্রয়োজনে যতদূর সম্ভব অনুকূল পরিবেশ যেন সৃষ্টি করা হয়।

ইভান পেট্রোভিচ প্যাভলোভ 1936 সালে 87 বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্যাভলোভের বৈজ্ঞানিক অবদান
Scientific Contributions of Pavlov

প্যাভলোভের বৈজ্ঞানিক অবদান সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হল :

1. **রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুসংযোগ** (Blood Pressure and Innervation of Heart) : প্যাভলোভ 1876 সাল থেকে 1888 সাল পর্যন্ত রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুসংযোগের উপর পর্যায়ক্রমে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। অবশ্য তাঁর এই সময়ের কাজ তাঁর পরবর্তী জীবনের কাজের মত শারীরবিজ্ঞানে তেমন স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে পারেনি।

প্যাভলোভ কুকুরকে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে ধমনীকে প্রেসার গজের সংগে সংযুক্ত করে রক্তচাপ নির্ণয়ের পদ্ধতি বের করেন। এই রক্তচাপ নির্ণয়ের সময় কুকুরটি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চল অবস্থায় টেবিলে শুয়ে থাকত। এই অবস্থায় রক্তের পরিমাণ নানাভাবে পরিবর্তন করিয়ে তিনি দেখিয়েছেন রক্তচাপ অপরিবর্তিত থাকে। এছাড়া হৃৎপিণ্ডকে সরবরাহকারী স্নায়ুও তিনি সনাক্ত করেন।

1. **পরিপাক গ্রন্থির কাজ** (The work of Digestive glands) : প্যাভলোভ 1880 সাল থেকে 1900 সাল পর্যন্ত পরিপাক গ্রন্থির উপর নানা প্রকার পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। কুকুরের উপর বিশদভাবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রাণীটিকে তাঁর পরীক্ষার উপযোগী করে তুলতেন। বিভিন্নপ্রকার খাদ্যবস্তুর প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে (মুখ, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি) যেসব পরিপাক রসের ক্ষরণ ঘটে, কি প্রক্রিয়ায় তা সংঘটিত হয় তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁর অনুরাগ সবচেয়ে বেশী ছিল। একটানা বছর দশেক পরিপাক গ্রন্থির উপর কাজ করার সময় তাঁর কাছে যেসব সমস্যা এসেছে তা নিয়ে তিনি 1897 সালে একটি বই প্রণয়ন করেন যার নাম পরিপাক-গ্রন্থির কাজ (The work of the Digestive gland)। এই বইতে পরিপাকতন্ত্রকে তিনি একটি রাসায়নিক ফ্যাক্টরীর সংগে তুলনা করেন যেখানে কাঁচামাল (খাদ্য) রাসায়নিক পদ্ধতিতে ভেংগে এমন এক অবস্থায় পৌঁছয় যা দেহতরলে বিশোষিত হতে পারে ও দেহের জৈবনিক প্রক্রিয়াসমূহকে বজায় রাখে। এই ফ্যাক্টরী কতকগুলো কামরা নিয়ে গঠিত যার প্রতিটিতে কোন খাদ্য তার ধর্ম অনুসারে কিছুক্ষণ থাকত নয়ত সংগে সংগে পরবর্তী কামরায় প্রেরিত হত। প্রতিটি কামরায় আবার যথোপযুক্ত বিকারকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত।

বিকারকগুলো পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওয়ার্কসপে তৈরী হত। যে ওয়ার্কসপগুলো ল্যাবরেটরীর প্রাচীরগাত্রে নিহিত থাকত অথবা দূরবর্তী কোন অংগে তৈরী হত এবং নলের দ্বারা অন্যান্য বড় রাসায়নিক ফ্যাক্টরীর মত প্রধান ওয়ার্কসপের সংগে যুক্ত হত।

3. **প্যাভলোভ পাকস্থলী ফিস্টুলা** (Pavlov Gastric Fistula): পাকস্থলীর পরিপাকের সময় জারকরসের সংগ্রহের জন্য প্যাভলোভ অস্ত্রোপচার করে পাকস্থলীতে ফিস্টুলা তৈরী করেন। একটি ধাতব সরু নলকে উদর ও পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রবেশ করান হয় এবং সেলাই করে বেঁধে দেওয়া হয়। একে ফিস্টুলা বলা হয়। ঘা শুকিয়ে যাবার পর পরীক্ষার সময় পাকস্থলীর পদার্থকে এই ফিস্টুলার সাহায্যে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এই ফিস্টুলা স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ায় কোন বাধার সৃষ্টি করে না এবং প্রাণী বহু বছর বেঁচে থাকতে পারে। তবে এর দ্বারা বিশুদ্ধ পাকস্থলীরসকে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না, কারণ লালা ও মুখের খাদ্য তাতে মিশে যেত।

4. **নকল ভোজন** (Sham Feeding): পাকস্থলী ফিস্টুলার অসুবিধা দূর করার জন্য প্যাভলোভ অতিরিক্ত অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে গ্রাসনালীকে বিভক্ত করে তার দুটো প্রান্তকে বাইরে ত্বকের সংগে বেঁধে দেন। এজাতীয় অস্ত্রোপচারের পর প্রাণী ক্ষুধানিবৃত্তি না হওয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেতে পারত, কারণ খাওয়ার পরই তার খাদ্য বাইরে বেরিয়ে আসত, পাকস্থলীতে পৌঁছাত না (2-1 নং চিত্র ও 6-21 নং চিত্র)। এজন্য এজাতীয় খাদ্যগ্রহণকে **নকল ভোজন** (Sham Feeding) বলা হয়। কর্তিত গ্রাসনালীর প্রান্তে একটি টিউব প্রবেশ করিয়ে তার মাধ্যমে তরল খাদ্য পাকস্থলীতে পাঠিয়ে এজাতীয় প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। সরাসরি ক্যানুনার মাধ্যমে খাদ্যকে পাকস্থলীতে পাঠাবার ব্যবস্থাও করা হত।

একই প্রাণীতে এজাতীয় যৌথ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মুখগহ্বর, গলবিল ও পাকস্থলী গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন প্রতিবর্তসমূহকে অনুশীলন করা সম্ভবপর হয়।

5. **প্যাভলোভ পাউচ** (Pavlov Pouch): পাকস্থলীতে প্রবেশ করার পর খাদ্য পাচকগ্রন্থির উপর কি ধরণের প্রভাব ফেলে তা পাকস্থলী ফিস্টুলা ও নকল ভোজন প্রণালীতে অনুশীলন করা সম্ভব ছিল না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করে পাকস্থলীর একটি অংশকে আলাদা করে ও সেলাই করে ক্ষুদে পাকস্থলী বা পাউচ (থলি) প্রস্তুত করা হত।

এভাবে একই প্রাণীতে দুটো পাকস্থলী তৈরী হত : একটি বড় ও স্বাভাবিক (যদিও অস্ত্রোপচারে কিছুটা ছোট), যার মধ্যে স্বাভাবিক পরিপাক সম্পন্ন হয়। অপরটি ছোট, যাতে কোন খাদ্য প্রবেশ করে না। হেইডেনহাইন (Heidenhain) 1879 সালে এ ধরণের একটি পাউচ বা থলি তৈরী করেন। কিন্তু এর একটি ত্রুটি ছিল খাদ্যগ্রহণের 30 থেকে 50 মিনিট পরে পাকস্থলীর ক্ষরণ শুরু হত। অথচ গ্রাসনালীকর্তিত পাকস্থলী ফিস্টুলার ক্ষেত্রে (যার স্নায়ুসংযোগ স্বাভাবিক ছিল) নকল ভোজনের 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যেই ক্ষরণ হত।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য প্যাভলোভ তার নিজস্ব অস্ত্রোপচার পদ্ধতিতে যে পাউচ বা থলি প্রস্তুত করেন তাতে স্বাভাবিক স্নায়ুসংযোগ সুরক্ষিত হত।
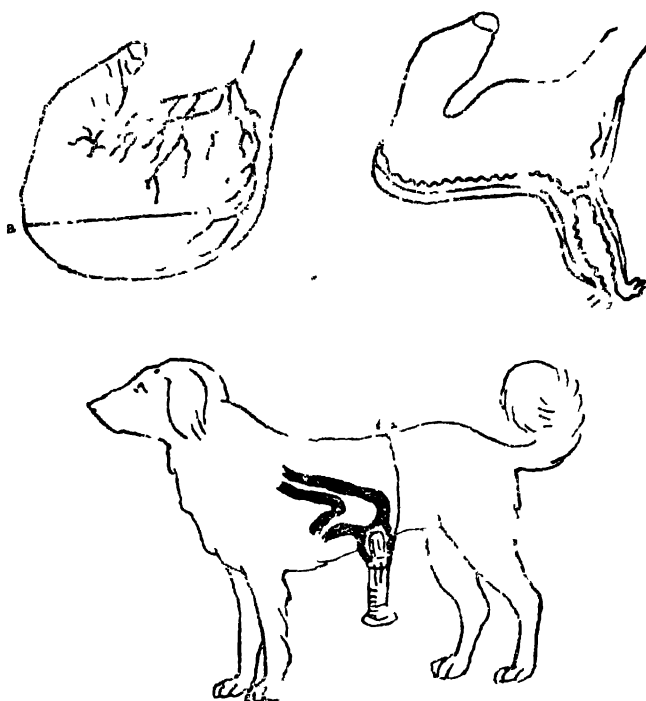
2-7 নং চিত্র : অস্ত্রোপচারের দ্বারা প্যাভলোভ পাউচ তৈরী করার পদ্ধতি। নীচে প্যাভলোভ পাউচসমেত একটি কুকুর।

ফলে এই পাউচের ক্ষরণ পাকস্থলীর বৃহদংশের ক্ষরণের মতই ছিল স্বাভাবিক। পাকস্থলীর ফানডাসের একটি ফালিকে এমনভাবে চেরা হত (2-7 নং চিত্রে a-b)

যাতে শুধু তার শ্লেষ্মাস্তর সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত হয়। কিন্তু তার সেরাস ও পেশীস্তর অবিভক্ত অবস্থায় থাকে। শ্লেষ্মাস্তরের উভয় পাশে সেলাই করে থলি তৈরী করা হত, যার মুখ সেলাই করে ত্বকের সংগে বেঁধে দেওয়া হত। ফলে আসল পাকস্থলীর সংগে তার স্বাভাবিক সংযোগ রক্ষিত হত। আসল পাকস্থলী ও পাউচের সেরাস ও পেশীস্তরকে আলাদা ভাবে বেঁধে সেলাই করে দেওয়া হত। অক্ষত সেরাস ও পেশীস্তর এই দুটো পাকস্থলীর মধ্যে সেতু রচনা করে এবং পাউচ বা ক্ষুদে পাকস্থলীতে স্নায়ুসরবরাহ বজায় রাখে।

প্যাভলোভ পাউচের ক্ষরণ আসল পাকস্থলীর ক্ষরণের মত হয় এবং খাদ্য যেহেতু পাউচে প্রবেশ করতে পারে না সেহেতু বিশুদ্ধ পাচকরস সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়।

6. **সাইকিক ক্ষরণ** (Psychic secretion) : প্যাভলোভ দেখতে পেলেন খাদ্য পাকস্থলীতে পৌঁছবার পূর্বেই পাকস্থলী ও অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণ শুরু হয় এবং খাদ্য মুখে নিলেই এজাতীয় ক্ষরণের সূত্রপাত হয়। প্যাভলোভ একে **সাইকিক ক্ষরণ** নামে অভিহিত করেন। প্যাভলোভ দেখালেন এজাতীয় ক্ষরণ স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পরিপাকের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ ক্ষুধাকাঙ্ক্ষা উদ্রেককারী রস (appetite juice) হিসাবে ইহা কাজ করে।

1902 সালে বেইলিস ও স্টার্লিংএর দ্বারা সিক্রেটিন (secretin) আবিষ্কারের পর দাবী করা হল অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণ সিক্রেটিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নয়। 1906 সালে বেইলিস ও স্টার্লিং অগ্ন্যাশয়ের স্নায়ুগত নিয়ন্ত্রণের কথা সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দিলেন। প্যাভলোভও নাছোড়বান্দা। তিনি 1912 সালে অ্যানরেপ (Anrep) নামক তাঁর এক ছাত্রকে বেইলিস ও স্টার্লিংএর ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ করেন ; তিনি তাঁদের সামনে ভেগাস নার্ভে উদ্দীপনা প্রয়োগ করে অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণ যে বৃদ্ধি পায় তা প্রদর্শন করেন। এভাবে উভয়ের কাজে পরস্পর বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে আসে ও 'স্নায়ুঅন্তঃক্ষরণ' (neuroendocrine) ধারণার সৃষ্টি হয়। তবে স্নায়ুগত ও হরমোনগত মতবাদ নিয়ে বাদানুবাদ এর পরও প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে টিকে থাকে।

7. **এন্টারোকাইনেজ** (Enterokinase) : 1899 সালে প্যাভলোভ এন্টারোকাইনেজের আবিষ্কার করেন।

8. **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (Conditioned Reflexes):** প্যাভলোভের প্রধান কাজ সাপেক্ষ প্রতিবর্তের উপর। 1898 সাল থেকে 1935 সাল পর্যন্ত *এই দীর্ঘসময় তিনি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন।* 1903 সালে তিনিই প্রথম 'কনডিশনড রিফ্লেক্স' বা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত কথাটির ব্যবহার করেন।

প্যাভলোভ প্রতিবর্তকে দুভাগে ভাগ করেন: (a) **অনপেক্ষ প্রতিবর্ত** (unconditioned reflex) যা সহজাত এবং (b) **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** (conditioned reflex) যা অর্জন করতে হয়। অনপেক্ষ উদ্দীপনার ভিত্তিতে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত গড়ে উঠে। প্যাভলোভ সাপেক্ষ প্রতিবর্তের বিভিন্ন ধর্ম ও শিক্ষাদীক্ষা, আচরণ ও স্মৃতি গড়ে উঠা প্রভৃতির সংগে তার সম্পর্কের উল্লেখ করেন। এভাবে সাপেক্ষ প্রতিবর্তের সংগে গুরুমস্তিষ্কের সম্পর্কেরও তিনি উল্লেখ করেন।

তিন

মানবতন্ত্রের একক

UNITS OF HUMAN SYSTEMS
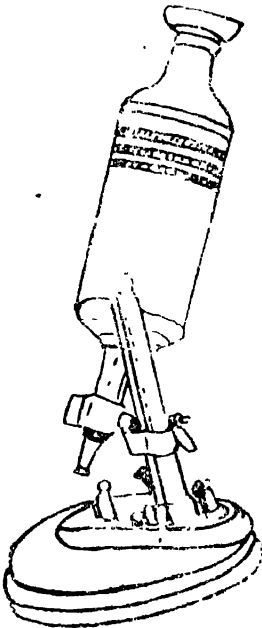
উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ কোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রাণী শুধুমাত্র একটি কোষের দ্বারা গঠিত হলে, তাকে **এককোষী** প্রাণী (যেমন, অ্যামিবা) এবং অসংখ্য কোষের দ্বারা গঠিত হলে তাকে **বহুকোষী** প্রাণী বলা হয়। মানুষ একটি বহুকোষী প্রাণী। বহুকোষী প্রাণীর কোষের আকৃতি এবং গঠন ভিন্নতর হয়, কারণ এক্ষেত্রে তারা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। তবে আকৃতি, প্রকৃতি ও গঠনে প্রভূত পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে এমন কিছু পদার্থ থাকে যা সাধারণভাবে সব কোষেই দেখা যায়।

1665 সালে **রবার্ট হুক** (Robert Hook) কোষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করেন। তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 'কর্কে'

মৌচাকের মত যেসব ক্ষুদ্র কক্ষ দেখতে পান, তাদের নাম দেন **সেল** (ল্যাটিন, cella = ক্ষুদ্র কক্ষ) বা **কোষ**। প্রথম দিকের ধারণা ছিল, কোষে একটি মাত্র উপাদানই থাকে, তা হল **কোষঝিল্লি**। **রবার্ট ব্রাউন** (Robert Brown) অবশ্য 1831 সালে কোষের অভ্যন্তরে একটি বিশেষ বস্তুর সাক্ষাৎ পান ; তিনি এর নাম দেন **নিউক্লিয়াস**। এরও কিছু পরে 1835 সালে **দ্যুজারডিন** (Dujardin) কোষের অভ্যন্তরস্থ জেলিসদৃশ পদার্থের নামকরণ করেন **স্যারকোড** (sarcode)। 1840 সালে **পারকিনজি** (Purkinje) স্যারকোডের স্থলে **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) কথাটি ব্যবহার করেন। এভাবে কোষের অভ্যন্তরের বিভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের সংগে সংগে তা আরও প্রসারিত হয় এবং কোষের বিভিন্ন অংগসংস্থান ও তাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা সম্ভবপর হয়। যেসব কোষসমষ্টির কার্যাবলী এক তাদের **কলা** বলা হয়।

নিউক্লিয়াসযুক্ত ও নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ
Nucleated & Non-Nucleated Cells

কোষকে প্রাণীদেহের গঠন ও জৈবিক কার্যের একক বলা হয়। কোষ সাধারণত দুধরনের হয় ; (a) **প্রোকারীওট** (Prokaryotes) বা **নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ** এবং (b) **ইউকারীওট** (eukaryotes) বা নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং কোন কোন শৈবালজাতীয় কোষে নির্দিষ্ট কোন নিউক্লিয়াস থাকে না। এদের তাই **নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ** বলা হয়। এদের ছাড়া অন্যান্য প্রাণীকোষের সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে। তাদের তাই **নিউক্লিয়াসযুক্ত** কোষ বলা হয়। প্রথম শ্রেণীর কোষে নিউক্লিয়াস-পদার্থ কোষের সাইটোপ্লাজমে ছড়ান থাকে। DNA তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম তন্তুজাল (network) রচনা করে দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে। এদের **ক্রোমাটিন বডি** (chromatin bodies) বা **জেনোফোর** (genophore) বলা হয়। RNA দ্রবীভূত হয়ে সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে থাকে।

নিউক্লিয়াসবিহীন কোষের কোষঝিল্লিতে খাঁজ থাকে। খাঁজের ভেতরে কোষ-প্রাচীর অনুপ্রবেশ করে কখনও কখনও বিভাজক প্রাচীর বা **সেপটাম** (septum) সৃষ্টি করে। সেপটামের প্রান্তদেশে কখনও সুসংবদ্ধ প্রক্ষেপ দেখা যায়, যাদের **মেসোসোম** (mesosome) বলা হয়। মেসোসোমে প্রায়ই ক্রোমাটিড বডি এটে

থাকতে দেখা যায়। তাছাড়া কোষঝিল্লির কোন এক প্রান্ত অধিকতর পুরু হয়ে মেরুঝিল্লি বা পোলার মেমব্রেন (polar membrane) গঠন করে।
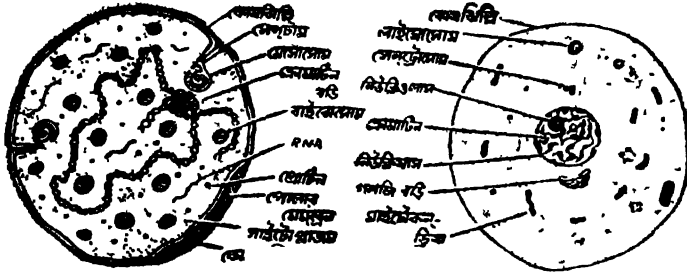
3-2নং চিত্র : (a) নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ, (b) নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ।

সাইটোপ্লাজমে 100--250Å ব্যাসসম্পন্ন দানাদার পদার্থের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এদের অধিকাংশই **রাইবোসোম**।

1. **কোষের আকৃতি** (Shape of the Cell) **:** নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ সাধারণভাবে গোলাকার হয়। তবে মানুষের দেহে এমন অসংখ্য কোষ রয়েছে যারা গোলাকার নয়। তাদের কোনটি ডিম্বাকার, কোনটি ঘনতলীয়, স্তম্ভাকার, কেশাকার, চেপ্টা, দুমুখ-সূঁচাল, বহুতলীয় বা দীর্ঘ কৈশ প্রক্ষেপ-সম্পন্ন। আবরণী কোষ, পেশীকোষ, স্নায়ুকোষ, রক্তকণিকা, শুক্রাণু, আগ্রাসক কোষ ইত্যাদি এর উদাহরণ।

কোষের আকৃতি প্রধানত তার জৈবিক ক্রিয়ার সংগে সংগতিপূর্ণ। এছাড়া ইহা অংশত প্রোটোপ্লাজমের পৃষ্ঠটান ও সান্দ্রতার উপর নির্ভরশীল

2. **কোষের আয়তন** (Size of the Cell) **:** কিছুসংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষ (যেমন, পাখীর ডিম) ছাড়া কোন প্রকার কোষকেই খালি চোখে দেখা যায় না। অধিকাংশ কোষই সাধারণত 0·5—20μ ব্যাসসম্পন্ন। ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াতে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কোষের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় (1নং তালিকা)। মানুষের লোহিতকণিকার ব্যাস 7—8μ। মানুষের ডিম্বাণুর ব্যাস 100μ। 100μ ব্যাসসম্পন্ন মেগাকারীওসাইটও যেমন অস্থিমজ্জায় পাওয়া যায়, তেমনি সুষুম্নাকাণ্ডের সম্মুখ স্নায়ুশৃংগে 135μ ব্যাসসম্পন্ন স্নায়ুকোষের সাক্ষাৎও পাওয়া যায়। রক্তের অণুচক্রিকার ব্যাস 2—4μ। দীর্ঘ স্নায়ুকোষের আয়তন প্রাণীজগতে বাস্তবিকই বিস্ময়ের বস্তু।

1নং তালিকা ঃ কোষ ও কোষের আয়তন।

কোষ	আয়তন	কোষ	আয়তন
ভাইরাস	0·05—0·5μ	অস্থিপেশী (প্রস্থচ্ছেদ)	10—108μ
ব্যাক্‌টেরিয়া	0·1—10μ	ইওসিনোফিল	10—14μ
অণুচক্রিকা	2—4μ	মেগাকারীওসাইট	30—100μ
শুক্রাণুর মস্তক	2.5—3·5μ	বেজকোষ	100μ
লোহিতকণিকা	7—8μ	ডিম্বাণু	100μ
লিম্ফোসাইট	6—10μ	সম্মুখস্নায়ুশৃংগীয়	135μ
নিউট্রোফিল	9—12μ	স্নায়ুকোষ	(9—135μ)
হৃৎপেশী (প্রস্থচ্ছেদ)	9—20μ		

একটি আদর্শকোষের গঠন ও কার্য
Structure and Function of a ideal Cell

কোষের আকার, আয়তন ও গঠনের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে এমন কতকগুলো জিনিষ রয়েছে যা সব কোষেই দেখা যায়। নিচে এদের বিবরণ ও কার্যাবলী আলোচনা করা হল (3-4 নং চিত্র)।

1. **কোষঝিল্লি** (Cell membrane) ঃ লোহিতকণিকা ও স্নায়ুতন্তুর শ্বোয়ান কোষের উপর অনুশীলন চালিয়ে কোষঝিল্লির গঠন সম্পর্কে প্রায় যাবতীয় তথ্য পাওয়া গেছে। মানুষের লোহিতকণিকাকে লঘুসারক দ্রবণে বা জলে ডুবালে, তারা ফুলে ওঠে ও ফেটে যায়। হিমোগ্লোবিন কোষ থেকে নির্গত হয়। এভাবে বিশুদ্ধ কোষঝিল্লিকে পাওয়া যায়। এই কোষঝিল্লির রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, এর উপাদানের মধ্যে 35% লিপিড (লিসিথিন, কেফালিন ও কোলেস্টারল), 60% প্রোটিন এবং সামান্য পরিমাণ কার্বহাইড্রেট রয়েছে। লোহিতকণিকার উপরিতলের ক্ষেত্রফলের পরিমাপ করে এবং বিশ্লেষণ থেকে যে পরিমাণ লিপিড বা ফস্‌ফোলিপিড পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সম্পর্কস্থাপন করে দেখা যায়, ফস্‌ফোলিপিড কোষঝিল্লির

উপর দুটো আবরণ সৃষ্টি করতে পারে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, কোষঝিল্লিতে দুটো ফসফোলিপিডের স্তর রয়েছে। এছাড়া ওসমিয়াম টেট্রাক্লোরাইড বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করে এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করে ফসফোলিপিডের দ্বিস্তরের উভয়পাশে দুটো প্রোটিনস্তরের অস্তিত্ব ধরা গেছে। 1935 সালে **ডেনিয়েলি ও ডেভসোন** (Denielli, Davson) কোষঝিল্লির মডেলের যে প্রস্তাব করেছিলেন, তাতে তারা বলেছিলেন কোষঝিল্লি দুটো প্রোটিনস্তরের অন্তর্বর্তী ফসফোলিপিডের দুটো স্তরকে নিয়ে গঠিত। তাদের মডেল প্রধানত কোষঝিল্লির ভেদ্যতাধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপরের পরীক্ষা ছাড়াও কোষঝিল্লির গভীরতা, ও অসম আলোবিক্ষেপ, (birefringence), এক্স-রে বিচ্ছুরণ (x-ray diffraction), পৃষ্ঠটান প্রভৃতির পরিমাপ করে, এই মডেলের সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেছে। 1959 সালে **রবার্টসোন** (Robertson) একেই **একক ঝিল্লি** (unit membrance) নামে অভিহিত করেন।

এসব পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও মডেল থেকে কোষঝিল্লির ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ-যন্ত্রীয় যে গঠন পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ (3-3 নং চিত্র) :

(1) কোষঝিল্লি একটি এককঝিল্লি এবং ইহা তিনটি স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ স্তর দুটোর উভয়েই 20Å পুরু। অন্তর্বর্তী স্তরটির গভীরতা 35Å। সমগ্র কোষঝিল্লি তাই 75Å পুরু (3-3 নং চিত্র)।

৩-3নং চিত্র : A—ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা কোষঝিল্লি : B—ডেভসোন ডানিয়েলি মডেল।
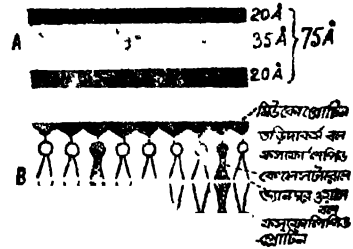
(2) বহিঃস্থ 20Å গভীর স্তরটি মিউকোপ্রোটিনে গঠিত। প্রোটিন ছাড়াও এই স্তরে একটি পলিস্যাকারাইড বা যৌগ শর্করা রয়েছে (Bell) যা ঝিল্লির লিপিড-প্রোটিন কমপ্লেক্সকে স্থিতিশীল করে রাখে।

(3) অন্তঃস্থ 20Å পুরু স্তরটি শুধুমাত্র প্রোটিনে গঠিত। এই দুটো স্তরের প্রোটিনে যেসব অ্যামাইনোঅ্যাসিড পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রধান : আরজিনিন ও লাইসিন। এছাড়া কম পরিমাণে হিস্টিডিন, টাইরোসিন, মিথিওনিন এবং খুব সামান্য পরিমাণে সিস্টাইন রয়েছে। একই প্রকার কোষে অ্যামাইনো-

অ্যাসিড একই হয়, তবে ভিন্নতর কোষে ভিন্ন হতে পারে। আবার যেসব কোষের বিপাকক্রিয়া কম, তাদের ঝিল্লিতে প্রোটিনের পরিমাণও কম দেখা যায় (যেমন, মায়েলিন ঝিল্লি, 20%) এবং যেসব কোষের বিপাকক্রিয়া বেশী, তাদের ঝিল্লিতে প্রোটিনও বেশী থাকে (যেমন, মাইটোকনড্রিয় ঝিল্লি, 65%)।

(4) এই উভয়স্তরের অন্তর্বর্তী স্তর ফসফোলিপিড অণুর দুটো স্তরে গঠিত। ফসফোলিপিড অণু (লিসিথিন, কেফালিন ও কোলেস্টারল) সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে। তাদের অজলাসক্ত প্রান্তে (hydrophobic end) ফ্যাটি অ্যাসিড এবং জলাসক্ত প্রান্তে (hydrophilic end) ফসফেট গ্রুপ থাকে। এভাবে অজলাসক্ত আধানহীনপ্রান্ত (non-polar end) পাশাপাশি অবস্থান করে এবং জলাসক্ত আধানযুক্ত প্রান্ত একপাশে মিউকোপ্রোটিন এবং অন্যপাশে প্রোটিনস্তরের সংগে যুক্ত থাকে। প্রোটিন ও ফসফোলিপিড সম্ভবত হাইড্রোজেন যোজক, আয়নযোজক বা তড়িদাকর্ষ বলের (electroscopic force) দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ফসফোলিপিডের সংলগ্ন আধানহীন প্রান্তদ্বয় সম্ভবত ভ্যান্ডার ওয়াল বলের (Van der Waal's force) দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

উপরে বর্ণিত গঠনবিশেষত্ব ছাড়াও কোন কোন কোষঝিল্লিতে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে আরো কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে প্রধান : (1) মাইক্রোভিলাস : এরা 0·6μ-0·8μ দীর্ঘ ও প্রায় 100μ ব্যাসসম্পন্ন হয়। অধিকতর ঘন সাইটোপ্লাজমীয় বহির্দ্গমে এরা গঠিত এবং কোষঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। কোন কোন কোষে 3000-এরও বেশী মাইক্রোভিলাস দেখা গেছে। এরা বিশোষণপ্রক্রিয়ার জন্য সক্রিয় উপরিতলের বৃদ্ধি ঘটায়। (2) কোন কোন বিন্দুতে কোষঝিল্লি অন্তর্ভাজে অন্তঃকোষ জালকের সংগে সরাসরি যুক্ত হয়, ফলে সাইটোপ্লাজমের ভেতরে ও বাইরে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আবার কোন কোন কোষে কোষঝিল্লি ভাঁজ হয়ে যে পকেট বা চেম্বারের সৃষ্টি করে, তাতে মাইটোকনড্রিয়া বিন্যস্ত থাকে। এই ভাঁজগুলো দেখতে অনেকটা মাইক্রোভিলাসের মত হয়। মাইটোকনড্রিয়ার উপস্থিতি সক্রিয় পরিবহনে সহায়তা করে।

কার্যাবলী (Functions) : কোষঝিল্লির কার্যাবলীর মধ্যে প্রধান (2নং তালিকা) : (1) কোষের আকৃতিদান, (2) কোষঝিল্লির মধ্য দিয়ে পদার্থের পরিবহন, (3) কোষপদার্থের সংরক্ষণ, (4) উদ্দীপনায় অংশগ্রহণ, (5) আগ্রাসন ও পিনোসাইটোসিসের মাধ্যমে পরিপাকে সহায়তা করা এবং

(6) সাইটোপ্লাজমীয় উপাদানের গঠনে সহায়তা করা। কোষঝিল্লির মধ্য দিয়ে পরিবহন ভৌতভাবে (ব্যাপন, অভিস্রবণ ইত্যাদি) বা সক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে পারে। সক্রিয় পরিবহনের দ্বারা কোন পদার্থ বা আয়নকে সাধারণত অধিকতর কম গাঢ়ত্বের দ্রবণ থেকে অধিকতর বেশী গাঢ়ত্বের দ্রবণে নিয়ে যাওয়া হয়। আগ্রাসন ও পিনোসাইটোসিসও কোন কোন কোষে পরিবহনে সহায়তা করে। পরিবহনের সাহায্যে কোষ বিভিন্ন খাদ্যবস্তু, অক্সিজেন প্রভৃতিকে গ্রহণ করে এবং CO_2 সমেত বর্জ্য ও ক্ষরণপদার্থকে নিঃসৃত করে।

2. **সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)ঃ** নিউক্লিয়াস ছাড়া কোষের বাকী অংশকে সাইটোপ্লাজম বলা হয়। এই অংশ যেমন সমপ্রকৃতির, বুদ্বুদ্‌সম্পন্ন বা দানাদার হতে পারে, তেমনি জালকাকৃতি বা তন্তুময় হতে পারে। জীবন্ত সাইটোপ্লাজমে দানাদার পদার্থের মধ্যে চলন পরিলক্ষিত হয়, যাকে **'ব্রাউনের চলন'** বলে। প্রোটিন, কার্বহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ, মেলানিন কণা, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি নির্জীব পদার্থ ছাড়া সাইটোপ্লাজমে আর যেসব পদার্থ পরিলক্ষিত হয় নীচে তার বর্ণনা দেওয়া হল।

(a) **মাইটোকন্‌ড্রিয়া** (গ্রীক, mitos=সূত্র, chondros=দানা)ঃ **বেনদা** (Benda) প্রথমে শুক্রকোষে মাইটোকনড্রিয়া আবিষ্কার করেন। **অ্যাটমান** (Attmann) 1894 সালে মাইটোকন্‌ড্রিয়ার গঠনের বিবরণ দেন। তবে মাইটোকন্‌ড্রিয়ার সূক্ষ্ম গঠনের বর্ণনা আসে **প্যালেড** (Palade, 1950), **জস্‌ট্রান্ড** (Jostrand; 1955) এবং **ডেভিড গ্রীনের** (1964) কাছ থেকে। বিশেষ রঞ্জকপদার্থের প্রয়োগে মাইটোকন্‌ড্রিয়াকে সংরক্ষিত প্রোটোপ্লাজমে বা জীবন্ত সাইটোপ্লাজমে পর্যবেক্ষণ করা যায়। জেনাস গ্রীনে (Jenus green) জীবন্ত মাইটোকন্‌ড্রিয়া প্রথমে হরিতাভ-নীল (greenish blue) এবং পরে লালবর্ণ ধারণ করে, পরিশেষে বর্ণহীন হয়। সাইটোক্রোম অক্সিডেজ সংস্থার উপস্থিতিতে মাইটোকন্‌ড্রিয়া বর্ণযুক্ত হয়।

জীবন্ত কোষে মাইটোকন্‌ড্রিয়া অবিরাম চলমান থাকে। কখনও তারা সম্প্রসারিত, কখনও সংকুচিত, কখনও একীভূত এবং কখনও বা বিভাজিত হয়। তাপমাত্রা, pH, বিপাকক্রিয়া ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তনে কোষ-সাইটোপ্লাজমে অন্যান্য উপাদানের চেয়ে মাইটোকন্‌ড্রিয়াতে সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া ও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

মাইটোকন্ড্রিয়া দানা, রড বা তন্তু আকারে থাকতে পারে। দানার আকৃতি বিশিষ্ট মাইটোকন্ড্রিয়া 0·2—1μ ব্যাসসম্পন্ন। তন্তু-আকৃতির মাইটোকন্ড্রিয়ার
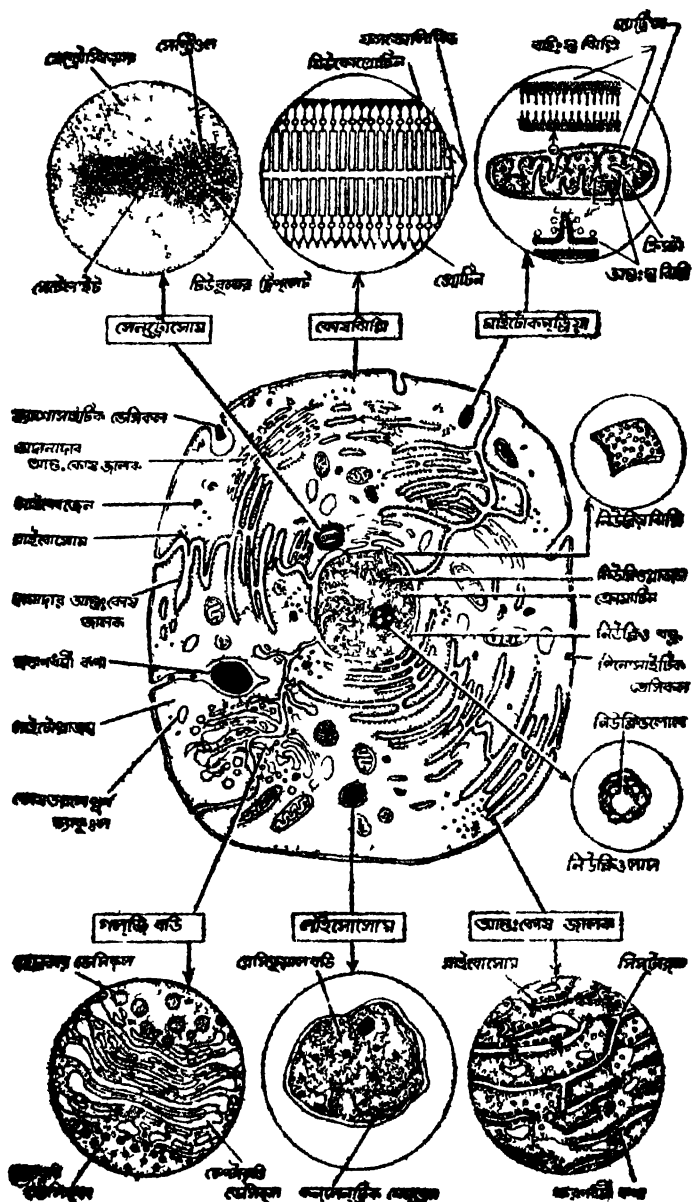
৪-৪:নং চিত্রঃ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রাখা একটি প্রাণীকোষ ও তার বিভিন্ন উপাদান।

ব্যাস 2—4μ বা কখনও 10—12μ হতে পারে। সব কোষেই মাইটোকন্‌ড্রিয়া দেখা যায়। কোন কোন কোষে (শুক্রাণু) এদের সংখ্যা যেমন মাত্র 20টি তেমনি অন্য কোষে (বৃহৎ অ্যামিবা) 500,000টিও হতে পারে।

2নং তালিকা ঃ কোষউপাদান ও তাদের কার্যাবলী।

কোষ উপাদান	কার্যাবলী
কোষঝিল্লি	1. কোষের আকৃতি দান। 2. কোষপদার্থের সংরক্ষণ। 3. কোষের মধ্যে পদার্থের পরিবহন। 4. আগ্রাসন ও পিনোসাইটোসিসের দ্বারা পরিপাকে সহায়তা। 5. সাইটোপ্লাজমীয় উপাদান গঠনে সহায়তা।
সাইটোপ্লাজম ঃ মাইটোকন্‌ড্রিয়া	1. জৈবশক্তির উৎপাদন। 2. আয়নের সঞ্চয়। 3. নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের সংশ্লেষণ। 4. শুক্রাণু-উৎপাদনে সহায়তা। 5. ডিম্বাণুর কুসুম উৎপাদনে সহায়তা।
অন্তঃকোষ জালক	1. অন্তঃকোষীয় পরিবহনের সহায়তা। 2. প্রোটিন সংশ্লেষণে সহায়তা। 3. লিপিডের সংশ্লেষণে সহায়তা। 4. গ্লাইকোজেন-সংশ্লেষণে সহায়তা। 5. অন্তঃকোষীয় উদ্দীপনা পরিবহনে সহায়তা (যেমন পেশীতে)। 6. কোষবিভাজনের সময় নিউক্লিয়ঝিল্লির উৎপাদনে সহায়তা।
রাইবোসোম সেনট্রোসোম	প্রোটিন সংশ্লেষণে সহায়তা। কোষবিভাজনে সহায়তা।
গলজি বডি	1. ক্ষরণক্রিয়ায় সহায়তা করা। 2. শুক্রাণুর বৃদ্ধির সময়ে আক্রোসোম উৎপাদনে সহায়তা করা। 3. ডিম্বাণুর কুসুম উৎপাদনের সহায়তা করা।
লাইসোসোম	1. আগ্রাসন পদ্ধতি ও অন্তঃকোষীয় পদার্থের তরলীকরণে সহায়তা করে।
নিউক্লিয়াস ঃ নিউক্লিয়ঝিল্লি	1. ক্রোমোসোমের সংরক্ষা। 2. নিউক্লিয়াসে প্রবেশ্য পদার্থের পরিবহনের নিয়ন্ত্রণ।
নিউক্লিওলাস	1. প্রোটিন সংশ্লেষণের নিয়ন্ত্রণ।
ক্রোমোসোম	1. আর. এন. এ. সংশ্লেষণ। 2. বংশানুক্রমিক ধারার পরিবহন। 3. কোষের বিপাকক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ।

প্যালেড, জস্ট্রান্ড ও ডেভিড গ্রীনের ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পর্যবেক্ষণ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়ার যে গঠন জানা গেছে তা নিম্নরূপ।

মাইটোকন্ড্রিয়া দুটো ঝিল্লী দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ভেতরের ঝিল্লীস্তর ভাঁজ বিশিষ্ট হয় এবং ভেতরের দিকে প্রক্ষিপ্ত হয়। ভাঁজগুলোকে ক্রিস্টা (crista) বলা হয়। ক্রিস্টার সংখ্যা ও গঠন কোষের প্রকৃতি ও সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল। এরা ভাঁজের মত, নলের মত বা ভিলাসের মত হতে পারে।

প্রতিটি ঝিল্লি দুটো প্রোটিনস্তরের (প্রতিটি 20Å ব্যাসসম্পন্ন) অন্তর্বর্তী দুটো লিপিড স্তর (মোট 20Å) নিয়ে গঠিত।

দুটো মাইটোকন্ড্রিয়-ঝিল্লীর মোট গভীরতা প্রায় 140—180Å। দুটো স্তরের দূরত্ব প্রায় 40—70Å। ক্রিস্টা ছাড়া মাইটোকন্ড্রিয়ার বাকী অন্তঃস্থ অংশকে মেট্রিক্স (matrix) বলা হয়। মাইটোকন্ড্রিয়ার মেট্রিক্স বিভিন্ন আকৃতির সূক্ষ্ম দানাদার পদার্থে পূর্ণ থাকে। বিভিন্ন প্রকার ধনাত্মক আয়ন (Ca^{++} ইত্যাদি) এসব দানার সংগে সংযুক্ত থাকে। ডেভিড গ্রীন মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃস্থ ঝিল্লির অন্তর্দেশে এবং বহিঃস্থ ঝিল্লীর বহির্দেশে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। এদের ব্যাস 90—100Å। বহির্দেশীয় ও অন্তর্দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকৃতি পৃথক। বহির্দেশীয় কণাগুলো সাধারণত গোলাকার। প্যাকেট হিসাবে বহিঃস্থ ঝিল্লীর উপরিতলে এরা এটে থাকে। ফলে মাইটোকন্ড্রিয়ার উপরিতল অমসৃণ ফুসকুড়ির মত দেখায়। অন্তঃস্থ ঝিল্লিতে যেসব ক্ষুদ্র কণা দেখা যায় তারা তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত : মূলদেশ, দণ্ড এবং মস্তক। দণ্ড 50Å দৈর্ঘ্য এবং 30Å ব্যাসসম্পন্ন। মূলদেশ ও মস্তকের ব্যাস 80Å এর মত। অন্তঃস্থ ঝিল্লি থেকে কণাগুলোর মস্তক পর্যন্ত দূরত্ব 160Å এবং দুটো কণার মধ্যবর্তী ব্যবধান প্রায় 20Å। কণাগুলো এভাবে সুবিন্যস্ত থাকে।
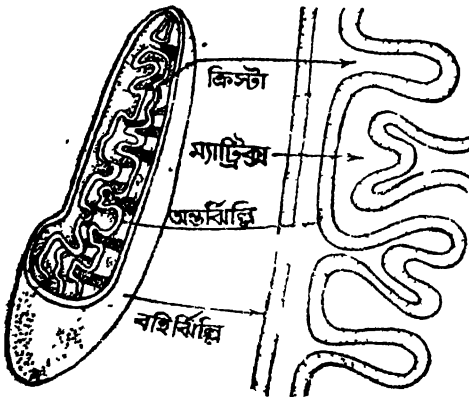
3-5 নং চিত্র : মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন।

এছাড়া মাইটোকন্‌ড্রিয়াতে প্রায় 20Å ব্যাসসম্পন্ন এক বা একাধিক গোলাকার DNA-সূত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাইটোকন্‌ড্রিয় রাইবোসোম দেখা যায়। এই সব রাইবোসোমের সংগে RNA যুক্ত থাকে। মাইটোকন্‌ড্রিয়াতে DNA-এর আবিষ্কারে প্রমাণিত হয়েছে, এরা পৃথক **প্রজনন একক** (genetic unit) হিসাবে বিভাজিত হতে পারে এবং প্রোটিন ও RNA এর সংশ্লেষণ ঘটাতে পারে। মাইটোকন্‌ড্রিয়াস্থিত DNA নিউক্লিয়াসের DNA থেকে নানাদিক থেকে ভিন্ন : (1) মাইটোকন্‌ড্রিয়ার DNAতে G-C উপাদান (G=গুয়ানিন, C=সাইটোসিন ; গুয়ানিন সব সময়ে সাইটোসিনের সংগে যুগ্মভাবে অবস্থান করে।) অনেক বেশী, (2) মাইটোকন্‌ড্রিয়াস্থিত DNA যে বংশসংকেত (genetic code) বহন করে তা সবরকম প্রোটিন ও এনজাইমের বৈশিষ্ট্য-দানের পক্ষে যথেষ্ট নয়, (3) মাইটোকন্‌ড্রিয়াস্থিত DNA সম্ভবত কোষের গঠনের সংগে জড়িত প্রোটিনের সংশ্লেষণের বংশসংকেত বহন করে থাকে। এরা অধিক তাপমাত্রায় অপ্রাকৃত হয়, (4) এদের DNA তে হিস্‌টোন যুক্ত থাকে না বলে ইহা ব্যাকটেরিয়াস্থিত DNA এর সংগে অনেকাংশে সদৃশ।

মাইটোকন্‌ড্রিয়াস্থিত রাইবোসোম প্রায় 70S সম্পন্ন। 1969 সালে **ভিগনাইজ** (Vignais), হুয়েট (Huet), এবং আঁদ্রে (Andre) মাইটোকন্‌ড্রিয়াতে পলিসোমের মত রাইবোসোমের সমাবেশ লক্ষ্য করেছেন। দেখা গেছে, মাইটোকন্‌ড্রিয়াস্থিত রাইবোসোমের অখণ্ডতা (integrity) বজায় রাখতে অধিক পরিমাণ Mg আয়নের প্রয়োজন হয়।

মাইটোকন্‌ড্রিয়াতে প্রচুর পরিমাণে এনজাইম ও কো-এনজাইমের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। **লেনিনজারের** (Lehninger, 1960) মতে প্রতিটি মাইটোকন্‌ড্রিয়াতে 5000—10,000 স্বয়ং-সম্পূর্ণ এনজাইম রয়েছে। এই এনজাইম ও কো-এনজাইম মাইটোকন্‌ড্রিয়ার অন্তঃস্থ ঝিল্লির ভাঁজে ভাঁজে অবস্থান করে এবং সম্ভবত সমভাবে এই ঝিল্লিভাঁজ বা ক্রিস্টার ওপরে ছড়ান থাকে। এছাড়া সালফার ও ভিটামিন A, B_6, B_{12} এবং C এর উপস্থিতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

কার্যাবলী (Functions) : মাইটোকন্‌ড্রিয়া যেসব কার্যাবলী সম্পন্ন করে তার মধ্যে প্রধান : (1) জৈবশক্তির উৎপাদন, (2) আয়নের সঞ্চয়, (3) নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের সংশ্লেষণ, (4) শুক্রাণু-উৎপাদনে সহায়তা এবং (5) ডিম্বাণুর কুসুম-উৎপাদনে সহায়তা।

মাইটোকনড্রিয়াকে কোষের শক্তির আধার বলা হয়। এর মধ্যে অবস্থানকারী এনজাইম খাদ্য বস্তু ও অক্সিজেনের মিলন ঘটিয়ে জৈবশক্তি উৎপন্ন করে। এ ব্যাপারে ইলেকট্রন পরিবহন সেতুর গুরুত্ব অনেকখানি, কারণ এই সেতু এনজাইমের দ্বারা খাদ্যবস্তু থেকে যে সক্রিয় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়, তাকে বিভিন্ন বাহকের (carrier) মাধ্যমে বহন করে অক্সিজেনের সংগে যুক্ত করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জৈবশক্তি ATP উৎপন্ন হয়।

মাইটোকনড্রিয়ার মেট্রিক্স সূক্ষ্ম দানাদার পদার্থে পূর্ণ থাকে। বিভিন্ন প্রকার আয়ন, বিশেষ করে ধনাত্মক আয়ন (যেমন, Ca^{++}) এসব দানার গায়ে এঁটে থাকে। মাইটোকনড্রিয়াতে DNA এর আবিষ্কারে প্রমাণিত হয়েছে এরা পৃথক প্রজনন একক (genetic unit) হিসাবে বিভাজিত হতে পারে এবং প্রোটিন ও RNA-এর সংশ্লেষণ ঘটাতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে মাইটোকনড্রিয়া বর্ধনশীল ডিম্বাণুতে কুসুম উৎপাদনেও সহায়তা করে। শুক্রাণু মধ্যদেহে অক্ষতন্তুর চারিপাশে মাইটোকনড্রিয়া বিন্যস্ত হয়ে হেলিক্স (helex) গঠন করে।

(b) **অন্তঃকোষ জালক** Endoplasmic Reticulam): 1945 সালে **পর্টার ও ক্লড ফুলান** (Fullan) সাইটোপ্লাজমে অন্তঃকোষ জালকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তাদের সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। **জস্ট্রান্ড** (1953), **কুরোসুমি** (Kurosumi, 1954) এবং **উইসের** (Weiss, 1953) পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, অন্তঃকোষ জালকের আকৃতি তিনপ্রকার: (a) **সিসটারনা** (cisternae), (b) **ভেসিকল** (vesicles) এবং (c) **টিউবুল** (tubule)। সিসটারনা দীর্ঘ ও চেটাল থলির মত দেখতে (3-6নং চিত্র)। এদের প্রত্যেকে 40-50 mμ পুরু এবং সাধারণত সমান্তরাল সারি হিসাবে অবস্থান করে। এ ধরনের বিন্যাস প্রধানত প্রোটিন ও এনজাইম সংশ্লেষণকারী কোষে (অগ্ন্যাশয় কোষ, যকৃৎকোষ ইত্যাদিতে) দেখা যায়।

ভেসিকল দেখতে গোলাকার এবং তাদের ব্যাস 25—500 mμ। টিউবুল লম্বা নলের মত এবং তারা 50-190mμ ব্যাসসম্পন্ন হয়। এজাতীয় অন্তঃকোষ জালককে প্রধানত সেইসব কোষে দেখা যায়, যারা ক্ষরণশীল নয় (যেমন পেশীকোষ)। এই তিন প্রকারের অন্তঃকোষ জালককে একটিমাত্র কোষে একসংগে দেখা যেতে পারে, আবার পৃথকভাবে ভিন্ন কোষে বিভিন্ন সময়ে দেখা

যেতে পারে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লোহিতকণিকা ছাড়া অন্যান্য সবরকম পরিণত কোষেই অন্তঃকোষ জালক দেখা যায়।

অন্তঃকোষ জালক একক ঝিল্লি দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ঝিল্লি 50-60Å পুরু। কোষঝিল্লি থেকে খানিকটা পাতলা। অন্তঃকোষ জালক একদিকে বহিঃস্থ নিউক্লিয়ঝিল্লি এবং অপর দিকে কোষঝিল্লির সংগে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সংযুক্ত থাকে। নিউক্লিয়-ঝিল্লির সংগে সরাসরি সংযোগ থেকে ধারণা করা হয়, ইহা কোন স্বাধীন ঝিল্লি নয়, নিউক্লিয়ঝিল্লির ভাঁজ থেকে ইহা উৎপন্ন হয়, কোন কোন কোষে অবশ্যই। ইঁদুরের ভ্রূণকোষ এবং বাগদা চিংড়ির ডিম্বাণু পর্যবেক্ষণ করে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এছাড়া কোন কোন কোষের সাইটোপ্লাজমের কোন কোন অংশে অন্তঃকোষ জালক এমন যোগসূত্র রচনা করে যা অনেকগুলো সাইটোপ্লাজমীয় গহ্বরেব মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং তাদের মধ্যকার পদার্থের পরিবহনে সহায়তা করে।
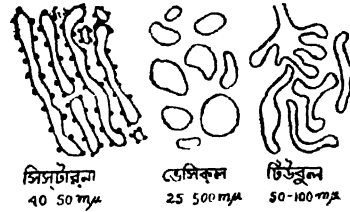
3-6 নং চিত্র : অন্তঃকোষ জালক।

অন্তঃকোষ জালককে আবার দুভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় : (a) **দানা-দার বা অমসৃণ** (granular or rough) এবং (b) **অদানাদার বা মসৃণ** (agranular or smooth)। অন্তঃকোষ জালকের উপরিতলে রাইবোসোম কণা থাকলে তাদের দানাদার বা অমসৃণ বলা হয়। উপরিতলে রাইবোসোম না থাকলে তাদের মসৃণ বা অদানাদার বলা হয়। রাইবোসোমের ব্যাস প্রায় 100-150Å এবং ইহা রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিনের দ্বারা গঠিত। প্রোটিন ও RNA এর ভাগ যথাক্রমে 40% এবং 60%। কী প্রকার কোষ এবং কোষের শারীরবৃত্তীয় প্রকৃতি কি, প্রধানত তার উপরই দানাদার অন্তঃকোষ জালকের পরিমাণ ও আকৃতি নির্ভর করে। যে সব কোষ প্রোটিন সংশ্লেষণে বিশেষভাবে নিয়োজিত, তাদের মধ্যেই এজাতীয় অন্তঃকোষ জালকের উপস্থিতি বেশী দেখা যায়। সিসটারনা শ্রেণীর অন্তঃকোষ জালক সব সময় দানাদার হয়।

মসৃণ বা অদানাদার অন্তঃকোষ জালকের আকৃতি টিউবুলের মত। এরা স্টেরোয়েড পদার্থ অর্থাৎ কোলেস্টারোল, গ্লিসারাইড এবং স্টেরোয়েড হরমোন সংশ্লেষণে সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। 1960 সালে ফেভসেট (Favcet) এদেরে

অক্ষিপটের রঞ্জককোষে প্রথমে দেখতে পেয়েছেন। এরা ভিটামিন A-এর বিপাক ও দর্শনের সংগে সম্পর্কযুক্ত রঞ্জককণার উৎপাদনের সংগে জড়িত। যকৃতের গ্লাইকোজেন সঞ্চয়কারী কোষেও এজাতীয় অন্তঃকোষ জালকের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেছে। মসৃণ অন্তঃকোষ জালক প্রায়শ অমসৃণ অন্তঃকোষ জালকের সংগে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকে।

কার্যাবলী (Functions) : অন্তঃকোষ জালক সাধারণত, (1) অন্তঃকোষীয় পরিবহন, (2) প্রোটিনসংশ্লেষণ, (3) ফ্যাট বা লিপিডের সংশ্লেষণ, (4) গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ, (5) অন্তঃকোষীয় উদ্দীপনা পরিবহন এবং (6) কোষবিভাজনের সময় নিউক্লিয়ঝিল্লি উৎপাদনে সহায়তা করে।

(c) **রাইবোসোম** (Ribosomes) : রাইবোনিউক্লিয়প্রোটিনের যেসব গুটিকা বা কণা অন্তঃকোষ জালকের উপরিতলে এঁটে থাকে এবং কোন কোন কোষের সাইটোপ্লাজমেও বিচ্ছিন্ন বা দলগতভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে, রবার্ট (Robert —1958) তাদের **রাইবোসোম** নামে অভিহিত করেন। লিম্ফোসাইট, রেটিকুলোসাইট, ভ্রূণজ স্নায়ুকোষ প্রভৃতিতে এদের বিক্ষিপ্ত ও মুক্ত অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। মাইটোকন্ড্রিয়াতেও রাইবোসোম দেখা যায়, তবে তারা আকৃতিতে অনেক ছোট। অন্তঃকোষ জালকে রাইবোসোম বৃত্তাকারে, লুপ হিসাবে, পেঁচানো অবস্থায় বা স্থবিন্যস্ত মালার মত সজ্জিত থাকে। এদের এজাতীয় সংগবদ্ধ অবস্থাকে **পলিসোম** (polysome) বলা হয়। রাইবোসোমের গড় ব্যাস 100-150Å এর মত। এদের মধ্যে 60 শতাংশ RNA এবং 40 শতাংশ প্রোটিন। যকৃৎকোষে রাইবোসোমের সংখ্যা প্রায় 20^{8}টি।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা যায়, রাইবোসোম দুটো অংশের সমন্বয়ে গঠিত : একটি বৃহত্তর, অপরটি ক্ষুদ্রতর। এই দুটো অংশের মধ্যে একটি খাঁজ থাকে : ই কোলিতে (E Coli) দেখা গেছে, বৃহত্তর অংশের ব্যাস 140-160Å এবং ক্ষুদ্রতর অংশের ব্যাস 90-110Å। বৃহত্তর অংশের আকৃতি পেয়ালার (cup) মত এবং ক্ষুদ্রতর অংশের আকৃতি টুপির (cup) মত। হাক্সলে ও জুবের (Huxley, Zubey) মতে, রাইবোসোম বৃহত্তর অংশের দ্বারা অন্তঃকোষ জালকের সংগে যুক্ত থাকে।

রাইবোসোমের আকৃতি খুব জটিল। এরা অত্যধিক রন্ধ্রযুক্ত এবং সোদক (hydrated) হয়। RNA এবং প্রোটিনের দুটো ভাগই সম্ভবতঃ একত্রে কুণ্ডলীকৃতভাবে অবস্থান করে; ইউরানীল আয়নে (uranyl ions, RNA

নির্বাচক বর্ণ) কোষকে বর্ণযুক্ত করলে রাইবোসোমকে অনেকটা তারকার মত দেখায় এবং ঘনতর অক্ষ থেকে 4-6 বাহু প্রসারিত করে থাকতে দেখা যায়। 1967 সালে নানিংগা (Nanninga) বেসিলাস সাবটিলিসের (Bacillus subtilis) রাইবোসোমের 160-180Å ব্যাসসম্পন্ন বিভাগটিতে (50S) পঞ্চভূতের সমন্বয় দেখেছেন, যার কেন্দ্র 40-60Å ব্যাসযুক্ত একটি স্বচ্ছ অঞ্চল। অপর 40S অংশটি সুসম নয় এবং ইহা আবার দুটো অংশের সমন্বয়ে গঠিত। এই দুটো অংশ 30-60Å পুরু তন্তুর দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

পরাপকেন্দ্রে রাইবোসোমের থিতান ধর্মের যে বিকাশ ঘটে তার উপর ভিত্তি করে তাদের দুভাগে বিভক্ত করা যায় : 70S (S ভেদ্‌বার্গের একক) থিতান ধ্রুবক সম্পন্ন ব্যাক্‌টেরিয়ার রাইবোসোম এবং নিউক্লিয়াসসম্পন্ন কোষের 80S যুক্ত রাইবোসোম। উভয়প্রকার রাইবোসোমের আবার দুটো করে অংশ থাকে, 2/3 তৃতীয়াংশ এবং 1/3 তৃতীয়াংশ। এদের থিতান ধ্রুবক (sedimentation constant) যথাক্রমে 50S ও 60S এবং 30S ও 40S। দুটো উপবিভাগই Mg আয়নের দ্বারা আবদ্ধ থাকে। Mg আয়ন RNA-এর ফসফোডায়এস্টার গ্রুপের সংগে বিক্রিয়া ঘটায়। দেখা গেছে, প্রতি তিনটি ফসফো-ডায়এস্টার গ্রুপে একটি করে Mg আয়ন থাকে। 80S রাইবোসোম থেকে $\frac{1}{3}$ অংশ Mg সরিয়ে নিলে ইহা 60S এবং 40S অংশে বিভক্ত হয়। Mg আয়নের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে এই বিভাগগুলোকে আরও উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়।

এজাতীয় পরিবর্তন একমুখী অর্থাৎ Mg আয়নের পরিমাণকে বৃদ্ধি করে উপবিভাগ বা বিভাগগুলোকে পুনরায় একীভূত করা যায় না। অপরপক্ষে Mg আয়নের পরিমাণ 10 গুণ বৃদ্ধি করে দেখা গেছে দুটো রাইবোসোম সংযুক্ত হয়ে ডাইমার গঠন করে।
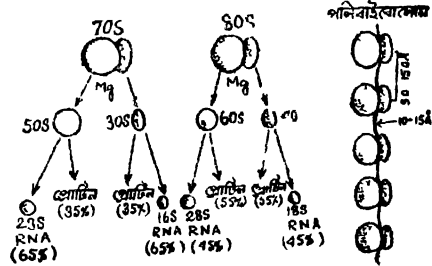
3-7 নং চিত্র : ব্যাক্‌টেরিয়া ও নিউক্লিয়াসসম্পন্ন কোষের রাইবোসোম ও তাদের বিভিন্ন অংশ।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা গেছে 75% রাইবোসোমই পলিরাইবোসোম হিসাবে অবস্থান করে। পলিরাইবোসোমে রাইবোসোমের সংখ্যা বিভিন্ন হতে

পারে। 5টি রাইবোসোম একক নিয়ে যে পলিসোম গঠিত হয় তাকে পেণ্টামিয়ার (pentamere) বলা হয় এবং থিতান ধ্রুবক 170S। এই পলিরাইবোসোমের উপরে যে ফিতে ছড়ান থাকে তাকে সংকেতবাহী RNA বা mRNA বলা হয়। পলিরাইবোসোমে দুটো রাইবোসোমের মধ্যবর্তী কেন্দ্র দূরত্ব 340Å এবং mRNA এর দৈর্ঘ্য 1500Å।

অপরিণত লোহিতকণিকায় যে পলিরাইবোসোম দেখা যায়, তা 5টি রাইবোসোমের সমন্বয়ে গঠিত। ইহা 150টি অ্যামাইনো অ্যাসিডসম্পন্ন পলিপেপ-টাইড চেন গঠন করে এবং হিমোগ্লোবিনের সংশ্লেষণ ঘটায়। ক্রমবর্দ্ধমান পেশীকোষে যে মায়োসিন সংশ্লেষিত হয় তাতে 56টি রাইবোসোমের সমন্বয়ে একটি পলিসোম গঠিত হয়। এই পলিসোমের সংগে যুক্ত mRNA 1800টি অ্যামাইনো অ্যাসিডযুক্ত পলিপেপটাইড চেনের প্রোটিন মায়োসিন উৎপন্ন করে।

স্কেরার (Scherrer, 1963) প্রভৃতির মতে mRNA এবং rRNA প্রাথমিকভাবে একটি বৃহত্তর RNA একক হিসাবে (45S) কোষের নিউক্লিয়াসে সংশ্লেষিত হয় এবং পরে নিউক্লিওলাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে (32S, 28S, 18S, 5S) বিভক্ত হয়ে মিথাইলযুক্ত ($+ CH_3$) হয়। সংশ্লেষিত হবার পর RNA এর একটি অংশ (18S) প্রোটিনের সংগে যুক্ত হয়ে একটি ক্ষুদ্রতর রাইবোসোম খণ্ড উৎপাদন করে যা সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। তেমনি RNA-এর আর এক অংশ (28S) প্রোটিনের সংগে যুক্ত হয়ে আর একটি বৃহত্তর রাইবোসোম একক গঠন করে। নিউক্লিওলাসের বহির্দেশীয় জিন থেকে প্রতিলিপি গ্রহণকারী RNA-এর আর একটি অণু (5S) রাইবোসোমের বৃহত্তর খণ্ডের সংগে যুক্ত হয়। এই 5S অংশের কার্য এখনও অজ্ঞাত। সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করার পর এসব উপবিভাগ mRNA-এর সংগে যুক্ত হয়ে পলিসোম গঠন করে।

কার্যাবলী: রাইবোসোমের গায়ে প্রোটিন-সংশ্লেষণক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নিউক্লিয়াসস্থিত ডেঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (DNA যে বিশেষ সংকেত-বাহী RNA বা mRNA-এর জন্ম দেয়, তারা নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে এসে রাইবোসোমের সংগে যুক্ত হয় এবং সংকেতমাফিক অ্যামাইনোঅ্যাসিডকে পরপর সংযুক্ত করে নির্দিষ্ট প্রোটিন সৃষ্টি করে।

(d) **সেন্ট্রোসোম (Centrosome):** নিউক্লিয়াসসংলগ্ন সাইটো-প্লাজমের এক বিশেষ স্বচ্ছ বলয় (centrosphere) এবং স্বচ্ছ বলয়ের অভ্যন্তরে

এক বা একাধিক গাঢ় রঞ্জককণা (centrioles) নিয়ে সেন্ট্রোসোম গঠিত। অধুনা জানা গেছে স্নায়ুকোষেও সেন্ট্রোসোম থাকে। কোষবিভাজনের সময় ছাড়া সেণ্ট্রিওলকে দেখা যায় না।

কার্যাবলী : সেন্ট্রোসোম কোষবিভাজনে অংশগ্রহণ করে। বয়স্ক স্নায়ু-কোষে বিভাজনক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না।

(e) **গল্‌জি বডি** (Golgi body) : গল্‌জি বডি দেখতে অনেকটা সূক্ষ্ম তন্তুর জালিকার মত। সচরাচর কোষের একটি নির্দিষ্ট মেরুতে ইহা অবস্থান করে। কেমিলো গল্‌জি (Camillo Golgi) 1898 সালে একে অন্তঃস্থ জালকসদৃশ যন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করেন। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, ইহা তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত : (a) চেপ্টাকৃতি থলি, (b) বৃহদাকার ভ্যাকুওল এবং (c) ক্ষুদ্রাকৃতি ভ্যাকুওলপুঞ্জ। গল্‌জি-ঝিল্লি 60—70Å পুরু। থলির ঝিল্লিদ্বয় 60—90Å ভ্যাকুওল দূরত্বে অবস্থান করে; দুটো পাশাপাশি থলির দূরত্ব প্রায় 130Å।

গল্‌জিবডির আকৃতি বিভিন্ন হতে পারে। স্নায়ুকোষ ও গ্রন্থিকোষে এর আকৃতি তুলনামূলকভাবে বড় হয়, কিন্তু পেশীকোষে ছোট হয়। গ্রন্থিকোষে এর অবস্থান নিউক্লিয়াস ও নালীপথের (lumen) মাঝামাঝি। এর মধ্যে লাইপো-প্রোটিনের (lipoprotein) বিশেষ সমাবেশ লক্ষণীয়। কোষের নিষ্ক্রিয়তার সংগে এর আকার, আকৃতি ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। বিষক্রিয়া গল্‌জি বডিতে প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

কার্যাবলী (Function) : গল্‌জি বডির কার্যাবলীর মধ্যে প্রধান : (a) ক্ষরণক্রিয়ায় সহায়তা করা, (b) শুক্রাণুর বৃদ্ধির সময়ে আক্রোসোম (acrosome) উৎপাদনে সহায়তা করা এবং (c) ডিম্বাণুর কুসুম উৎপাদনে সহায়তা করা। ক্ষরণধর্মী কার্যের সংগে গল্‌জি বডির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। জাইমোজেন-কণা (zymogen granules) এবং সাইটোপ্লাজমে সংশ্লেষিত অন্যান্য বস্তু প্রথমে গল্‌জিবডির সংস্পর্শে আসে এবং পরে ক্ষরিত হয়। এনজাইম, ভিটামিন C এবং অন্যান্য পদার্থকে এর গায়ে সংযুক্ত হয়ে থাকতে দেখা যায়।

(f) **লাইসোসোম** (Lysosome) : ফ্যাগোসাইট (phagocytes) বা আগ্রাসী কোষে লাইসোসোমের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। আর্দ্র-বিশ্লেষণকারী এনজাইমসমূহ, (যথা : ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ, বিটা-গ্লুকুরো-নিডেজ ও অ্যাসিড ফস্‌ফাটেজ) লাইসোসোমে দেখতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী ঃ (Function) ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) বা আগ্রাসন পদ্ধতিতে এবং অন্তঃকোষ পদার্থের তরলীকরণে ইহা সহায়তা করে।

এসব ছাড়া সাইটোপ্লাজমে নিঃস্রাবীকণা (secretory granules), নিজ্‌লকণা (Nissl granules—শুধুমাত্র স্নায়ুকোষে), প্লাজমোসিন, মায়োফাইব্রিল, নিউরোফাইব্রিল, মাইক্রোসোম প্রভৃতি পদার্থ কোষের সাইটোপ্লাজমে দেখতে পাওয়া যায়।

3. **নিউক্লিয়াস** (Nucleus) ঃ সাধারণত গোলাকার নিউক্লিয়াসটি কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। তবে তাদের আকার, আকৃতি, অবস্থান এবং সংখ্যার পরিবর্তন হয়। পেশীকোষ ও স্তম্ভাকার কোষে নিউক্লিয়াস লম্বাটে, নিউট্রোফিল শ্বেতকণিকায় লতিযুক্ত, তরুণাস্থি প্রভৃতিতে অসম। দুমুখ সুঁচাল উপবৃত্তাকার, চেপ্টা প্রভৃতি ধরনের নিউক্লিয়াসও পাওয়া যায় নিউক্লিয়াস কোন কারণবশতঃ বিদ্ধ হলে সমগ্র কোষ মারা যায়। সচরাচর প্রতি কোষে একটি করে নিউক্লিয়াস দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন কোষে দুই বা তারও বেশী নিউক্লিয়াস দেখা যায়। পাকস্থলীর প্রাচীরকোষ (parietal cell), যকৃৎকোষ, মূত্রথলীর আবরণী কোষ এবং কোন কোন স্নায়ুকোষেও দুটো নিউক্লিয়াস থাকে। যকৃৎকোষে তিনটি নিউক্লিয়াস দেখা যায়। অস্থিপেশী ও ওস্টিওক্লাস্ট কোষে পাঁচ বা তারও বেশী নিউক্লিয়াস দেখা যায়। নিউক্লিয়াসকে বেষ্টন করে রয়েছে অতি সূক্ষ্ম **নিউক্লিয়াঝিল্লি** (nuclear membrane)। কোষঝিল্লি যেখানে একক ঝিল্লি, নিউক্লিয়াঝিল্লি সেখানে দুটো সূক্ষ্ম ঝিল্লির সমন্বয়ে গঠিত। দুটো ঝিল্লি প্রায় 150 Å দূরত্বে সহাবস্থান করে। নিউক্লিয়ঝিল্লিতে রয়েছে অসংখ্য বৃহদাকার রন্ধ্র (প্রায় 1000 Å ব্যাসবিশিষ্ট)। এই রন্ধ্রগুলো সাইটোপ্লাজম ও অন্তর্নিউক্লিয় উপকরণের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে। রন্ধ্রগুলো বড় হওয়ার ফলে অনেক নিউক্লিয়াসেই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার অভাব এবং তড়িৎপ্রতিরোধ ক্ষমতা (electrical resistance) কম দেখা যায়

নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে এক বা একাধিক **নিউক্লিওলাস** (nucleolus) থাকে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই নিউক্লিওলাসের মধ্যে যেসব সারিবদ্ধ সূক্ষ্ম কণিকা বা বিক্ষিপ্ত জালিকার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, তাদের **নিউক্লিওলোনেমা** (nucleolonema) বলে। নিউক্লিওলোনেমা ছাড়া নিউক্লিওলাসের বাকী অংশকে **পারস্‌ অ্যামোর্ফা** (pars amorpha) বলা হয়। নিউক্লিওলোনেমা প্রধানত DNA এবং অ্যামোর্ফা অংশ RNA নিয়ে গঠিত.

লিনিন (linin) নামক একপ্রকার পদার্থের সূক্ষ্ম জালকের দ্বারা নিউক্লিয়-দেহ গঠিত। এই জালকের মধ্যবর্তী অংশ **নিউক্লিওপ্লাজম** (nucleoplasm) নামক প্রোটোপ্লাজম-পদার্থে পূর্ণ থাকে। গাঢ় বর্ণযুক্ত ক্রোমাটিন নামক তন্তু সবর্ণ (stained) নিউক্লিয়াসে দেখতে পাওয়া যায়। এই পদার্থটি নিউক্লিও-প্রোটিন ক্রোমাসিন (chromasin) নামক পদার্থ দ্বারা গঠিত। নিউক্লিও-প্রোটিনে DNA ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ফসফরাসঘটিত পদার্থ রয়েছে। কোষবিভাজনের প্রাক্কালে সাধারণভাবে অদৃশ্য এই ক্রোমাটিন পদার্থগুলো জড়ো হয়ে 'রডের' আকৃতি ধারণ করে।

ওয়াল্‌ডেয়ার (Waldeyer) 1888 সালে তাদের নামকরণ করেন **ক্রোমোসোম**। মানুষের প্রতি দেহকোষে মোট 22 জোড়া সদৃশ দেহ-ক্রোমোসোম এবং এক জোড়া যৌন ক্রোমোসোম থাকে। স্ত্রীলোকে যৌন ক্রোমোসোম সদৃশ (XX), কিন্তু পুরুষে সদৃশ নয় (XY)। স্ত্রী ডিম্বকোষে তাই 22টি দেহ ক্রোমোসোম এবং একটিমাত্র Y অথবা X ক্রোমোসোম থাকে।

সাধারণত ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য 0·1-50 μ হয়। মানুষের ক্রোমোসোম 4-6μ দীর্ঘ এবং 0·2-2μ ব্যাসসম্পন্ন। স্থিতিশীল নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোম অদৃশ্য থাকে। কোষবিভাজনের সময়ে, বিশেষ করে মেটাফেজ ও অ্যানাফেজে তাদের আকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাদের দৈর্ঘ্য প্রায় সুনির্দিষ্ট থাকে। ক্রোমোসোমের আকৃতি 4 প্রকারের হতে পারে: (1) অ্যাক্রোসেনট্রিক (acrocentric): রডের আকৃতিবিশিষ্ট ও একটি ক্ষুদ্র বাহুযুক্ত, (2) সাব্-মেটাসেনট্রিক (submetacentric): L-এর মত দেখতে এবং বাহুদ্বয় অসম, (3) মেটাসেনট্রিক (metacentric): V-এর মত আকৃতি এবং বাহুদ্বয় সুসম এবং (4) টেলোসেন্ট্রিক (telocentric): রডের মত আকৃতি, একপ্রান্তে সেন্ট্রোমিয়ার ও একটি মাত্র বাহু।

কোন কোন বিশেষ কোষে অস্বাভাবিক বৃহদাকারের ক্রোমোসোমের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন, লালাগ্রন্থিকোষের ক্রোমোসোম।

ক্রোমোসোম নিম্নলিখিত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত: (a) ক্রোমোনেমা, (b) ক্রোমোমিয়ার; (c) সেনট্রোমিয়ার এবং (d) সেটেলাইট বডি সমেত কুণ্ডন। সেন্ট্রোমিয়ারের দ্বারা পৃথকীকৃত অংশ **ক্রমাটিড** নামে পরিচিত।

ক্রোমোনেমা (chromonema): ক্রোমোনেমা নিউক্লিওপ্রোটিনের তন্তু

বা তন্তুর গুচ্ছবিশেষ। ইহা জিন-এর উপর সরলরেখায় বিন্যস্ত থাকে। মেটাফেজে বিভক্ত না হলে প্রতিটি ক্রমাটিডে একটি করে ক্রোমোনেমা থাকে। এবং বিভক্ত হলে দুটো থাকে। মেটাফেজে ক্রোমোনেমাটা পেঁচানো থাকে। ক্রোমোনেমার তন্তু দুভাবে পেঁচানো থাকতে পারে : (1) প্যারানেমিক (paranemic) বা (2) প্লেকটোনেমিক (plectonemic) কুণ্ডলী হিসাবে। প্রথম প্রকারের কুণ্ডলীতে উপতন্তুগুলো পৃথকভাবে অবস্থান করে। তবে দ্বিতীয় প্রকার কুণ্ডলীতে তারা সহজে পৃথকীযোগ্য নয়।

৪-৯নং চিত্র : (*a*) আক্রোসেনট্রিক, (*b*) সাবমেটাসেনট্রিক, (*c*) মেটাসেনট্রিক এবং (*d*) টেলোসেনট্রিক ক্রোমোসোম।

ক্রোমোমিয়ার (Chromomere) : কোন অনুকূল অবস্থায় ক্রোমোনেমার দৈর্ঘ্য বরাবর যে বিপুল সংখ্যক দানার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তাদের ক্রোমোমিয়ার বলা হয়। কোষ বিভাজনে বা মেটাফেজে দেহ-ক্রোমোসোমে এদের দেখা যায় না। লালাগ্রন্থিজ ক্রোমোসোম বা উভচর প্রাণীর ল্যাম্পব্রাশ (lampbrush) ক্রোমোসোমে এদের দেখা যায়।

সেনট্রোমিয়ার (Centromere) : সেনট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর ক্রোমোসোমের আকৃতি নির্ভর করে। সেনট্রোমিয়ার কোষবিভাজনের সময় ক্রোমোসোম বা ক্রমাটিডকে বিষুব অঞ্চলে বিন্যস্ত করে। অধিকাংশ ক্রোমোসোমে সেনট্রোমিয়ারের আকৃতি একই রকম হয়। সেনট্রোমিয়ারের মধ্যে এক বা একাধিক বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোমিয়ার এবং সূক্ষ্ম অপেঁচানো ক্রোমোনেমাটা থাকে।

সেটেলাইট বডিসমেত কুঞ্চন (Constrictions with satelite bodies) : ক্রোমোসোমে গৌণ কুঞ্চন ও সেটেলাইট বডি দেখা যায়। ইন্টারফেজের সময় ইহা নিউক্লিওলাসের সংগে যুক্ত থাকতে পারে। নিউক্লিওলাস কোষবিভাজনের প্রফেজ দশায় হ্রাস পেয়ে সাইটোপ্লাজমে অদৃশ্য হয়। সেটেলাইট বলতে ক্রোমোসোমের সেই অংশকেই বুঝায় যেখানে কুঞ্চন থাকে এবং পুনরায় নিউক্লিয়াস যেখানে উৎপন্ন হয়। কোষবিভাজনের সময়ে সম্ভবত ইহা নিউক্লিওলাসের পুনর্বিন্যাসে সহায়তা করে।

টেলোমিয়ার ও মেট্রিক্স (telomere and matrix) ঃ ক্রোমোসোমের প্রান্তসমূহ টেলোমিয়ার নামে পরিচিত। ক্রোমোসোমের প্রান্তসমূহ অন্তর্বর্তী অংশগুলো থেকে পৃথক। এই প্রান্তসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা আবেশে ভেংগে গেলে পর্যায়ক্রমিক কোষবিভাজনে তারা নিউক্লিয়াস থেকে বিলুপ্ত হয়, কারণ এরা সেনৃট্রোমিয়ারের সংগে যুক্ত থাকে না। ক্রোমোসোমের অবশিষ্ট বিনষ্ট অংশ অস্থায়ী হয় এবং অপর কোন ভগ্ন ক্রোমোসোমের সংগে যুক্ত হতে পারে। ভগ্নপ্রান্ত কখনও স্বাভাবিক প্রান্তের সংগে যুক্ত হয় না।

ক্রোমোসোমের প্রধান উপাদানকে মেট্রিক্স বলা হয়। ক্রোমোনেমাটা এরই মধ্যে নিহিত থাকে।

কার্যাবলী (Functions) ঃ নিউক্লিয়াস কোষের সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয় অংশ। কোষের সবরকম কার্যে এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। নিউক্লিয়াস নির্দিষ্ট সংকেতবাহী RNA বা mRNA-এর সংশ্লেষণের জন্য দায়ী। এই সংকেতবাহী RNAতে প্রয়োজনীয় বংশসংকেত নিহিত থাকে। এরা নিউক্লিয়রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে সাইটোপ্লাজমে বেরিয়ে আসে এবং রাইবোসোমের সংগে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট এনজাইম, হরমোন প্রোটিন ইত্যাদি উৎপাদন করে এবং এভাবে মানবদেহের সব রকম কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ক্রোমোসোম তাই কোন কোষের নির্দিষ্ট বিশেষত্বের জন্যই শুধু দায়ী নয়, বংশানুক্রমিক ধারাকেও বংশপরম্পরায় পরিচালিত করে।

নিউক্লিয়াসের কার্যাবলীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (1) নিউক্লিয়-ঝিল্লির কার্যাবলী, (2) নিউক্লিওলাসের কার্যাবলী এবং (3) ক্রোমোসোমের কার্যাবলী।

নিউক্লিয়ঝিল্লির কার্যাবলীর মধ্যে প্রধান (a) ক্রমোসোমের সুরক্ষা এবং (b) নিউক্লিয়াসে যাতায়াতকারী পদার্থসমূহের পরিবহনের নিয়ন্ত্রণ

নিউক্লিওলাস প্রধানত প্রোটিন সংশ্লেষণের নিয়ন্ত্রণ করে। রাইবোসোমীয় RNA (rRNA) ও প্রোটিন সংশ্লেষণে এটি বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকে। mRNA ও rRNA সম্মিলিত ভাবে নিউক্লিয়াসে বৃহদাকার RNA একক হিসাবে সংশ্লেষিত হয় ; এর পরই ইহা নিউক্লিওলাসে বিভক্ত এবং মিথাইল যুক্ত ($+CH_3$) হয়। rRNA এভাবে সংশ্লেষিত হবার পর প্রাথমিক পর্যায়ে (basic) প্রোটিনের সংগে যুক্ত হয়ে নিউক্লিওপ্রোটিন বা রাইবোসোম গঠন

করে, যা নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হয়ে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। অতিরিক্ত আরও কিছু প্রোটিন রাইবোসোমের সংগে যুক্ত হলে ইহা পরিণত রাইবোসোমে রূপান্তরিত হয় এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে সক্রিয় হয়।

ক্রোমোসোম যেসব কাজ করে, তার মধ্যে প্রধান : (a) আর. এন. এ. সংশ্লেষণ, (b) বংশানুক্রমিক ধারাকে বংশ পরম্পরায় পরিচালনা এবং (c) কোষের বিপাকক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ।

কোষের আচরণের কতিপয় বৈশিষ্ট্য
Some Features of the Behaviour of cell

জীবন্ত কোষে যেসব ধর্মের বিকাশ ঘটে তার মধ্যে প্রধান : (a) উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া, (b) পুষ্টিপদার্থের গ্রহণ ও রূপান্তরের মাধ্যমে নূতন জৈব পদার্থের সৃষ্টি বা জৈব শক্তির উৎপাদন এবং (c) কোষবিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির নিয়ন্ত্রণ করে কোষনিউক্লিয়াস এবং তৃতীয়টিকে শুরু করায় সেণ্ট্রিওল। উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া বিশেষভাবে নির্ভর করে কোষের সাইটোপ্লাজমের উপর। সাইটোপ্লাজমের এই ধর্মের উপরই কোষের আচরণ নির্ভরশীল। নিম্নে কোষের আচরণের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হল :

1. **চলন** (Locomotion) : কোষের আচরণের একাধিক বৈশিষ্ট্যের একটি হল চলন। কিছুসংখ্যক আদিম প্রকৃতির কোষে এই বৈশিষ্ট্যের বিকাশ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এককোষী প্রাণী অ্যামিবা, রক্তের নিউট্রোফিল, মনোসাইট প্রভৃতি শ্বেতকণিকা, কোন কোন আর. ই. কোষ (হিস্টিওসাইট, মাইক্রোগ্লিয়া) প্রভৃতিতে এজাতীয় চলন লক্ষ্য করা যায়। কোষের এজাতীয় চলনের বিশেষত্ব হল : চলনের সময় কোষের যে কোন স্থান থেকে একাধিক ক্ষণপদের pseudopodia) আবির্ভাব ঘটে এবং তাদের মধ্যে সর্বাধিক বৃহদাকারের ক্ষণপদটি চলন-কার্যে অংশগ্রহণ করে। কোষের যে পার্শ্বে এসব ক্ষণপদ নির্গত হয় তার বিপরীত পার্শ্বের ক্ষণপদসমূহ তেমনি বিলুপ্ত হয়। বৃহদাকারের ক্ষণপদটি যেদিকে প্রসারিত হয় কোষটিও সেদিকে এগিয়ে যায়। শ্বেতকণিকায় এ ধরনের চলনকে **লিউকোটেক্সিস** (leucotaxis) নামে অভিহিত করা হয়।

পূর্বে পৃষ্ঠটানের দ্বারা কোষের এজাতীয় চলনের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অধুনা সান্দ্রতার পরিবর্তন এবং সোল-জেলের রূপান্তরই (sol-gel transformation) এজাতীয় চলনের জন্য দায়ী বলে যে মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে মোটামুটিভাবে তা সমর্থিত হয়েছে। শেষোক্ত মতবাদের বক্তব্য হল ঃ কোষের যে অংশ ক্ষণপদের সৃষ্টি করে তার কোলয়েড-জেল কোলয়েড-সোলে রূপান্তর লাভ করে। এভাবে সেই অংশের সান্দ্রতা হ্রাসের ফলে বা সেটি অধিকতর তরল হয়ে যাবার ফলে সন্নিহিত কোষঝিল্লিতে চাপ পড়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই তা সামনের দিকে সম্প্রসারিত হয়। সাইটোপ্লাজমে চাপ সৃষ্টির ফলে ক্ষণপদটি আরও সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং কোষটিও সেদিকে অধিকতর গতিশীল হয়ে ওঠে।

3-9 নং চিত্র ঃ শ্বেতকণিকার চলনে সোলজেল মতবাদের ব্যাখ্যা।
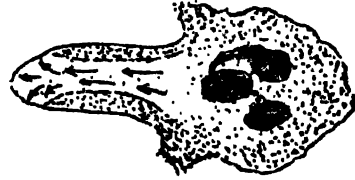
2. **রসায়নগতি** (Chemotaxis) ঃ কোষের প্রতিক্রিয়ার অপর একটি বৈশিষ্ট্য রসায়নগতি বা কেমোটেক্সিস। কোন রাসায়নিক উত্তেজক পদার্থের অভিমুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কোষের অগ্রগমন বা পশ্চাদ্‌গমনকে **রসায়নগতি বা কেমোটেক্সিস** বলা হয়। উত্তেজকপদার্থের অভিমুখে কোষের অগ্রগমনকে ধনাত্মক রসায়নগতি (positive chemotaxis) এবং দূরে সরে যাওয়াকে ঋণাত্মক রসায়নগতি (negative chemotaxis) বলা হয়। মানুষের রক্তের শ্বেতকণিকার মধ্যে এই ধর্মের বিকাশ সর্বাধিক। নিউট্রোফিল শ্বেতকণিকা প্রায় 1 মিলিমিটার দূরত্ব থেকেই উত্তেজক পদার্থের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। ইওসিনোফিলেও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মনোসাইট 25μ বা তারও কম দূরত্ব থেকে রসায়নগতি শুরু করে। উত্তেজক পদার্থ থেকে কোষ যত কাছে থাকে তার গতি তত
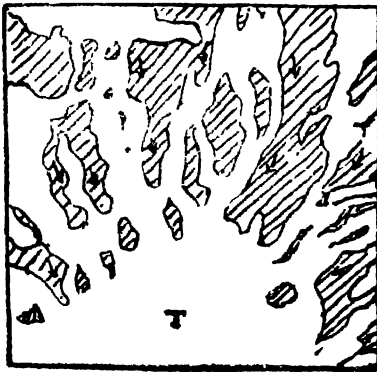
3-10 নং চিত্র ঃ মনোসাইট শ্বেতকণিকার যক্ষ্মারোগের জীবাণুপুঞ্জের (T) দিকে কেন্দ্রাভিমুখী রসায়নগতি।

সরলরেখ হয়। রাসায়নিক উত্তেজক পদার্থের প্রভাবে কিন্তু কোষের গতি বৃদ্ধি পায় না, শুধুমাত্র গতির দিক পরিবর্তন হয়।

বিভিন্ন প্রকার জীবন্ত বা মৃত ব্যাক্টেরিয়া যেসব পদার্থ নিঃসৃত করে তারা ধনাত্মক রাসায়নগতিতে প্রভাব বিস্তার করে। দেখা গেছে ব্যাকটেরিয়া-নিঃসৃত পদার্থটি প্রোটিন বা প্রোটিনলব্ধ পদার্থ হয়। প্রদাহস্থান বা ক্ষতস্থানের কলাকোষ তীব্র রসায়ন-উদ্দীপক (chemotactic) প্রভাব বিস্তার করে। মেনকিন (Menkin) ক্ষতস্থানীয় কলাকোষ থেকে যে পলিপেপটাইড জাতীয় লিউকোটেক্সিন (leucotaxin) পদার্থের নিষ্কাষণ ঘটিয়েছেন তা দেহের ভেতরে ও বাইরে এই উভয় স্থানেই কোষে রসায়নগতি উৎপন্ন করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের পলি-স্যাকারাইড (যেমন—স্টার্চদানা, গ্লাইকোজেন, তুলা) এবং সম্ভবত ক্ষয়রোগের জীবাণুনিঃসৃত পলিস্যাকারাইড কোষের এই ধর্মকে প্রভাবিত করে।

অপর দিকে অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকেট প্রভৃতি কোষে ঋণাত্মক রসায়নগতি প্রদর্শন করে। তবে কি প্রক্রিয়ায় এই রসায়নগতি সম্পন্ন হয় তা সঠিকভাবে জানা সম্ভবপর হয়নি। আবার রসায়নগতির পরই যেমন সব সময় কোষের আগ্রাসন (phagocytosis) লক্ষ্য করা যায় না, তেমনি প্রতি আগ্রাসনের আগেই রসায়নগতিও বাধ্যতামূলক নয়। আগ্রাসন অন্তর্তলীয় আকর্ষবলের (interfacial forces) সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু রসায়নগতির ক্ষেত্রে তা সত্যি নয়।
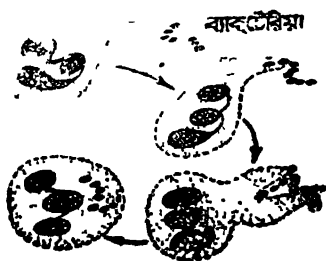
3-11নং চিত্র : নিউট্রোফিল শ্বেতকণিকার আগ্রাসন পদ্ধতি।

উত্তেজক রাসায়নিক পদার্থ না হয়ে আলোর রশ্মি হলে কোষের এজাতীয় আচরণকে ফটোটেক্সিস (phototaxis), উষ্ণতা বা উত্তাপ হলে থার্মোটেক্সিস (thermotaxis), যান্ত্রিক হলে থিগ্‌মোটেক্সিস (thigmotaxis) প্রভৃতি বলা হয়।

3. **আগ্রাসন** (Phagocytosis) : অ্যামিবা ক্ষণপদের দ্বারা যে পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণ করে তাকে **আগ্রাসন** বা **ফ্যাগোসাইটোসিস** বলা হয়। রক্তের শ্বেতকণিকা ও দেহের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত আর. ই. কোষ এই পদ্ধতিতে ব্যাক্টেরিয়া বা রোগবীজাণু, বৃহদাকার অণু প্রভৃতিকে গ্রাস করে এবং কোষমধ্যস্থ এনজাইমের দ্বারা তাদের বিনষ্ট করে।

রক্তের শ্বেতকণিকার মধ্যে নিউট্রোফিল ও মনোসাইটের মধ্যে এই ধর্মের বিকাশ সর্বাধিক। ইওসিনোফিল আগ্রাসক হলেও এটি তার প্রধান কার্যের মধ্যে পড়ে না। এছাড়া কুপ্‌ফার সেল (kupfer cell), হিস্‌টিওসাইট, মাইক্রোগ্লিয়া প্রভৃতি আর. ই. কোষ আগ্রাসক কোষ। কুপ্‌ফার সেল যকৃতে, হিস্‌টিওসাইট সংযোগরক্ষাকারী কলায় এবং মাইক্রোগ্লিয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া অস্থিমজ্জা, প্লীহা, লসিকাগ্রন্থি প্রভৃতিস্থিত আর. ই. কোষও আগ্রাসক হয়।

রক্তের কোন কোন প্রোটিন আগ্রাসনক্রিয়াকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে তোলে। এদের **ওপ্‌সোনিন** (opsonin) নামে অভিহিত করা হয়। ওপসোনিনের সক্রিয়তা সম্ভবত ভৌতধর্মী, কারণ সাধারণত এরা নির্দিষ্ট ধরনের অ্যান্টিবডি এবং ব্যাক্‌টেরিয়ার উপরিতলে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির যে স্তূপ (aggregates) গঠন করে তার ফলেই ব্যাক্‌টেরিয়ার প্রতি শ্বেতকণিকা অধিকতর আগ্রাসী হয়ে ওঠে।

এছাড়া যে সমস্ত বিপাকজাত বর্জ্য পদার্থ সাইটোপ্লাজমে জমা হয়, এধরনের কোষ তাদের **বিপরীত আগ্রাসন** (reverse phagocytosis) পদ্ধতিতে নিঃসৃত করে।

4. **পিনোসাইটোসিস** (pinocytosis): রক্তের শ্বেতকণিকা, ক্ষুদ্রান্ত্রের আবরণী কোষ, অস্থির ওস্‌টিওক্লাস্ট কোষ এবং দেহের অন্যান্য কিছু কোষ এই

3-12নং চিত্র ঃ পিনোসাইটোসিস পদ্ধতি।

পদ্ধতিতে কোন কোন পদার্থকে কোষের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। পদার্থটি কোষ-ঝিল্লীর সংস্পর্শে এলেই কোষঝিল্লি বেলুনের মত ভেতরের দিকে ঢুকে যায়। পদার্থের চারিপাশে কোষঝিল্লি যে আবরণ সৃষ্টি করে তা ক্ষুদ্র ভ্যাকুওলের (vacuole) আকারে ঝিল্লি থেকে আলাদা হয়ে সাইটোপ্লাজমে ভাসতে থাকে। এই পদ্ধতিকে **পিনোসাইটোসিস** বলা হয়।

পিনোসাইটোসিসের বিপরীত প্রক্রিয়াকে **বিপরীত পিনোসাইটোসিস** (reverse pinocytosis) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দানা বা ভ্যাকুওলের উপরিতলীয় ঝিল্লি কোষ-ঝিল্লির সংগে একীভূত হয় এবং একীভূত অংশ বিদীর্ণ

হয়ে পদার্থ বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। কোষঝিল্লি এভাবে অক্ষত থেকে যায়। অধিকতর বৃহদাকারের অণুসমূহকে একই পদ্ধতিতে গ্রহণ করার নাম **রফিও-সাইটোসিস** (rhopheocytosis)।

5. **পডোসাইটোসিস** (Podocytosis) **:** বৃক্কের রেচননালিকা এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের আবরণীকোষে এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। কলাকোষ এই পদ্ধতিতে পদার্থের দানাকে গ্রাস করে সাইটোপ্লাজমে নিয়ে যায়। কিন্তু দানাকে বেষ্টনকারী ভ্যাকুওল কোষকে অতিক্রম করে একই কোষের অন্যতলে নিক্ষিপ্ত হয়।

কোষবিভাজন
CELL DIVISION

যে প্রক্রিয়াতে মাতৃকোষ থেকে নূতন নূতন কোষের জন্ম হয়, তাকে **কোষ-বিভাজন** বলে। ভ্রূণাবস্থায় এবং ক্রমবর্ধশীল দেহে কোষবিভাজন সর্বাধিক। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ইহা হ্রাস পায়; শুধুমাত্র যেসব অংগ-প্রতংগ কোন কারণবশতঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কোষবিভাজনেই তার মেরামতি চলে। পরিণত বয়সে স্নায়ুকোষের কোষবিভাজন হয় না। তাই কোন স্নায়ুকোষ বিনষ্ট হলে তার প্রতিস্থাপন সম্ভব হয় না। **কলচিসিন** (colchicine) নামক একপ্রকার ওষুধের প্রয়োগে কোষবিভাজন-প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভবপর, কারণ এই ওষুধটি কোষবিভাজনকে মেটাফেজ নামক দশায় থামিয়ে দেয়। কোষবিভাজনের মধ্যবর্তী দীর্ঘ অবকাশকে অন্তর্দশা (interphase) বলা হয়।

কোষবিভাজনকে প্রধানত দুভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় **:** (a) **প্রত্যক্ষ কোষবিভাজন** এবং (b) **পরোক্ষ কোষবিভাজন**। প্রত্যক্ষ কোষবিভাজনে নিউক্লিয়াস ও কোষদেহ সাধারণভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়। নিউক্লিয়াসে প্রথমে কুঞ্চন দেখা দেয়, এরপরই ইহা দ্বিখণ্ডিত হয়। **ফ্লেমিং** এর মতে এটি এক ধরনের অপজননমূলক ঘটনা, কারণ রোগগ্রস্ত কলাকোষে প্রায়ই এধরনের কোষবিভাজন লক্ষ্য করা যায়। শ্বেতকণিকায়ও এই ধরনের কোষবিভাজন দেখা যায়। **নভিকোফ** (Nowikoff) এধরনের কোষবিভাজন বিভিন্নপ্রকার সংযোগরক্ষাকারী কলায় লক্ষ্য করেছেন। এছাড়া যেসব প্রাণীতে ক্রোমোসোম সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়, তাদের মধ্যে এজাতীয় কোষবিভাজন দেখা যায়।

পরোক্ষ কোষবিভাজনে নিউক্লিয়াসে জটিলতর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে ইহা দুটো নূতন নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয়। পরোক্ষ কোষবিভাজনকে

আবার দ্বু ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় যথা, (1) মাইটোসিস (mitosis) এবং (4) মিওসিস (meiosis)

1. **মাইটোসিস :** মাইটোসিস একটি পরোক্ষ প্রক্রিয়া। কোষের উপকরণের সুন্দর ও সুশৃংখল বিভাজনই এই প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ দেহকোষই এই প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে নূতন কোষের জন্ম দেয়। মাইটোসিস স্বাভাবিকভাবে নিউক্লিয়াসের বিভাজন (karyokinesis) এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজনের (cytokinesis) সমন্বয়ে গঠিত। দুটো পদ্ধতিই অনেকটা স্বাধীন পদ্ধতি। সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ছাড়া শুধুমাত্র নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটলে **একাধিক নিউক্লিয়াসসম্পন্ন** কোষের জন্ম হয়। আবার নিউক্লিয়াসের বিভাজন ব্যতিরেকে সাধারণত সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয় না। তাছাড়া মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন নবজাত কোষে মাতৃকোষের মত ক্রোমোসোমের স্থানান্তর ঘটে। দেখা গেছে, মাইটোসিসের সময় কোষের স্বাভাবিক সক্রিয়তা মন্দীভূত হয়।

মাইটোসিস প্রক্রিয়াকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে চারটি দশার বর্ণনা দেওয়া হল।

(a **প্রথম দশা বা প্রফেজ** (Prophase) : এই দশার স্থায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। এক ঘণ্টা থেকে কয়েক ঘণ্টা। এই দশায় প্রথমে নিউক্লিয়ঝিল্লির অবলুপ্তি ঘটে। ক্রোমোসোমগুলো পরস্পর থেকে আলাদা ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেনট্রোসোমের সেণ্ট্রিওল দুটো বিপরীত মেরুর দিকে ধাবিত হয় (3-13 নং চিত্র)

(b) **দ্বিতীয় দশা বা মেটাফেজ** (Metaphase) : এই দশাতে ক্রোমোসোমগুলো কোষের বিষুবরেখায় জড়ো হয় এবং লম্বভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমাটিড গঠন করে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সেণ্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রমাটিডগুলো সেণ্ট্রোমিয়ারের সংগে যুক্ত থাকে। শুধুমাত্র সেণ্ট্রোমিয়ারেই স্পিনডলতন্তু সংযুক্ত হতে পারে।

(c) **তৃতীয় দশা বা অ্যানাফেজ** (Anaphase) : এই দশায় ক্রমাটিডগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কোষের উভয় মেরুর দিকে অগ্রসর হয়। প্রতিটি ক্রমোসোমের সেণ্ট্রোমিয়ার এই দশাতেই বিভক্ত হওয়ায় ক্রমাটিডগুলো সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং সংযুক্তবিন্দুতেই পৃথক হয়ে উভয় মেরুর দিকে এমনভাবে অগ্রসর হয় যাতে মনে হয় স্পিণ্ডলতন্তু যেন

তাদের মের‍ুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন ক্রমাটিডগ‍ুলো নবজাত কোষের ক্রোমোসোম স‍ৃষ্টির জন্য দায়ী।
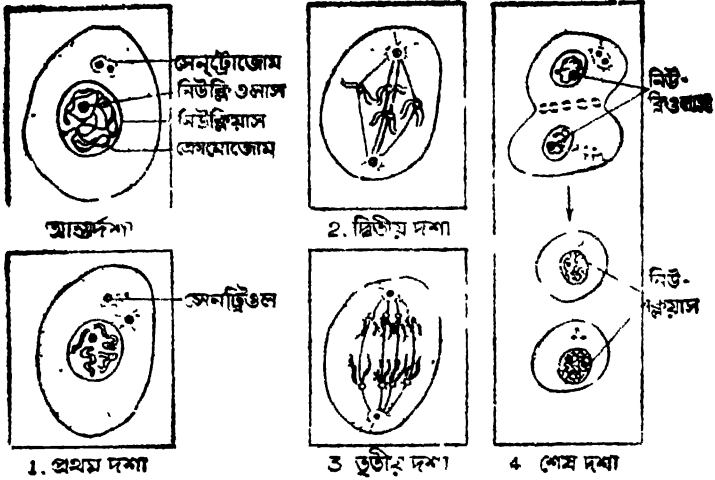
3-13 নং চিত্র : মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষবিভাজন।

(d) **শেষ দশা বা টেলোফেজ** (Telophase) : শেষ দশায় দ‍ুদল ক্রোমোসোমকে ঘিরে ধীরে ধীরে নিউক্লিয়ঝিল্লি ও নিউক্লিওলাসের আবির্ভাব ঘটে। স্পিণ্ডেল ধীরে ধীরে অদৃশ্য ও তরলীভূত হয়। সেন্‌ট্রিওল দ‍ুপ্রান্তে সেনট্রসোমে মিলিত হয়। ক্রোমোনেমার চারিপাশের ভিত্তিপদার্থ বা মেট্রিক্স অদৃশ্য হয় এবং এভাবেই নিউক্লিয়াসের বিভাজন সমাপ্ত হয়।

নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পর সাইটোপ্লাজমের বিভাজন শ‍ুর‍ু হয়। বিষুব অঞ্চলে প্রথমে খাঁজের স‍ৃষ্টি হয় এবং ইহা ভেতরের দিকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়। সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে স্পিণ্ডেল কিছ‍ুটা নিয়ন্ত্রণ করে। দেখা গেছে, অ্যানাফেজের প‍ূর্বে স্পিণ্ডেলের অপসারণে সাইটোকাইনেসিস বা সাইটোপ্লাজমের বিভাজন থেমে যায়।

সাইটোপ্লাজমের বিভাজনের সময় সাইটোপ্লাজমস্থিত উপাদানের বণ্টন স‍ুসম হয় না। যেমন, বিভাজনের পর কোন একটি নবজাত কোষে হয়ত 120টি মাইটোকন্‌ড্রিয়া ও অন্যটিতে 60টি মাইটোকন্‌ড্রিয়া স্থানান্তরিত হয়। অবশ্য এর থেকে নবজাত কোষে সামান্যই প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

2. **মিওসিস** (Meiosis) : ডিম্বাণ‍ু ও শ‍ুক্রাণ‍ু এই উভয়প্রকার যৌন-

কোষের বিভাজন-প্রক্রিয়াকে মিওসিস বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় নবজাত ডিম্বকোষে 22টি দেহ-ক্রোমোসোম এবং একটিমাত্র X ক্রোমোসোমের স্থানান্তর ঘটে, তেমনি নবজাত শুক্রকোষেও 22টি দেহ-ক্রোমোসোম ও একটি মাত্র X অথবা Y ক্রোমোসোম স্থানান্তরিত হয়। অবশ্য ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে যে জাইগোটের (zygote) সৃষ্টি হয়, তাতে মোট 23 জোড়া ক্রোমোসোমেরই পুনঃস্থাপন ঘটে।
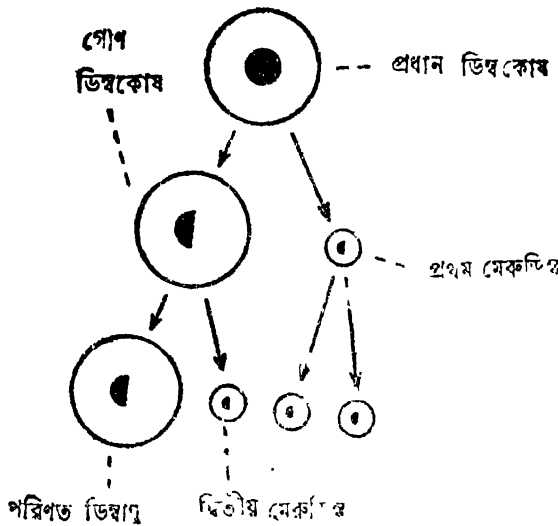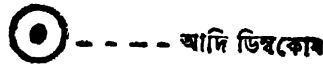
3-1। নং চিত্র ঃ ডিম্বাণুর হ্রসীবিভাজন।

মিওসিসকে **হ্রসীকরণ বিভাজনও** বলা হয়। মিওসিসকে দুভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ প্রথম বিভাজন ও দ্বিতীয় বিভাজন। প্রথম বিভাজনের সময় মাতৃকোষের (parent cell) 23 জোড়া ক্রোমোসোমের 23টি (22+যৌন ক্রোমোসোম) দুটো নূতন কোষে স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় বিভাজন মাইটোসিস

কোষবিভাজনের মত। প্রথম বিভাজনে উৎপন্ন কোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সমসংখ্যক ক্রোমোসোমসম্পন্ন (হ্রসীকৃত) চারটি নবজাত কোষে বিভক্ত হয়।

মানব দেহের মৌলিক কলা

ELEMENTARY TISSUES OF THE HUMAN BODY

মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের কোষ বিভিন্ন জৈবিক কার্যে নিয়োজিত রয়েছে। তবে সদৃশ কোষকে সমষ্টিগতভাবে একই প্রকার জৈবিক কার্য সম্পন্ন করতে দেখা যায়। যেসব কোষের গঠন এক, যারা দেহের মধ্যে একই সংগে অবস্থান করে এবং একই জৈবিক কার্য সম্পন্ন করে, দলগতভাবে তাদের **কলা** বলা হয় এক্টোডার্ম (ectoderm), মেসোডার্ম (mesoderm) এবং এন্ডোডার্ম (endoderm)-এই তিনটি ভ্রূণস্তর থেকে দেহের সবরকম কলাকোষ উৎপন্ন হয় বিভিন্ন কলার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র। বিভিন্ন তন্ত্রের সমন্বয়ে মানবদেহ গঠিত।

মানবদেহে প্রধানত চারপ্রকার কলার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। যথা : (1) আবরণী কলা (epithelial tissue), (2) সংযোগী কলা (connective tissue), (3 পেশী কলা (muscular tissue) এবং (4) স্নায়ুকলা (nervous tissue)।

1. আবরণী কলা (Epithelial Tissue) **:** আবরণী কলা দেহের মুক্ত অংশকে ঢেকে রাখে। এই কলা একস্তর বা বহুস্তরবিশিষ্ট হতে পারে। আবরণী কলার কোষগুলি ঘন সন্নিবেশিত হয় কোষমধ্যস্থ ভিত্তিপদার্থ (cement substance) যথেষ্ট কম। বুনিয়াদ ঝিল্লির (basement membrane) উপর এই কোষগুলো সজ্জিত থাকে। ভিত্তিপদার্থ একপ্রকার মিউকোপ্রোটিন (mucoprotein), যার মধ্যে ক্যাল্‌সিয়াম সল্ট এবং হায়ালুরোনিক অ্যাসিড (hyaluronic acid) রয়েছে। আবরণী কলা যেসব কার্য সম্পন্ন করে তার মধ্যে প্রধান শোষণ, ক্ষরণ, রেচন এবং মুক্ত অংশের সুরক্ষা।

2. সংযোগী কলা (Connective Tissue) **:** দেহের আকৃতি, দেহের যোগাযোগ ব্যবস্থা, দেহভার বহন ইত্যাদির সংগে জড়িত কলাকে সংযোগী কলা বলা হয়। যেমন : অস্থি, তরুণাস্থি, স্থিতিস্থাপক কলা, তন্তুজাতীয় কলা, চর্বিকলা ইত্যাদি এই শ্রেণীর পর্যায় ভুক্ত। সংযোগরক্ষাকারী কলায় ভিত্তি-

পদার্থের প্রাচুর্য রয়েছে। এই ভিত্তিপদার্থে বিভিন্ন তন্তুজাতীয় উপাদান পরিলক্ষিত হয়। সংযোগী কলা মেসোডার্ম ভ্রূণস্তর থেকে উৎপন্ন হয়। এই কলা যেসব কার্য সম্পাদন করে তার মধ্যে প্রধান : (a) দেহের আকৃতিদান, (b) আঘাত থেকে দেহকে রক্ষা করা, (c) দেহভার বহন করা, (d) উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা, (e) দেহের স্থিতিস্থাপকতায় অংশগ্রহণ করা এবং (f) দেহের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা ইত্যাদি।

3. **পেশীকলা** (Muscular Tissue) : দেহের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগের নড়াচড়ার জন্য দায়ী কলাকে পেশীকলা বলা হয়। উদ্দীপনা পেলে পেশীতে যে টান (tension) বৃদ্ধি পায়, তার বিরুদ্ধে (বোঝা অধিক না হলে) সংকুচিত হয়ে পেশী যান্ত্রিক কার্য সম্পাদন করে। পেশীতে পর্যায়ক্রমে টান বৃদ্ধি পায় এবং তা ভারের উপযোগী হয়ে ওঠে। সংকোচনেব সংগে পেশীর দৈর্ঘ্য-হ্রাসের সম্পর্ক থাকলে টান ভার ও গতিবেগের সমতুল্য হয। পেশীর সক্রিয়তা নির্ভর করে শক্তি-সরবরাহের উপর, যে শক্তির আধার কার্বহাইড্রেটজাতীয় পদার্থ। পেশীকলা সাধারণত পেশীকোষ (পেশীতন্তু) ও শিথিল কোষযুক্ত অ্যারিওলীয় (areolar) কলা নিয়ে গঠিত। মানবদেহে তিন শ্রেণীর পেশীকলার অস্তিত্ব রয়েছে। যথা : (1) ঐচ্ছিক, (2) অনৈচ্ছিক এবং (3) হৃৎকলা।

4. **স্নায়ুকলা** (Nervous Tissue) : স্নায়ুকলা দেহের বিভিন্ন অংশে সংবাদ আদান-প্রদান, উদ্দীপনার পরিবহন, গ্রহণ ও সমন্বয়সাধনে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। স্নায়ুতন্তু স্নায়ুকলা দ্বারা গঠিত। এই কলা শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট স্নায়ুকোষ, স্নায়ুতন্তু এবং নিউরোগ্লিয়া কোষ নিয়ে গঠিত।

দেহকলার বিশদ বিবরণ

DESCRIPTION OF TISSUES IN DETAIL

পেশীকলার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে যথাস্থান সংযোজিত হয়েছে স্নায়ুকলার বিবরণ শারীরবিজ্ঞান দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র আবরণী কলা ও সংযোগী কলার বিবরণ বিশদভাবে সন্নিবেশিত হল।

আবরণী কলা

Epithelial Tissue

আবরণী কলাকে প্রধানত দুভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। যথা : (1) সরল

আবরণী কলা (simple epithelial tissue) এবং (2) যৌগিক আবরণী কলা (compound epithelial tissue)।

1. সরল আবরণী কলা (Simple Epithelial Tissue) **:** সরল আবরণী কলা একটি মাত্র ঘনসন্নিবিষ্ট কোষস্তর নিয়ে গঠিত। একে আবার 5 ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : (a) আচ্ছাদক কলা (pavement epithelium), (b) ঘনতলীয় আবরণী কলা (cubical epithelium), (c) স্তম্ভাকার আবরণী কলা (columnar epithelium), (d) কেশাকার আবরণী কলা (ciliated epithelium) এবং (e) গ্রন্থিময় আবরণী কলা (glandular epithelium)।

1. (a) আচ্ছাদক কলা (Pavement Epithelium) **:** এই কলা একস্তরবিশিষ্ট। সূক্ষ্ম বনিয়াদ ঝিল্লির (basement membrane) উপর সজ্জিত কোষগুলো বৃহদাকার এবং চেপ্টা হয়। নিউক্লিয়াস কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং ইহা ডিম্বাকৃতি। (3-15 নং চিত্র)।
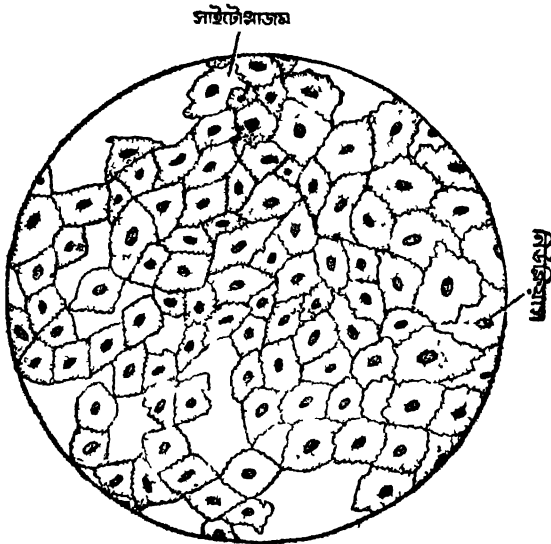
3-15 নং চিত্র : আচ্ছাদক আবরণী কলা

অবস্থান : ফুসফুসী বায়ুস্থলী (alveoli), প্লুরা (pleura), পেরিটনিয়াম (peritonium) প্রভৃতি সেরাস ঝিল্লি, হৃৎপিণ্ডের অন্তরাবরণী ঝিল্লি, কর্নিয়ার পশ্চাৎঝিল্লি, টিম্প্যানিক পর্দার (tympanic membrane) ভেতরের পৃষ্ঠতলীয় ঝিল্লি, বাওম্যানের ক্যাপসুল (Bowman's capsule) ও হেন্‌লির

লুপের (Henle's loop) সেরাসঝিল্লি, রক্তনালী ও লসিকানালীর আচ্ছাদক কলা ইত্যাদি।

কার্যাবলী : (i) তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের আদান-প্রদানে সহায়তা করা, (ii) ঝিল্লিবিশ্লেষণ ও পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করা এবং (iii) ক্ষরণক্রিয়ায় সহায়তা করা ইত্যাদি।

1 b). ঘনতলীয় আবরণী কলা : একস্তর ঘনতলবিশিষ্ট কোষ নিয়ে এই কলা গঠিত। কোষগুলি বনিয়াদঝিল্লির উপর সজ্জিত থাকে।

অবস্থান : লালাগ্রন্থি, থাইরোয়েড গ্রন্থি, পাচক গ্রন্থি প্রভৃতির অন্তঃস্থ ঝিল্লি, ডিম্বাশয়ের আবরক ঝিল্লি, ক্লোমপ্রশাখা (terminal brochioles) প্রভৃতি।

কার্যাবলী : ক্ষরণ, সুরক্ষা ইত্যাদি ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

1(c). স্তম্ভাকার আবরণী কলা : স্তম্ভাকার কলার কোষগুলো লম্বাটে ধরনের। এরা সাধারণত একস্তরবিশিষ্ট হয় এবং বনিয়াদঝিল্লি বা বেসমেণ্ট পর্দার উপর সজ্জিত থাকে। (3-16নং চিত্র)।
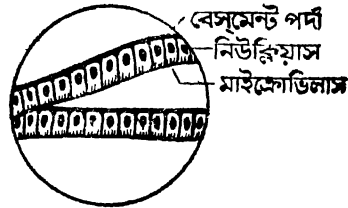
3-16 নং চিত্র : স্তম্ভাকার আবরণী কলা।

অবস্থান : পাকস্থলী, সমগ্র ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র, গ্রন্থিনালী, গ্রন্থিথলী প্রভৃতি রূপান্তরিত নাতিদীর্ঘ স্তম্ভাকার কলা বৃক্কের (kidney) কোন কোন অংশে এবং ডিম্বাশয়ে দেখতে পাওয়া যায়। নেফ্রোনের পরসংবর্ত নালিকা ও পৌষ্টিকনালীতে এই জাতীয় কলার মুক্ত প্রান্তদেশে মাইক্রোভিলাস (microvilli) বা অনুলোম দেখতে পাওয়া যায়। বৃহদন্ত্রে আর এক প্রকার স্তম্ভাকৃতি কলা দেখতে পাওয়া যায়, যারা শ্লেষ্মাক্ষরণ করে। এদের গোবলেট (goblet) কোষ বলা হয়। শ্লেষ্মাক্ষরণকারী গোবলেট কোষে মাইক্রোভিলাস অনুপস্থিত থাকে।

কার্যাবলী : স্তম্ভাকৃতি আবরণী কলার দুটো প্রধান কার্য হল : (a) শোষণ এবং (b) ক্ষরণ। গোবলেট কোষ শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে।

1(d). কেশাকার আবরণী কলা : এই কলার কোষগুলো সচরাচর স্তম্ভাকৃতি, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ঘনতলীয়। কোষগুলো একস্তরবিশিষ্ট এবং বনিয়াদ ঝিল্লির উপর সজ্জিত। প্রতিটি কোষের মুক্তপ্রান্তে কেশাকৃতি

20 থেকে 30টি সিলিয়াম (cillia) বা বহিরুদ্‌গম থাকে। সিলিয়ামগুলো কোষপ্রান্তের বেসাল কণিকার (basal particles) সংগে যুক্ত থাকে। এই বেসাল কণিকাকে ভেদ করে প্রতিটি সিলিয়াম্ সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং সূক্ষ্ম উল্লম্ব শিকড় (rootlets) সৃষ্টি করে।
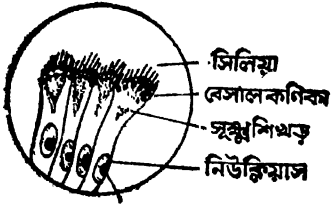
3-17 নং চিত্র : কেশাকার আবরণী কলা।

অবস্থান : শেষপ্রান্ত ছাড়া শ্বাসনালীর সর্বত্রই এজাতীয় কলা বিদ্যমান। শ্বাসনালীতে কেশাকার আবরণী-কলার দুটোস্তর রয়েছে। একে ছদ্ম-স্তরীভূত স্তম্ভকেশাকার আবরণী কলা (pseudo stratified columnar ciliated epithelium) নামে অভিহিত করা যায়। ফেলোপিয়ান নালী, শুক্রাশয়ের বহির্মুখী নালী ও জরায়ুর বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এই কলা ছড়িয়ে আছে। এছাড়া মেরুদণ্ডের কেন্দ্রীয় নালী (central canal) ও কেন্দ্রীয় প্রণালী (central aqueduct) এবং মস্তিষ্ক-গহ্বরের ঝিল্লিস্তর কেশাকার আবরণী কলা দ্বারা গঠিত।

কার্যাবলী : কেশাকার আবরণী কলার সিলিয়াম অনবরত চলনশীল। এই ধর্মের জন্য এরা শ্লেষ্মানিলম্বিত কণা ইত্যাদিকে একটা নির্দিষ্ট দিকে ঠেলে দেয়। শ্বাসনালীতে এরা বিজাতীয় কণা (foregin particles), ব্যাক্‌টেরিয়া, শ্লেষ্মা প্রভৃতিকে প্রতি মিনিটে 1 থেকে 2 সেন্টিমিটার গতিতে বাইরের দিকে ঠেলে দিতে পারে। মস্তিষ্কমেরুরসকে গতিশীল রাখতে এরা সহায়তা করে। ফেলোপিয়ান নালীতে সিলিয়ামের চলন ডিম্বাণুকে জরায়ুর দিকে ঠেলে দেয়।

1(e). গ্রন্থিময় কলা : একস্তরবিশিষ্ট এই কলার কোষগুলো সাধারণত ঘনতলাকৃতি, নাতিদীর্ঘ স্তম্ভাকৃতি অথবা বহুতলীয় হয়। লালাগ্রন্থিতে এই কলার আরও একটি অসম্পূর্ণ স্তর দেখতে পাওয়া যায়। বনিয়াদ ঝিল্লির উপরে এই কোষগুলি সজ্জিত থাকে।

অবস্থান : মাতৃস্তন, স্বেদগ্রন্থি, সেবাসিয়াস গ্রন্থি (sebaceous) ইত্যাদির নলীস্থ কোন কোন অংশ, থাইরোয়েডের গ্রন্থিথলীতে (alveolus), ক্ষুদ্রান্ত্রীয় গ্রন্থিতে এবং লালাগ্রন্থিতে এজাতীয় গ্রন্থিময় কলার অস্তিত্ব রয়েছে।

কার্যাবলী : গ্রন্থিরসের বিভিন্ন উপাদানের সংশ্লেষণ ও ক্ষরণের জন্য

এজাতীয় কলা বিশেষভাবে দায়ী। কার্যপ্রণালী অনুযায়ী গ্রন্থিময় কলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে। যথা ঃ (i) **অ্যাপোক্রিন** (apocrine), (ii) **হলোক্রিন** (holocrine) এবং (iii) **মেরোক্রিন** (merocrine)।

অ্যাপোক্রিন গ্রন্থিকলা মাতৃস্তনে বিশেষভাবে দেখা যায়। এই কলার বহিরংশে ক্ষরিত পদার্থ জমা হয়। এই অংশটি ধীরে ধীরে ফুলে ওঠে এবং বিদীর্ণ হয়। এতে কোষের অন্যান্য অংশের কোন ক্ষতি হয় না। এই প্রক্রিয়াটি পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন হয়।

হলোক্রিন-প্রক্রিয়া প্রধানত সেবাসিয়াস গ্রন্থিতে দেখা যায়। ক্ষরিত পদার্থ কোষের মধ্যেই জমা হয়। কোষ অবশেষে বিনষ্ট হয় এবং গ্রন্থিরস নিঃসৃত হয়। বিনষ্ট কোষের স্থানে নূতন কোষের জন্ম হয়।

মেরোক্রিন প্রক্রিয়া প্রধানত পাচকগ্রন্থি এবং অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে দেখতে পাওয়া যায়। কোষের অভ্যন্তরে বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। গ্রান্থরস কোষঝিল্লির মধ্য দিয়েই নিঃসৃত হয়।

2. **যৌগিক আবরণী কলা ঃ** (Compound Epithelial Tissue) এজাতীয় আববণী কলা একাধিক স্তরবিশিষ্ট হয়। যৌগিক আবরণী কলাকে 5 ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা ঃ (a) পরিবর্তনসূচক আবরণী কলা (transitional epithelium), (b) স্তরীভূত আচ্ছাদক কঠিন আবরণী কলা (stratified squamous cornified epithelium), (c) স্তরীভূত আচ্ছাদক অকঠিন আবরণী কলা (stratified squamous noncornified epithelium), (d) স্তরীভূত স্তম্ভাকার আবরণী কলা (stratified columnar epithelium) এবং (e) স্তরীভূত স্তম্ভকেশাকার আবরণী কলা (stratified columnar ciliated epithelium)

2(a). পরিবর্তন সূচক আবরণী কলা ঃ তিন থেকে চারটি কোষস্তর নিয়ে এই কলা গঠিত। উপরিতলের কোষগুলো প্রধানত বৃহদাকার, চেপ্টা

3-14নং চিত্র

এবং অনিয়মিতভাবে চতুর্ভুজাকৃতি। এ ধরনের কোষগুলিতে প্রায় দুটি করে নিউক্লিয়াস দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তী স্তরের কোষগুলি সূঁচালো

ত্রিভুজাকৃতি (pyriform)। উপরের বাঁকা অংশ পূর্ববর্তী কোষস্তরের আনত তলে এঁটে থাকে। পরবর্তী একক বা একাধিক স্তরের কোষগুলো বহুতলীয়।

অবস্থান ঃ এ জাতীয় কলা মূত্রনালীর উর্ধ্বাংশ, মূত্রাশয়, গবিনি, বৃক্কের বস্তিদেশ (palvis of the kidney) প্রভৃতিতে দেখতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী ঃ এরা (i) রেচিত পদার্থের পুনর্বিশোষণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, (ii) সুরক্ষায় অংশগ্রহণ করে, (iii) রক্ত ও কলারস থেকে মূত্রে যে অধিক তরলপদার্থ নির্গত হতে চায় তাতে বাধা সৃষ্টি করে।

2(b). **স্তরীভূত আচ্ছাদক কঠিন আবরণী কলা ঃ** বহু কোষস্তর নিয়ে এই কলা গঠিত। কেরাটিনজাতীয় পদার্থ জমা হওয়ার ফলে এজাতীয় কলার উপরিস্তর কঠিন আকার ধারণ করে। পরবর্তী স্তরের কোষগুলো পিষ্ট হয়ে চেপ্টা আকৃতিবিশিষ্ট হয়। এর পরের কোষগুলো অনেকটা বহুতলীয়। নাতিদীর্ঘ স্তম্ভাকৃতি কলার প্রাধান্য এর পরের স্তরে পরিলক্ষিত হয়। গভীরের এই কোষগুলো কাঁটার মত প্রোটোপ্লাজমীয় এবং কোষমধ্যকার তন্তু দ্বারা পরস্পরের সংগে সংযুক্ত থাকে। এই কণ্টকাকীর্ণ আকৃতির জন্য এজাতীয় কোষগুলোকে **কণ্টক কোষ** (prickle cells) বলা হয়। উপরিতলের কোষগুলি অনবরত বিনষ্ট হয় এবং তার স্থান দখল করে নিম্ন স্তরের কোষগুলি।

অবস্থান ঃ ত্বকে এজাতীয় কলার প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। কেশ, নখ, দাঁতের এনামেল (·enamel) ইত্যাদিতে এজাতীয় কলার রূপান্তর ঘটে।

কার্যাবলী ঃ দেহের যেসব স্থান আবহমণ্ডল, ঘর্ষণ, যান্ত্রিক চাপ, আঘাত ইত্যাদির সংস্পর্শে আসে তাদের রক্ষা করার কাজে এ জাতীয় কলা ব্যাপৃত থাকে।

2(c). **স্তরীভূত আচ্ছাদক অকঠিন আবরণী কলা ঃ** এজাতীয় কলায় উপরিস্তরে কেরাটিনজাতীয় পদার্থ অনুপস্থিত থাকে। এছাড়া অন্যান্য গঠন পূর্ববর্তী কলার মতই।

অবস্থান ঃ এই কলা কর্নিয়া, স্বর-রজ্জু (vocal cord), গ্রাসনালী, গলবিল (pharynx), মুখগহ্বর, মলনালী, মূত্রনালীর নিম্নাংশ, যোনিনালী, যোনিদেশ প্রভৃতিতে দেখা যায়।

কার্যাবলী ঃ এরা যান্ত্রিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কার্যে অংশগ্রহণ করে।

2(d). **স্তরীভূত স্তম্ভাকার আবরণী কলা ঃ** এজাতীয় কলা খুবই বিরল। দেহের সীমিত স্থানে এদের দেখতে পাওয়া যায়। **যথা ঃ** আলজিব,

(epiglottis), গলবিল, মলদ্বারের শ্লেষ্মাঝিল্লি, পুরুষের মূত্রনালীর প্রশস্ত অংশ (cavernous parts) ইত্যাদি। এই কলার উপরিতলের কোষগুলো স্তম্ভাকৃতি এবং বৃহদাকৃতি, নিম্নস্তরের কোষগুলি ক্ষুদ্র এবং নাতিদীর্ঘ।
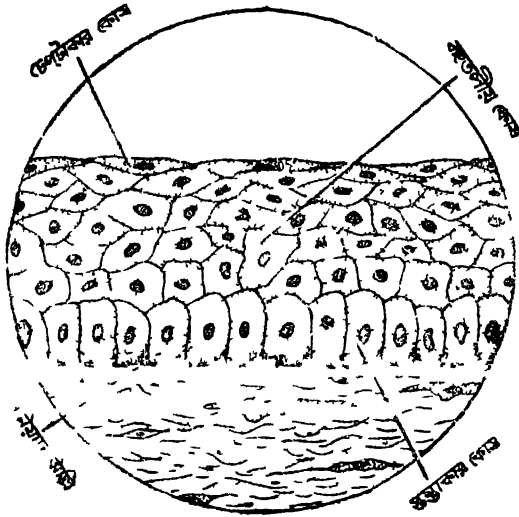
3-19নং চিত্র : স্তরীভূত অকঠিন আবরণী কলা।

কার্যাবলী : যান্ত্রিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে দেহাংগকে রক্ষা করা।

স্তরীভূত স্তম্ভকোশাকার আবরণী কলা : এ জাতীয় কলাও দেহের সামান্য অংশে দেখতে পাওয়া যায়। বাগ্‌যন্ত্রের কোন কোন অংশ এবং নাসিকাতলের কোন কোন অংশে এদের দেখা যায়।

সংযোগী কলা

Connective Tissue

সংযোগী কলাকে প্রধানত নটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : (1) কংকাল বা অস্থি (bone), (2) তরুণাস্থি (cartilage), (3) জালকাকৃতি কলা (reticular tissue , (4) হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক কলা (yellow elastic tissue), (5) শ্বেততন্তু কলা (white fibrous tissue), (6) অ্যারিওলার কলা (areolar tissue), (7) চর্বি কলা (adipose tissue), (8) লসিকাকলা (lymphoid tissue) এবং (9) জেলীসদৃশ কলা (jelly like tissue)। এছাড়া রক্তকোষকেও বিশেষ ধরনের সংযোগী কলার পর্যায়ে ফেলা হয়। এর বিস্তৃত বিবরণ পরে আলোচিত হয়েছে।

1. **অস্থি** (Bone) **:** অস্থি দেহের কঠিনতম **কলা**। **অস্থিকোষ এবং** ক্যাল্‌সিয়ামের লবণযুক্ত ভিত্তিপদার্থ নিয়ে **এই** কলা গঠিত। অস্থিকোষ তিন প্রকারের **:** (a) **ওস্‌টিওক্লাস্ট** (osteoclasts), (b) **ওস্‌টিওব্লাস্ট** (osteoblasts) এবং (c) **ওস্‌টিওসাইট** (osteocytes)। প্রথম প্রকারের অস্থিকোষ পিনো-সাইটিক কোষ হিসাবে পরিচিত এবং সম্ভবত ইহা প্রোটিনবিশ্লিষ্টকারী এনজাইম ক্ষরণ করে, যা অস্থিকলাকে দ্রবীভূত হতে সহায়তা করে। অস্থির বৃদ্ধি ও পুনর্বিন্যাসে ইহা সহায়তা করে। তাছাড়া অস্থির বিনাশসাধনেও ইহা অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় প্রকারের কোষে অ্যাল্‌কালাইন **ফস্‌ফাটেজ** (phosphatase) নামক এনজাইমের প্রাচুর্য রয়েছে। এন্‌জাইম ক্যালসিয়াম লবণের সঞ্চয়ে সহায়ক। তৃতীয় প্রকার কোষ জৈব মেট্রিক্সে নিহিত থাকে। এর কোনপ্রকার সংশ্লেষণকার্য লক্ষ্য করা যায় না এরা রূপান্তরিত ওস্টিওব্লাস্ট কোষ। অস্থির অভ্যন্তরে রয়েছে অস্থিমজ্জা।

কাঠিন্য ও ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে অস্থিকলাকে দুভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। **যথা :** (a) স্পঞ্জ (spongy) বা বিলোপধর্মী অস্থি এবং (b) দৃঢ় অস্থি (compact bone)।

1(a). স্পঞ্জ-অস্থি (Spongy Bone) **:** এই জাতীয় অস্থিতে ক্যাল্‌সিয়াম কম পরিমাণে সঞ্চিত হয়, ফলে এই অস্থি কম ঘনত্বসম্পন্ন হয়। তাছাড়া অস্থির অভ্যন্তর ক্ষুদ্র কঠিন প্রাচীর দ্বারা বহুবিভক্ত হয় এবং স্পঞ্জের মত দেখায়। মজ্জা দ্বারা প্রাচীরের অভ্যন্তর পরিপূর্ণ থাকে এবং **এন্‌ডোস্‌টিয়াম** (endostium) ঝিল্লির দ্বারা আবৃত থাকে।

1(b). দৃঢ়অস্থি (Compact Bone) **:** এদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তিন ধরনের হয়। প্রথম প্রকারের বৈশিষ্ট্য **হ্যাভার্সিয়ান প্রণালী** (Haversian system)। কেন্দ্রীয় মজ্জানালী ছাড়াও অস্থির গাত্রদেশে দীর্ঘাকৃতি সুড়ংগ দেখা যায়। এই সুড়ংগকে **হ্যাভার্সিয়ান নালী** Haversian canal) বলে। প্রতিটি সুড়ংগে রক্তনালী, লসিকানালী, স্নায়ু এবং কখনও কখনও কিছু পরিমাণ মজ্জা থাকে। হ্যাভার্সিয়ান নালীর চারপাশে অস্থিস্তর সমকেন্দ্রিক বৃত্তের মত সজ্জিত থাকে। এসব সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকার অস্থিস্তরকে **হ্যাভার্সিয়ান লেমেলা** (Havarsian lamellae) বলা হয়। দুটো স্তরের মধ্যবর্তী স্থানকে **লেকুনা** (lacunae) বলা হয়। লেকুনা এভাবে হ্যাভার্সিয়ান নালীর চারপাশে বৃত্তাকারে সজ্জিত থাকে। কিছুসংখ্যক তরংগায়িত ক্ষুদ্রনালী লেকুনা থেকে নির্গত হয়,

যাদের **ক্যানালিকুলাস** (canaliculus) বলা হয়। লেকুনার মধ্যে ওস্‌টিওসাইট নামক অস্থিকোষ থাকে। অস্থিকোষের চারপাশে ক্যাল্‌সিয়াম লবণ জমা হয়। অস্থিকোষের কোষ-উদ্‌গম (processes) ক্যানালিকুলাসে প্রবেশ করে। হ্যাভার্সিয়ান নালী, লেকুনা এবং ক্যানালিকুলাস সম্মিলিতভাবে হ্যাভার্সিয়ান প্রণালী গঠন করে।
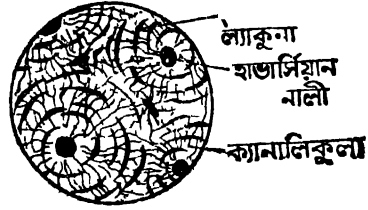
3-20নং চিত্র ঃ দৃঢ়অস্থির প্রস্থচ্ছেদ।

এছাড়া অপর দুটো আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অন্তঃকৌণিক অঞ্চল (angular interspace) এবং পেরিওস্‌টিয়াল্‌ লেমেলা (periosteal lamellae) নামে পরিচিত। অন্তঃকৌণিক অঞ্চলে অস্থি ও অস্থিকোষ অনিয়মিতভাবে সজ্জিত থাকে। সমগ্র অস্থিকে ঘিরে **পেরিওস্‌টিয়াম** (periostium) নামক পর্দা থাকে, তার ঠিক নীচে পেরিওস্‌টিয়াল লেমেলাস্তরকে দেখতে পাওয়া যায়। এইস্তর অস্পষ্ট ও অনিয়মিত। কুণ্ডলীপাকানো রক্তনালী ও ক্যাল্‌সিয়ামযুক্ত তন্তুকলা এই স্তরের মধ্যে প্রবেশ করে।

অবস্থান ঃ স্পঞ্জ-অস্থি চেপ্টা অস্থির অভ্যন্তরে, দীর্ঘাস্থির প্রান্তদেশে এবং আরো অনেক স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। দীর্ঘ অস্থির দণ্ড এবং সবরকম অস্থির বহিঃস্তরে দৃঢ় অস্থি দেখতে পাওয়া যায়।

অস্থিকলার কার্যাবলী ঃ (1) কংকাল বা অস্থি দেহের সুদৃঢ় কাঠামো গঠন করে, (2) প্রয়োজনীয় অংশের সুরক্ষা করে (3) মজ্জাকে নিজের আবাসে ধরে রাখে বলে মজ্জার যাবতীয় কার্য সহজতর হয়. (4) R-E কোষের মুখ্য আবাসস্থল হিসাবে কার্য করে, (5) ফস্‌ফরাস, ক্যাল্‌সিয়াম ইত্যাদির সঞ্চয়-ভাণ্ডারহিসাবে কার্য করে, (6) রেডিয়াম, ফ্লোরিন, সীসা, আর্সেনিক প্রভৃতি পদার্থকে রক্ত-প্রবাহ থেকে সরিয়ে নেয় এবং অস্থি ও দাঁতে জমা করে।

2. **তরুণাস্থি** (Cartilage) ঃ তরুণাস্থি অনেকটা অর্ধস্বচ্ছ, কিছুটা স্থিতি-স্থাপক এবং শক্ত বুনানিসম্পন্ন হয়। প্রধানত তরুণাস্থিকোষ (chondroblast) এবং অধিক পরিমাণ ভিত্তিপদার্থ (matrix) নিয়ে এই কলা গঠিত। ভিত্তিপদার্থ বা মেট্রিক্সে কন্‌ড্রোমিউকোয়েড (chondromucoid) এবং কন্‌ড্রোঅ্যালবুনোয়েড (chondroalbunoid) নামে দুধরনের প্রোটিন দেখতে পাওয়া যায়। তরুণাস্থিকোষের সংখ্যা এবং ভিত্তিপদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে

তরুণাস্থিকে দুভাবে বিভক্ত করা যায়। যথা : তন্তুময় তরুণাস্থি (fibro-cartilage) এবং (b) হায়ালিন তরুণাস্থি (hyaline cartilage)।

2(a). **তন্তুময় তরুণাস্থি :** ভিত্তিপদার্থে অবস্থিত তন্তুর গুণানুসারে তন্তুময় তরুণাস্থিকে আবার দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : (i) হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি (yellow elastic cartilage) এবং (ii) শ্বেত তন্তুময় তরুণাস্থি (white fibro-cartilage)।
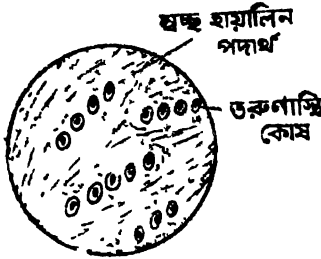
3-21নং চিত্র : শ্বেততন্তুময় তরুণাস্থি।

(i) **হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি :** ভিত্তিপদার্থে হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক তন্তুর উপস্থিতি ছাড়া এই কলার অন্য সব গঠন অন্যান্য তরুণাস্থির মতই। (ii) **শ্বেততন্তুময় তরুণাস্থি :** এজাতীয় কলার বৃহদাকৃতি কোষগুলো দলবদ্ধভাবে সহাবস্থান করে। প্রতিটি দলের চারপাশে স্বচ্ছ হায়ালিন পদার্থ ছড়িয়ে থাকে। দলবদ্ধ কোষের মধ্যে শ্বেততন্তুর গুচ্ছ দেখা যায় (3-21নং চিত্র)।

2(b). **হায়ালিন তরুণাস্থি :** তরুণাস্থি কোষ এবং তন্তুবিহীন স্বচ্ছ সমপ্রকৃতির ভিত্তিপদার্থ নিয়ে হায়ালিন তরুণাস্থি গঠিত। তরুণাস্থিকোষগুলো দুই, চার প্রভৃতি দলে বিভক্ত হয়ে সহাবস্থান করে। একটিমাত্র মাতৃকোষ থেকে বিভক্ত হয়ে এক একটি দলের কোষ উৎপন্ন হয়। কোষগুলো বৃহদাকৃতি এবং অনেকটা গোলাকার কোণসম্পন্ন হয়। লাগোয়া কোষের চাপে সংলগ্নতল চেপ্টা আকার ধারণ করে। প্রচুর পরিমাণ স্বচ্ছ সাইটোপ্লাজমে গোলাকার নিউক্লিয়াসটি যথেষ্ট ক্ষুদ্র হয়। কোষের সাইটোপ্লাজমে যেমন প্রচুর পরিমাণে গ্লাইকোজেন থাকে, তেমনি মাইটোকন্ড্রিয়া এবং স্নেহবিন্দু দেখতে পাওয়া যায়। কোষগোষ্ঠীর চারিপার্শ্বের ভিত্তিপদার্থ বা কোষমধ্যস্থ পদার্থ সমকেন্দ্রিক অংগুরীয়কের মত সজ্জিত থাকে। এই অংশটি গাঢ়বর্ণ গ্রহণ করে। একে ক্যাপসুল নামে অভিহিত করা হয় (3-22 নং চিত্র)।
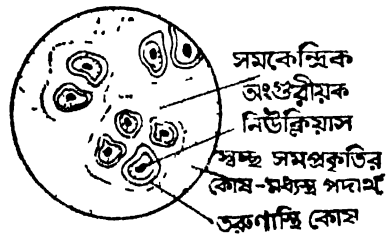
3-22নং চিত্র : হায়ালিন তরুণাস্থি।

অবস্থান ঃ হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি, বহিঃকর্ণ (pinna), আলজিব, বাগযন্ত্রের কিছুটা তরুণাস্থি ইউস্টেসিয়ান নালী (eustachian tube) প্রভৃতিতে দেখা যায়। শ্বেততন্তুময় তরুণাস্থিকে চোয়ালের সন্ধি, জানুসন্ধির অর্ধচন্দ্রাকৃতি অস্থি (menisci), অন্তর্মেরুদণ্ডীয় ডিস্ক (discs) প্রভৃতি স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। হায়ালিন তরুণাস্থিকে অস্থিপ্রান্ত, বর্ধনশীল এপিফাইসিস্ (epiphysis) এবং ডায়াফাইসিসের (diaphysis) মধ্যবর্তী অংশে, পাঁজরের সম্মুখপ্রান্ত ইত্যাদি স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া নাসিকার তরুণাস্থি, শ্বাসনালী ও ক্লোমশাখার (bronchus) তরুণাস্থি, স্বরযন্ত্রের তরুণাস্থি ইত্যাদি হায়ালিন তরুণাস্থিবিশেষ।

কার্যাবলী ঃ স্থিতিস্থাপকতা ও কাঠিন্যের দিক দিয়ে এই কলা অস্থি ও তন্তুময় কলার মধ্যবর্তী স্থান দখল করে। এর প্রধান কার্য যান্ত্রিক। তরুণাস্থি দৈহিক কাঠামোর আকার ও কাঠিন্য কিছুটা স্থিতিস্থাপকতার সংগে বজায় রাখে। এই কলা জানুসন্ধি ও অন্তর্মেরুদণ্ডীয় ডিস্কে বাফার হিসাবে কার্য করে। হায়ালিন তরুণাস্থি আবার এজাতীয় কলা থেকে অস্থিগঠনের মাধ্যম হিসাবে কার্য করে।

3. **জালকাকৃতি কলা** (Reticular Tissue) **ঃ** কতকগুলো বিশেষত্ব ছাড়া জালকাকৃতি কলা অ্যারিওলীয় কলার মতই। জালকাকার কলার তন্তুগুলো অনেকটা শ্বেততন্তুর মত হলেও তারা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং শাখাপ্রশাখামণ্ডিত। পেপ্‌সিন (pepsin) নামক এনজাইম শ্বেততন্তুকে পরিপাক করতে পারে, কিন্তু জালকতন্তুর কোন অনিষ্ট করতে পারে না। তাছাড়া তন্তুগুলোর আর একটা বিশেষত্ব হল তারা সিল্‌ভার ক্লোরাইড (silver chloride) বা কার্বনেট দ্রবণে বর্ণগ্রহণ করে রঞ্জিত হয়। এদের তাই আর্জিরোফিল (argyrophil) তন্তু বলা হয়। জালকাকৃতি কলা R-E তন্ত্রের অন্তর্গত। আন্তর্জালিকাস্থান তরলপদার্থ ও লসিকায় পরিপূর্ণ থাকে।

অবস্থান ঃ দেহের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই কলা ছড়িয়ে আছে। লসিকা-গ্রন্থি, প্লীহা, যকৃৎ, অস্থিমজ্জা এবং আরো অনেক অংগ-প্রত্যংগে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী ঃ জালকাকৃতি কলা অনেক আবরণী কলার বনিয়াদঝিল্লি গঠন করে এবং অনেক অংগ-প্রত্যংগ জালিকা সৃষ্টি করে তাদের অত্যাবশ্যক কোষ-উপাদানকে অবলম্বনে থাকতে সহায়তা করে। তাছাড়া R-E তন্ত্রের অন্তর্গত বলে এই জাতীয় কলা দেহের প্রতিরক্ষার কার্যেও অংশ গ্রহণ করে।

4. **হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক কলা** (Yellow Elastic Tissue) **:** এজাতীয় কলা তন্তুকলারই রকমফের কলা। এই তন্তুকলার বর্ণ হরিদ্রাভ। প্রতিটি তন্তু বৃহদাকৃতি হয়। তন্তুগুলো শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে পুনরায় পরস্পর মিলিত হয় এবং জালিকার সৃষ্টি করে। হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক কলার বৈশিষ্ট্য হল এদের তন্তুগুচ্ছ তরংগায়িত নয়। টানলে তন্তুগুলো বিচ্ছিন্ন হয় এবং স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্য ছিন্নপ্রান্ত সংকুচিত হয়ে কুঁকড়ে যায় (3-23নং চিত্র)। **ইলাস্টিন** (elastin) নামক প্রোটিনের দ্বারা এই কলা গঠিত। ট্রিপ্সিন (trypsin) নামক এনজাইম এই জাতীয় কলাকে পরিপাক করতে পারে।
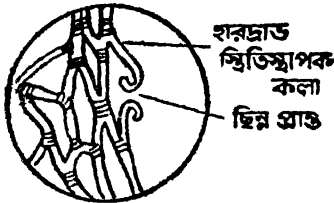
3-23নং চিত্র : হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক কলা

অবস্থান : সমগ্র দেহে অ্যারিওলীয় কলার মধ্যে হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক তন্তু ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া কশেরুকার (vertebra) লিগামেন্টাম ফ্লাভাতে (legamentum flava) এদের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশী। তন্তুময় তরুণাস্থি হিসাবে এদের উপধমনীর প্রাচীরগাত্রে এবং ফুসফুসে দেখতে পাওয়া যায়। স্বরযন্ত্র ও ক্লোমশাখার গাত্রে তরুণাস্থি সংযোগরক্ষাকারী কলা ও এজাতীয় স্থিতিস্থাপক কলা দ্বারা গঠিত।

কার্যাবলী : এই কলা শক্ত স্থিতিস্থাপক দড়ির মত কার্য করে। নিজেদের সম্প্রসারণ-ক্ষমতা, দৃঢ়তা এবং স্থিতিস্থাপক সংকোচন-ধর্মের মধ্যেই তাদের কার্যাবলীর ইংগিত রয়েছে। রক্তনালীর অত্যধিক প্রসারণকে এই কলা যেমন প্রতিরোধ করে, তেমান এই কলার স্থিতিস্থাপক সংকোচন-ধর্ম রক্তসংবহন ও রক্তচাপের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফুসফুসে এরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার সহায়ক।

5. **শ্বেত তন্তুকলা** (White Fibrous Tissue) **:** অনিয়মিতভাবে তরংগায়িত উজ্জ্বল শ্বেততন্তুর গুচ্ছ বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত থাকে। একক তন্তু শাখাপ্রশাখাহীন হলেও শ্বেততন্তুর গুচ্ছ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে পরস্পরের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে। তন্তুর অন্তর্বর্তী স্থান অ্যারিওলীয় কলা এবং সংযোগরক্ষাকারী কলার কোষের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। সন্নিহিত শ্বেততন্তু-গুচ্ছের নিষ্পেষণে এই কোষগুলো প্রস্থচ্ছেদে নক্ষত্রের আকার ধারণ করে। এদের

তাই **নক্ষত্র কোষ** (stellate cells) বলা হয়। কোলাজেন (collagen) নামক প্রোটিনদ্বারা এজাতীয় কলা গঠিত। পেপ্‌সিন (pepsin) নামক এন্‌জাইম এই কলাকে পরিপাক করতে পারে।

অবস্থান : বিশেষভাবে অস্থিবন্ধনী (ligaments), সন্ধির ঢাকনা (articular capsule), কণ্ডরা (tendon), এপোনিউরোসিস (aponeurosis), অংগপ্রত্যংগের তন্তুময় ঢাকনা ইত্যাদি স্থানে এজাতীয় কলা দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া এক ধরনের তরুণাস্থি-কলা হিসাবেও এদের দেখা যায়।
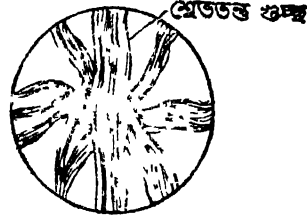
3-24নং চিত্র : শ্বেত তন্তুকলা।

কার্যাবলী : এরা দেহের বিভিন্ন অংশ ও কলার মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে চাপ ও টানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগকে যান্ত্রিক উপায়ে রক্ষা করে এবং তাদের অত্যন্ত নমনীয় ও যথেষ্ট শক্তি-সম্পন্ন করে তুলতে সহায়তা করে।

6 **অ্যারিওলীয় কলা** (Areolar Tissue) **:** কোষ ও বিভিন্ন ধরনের তন্তু নিয়ে এই কলা গঠিত। উপরে বর্ণিত তিন ধরনের তন্তুই (জালক, শ্বেত ও স্থিতিস্থাপক তন্তু) অ্যারিওলীয় কলায় দেখতে পাওয়া যায়। এই তিন-প্রকার তন্তুগুচ্ছ এবং কোন কোন একক তন্তু শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে জালিকার সৃষ্টি করে। জালিকামধ্যস্থ স্থান স্বচ্ছপদার্থ ও কোষের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। জালিকামধ্যস্থ স্থানে প্রায় ছপ্রকারের কোষের সন্ধান পাওয়া যায়। কোষগুলো হল : (1) ফাইব্রোব্লাস্ট (fibroblast) কোষ, (2) বেসোফিল (basophil) কোষ, (3) প্লাজমা কোষ (plasma cells), (4) হিস্‌টিওসাইট (histeocytes) কোষ, (5 বঞ্জক কোষ এবং (6) মাস্তুল কোষ (mast cells)।

(1) **ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ :** শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট লম্বাটে ধরনের এই কোষ-গুলো কর্মঠ বা সক্রিয়। কোষস্থিত নিউক্লিয়াস গোলাকার। তরুণ কোষগুলিও তুলনামূলকভাবে গোলাকার। কার্যরত ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ নির্গত শাখা-প্রশাখার দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। এদের যেমন চলার ক্ষমতা নেই, তেমনি বিজাতীয় কোষ বা জীবাণু-ধ্বংসী ক্ষমতাও নেই। বিনষ্ট কোষের সাইটোপ্লাজমে রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিনের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়।

(2) **বেসোফিল ক্ষারাসক্ত কোষ :** এই কোষগুলি বৃহদাকার, গোলাকৃতি

চলৎশক্তিসম্পন্ন, একটিমাত্র নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং দানাদার ক্ষারাসক্ত সাইটোপ্লাজমসম্পন্ন। সচরাচর চর্বিযুক্ত স্থানে এদের বেশী করে দেখতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও এরা রক্তনালী ভেদ্ করে রক্তসংবহন তন্ত্রে বেরিয়ে আসে, তাদের তখন **ক্ষারাসক্ত শ্বেতকণিকা** নামে অভিহিত করা হয়।

(3) **প্লাজমা কোষ :** প্লাজমা কোষগুলো গোলাকার ও বৃহদাকৃতি। সাইটোপ্লাজম দানাহীন এবং ক্ষারাসক্ত। নিউক্লিয়াস কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। নিউক্লিয়াসস্থিত ক্রোমাটিন পদার্থ গরুর গাড়ীর চাকার পাকির (spoke) মত বিন্যস্ত থাকে। এই কোষ নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠে এবং নিজের সাইটোপ্লাজমে বিশেষ ধরনের প্রোটিনের সংশ্লেষণ ঘটায়। বিশেষ ধরনের প্রোটিনকে অ্যাণ্টিবডি বলা হয়, যা নির্দিষ্ট অ্যাণ্টিজেনকে নিষ্ক্রিয় করে থাকে।

(4) **হিস্‌টিওসাইট কোষ :** এই কোষগুলো R-E তন্ত্রের অন্তর্গত। বৃহদাকার এই কোষগুলো এক বা একাধিক নিউক্লিয়াসযুক্ত। এই কোষের সাইটোপ্লাজম ক্ষারাসক্ত। এরা সক্রিয়ভাবে চলৎশক্তিসম্পন্ন এবং আগ্রাসক (phagocytic) হয়।

(5) **রঞ্জককোষ :** এই জাতীয় কোষে রঞ্জককণা (pigment) নিউক্লিয়াসের চারপাশে সজ্জিত থাকে। রঞ্জকপদার্থ কাল হলে (যেমন, ত্বকে),
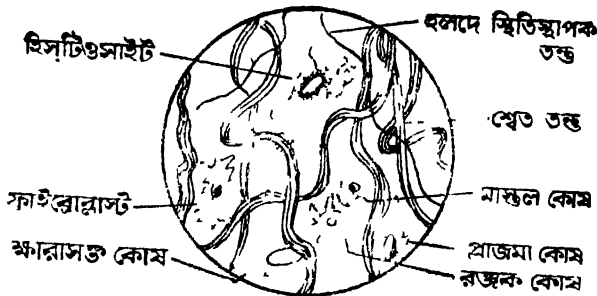
3-25নং চিত্র : অ্যারিওলার কলা।

এজাতীয় কোষগুলোকে **মেলানোফোর** (melanophore) কোষ বলা হয়। নীচু স্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণীতে রঞ্জকপদার্থ হলুদবর্ণ, তাদের তাই **জ্যানথোফোর (xanthophore)** নামে আখ্যা দেওয়া হয়। আলো, আর্দ্রতা ইত্যাদি এজাতীয় রঞ্জকপদার্থকে সাইটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত হতে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কিছু সংখ্যক প্রাণী নিজেদের গাত্রবর্ণ পাল্টাতে পারে। এদের তাই

বহুরূপী আখ্যা দেওয়া যায়। এই ছদ্মবেশকে তারা আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। পশ্চাৎপিট্যুইটারীর পারস্ ইন্টারমিডিয়া থেকে নিঃসৃত হরমোন (MSH) রঞ্জকপদার্থের পুনর্বিন্যাসে সহায়তা করে।

(6) **মাস্তুল কোষ ঃ** এই কোষগুলো প্রধানত গোলাকার। সাইটোপ্লাজম বৃহদাকার দানাযুক্ত। এই কোষগুলো বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে।

অবস্থান ঃ অ্যারিওলীয় কলা কমবেশী সমগ্র দেহে ছড়িয়ে আছে। অন্যান্য সংযোগরক্ষাকারী কলার ভিত্তিপদার্থ হিসাবে এদের দেখা যায়। ত্বক, শ্লেষ্মা-ঝিল্লি, সেরাসঝিল্লির নিম্নস্থ কলায়ও এদের দেখতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী ঃ অ্যারিওলীয় কলা প্রধানত আলম্বন-কলা (supporting tissue) হিসাবে কাজ করে। এই কলায় বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন কোষ ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদন করে। ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা তথা রোগগ্রস্থ অবস্থায় শ্বেততন্তুকলার উৎপাদনের জন্য দায়ী। ক্ষারাসক্ত কোষ ও মাস্তুল কোষ নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। যথা ঃ রক্ততঞ্চনের প্রতিরোধক পদার্থ
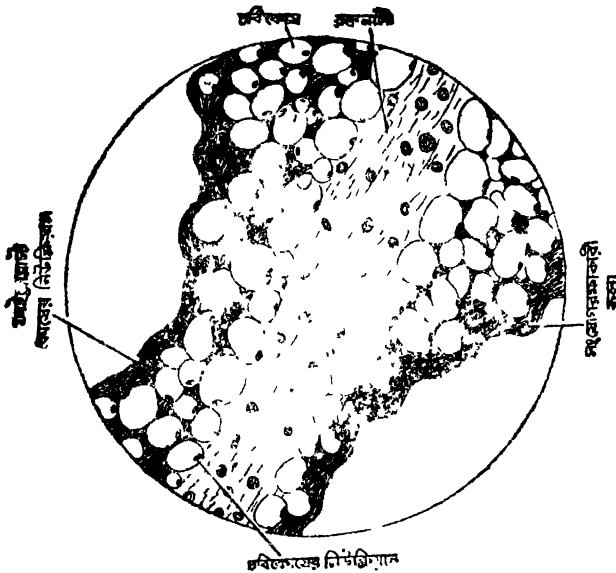
3-26 নং চিত্র ঃ চর্বিকলা।

হেপারিন (heparin), এলার্জিজনিত (allergy) অবস্থায় ক্ষরিত হিস্টামিন (histamine) এবং রক্তনালীর সংকোচনকারী পদার্থ সেরোটনিন (serotonin)

ইত্যাদি। **প্লাজমা কোষ** গামা-গ্লোবিউলিন (γ-globulin) নামক পদার্থ সংশ্লেষণ করে এবং দেহের প্রতিরক্ষার কার্যে অংশগ্রহণ করে। হিস্‌টিওসাইট R-E তন্ত্রের অন্তর্গত বলে দেহের প্রতিরক্ষার কার্যে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে।

7. **চর্বিকলা** (Adipose Tissue) : এ জাতীয় কলায় স্নেহকোষের (fat cells) অভ্যন্তরে মুক্ত স্নেহপদার্থ ছড়িয়ে থাকে। অ্যারিওলীয় জালিকায় অবলম্বনকারী এই স্নেহকোষগুলো স্বভাবত বৃহদাকৃতি এবং গোল হয়। চাপে পড়ে এই কোষগুলো বহুতলীয় আকার ধারণ করে। সাইটোপ্লাজমস্থিত অত্যধিক স্নেহপদার্থের নিষ্পেষণে নিউক্লিয়াসটি কোষের একপাশে অবস্থান করে। এই কোষগুলোর অভ্যন্তরে এক ধরনের এন্‌জাইম দেখা যায়, যা স্নেহপদার্থের সঞ্চয়ে (deposition) সহায়তা করে।

অবস্থান : সাধারণত ত্বকনিম্নস্থ কলা, ধারণীঝিল্লি (mesentery), ওমেন্‌টাম (omentum), অধঃহৃদ্বরাঝিল্লি (subpericardial tissue), পেরিনেফ্রীয় অঞ্চল (perinephric region) প্রভৃতি স্নেহ-সঞ্চয়ভাণ্ডারে (fat depots) এই কলার প্রাধান্য রয়েছে। পয়স্বিনী মাতৃস্তন এবং হলদে অস্থিমজ্জায় চর্বিকলা প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী : আন্ত্রযন্ত্রের (viscera) চারপাশ থেকে তাদের স্বস্থানে রাখতে এবং আঘাত থেকে রক্ষা করতে চর্বিকলা সহায়তা করে। দেহের ও অংগপ্রত্যংগের আকৃতিদানেও এরা সহায়তা করে। দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণেও এদের অবদান যথেষ্ট। তাছাড়া চর্বিকলা সঞ্চিত শক্তি হিসাবে কার্য করে।

8. **লসিকা কলা** (Lymphoid Tissue) : এই কলা লসিকা, লসিকা-কোষ, লসিকানালী এবং লসিকাগ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। লসিকাকোষ (lymphocytes) বিক্ষিপ্তভাবে যেমন দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে পারে, তেমনি ঘনসন্নিবিষ্ট (যেমন লসিকাগ্রন্থি) হয়েও সহাবস্থান করতে পারে। কোষগুলো গোলাকার। নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের প্রায় অধিকাংশ স্থানই দখল করে থাকে। লসিকানালীর প্রাচীরগাত্র খুবই পাতলা এবং তাতে কবাটিকা রয়েছে বলে লসিকা নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়।

অবস্থান : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ছাড়া লসিকা দেহের প্রায় সমগ্র অংশেই ছড়িয়ে রয়েছে। প্লীহা, অস্থিমজ্জা, লসিকাগ্রন্থি, থাইমাস গ্রন্থি, ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লিস্থ পেয়ার প্যাচ্‌ (peyer's patches), অ্যাপেন্‌ডিক্স (appendix) প্রভৃতি স্থানে এদের বিশেষভাবে দেখা যায়।

9. জেলিসদৃশ কলা (Jellylike Tissue) **:** এই কলা অনেকটা জেলির মত দেখতে হয়। ভ্রূণাবস্থায় অ্যারিওলার কলাকে যেভাবে দেখতে পাওয়া যায় এই কলাও অনেকটা সে রকমই। কোষগুলো সমসত্ব জেলী-সদৃশ পদার্থে বিক্ষিপ্ত থাকে।

অবস্থান : বয়স্ক লোকের অক্ষিগোলকের ভিট্রিয়াস হিউমর (vitreous humour) এবং নাভি-রজ্জুতে (umbilical cord) এই ধরনের কলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নাভি-রজ্জুতে এই কলাকে **ওয়ারটো জেলি** (Wharto's jelly) বলা হয়।

কার্য : এরা রক্ষাকার্যের সংগে

অস্থি ও অস্থিবৃদ্ধি

BONE AND OSSIFICATION

অস্থি প্রাণীদেহের সবচেয়ে কঠিনতম কলা। এরা দেহের গঠন-কাঠামোর জন্য

3-27 নং চিত্র : মানুষের দেহের কংকাল।
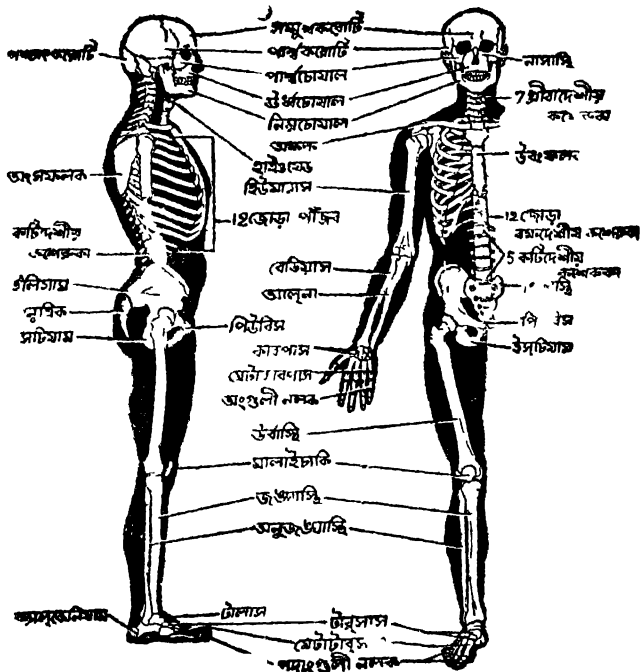
দায়ী প্রাণীর আকৃতি এই কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। অস্থির অন্যান্য

কাজের মধ্যে প্রধান ঃ (1) দেহের কিছুসংখ্যক অন্তর্দেশীয় কোমল অংগকে অংশত ধারণ করা ও সীমিতভাবে সুরক্ষা করা, বিশেষত করোটি ও শ্রোণীচক্রের অংগসমূহকে, (2) অস্থিপেশীর সংগে একযোগে লিভার হিসাবে কাজ করা এবং দেহের নড়াচড়া ও চলাফেরায় অংশগ্রহণ করা।

মানুষের দেহে প্রায় 206টি অস্থির সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। শিশুতে অস্থির সংখ্যা আরও কিছু বেশী হয়, কারণ পরিণত বয়সে কিছুসংখ্যক অস্থি একীভূত হয়ে একক অস্থিতে রূপান্তর লাভ করে।

1. **অস্থির শ্রেণীবিন্যাস** (Classification of Bone) ঃ দেহের কংকাল বা অস্থিকে দুভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। যথা ঃ (a) **অক্ষদেশীয় অস্থি**

6নং তালিকা ঃ অক্ষদেশীয় অস্থি (=80)

1. **করোটিকা** (=8)
- সম্মুখকরোটি (frontal, 1)
- মধ্যকরোটি (parietal, 2)
- পার্শ্বকরোটি (temporal, 2)
- স্ফেনোয়েড (sphenoid, 1)
- এথময়েড (ethmoid, 1)
- পশ্চাৎকরোটি (occipital, 1)

2. **মুখমণ্ডল** (=14)
- ঊর্ধ্বচোয়াল (maxilla, 2)
- নিম্নচোয়াল (mandible, 1)
- পার্শ্বচোয়াল (zygomatic, 2)
- নাসিকাস্থি (nasal, 2)
- অধরা নাসাশঙ্খাস্থি (inferior nasal concha, 2)
- অশ্রুকোটরাস্থি (lacrimal, 2)
- তালু-অস্থি (palatine, 2)
- নাসাপ্রাচীরাস্থি (vomer, 1)

3. **মধ্যকর্ণীয় ক্ষুদ্রাস্থি** (=6)
- ইনকাস (incus, 2)
- ম্যালিয়াস (malleous, 2)
- স্টেপস্ (stapes, 2)

4. **কণ্ঠাস্থি** (=1)
- হাইওয়েড (hyoid, 1)

5. **মেরুদণ্ড** (=26)
- গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা (cervical vertebra, 7)
- বক্ষদেশীয় (thoracic, 12)
- কটিদেশীয় (lumbar, 5)
- ত্রিকাস্থি (sacrum, একীভূত 5টি), অনুত্রিক (coccygeal, একীভূত 4টি)

6. **বক্ষপঞ্জর** (=25)
- উরঃফলক (sternum, 1)
- পাঁজর (ribs, 12 জোড়া)

(axial skeleton) এবং (b) **উপাংগ অস্থি** (appendicular skeleton)। দেহের মধ্যরেখায় অবস্থানকারী অস্থিসমূহকে অক্ষদেশীয় অস্থি বলা হয়। অক্ষদেশীয় অস্থি প্রধানত **করোটি** (skull), **মেরুদণ্ড** (vertebral column), **উরঃফলক** (sternum), **পঞ্জরাস্থি** (ribs), **হাইওয়েড** (hyoid) এবং

মধ্যকর্ণীয় ক্ষুদ্রাস্থির (ossicles) সমন্বয়ে গঠিত। উপাংগ-অস্থি প্রধানত ঊর্ধ্ব-উপাংগ (দুটো হাত), নিম্নউপাংগ (দুটো পা), বক্ষচক্র (pectoral girdle) এবং শ্রোণীচক্রের (pelvic girdle) অস্থিরদ্বারা গঠিত।

7নং তালিকা ঃ উপাংগ-অস্থি (=126)

1. বক্ষচক্র (=4) অংসফলক (scapula, 2) অক্ষক (clavicle, 2) 2. শ্রোণীচক্র (=2) ওস কোক্সা (os coxa, 2) ইলিয়াম (ilium) ইস্চিয়াম (ischium) পিউবিস (pubis) 3. ঊর্ধ্ব-উপাংগ (=60) হিউমারাস (humerus, 2) রেডিয়াস (radius, 2) আলনা (ulna, 2) কব্জিকংকাল (carpal, 16) (capitate, hamate lunate, pisiform, scaphoid, trapezium,, trapezoid, triquetral) মেটাকারপাল (metacarpal, 10) অঙ্গুলনীলক (phalanges, 28)	4. নিম্ন উপাংগ (=60) ঊর্বাস্থি (femur) মালাইচাকি (patella, 2) জঙ্ঘাস্থি (tibia, 2) অনুজঙ্ঘাস্থি (fibula, 2) গুল্ফাস্থি (tarsal, 14) (calcaneus, cuboid, medial cuneiform, intermediate cuneiform, lateral cuneiform, navicular, talus) মেটাটারসাল (metatarsal, 10) পদাঙ্গুলীনলক (phalanges, 28)

অক্ষদেশীয় অস্থির মোট সংখ্যা 80টি এবং উপাংগ-অস্থির সংখ্যা 126টি। অক্ষদেশীয় অস্থির 80টির মধ্যে করোটিকাস্থির (cranium) অস্থির সংখ্যা 8টি, মুখমণ্ডলীয় 14টি, মধ্যকর্ণীয় 6টি, কণ্ঠনালীস্থ 1টি মেরুদণ্ডীয় 26টি এবং বক্ষপঞ্জরের 25টি। 6নং তালিকায় অক্ষদেশীয় অস্থির নাম ও তাদের মোট সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষের করোটিকা অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর চেয়ে তুলনামূলকভাবে বৃহদাকৃতির, কিন্তু মুখমণ্ডল তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রতর। মানুষের চোয়ালগুলো অনেক ছোট, কারণ অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত মানুষ চোয়ালকে প্রতিরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে না।

পশ্চাৎকরোটির মধ্যে যে বৃহদাকার ছিদ্র রয়েছে এবং যার মধ্য দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ড সম্প্রসারিত হয়ে মস্তিষ্কের সংগে যুক্ত হয়, তাকে ফরামেন ম্যাগ্‌নাম (foramen magnum) বা মহারন্ধ্রবিবর বলা হয়। রূপান্তরিত গ্রীবাদেশীয় প্রথম কশেরুকা বা অ্যাট্‌লাসের (atlas) উপর পশ্চাৎকরোটি অবস্থান করে। অক্সিপিটাল কন্‌ডাইল (occipital condyle) নামক এক বিশেষ সন্ধিতলের জন্য মস্তক অগ্রপশ্চাৎ দিকে নড়াচড়া করতে পারে। তাছাড়া দ্বিতীয় কশেরুকাও রূপান্তরিত হয়ে একটি বিশেষ পাইভট (pivot) হিসাবে অ্যাটলাসের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়, যা মস্তকের ঘূর্ণায়মান চলনের জন্য দায়ী।

উপাংগ-অস্থির 126টির মধ্যে বক্ষচক্রে (pectoral girdle) 4টি, শ্রোণীচক্রে (pelvic girdle) 2টি, ঊর্ধ্ব-উপাংগে (upper limbs) 60টি এবং নিম্ন-উপাংগে (lower limbs) 60টি অস্থির সমাবেশ করা যায়। 7 নং তালিকায় উপাংগ-অস্থির নাম ও সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে।

বক্ষচক্র প্রতিপার্শ্বে দুটি করে অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। প্রথম প্রশস্ত চেপ্‌টা অস্থি স্কন্ধফলক হিসাবে পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে। একে অংসফলক নামে অভিহিত করা হয়। ইহা অক্ষদেশীয় অস্থির সংগে সরাসরি যুক্ত নয়। বাহুর সুদৃঢ় পেশীর সংযোগস্থলে ইহা স্বস্থানে অবস্থান করে। পার্শ্বদেশে ইহা অক্ষকের সংগে যুক্ত হয়। অংসফলকে যে বৃহদাকারের আনতি (depression) দেখা যায়, তাকে গ্লেনোয়েড ফসা (glenoid fossa) বলা হয়। ইহা হিউমারাসের মস্তকের সংগে কোটরসন্ধি (ball-and-socket) গঠন করে।

শ্রোণীচক্র দেহের প্রতিপার্শ্বে তিনটি একীভূত অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। এই একীভূত অস্থিত্রয় ইলিয়াম, ইস্‌চিয়াম এবং পিউবিস নামে পরিচিত। এরা কশেরুকা বা মেরুদণ্ডের সংগে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। ত্রিকাস্থি (sacrum) ইলিয়ামের সংযোগস্থলে স্যাক্রোইলিয়াক সন্ধি গঠন করে। এই সন্ধির মধ্য দিয়ে দেহভার শ্রোণীচক্র ও পায়ে ছড়িয়ে পড়ে।

2. অস্থির রাসায়নিক উপাদান (Chemical Composition of Bone) **:** অস্থি 25 শতাংশ জল এবং 75 শতাংশ কঠিন পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। কঠিন পদার্থের 75 শতাংশের মধ্যে 30 শতাংশ জৈব পদার্থ (প্রধানত প্রোটিন) এবং 45 শতাংশ অজৈব পদার্থ। অস্থির ওজনের প্রায় অর্ধাংশই ক্যালসিয়াম লবণে গঠিত।

জৈব পদার্থের মধ্যে তিন ধরনের প্রোটিনের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

(1) **ওসেইন** (ossein)—এটি একটি স্ক্লেরোপ্রোটিন, (2) ওসিওমিউকোয়েড (osseomucoid)—এটি একটি মিউকোপ্রোটিন এবং (3) ওসিওঅ্যালবুমিন (osseoalbumin)—এটি একটি কেরাটিন প্রোটিন।

অজৈব পদার্থের মধ্যে প্রধান : $Ca_3(PO_4)_2$ (36·0 শতাংশ), $CaCO_3$ (5·8%), $Mg_3(PO_4)_2$ (0·9 শতাংশ) এবং সামান্য পরিমাণে K, Na এবং Cl। এছাড়াও খুব সামান্য পরিমাণে লোহা, ফ্লোরিন ও লিথিয়ামের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অস্থিবৃদ্ধি

OSSIFICATION

প্রাণীদেহের অস্থি-উৎপাদন প্রক্রিয়ার নাম অস্থিবৃদ্ধি। ভ্রূণের মেসোডার্ম বা মধ্যস্তর থেকে ষষ্ঠসপ্তাহ থেকে অস্থি-উৎপাদন শুরু হয়। ভ্রূণগত উৎসের উপর ভিত্তি করে অস্থিবৃদ্ধিকে দুভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় : (1) **অন্তর্ঝিল্লিজ অস্থিবৃদ্ধি** (intramembraneous ossification) এবং (2) **অন্তঃতরুণাস্থি অস্থিবৃদ্ধি** (intracartilaginous ossification) বা এন্‌ডোকন্‌ড্রিয়েল অস্থিবৃদ্ধি। প্রথম প্রক্রিয়ায় সংযোগরক্ষাকারী কলায় গঠিত ঝিল্লির নীচে বা মধ্যে অস্থির বৃদ্ধি ঘটে এবং এই পদ্ধতিতে তরুণাস্থির অপসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। দ্বিতীয় প্রকার অস্থিবৃদ্ধিতে তরুণাস্থি অপসারিত হয় এবং বিশুদ্ধ অস্থি তার স্থান দখল করে। করোটিস্থিত অস্থি ও চোয়াল অস্থি প্রথম প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে করোটির মূলদেশ, মুখাস্থি, অক্ষদেশীয় অস্থি ও উপাংগ-অস্থি—উভয় পদ্ধতির সাহায্যে বৃদ্ধি পায়।

1. **অন্তর্ঝিল্লিজ অস্থিবৃদ্ধি :** অন্তর্ঝিল্লিজ অস্থিবৃদ্ধিকে 4 ভাগে বিভক্ত করা যায় : (1) **ওস্‌টিওব্লাস্ট ও ওস্‌টিওড** (osteoid) উৎপাদন, (2) **লেকুনা ও ক্যানালিকুলাসের** উৎপাদন, (3) **ক্যালসিয়াম অবক্ষেপন** বা ক্যালসিফিকেশন এবং (4) **অস্থির পুনর্বিন্যাস**।

ভ্রূণের মেসোডার্ম বা মধ্যস্তরে অবস্থিত সংযোগরক্ষাকারী কলা মেসেনকাইমা (mesenchyma) থেকে অস্থির উৎপাদন হয়। অস্থি-উৎপাদনের প্রাক্কালে মেসেনকাইমার যে স্থানে অস্থির উৎপাদন শুরু হবে, সেখানে রক্তনালী অত্যধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। মেসেনকাইমাস্থিত কোষ সক্রিয়ভাবে বিভাজিত হতে থাকে এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক কোষ আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং অধিকতর গোল আকার ধারণ করে এবং **ওস্‌টিওব্লাস্ট** (osteoblast) নামে পরিচিত হয়। ওস্‌টিওব্লাস্ট

তার চারিপাশে বহিরুদ্গম (process) বিস্তার করে এবং একই সংগে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে অবস্থান করে। এছাড়া এই কোষগুলো কোলাজেন উপতন্তু (fibrils) উৎপাদন করে। মেসেনকাইমাস্থিত উপতন্তু, ওস্‌টিওব্লাস্টের দ্বারা উৎপন্ন উপতন্তু এবং অর্ধতরল ওসিওমিউকোয়েড বা হায়ালিন পদার্থ সম্মিলিতভাবে ওস্‌টিওব্লাস্টের অন্তর্বর্তী স্থানে ভিত্তিপদার্থ বা মেট্রিক্স (matrix) গঠন করে। এই ভিত্তিপদার্থে কোন অজৈব উপাদান থাকে না, ফলে ইহা কোমল হয় এবং সহজেই একে কাটা যায়। **ইহা ওস্‌টিওড** নামে পরিচিত।

মেট্রিক্সে অবক্ষেপন বৃদ্ধির সংগে ওস্‌টিওব্লাস্ট তাদের প্রসেস সমেত মেট্রিক্সের মধ্যে অবরুদ্ধ হয় এবং **লেকুনা** (lacunae) এবং **ক্যানালিকুলাস** (canaliculi) উৎপন্ন হয়। সন্নিহিত কোষের প্রসেসসমূহ এরপর পরস্পর সংযোগ স্থাপন করে, ফলে সন্নিহিত লেকুনা ও ক্যানালিকুলাসের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত

3-28 নং চিত্র : অন্তর্ঝিল্লিজ অস্থিবৃদ্ধি (উপরে), অস্থি-দণ্ডের একীভবনে স্পঞ্জাস্থি উৎপাদন (নীচে)।
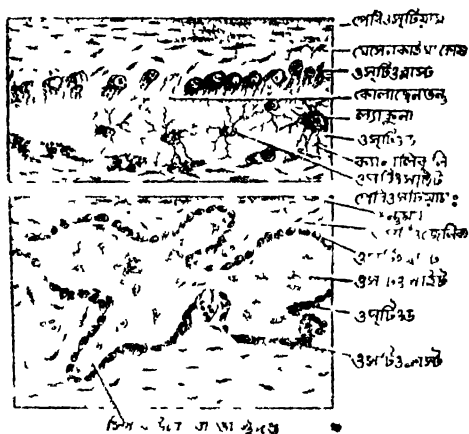
ওস্‌টিওব্লাস্ট কোষকে অস্থি উৎপাদনের প্রাথমিক কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হয়। এই কোষের সক্রিয়তার ফলে ক্যালসিয়াম লবণের অবক্ষেপন শুরু হয়। ক্যালসিয়াম লবণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেলাসকণা (hydroxyapatites) হিসাবে প্রথমে উপতন্তুর উপরে এবং তাদের অন্তর্বর্তীস্থানে সঞ্চিত হতে থাকে। এই কেলাসকণাকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়। ক্যালসিয়ামের অবক্ষেপনের সময়ে কিছু-সংখ্যক ওস্‌টিওব্লাস্ট কোষ লেকুনাতে আটকা পড়ে, এদের **ওসটিওসাইট** (osteocyte) বলা হয়।

এভাবে উৎপন্ন অস্থির চারিপাশের সক্রিয় ওস্টিওব্লাস্ট একটি স্তর সৃষ্টি করে। তাদের সক্রিয়তার ফলে উৎপন্ন অস্থি লম্বা দণ্ডের (spicule) মত চারিদিকে প্রসারিত হয়, এরপর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে ও পরস্পরের সংগে যুক্ত হয়ে অস্থিজাল (meshwork of bone) গঠন করে।

অস্থি-উৎপাদনের পর তার পুনর্বিন্যাস (remodelling) শুরু হয়। কোন কোন স্থানে ওস্টিওব্লাস্টের সক্রিয়তায় ও অবক্ষেপনে অস্থি পুরু হয়ে আসে. আবার অপর স্থানে বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত ওস্টিওক্লাস্টের সক্রিয়তায় অস্থির ক্ষয় হয়। উদাহরণ স্বরূপ, করোটির উপরিতলের অবক্ষেপনে যখন উপরিতলের ক্ষেত্রফল ও করোটিপ্রান্তের বৃদ্ধি ঘটে, তখন একই সময়ে অন্তস্থলে ওস্টিওক্লাস্টের সক্রিয়তায় অস্থির ক্ষয় হয়। এভাবে করোটিগহবরের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

প্রত্যেক অস্থির চারিপাশে মেসেনকাইমা ঘনীভূত হয়ে যে তন্তুময় আবরণের সৃষ্টি করে, তাকে, **পেরিওস্টিয়াম** (periosteum) বলা হয়।

(b **অন্তঃতরুণাস্থি অস্থিবৃদ্ধি** ঃ ভ্রূণাবস্থায় যে স্থানে অস্থির উৎপাদন শুরু হয়, সেখানে মেসেনকাইমাস্থিত কোষ প্রথমে **তরুণাস্থিতে** রূপান্তরিত হয়, পরে তারা সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয় এবং অস্থির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় (সন্ধিতল ছাড়া)। চারিপাশে মিউকোয়েড কলার যে তন্তুময় স্তরের দ্বারা তরুণাস্থি আবদ্ধ থাকে, তাকে **পেরিকন্ড্রিয়াম** (perichondrium) বলা হয়।

অন্তঃতরুণাস্থি অস্থিবৃদ্ধিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় ঃ (1) প্রথম পর্যায়, (2) দ্বিতীয় পর্যায় এবং (3) তৃতীয় পর্যায়।

(1) **প্রথম পর্যায়ের পরিবর্তন** ঃ প্রথম পর্যায়ে দু ধরনের পরিবর্তন পাশাপাশি সংগঠিত হয় ঃ প্রথমটি তরুণাস্থিতে এবং অপরটি পেরিকন্ড্রিয়ামের তলদেশে। ভাবী দীর্ঘাস্থির কেন্দ্রীয় অঞ্চলের যে স্থানে তরুণাস্থির বৃদ্ধি শুরু হয় তাকে অস্থি-বৃদ্ধির **প্রাথমিক কেন্দ্র** (primary ossification centre) হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রাথমিক কেন্দ্রস্থিত তরুণাস্থিকোষ প্রথমে আয়তনে বৃদ্ধি পায়. এরপর অবক্ষিপ্ত মেট্রিক্সের বৃদ্ধিতে পরস্পর পৃথক হয় এবং পরিশেষে উভয় পার্শ্বে দৈর্ঘ্য বরাবর, শ্রেণীবদ্ধভাবে বিন্যস্ত হয়। মেট্রিক্সে ক্যালসিয়াম লবণের অবক্ষেপনে তরুণাস্থির কোষের পুষ্টি ব্যাহত হয়, ফলে তারা বিনষ্ট ও অদৃশ্য হয়। তরুণাস্থি কোষের এধরনের অবলুপ্তির ফলে মেট্রিক্সে অনিয়মিত গহ্বরের সৃষ্টি হয় কারও কারও মতে (Crelin ও Koch ; 1967) অনেক তরুণাস্থিকোষ শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে এবং একীভূত হয়ে কনড্রোক্লাস্ট (chondroclast) কোষ তৈরী করে, নয়ত রূপান্তরিত হয়ে ওস্টিওব্লাস্ট করে।

তরুণাস্থির এই পরিবর্তনের সংগে যুগপৎ পেরিকন্ড্রিয়ামেও ওস্টিওজেনিক ক্রিয়া (osteogenic function) লক্ষ্য করা যায়। পেরিকন্ড্রিয়ামের অন্তর্দেশীয় কিছু কোষ ওস্টিওজেনিক কোষে রূপান্তরিত হয়, যার থেকে ওস্টিওব্লাস্টকোষের উদ্ভব ঘটে। শেষোক্ত কোষ শ্রেণীবদ্ধভাবে অস্থিবৃদ্ধির প্রাথমিক কেন্দ্রের তরুণাস্থির চারিপাশে প্রথমে পাতলা প্রাচীর গঠন করে, পরে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে তরুণাস্থির উপরিতলে পুরু প্রাচীর গঠন করে। এভাবে ইহা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। পেরিকন্ড্রিয়ামের এ জাতীয় অস্থিবৃদ্ধিকে অন্তঝিল্লিজ অস্থিবৃদ্ধি বলে।

(2) **দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিবর্তন ঃ** পেরিকন্ড্রিয়াম থেকে উৎপন্ন অস্থিপ্রাচীর বা অক্ষকাস্থির (collar bone) অংশবিশেষ কিছু সংখ্যক সাবপেরিওস্টয়াল কোষের (subperiosteal cells) অতিসক্রিয়তায় বিনষ্ট হয়, ফলে তাতে ফাটল বা ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এই ছিদ্র বা ফাটলের ভেতর দিয়ে ওস্টিওব্লাস্ট, ওস্টিওক্লাস্ট সংযোগরক্ষাকারী কলা ও রক্তনালীর সমন্বয়ে গঠিত **পেরিওস্টিয়াল বাড** (periosteal bud) ক্যালসিয়াম অবক্ষিপ্ত তরুণাস্থিতে প্রবেশ করে। ওস্টিওক্লাস্ট কোষ তরুণাস্থি কোষের দ্বারা সৃষ্ট কোটর বা গহ্বরকে ভেংগে দেয়, ফলে প্রচুর ফাঁকাস্থানের সৃষ্টি হয়। এভাবে প্রাথমিক মজ্জাস্থানের (primary marrow space) আবির্ভাব ঘটে। অবক্ষিপ্ত তরুণাস্থির ভগ্নাবশেষের ওপর এরপর ওস্টিওব্লাস্টের সক্রিয়তায় প্রথমে ওস্টিওড এবং পরে অস্থির অবক্ষেপন ঘটে, ফলে বিশুদ্ধ অস্থি গঠিত হয়।

(3) **তৃতীয় পর্যায়ের পরিবর্তন ঃ** তৃতীয় পর্যায়ে অস্থিবৃদ্ধি একইভাবে তরুণাস্থির উভয়-পার্শ্বে সম্প্রসারিত হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়। তরুণাস্থির প্রান্ত থেকে অস্থি অবক্ষেপনের দিকে এই অঞ্চলগুলোকে নিম্নলিখিত সুস্পষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় (3-29নং চিত্র) ঃ (a) **সঞ্চিত তরুণাস্থি অঞ্চল** (zone of reserve cartilage) ঃ ইহা অস্থিবৃদ্ধির পূর্বেকার হায়ালিন তরুণাস্থির দ্বারা গঠিত। খুব মন্থর গতিতে এই অঞ্চলে কোষবিভাজন ও মেট্রিক্স-উৎপাদন ঘটে থাকে। (b) **কোষের বহুবিভাজন অঞ্চল** (zone of cell multiplication) ঃ এই অঞ্চল প্রধানত তরুণাস্থির অক্ষবরাবরে কমবেশী বিন্যস্ত কোষসারির সমন্বয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের বহুবিভাজনের ফলে তরুণাস্থির দৈর্ঘ্য অধিকতর বৃদ্ধি পায় ঃ (c) **কোষ ও লেকুনার সম্প্রসারণ অঞ্চল** (zone of cell and lacunar enlargement) ঃ এই অঞ্চলে কোষের বিভাজন তেমন হয় না, তবে কোষের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং তারা আরও অধিকতর পরিণত হয়। লেকুনাও আয়তনে বৃদ্ধি পায়। (d) **তরুণাস্থি অবক্ষেপন অঞ্চল** (zone of cartilage calcification) ঃ এই অঞ্চলে লেকুনার অন্তর্বর্তী স্থানের মেট্রিক্স তিরোহিত হয় এবং তার স্থানে অস্থি-অবক্ষেপন শুরু হয়। (e) **তরুণাস্থি**

অপসারণ ও অস্থিঅবক্ষেপন অঞ্চল (zone of cartilage removal and bone deposition) **:** এই অঞ্চলের বহির্দেশে সন্নিহিত লেকুনাসমূহের অন্তর্বর্তী
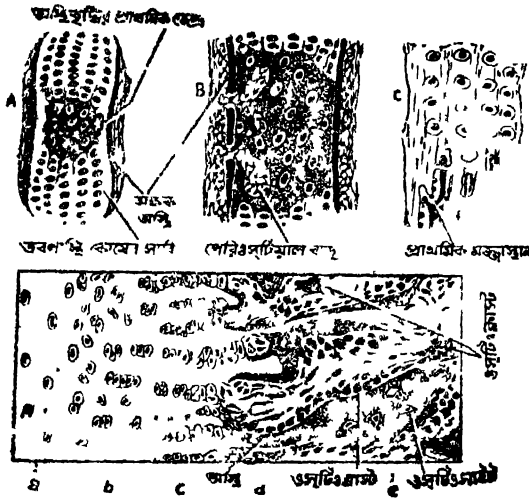
৪-২৭নং : অস্থিবৃদ্ধির A-প্রথম পর্যায় B-দ্বিতীয় পর্যায় এবং C-তৃতীয় পর্যায়। নীচের চিত্রে অস্থি বৃদ্ধির স্তর : (a) সঞ্চিত তরুণাস্থি অঞ্চল, (b) কোষের বহুবিভাজন অঞ্চল, (c) কোষ ও লেকুনার সম্প্রসারণ অঞ্চল, (d) তরুণাস্থি অবক্ষেপন অঞ্চল এবং (e) তরুণাস্থি অপসারণ ও অস্থি অবক্ষেপন অঞ্চল।

পাতলা প্রাচীর বিনষ্ট হয় বা দ্রবীভূত হয় এবং তারই সংগে কিছুসংখ্যক তরুণাস্থি-কোষের মৃত্যু ঘটে। তরুণাস্থি-মেট্রিক্সে অনুদৈর্ঘ্য নালিকার উদ্ভব হয় এবং সেগুলো রক্তনালী ও মজ্জায় ভরে ওঠে। ওস্টিওব্লাস্ট অবশিষ্ট তরুণাস্থির ভগ্নাবশেষের উপর জড়ো হয় এবং একটি অস্থিস্তর গঠন করে।

এভাবে অস্থি-অবক্ষেপনের ফলে অস্থি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। মজ্জা-গহ্বরও তরুণাস্থির অপসারণে আয়তনে বৃদ্ধি পায়।

প্রায় জন্মের সময় থেকেই দীর্ঘ অস্থির উভয় প্রান্তে স্বাধীনভাবে অস্থি-উৎপাদন শুরু হয়। অস্থি-উৎপাদনের এই প্রান্তকেন্দ্রকে **গৌণ কেন্দ্র** (secondary ossification centre) হিসাবে গণ্য করা হয়। এভাবে এপিফাইসিস (epiphysis) গঠিত হয়। প্রত্যেক এপিফাইসিস এবং দীর্ঘাস্থি বা ডায়াফাইসিসের (diaphysis) মধ্যবর্তী অঞ্চলে সক্রিয় ক্রমবর্ধমান তরুণাস্থি কোষ প্রায় 25 বৎসর বয়স অবধি বর্তমান থাকে। এই অঞ্চলকে **এপিফাইসিয়েল প্লেট** (epiphyseal plate) বলা হয়। তবে এই প্লেট কখনও অধিক বাড়তে পারে না। উভয়প্রান্তেই ইহা অবক্ষেপনের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এরপরই এপিফাইসিস একীভূত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. কোষের সংজ্ঞা লিখ। চিত্রসহ একটি আদর্শ প্রাণীকোষের গঠনের বিশদ বিবরণ দাও এবং তাদের কার্যাবলী বিবৃত কর। (C. U. '66, '70, '73, 77 C. U. (2) 80)

2. (a) মাইটোকন্‌ড্রিয়া, (b) অন্তঃকোষজালক, (c) রাইবোসোম এবং (d) গল্‌জিবডির অবস্থানসহ একটি প্রাণীকোষের চিত্র অংকন কর এবং এদের কার্যাবলীর ব্যাখ্যা কর। (C. U. H. 76, 78)

3. নিউক্লিয়াসকে কোষের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় অংশ বলা হয় কেন? একটি নিউক্লিয়াসের গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর।

4. চিত্রসহ মাইটোকন্‌ড্রিয়া ও কোষঝিল্লির ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রীয় গঠন ও কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। (C. U. 71, 73, 75)

5. অন্তঃকোষজালক ও রাইবোসোমের বিশদ বিবরণ দাও।

6. কোষবিভাজন বলতে কি বুঝায়? স্নায়ুকোষে কোষবিভাজন অনুপস্থিত কেন? চিত্রসহ কোষবিভাজনের বিভিন্ন দশার আলোচনা কর। (C. U. 67, 71, 73, 74)

7. মানবদেহে কত প্রকার কলা দেখতে পাওয়া যায়? কি কি ভাবে তারা পরস্পর থেকে ভিন্ন? (C. U. 65)

8. পেশীকলা ও স্নায়ুকলার গঠন ও কার্যাবলীর তুলনা কর। (C. U. 76)

9. আবরণী কলা কাকে বলে? সংযোগী কলা থেকে এদের পার্থক্য কতটুকু? আবরণী কলার শ্রেণীবিন্যাস কর এবং তাদের অবস্থান ও কার্যাবলী বিবৃত কব। (C. U. 76, C. U. H, 78)

10. সংযোগী কলাব শ্রেণী বিভাগ কর এবং এদের যে কোন একটি বর্ণনা দাও। (C. U. (2) 80)

11. সংযোগী কলার গঠন বিশেষত্ব বর্ণনা কব এবং এদেব সংগে আবরণী কলার পার্থক্যসমূহ দেখাও। অস্থি ও কণ্ডরার প্রস্থচ্ছেদের সূক্ষ্ম গঠনের চিত্র অংকিত কর। (C. U. 74)

12. তরুণাস্থি কী ধরনের কলা? দেহের কোন্ কোন্ অংশে তাদের দেখতে পাওয়া যায়? তাদের সম্বন্ধে যা জান লিখ।

13. অ্যারিওলীয় কলার মধ্যে কত ধরনের কোষ দেখতে পাওয়া যায়? তাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কর।

14. ক্রমবর্ধনশীল অস্থির আণুবীক্ষণিক গঠন ও অস্থিবৃদ্ধি সম্বন্ধে যা জান বিশদভাবে আলোচনা কর। (C. U. H. 73, 78)

15. টীকা লিখ :—

(a) অন্তঃকোষ জালক, (b) রাইবোসোম গুটিকা, (c) ক্রোমোসোম, (d) মিওসিস, (e) আচ্ছাদক আবরণীকলা, (f) গ্রন্থিময় কলা, (g) হলদে স্থিতিস্থাপক কলা, (h) শ্বেততন্তু, (i) হায়ালিন তরুণাস্থি এবং (j) মাইটোকন্‌ড্রিয়া (76) (C. U. 72)

16. সংক্ষেপে উত্তর লিখ :

(a) মাস্ট কোষ ও প্লাজমা কোষের কাজগুলো কি কি? (C. U. 86)

(b) অস্টিওব্লাস্ট ও ওসটিওক্লাস্ট কোষের কার্যাবলী বর্ণনা কর। একটি ওস্টিওসাইট কোষের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর। (C. U. 85)

(c) চর্বিকলা ও অ্যারীওলীয় কলার পার্থক্য কি? (C. U. 84)

(d) একটি আদর্শ প্রাণীকোষের ইলেকট্রন-আণুবীক্ষণিক চিত্র অংকন কর। (C. U. 77, 84)

(e) আবরণীকলা ও সংযোগীকলার মধ্যে পার্থক্য কর। (C. U. 82)

চার

প্রাণপদার্থবিদ্যা

BIOPHYSICS
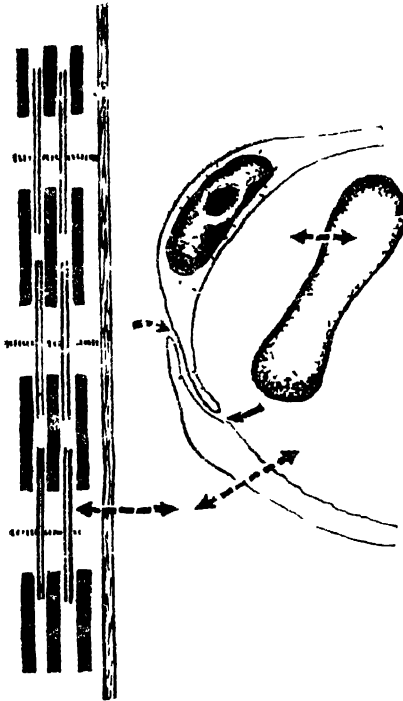
জৈব প্রক্রিয়া বা জৈব ঘটনাবলীর সংগে সম্পর্কযুক্ত পদার্থবিদ্যাকে **প্রাণপদার্থবিদ্যা** নামে অভিহিত করা হয়। এটি পদার্থবিদ্যার সূত্র, প্রযুক্তি কৌশল, যন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে প্রাণীদেহের জৈব ঘটনাবলীর অনুশীলন, পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা দিতে সক্ষম। শারীরবিজ্ঞানের তিনটি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়ঃ (1) জৈব ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় পদার্থবিদ্যার ব্যবহার, (2) জৈব ঘটনাবলীর অনুশীলনে পদার্থবিদ্যার প্রযুক্তি কৌশল ও যন্ত্রের ব্যবহার এবং (3) জৈব ঘটনাবলীর ওপর ভৌত পরিবেশীয় উপাদানের প্রভাব বিষয়ে অনুশীলন। .বে প্রাণ

পদার্থবিদ্যার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভবপর নয়। ভৌত প্রাণ-রসায়ন বলতে যা বোঝায় তার সবকিছুই যেমন এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তেমনি সাধারণ শারীরবিজ্ঞানের সব কিছুও এর অন্তর্ভুক্ত। তাই অম্ল, ক্ষারক, পি. এইচ, বাফার, কোলয়েড প্রভৃতি ভৌত রসায়নের বিষয়গুলি যেমন এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি ঝিল্লিভেদ্যতা, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিবহন, ডোনানের ঝিল্লিসাম্য প্রভৃতি সাধারণ শারীরবিজ্ঞানের বিষয়গুলিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি

Systeme International Units

কোন কিছুর পরিমাপলব্ধ মানকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন এককে প্রকাশ করা হত। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়। শিক্ষা, প্রযুক্তি, গবেষণা, পত্রপত্রিকার রচনা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই পরিস্থিতির সুরাহার জন্য 1960 সালে একটি আন্তর্জাতিক একক পরিমাপ সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার কাজ ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যাতে একই ধরনের একক ব্যবহার করে তার ব্যবস্থা করা। তাদের মতামতের ভিত্তিতে যে একক পদ্ধতির প্রচলন হয় তাকে **SI একক** (SI units) বা **আন্তর্জাতিক একক** পদ্ধতি (Systeme International units) বলা হয়। 1962 সালে SI এককের ব্যবহার সমগ্র বিশ্ব মেনে নেয়। ভারতেও 1970-71 সালে 'ওয়েট্‌স এণ্ড মেজারস্ অ্যাক্ট' (1956) সংশোধন করে SI এককের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি প্রধানত 7টি মৌলিক ভৌতরাশির উপর নির্ভরশীল। এই সাতটি ভৌতরাশিকে 1নং তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া

1নং তালিকা ঃ মৌলিক একক।

ভৌতরাশি	নাম	প্রতীক
দৈর্ঘ্য	মিটার	m
ভর	কিলোগ্রাম	Kg
সময়	সেকেণ্ড	S
তড়িৎপ্রবাহমাত্রা	অ্যাম্পিয়ার	A
উষ্ণতা	কেলভিন	K
দীপনমাত্রা	ক্যানডেলা	cd
পদার্থের পরিমাণ	মোল (mole)	mol

আরো দুটি অতিরিক্ত ও বহুলব্ধ একক SI এককের অন্তর্ভুক্ত। মৌলিক একক থেকে যেসব লব্ধ একক পাওয়া যায় 2নং তালিকায় তাদের লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া ডেসিমেল ভগ্নাংশ বা গুণিতক (multiples) বোঝাবার জন্য যেসব প্রাক্-শব্দ (prefixes) ব্যবহার করা হয় তাদের 3নং তালিকায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

SI এককের সুবিধেগুলো হল ঃ (1) কোন ভৌতরাশির কম বা বেশী মান বোঝাতে তাকে 10-এর ঘাতে (power) প্রকাশ করা হয়। তাই এই পদ্ধতিতে কম সময়ে কোন হিসেবকে নির্ভুলভাবে করা যায়। (2) SI এককের দুই বা ততোধিক রাশির গুণফল অথবা অনুপাতলব্ধ রাশি একক নির্দেশ করে। তাই ভৌত বা রাশিভিত্তিক সমীকরণে SI একক সহজে ব্যবহার করা যায়। (3) এটি পরম পদ্ধতি হওয়ার জন্য কিছু ক্ষেত্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) গুণ করায় যে জটিলতা দেখা যায় তা দূরীভূত হয়। (4) সি. জি. এস পদ্ধতির সংগে

2নং তালিকা ঃ কিছুসংখ্যক লব্ধ SI একক।

ভৌতরাশি	এককের নাম	এককের প্রতীক
ক্ষেত্রফল	বর্গমিটার	m^2
অপসারণ (clearance)	লিটার/সেকেন্ড	L/s
গাঢ়ত্ব ঃ		
ভর	কিলোগ্রাম/লিটার	kg/L
পদার্থ	মোল/লিটার	mol/L
ঘনত্ব	কিলোগ্রাম/লিটার	Kg/L
বিভব পার্থক্য	ভোল্ট	$V = Kgm^2/s^3A$
শক্তি	জুল	$J = Kgm^2/s^2$
বল	নিউটন	$N = Kgm/s^2$
কম্পাংক	হার্ৎস	Hz = 1 cycle/s
চাপ	প্যাসকেল	$Pa = Kg/ms^2$
উষ্ণতা	সেলসিয়াস ডিগ্রি	$°C = °K - 273{\cdot}15$
আয়তন	ঘনমিটার	m^3
	লিটার	$L = dm^3$

SI পদ্ধতির সরল সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে সহজে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তন করা সহজ সাধ্য। (5) SI এককে সবরকম শক্তির একক জুল। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের একক ব্যবহারের জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে।

3নং তালিকা : প্রমাণ প্রাক্‌শব্দাংশ।

প্রাক্‌শব্দাংশ	শব্দসংক্ষেপ	মাত্রা
টেট্রা (tetra)	T	10^{12}
জাইগা (giga)	G	10^{9}
মেগা (mega)	M	10^{6}
কিলো (kilo)	K	10^{3}
হেকটো (hecto)	h	10^{2}
ডেকা (deca)	da	10^{1}
ডেসি (deci)	d	10^{-1}
সেন্টি (centi)	c	10^{-2}
মিলি (milli)	m	10^{-3}
মাইক্রো (micro)	μ	10^{-6}
ন্যানো (nano)	n, mμ	10^{-9}
পিকো (pico)	p, $\mu\mu$	10^{-12}
ফেমটো (femto)	f	10^{-15}
অ্যাটো (atto)	a	10^{-18}

প্রাণীদেহের উপর পরীক্ষালব্ধ যে সব মান পাওয়া যায় তাদের কোন কোন ক্ষেত্রে SI একক এর [illegible] যায়। উদাহরণস্বরূপ এনজাইম একক। এই এককটি বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে বেশ প্রচলিত। সব না হলেও ক্ষেত্রবিশেষে SI একক এই বইতে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বর্তমানে সব ক্ষেত্রেই এই এককের ব্যবহার চলছে।

পদার্থের চলনের নিয়ন্ত্রক বলসমূহ
Forces Regulating Movement of Substances

দেহের সবরকম কোষই কোষবহিঃস্থ তরলে (extracellular fluid) সৃষ্ট এক 'আভ্যন্তরীণ সমুদ্রে' ডুবে থাকে। এই তরল থেকেই কোষগুলো O_2 ও পুষ্টি গ্রহণ করে এবং বিপাকলব্ধ বর্জ্য পদার্থকে ছেড়ে দেয়। বর্তমান সমুদ্রের জলের চেয়ে এই আভ্যন্তরীণ সমুদ্রের তরল অনেকটা লঘু, তবে আদিমকালে যে সমুদ্রে নূতন জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল এই তরলের উপাদান তারই মত। দেহের

মধ্যে এই তরল বিভিন্ন কামরা বা কম্পার্টমেণ্টে বিভক্ত হয়। আন্তরকোষীর তরল (interstitial fluid) ও রক্তসংবহনের প্লাজমা এর উদাহরণ। এছাড়া লসিকা মস্তিষ্কমেরুরস, কোষনিহিত তরল (intracellular fluid) প্রভৃতি বিভাগও রয়েছে। এসব বিভাগের তরলের উপাদান বিভিন্ন হয়, এর কারণ এরা পরস্পর সূক্ষ্ম পর্দা বা মেমব্রেনের (membrane) দ্বারা পৃথক হয়ে থাকে এবং সব রকম পদার্থের প্রতি এরা ভেদ্য নয়। কোষঝিল্লি কোষনিহিত তরল ও কোষবহিঃস্থ তরলকে পৃথক করে রাখে, তেমনি রক্তজালিকা প্লাজমা ও কোষবহিঃস্থ তরলকে পৃথক করে রাখে। যে সব বল (forces) এসব ঝিল্লিবাধার (membrane barrier) মধ্য দিয়ে জল ও অন্যান্য পদার্থকে বিনিময়ে সাহায্য করে তাদের মধ্যে প্রধান ব্যাপন (diffusion), দ্রাবক টান (solvent drag), অভিস্রবণ (osmosis) ঝিল্লিবিশ্লেষণ (dialysis), পরাপরিস্রাবণ (ultrafiltration), সক্রিয় পরিবহন (active transport) এবং এক্সোসাইটোসিস ও এনডোসাইটোসিস প্রভৃতি।

ব্যাপন

Diffusion

দুটো মিশ্রণযোগ্য পদার্থকে পরস্পরের সংস্পর্শে নিয়ে আসা হ'লে কিছুক্ষণের মধ্যে তারা একে অপরের ভেতরে প্রবেশ ক'রে একটি সমমিশ্রণ সৃষ্টি করে।
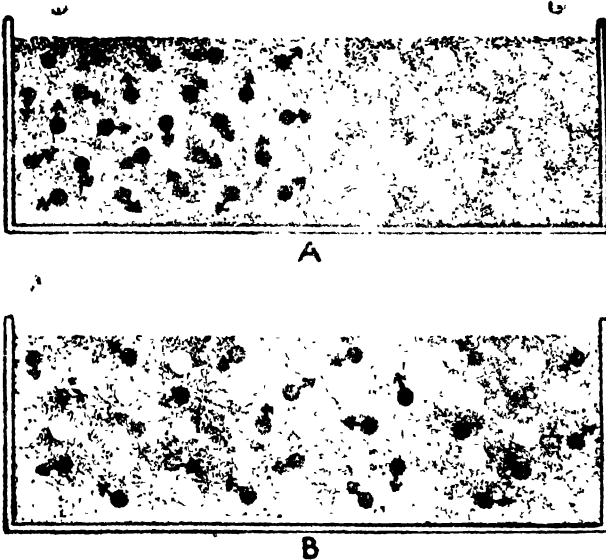
4-2 নং চিত্র : ব্যাপন প্রক্রিয়া। A : ব্যাপনের পূর্বাবস্থা, B : ব্যাপনের পরবর্তী অবস্থা।

(4-2নং চিত্র)। পরস্পরের সংস্পর্শে আসা পদার্থের এই স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরমিশ্রণকে **ব্যাপন** বলে। জলের অণুর সংগে জলে দ্রবণীয় পদার্থের অণুও এভাবে সমধর্মী দ্রবণের সৃষ্টি করে।

1. **ব্যাপনের পরীক্ষা** (Experiment on diffusion) : একটি জলপূর্ণ পাত্রে থিস্‌ল ফানলের সাহায্যে কিছু পরিমাণ লাল কালিকে পাত্রের তলদেশে ঢেলে দেওয়া হয়। প্রথম অবস্থায় জল ও কালির ভিন্নস্তর সহজেই পরিলক্ষিত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্তরমিশ্রণের ফলে পাত্রের সমগ্র জলই লাল হয়ে উঠে (4-3নং চিত্র)। পদার্থের অণুপরমাণুর সহজাত গতিশীলতাই এই অন্তরমিশ্রণের প্রধান কারণ।
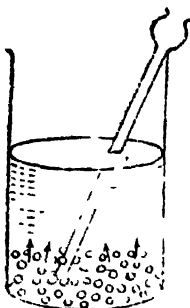
4-3 নং চিত্র ব্যাপনের পরীক্ষা।

2. **ব্যাপনের পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণসমূহ** (Factors affecting diffusion) : ব্যাপন যেমন পদার্থের অণুর সহজাত গতিশীলতার উপর নির্ভরশীল তেমনি এই গতিশীলতার পরিবর্তনে ব্যাপনের পরিবর্তন ঘটে। **গ্রাহাম** (Graham) দেখেছেন, (a) বিভিন্ন লবণদ্রবণের ব্যাপনহার ভিন্ন, (b) উষ্ণতার বৃদ্ধিতে ব্যাপনের হার বৃদ্ধি পায়, (c) কোলয়েড পদার্থের চেয়ে কেলাসপদার্থের ব্যাপনের হার বেশী এবং (d) লবণদ্রবণের ব্যাপনের হার দ্রবণের তীব্রতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

3. **ব্যাপনের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব** (Physiological importance of diffusion) : দেহের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জৈব ও অজৈব পদার্থের সংমিশ্রণ সবসময় সংঘটিত হয়। যেমন, জারকরসের সংগে খাদ্যের সংমিশ্রণ, অন্ত্র থেকে খাদ্যবস্তুর শোষণ, রক্তজালিকা থেকে কলারসে অথবা কলারস থেকে রক্তপ্রবাহে বিভিন্ন পদার্থের যাওয়া-আসা, ফুসফুসে গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণ এবং পরস্পর আদান-প্রদান ইত্যাদি। এই সব কার্য কতৃত্ত ব্যাপনের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়।

দ্রাবক টান

Solvent Drag

দ্রাবক খুব বেশী পরিমাণে কোন দিকে গতিশীল হলে কিছু পদার্থকে সে তার সংগে টেনে নিয়ে যায়। এই বলকে **দ্রাবক টান** (solvent drag) বলা হয়। তবে প্রাণীদেহে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর প্রভাব খুব বেশী নয়।

ঝিল্লিবিশ্লেষণ

Dialysis

ঝিল্লি বা অর্ধভেদ্য পর্দার সাহায্যে কোলয়েড থেকে কেলাসপদার্থ ও আয়নের পৃথকীকরণ পদ্ধতিকে **ঝিল্লিবিশ্লেষণ** বলা হয়। অর্ধভেদ্য পর্দা বা ঝিল্লিকে বিশ্লেষক ঝিল্লি (dialyser) বলা হয়। বিশ্লেষক ঝিল্লিব মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ দ্রবণের অধিকাংশ দ্রাব্যবস্তুই সহজে অতিক্রম কবতে পারে, কিন্তু কোলয়েড কণা পারে না। ফলে এই পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই তাদের পৃথক করা যায়। অবশ্য কোলয়েড থেকে আয়ন বা তড়িদ্বিশ্লেষ্যকে তড়িৎক্ষেত্রের মাধ্যমে আরও দ্রুত পৃথক কবা যায়। শেষোক্ত পদ্ধতিকে **তড়িৎ ঝিল্লিবিশ্লেষণ** নামে অভিহিত করা হয়।

1. **ঝিল্লিবিশ্লেষণের পরীক্ষা** (Experiment on dialysis) : বিশ্লেষক ঝিল্লির একটি থলিতে প্রোটিন ও সোডিয়াম ক্লোবাইডেব একটি মিশ্র দ্রবণ নেওয়া
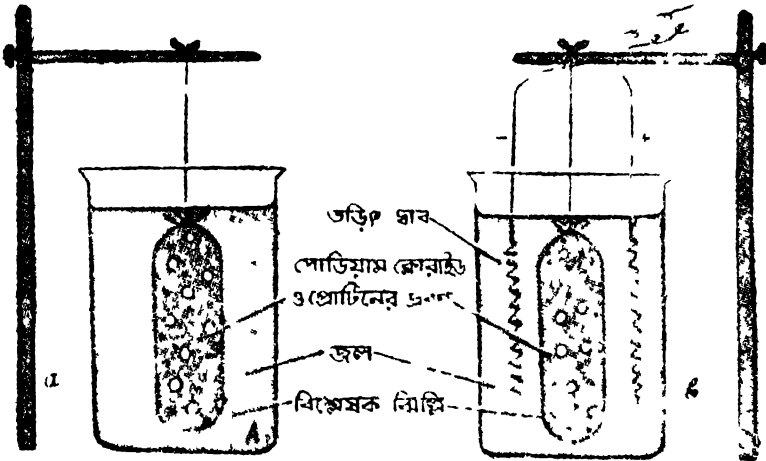
4-4নং চিত্র : ঝিল্লিবিশ্লেষণ।

হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড ঝিল্লির মধ্য দিযে সহজে অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু প্রোটিন একেবারেই পারে না (4-4aনং চিত্র)। এই থলিটিকে একটি জলপূর্ণ পাত্রে (A) ডুবান হয়। থলির অভিস্রবণ চাপ (osmotic pressure বেশী বলে A-পাত্রের জল থলিতে প্রবেশ করবে এবং একই সংগে সোডিয়াম ক্লোরাইড থলি থেকে A-পাত্রেব জলে চলে আসবে, কারণ থলিতে সোডিয়াম ক্লোবাইডেব তীব্রতা বেশী। A-পাত্রের জলকে এরপর পালটে নিয়ে পুনরায় নূতন জলে

ভর্তি করা হয়। এভাবে A-পাত্রের জলকে বার বার পালটে থলিস্থিত দ্রবণকে সম্পূর্ণরূপে লবণমুক্ত করা সম্ভব।

তড়িৎ ঝিল্লিবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুটো তড়িৎদ্বারকে ঝিল্লিবিশ্লেষক থলির উভয়-পার্শ্বস্থ জলে ডুবিয়ে তড়িৎক্ষেত্রের সৃষ্টি করা হয় (4-4b নং চিত্র)। ফলে থলির মধ্যস্থিত আয়ন তড়িৎক্ষেত্রের আকর্ষণে থলি থেকে নির্গত হয়ে জলে প্রবেশ করে। একই ভাবে পাত্রের জলকে পালটে থলির দ্রবণকে আয়নমুক্ত করা যায়।

2. **ঝিল্লিবিশ্লেষণের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব** (Physiological importance of dialysis) : মানবদেহে ঝিল্লিবিশ্লেষণের গুরুত্ব অনেকখানি। এই প্রক্রিয়া ব্যাপন ও অভিস্রবণের সংগে সম্মিলিতভাবে কাজ করে। শোষণের সময় বৃহদাকার খাদ্যকণার ক্ষুদ্রান্ত্রে আটকে পড়া, রক্তপরিস্রাবণের সময় কোলয়েড পদার্থের গ্লোমারুলাস ঝিল্লির মধ্য দিয়ে যেতে না পারা এবং সাধারণভাবে অ্যালবুমিন (albumin) ও গ্লোবিউলিন (globulin) জাতীয় প্রোটিনের রক্তজালিকা থেকে কলারসে প্রবেশ করতে না পারা ইত্যাদি সবই ঝিল্লিবিশ্লেষণের সংগে জড়িত।

অভিস্রবণ

Osmosis

যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে লঘুতর দ্রবণের বিশুদ্ধ দ্রাবক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে গাঢ়তর দ্রবণে প্রবেশ করে তাকে **অভিস্রবণ** বলে। 1748 খ্রীষ্টাব্দে **অ্যাবে নোলেট** (Abbe Nollet) অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার সঠিক পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন একটি অর্ধভেদ্য পর্দার থলি বা ব্লাডারকে অ্যালকোহল (alcohol) দ্বারা পূর্ণ ক'রে জলপূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে রাখলে থলি বা ব্লাডারটি ফেঁপেফুলে ওঠে। অপরপক্ষে থলি বা ব্লাডারটিকে জলপূর্ণ করে অ্যালকোহলপূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে রাখলে তা চুপসে যায়।

1 **অভিস্রবণের পরীক্ষা** (Experiment on osmosis) : চিনির দ্রবণে-পূর্ণ একটি ফানেলের মুখকে পার্চমেণ্ট পর্দা দ্বারা শক্ত করে বেঁধে একটি জলপূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যাবে জল ফানেলের নল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণই চলবে যতক্ষণ না বিপরীত জলের চাপ তাকে থামিয়ে দেবে (4-5নং চিত্র)।

2. **অভিস্রবণ চাপ** (Osmotic pressure) : অভিস্রবণের ফলে ফানেলে যে অধিক জলচাপের সৃষ্টি হয়, যা পাত্রস্থ জলকে আর ফানেলে প্রবেশ করতে দেয় না, তাকে **অভিস্রবণ চাপ** বলে। অর্থাৎ বিভিন্ন

তীব্রতার দুটো দ্রবণকে যদি অর্ধভেদ্য পর্দার উভয় পার্শ্বে রাখা হয়, তবে লঘুতর দ্রবণের দ্রাবক যাতে আর ঘনতর দ্রবণে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য গাঢ়তর দ্রবণে যে অধিক জলচাপ প্রযুক্ত হয়, তাকে **অভিস্রবণ চাপ** বলে। অভিস্রবণ চাপ উভয় দ্রবণের ব্যাপনচাপের অন্তরফলবিশেষ এবং এই চাপ উভয় দ্রবণের বিশুদ্ধ দ্রাবককে সাম্যাবস্থায় রাখতে সক্ষম। অভিস্রবণ চাপ দ্রবণের প্রকৃতি, তীব্রতা এবং উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল। গাঢ়তর দ্রবণ লঘুতর দ্রবণের দ্রাবককে যেমন সহজেই টেনে নিতে পারে তেমনই তার গাঢ়ত্ব হ্রাস পেলে অভিস্রবণের হারও হ্রাস পায়। লঘুতর দ্রবণে প্রতি একক ঘনত্বে বিশুদ্ধ দ্রাবক বা জলের অণুর সংখ্যা গাঢ়তর দ্রবণের দ্রাবকের অণুর চেয়ে অনেকগুণ বেশী হয়, ফলে লঘুতর দ্রবণের দ্রাবকের ব্যাপনচাপ গাঢ়তর দ্রবণের দ্রাবকের ব্যাপনচাপ অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। দ্রাবকের গতি তাই লঘুতর দ্রবণ থেকে ঘনতর দ্রবণের দিকে।
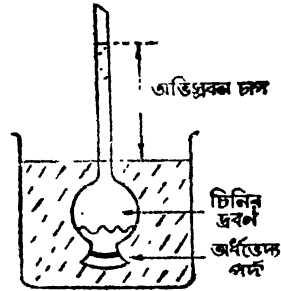
4-৬ নং চিত্র : অভিস্রবণ।

গ্যাসের চাপের মত অভিস্রবণ চাপও উষ্ণতা ও আয়তনের সংগে সম্পর্কযুক্ত

$$P=\frac{nRT}{V}$$

যেখানে, n = কণিকার সংখ্যা, R গ্যাস ধ্রুবক, T পরম উষ্ণতা এবং V পরিমাণ বা আয়তন। তাপমাত্রা নির্দিষ্ট থাকলে অভিস্রবণ চাপ দ্রবণের একক আয়তনের কণিকার (particles) সংখ্যার সমানুপাতিক। গ্লুকোজ প্রভৃতি পদার্থ যারা বিয়োজিত হয় না, অভিস্রবণ চাপ তাদের অণুর সংখ্যার সংগে সমানুপাতিক। কিন্তু যেসব পদার্থ বিয়োজিত হয়, যেমন NaCl, তারা Na^+ ও Cl^- আয়নকে 2টি ওসমোল (osmole) হিসাবে দ্রবণে সরবরাহ করে। তাই এক্ষেত্রে অভিস্রবণ চাপ বেশী হয়।

3. **দ্রবণের সংগে অভিস্রবণ চাপের সম্পর্ক** (Relation of solutions with osmotic pressure): যেসব দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ

সমান তাদের **সমসারক** (isotonic) দ্রবণ বলা হয়। তুলনামূলকভাবে কোন একটি দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ কম হলে তাকে, **লঘুসারক** (hypotonic) এবং বেশী হলে **অতিসারক** (hypertonic) দ্রবণ বলে। সোডিয়াম ক্লোরাইডের 0·9 শতাংশ দ্রবণ প্লাজমার সংগে সমসারক বলে তাকে **প্রমিত লবণজল** (normal saline) বা **শারীরবৃত্তীয় লবণজল** (physiological saline) বলা হয়। দ্রাক্ষাশর্করা বা গ্লুকোজের 5 শতাংশ দ্রবণের অভিস্রবণ চাপও একই, তবে ঝিল্লীর মধ্য দিয়ে এর ভেদ্যতা ভিন্ন করে একে সমসারক দ্রবণ নাও বলা যেতে পারে। তবে প্রমিত লবণজলের মতে একেও জীবাণুমুক্ত অবস্থায় শিরাতে ইন্‌জেক্‌ট কবা চলে।

সমসারক দ্রবণে রক্তস্থিত লোহিতকণিকাকে ডুবালে তাদের গঠনের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। তবে অতিসারক ও লঘুসাবক দ্রবণে ডুবালে তারা যথাক্রমে কুঞ্চিত হয় এবং ফেঁপেফুলে ওঠে ফেটে যায়। নিম্নলিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে তা প্রমাণ করা যায়। তিনটি পরীক্ষানলের একটিতে 0 90 শতাংশ NaCl এর দ্রবণ, অন্যটিতে 0·25 শতাংশ এবং তৃতীয়টিতে 1 25 শতাংশ NaCl এর দ্রবণ নেওয়া হয়। এই তিনটি পবীক্ষানলের প্রত্যেকটিতে কিছু-
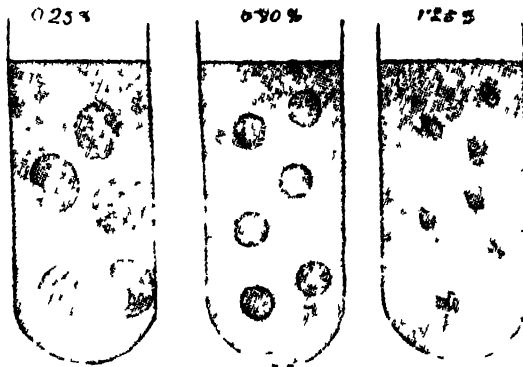
4 6 নং চিত্র : কিছুসংখ্যক জীবন্ত লোহিতকণিকাকে সমসারক, লঘুসারক ও অতিসারক দ্রবণে ডুবালে যে পরিবর্তন দেখা যায়।

সংখ্যক জীবন্ত লোহিতকণিকা ফেলা হয়। 0·90 শতাংশ লবণজলসম্পন্ন পরীক্ষা-নলের লোহিতকণিকার মধ্যে কোন রকম পবিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে না (4-6নং চিত্র), কারণ 0·90 শতাংশ লবণজল প্লাজমার সংগে সমসারক বা সমান অভিস্রবণ চাপসম্পন্ন। 0·25 শতাংশ লবণজলসম্পন্ন পরীক্ষানলের লোহিতকণিকা ধীরে

ধীরে ফেঁপেফুলে ওঠে ; পরিশেষে ফেটে যায় ও হিমোগ্লোবিন কোষ থেকে নির্গত হয়। 0·25 শতাংশ লবণজলের অভিস্রবণ চাপ প্লাজমার অভিস্রবণ চাপের চেয়ে কম, অর্থাৎ ইহা লঘুসারক দ্রবণ। অভিস্রবণ চাপ হ্রাস পেলে ব্যাপন চাপের বৃদ্ধি ঘটে। তাই এই দ্রবণে ডুবে থাকা লোহিতকণিকা প্রচুর পরিমাণে জল গ্রহণ ক'রে ফেঁপেফুলে ওঠে এবং ভেতরকার জলচাপ সহ্য করতে না পেরে ফেটে যায়। 1·25 শতাংশ লবণজল প্লাজমার সংগে অতিসারক বলে লোহিত-কণিকার অভ্যন্তরস্থ জলকে ইহা বিপরীত অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বের করে নিয়ে আসে, ফলে লোহিতকণিকা চুপসে যায়।

4 **অভিস্রবণের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব** (Physiological importance of osmosis) **:** অভিস্রবণ জল ও ভেদ্য পদার্থকে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেবার কাজে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে প্রাণীকোষ তার চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রবণে যেমন ভেসে আছে তেমনই তার অভ্যন্তরে রয়েছে গাঢ়তর জটিল দ্রবণ। জল, নানাপ্রকার লবণ এবং অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থ তাই অভিস্রবণের মাধ্যমে কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। অধিক জল পান করলে রক্তের অভিস্রবণ চাপ হ্রাস পায় এবং ব্যাপন চাপের বৃদ্ধি ঘটে। জল তাই রক্ত থেকে কলান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া এই তরল রক্ত যখন বৃক্ক বা কিডনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন অধিক পরিমাণে মূত্র উৎপন্ন হয়। রক্তের অভিস্রবণ চাপ পূর্বের অবস্থায় ফিরে না আসা অবধি এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। জ্বর ইত্যাদি রোগে যখন দেহে জলের ঘাটতি দেখা দেয়, তখন রক্ত এবং কলারস (tissue fluid) গাঢ়তর হয়। বৃক্ক তখন মূত্র উৎপাদন করতে অসমর্থ হয়। রোগী অ্যানুরিয়া (anuria) রোগে ভোগে। এছাড়া অন্ত্র থেকে বিশোষণ, রক্তজালিকার বিনিময়, মস্তিষ্কমেরুরসে পুনর্বিশোষণ, রক্তকোষ ও প্লাজমার মধ্যে বিনিময় ইত্যাদি কার্যে অভিস্রবণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। চিকিৎসা ও পরীক্ষাগারে বিভিন্ন অভিস্রবণ চাপসম্পন্ন দ্রবণের ব্যবহার করা হয়।

পরাপরিস্রাবণ
Ultrafiltration

অর্ধভেদ্য পর্দা বা জেলিফিল্টারের (jelly filter) মধ্য দিয়ে দ্রাবক ও বিশুদ্ধ দ্রবণের দ্রাব-বস্তুকে কোলয়েড পদার্থ থেকে চাপ প্রয়োগের দ্বারা পৃথক করার নাম **পরাপরিস্রাবণ**। দ্রবণের উপর যে চাপ প্রয়োগ করা হয়, তারই

ফলে বিপরীত অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ তীব্রতার নীতমাত্রার (concentration gradient) বিরুদ্ধে, দ্রাবক বা জল ঘনতর দ্রবণ থেকে লঘুতর দ্রবণে অনুপ্রবেশ করে। এই পদ্ধতির সাহায্যে মিশ্র কোলয়েডদ্রবণ থেকে বিভিন্ন আকৃতির কোলয়েডকণাকে পৃথক করা যায়। এ কাজে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির সক্রিয় (effective) রন্ধ্রসম্পন্ন পর্যায়ক্রমিক ফিলটারের ব্যবহার করা হয়।

1. **পরাপরিস্রাবণের পরীক্ষা** (Experiment on ultrafiltration) : বিভিন্ন আকৃতির রন্ধ্রসম্পন্ন কিছু সংখ্যক ফিলটারের দ্বারা নির্মিত একটি পাত্র নেওয়া হয়। পাত্রের ফিলটারগুলো পর্যায়ক্রমে এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যাতে সবচেয়ে বড় রন্ধ্রযুক্ত ফিলটার সবচেয়ে ভেতরে এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্র আকৃতির রন্ধ্রসম্পন্ন ফিলটারগুলো পর পর বহির্দেশে থাকে। মিশ্র কোলয়েডের দ্রবণ মধ্যভাগে নেওয়া হয় এবং তার উপর বিশেষ চাপ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। চাপের ফলে বিভিন্ন আকৃতির কোলয়েডকণা পৃথক হয়ে বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে ছড়িয়ে পড়ে
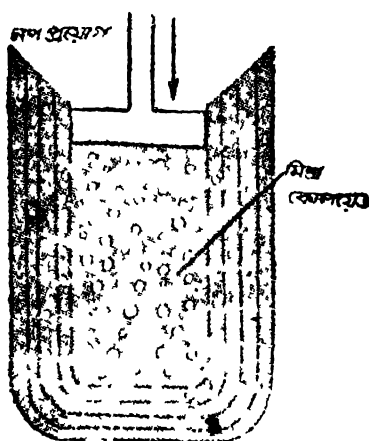
4 নং চিত্র : পরাপরিস্রাবণ।

মিশ্র কোলয়েডকে শুধু যে এভাবে পৃথক করা যায় তা নয়, দুটো ফিলটারের মধ্যবর্তী কোলয়েডকণার আকৃতিও জানা যায়।

2. **পরাপরিস্রাবণের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব** (Physiological importance of ultrafiltration) : পরাপরিস্রাবণ পদ্ধতির সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরে রক্তরস বা প্লাজমা থেকে কোষবহির্ভূত তরলপদার্থ (extracellular fluid) উৎপন্ন হয়। একই ভাবে গ্লোমেরুলাসে (glomerulus) প্লাজমা পরিস্রুত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই নালিকাঝিল্লি (capillary membrane) রন্ধ্রসম্পন্ন ফিলটার হিসাবে কাজ করে। তাছাড়া প্লাজমার ওপরে যে বিরুদ্ধ চাপ প্রয়োগ করা হয়, তা প্রযুক্ত না হলে পরিস্রুত তরলপদার্থ প্লাজমাতে পুনরায় ফিরে আসবে। এসব শারীরবৃত্তীয় কার্য ছাড়াও কোলয়েড দ্রবণে দ্রবীভূত পদার্থকে এই পদ্ধতির সাহায্যে পৃথক করা যায়।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিবহন

Active and Passive Transport

নানাপ্রকার পদার্থ কোষঝিল্লির মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসা করে। কোষ থেকে বা কোষের মধ্যে পদার্থের এধরনের যাওয়া-আসাকে **পরিবহন** বলা হয়। দুটি প্রধান পদ্ধতির সাহায্যে পদার্থ কোষঝিল্লির মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়। এই পদ্ধতি দুটি হল: (1) **সক্রিয় পরিবহন** এবং (2) **নিষ্ক্রিয় পরিবহন** বা ব্যাপন। সক্রিয় পরিবহনে রাসায়নিক শক্তি ও বাহকপদার্থের (carrier substances) উপস্থিতি অপরিহার্য। নিষ্ক্রিয় পরিবহনে এই দুটি উপাদানের প্রয়োজন হয় না, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বাহকপদার্থের উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় পরিবহন ত্বরান্বিত হয়। এধরনের পরিবহনকে **সহায়ক ব্যাপন** (facilitated diffusion) বলা হয়। অনেক হরমোন শেষোক্ত পরিবহনের নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, পেশীকোষে গ্লুকোজের সহায়ক ব্যাপনে ইনসুলিন সহায়তা করে।

সক্রিয় পরিবহন (Active Transport): পদার্থ মাত্রেই তাদের স্থিতি-শক্তির উর্ধ্ব অবস্থা থেকে নিম্ন অবস্থায় নেমে আসতে চায়। সুতরাং কোন পদার্থকে তার স্থিতিশক্তির নিম্ন অবস্থা থেকে যদি জোর করে উর্ধ্ব অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়, তবে সেই প্রক্রিয়াকে **সক্রিয় পরিবহন** বলা হয়। সক্রিয় পরিবহন বাহক (carrier) ও রাসায়নিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল। যেসব পদার্থ সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে কোষঝিল্লির মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসা করে তাদের মধ্যে প্রধান: সোডিয়াম আয়ন, পটাসিয়াম আয়ন, ক্যালসিয়াম আয়ন, আয়রন আয়ন, হাইড্রোজেন আয়ন, আয়োডাইট আয়ন, ইউরিয়েট আয়ন, বিভিন্ন প্রকার শর্করা এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড।

সক্রিয় পরিবহন বাহক ব্যতিরেকে সংঘটিত হতে পারে না। এই পরিবহনের **মূল প্রক্রিয়া** নিম্নরূপ: পদার্থটি (s) কোষঝিল্লির উপরিতলে প্রবেশ করে বাহকের (c) সংগে যুক্ত হয়। এরপর কোষঝিল্লির অন্তঃস্থ তলে এসে বাহক থেকে পৃথক হয়ে কোষসাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে; বাহক উপরিতলে ফিরে যায়। শক্তিব্যয় এই পরিবহনে অপরিহার্য।

জানা গেছে, যে পদার্থটি কোষসাইটোপ্লাজমে পরিবাহিত হয়, তার প্রতি বাহকের একটা স্বাভাবিক আসক্তি থাকে। এই আসক্তির দরুণ পদার্থটি সহজভাবে বাহকের সংগে যুক্ত হতে পারে ও সংযুক্তভাবে কোষঝিল্লির অন্তঃস্থ

তলে পৌঁছতে পারে। কোষের অন্তঃস্থ তলে ATP ও এনজাইমের বিক্রিয়ার দ্বারা পদার্থটিকে বাহক থেকে আলাদা করতে হয়। পদার্থটি চর্বিজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় নয় বলে কোষের বাইরের দিকে আর যেতে পারে না, ফলে কোষ সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। বাহক পুনরায় বহির্দেশে ফিরে যায় ও পদার্থের আরেকটি অণুর সংগে সংযুক্ত হয়।
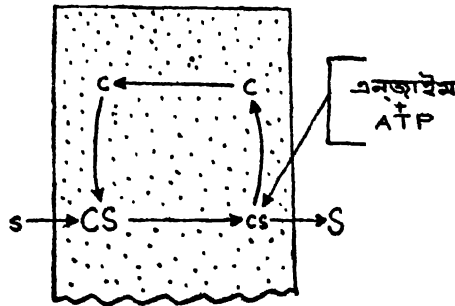
4-৪নং চিত্র ঃ সক্রিয় পরিবহনের মূল প্রক্রিয়া। S বাহকটি এক্ষেত্রে সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে সাইটোপ্লাজম থেকে বেরিয়ে আসছে।

বাহকটি **প্রোটিন** বা **লাইপোপ্রোটিন** জাতীয় পদার্থ। প্রোটিন অংশ বাহকের সংগে পরিবাহিত পদার্থের সংযুক্তিস্থানের জোগান দেয়, অপরপক্ষে লিপিড বা চর্বিজাতীয় অংশ কোষঝিল্লির চর্বিতে দ্রবীভূত হতে সহায়তা করে।

কোষঝিল্লিতে বিভিন্ন ধরনের বাহকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদের কোনটি সোডিয়াম বা পটাসিয়াম ইত্যাদির পরিবহনের সংগে যুক্ত, কোনটি গ্লুকোজের পরিবহনের সংগে যুক্ত, আবার কোনটি বা অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিবহনের সংগে যুক্ত।

1. **সক্রিয় পরিবহনের অন্যান্য স্থান ঃ** কোষঝিল্লি ছাড়াও কোষের অন্যান্য স্থানে বা সমগ্র কোষস্তরের মধ্য দিয়েও সক্রিয় পরিবহন সংঘটিত হতে পারে। মাইটোকন্ড্রিয়া ও অন্তঃস্থ জালকে সক্রিয় পরিবহন লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ভেদ্যতা ও পরিবহনের বৈশিষ্ট্য খানিকটা আলাদা।

সমগ্র কোষস্তরের মধ্য দিয়েও সক্রিয় পরিবহন লক্ষ্য করা যায় ক্ষুদ্রান্ত্রের আবরণী কোষে, রেচন নালিকার আবরণী কোষে, বহিঃক্ষরা গ্রন্থির আবরণী কোষে, মস্তিষ্কের করোয়েড প্লেক্সাসে এবং আরও নানা স্থানে। এরকম একটি

সক্রিয় পরিবহনের বৈশিষ্ট্য 4-9নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি দুটো কোষের ওপরের দিকে কোষের অন্তর্বর্তী স্থান খুব কম, নিচের দিকে কিন্তু তা
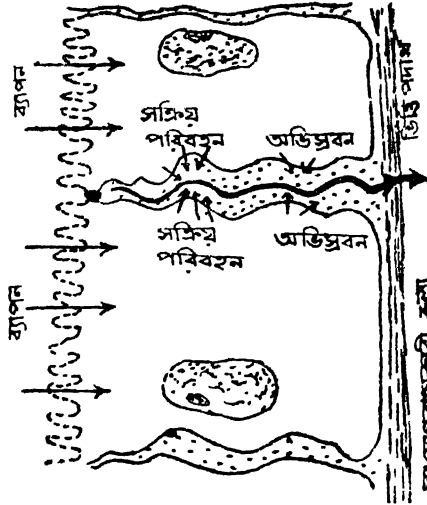
4-9নং চিত্র : ক্ষুদ্রান্ত্রের আবরণী কোষের মধ্য দিয়ে সক্রিয় পরিবহন।

বেশ বিস্তৃত। এজাতীয় কোষের উপরিতলীয় ভেদ্যতা খুবই বেশী। ফলে জল সমেত অনেক পদার্থই সহজে কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এসব পদার্থের কিছু এরপর সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে দুটো কোষের অন্তর্বর্তী স্থানে পাচার হয়। এসব কোষের ভিত্তিপদার্থও খুব ভেদ্য। ফলে কোষ-অন্তর্বর্তী স্থানে পাচার-হওয়া পদার্থ সহজেই সংযোগরক্ষাকারী কলায় প্রবেশ করতে পারে।

4-10নং চিত্র : সোডিয়াম-পটাসিয়াম পাম্প।

2. সক্রিয় পরিবহনের উদাহরণ : আয়ন, শর্করা ও অ্যামাইনো অ্যাসিডের সক্রিয় পরিবহনের বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচিত হল।

(a) সোডিয়াম আয়নের সক্রিয় পরিবহন : দেহের প্রায় প্রতিটি কোষেই সোডিয়ামের সক্রিয়পরিবহন লক্ষ্য করা গেছে। কোষের ভেতরে সোডিয়াম আয়ন কম থাকে, বাইরে বেশী। সোডিয়াম আয়নকে তাই কোষের
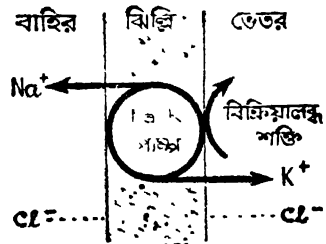
ভেতর থেকে বাইরে নিয়ে যেতে হলে শক্তিক্ষয় ছাড়া তা সম্ভবপর হয় না। কোষে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে Na^+ আয়ন যত তাড়াতাড়ি কোষে প্রবেশ করে, তাকে পাম্প করে বহিষ্কার করতে তত বেশী শক্তির' প্রয়োজন হয়। কোষ-ঝিল্লিতে সক্রিয় এমন একটি সোডিয়াম-পটাসিয়াম পাম্পকে 4-10নং চিত্রে দেখান হয়েছে।

বহির্দেশ কোষঝিল্লি অন্তর্দেশ
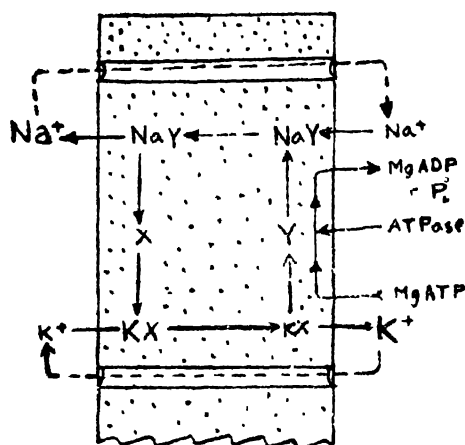
4-11নং চিত্র: সোডিয়াম আয়নের সক্রিয় পরিবহন।

সোডিয়ামের সক্রিয় পরিবহনের প্রক্রিয়া নিম্নরূপ: কোষের অভ্যন্তরে Na^+ বাহক Y এর সংগে যুক্ত হয়ে প্রচুর পরিমাণে NaY তৈরী করে। NaY এরপর ঝিল্লির বহির্দেশে আসে। Na^+ মুক্ত হয়। বাহক Y এর সামান্য রাসায়নিক পরিবর্তনে এটি X-এ রূপান্তরিত হয়। X এরপর K^+ আয়নের সংগে যুক্ত হয়ে KX গঠন করে এবং কোষের অন্তর্দেশে এগিয়ে যায়। K^+কে X থেকে পৃথক করার জন্য শক্তি প্রয়োজন হয়, যা MgATP থেকে আসে। ATP-ase এনজাইম এই বিক্রিয়া পরিচালনা করে। এই সময়ে X বাহক Y-তে পুনরায় রূপান্তরিত হয় এবং Na^+-এর সংগে যুক্ত হয়ে তার পরিবহনে পুনরায় নিয়োজিত হয়। এই বাহকটি সম্ভবত লাইপোপ্রোটিন এবং সম্ভবত এটিই ATP-ase হিসাবে কাজ করে।

(b) **শর্করার সক্রিয় পরিবহন:** গ্লুকোজ ও অন্যান্য কিছু শর্করা প্রধানত বাহকের উপস্থিতিতে কোষে কোষে পরিবাহিত হয়; কিন্তু কিছু

ক্ষেত্রে শর্করার পরিবহন সক্রিয়। যেমন, ক্ষুদ্রান্ত্র, রেচন নালিকা ইত্যাদি। গ্লুকোজ, গালাক্টোজ, ফ্রাক্টোজ, ম্যানোজ, জাইলোজ, অ্যারাবিনোজ, সরবোজ প্রভৃতি শর্করা প্রধানত সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে।

শর্করার পরিবহনের সংগে যুক্ত বাহক ও রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্বন্ধে সবিশেষ জানা যায়নি। তবে একক শর্করার দ্বিতীয় কার্বনস্থানে যে –OH গ্রুপ রয়েছে, তা পরিবহনের সময় বাহকের সংগে যুক্ত হয় বলে জানা গেছে। যেসব শর্করার দ্বিতীয় কার্বন স্থানে –OH গ্রুপ নেই, তাদের ক্ষেত্রে আলাদা বাহক কাজ করে বলে ধারণা করা হয়।

এছাড়াও, জানা গেছে সোডিয়ামের সক্রিয় পরিবহন বন্ধ করলে শর্করার পরিবহনও ব্যাহত হয় বা বন্ধ হয়ে যায়। এ থেকে ধারণা করা হয়, সোডিয়ামের পরিবহন সম্মিলিতভাবে একক শর্করার পরিহনের সংগে যুক্ত হয়ে যে শক্তি জোগায় প্রধানত তার দ্বারাই একক শর্করার পাবিবহন সংঘটিত হয়। শর্করার পরিবহনকে তাই **গৌণ সক্রিয় পরিবহন** এবং সোডিয়ামের পরিবহনকে **মুখ্য সক্রিয় পরিবহন** নামে অভিহিত করা হয়।

(c) **অ্যামাইনো অ্যাসিডের সক্রিয় পরিবহন** : অ্যামাইনো অ্যাসিডের সক্রিয় পরিবহনের সংগে প্রায় চার ধরনের বাহক ব্যবস্থা যুক্ত রয়েছে। অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিবহন গ্লুকোজের মত যেমন সোডিয়ামের ওপর নির্ভরশীল তেমনি পিরাইডোক্সিনের (B_6) ওপরও নির্ভরশীল। এই ভিটামিনটির অভাবে তাই দেহে প্রোটিনের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

চার ধবনের বাহক চার ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিবহনেব সংগে জড়িত : প্রথম বাহক প্রশমিত অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিবহনের সংগে যুক্ত, দ্বিতীয় বাহক **ক্ষারীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড**, তৃতীয় বাহক **অম্লধর্মী অ্যামাইনো অ্যাসিড**, এবং চতুর্থ বাহক **প্রোলাইন** ও **হাইড্রোক্সিপ্রোলাইন** নামক দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিবহনের সংগে যুক্ত।

কোলয়েড ও তার ধর্ম

Colloid and its Properties

1. **কোলয়েডের প্রকৃতি** (Colloidal Nature) : বিজ্ঞানী গ্রাহামের (Graham) ধারণা ছিল কোলয়েড একপ্রকার পদার্থ যা জলে দ্রবীভূত হয়ে যে দ্রবণ তৈরী করে তা পার্চমেন্ট পর্দার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। প্রোটিন, গাম, ট্যানিন (tannin) ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে। তেমনি যেসব পদার্থ

জলীয় দ্রবণে পার্চমেণ্ট পর্দার মধ্য দিয়ে সহজে অতিক্রম করতে পারে, তিনি তাদের নাম দিলেন কেলাস পদার্থ (crystalloids)। পরে প্রমাণিত হল, **কোলয়েড কোন প্রকার পদার্থ নয়, পদার্থের একটি অবস্থামাত্র। যে কোন পদার্থকে এই অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভবপর।** কিছু কিছু পদার্থ সব সময়েই এই অবস্থায় থাকে। কোলয়েড দুটো দশা (phase) নিয়ে গঠিত ; (*a*) **অবিচ্ছিন্ন বিসরণ মাধ্যম** (continuous dispersion medium) এবং (*b*) **বিচ্ছিন্ন বিস্তৃত দশা** (discontinuous dispersed phase)। বিচ্ছিন্ন বিস্তৃত দশা নির্দিষ্ট উর্ধ্ব ও নিম্ন ব্যাসবিশিষ্ট দ্রাব-বস্তুর বিক্ষিপ্ত কণা (particles) দ্বারা গঠিত। এদের উর্ধ্ব ব্যাস যেমন 5×10^{-5} সে. মি. বা 500mμ তেমনই নিম্ন ব্যাস 1×10^{-7} সে. মি. বা 1mμ হয়। এই কণাগুলি শুধুমাত্র একটি বৃহৎ অণু বা অনেকগুলো ক্ষুদ্র অণুর দ্বারা গঠিত হতে পারে। যেমন, প্রোটিন ইত্যাদির অণু এবং সোনা, রূপা, প্লাটিনাম ইত্যাদির অণু।

বিসরণ মাধ্যম ও বিস্তৃত দশা উভয়েই তরল, গ্যাসীয় বা কঠিন হতে পারে। ধুয়াতে বিসরণ মাধ্যম গ্যাসীয় এবং বিস্তৃত দশা কঠিন ধূলিকণা দ্বারা গঠিত। অন্যপক্ষে মেঘ, কুয়াশা ইত্যাদিতে বিসরণ মাধ্যম গ্যাসীয় এবং বিস্তৃত দশা তরল কণায় গঠিত। তেমনই ফেনাতে (foam) বিসরণ মাধ্যম তরল এবং বিস্তৃত দশা গ্যাসীয়। কিছু সংখ্যক খনিজ পদার্থে বিসরণ মাধ্যমকে কঠিন পদার্থ হিসাবেও দেখা যায়। যেমন, রুবি গ্লাস (ruby glass)। এখানে স্বর্ণকণা কঠিন কাঁচের মধ্যে বিক্ষিপ্ত থাকে

2. **কোলয়েডের শ্রেণীবিভাগ** (Classification of colloids) **:** কোলয়েডকে মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় **:** (a) দ্রাবক-অনাসক্ত বা লায়োফবিক (lyophobic) এবং (b) দ্রাবক-আসক্ত বা লায়োফিলিক (lyophilic) কোলয়েড।

(a) **দ্রাবক অনাসক্ত কোলয়েড :** কোলয়েডকণা ও বিসরণ মাধ্যমের মধ্যে আসক্তি বা আকর্ষণ কম হলে, এজাতীয় কোলয়েডকে দ্রাবক-অনাসক্ত কোলয়েড বলা হয়। এই শ্রেণীর কোলয়েড তুলনামূলকভাবে অস্থায়ী। সামান্য পরিমাণে তড়িৎ-বিশ্লেষ্যসংযোগে (electrolytes) কোলয়েডের এই বিক্ষিপ্ত কণাগুলো অধঃক্ষিপ্ত (precipitated) বা তঞ্চিত (coagulated) হয়। তাছাড়া বাষ্পীভবন (evaporation) বা শীতলীকরণে (cooling) এজাতীয় কোলয়েড

থেকে যে কঠিন পদার্থ পাওয়া যায় তাকে বিপরীত ভৌত পরিবর্তনের সাহায্যে (দ্রাবক মিশিয়ে বা পর্যায়ক্রমে উষ্ণ করে) পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না। বস্তুতপক্ষে এই কোলয়েডকণা ক্ষুদ্র অণুর সমষ্টি দ্বারা গঠিত। যেমন ঃ সালফার, সালফাইড, সিলভার হ্যালাইড (silver halides) ইত্যাদির দ্রবণ এজাতীয় কোলয়েড।

দ্রাবক-অনাসক্ত কোলয়েডকে **অবলম্ব** (suspension) বলা হয়।

(b) **দ্রাবক-আসক্ত কোলয়েড ঃ** এই জাতীয় কোলয়েডে বিসরণ মাধ্যম ও কোলয়েডকণার মধ্যে প্রচণ্ড আকর্ষণ বা আসক্তি থাকে। এজাতীয় কোলয়েডের সান্দ্রতা (viscosity) যেমন বেশী তেমনি অধিক পরিমাণে তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের উপস্থিতি ছাড়া এদের অধঃক্ষেপণ সম্ভব নয়। তরল-আসক্ত কোলয়েডকে বাষ্পীভবন ও শীতলীকরণে যে কঠিন পদার্থ পাওয়া যায় তাকে যথাযথ দ্রাবকে মিশিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। কারণ, এক্ষেত্রে কোলয়েডকণা শুধুমাত্র বৃহৎ একক অণুর দ্বারা গঠিত। যেমন ঃ প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড (polysaccharides) ইত্যাদির অণু।

দ্রাবক-আসক্ত কোলয়েডকে **অবদ্রব** (emulsion) বলা হয়।

3. **সোল ও জেল** (Sol and gel) ঃ কোলয়েডের বিসরণ মাধ্যম তরল পদার্থ হ'লে তাকে **সোল** (sol) বলা হয়। কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় এই সোলকে (বিশেষ করে অবদ্রবকে) তঞ্চিত করা সম্ভব। এর ফলে অর্ধকঠিন জেলির মতো যে পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং যার মধ্যে সোলের সবটুকু তরলই অন্তর্ভুক্ত থাকে তাকে **জেল** (gel) বলা হয়।

সোল থেকে জেল উৎপাদনের সময় সোলের কোলয়েডকণা ধীরে ধীরে সংযুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তুর (thread) সৃষ্টি করে। এই তন্তুসমূহ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কৈশিক বলের (capillary force) দ্বারা তাদের অন্তর্বর্তীস্থানে জলকে ধরে রাখে। জলের একাংশ সম্ভবত কোলয়েডকণার তন্তুশৃংখলে জল-যোজনের জল (water of hydration) হিসাবে অবস্থান করে। এভাবে অধিক সান্দ্রতাসম্পন্ন অর্ধকঠিন জেল উৎপন্ন হয়।

সোলের ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম তরল এবং বিক্ষিপ্ত দশা কঠিন হয়, কিন্তু জেলের ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম কমবেশী কঠিন এবং বিক্ষিপ্তদশা তরল হয় (4-12 নং চিত্র)।

জেলকে স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক এই দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। জেলাটিনকে ঠাণ্ডা করে স্থিতিস্থাপক জেল (জেলাটিন জেল) পাওয়া যায়। সিলিসিক অ্যাসিডের সংগে সঠিক অনুপাতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তেমনি অস্থিতিস্থাপক জেল (সিলিকা জেল) পাওয়া যায়। জেলাটিন জেলি, ফলের আচার, ফলের জেলি প্রভৃতি খাদ্যবস্তু স্থিতিস্থাপক জেলের উদাহরণ।
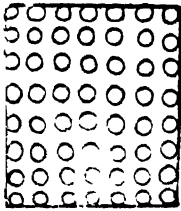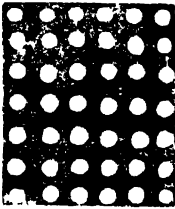
সোল

জেল

4-11নং চিত্র : সোল ও জেলের পার্থক্য।

জেল স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক হবে, তা' নির্ভর করে সোলের কোলয়েডকণার (যারা তন্তুশৃঙ্খল রচনা করে) ভৌত ও রাসায়নিক প্রকৃতির ওপর। স্থিতিস্থাপক জেলকে অংশত নিরুদন করলে ইহা স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থে রূপান্তরলাভ করে। এই কঠিন পদার্থে জল মিশিয়ে ও প্রয়োজনে গরম করে পূর্বের সোলকে ফিরে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে অস্থিতিস্থাপক জেল নিরুদনের ফলে পাউডার ও কাচ সদৃশ পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

4. **কোলয়েডের প্রস্তুতিকরণ** (Preparation of colloid) : তিনটি পদ্ধতিতে কোলয়েড প্রস্তুত করা যায় : (a) ঘনীকরণ পদ্ধতি (condensation method), (b) বিসরণ পদ্ধতি (despersion method) এবং (c) তড়িৎপদ্ধতি (electrical method)।

(a) **ঘনীকরণ পদ্ধতি :** যেসব দ্রাববস্তু আয়ন বা অণু হিসাবে বিশুদ্ধ দ্রবণে অবস্থান করে তাদের এই পদ্ধতির সাহায্যে কোলয়েডে পরিণত করা হয়। দ্রাববস্তুর অণু বা আয়নের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তাদের অদ্রবণীয় কোলয়েডকণায় রূপান্তরিত করা হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া জারণ বা বিজারণ-ধর্মী হতে পারে। যেমন, কোন দ্রবণে দ্রবীভূত লবণ বা অক্সাইডের মধ্যে বিজারণধর্মী বিক্রিয়া ঘটিয়ে **ধাতব সোল** (metal sol) প্রস্তুত করা হয়। আর্দ্রবিশ্লেষণের দ্বারা অ্যালুমিনিয়াম, ক্রোমিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি **হাইড্রাস অক্সাইড সোল** উৎপাদন করা হয়।

(b) **বিসরণ পদ্ধতি :** যেসব পদার্থ বৃহদায়তন হিসাবে অবস্থান করে,

তাদের এই পদ্ধতির মাধ্যমে কোলয়েডে পরিণত করা হয়। বৃহদায়তনে অবস্থানকারী পদার্থকে সঠিক প্রয়োগকৌশলে বিভাজিত করে কোলয়েডকণায় পরিণত করা হয়। **কোলয়েড মিলের** (colloidal mill) দ্বারা এভাবে বহু পদার্থকে কোলয়েডকণায় রূপান্তরিত করে, যথাযথ দ্রাবক মিশিয়ে ও স্থিতক পদার্থ (stabilizing agent) যোগ করে স্থায়ী কোলয়েড উৎপাদন করা হয়।

কোন কোন তরলকে বৃহদায়তন পদার্থের সংস্পর্শে নিয়ে আসা হলে, পদার্থটিকে সে সরাসরি কোলয়েডকণায় পরিণত করে। এ জাতীয় তরল পেপ্‌টাইজিং এজেন্ট (peptizing agent) নামে পরিচিত। স্টার্চ প্রভৃতি পদার্থের দ্রাবক-অনাসক্ত কোলয়েড প্রস্তুতিতে জল পেপ্‌টাইজিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করে।

(c **তড়িৎপদ্ধতি :** ঘনীকরণ ও বিসরণ এই উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে তড়িৎ-পদ্ধতি গঠিত। সমপ্রবাহী তড়িৎ-আর্ককে জলে ডুবিয়ে রাখা সোনা, রূপা বা প্লাটিনাম তারের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করলে আর্কের উচ্চতাপমাত্রা ধাতুকে বাষ্পীভূত করে। বাষ্পীভূত ধাতু জলের সংস্পর্শে ঘনীভূত হয়ে কোলয়েডকণায় পরিণত হয়। সামান্য পরিমাণে তড়িদ্‌বিশ্লেষ্যের উপস্থিতি এজাতীয় কোলয়েডকে স্থিতিশীল করে। এভাবে সোনা ও প্লাটিনামের সোল উৎপন্ন হয়।

5. **কোলয়েডের শোধন** (Purification of colloid) : ঝিল্লিবিশ্লেষণ তড়িৎ-ঝিল্লিবিশ্লেষণ এবং পরাপারিস্রাবণের দ্বারা কোলয়েডকে আয়ন ও কেলাস-পদার্থ প্রভৃতি থেকে শোধন করা হয় (যথাস্থানে দ্রষ্টব্য)।

6. **কোলয়েডের ধর্ম** (Properties of colloid) : দ্রাবক-আসক্ত ও দ্রাবক-অনাসক্ত কোলয়েডের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য থাকলেও ধর্মগত পার্থক্য যথেষ্ট নয়। পার্থক্য শুধুমাত্র স্থিতিশীলতা, সান্দ্রতা ও অধঃক্ষেপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোলয়েডের ধর্মকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (a) তড়িৎ-ধর্ম (electrical property), (b) আলোক-ধর্ম (optical property) এবং (c) অধঃক্ষেপন (precipitation)।

(a) **তড়িৎ ধর্ম :** কোলয়েডকণা তড়িৎ-আহিত থাকে। তড়িৎ-আধান (electrical charge) কোলয়েডের স্থিতিশীলতার পক্ষে খুবই জরুরী, বিশেষ করে তরল-অনাসক্ত কোলয়েডের ক্ষেত্রে। সমধর্মী আধানের উপস্থিতির ফলে এরা পরস্পরের প্রতি বিকর্ষণ অনুভব করে এবং অবলম্বনে থাকে।

(i) **তড়িৎ-আধানের উৎস :** কোলয়েডকণার আধানের উৎস দুটি। প্রথম উৎস, কণিকার উপরিতলে অবস্থিত মূলকসমূহ (groups), যারা আয়নিত

(ionised) হয়ে কোলয়েডকণাকে আহিত করে। দ্বিতীয় উৎস, বিসরণ-মাধ্যমস্থিত আয়ন, যা কণিকাপৃষ্ঠে পছন্দমত সংগৃহীত হয়ে কোলয়েডকণাকে আহিত করে। উভয়ধর্মী (amphoteric) প্রোটিনের উপরিতলে আধানের প্রকৃতি কী হবে তা' নির্ভর করে বিসরণ-মাধ্যমের pH-এর উপর। মাধ্যম আম্লিক (acidic) হলে কোলয়েডকণার আধান ধনাত্মক, এবং ক্ষারীয় (alkaline) হলে আধান ঋণাত্মক হয়। বিসরণ-মাধ্যমে সামান্য পরিমাণ তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের (electrolytes) উপস্থিতির জন্য কোলয়েডকণার পৃষ্ঠদেশে আয়ন আসঞ্জন সহজতর হয়।

(ii) **ইলেকট্রফরেসিস** (Electrophoresis) ঃ কোলয়েডকণা যে তড়িৎ-আহিত তা' নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা সহজেই নির্ণয় করা যায়। একটি U-নলে কোলয়েড সোল নেওয়া হয়। সোলের উপর বিশুদ্ধ দ্রাবক বা জল ঢালা হয় (4-13 নং চিত্র)। জলে দুটো প্লাটিনামের তড়িৎ-দ্বার (electrodes) ডুবিয়ে তাদের তড়িৎচালক বল বা ই. এম. এফ. (E. M. F.) এর সংগে সংযুক্ত করা হয়। জল ও কোলয়েডের মধ্যবর্তী তলরেখা যদি প্রখর ও দর্শনযোগ্য হয়, তবে দেখা যাবে তরলরেখাটি নলের যে-কোন একটা দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।
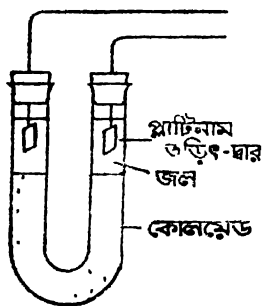
4-13 নং চিত্র ঃ ইলেক্ট্রফরেসিস।

কোলয়েডকণা যদি ধনাত্মক আধানযুক্ত হয় তবে তলরেখা ক্যাথোডের দিকে এবং ঋণাত্মক আধানযুক্ত হলে অ্যানোডের দিকে অগ্রসর হবে। তড়িৎক্ষেত্রে কোলয়েডের এ জাতীয় চলনকে (movement) **ইলেকট্রফরেসিস** বলা হয়। এ জাতীয় চলন ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিনের ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়। তড়িৎ-ক্ষেত্রে এজাতীয় চলনের পরিমাপ করে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রোটিনকে সনাক্ত-করণ সম্ভবপর।

(iii) **কোলয়েডকণার পৃষ্ঠতলে আধানের সম্পর্ক** (Charge relations at the surface of the colloidal particle) ঃ কোলয়েড কণার উপরিতলে আধান-সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় **হেমহোজ** (Helmholtz) ও **গোয়ের** (Gouy) যুগ্মস্তর (double layer) মতবাদ থেকে (4-14নং চিত্র)। এই মতবাদ অনুসারে কোলয়েডকণার আহিত উপরিতলকে ঘিরে বিপরীতধর্মী আহিত আয়নের সমাবেশ ঘটে। আহিত উপরিতলের পরবর্তী

আয়নস্তরটি **স্থিতিশীল** (immobile) হয়। এই স্থিতিশীল আয়নস্তরকে ঘিরে রয়েছে অপেক্ষাকৃত শিথিল চলমান (mobile) স্তর, যে স্তরের আয়নের বিচলন উপরিতলের দূরত্বের সংগে সমানুপাতিক। চিত্রে স্থিতিশীল স্তরকে ঋণাত্মকধর্মী দেখানো হয়েছে। অবশ্য এই স্তর ধনাত্মক আয়নযুক্তও হতে পারে।

কোলয়েডকণার পৃষ্ঠতল থেকে বিসরণ-মাধ্যম পর্যন্ত সব কটি স্তরের বিভব-পার্থক্যকে **তড়িৎরাসায়নিক-বিভব** (electrochemical potential) বলা হয়। স্থিতিশীল স্তর ও চলমান স্তরসমূহের বিভব-পার্থক্যকে **তড়িৎগতীয় বিভব** (electrokinetic potential) বা **জেটা বিভব** (zeta potential) বলা হয়। কোলয়েডকণার পৃষ্ঠতল ও স্থিতিশীল স্তরের বিভব-পার্থক্যকে **স্টার্নের বিভব** (Stern potential) বলা হয়।
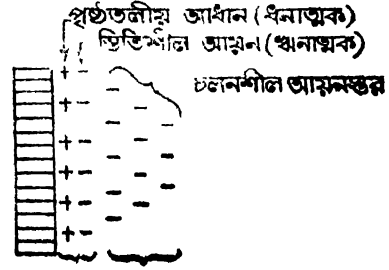
1-14 নং চিত্র : কোলয়েডকণার পৃষ্ঠতলে আধানের সম্পর্ক।

এই তিনটি বিভবের মধ্যে জেটা-বিভবের গুরুত্ব সমধিক। বিপরীত ধর্মী তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের সংযোগে এই বিভব যখন একটি সংকট-বিভবে (critical potential) পৌঁছয় তখন কোলয়েডকণার যুগ্মস্তর বিনষ্ট (collapse) হয় এবং কণাগুলো পরস্পরের সংগে সংযুক্ত হয়ে অধঃক্ষেপের সৃষ্টি করে।

(b) **আলোক ধর্ম :** কোলয়েডকণার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, তারা আপতিত রশ্মির বিক্ষেপন (scattering) ঘটাতে সক্ষম। এই ক্ষমতার অধিকারী
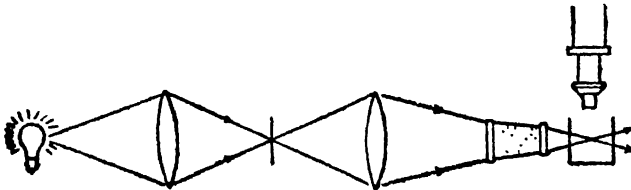
4-15 নং চিত্র : পরাণুবীক্ষণ যন্ত্র।

বলেই কোলয়েডকণা দর্শনযোগ্য হয়। অবশ্য সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তাদের দেখা সম্ভবপর নয়। 1903 সালে **জিগমোন্ডী** (Zsigmondy) যে **পরাণুবীক্ষণ যন্ত্র** (ultramicroscope) আবিষ্কার করেন তার সাহায্যেই তাদের দেখা

সম্ভব। এই পরাণুবীক্ষণ যন্ত্রের মঞ্চে (stage) রক্ষিত কোলয়েডের মধ্য দিয়ে আর্ক-ল্যাম্পের (arc lamp) তীব্র আলোকরশ্মিকে খানিকটা তির্যক বা সমান্তরালভাবে পাঠান হয় (4-15 নং চিত্র)। কোলয়েডকণাকে এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বিক্ষিপ্ত আলোক-উজ্জ্বল গোলাকার বিন্দু হিসাবে দেখা যায়।

কোলয়েডকণার এই আলোক-বিক্ষেপনকে **টিন্ড্যাল ঘটনা** (Tyndall effect) বলা হয়। কোলয়েডকণার বিক্ষেপনের জন্য দর্শনযোগ্য আলোক রশ্মিকে **টিন্ড্যাল রশ্মি** (Tyndall beam) বলা হয়।
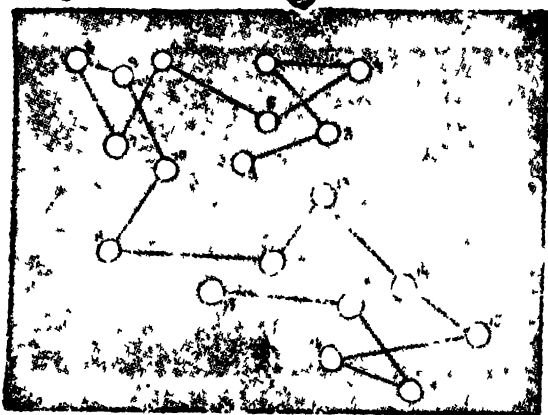
4-16 নং চিত্র : ব্রাউনের চলন।

পরাণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোলয়েডকণার আর একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। কোলয়েড কণা মোটেই স্থিতিশীল নয়। তারা অনবরত এলোমেলো সার্পিল গতিতে বিসরণ মাধ্যমে ঘুরে বেড়ায়। জলে অবলম্বিত পরাগরেণুর মধ্যে কোলয়েডকণার এই বিশেষত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী **ব্রাউন** (Brown)। তাঁরই নামানুসারে কোলয়েডকণার এ জাতীয় চলনকে **ব্রাউনের চলন** (Brownian movement) নামে অভিহিত করা হয় (4-16 নং চিত্র)। বিসরণ মাধ্যমের অণুর সংগে কোলয়েডকণার অনবরত সংঘাতই এই অনিয়মিত লক্ষ্যহীন চলনের কারণ বলে মনে করা হয়।

(c) **অধঃক্ষেপন :** দ্রাবক-অনাসক্ত কোলয়েডের স্থিতিশীলতার জন্য যদিও কোলয়েডে সামান্য পরিমাণ তড়িৎ-বিশ্লিষ্যের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়, তথাপি অধিক

পরিমাণ বিপরীত তড়িদ্‌বিশ্লেষ্যের উপস্থিতিতে কোলয়েডকণা পরস্পরের সংগে সংযুক্ত হয়ে অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই অধঃক্ষেপনের হার আয়নের যোজ্যতার সংগে সমানুপাতিক।

দ্রাবক-আসক্ত কোলয়েডকণাকে অধঃক্ষিপ্ত করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ এজাতীয় কোলয়েড সোদক হিসাবে (hydrated) থাকে। কোলয়েডকণাগুলোকে প্রথমে তাই নিরুদক-দ্রব্য (dehydrating agent) দিয়ে জলমুক্ত করতে হয়। পরে বিপরীতধর্মী তড়িদ্‌বিশ্লেষ্যের সাহায্যে তাদের অধঃক্ষিপ্ত করা হয়।

7. **রক্ষাপদ কোলয়েড** (Protective colloid) : জিলাটিন (gelatin), গাম অ্যাবাসিয়া (gum acacia) প্রভৃতি দ্রাবক-আসক্ত কোলয়েড পদার্থকে রক্ষাপদ কোলয়েড বলা হয়, কারণ এদেরে দ্রাবক-অনাসক্ত কোলয়েডে মিশ্রিত করলে শেষোক্ত কোলয়েডটিকে তড়িদ্‌বিশ্লেষ্যের সাহায্যে সহজে অধঃক্ষিপ্ত করা যায় না। অর্থাৎ এই কোলয়েডটিও তখন দ্রাবক-আসক্ত কোলয়েডধর্মী হয়ে পড়ে।

8. **কোলয়েডকণার আকৃতি ও আণবিক ওজন নির্ধারণ** (Determination of the size and molecular weight of colloidal particles) : কোলয়েডকণার আকৃতি ও আণবিক ওজন নির্ধারণে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। এখানে তিনটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হল :

(a) **পরাপরিস্রাবণ পদ্ধতি** (ultrafiltration method)

(b) **আলোক বিক্ষেপন পদ্ধতি** (light scattering method) এবং

(c) **পরাপকেন্দ্রী পদ্ধতি** (ultracentrifugal method)।

পরাপরিস্রাবণের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। এই পদ্ধতির দ্বারা দুটি রন্ধ্রযুক্ত ফিলটারের অন্তর্বর্তী কোলয়েডকণার ব্যাস সহজেই নির্ণয় করা যায়। অন্য দুটি পদ্ধতির আলোচনা নিম্নে দেওয়া হ'ল।

আলোক বিক্ষেপন পদ্ধতি : কোলয়েডকণার আলোক-বিক্ষেপন ধর্মের ব্যবহার করে, এই পদ্ধতির সাহায্যে তাদের আকৃতি ও আণবিক ওজন নির্ধারণ করা হয়। কোলয়েড দ্রবণের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি অতিক্রম করার সময় তাদের একাংশ বিক্ষিপ্ত এবং অপর অংশ প্রেরিত হয়। প্রেরিত আলোকরশ্মির তীব্রতা হ্রাসের সংগে কোলয়েড কণার আণবিক ওজনের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়

$$M = -\left(\frac{\log_e x/x_0}{HCL}\right)$$

এক্ষেত্রে, M = আণবিক ওজন, x = প্রেরিত রশ্মির তীব্রতা, x_0 = আপাতিত রশ্মির তীব্রতা, C = কোলয়েড দ্রবণের গাঢ়ত্ব (গ্রাম/মিলিলিটারে), L = দ্রবণের পাত্রের অন্তর্বর্তী দূরত্ব এবং H = সমানুপাতিক ধ্রুবক। শেষোক্ত ধ্রুবকের মান দ্রবণ ও দ্রাবকের প্রতিসরাংক এবং আপাতিত রশ্মির তরংগ দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল।

পরাপকেন্দ্রী পদ্ধতি : স্ভেদবার্গ (Svedberg) এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতি কোলয়েডকণার আণবিক ওজন নির্ণয়ে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে প্রোটিন ও ভাইরাস প্রোটিনের ক্ষেত্রে। এছাড়া কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইক্রসোম এবং নিউক্লিয়পদার্থের পৃথকীকরণেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

এই পদ্ধতিতে যে ধরনের পরাপকেন্দ্রক (ultracentrifuge) ব্যবহার করা হয়, তার আবর্তক (rotor) মিনিটে প্রায় 60,000 বার ঘূর্ণিত হয়, ফলে অভিকর্ষের প্রায় 500,000 গুণ অপকেন্দ্রী বলের সৃষ্টি হয়। প্রোটিন বা অন্যান্য কোলয়েড দ্রবণকে এজাতীয় পরাপকেন্দ্রকের কাচনলে রেখে আবর্তন করালে সমস্ত কোলয়েডকণা সুস্পষ্ট তলরেখা সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসে। বিসরণ মাধ্যমের চেয়ে কোলয়েড-কণার প্রতিসরাংক ভিন্ন বলে বিশেষ আলোর ব্যবস্থাপনা ও আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সীমারেখার গতিবেগ নির্ধারণ করা হয়, কারণ কোলয়েড-কণার দ্বারা সৃষ্ট সীমারেখার প্রতিসরাংক বেশী বলে সেখানে আলোকরশ্মি বেঁকে যায়। আবর্তন-অক্ষ (axis of rotation) থেকে এর দূরত্ব x হলে, সীমা-রেখার নিম্নমুখী গতিবেগ হবে নিম্নরূপ :

$$\frac{dx}{dt} = S\omega x$$

এক্ষেত্রে, $\omega = 2\pi$ আবর্তন/সেকেণ্ড, S = থিতান ধ্রুবক (প্রোটিনের ক্ষেত্রে এর মান 1×10^{-13} থেকে 200×10^{-13} সেকেণ্ড)। এই সম্পর্ক থেকে থিতান-ধ্রুবক S এর মান নির্ণয় করা হয়।

কোলয়েডকণার আণবিক ওজন এরপর নিম্নলিখিত সমীকরণের দ্বারা নির্ণয় করা হয় :

$$M = \frac{RTS}{(1 - Vd)D}$$

এক্ষেত্রে, M=আণবিক ওজন, R=গ্যাসীয় ধ্রুবক, T=পরম তাপমাত্রা, S=থিতান-ধ্রুবক, V=পদার্থের আংশিক আপেক্ষিক আয়তন (partial specific volume)। 1 গ্রাম শুষ্ক পদার্থকে প্রচুর পরিমাণ দ্রাবকে মেশালে যে আয়তন বৃদ্ধি ঘটে, তাকে আংশিক আপেক্ষিক আয়তন বলে। D=ব্যাপনগত ধ্রুবক এবং d=ঘনত্ব।

8. **কোলয়েডের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব** (Physiological importance of colloid) : কোলয়েডের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব অপরিসীম। মানবদেহের প্রায় 70 শতাংশ জৈব পদার্থ এই অবস্থায় থাকে। কোষ থেকে শুরু করে দেহের বিভিন্ন তন্ত্রে বিভিন্ন কার্যে এরা জড়িত। প্লাজমাস্থিত কোলয়েডপদার্থ এবং কেলাসপদার্থ একসংগে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। প্লাজমাস্থিত সিরাম অ্যালবুমিন (serum albumin) এবং সিরাম গ্লোবিউলিন (serum globulin) নামক দুটো প্রোটিন বিশেষভাবে রক্তের অভিস্রবণ চাপের জন্য দায়ী। এই অভিস্রবণ চাপের জন্যই রক্তজালিকাস্থিত তরলপদার্থ বেরিয়ে যায় না ; ফলে প্লাজমার পরিমাণ বজায় রাখা সম্ভবপর হয়। গ্লোমারুলাসে পরিস্রাবণক্রিয়ায় কোলয়েড-অভিস্রবণ চাপ অংশগ্রহণ করে।

কোষের প্রোটোপ্লাজম কোলয়েডবিশেষ। মাতৃদুগ্ধ, লসিকা, প্লাজমা ইত্যাদি দ্রাবক-আসক্ত কোলয়েড। কোলয়েডকণার ক্ষেত্রতলের পরিমাণ যথেষ্ট বলে কোলয়েড পৃষ্ঠটান (surface tension), পৃষ্ঠ-লগ্নতা (adsorption), এন্‌জাইম্‌ সক্রিয়করণ প্রভৃতি কাজের সংগে জড়িত থাকে। তাছাড়া দ্রাবক-আসক্ত কোলয়েড সোদক থাকে বলে প্রচুর পরিমাণ জলকে দেহের অভ্যন্তরে ধরে রাখা সম্ভবপর হয়।

দেহে রক্ষাপদ কোলয়েডের প্রয়োজনীয়তাও নিতান্ত কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রোটিন রক্ষাপদ কোলয়েড হিসাবে ক্রিয়া করে বলেই প্লাজমাস্থিত ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট অবলম্বনে থাকে। দুগ্ধের প্রোটিন একইভাবে দুগ্ধস্থিত ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেটকে অধঃক্ষিপ্ত হতে দেয় না। পিত্তলবণ ও পিত্তপ্রোটিন রক্ষাপদ কোলয়েড হিসাবে কাজ করে এবং পিত্তরসে কম দ্রবণীয় কোলেসটারোল (cholesterol) এবং ক্যাল্‌সিয়ামের লবণকে অবলম্বনে রাখে। পিত্তপাথর (gallstone) এবং মূত্রাশয়ে পাথর (bladderstone) সৃষ্টির মূলে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ষাপদ কোলয়েডের অভাব।

পৃষ্ঠলগ্নতা
Adsorption

পৃষ্ঠলগ্নতা একটি তলীয় ধর্ম। সবরকম তরলের ওপরেই অপ্রশমিত আকর্ষণশক্তি বা মুক্ত আধান রয়েছে যা অন্যান্য অণুকে যেমন কমবেশী আকর্ষণ করতে পারে তেমনি তাদের ধরে রাখতেও পারে। **আকর্ষণ শক্তি দিয়ে শুধুমাত্র পৃষ্ঠতলে অপর কোন পদার্থকে এভাবে আটকে রাখার নাম পৃষ্ঠলগ্নতা।** অপরপক্ষে **বিশোষণ** (absorption) বলতে বুঝায় কোন বস্তুদ্বারা অপর কোন বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে শোষণ করা। বস্তুর সমস্ত অণুই বিশোষণক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

1. **পৃষ্ঠতল ও পৃষ্ঠলগ্নতা ঃ** পৃষ্ঠতলের প্রতিটি অণুতে যে আকর্ষণশক্তি বর্তমান থাকে, তার সাহায্যে সে তরল, গ্যাসীয় বা কঠিন পদার্থের একটিমাত্র অণুকে ধরে রাখতে পারে। সাম্যাবস্থায় পৃষ্ঠলগ্নতা ও তার বিপরীত প্রক্রিয়ার হার সমান। **ল্যাংমুইরের** (Langmuir) মতে পৃষ্ঠতলে পৃষ্ঠলগ্ন অণু একটি-মাত্র আণবিক গভীরতায় অবস্থান করে ; কারণ আকর্ষণশক্তির স্থিতি একটি অণুর গভীরতা পর্যন্ত সীমিত থাকে।

পৃষ্ঠলগ্ন পদার্থ (adsorber) এবং পৃষ্ঠপোষক পদার্থের (adsorbing agent) প্রকৃতির ওপর পৃষ্ঠলগ্নতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। পৃষ্ঠপোষক পদার্থের পৃষ্ঠতলের বিস্তৃতি যত বেশী হবে পৃষ্ঠলগ্নতাও তত বেশী হবে। কোলয়েডের পৃষ্ঠলগ্নতা খুবই বেশী। কাঠকয়লা অত্যধিক ছিদ্রযুক্ত বলে তার পৃষ্ঠতলের বিস্তৃতি খুব বেশী , কাঠকয়লার পৃষ্ঠলগ্নতা তাই অসাধারণ।

2. **পৃষ্ঠলগ্নতার বৈশিষ্ট্য ঃ** পৃষ্ঠলগ্নতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য যথা ঃ (1) পৃষ্ঠলগ্নতা উভয়মুখী (reversible) পদ্ধতি। (2) পৃষ্ঠলগ্নতা উষ্ণতা বৃদ্ধিতে হ্রাস পায় (রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংগে পৃষ্ঠলগ্নতার পার্থক্য এখানেই)। (2) পৃষ্ঠলগ্নতা একটি দ্রুত পদ্ধতি এবং পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের সংগে সামানুপাতিক। (4) পৃষ্ঠলগ্ন অণুগুলো পৃষ্ঠতলে সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত থাকে।

3. **পৃষ্ঠলগ্নতার শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব** (Physiological importance of adsorption) ঃ

(1) পৃষ্ঠলগ্নতা ও জৈব অনুঘটন ঃ প্রাণীদেহের এনজাইম জৈব অনুঘটক হিসাবে ক্রিয়া করে। এনজাইমের প্রকৃতি প্রোটিন। তাদের আণবিক ওজন

যৌগকের চেয়ে প্রায় 500 গুণ বেশী। তারা কোলয়েড সৃষ্টি করে। তাদের পৃষ্ঠতলের বিস্তৃতি তাই খুব বেশী। এনজাইম ও যৌগক এর ফলে তাড়াতাড়ি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে এবং জৈবিক বিপাকক্রিয়া দ্রুততর হয়।

(2) পৃষ্ঠলগ্নতা ও এনজাইমের শোধন : পৃষ্ঠলগ্নতার ওপর ভিত্তি করে এনজাইমকে শোধন করা যায়। একটি নির্দিষ্ট pH-এ এনজাইমকে কোন পৃষ্ঠ-পোষক পদার্থের [$Al(OH)_3$] উপর পছন্দমত পৃষ্ঠলগ্ন করে অবিশুদ্ধ দ্রবণ থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়। পরে তাকে ধৌত করে ভিন্ন pH-সম্পন্ন দ্রবণে রাখলে বিশুদ্ধ এনজাইমটি বেরিয়ে আসে।

(3) পৃষ্ঠলগ্নতা ও ঔষধের ক্রিয়া : কোন কোন ঔষধ, বিষ ইত্যাদি কোষঝিল্লিতে পৃষ্ঠলগ্ন হয়ে বিষক্রিয়া প্রয়োগ করে।

(4) অধিবিষ (toxin) ও প্রতিবিষের (antitoxin) সংযুক্তি এবং তাদের প্রশমন আর এক ধরনের পৃষ্ঠলগ্নতা।

(5) জটিল প্রোটোপ্লাজমস্থিত প্রোটিন, কার্বহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ, লবণ ইত্যাদির ভাঙ্গাগড়ার কাজে পৃষ্ঠলগ্নতা অংশ গ্রহণ করে।

পৃষ্ঠটান
Surface Tension

পৃষ্ঠটান একপ্রকার বল বা শক্তি যে শক্তি কোন তরলের পৃষ্ঠতলীয় অণুগুলোকে পরস্পর শক্তভাবে বেঁধে রাখে। ফলে পৃষ্ঠতলীয় অণুগুলি মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে না। তারা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে টান করা একটি স্থিতিস্থাপক পর্দার মত আচরণ করে (4-17 নং চিত্র)। সূক্ষ্ম সালফার-গুঁড়ো অথবা জলে ভেজে না এমন কোন পদার্থের সূক্ষ্মকণাকে জলের ওপর ভাসিয়ে দিলে তা জলের ওপরেই ভাসতে থাকে, ডুবে যায় না। জলের পৃষ্ঠতলীয় অণুর পৃষ্ঠটানের জন্যই এমনটি সম্ভবপর।
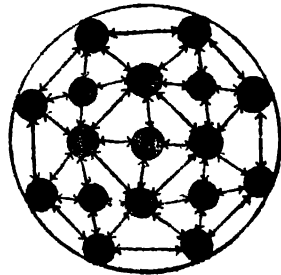
4-17নং চিত্র : তরলের পৃষ্ঠটান।

1. পৃষ্ঠটানের ব্যাখ্যা : ল্যাপলাস আণবিক তত্ত্বের সাহায্যে পৃষ্ঠটানের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে কোন সমসত্ত্ব তরলের অণুগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তরলের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোণ অণু

তার চতুঃপার্শ্বস্থ অণুর দ্বারা সমানভাবে আকর্ষিত হয়, তাই তারা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু তরলের পৃষ্ঠতলে অবস্থিত অণুগুলি শুধুমাত্র উভয়পার্শ্বে এবং নিম্নদিকে আকর্ষিত হয়। ফলে, পৃষ্ঠতলীয় অণুগুলি মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে না। পৃষ্ঠতলীয় অণুগুলির স্থিতিশক্তি তাই তুলনামূলকভাবে বেশী। এই শক্তির সাহায্যে তারা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে সম্ভাব্য স্বল্প পরিসরে তরলের পৃষ্ঠতলে একটি পর্দার সৃষ্টি করে। জলপূর্ণ কৈশিকনলে (capillary tube) এই পর্দা 4-18Aনং চিত্রের মত অবতলীয় (concave) এবং পারদপূর্ণ কৈশিকনলে তা 4-18Bনং চিত্রের মত উত্তলীয় (convex) হয়, কারণ পারদ কাচকে ভেজাতে পারে না (4-18নং চিত্র)। প্রথম ক্ষেত্রে স্পর্শ কোণ θ এক সমকোণের চেয়ে কম হয়, শেষোক্ত ক্ষেত্রে এক সমকোণের চেয়ে বেশী হয়।
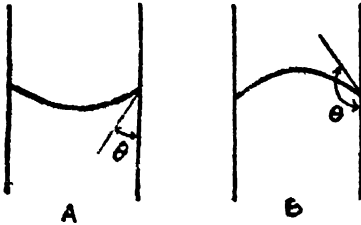
4-18নং চিত্র : কৈশিকনলে তরলের বক্রতল।

তরলের অণুর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ যত বৃদ্ধি পায়, তরলের পৃষ্ঠটানও তত বেশী হয়। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে পৃষ্ঠটান হ্রাস পায়। সংকট-উষ্ণতায় (critical temperature) তরলের পৃষ্ঠটান শূন্য হয়। এছাড়া দ্রাবকে দ্রবীভূত পদার্থের উপর পৃষ্ঠটান খানিকটা নির্ভরশীল। অজৈব লবণ সাধারণত পৃষ্ঠটান বৃদ্ধি করে, তেমনি জৈবপদার্থ পৃষ্ঠটান হ্রাস করে। পিত্ত লবণ, প্রোটিন, তেল, ফসফোলিপিড (phospholipids) শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ে।

4-19 নং চিত্র : কৈশিকনলে তরলের উপরে ওঠার সংগে পৃষ্ঠটানের সম্পর্ক।
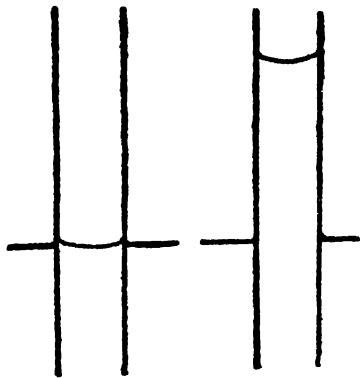
2. **পৃষ্ঠটানের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব (Physiological importance of surface tension) :** অসংখ্য উদাহরণের সাহায্যে মানবদেহে পৃষ্ঠটানের গুরুত্ব বুঝান যায়। যেমন : (1) সাইটোপ্লাজম থেকে কোষঝিল্লির সৃষ্টিতে পৃষ্ঠটান অংশগ্রহণ করে; (2) জলে স্নেহবিন্দু, দুধে স্নেহবুদবুদ ইত্যাদি পৃষ্ঠটানসঞ্জাত; (3) ক্ষুদ্রান্ত্রে স্নেহপদার্থের পৃষ্ঠটান হ্রাস করে

পিত্তলবণ স্নেহপদার্থের অবদ্রব সৃষ্টি করে এবং এভাবেই স্নেহপদার্থের পরিপাক ও শোষণে সহায়তা করে।

সান্দ্রতা

Viscosity

কোন তরল পদার্থের একটি স্তর অপর একটি স্তরের উপর দিয়ে চলার সময় যে বাধার সম্মুখীন হয় তাকে সান্দ্রতা বলে। ভিন্ন স্তরের এই আপেক্ষিক গতির সময় যে বাধা বা বিরুদ্ধ বল ক্রিয়া করে তা গতিশীল অণুগুলির দ্বারা প্রযুক্ত ঘর্ষণ থেকে উৎপন্ন হয়। সান্দ্রতাকে তাই আণবিক ঘর্ষণ বা অন্তস্থ ঘর্ষণও বলা যেতে পারে।

পদার্থ ভেদে সান্দ্রতারও পরিবর্তন ঘটে। ইথার, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতি তরলের সান্দ্রতা যেমন খুবই কম তেমনি মধু, আলকাতরা ইত্যাদির সান্দ্রতা খুবই বেশী।

1. **সান্দ্রতার একক** (Unit of Visicosity) : সি. জি এস পদ্ধতিতে সান্দ্রতার একক **পয়েজ** (Poise)। এক সেন্টিমিটার ব্যবধানে রাখা প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটার (cm^2) ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট দুটি সমান্তরাল স্তরের মধ্যভাগে অবস্থিত একক বর্গসেন্টিমিটার তলকে প্রতি সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার সরলরেখ গতি (streamline motion) প্রধান করতে যত ডাইন বলের প্রয়োজন হয় তাকে এক পয়েজ বলা হয়। 25° সেলসিয়াসে জলের পরম সান্দ্রতা (absolute viscosity) 0·00895. এই সংখ্যাকে একক ধরে অন্যান্য তরলের **আপেক্ষিক সান্দ্রতার** (relative viscosity) পরিমাপ করা হয়।

2. **সান্দ্রতার পরিমাপ** : কৈশিকনলের মধ্য দিয়ে অসংনম্য তরলের (incompressible fluid) প্রবাহ ঘটিয়ে **পয়জেউলি** (Poiseuille) সান্দ্রতার যে পরিমাপ করেছেন তা হ'ল,

$$=\frac{\pi P r^4 t}{8Vl}$$

যেখানে η = সান্দ্রতা, V = সরু নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরলের পরিমাণ, l = নলের দৈর্ঘ্য, r = নলের ব্যাসার্ধ, P = নলের উভয় প্রান্তস্থ তরলের চাপের পার্থক্য এবং t = সময়।

3. **সান্দ্রতার পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণসমূহ** (Factors affecting the viscosity) :

(a) উষ্ণতা : প্রতি ডিগ্রি উষ্ণতা-বৃদ্ধিতে সান্দ্রতা প্রায় 2 শতাংশ হ্রাস পায়।

(b) দ্রবীভূত পদার্থ : কঠিন পদার্থ অধিক পরিমাণে তরলে দ্রবীভূত হলে তরলের সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য নয় এমন সব পদার্থ যেমন সান্দ্রতা বৃদ্ধি করে তেমনই অধিক পরিমাণে আয়নিত (ionised) লবণ সান্দ্রতার হ্রাস ঘটায়।

(c) কোলয়েডের সান্দ্রতা : দ্রাবক-অনাসক্ত কোলয়েডের সান্দ্রতা বিশুদ্ধ বিসরণ মাধ্যমের কাছাকাছি। তবে দ্রাবক-আসক্ত কোলয়েডের সান্দ্রতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। জেলের (gel) সান্দ্রতা অত্যধিক বেশী।

(f) অবলম্বিত পদার্থের প্রভাব : তরলের মধ্যে অবলম্বিত পদার্থের আপেক্ষিক অবস্থান অনুসারে তরলের সান্দ্রতা পরিবর্তিত হয়।

4. **সান্দ্রতার শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব** (Physiological importance of viscosity) : রক্ত ও প্লাজমার সান্দ্রতা মুখ্যত রক্তকণিকা ও প্লাজমা-প্রোটিনের উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। রক্তের চেয়ে প্লাজমার সান্দ্রতা কম। জল, প্লাজমা ও রক্তের আপেক্ষিক সান্দ্রতা যথাক্রমে 1, 3, 5। রক্তের সান্দ্রতা রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের উপর যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তার গুরুত্ব অনেকখানি। কারণ একটা নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে হৃৎপেশী সর্বাপেক্ষা সাফল্যের সংগে কার্য করে। এছাড়া রক্তের সান্দ্রতা রক্তপ্রবাহে প্রান্তীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ক'রে রক্তচাপের সমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। অ্যাসিডোসিস (acidosis), হাইপারগ্লাইসেমিয়া (hyperglycemia), হাইপার্‌ক্যালসিমিয়া (hypercalcemia) ইত্যাদি অস্বাভাবিক অবস্থা যেমন রক্তের সান্দ্রতা বৃদ্ধি করে, তেমনই দেহের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে তা হ্রাস পায়। প্রোটোপ্লাজমের সান্দ্রতা সবচেয়ে বেশী।

জৈব তড়িৎ-বিভব

Bioelectric Potential

1. **ঝিল্লীবিভব** (Membrane potential) : কোষঝিল্লির ভেতরে ও বাইরে দুটো তড়িৎ-দ্বার (electrodes) প্রতিস্থাপন করলে গ্যালভানোমিটারে

(galvanometer) যে বিভবপার্থক্য দেখা যায়, তাকে **ঝিল্লিবিভব** বা **স্থিতিবিভব** (resting potential) বলা হয়। এই স্থিতিবিভবের পরিবর্তনের ওপরই নির্ভর করে পেশী ও স্নায়ুর মধ্য দিয়ে তড়িতের প্রবাহ।

2. **ঝিল্লিবিভব নির্ণয়ের পরীক্ষা** (Experiment on recording of resting potential) **:** এমনভাবে একটি **সূক্ষ্ম তড়িৎ-দ্বার** (micro-electrode) নির্মাণ করা হয় যার অগ্রভাগ 1 মিউ (μ) এর বেশী নয় এবং যার অভ্যন্তরভাগ গাঢ় KCl-এর দ্রবণে পূর্ণ থাকে। পরীক্ষার প্রারম্ভে কুনো ব্যাঙের সার্টরিয়াস (sartorius) পেশীকে ব্যবচ্ছেদ করে শারীরবৃত্তীয় দ্রবণে
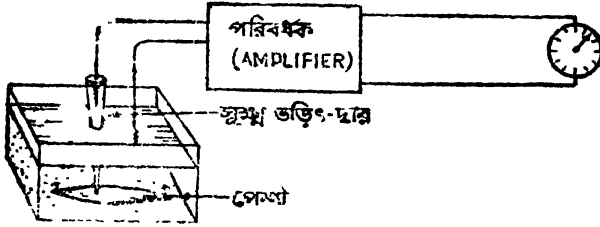
4-20 নং চিত্র **:** ঝিল্লিবিভব নির্ণয়ের পরীক্ষা।

(Ringer) পূর্ণ একটি পাত্রে ডুবিয়ে রাখা হয় এবং পাত্রনিম্নস্থ মোমের সংগে পিন দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়। পাত্র ও সূক্ষ্ম তড়িৎ-দ্বারে রূপার তৈরী কুণ্ডলীকৃত তারের সাহায্যে তড়িৎ-সংযোগ ঘটান হয় (4-20নং চিত্র)। সূক্ষ্ম তড়িৎ-দ্বারটিকে এরপর ধীরে ধীরে পেশীর দিকে চালনা করা হয়। যখনই তড়িৎ-দ্বারটি পেশীঝিল্লি ভেদ করে, তড়িৎ-বিভব তখনই দ্রুত −90mV এ নেমে আসে (ভেতর ঋণাত্মক হয়)। তড়িৎ-দ্বার যতক্ষণ কোষের ভেতরে থাকে ততক্ষণ এই বিভবের আর কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। এই বিভবকে পেশীর ঝিল্লিবিভব বা স্থিতিবিভব বলা হয়। এভাবে পরীক্ষা করে বিভিন্ন কোষের স্থিতিবিভব −20mV থেকে −100mV এর মধ্যে পাওয়া গেছে।

3. **ঝিল্লিবিভব সৃষ্টির মূলনীতি** (Basic principle for the generation of membrane potential) **:** একটি ঝিল্লির এক পার্শ্বে NaCl ও KCl-এর দ্রবণ এবং অন্য পার্শ্বে KNO_3-এর দ্রবণ রাখা হ'ল। ধরা

থাক, ঝিল্লির মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র K^+ আয়ন যাতায়াত করতে পারে, অন্যেরা পারে না। 4-21নং চিত্র থেকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে ঝিল্লির উভয় পার্শ্বের অভিস্রবণ চাপ সমান। এমতাবস্থায় K^+ আয়ন Iনং দ্রবণ থেকে IIনং দ্রবণে প্রবেশ করবে, কারণ প্রথমোক্ত দ্রবণে K^+ আয়নের গাঢ়ত্ব বেশী। তবে K^+ আয়নের সংগে ঋণাত্মক আয়ন (anion ঝিল্লির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে না পারায় কিছুক্ষণের মধ্যেই K^+ আয়নের গতি ব্যাহত হবে। কারণ, ঋণাত্মক আয়ন স্থিততড়িৎ আকর্ষণে (electrostatic attraction) K^+ আয়নকে টেনে রাখবে। অতএব যদিও K^+ আয়ন ঝিল্লির মধ্য দিয়ে অনায়াসে চলাচল করতে পারে তবু উভয় দ্রবণে তার গাঢ়ত্ব কখনও সমান হবে না। কিছুসংখ্যক K^+ আয়ন II দ্রবণে চলে যাওয়ায় তুলনামূলকভাবে এই দ্রবণটি ধনাত্মক আধানযুক্ত (.positive charge) হবে এবং এভাবে একটি স্থায়ী ঝিল্লিবিভব সৃষ্টি করবে। স্থিতিবিভব উৎপাদনের এটিই হল মূলনীতি।
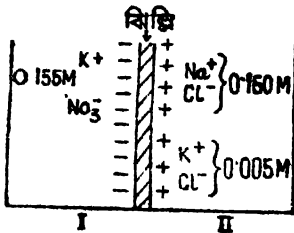
4-21নং চিত্র : ঝিল্লিবিভব সৃষ্টির মূলনীতি।

4. **স্নায়ু ও পেশীর স্থিতিবিভব** (Resting potential of nerve and muscle) **:** স্নায়ু ও পেশীর ঝিল্লি-পরিস্থিতি উপরিউক্ত চিত্রের মতোই। Iনং দ্রবণে NO_3^- আয়নের মতো কোষের অভ্যন্তরে নানাপ্রকার জৈব ঋণাত্মক আয়ন রয়েছে যারা কোষঝিল্লির মধ্য দিয়ে ভেদ্য নয়। এসব ঋণাত্মক জৈব আয়নের মধ্যে প্রধান প্রোটিন। পটাসিয়াম আয়ন ঝিল্লির মধ্য দিয়ে সহজে যাওয়া আসা করতে পারে। সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরাইড আয়নের ভেদ্যতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। দেখা গেছে Na^+ এর চেয়ে K^+ ঝিল্লির মধ্য দিয়ে প্রায় 50-100 গুণ বেশী ভেদ্য, যদিও সোডিয়ামের (23) চেয়ে পটাসিয়ামের (39) পারমাণবিক ওজন বেশী। জানা গেছে সোডিয়ামের সোদক ব্যাস (hydrated diameter, 3·4Å) পটাসিয়ামের সোদক ব্যাস (2·2Å) এবং ঝিল্লিরন্ধ্রের ব্যাসের (3Å) চেয়ে বেশী। তবে ঝিল্লিরন্ধ্রের ব্যাসের সংগে আয়নের ঝিল্লির মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসাটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে জানা গেছে। প্রতিটি আয়নের জন্য নির্দিষ্ট আয়নপথ (ion channel) রয়েছে। এসব আয়নপথের পার্থক্যই আয়নের ভেদ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

স্থিতিশীল বিভবপার্থক্য গড়ে ওঠার পেছনে তাই নিম্নলিখিত ঘটনাবলী সম্পর্কযুক্ত : (1) **ঝিল্লির মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র আয়নের অসম ভেদ্যতা,** (2) **কোষের অভ্যন্তরে অভেদ্য আয়নের উপস্থিতির দরুণ ডোনানের ঝিল্লিসাম্যের প্রতিষ্ঠা** এবং (3) **সোডিয়াম পটাসিয়াম পাম্পের সক্রিয়তা।** স্থিতিশীল অবস্থায় কোষের অভ্যন্তরে পটাসিয়ামের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেছে। সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়ন কোষের অভ্যন্তরে কম, কিন্তু কোষবহিঃস্থ তরলে বেশী থাকে। সোডিয়াম আয়ন কোষ-সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করলে সক্রিয় সোডিয়াম-পটাসিয়াম পাম্প সোডিয়াম আয়নকে কোষের বাইরে নিয়ে যায় এবং সমসংখ্যক পটাসিয়ামকে ভেতরে আনার সুযোগ করে দেয়।

5. **আয়নের উপর প্রভাববিস্তারকারী বল** (Force acting on ions) : বার্নস্টেইনের (Bernstein) মতে ঝিল্লির মধ্য দিয়ে পটাসিয়াম আয়নের ভেদ্যতা যেহেতু সর্বাধিক, সেহেতু স্থিতিবিভব প্রধানত পটাসিয়ামের গাঢ়তার নতিমাত্রার (potassium concentration gradient) জন্যই উদ্ভূত হয়। নারন্স-সমীকরণের দ্বারা নিম্নলিখিতভাবে ওই স্থিতিবিভবের পরিমাপ করা যায় :

স্থিতিবিভব $(E_m) = 60 \log_{10} \frac{[K^+]_0}{[K_+]_i}$

যেখানে, $[K^+]_0$ = ঝিল্লির কোষবহিঃস্থ তরলে পটাসিয়ামের গাঢ়তা,

$[K^+]_i$ = ঝিল্লির কোষমধ্যস্থ তরলে পটাসিয়ামের গাঢ়তা। অবশ্য বর্তমানে জানা গেছে, স্থিতিবিভব শুধুমাত্র পটাসিয়াম আয়নের ভেদ্যতা থেকেই উৎপন্ন হয় না, সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়নের ভেদ্যতাও এর জন্য দায়ী। ভেদ্যতার উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে স্থিতিবিভব উৎপন্ন হয়। গোল্ড্‌মেনের (Goldmann) নিম্নলিখিত সমীকরণের দ্বারা তা প্রকাশ করা যায়।

$$E_m = 60 \log_e \frac{P_K[K]_0 + P_{Na}[N_a]_0 + P_{Cl}[Cl]_i}{P_K[K]_i + P_{Na}[N_a]_i + P_{Cl}[Cl]_0}$$

এক্ষেত্রে, P = নির্দিষ্ট আয়নের ভেদ্যতা,

o = কোষবহিঃস্থ তরলে নির্দিষ্ট আয়নের গাঢ়তা,

i = কোষমধ্যস্থ তরলে নির্দিষ্ট আয়নের গাঢ়তা।

ডোনানের ঝিল্লিসাম্য

Donnan Membrane Equilibrium

কোন একটি পাত্রকে অর্ধভেদ্য পর্দা বা ঝিল্লিদ্বারা পৃথক করে তার একপাশে

বিশুদ্ধ জল এবং অপরপাশে যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ রাখা যায়, তাহলে কিছুক্ষণ পরেই দেখা যাবে, পর্দার উভয়পাশের তরলে সোডিয়াম ক্লোরাইড সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জলে একটি অভেদ্য আয়নকে রাখলে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইডের বণ্টন পর্দার উভয়পাশের তরলে সমান হবে না। ডোনান 1911 সালে এই ঘটনা লক্ষ্য করেন। তিনি অর্ধভেদ্য পর্দার একপাশে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং অপরপাশে কংগ-রেডের সোডিয়াম লবণ (NaR) রেখেছিলেন। ঋণাত্মক-কংগ-রেড (R) ঝিল্লিভেদ্য নয়। তিনি দেখলেন, সোডিয়াম ক্লোরাইড উভয় তরলে যাওয়া-আসা করে এবং যখন একটি স্থিতিশীল অবস্থা বা সাম্যাবস্থায় পৌঁছয়, তখন উভয় তরলে তার বণ্টন অসম হয়। অতএব অর্ধভেদ্য পর্দার একপাশে একটি অভেদ্য আয়নকে রেখে অর্ধভেদ্য পর্দার বিপরীত পাশে রাখা ভেদ্য আয়নসমূহের উভয় তরলে অসম বণ্টনের যে ঘটনা লক্ষ্য করা যায়, তাকে **ডোনানের ঝিল্লিসাম্য** নামে অভিহিত করা যায়।

1. **ঝিল্লিসাম্যের পরীক্ষা ঃ** অর্ধভেদ্য পর্দার একপাশে KA-এর একটি দ্রবণ এবং অপরপাশে KCl এর একটি দ্রবণ রাখা হল। প্রথম দ্রবণের গাঢ়ত্ব a এবং দ্বিতীয়টির b। প্রথম দ্রবণের A^- আয়ন ঝিল্লিভেদ্য নয়। দ্বিতীয় দ্রবণের K^+ ও Cl^- ঝিল্লির মধ্য দিয়ে সহজে যাতায়াত করতে পারে। এই প্রাথমিক অবস্থাকে নিম্নলিখিত ছকের দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

(1)	(2)
a K^+	K^+ b
a A^-	Cl b
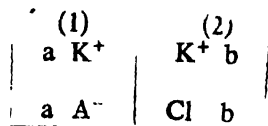
K^+ ও Cl^- আয়ন জোড়ায় জোড়ায় 2নং দ্রবণ থেকে 1নং দ্রবণে আসবে। জোড়ায় জোড়ায় আসার উদ্দেশ্য তড়িৎ-উদাসীনতা (electrical neutrality) বজায় রাখা। KCl 1নং দ্রবণে এসে আবার 2নং দ্রবণে ফিরে যাবে। একটি নির্দিষ্ট সময় পরে দেখা যাবে, যত সংখ্যক KCl 2নং দ্রবণ থেকে 1নং দ্রবণে আসছে, ঠিক ততসংখ্যক 1নং দ্রবণ থেকে 2নং দ্রবণে যাচ্ছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ততক্ষণে একটি স্থিতিশীল অবস্থা বা সাম্যাবস্থায় পৌঁছে গেছে। এই সংশেষ পরিস্থিতিতে 2নং দ্রবণে KCl-এর পরিমাণ হ্রাস পাবে, এবং 1নং দ্রবণে তা বৃদ্ধি পাবে। ধরা যাক, এই অবস্থায় x সংখ্যক KCl (xKCl$=xK^+ + xCl^-$) 2নং দ্রবণ থেকে 1নং দ্রবণে প্রবেশ করেছে। ফলে, 2নং দ্রবণে (b-x)

সংখ্যক K^+ ও (b-x) সংখ্যক Cl^- আয়ন রয়ে গেছে। এই সর্বশেষ পরিস্থিতিকে নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়ঃ

(1)		(2)	
a+x	K^+	K^+	b−x
a	A.	Cl^-	b−x
x	Cl^-		

2নং দ্রবণ থেকে 1নং দ্রবণে KCl এর ব্যাপনের হার তার আয়ন দুটির গাঢ়ত্বের গুণফলের সমানুপাতিক। বিপরীত বক্তব্যটিও সত্য। সাম্যাবস্থায় উভয়মুখী ব্যাপনের হার যেহেতু সমান সেহেতু দুটি দ্রবণে আয়ন দুটির গুণ-ফলও সমান হবে, অর্থাৎ

$$(a+x)x=(b-x)^2$$

এটিই হল ডোনানের মূল সমীকরণ। এই সম্পর্ককে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়।

$$[K^+]_1 . [Cl^-]_1 = [K^+]_2 . [Cl^-]_2$$

এই সম্পর্কের বক্তব্য, সাম্যাবস্থায় 1নং দ্রবণের পটাসিয়াম ও ক্লোরাইড আয়নের গাঢ়ত্বের গুণফল 2নং দ্রবণের পটাসিয়াম ও ক্লোরাইড আয়নের গাঢ়ত্বের গুণফলের সমান।

এই ঝিল্লিসাম্য থেকে দু'টো জিনিস পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, তা হলঃ

(1) ঝিল্লির যে পাশে অভেদ্য ঋণাত্মক আয়ন রয়েছে, ভেদ্য ধনাত্মক আয়নের গাঢ়ত্ব সেই পাশে বেশী, অর্থাৎ $[K^+]_1 > [K^+]_2$

(2) ঝিল্লির যে পাশে অভেদ্য ঋণাত্মক আয়ন নেই, সেই পাশে ভেদ্য ঋণাত্মক আয়নের গাঢ়ত্ব অনেক বেশী, অর্থাৎ

$$[Cl^-]_2 > [Cl^-]_1$$

আয়নের এই অসম বণ্টনের ফলে ঝিল্লির উভয় পার্শ্বে তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পাকস্থলী কী ভাবে গাঢ় অম্লের ক্ষরণ ঘটায় এবং অগ্ন্যাশয় কেন ক্ষারকীয় রস ক্ষরণ করে, ডোনানের ঝিল্লিসাম্যের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

ডোনানের সমীকরণ অনুসারে,

$$(a+x)x=(b-x)^2$$

বা, $ax+x^2=b^2-2bx+x^2$

বা, $ax \quad =b^2-2bx$

বা, $x(a+2b)=b^2$

বা, $x=\dfrac{b^2}{a+2b}$

দেখা যাচ্ছে, x একদিকে যেমন সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়নের গুণফলের সমানুপাতিক, তেমনি অপরদিকে অভেদ্য ঋণাত্মক আয়নের গাঢ়ত্বের সংগে ব্যস্তানুপাতিক। অতএব 1নং দ্রবণে অভেদ্য ঋণাত্মক আয়নের পরিমাণ বেশী হলে 2নং দ্রবণ থেকে 1নং দ্রবণে তড়িদ্‌বিশেষ্য কম যাবে। বিপরীত বক্তব্যও সত্য।

2. **অভিস্রবণচাপের সংগে ডোনানের ঝিল্লিসাম্যের সম্পর্ক :** ডোনানের ঝিল্লিসাম্যে ঝিল্লির উভয়পার্শ্বে আয়নের বণ্টন অসমান হয়। ফলে উভয় দ্রবণের মধ্যে অভিস্রবণচাপের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উপরের সমীকরণে $a=1$ এবং $b=2$ অণু ধরা হলে, x-এর মান দাঁড়ায়,

$$x=\frac{4}{1+4}=0{\cdot}80$$

ঝিল্লিসাম্যে উভয় দ্রবণে আয়ন-সংখ্যাকে যোগ করে যে সম্পর্ক পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

1	2
$K^+=a+x=1{\cdot}8$	$K^+=(b-x)=1{\cdot}2$
$A\ =a \quad =1{\cdot}0$	$Cl^-=(b-x)=1{\cdot}2$
$Cl^-=x \quad =0{\cdot}8$	মোট = 2·4 অণু
মোট = 3·6 অণু	

এক্ষেত্রে 1নং দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ = CRT অর্থাৎ 3·6RT এবং 2নং দ্রবণের অভিস্রবণচাপ = 2·4RT (R, গ্যাসীয় ধ্রুবক এবং T পরম তাপমাত্রা)।

অতএব, উভয় দ্রবণের অভিস্রবণচাপের পার্থক্য $= (3.6 - 2.4)$ RT বা 1.2 RT। 27C° সেলসিয়াসে (T = 300) এই চাপপার্থক্যের পরিমাণ হবে,

অভিস্রবণ চাপ $= 1.2 \times 0.082 \times 300$

$= 29.52$ আবহচাপ

3. **ডোনানের ঝিল্লিসাম্যের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব** (Physiological importance of Donnan membrane equilibrium) ঃ জৈবিক তন্ত্রসমূহে ডোনানের ঝিল্লিসাম্যের গুরুত্ব সমধিক। কোষঝিল্লি বিভিন্ন প্রকারের পদার্থকে **ভেদ্য ও অভেদ্য** পদার্থ হিসাবে পৃথক করে রাখে। ফলে কোষ-ঝিল্লির মধ্য দিয়ে ভেদ্য আয়নের লব্ধ (resultant) পার্থক্য ঝিল্লির উভয়পার্শ্বে তড়িৎবিভব উৎপন্ন করে। এছাড়াও ডোনানের ঝিল্লিসাম্য সম্ভবত শোষণ, ক্ষরণ প্রভৃতি পদ্ধতির সংগে জড়িত থাকে। দেহের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের (compartments) মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের গাঢ়তার যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায় তাকে বজায় রাখার ক্ষেত্রেও হয়ত ডোনানের ঝিল্লিসাম্য কাজ করে। তবে জৈবিক তন্ত্রে ডোনানের ঝিল্লিসাম্য কখনও নির্দিষ্ট থাকে না, কারণ কোষের বিপাকক্রিয়ার পরিবর্তনে (প্রোটিনের সংশ্লেষণ বা বিশ্লেষণে) অপ্রবেশ্য বা অভেদ্য উপাদানসমূহের গাঢ়ত্বের পরিবর্তন ঘটে, ফলে ডোনানের ঝিল্লিসাম্যও পরিবর্তিত হয়।

অম্ল, ক্ষারক ও বাফার
Acid Base and Buffer

1. **অম্ল ও ক্ষারক** (Acids and bases) ঃ পূর্বের ধারণা অনুযায়ী যে পদার্থ দ্রবণে H^+ আয়নের[1] যোগান দিতে পারে তাকে অম্ল এবং যে OH^- আয়ন যোগান দিতে পারে, তাকে ক্ষারক বলা হত। বর্তমানে যে পদার্থ প্রোটোনের

1. কোন পদার্থের জলীয় দ্রবণে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করলে কিছু সংখ্যক মৌল উপাদান **অ্যানোডে** (anode ঃ গ্রীক—anodos = ওপরে ওঠা) বা ধনাত্মক মেরুতে জমা হয় এবং বাকীরা **ক্যাথোডে** (cathode ঃ গ্রীক—kathodos = নীচে নামা) বা ঋণাত্মক মেরুতে জমা হয়। এর থেকে বোঝা যায় দ্রবণে এই উপাদান বা মূলক তাড়িতাহত থাকে। তাড়িতাহত এই উপাদান বা মূলককে **আয়ন** বলা হয়। যে সব আয়ন অ্যানোডের দিকে এগিয়ে যায়, তাদের **ধনাত্মক আয়ন** (anions) এবং ক্যাথোডের দিকে যারা ধাবিত হয়, তাদের **ধনাত্মক আয়ন** (cations) বলা হয়।

(proton) যোগান দেয় তাকে অম্ল এবং যে প্রোটোনের সংগে সংযুক্ত হতে পারে তাকে ক্ষারক বলা হয়। যথা ঃ

অম্ল	⇌প্রোটোন	+ক্ষারক
HCl	$\rightleftharpoons H^+$	$+Cl^-$
CH_3COOH	$\rightleftharpoons H^+$	$+CH_3COO^-$
H_2CO_3	$\rightleftharpoons H^+$	$+HCO_3^-$
HCN	$\rightleftharpoons H^+$	$+CN^-$

ইত্যাদি।
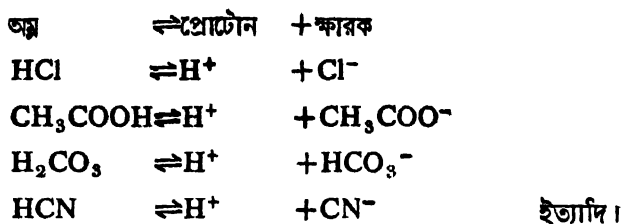
HCl-কে তীব্র অম্ল (strong acid) বলা হয়, কারণ সে সম্পূর্ণভাবে H^+ আয়ন এবং Cl^- আয়নে বিয়োজিত হতে পারে। Cl^- আয়নকে মৃদু ক্ষারক (weak base) বলা হয়, কারণ সে H^+ আয়নের সংগে তাড়াতাড়ি সংযুক্ত হতে চায় না। অপরপক্ষে HCO_3^- বা CN^- আয়নকে তীব্র ক্ষারক (strong base) বলা হয়, কারণ এরা H^+ আয়নের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে এবং তার সংগে তাড়াতাড়ি সংযুক্ত হতে চায়। ব্রনস্টেডের (Bronsted) মতে মৃদু অম্লের তীব্র ক্ষারক এবং তীব্র অম্লের মৃদু ক্ষারক থাকে।

NaOH, KOH প্রভৃতি ধাতব হাইড্রোক্সাইড ক্ষারক নয়, কারণ এরা অম্ল বা ক্ষারকের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। এদের ক্ষার বা অ্যালকালি (alkali) বলা হয়। অবশ্য অ্যালকালিও ক্ষারকের মতো ক্রিয়া করে, কারণ দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে অ্যালকালি OH^- আয়ন উৎপন্ন করে যা একটি ক্ষারক বিশেষ।

যে সব পদার্থ অম্ল ও ক্ষারক উভয়ভাবেই ক্রিয়া করে তাদের উভয়ধর্মী পদার্থ (amphoteric substance) বলে। জল একটি উভধর্মী পদার্থ, কারণ সে প্রোটোনের যোগান দিতে পারে। যেমন,

$$HOH \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$
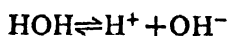
আবার ইহা ক্ষারক হিসাবেও ক্রিয়া করে, কারণ সে প্রোটোনের সংগে সংযুক্ত হতে পারে। যথা ঃ

$$HOH + H^+ \rightleftharpoons H_3O^+$$
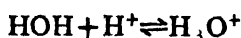
তরল অ্যামোনিয়া এমনই আর একটি উভধর্মী পদার্থ।

2. **হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব (C_H)** ঃ হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব কোন দ্রবণের অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাপক। কোন একটি দ্রবণের H^+ বা OH^- এর গুণফল যেহেতু সমান সেহেতু H^+ আয়নের পরিমাণ জানা থাকলে OH^-

আয়নের পরিমাণও নির্ণয় করা যায়। বিশুদ্ধ জলে H^+ বা OH^- আয়নের মান 10^{-7}।

3. **পি এইচ (P^H) : কোন দ্রবণের H^+ আয়নের গাঢ়ত্বের পরিমাপসূচক সংখ্যাকে P^H বলা হয়।** 10 কে ভূমি ধরে H^+ আয়নের গাঢ়ত্বের ঋণাত্মক লগারিদম নিলে এই সংখ্যাগুলো উৎপন্ন হয়। P^H কে তাই **H^+ আয়নের গাঢ়ত্বের ঋণাত্মক লগারিদম বা $-\log_{10}[H^+]$ বলা হয়।** নিম্নের উদাহরণ থেকে P^H সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

জলের বিদ্যুৎপরিবাহিতার পরিমাপ করে দেখা গেছে বিশুদ্ধ জল 25° সেলসিয়াসে (Celsius) খুব সামান্য পরিমাণে বিয়োজিত হয় (10^7 লিটারে 1 গ্রাম) :

$$HOH \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

H^+ আয়নের গাঢ়ত্ব সেক্ষেত্রে প্রতি লিটারে 10^{-7} গ্রাম আয়ন, অর্থাৎ $[H^+]=10^{-7}$। বিশুদ্ধ জলের বিয়োজনে সমান সংখ্যক হাইড্রোজেন ও হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) উৎপন্ন হয়, সুতরাং $[H^+]=[OH^-]=10^{-7}$ গ্রাম আয়ন। তাদের গুণফল,

$$[H^+][OH^-]=10^{-14}$$

অথবা
$$[H^+]=\frac{10^{-14}}{[OH^-]}$$

অর্থাৎ H^+ আয়নের গাঢ়ত্বের সংগে OH^- আয়নের গাঢ়ত্বের বরাবরই একটা ব্যস্তানুপাতিক সম্বন্ধ রয়েছে। কোন একটি আয়নের গাঢ়ত্ব বাড়লে অন্যটি কমে যায়। জলে অম্ল যোগ করলে H^+ আয়নের গাঢ়ত্ব যেমন বেড়ে যায় তেমনই OH^- আয়নের গাঢ়ত্ব কমে যায়।

যে কোন দ্রবণের H^+ আয়ন ও OH^- আয়নের গাঢ়ত্ব 10-এর শক্তিতে প্রকাশ করা যায়। যেমন, কোন অম্লের তীব্রতা প্রতি লিটারে যদি 0·1, 0·01, 0·001, 0·0001 ইত্যাদি গ্রাম অণু (gram mol) হয়, তবে তাদের 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, ইত্যাদি 10-এর শক্তিসংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা চলে। শেষোক্ত সংখ্যাগুলোর ঋণাত্মক লগারিদম নিলে 1, 2, 3, 4, 5 প্রভৃতি সংখ্যা পাওয়া যায়। এই সংখ্যাগুলোই ঐ সব দ্রবণের P^H।

যেহেতু বিশুদ্ধ জলের $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$, সুতরাং জলের P^H একই নিয়মে 7, অর্থাৎ যে-কোন প্রশমিত (neutral) দ্রবণের P^H সব সময় 7 হয়।

4নং তালিকা ঃ লঘু দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন, হাইড্রোক্সিল আয়ন ও P^H এর সম্পর্ক।

$[H^+]$	$[OH^-]$	pH (= −log)$[H^+]$	$[H^+]$	
10^{0}N	10^{-14}N		1·0 N	
10^{-1}N	10^{-13}N	1	0·1 N	← অম্ল বৃদ্ধি ←
10^{-2}N	10^{-12}N	2	0·01 N	
10^{-3}N	10^{-11}N	3	0·001 N	
10^{-4}N	10^{-10}N	4	0·0001 N	
10^{-5}N	10^{-9}N	5	0·00001 N	
10^{-6}N	10^{-8}N	6	0·000001 N	
10^{-7}N	10^{-7}N	7	0·0000001 N	প্রশমিত
10^{-8}N	10^{-6}N	8	0·00000001 N	
10^{-9}N	10^{-5}N	9	0·000000001 N	
10^{-10}N	10^{-4}N	10	0·0000000001 N	
10^{-11}N	10^{-3}N	11	0·00000000001 N	→ ক্ষার বৃদ্ধি →
10^{-12}N	10^{-2}N	12	0·000000000001 N	
10^{-13}N	10^{-1}N	13	0·0000000000001 N	
10^{-14}N	10^{-0}N	14	0·00000000000001 N	

এই 7 কে ঠিক মধ্যবিন্দুতে রেখে O থেকে 14 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো দিয়ে যে স্কেল করা সম্ভব তাকে P^H-স্কেল বলা হয় (এই স্কেলের P^H সংখ্যার মধ্যেই যেকোন দ্রবণের অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব সীমিত থাকে)। প্রশমিত P^H অর্থাৎ P^H 7 থেকে P^H-এর সংখ্যাগত মান যত হ্রাস পাবে H^+ আয়নের গাঢ়ত্ব তত বেড়ে যাবে, অর্থাৎ সেই দ্রবণ তত আম্লিক হবে। তেমনই P^H সংখ্যা 7-এর ওপরে

5নং তালিকা ঃ প্রকৃতি ও জীবদেহের কিছু দ্রবণের P^H মান।

পদার্থ	pH
রক্ত	7·35—7·45
মস্তিষ্কমেরুরস	7·35—7·45
জলীয় নেত্ররস	7·4
লালারস	6·35—6·85
বিশুদ্ধ পাকরস	0·9
অগ্ন্যাশয় জারক রস	7·5—8·0
আন্ত্রিক জারকরস	7·0—8·0
মূত্র	4·8—6·9
মল	7·0—7·5
অশ্রুজল	7·4
দুধ	6·6—6·9
দৈ	5.2
পাতিত জল	5·5 (প্রায়)
তাজা বৃষ্টির জল	5·7—5·8
সমুদ্রের জল	8·0
পানীয় জল	6·5—8·0
কমলালেবুর রস	2·6—4·4
তাজা আপেল রস	2·9—3·3
পাকা টমেটো	4·3
লেবুর রস	2·2—2·4

ওঠতে শুরু করলে H^+ আয়নের গাঢ়ত্বও আনুপাতিকভাবে হ্রাস পায় এবং দ্রবণটি তত ক্ষারীয় হয়। অতএব P^H কোন দ্রবণের H^+ আয়নের গাঢ়ত্বের পরিমাপক (4-22নং চিত্র)।
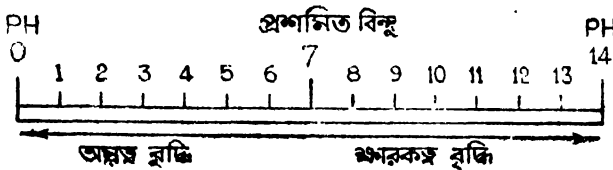
4-22 নং চিত্র ঃ পি. এইচ স্কেল।

কোন দ্রবণের অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব এই P^H সীমার বাইরেও থাকতে পারে, তবে প্রকৃতিতে ও জীবদেহে যেসব দ্রবণ পাওয়া যায় তাদের P^H এই সীমার মধ্যেই থাকে। এজাতীয় কিছুসংখ্যক দ্রবণের P^H 5নং তালিকায় দেওয়া হল।

4. **পি. এইচ নির্ণয়ের পদ্ধতি** (Methods of determination of P^H) **:** বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে কোন দ্রবণের P^H নির্ণয় করা যায়। নিম্নে এরকম দুটো পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করা হল।

(a) **বর্ণমাপক পদ্ধতি** (Colorimetric method) **:** এই পদ্ধতিতে কিছুসংখ্যক রঙ বা বর্ণকে সূচক (indicator) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এরা মৃদু অম্ল বা ক্ষারক। আয়নিত অবস্থায় এদের বর্ণ অধিকতর স্পষ্ট হয়।

6নং তালিকা : P^H নির্ণয়ে ব্যবহৃত সূচকের বৈশিষ্ট্য।

জলীয় দ্রবণে সূচকের গাঢ়ত্ব (%)	সূচকের নাম	pH-এর বিস্তৃতি	রঙের পরিবর্তন অম্ল—ক্ষার
0·04	থাইমোল ব্লু	1·2—2·8	লাল—হলদে
0·04	ব্রমফেনোল ব্লু	3·0—4·6	হলদে—নীল
0·01	কংগো রেড্	3·2—5·0	নীল—বেগুনী
0·016	ব্রম্ ক্রেসোল গ্রিন	3·8—5·4	হলদে—নীল
0·02 (60% অ্যাল্)	মিথাইল রেড্	4·0—6·0	লাল—হলদে
0·01	ক্লোর্ফেনোল রেড্	4·8—6·4	হলদে—লাল
0·04	ব্রম্ ক্রেসোল পার্পেল	5·2—6·8	হলদে—বেগুনীলাল
0·04	ব্রম্ থাইমোল ব্লু	6·0—7·6	হলদে—নীল
0·01 (50% অ্যাল্)	নিউট্রেল রেড্	7·0—8·0	হলদে—লাল
0·02	ফেনোল রেড্	6·8—8·4	হলদে—লাল
0·02	ক্রেসোল রেড্	7·2—8·8	হলদে—লাল
0·04	থাইমোল ব্লু	8·0—9·8	হলদে—নীল
0·05 (50% অ্যাল্)	ফেনোল্ফ্থেলিন	8·0—10·0	বর্ণহীন—লাল

প্রথমে কিছুসংখ্যক প্রমাণ বাফার দ্রবণ তৈরী করা হয়, যাদের P^H জানা থাকে। যে অজ্ঞাত দ্রবণের P^H নির্ণয় করা হবে, তার এবং ঐসব বাফারের একই পরিমাণ দ্রবণে নির্দিষ্ট পরিমাণ রঙ বা সূচক মেশানো হয়। এরপর বাফার ও অজ্ঞাত দ্রবণটির রঙের তুলনা করে অজ্ঞাত দ্রবণের P^H নির্ণয় করা হয়। যেসব বর্ণ বা রঙকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় 6নং তালিকায় তাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হল।

(b) **পি এইচ মিটার** (P^H meter) **:** অধিকতর নির্ভুল P^H নির্ণয়ে P^H-মিটারের ব্যবহার করা হয়। P^H-মিটারের দুটো তড়িৎ-দ্বারকে (গ্লাস ও
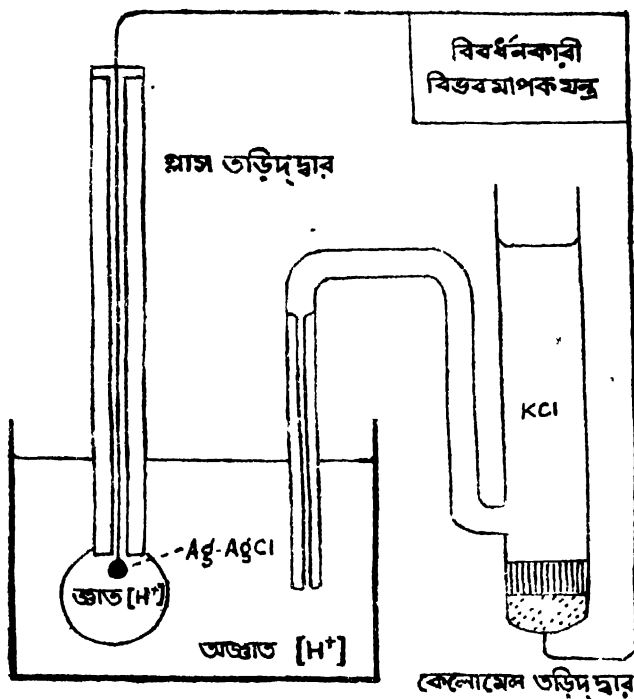
4-23 নং চিত্র : PH মিটার।

কেলোমেল তড়িৎ-দ্বার) অজ্ঞাত দ্রবণে ডুবান হয় (4-23 নং চিত্র)। গ্লাস তড়িৎ-দ্বারটি গ্লাস-বুদ্বুদে তৈরী, যার মধ্যে O·1N হাইড্রোজেন আয়ন থাকে। হাইড্রোজেন আয়নের সংগে সিলভার-সিলভার ক্লোরাইড তার সংযুক্ত করা হয়। কেলোমেল তড়িৎদ্বারে কেলোমেল (Hg_2Cl_2) থাকে। এর একপাশে KCl-এর সম্পৃক্ত দ্রবণ রাখা হয় এবং অপর পাশে পারদ। এই পারদ থেকে প্লাটিনামের তার বিভবমাপক যন্ত্রে (potentiometer) নিয়ে যাওয়া হয়।

গ্লাস-তড়িৎদ্বারের গ্লাসের পর্দার মধ্য দিয়ে H^+ আয়ন যাওয়া-আসা করতে পারে। তাই যে দ্রবণে এই তড়িৎদ্বারটিকে ডুবান হয়, সেই দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়ন ও তড়িৎ-দ্বারস্থিত হাইড্রোজেন আয়নের পার্থক্যের ফলে বিভব-পার্থক্য গড়ে ওঠে। এই দুটো দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের পার্থক্যের সংগে উৎপন্ন বিভব সমানুপাতিক হয়। পার্থক্য বেশী হলে বিভবও বেশী হবে। কেলোমেল

তড়িৎ-দ্বার নিরপেক্ষ (indifferent) তড়িৎ-দ্বার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কার্যত এই বিভব পার্থক্যকে বিবর্ধনের মাধ্যমে বিভবমাপক যন্ত্রের ডায়ালে P^H একক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এভাবে সরাসরি অজ্ঞাত দ্রবণের P^H নির্ণয় সম্ভব হয়।

(c) **হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব থেকে P^H নির্ণয়।**

প্রশ্ন : হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব (concentration) $3{\cdot}2 \times 10^{-4}$ গ্রাম-আয়ন হলে তার P^H কত হবে ?

উত্তর : সমাধান নিম্নলিখিত উপায়ে সম্পন্ন করতে হবে।

(i) প্রথমে H^+ আয়নের গাঢ়ত্বকে 10-এর শক্তিতে প্রকাশ করতে হবে।

(ii) এরপর গুণাংকের (co-efficient) লগ নির্ধারণ করে, তাকে শক্তি-সংখ্যা (exponent) থেকে বিয়োগ করতে হবে। যেমন,

$[H^+] = 10^{-4} \times 3{\cdot}2$ (তৃতীয় বন্ধনী গাঢ়ত্বের সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।)

গুণাংকের লগ $= \log 3{\cdot}2 = 0{\cdot}50$

10-এর শক্তিসংখ্যা $= 4$

বিয়োগফল $= 4 - 0{\cdot}50 = 3{\cdot}50$

সুতরাং, $P^H = -\log[H^+] = 3{\cdot}50$

(d) P^H **থেকে হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব নির্ণয় :**

প্রশ্ন : কোন দ্রবণের P^H 4·72 হ'লে তার H^+ আয়নের গাঢ়ত্ব কত হবে ?

উত্তর : $P^H\ 4{\cdot}72 = \log 10^{4{\cdot}72} = \log \frac{1}{10^{-4{\cdot}72}}$

$$= \log \frac{1}{10^{{\cdot}28} \times 10^{-5}} = \log \frac{1}{1{\cdot}9 \times 10^{-5}}$$

সুতরাং $[H^+] = 1{\cdot}9 \times 10^{-5}$

5. **বাফার (Buffers) :** মানুষের প্লাজমার P^H সাধারণত 7·36 থেকে 7·41-এর মধ্যে সীমিত থাকে। কোন কারণে এই P^H যদি 7·8-এর বেশী হয় বা 7·0-এর নিম্নে নেমে আসে, তবে মানুষ যথাক্রমে ধনুষ্টঙ্কার বা অম্লজাত গাঢ়-নিদ্রায় (acidotic coma) মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করতে পারে। অতএব সাধারণ-

ভাবে রক্ত বা দেহের অন্যান্য তরলের P^H যাতে পরিবর্তিত না হয় তার জন্য দেহের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। রক্ত এবং দেহের তরলস্থিত কিছুসংখ্যক রাসায়নিক পদার্থ এই ব্যবস্থাপনার সংগে জড়িত রয়েছে। এরা মৃদু অম্ল এবং তীব্র ক্ষারক অথবা তীব্র অম্ল এবং মৃদু ক্ষারকের দ্রবণবিশেষ। এদের তাই বাফার বলা হয়। অতএব, যেসব দ্রবণ **মৃদু অম্ল ও তীব্র ক্ষারক অথবা তীব্র অম্ল ও মৃদু ক্ষারকের মিশ্রণ হয় এবং বাইরে থেকে অম্ল বা ক্ষার মিশ্রিত করলেও যারা দ্রবণের P^H-কে পরিবর্তিত হতে দেয় না, তাদের বাফার বলা হয়।** অ্যাসিটিক অ্যাসিড (acetic acid) এবং সোডিয়াম অ্যাসিটেটের (sodium acetate) দ্রবণ এরকমই একটি বাফার। খুব সামান্য পরিমাণে বিয়োজিত হয় বলে অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে মৃদু অম্ল বলে। অপরপক্ষে সোডিয়াম অ্যাসিটেট সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়। যথা :

$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$ (আংশিক বিয়োজিত)

$CH_3COONa \rightarrow CH_3COO^- + Na^+$ (পূর্ণ বিয়োজিত)
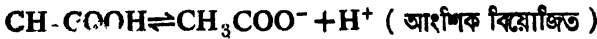
HCl-কে এধরনের বাফার দ্রবণে মিশ্রিত করলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের H^+ আয়ন CH_3COO^-আয়নের সংগে যুক্ত হয় এবং এভাবে H^+আয়নের গাঢ়ত্বকে হ্রাস করে এবং P^H বজায় রাখে।

$H^+ + CH_3COO^- \rightarrow CH_3COOH$ $\left\{\begin{array}{l} CH_3COOH \\ CH_3COONa + HCl \\ \rightarrow CH_3COOH + NaCl \end{array}\right.$

অ্যালকালি বা ক্ষার যোগ করলে দ্রবণে CH_3COOH হ্রাস পায় এবং CH_3COONa বৃদ্ধি পায়।

$$\left\{\begin{array}{l} CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O \\ CH_3COONa \end{array}\right.$$
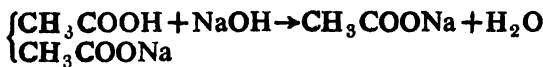
এক্ষেত্রে H^+ আয়তনের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি করে বাফার দ্রবণের P^H কে সঠিকভাবে বজায় রাখে।

(a) **বাফারের P^H নির্ণয়** (Determination of the P^H of a buffer solution) : HAকে একটি মৃদু অম্ল এবং BAকে তার লবণ হিসাবে ধরলে বাফার দ্রবণে তারা নিম্নলিখিতভাবে বিয়োজিত হবে। যথা :

$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ (আংশিক বিয়োজিত)

$BA \rightarrow B^+ + A^-$ (পূর্ণ বিয়োজিত)
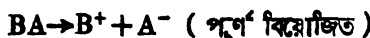
সাম্যাবস্থায় ভরসূত্র অনুসারে,

$$\frac{[H^+][A^-]}{[HA]}=K_a \text{ (ধ্রুবক)}$$

এই সমীকরণ থেকে H^+ আয়নের যে গাঢ়ত্ব পাওয়া যায় তা হ'ল

$$[H^+]=K_a \frac{[HA]}{[A^-]}$$

বা, $[H^+]=K_a \frac{[HA]}{[BA]}$ (যেহেতু বাফার দ্রবণে প্রায় সব A^- আয়ন BA থেকে পাওয়া যায়।

$$=K_a \frac{[\text{অম্ল}]}{[\text{লবণ}]}$$

উভয় পার্শ্বের ঋণাত্মক লগারিদম নিলে সমীকরণটি দাঁড়ায়,

$$-\log[H^+]=-\log\left\{K_a \frac{[\text{অম্ল}]}{[\text{লবণ}]}\right\}$$

$$=-\log K_a-\log\frac{[\text{অম্ল}]}{[\text{লবণ}]}$$

$$=-\log K_a+\log\frac{[\text{লবণ}]}{[\text{অম্ল}]}$$

যেহেতু, $-\log[H^+]=P^H$ এবং $-\log K_a=pK_a$, ধরলে, উপরিউক্ত সমীকরণটি দাঁড়াবে,

$$P^H=pK_a+\log\frac{[\text{লবণ}]}{[\text{অম্ল}]}$$

এই সমীকরণটিকে **হেনডার্সন-হ্যাসেলব্যাকের** (Henderson-Hasselbalch) **সমীকরণ** বলা হয়। এই সমীকরণটির সহায়তায় যে কোন বাফার দ্রবণের P^H-এর পরিমাপ সম্ভবপর।

(b) **বাফারের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব** (Physiological importance of buffers) ঃ মানবদেহের প্লাজমা, রক্তকোষ, লসিকা, মেরুরস, মস্তিষ্কমজ্জারস প্রভৃতি তরলে বাফারের প্রাচুর্য রয়েছে। এরা সম্মিলিতভাবে দেহের হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। প্লাজমায় প্রধানতঃ বাইকার্বনেট-কার্বনিক অ্যাসিড বাফার (HCO_3^-/H_2CO_3), ফসফেট বাফার ($HPO_4^{=}/H_2PO_4^-$) এবং প্রোটিন বাফার (প্রোটিনেট-/প্রোটিন) রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমোক্ত বাফার রক্তের

P^H-এর পরিবর্তন প্রতিরোধে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করে। অপর দুটি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ। লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিন বাফার ও HCO_3^-/H_2CO_3 বাফার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেহকোষে বিপাকক্রিয়ায় যেসব অ্যাসিড উৎপন্ন হয় (যথা ঃ সালফুরিক (sulphuric), ফসফোরিক (phosphoric), ল্যাকটিক (lactic), অ্যাসিটো-অ্যাসিটিক (acetoacetic) বিটাহাইড্রোক্সি-বিউটিরিক (β-hydorxy-butyric) অ্যাসিড, প্রভৃতি) তাদের প্রশমিত করতে এই সব বাফার বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করে। রক্তকোষে ফসফেট বাফার কতকটা অকিঞ্চিৎকর।

লসিকা, মেরুরস, মস্তিষ্ক-স্নায়ুরস ইত্যাদির বাফার অনেকটা প্লাজমাস্থিত বাফারের মতোই, শুধুমাত্র প্রোটিন বাফারের পরিমাণ এসব তরলে খুবই কম। এসব বাফারের উপস্থিতির ফলে দেহস্থিত জলীয় পদার্থের P^H সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়।

সমস্থানিক ও তার ব্যবহার
Isotopes and their Uses

1. **পরমাণুর গঠন ও পারমাণবিক সংখ্যা** (Atomic structure and atomic number) ঃ মৌলিক পদার্থের **পরমাণু** প্রধানত (a) প্রোটন, (b) নিউট্রন (neutron) এবং (c) ইলেকট্রন (electron) নিয়ে গঠিত। প্রোটন ও নিউট্রন সম্মিলিতভাবে পরমাণুর **নিউক্লিয়াস** (nucleus) গঠন করে। প্রোটন একটি ধনাত্মক আধানযুক্ত কণা, নিউট্রন আধানহীন। উভয়েই একক ভরসম্পন্ন। নিউক্লিয়াসের মোট ধনাত্মক আধানের জন্য প্রোটনই প্রধানত দায়ী। ইলেকট্রন একটি ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা। এর ভর (mass) হাইড্রোজেন আয়নের ভরের 1/1838 অংশ। ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারিপাশে কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। যেহেতু সাধারণভাবে পরমাণু প্রশমিত অবস্থায় থাকে, সেজন্য কক্ষপথে পরিভ্রমণশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধান প্রোটন সংখ্যার সমান হয়। এই তিনটি মৌলিক কণা ছাড়াও পরমাণুতে **পজিট্রন** (positron), **মেজোন** (meson), **নিউট্রিনো** (neutrino) প্রভৃতি কণার সন্ধান পাওয়া যায়।

কোন মৌলিক পদার্থের **পারমাণবিক সংখ্যা** তার নিউক্লিয়াসে অবস্থানকারী প্রোটন সংখ্যার সমান। ইহা নিউক্লিয়াস বহির্ভূত ইলেকট্রন সংখ্যারও সমান।

মৌলিক পদার্থের **পারমাণবিক ওজন** তার নিউক্লিয়াসস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলের সমান।

2. **সমস্থানিকের সংজ্ঞা** (Definition of Isotopes) ঃ যেসব মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা এক কিন্তু পারমাণবিক ওজন ভিন্ন এবং পর্যায় সারণীতে (periodic table) যারা সমস্থানে অবস্থান করে তাদের **আইসোটোপ** বা **সমস্থানিক** বলা হয়। আইসোটোপের রাসায়নিক ধর্ম একই রকম হয়। তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অভিন্ন হওয়ার ফলে, তাদের নিউক্লিয়াস বহির্ভূত ইলেক্ট্রনের সংখ্যা ও বিন্যাস একই রকম হয়। তবে তাদের নিউক্লিয়াসের গঠন ভিন্নতর হয়। নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যার
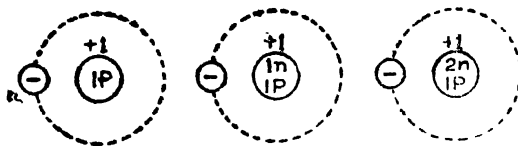
4-24 নং চিত্র ঃ হাইড্রোজেন আইসোটোপ।

সমান হলেও নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হয়। নিউট্রনের সংখ্যার বিভিন্নতার জন্য সমস্থানিকের পারমাণবিক ওজনও বিভিন্ন হয় (4-24নং চিত্র)।

3. **সমস্থানিকের শ্রেণীবিন্যাস** (Classification of isotopes) ঃ সমস্থানিককে দু'ভাবে বিভক্ত করা যায়। যথা ঃ (*a*) স্থায়ী বা অতেজস্ক্রিয় সমস্থানিক (stable or non-radioactive isotopes) এবং (*b*) তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক (radioactive isotopes)।

(*a*) **অতেজস্ক্রিয় সমস্থানিক ঃ** এজাতীয় সমস্থানিককে প্রধানত প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এরা সাধারণত মিশ্রণ হিসাবে থাকে। এদের সতর্কতার সংগে অন্তরণ (isolation) করে নিতে হয়। এ জাতীয় আইসোটোপ থেকে কোনপ্রকার তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণ হয় না। শারীরতত্ত্বের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্থানিকের উল্লেখ 7নং তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হল।

(*b*) **তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক ঃ** এ জাতীয় সমস্থানিক থেকে আলফা (α) বিটা (β), পজিট্রন ও গামা (γ) রশ্মির স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ ঘটে। রেডিয়াম (radium) ও ইউরেনিয়াম (uranium) ছাড়া খুব কমসংখ্যক মৌলিক পদার্থই প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে তেজস্ক্রিয় হিসাবে পাওয়া যায়। **সাইক্লোট্রনের**

সাহায্যে **কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়** সমস্থানিক উৎপন্ন করা হয়। তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের স্থায়িত্ব (stability) তার **হাফ-লাইফের** (half life) সাহায্যে নির্ণয় করা

7নং তালিকা : শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমস্থানিক।

মৌলিক পদার্থ	পারমাণবিক সংখ্যা	পারমাণবিক ওজন	সমস্থানিক (পারমাণবিক ওজনের দ্বারা নির্দেশিত)	প্রতীক
হাইড্রোজেন	1	1·008	1, 2, 3	H^1, H^2, H^3
কার্বন	6	12	11, 12, 13, 14	C^{11}, C^{13}, C^{12}, C^{14}
নাইট্রোজেন	7	14·008	14, 15	N^{14}, N^{15}
অক্সিজেন	8	16	16, 17, 18	O^{16}, O^{17}, O^{18}
সালফার	16	32·06	32, 33, 34	S^{32}, S^{33}, S^{34}
ক্লোরিন	17	35·457	35, 37, 39	Cl^{35}, Cl^{37}, Cl^{39}
লোহা	26	55·84	56, 54	Fe^{56}, Fe^{54}

হয়। যে সময়ে কোন তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের সক্রিয়তা (activity) তার প্রারম্ভিক (original) সক্রিয়তার অর্ধেকে নেমে আসে তাকে তেজস্ক্রিয় পদার্থটির **হাফ-লাইফ** বলা হয়। হাফ-লাইফ মিনিট থেকে বৎসর অবধি দীর্ঘ হতে পারে। যে-সব তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক শারীরবৃত্তীয় কার্যে ব্যবহৃত হয় তাদের হাফ-লাইফ সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। নিম্নলিখিত তালিকায় শারীরবৃত্তীয় কার্যে ব্যবহৃত হয় এমন কিছুসংখ্যক তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের নাম ও তাদের হাফ-লাইফ লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক	হাফলাইফ
তেজস্ক্রিয় আয়োডিন (I^{131})	8 দিন
,, লোহা (Fe^{56})	45 দিন
,, ফসফরাস (P^{32})	14·3 দিন
,, সালফার (S^{35})	87·1 দিন

4. **শারীরবৃত্ত ও প্রাণরসায়নে সমস্থানিকের ব্যবহার** (Use of isotopes in physiology and biochemistry) **:** উভয়প্রকার সমস্থানিকই বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতির অনুশীলনে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে বিপাকীয় পদ্ধতির অনুশীলনের ব্যাপারে কোন একটি যৌগপদার্থকে সমস্থানিকের দ্বারা লেবেল (lebel) করে তাকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করান হয় এবং দেহের মধ্যে তার গতি-বিধি, পরিণতি ইত্যাদিকে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। যৌগপদার্থের সংগে সমস্থানিককে লেবেল করা হয় বলে তাদের 'ট্রেসার এলিমেণ্ট' (tracer elements) নামে অভিহিত করা হয়। এভাবে কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহ-পদার্থের বিপাকক্রিয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপের সঠিক অনুধাবন সহজসাধ্য ও সম্ভব-পর হয়।

যেসব ক্ষেত্রে সমস্থানিককে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ **:** (*a*) কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও খনিজপদার্থের বিপাক-পদ্ধতির অনুশীলন, (*b*) কোষঝিল্লির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পদার্থের গতিবিধির অনুশীলন, (*c*) রক্ত ও প্লাজমার পরিমাণ নির্ধারণ, (*d*) লোহিতকণিকার সংখ্যা, জীবনকাল ইত্যাদি নির্ণয়, (*e*) দেহের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের (compart-ments) তরলের পরিমাপ করা, (*f*) বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর অন্ত্র থেকে শোষণ-ক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ, (*g*) হরমোনের উৎপাদন-হার ও তাদের বিপাকক্রিয়ার অনুশীলন, *h*) বিপাকক্রিয়াজনিত ত্রুটিবিচ্যুতির অনুশীলন, (*i* থাইরয়েড রোগের নিরাময়ে তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের ব্যবহার ইত্যাদি।

প্রাণীদেহের উপর তেজস্ক্রিয়ার প্রভাব
Effect of Radioactivity on Life

তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণ ঘটিয়ে থাকে। তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণকে **তেজস্ক্রিয়া** নামে অভিহিত করা হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয়াসের একটি ধর্ম। তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয়াস অপ্রতিষ্ঠ থাকে। নিউক্লিয়াসস্থিত নিউক্লিয়কণা (প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি) বিরামবিহীনভাবে বিচরণ করে, ফলে পরস্পর সংঘর্ষে মিলিত হয়। সংঘর্ষে শক্তির লেনদেন হয়, যার ফলে সব কটি নিউক্লিয়কণা সমশক্তিমান থাকতে পারে না। অপ্রতিষ্ঠ (unstable) নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়কণার মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ বেশী থাকে, ফলে শক্তি লেনদেনের সময় কোন একটি নিউক্লিয়কণা

অধিক গতিশক্তি লাভ করে এবং নিউক্লিয়াসের বাধা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। এভাবে সে নিউক্লিয়াস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তেজস্ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তাই: নিউক্লিয়াস থেকে নিউক্লিয়কণার বিকিরণের দ্বারা শক্তিহানি। পরিবেশীয় চাপ, তাপমাত্রা বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়াগত অবস্থা-কোনকিছুর ওপরই তেজস্ক্রিয়া কোনভাবে নির্ভরশীল নয়। অপ্রতিষ্ঠ নিউক্লিয়াসের সংখ্যা এবং তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের বিকিরণের ওপর ইহা নির্ভরশীল। তেজস্ক্রিয়ার একক **কুরি** (curie) এবং ক্ষুদ্র একক **মাইক্রোকুরি** (μc)। যে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের যে পরিমাণ পদার্থ থেকে সেকেণ্ডে $3{\cdot}7 \times 10^{10}$ সংখ্যক বিকিরণ ঘটে তাকে **এক কুরি** বলা হয়।

1. **তেজস্ক্রিয়ার শ্রেণীবিন্যাস** (Types of radioactivity): প্রকৃতিজাত তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে দু'ধরনের তেজস্ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়: **আলফাকণা** (α-particle) এবং **বিটাকণার** (β-particle) বিকিরণ। অনেক ক্ষেত্রে বিকিরণ শেষ হবার পরও নিউক্লিয়াস সক্রিয় (excited) থেকে যায় অর্থাৎ তার মধ্যে তখনও স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক শক্তি নিহিত থাকে। এক্ষেত্রে একটি বা পর্যায়ক্রমে কিছুসংখ্যক **গামারশ্মি** (gamma-ray) বিকিরিত হয় এবং নিউক্লিয়াস স্থিতাবস্থায় ফিরে আসে।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থে সাধারণত বিটাকণার বিকিরণই লক্ষ্য করা যায় এবং একটিমাত্র পদক্ষেপে তা শেষ হয়। অপরপক্ষে প্রকৃতিজাত তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয়াস স্থিতাবস্থায় ফিরে আসার আগে পর্যায়ক্রমে বিকিরণ ঘটায়; প্রথমে পর্যায়ক্রমে কিছুসংখ্যক আলফাকণা এবং মাত্র দুটো বিটাকণা বিকিরিত করতে পারে। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়ায় অবশ্য অন্য ধরনের বিকিরণও লক্ষ্য করা যায়; যেমন, ধনাত্মক বিটাকণা বা **পজিট্রনের** বিকিরণ।

2. **বিকিরণকণার ধর্ম** (Properties of emitting particles): আলফাকণা দুটো প্রোটন ও দুটো নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। এর ভর তাই 4 এবং ধনাত্মক আধান 2। আলফাকণা একটি বিশেষ নির্দিষ্ট শক্তি নিয়ে বিকিরিত হয়। ইহা যে ভরবেগ নিয়ে এবং যে অভিমুখে বিকিরিত হয়, নিউক্লিয়াস তার বিপরীত দিকে সমান ভরবেগ নিয়ে ঘূর্ণিত হয়। আলফাকণার বিকিরণে নিউক্লিয়াসের ভর এবং পারমাণবিক সংখ্যা 4 এবং 2-এ হ্রাস পায়।

এর গতিবেগ আলোর গতিবেগের 1 শতাংশ। অধিকাংশ আলফাকণার শক্তির পরিমাণ 5Mev(1Mev = 1 মিলিয়ন ইলেক্ট্রন ভোল্ট = $1{\cdot}602 \times 10^{-6}$ আর্গ)।

বিটাকণা ইলেকট্রনের মত একটি ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা। ভর ইলেকট্রনের মত। বিটাকণার বিকিরণে নিউক্লিয়াসের ভরের কোন পরিবর্তন হয় না, তবে পারমাণবিক সংখ্যা একে বৃদ্ধি পায়। নিউক্লিয়াসে প্রোটনের চেয়ে নিউট্রনের সংখ্যা অত্যধিক হলে নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হয়, ফলে ঋণাত্মক বিটাকণার বিকিরণ ঘটে। বিটাকণার গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি। নিহত শক্তি গড়ে 1 Mev.।

ধনাত্মক বিটাকণা বা পজিট্রনও নিউক্লিয়াস থেকেই বিকিরিত হয়। নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের চেয়ে প্রোটনের সংখ্যা অত্যধিক হলে প্রোটন নিউট্রনে রূপান্তরিত হয় এবং পজিট্রন বিকিরিত হয়। পজিট্রনের বিকিরণে পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা একে হ্রাস পায়। এর অন্যান্য ধর্ম বিটাকণার মত।

গামা-রশ্মি আলোক কণার মত অত্যন্ত ক্ষুদ্র তরংগের তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ (electromagnetic radiation)। অতএব আধানহীন। এক্স-রেও একই ধরনের আলোকণা, কিন্তু তাদের উৎস নিউক্লিয়াস বহির্ভূত ইলেকট্রন।

3. **আয়ননকারী বিকিরণ** (Ionizing radiation) : আলফা, বিটা, পজিট্রন এবং গামা-রশ্মিকে আয়ননকারী বিকিরণ বলা হয়, কারণ এরা পরিভ্রমণকারী মাধ্যমের অণুপরমাণুর সংগে পরস্পর বিক্রিয়া ঘটিয়ে **আয়নজুড়ি** (ion-pairs) উৎপন্ন করে। মিথক্রিয়ার (interaction) ফলে মাধ্যমের অণুপরমাণু থেকে বিক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রন ঋণাত্মক আয়ন এবং অণুপরমাণুর অবশিষ্টাংশ ধনাত্মক আয়ন হিসাবে আবির্ভূত হয়। আলফা, বিটা ও পজিট্রন প্রত্যক্ষভাবে এবং গামা-রশ্মি পরোক্ষভাবে আয়ন-জুড়ি উৎপন্ন করে।

আলফাকণার গতিবেগ তুলনামূলকভাবে কম বলে ইহা বায়ু বা গ্যাসীয় মাধ্যমের অণুপরমাণুর ইলেকট্রনের পাশাপাশি অধিক সময় অতিবাহিত করতে পারে। ফলে ইহা মাধ্যমে সর্বাধিক আয়ন-জুড়ি উৎপন্ন করে। দেখা গেছে, প্রতি সেন্টিমিটারে ইহা প্রায় 30,000 থেকে 50,000 আয়ন-জুড়ি উৎপন্ন করে এবং শক্তি নিঃশেষিত হবার পূর্বে 3·3 সে. মি. পথ পরিক্রমা করতে পারে।

বিটা ও পজিট্রনের গতিবেগ অত্যধিক বেশী বলে তারা স্বল্পসময় ইলেক্ট্রনের

পাশাপাশি অতিবাহিত করতে পারে, ফলে তাদের মিথষ্ক্রিয়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং এভাবে কমসংখ্যক আয়নজুড়ি উৎপন্ন হয়।

গামা-রশ্মি দুটো পরোক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে আয়নজুড়ি উৎপন্ন করে থাকে : (a) আলোকতড়িৎ বিশোষণ (photoelectric absorption) এবং (b)
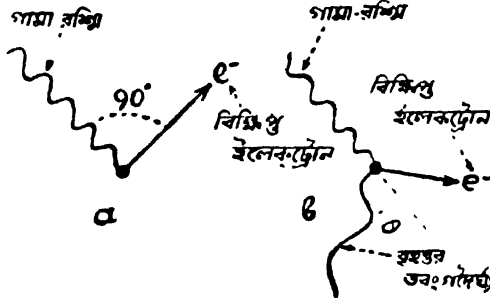
4-25নং চিত্র : (a) আলোকতড়িৎ বিশোষণ, (b) কোমটন বিক্ষেপণ।

কোম্‌টন বিক্ষেপণ (compton scattering)। প্রথম পদ্ধতিতে গামা-রশ্মিতে নিহিত সমস্ত শক্তি পরমাণুর একক ইলেক্‌ট্রনে স্থানান্তরিত হয়, ফলে ইলেকট্রন আপতিত গামা-রশ্মির সংগে সমকোণ রচনা করে বিক্ষিপ্ত হয়। এভাবে গামা-রশ্মি অদৃশ্য হয়, তবে বিক্ষিপ্ত ইলেক্‌ট্রন বিটাকণার মত মাধ্যমে আয়ন-জুড়ির উৎপাদন ঘটায়। অপরপক্ষে, কোম্‌টন বিক্ষেপণে গামা-রশ্মি নিহিত শক্তির একাংশ ইলেক্‌ট্রনে বিশোষিত হয় এবং অপর অংশ বৃহত্তর তরংগ দৈর্ঘ্যের সৃষ্টি করে। বিক্ষিপ্ত ইলেক্‌ট্রন একইভাবে আয়ন জুড়ি উৎপন্ন করে থাকে।

4. **প্রাণীদেহে আয়ননকারী বিকিরণের ফলাফল** (Effects of ionizing radiation on living body) : আয়ননকারী বিকিরণ প্রাণীদেহে তিনভাবে ক্রিয়া করে থাকে : (a) এরা দেহের যে কোন একটি বৃহদাকৃতি অণুকে সরাসরি ভেদ করতে পারে এবং তার যান্ত্রিক ক্ষতিসাধন করে। (b) এদের মধ্যে নিহিত শক্তি দেহের সীমিত স্থানে বিশোষিত হয়ে তাপে রূপান্তরিত হতে পারে এবং অত্যধিক তাপমাত্রার সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে সৃষ্ট তাপ অকুস্থলে ক্ষতিসাধন করতে পারে। (c) দেহতরলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় এরা জলের আয়নন ঘটায়। এভাবে অধিক বিক্রিয়াধর্মী পদার্থের (H_2O_2, H_2 ইত্যাদি) সৃষ্টি হয়। এই সব উৎপন্ন পদার্থ দেহে নানাপ্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে দেহের ক্ষতিসাধন করে। এছাড়াও বিকিরণ সম্পাতে

ক্ষতিগ্রস্ত কলাকোষ থেকে নির্গত বিপাকীয় পদার্থ, স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির প্রতিক্রিয়া, দেহতরলের সাম্যাবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি প্রাণীদেহে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করে থাকে।

প্রাণীদেহের নির্দিষ্ট অংশে আয়ননকারী বিকিরণের বিরূপক্রিয়া নিম্নে বিবৃত হল :

(I) **বয়ঃপ্রাপ্ত ও ক্রমবর্ধনশীল কোষ** (Adult and developing cell) : বয়ঃপ্রাপ্ত কোষের চেয়ে ক্রমবর্ধনশীল কোষ বা অপরিণত কোষ অধিকতর তেজস্ক্রিয়-সংবেদী। তারা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দ্বারা তাই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একইভাবে যে সব কোষের বিপাকক্রিয়া ও রক্তসরবরাহ-ব্যবস্থা তুলনামূলক-ভাবে বেশী তারাও অধিকতর বিনষ্ট হয়।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কোষে দু'ধরনের পরিবর্তন সাধন করে : (a) গাঠনিক পরিবর্তন এবং (b) সক্রিয়তার পরিবর্তন। গাঠনিক পরিবর্তনের মধ্যে প্রধান : কোষঝিল্লির বিনাশ, কোষের বর্ণগ্রাহীধর্মের পরিবর্তন, সাইটোপ্লাজমীয় পদার্থে দানা সৃষ্টি, ভ্যাকুওল বৃদ্ধি, স্ফীতি এবং পদার্থের বিচ্ছিন্ন হওয়া। কোষ-নিউক্লিয়াস সম্পূর্ণভাবে বিশ্লিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন হতে পারে বা ক্রমাটিন পদার্থ তঞ্চিত হতে পারে। ক্রমোসোম বিচ্ছিন্ন বা স্তূপীকৃত হতে পারে। কোষপদার্থের সান্দ্রতার হ্রাস ঘটে। চলন প্রভৃতির হ্রাস, কোষঝিল্লির ভেদ্যতাহ্রাস বা ভেদ্যতাবৃদ্ধি ঘটতে পারে। কোষবিভাজন বিষুব দশায় (equatorial stage) থেমে যেতে পারে বা অস্বাভাবিক কোষবিভাজনও হতে পারে।

(ii) **রক্ত ও রক্তকণিকা :** রক্ত সহজে তঞ্চিত হয় না, ফলে রক্তক্ষরণ ঘটে। অণুচক্রিকার সংখ্যাহ্রাস বা বিনষ্ট কলাকোষ থেকে নির্গত হেপারিন বা হেপারিনজাতীয় পদার্থ সম্ভবত এর জন্য দায়ী। লোহিতকণিকায় যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না, তবে বিভিন্ন প্রকার শ্বেতকণিকার গঠন ও সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। বিকিরণ-সম্পাতের প্রথম দিনেই রক্তে প্রচুর সংখ্যক অপরিণত শ্বেতকণিকার আবির্ভাব ঘটে। R-E তন্ত্র বা রক্তউৎপাদক অংগের ক্ষয়বিকৃতি থেকেই এই পরিবর্তন আসে।

(iii) **হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহ :** প্রমাণ পাওয়া গেছে হৃৎপেশী ও হৃৎপিণ্ডের সংযোগী কলা (junctional tissue) তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বিকিরণসম্পাত অত্যধিক হলে হৃৎপিণ্ডস্থিত স্নেহপদার্থ, ডি এন এ, পটাসিয়াম এবং অ্যাক্টোমায়োসিনের পরিমাণ হ্রাস পায়। এছাড়া হৃৎপিণ্ডে তরলের পরিমাণ-বৃদ্ধি ঘটে।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ধমনী, রক্তজালিকা ও শিরায় অনিয়মিত ও বিক্ষিপ্তভাবে ক্ষতিসাধন করে থাকে। সংগে সংগে এদের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীরও পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ তাদের ভেদ্যতা, চাপ-আয়তন সম্পর্ক (pressure-volume relation) প্রভৃতি অস্বাভাবিক হয়, দেহের বাইরে নিয়ে এলে তাদের মধ্যে অধিকতর আক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় এবং এপিনেফ্রিন বা নরএপিনেফ্রিনের প্রতি তারা অধিকতর কম সংবেদী হয়।

কোন সুস্থ ধমনীতে বিকিরণসম্পাত ঘটালে দুটো বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়ঃ ধমনীগাত্রের সংকোচন ঘটে এবং ভাসা ভ্যাসোরামের (vasa vasorum) মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায়।

(iv) **দেহচর্ম ঃ** তেজস্ক্রিয় বিকিরণসম্পাতে খুব বেশী হ'লে দেহচর্মে পর্যায়ক্রমে বিশেষ ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়ঃ প্রথম দিনেই দেহচর্ম রক্তিম হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ সপ্তাহে তৃতীয়বার এভাবে দেহচর্ম রক্তিম হয়ে উঠতে পারে এবং একই সংগে ত্বকের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এর থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, রক্তবাহের সম্প্রসারণে দেহত্বকে রক্তপ্রবাহ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। দেহচর্মে রক্ত সংবহনের এই পরিবর্তন প্রধানত তিনটি কারণের ওপর নির্ভরশীলঃ (a) রক্তবাহের স্বকীয় কোষের উপর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিরূপ ক্রিয়া, (b) প্রান্তীয় রক্তবাহের স্নায়ুপেশীগত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং (c) রক্তবাহকে পরিবেষ্টনকারী কলাকোষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হিস্টামিন বা অন্য পদার্থের ক্রিয়া।

(v) **প্রজনন ও বংশগতি ঃ** জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমার পরমাণু বিস্ফোরণের পর যে তেজস্ক্রিয় ভস্ম ছড়িয়ে পড়েছিল তা মানুষের প্রজনন ও বংশগতির ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্ত্রীলোকে ঋতুচক্রের অস্বাভাবিকতা এবং সাময়িক বন্ধ্যাদশার উদ্ভব হয়েছিল। পুরুষেও বন্ধ্যাত্ব লক্ষ্য করা গেছে, তবে অত্যধিক বিকিরণ সম্পাতেই তা ঘটে থাকে। পুরুষে শুক্রাণু-উৎপাদন সাময়িকভাবে হ্রাস পায়, ফলে এই পরিবর্তন আসে। বিকিরণ মাত্রার ওপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা আনুপাতিকভাবে নির্ভর করে।

প্রজননের সংগে যুক্ত কোষের ক্রমোসোম ক্ষতিগ্রস্ত হলে বংশগতির পরিবর্তন

আসে বা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ তিনভাবে ক্রমোসোমের ওপর ক্রিয়া করতে পারে: (a) বিকিরণসম্পাতে জলের আয়নন থেকে উৎপন্ন পদার্থ ক্রমোসোমের সংগে বিক্রিয়া ঘটাতে পারে, (b) ক্রমোসোমপদার্থ সরাসরি আয়নিত হতে পারে, এর ফলে জিন বা DNA-এর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং (c) ক্রমোসোম বিচ্ছিন্ন হতে পারে। দেখা গেছে ক্রমোসোমের ব্যাসে (0·2μ) আড়াআড়িভাবে 30টি আয়নন ঘটলে ক্রমোসোম-সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়। আরও দেখা গেছে 70 শতাংশ ক্ষেত্রে বিনষ্ট ক্রমোসোম পুনরায় সংযুক্ত হয়, তবে বিভিন্ন ক্রমোসোমের খণ্ডাংশের মধ্যে সংযুক্তি অনেক ক্ষেত্রে এমন ভাবে সংঘটিত হয়, যার ফলে কোষবিভাজনের পূর্বেই কোষের বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, অথবা যে শিশু জন্ম নেয়, সে পিতামাতা থেকে কোন না কোনভাবে ভিন্ন হয় অথবা বিকলাংগ হয়।

(vi) **ক্যান্সার বা টিউমার উৎপাদন:** তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে ক্যান্সার বা টিউমার উৎপন্ন হতে পারে। তবে ক্যান্সার বা টিউমারের প্রকৃতি দেহের নির্দিষ্ট অংশের বিকিরণসম্পাতের ওপর নির্ভর করে। সমগ্র দেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণসম্পাত ঘটলে লিম্ফ টিউমার (lymphoma), ডিম্বাশয়-টিউমার, ফুসফুসীয় টিউমার, লিউকোমিয়া প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণে দেহত্বকেও ক্যান্সার উৎপন্ন হয়। প্রথমে ইহা আঁচিল বা জড়োলের আকারে বৃদ্ধি পায়, পরে ক্যান্সারে পরিণত হয়। তবে বিকিরণসম্পাতের সংগে সংগেই ক্যান্সার বা টিউমার দেখা দেয় না, উভয়ক্ষেত্রেই একটা নির্দিষ্ট সময় পরে এদের আবির্ভাব ঘটে। এই সময়কে লীনকাল (latent period) বলা হয়। মানুষে ইহা প্রায় 3 বৎসর।

মানবদেহে G বলের ক্রিয়া

Effect of G Forces on Human Body

মহাকাশে ভাসমান মানুষের ওপর অভিকর্ষবলের প্রভাব থাকে না, ফলে মহাকাশে মানুষের ওজনের অনুভূতিও থাকে না। মানুষের নিজেকে মনে হয় ওজনহীন। মহাকাশচারীরা মহাকাশে লাফিয়ে পড়ে এবং ভেসে বেড়িয়ে এর প্রমাণ দিয়েছেন।

1. **ওজনের অনুভূতি কিভাবে আসে:** মানুষের দেহে যেসব সংজ্ঞাবহ গ্রাহক (sensory receptors) ছড়িয়ে আছে, তারা উদ্দীপিত না হলে দৈহিক

ওজনের অনুভূতি জাগ্রত হতে পারে না। মানুষ যখন কোন দৃঢ় অবলম্বনের সংস্পর্শে থাকে, তখন যে বল দেহে ঊর্ধ্ব-মুখী চাপ সৃষ্টি করে, তা দেহের মাংস বা অস্থির দ্বারা ঊর্ধ্বদিকে প্রতিটি পৃথক অংগে এমনভাবে সঞ্চালিত হয়, যাতে সেই অংগ বা তন্ত্র সেই অবলম্বনে প্রয়োজনীয় স্থানে অবস্থান করতে পারে। দেহাভ্যন্তরে এ ধরনের চাপ সৃষ্টি থেকে উৎপন্ন টান (strains) বা উদ্দীপনা দেহের সংজ্ঞাবহ গ্রাহককে উদ্দীপিত করে যা সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয়ে দৈহিক ওজনের অনুভূতি জাগায়। অতএব মানুষ কোন দৃঢ় অবলম্বনের সংস্পর্শে এলে, অবলম্বনজাত বল তার দেহে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাকেই সে ওজন হিসাবে প্রকাশ করে।

2. **G-বল :** পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষের ওপর সাধারণত অভিকর্ষ বল কাজ করে, তবে বিমান চালনার সময় ত্বরণজাত যে বল চালকের ওপর ক্রিয়া করে, তা দৈহিক ওজনের পরিবর্তন সাধন করে। ত্বরণজাত বলকে G-এককে প্রকাশ করা হয়। স্বাভাবিক অভিকর্ষ বলের সমান ত্বরণজাত বলকে G-একক বলা হয়। G-বল কেন্দ্রাতিগ বলের মত ভরের সমানুপাতিক। 2G-এর সমান কোন ত্বরণ-জাত বল যেমন অভিকর্ষ বলের দ্বিগুণ, তেমনি ইহা কোন চালকের ওপর সক্রিয় হলে তার দৈহিক ওজনও দ্বিগুণিত হয়।

দেহের উপর ক্রিয়াভেদে G-বলকে দু'ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় : (a) **ধনাত্মক G বল** (+G) এবং (b) **ঋণাত্মক G বল** (−G)। যে ত্বরণে জাড্যবল (inertial force) বিমানচালকের মস্তক থেকে পা অভিমুখে ক্রিয়া করে তাকে ধনাত্মক G-বল বলা হয়। একই ভাবে যে ত্বরণে জাড্যবল বিমান চালকের পা থেকে মস্তক অভিমুখে ক্রিয়া করে তাকে ঋণাত্মক G-বল বলা হয়।

আধুনিক বিমানপোত বিমানচালককে G-বলের আওতায় নিয়ে আসে, ফলে বিমানচালকের কর্মক্ষমতা বিশেষভাবে বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেদিক দিয়ে G-বলের গুরুত্ব শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে অনস্বীকার্য।

3. **G-বলের মান ও অভিমুখ :** G-বলকে অভিকর্ষ বল ও কেন্দ্রাতিগ বলের লব্ধি (resultant) বলা চলে। ভেক্টর অংকপাতন (notation) ব্যবহার করে, নিম্নলিখিত সমীকরণের দ্বারা G-বলের মান নির্ণয় করা যায় :

$$Fa \mid + Fg \mid - mx \mid = 0$$

এক্ষেত্রে, Fa | = অভিকর্ষ ছাড়া ত্বরণজাত যে বল বিমান চালকের ওপর ক্রিয়া

করে, Fg | = অভিকর্ষ বল, m = বিমানচালকের দেহের ভর এবং x | সৃষ্ট ত্বরণ। উপরিউক্ত সমীকরণকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$Fa \mid = mx \mid - Fg \mid$$

এখানে, ঋণাত্মক Fa | বা - Fa | কে G-বল বলা হয়।

mx | যদি Fg | এর বিপরীত মুখে ক্রিয়া করে, তাহলে G-বল (−Fa |) বিমানচালকের ক্ষেত্রে নিম্নাভিমুখী অর্থাৎ মস্তক থেকে পা অভিমুখে ক্রিয়া করবে। এক্ষেত্রে মোট নিম্নাভিমুখী বল Fg | এর চেয়ে বেশী হবে। সমীকরণ এক্ষেত্রে দাঁড়াবে,

$$Fa \mid = -mx \mid - Fg \mid$$
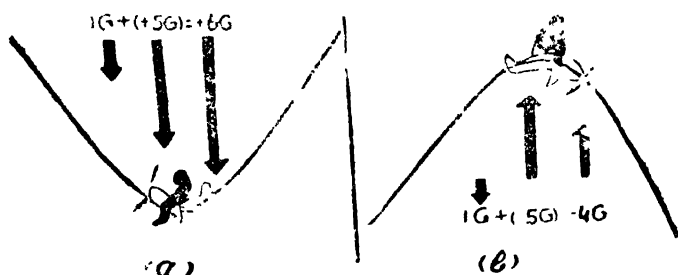
4-26নং চিত্র : মানবদেহে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক G বলের ক্রিয়া। a-ধনাত্মক বল, b-ঋণাত্মক বল।

উদাহরণস্বরূপ, mx | = 5G এবং Fg | = G ধরলে,

$$-Fa \mid = 5G + G = (+6G)$$

অর্থাৎ G-বল ধনাত্মক (4-26নং চিত্র)।

আবার, mx যদি সম্মুখী হয়, এবং Fg | -এর চেয়ে বেশী হয়, তাহলে G-বল বিমান চালকের পা থেকে মস্তক অভিমুখে ক্রিয়া করবে। এক্ষেত্রে −Fa | এর মান হবে,

$$-Fa \mid = -5G + G = (-4G)$$

G-বল এক্ষেত্রে ঋণাত্মক।

4. ধনাত্মক ও ঋণাত্মক G বলের ক্রিয়া (Effects of positive and negative G-forces) : G-বল যখন মস্তক থেকে পা অভিমুখে ক্রিয়া করে, তখন 3G পর্যন্ত বল ক্রিয়ায় বিমানচালক তার উপবিষ্ট আসনে চাপবৃদ্ধি অনুভব করে। 3G বা 4G-তে পেশীচালনা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে এবং মুখমণ্ডলের

পেশীকে টেনে নিম্নদিকে নামিয়ে আনে। 5G-তে দেহের নড়াচড়া ও শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে আসে। এই বলকে 5G থেকে 9G-তে বৃদ্ধি করলে, পা দুটো ফুলে ওঠে, কাফপেশীতে (calf muscle) খিল ধরে, দৃষ্টি লোপ পায়, শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা হ্রাস পায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংজ্ঞালোপ ঘটে।

রক্তসংবহনের পরিবর্তন থেকে প্রধানত এ ধরনের লক্ষণাবলীর প্রকাশ ঘটে। স্বাভাবিকভাবে উপবেশনকারী বিমানচালকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাপ-পার্থক্য, রক্তের ঘনত্ব (1-এর চেয়ে সামান্য বেশী) এবং 1 মিটার রক্তস্তম্ভের গুণ-ফলের সমান হয়। অতএব দেহকে অভিকর্ষের 5 গুণ বলের নিয়ন্ত্রাধীনে নিয়ে আসা হ'লে রক্তের ঘনত্ব 5 গুণ বৃদ্ধি পায় এবং চাপপার্থক্যেরও 5 গুণ বৃদ্ধি ঘটে। G-বল বেশী হলে নিম্নাংগের শিরাসমূহ স্ফীত হয়ে ওঠে। পা ও উদরস্থ শিরাভাণ্ডারে এভাবে প্রচুর পরিমাণে রক্ত জমা হয়, ফলে হৃৎপিণ্ডে শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন হ্রাস পায় এবং হার্দ উৎপাদের হ্রাস ঘটে।

পায়ের শিরায় প্রচুর পরিমাণে রক্ত জমে ওঠার ফলে পা ফুলে ওঠে এবং পেশীর ভেতর দিয়ে রক্তসবংহন বিঘ্নিত হওয়ার ফলে পেশীতে খিল ধরে। সংজ্ঞালোপের আগে দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। অক্ষিপটের ভেতর দিয়ে রক্ত-সংবহনের হ্রাসপাপ্তিতে অক্ষিপট নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠে। দৃষ্টিলোপকে **ব্লেক-আউট** (black-out) বলা হয়। গুরুমস্তিষ্কে অক্সিজেন-সরবরাহ হ্রাস পাওয়ার ফলে (রক্তসংবহনের হ্রাসপ্রাপ্তিতে) সংজ্ঞা লোপ ঘটে।

ঋণাত্মক G-বল পা থেকে মস্তক অভিমুখে ক্রিয়া করে, ফলে মস্তক অভিমুখে রক্তচলাচল বৃদ্ধি পায়। 3G-তে বিমান চালকের মাথা ঝিম ঝিম করে এবং নেত্রকোটরে চাপ অনুভূত হয়। মাথাধরাও প্রকাশ পেতে পারে G-বল তিনের বেশী হলে অক্ষিপটের রক্তনালী রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং অধিক পরিমাণ রক্তের ভেতর দিয়ে আলোর গতি বাধা পায় বলে দৃষ্টিরোধ ঘটে। রক্তের ভেতর দিয়ে যতটুকু আলো অক্ষিপটে শোষিত হয়, তা লালের অনুভূতির উদ্রেক করে। এ-ঘটনাকে **রেড-আউট** (redout) বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. তোমার দেহে কিভাবে হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব নিয়ন্ত্রিত হয় লিখ। পি-এইচ কিভাবে নির্ণয় করা হয়? (C. U. '75)

2. বাফারের সংজ্ঞা লিখ। মানব দেহে যে সব বিভিন্ন প্রকার বাফার রয়েছে তাদের সম্বন্ধে যা জান লিখ। (C. U. 83)

3. বাফার কাকে বলে ? বাফারের pH কিভাবে নির্ণয় করা যায় ?

4. ঝিল্লিবিশ্লেষণের সংজ্ঞা লিখ। একটি পরীক্ষার সাহায্যে ঝিল্লিবিশ্লেষণের ব্যাখ্যা কর। ঝিল্লিবিশ্লেষণের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব কতটুকু ?

5. অভিস্রবণ কাকে বলে ? অভিস্রবণের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব সম্বন্ধে যা জান লিখ।

6. অভিস্রবণ চাপের সংজ্ঞা লিখ। একটি পরীক্ষার সাহায্যে অভিস্রবণ চাপ কাকে বলে বুঝিয়ে দাও। সমসারক, লঘুসারক, ও অতিসারক দ্রবণ বলতে কি বুঝায় ?

7. ঝিল্লিবিশ্লেষণ ও অভিস্রবণ বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। মানুষের রক্তস্থিত কিছু সংখ্যক জীবন্ত লোহিতকণিকাকে যদি তিনটি পৃথক পরীক্ষানলে, যার (a) একটিতে 0·25 শতাংশ NaCl-এর দ্রবণ, (b) অন্যটিতে 0·90 শতাংশ NaCl-এর দ্রবণ এবং (c) তৃতীয়টিতে 1.25 শতাংশ NaCl-এর দ্রবণ রাখা আছে, তাতে ফেলা হয়, তবে কি ঘটবে তার আলোচনা কর।

(C. U. '74, '85, C. U, H. '77)

8. ঝিল্লিবিভব কাকে বলে ? ঝিল্লিবিভব সৃষ্টির মূলনীতি কী ? কিভাবে ঝিল্লিবিভব নির্ণয় করা যায় ?

9. কোলয়েডের তড়িৎ ও আলোক ধর্মের আলোচনা কর। (C. U. H. '77)

10. কোলয়েড কাকে বলে ? কোলয়েডের ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(C. U. '62, '80 (2))

11. (a) কোলয়েডের ধর্মগুলো আলোচনা কর। (b) ব্যাপন ও ঝিল্লিবিশ্লেষণের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্বগুলো কি কি ? (C. U. 85)

12. কোলয়েডের তড়িৎ ধর্মের বিস্তৃত বিবরণ দাও।

13. কোলয়েডের আলোক ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লিখ ?

14. রক্ষাপদ কোলয়েড কাদের বলে ? কোলয়েডের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব কতটুকু ?

15. ডোনানের ঝিল্লিসাম্যের প্রক্রিয়ার আলোচনা কর এবং অভিস্রবণ চাপের সংগে ডোনানের ঝিল্লিসাম্যের সম্পর্কের ব্যাখ্যা কর। (C. U. H. '76)

6. সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিবহন বলতে কি বোঝ। উদাহরণসহ সক্রিয় পরিবহনের বর্ণনা দাও। হরমোন প্রভাব বিস্তার করে এমন একটি পরিবহনের উল্লেখ কর।

17. ডোনানের ঝিল্লিসাম্য ও তার শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব সম্বন্ধে যা জান লিখ।

18. সমস্থানিক বলতে কী বুঝায় ? সমস্থানিকের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব কতটুকু ?

19. শারীরবৃত্ত ও প্রাণরসায়নে সমস্থানিকের ব্যবহারের বর্ণনা দাও। (C. U. H. '77)

20. বিকিরণজাত ক্ষতি কাকে বলে ? প্রাণীদেহে আয়ননকারী বিকিরণের ফলাফল বর্ণনা কর। (C. U. H. '76)

21. মানবদেহে C বলের ক্রিয়া সম্পর্কে যা জান লিখ।

22. সক্রিয় পরিবহন বলতে তুমি কি বোঝ ? কোষঝিল্লির মধ্য দিয়ে গ্লুকোজের পরিবহন-পদ্ধতির বর্ণনা দাও। (C. U. H. '81)

23. একাধিক সূচকপদার্থ ব্যবহার করে কিভাবে তুমি মূত্রের একটি নমুনার pH-নির্ধারণ করবে ? নির্ধারণ-পদ্ধতির সংগে জড়িত মূলনীতির আলোচনা কর। (C. U. H. '81)

24. কোলয়েড দ্রবণে যেসব তড়িত-গতীয় ঘটনাবলী লক্ষ্য করা যায় সংক্ষেপে তার আলোচনা কর। (C. U. H. '81)

25. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(a) ব্যাপন, (b) স্বমিত লবণ জল, (c) অম্ল ও ক্ষারক, (d) pH ('68), (e) ইলেক্ট্রো-ফরেসিস, (f) ব্রাউনের চলন, (g) পরমাণুবীক্ষণ যন্ত্র (h) পৃষ্ঠটান, (i) সান্দ্রতা, (j) পৃষ্ঠলগ্নতা, (k) সক্রিয় পরিবহন, (l) সমস্থানিক, (m) তেজস্ক্রিয়া, (n) বাফার ('76), (o) পরাপরিস্রাবণ ('77), (p) কোলয়েড ('77), (q) pH-এর পরিমাপ।

26. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(a) পি. এইচ' কি বাফারের কাজগুলো কি কি ? (C. U. 82, 86)

(b) দ্রাবক-আসক্ত ও দ্রাবক-অনাসক্ত কোলয়েডের মধ্যে পার্থক্য। (C. U. 85)

(c) অভিস্রবণ চাপের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (C. U. 83)

(d) সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিবহনের মধ্যে পার্থক্য। (C. U. 83)

(e) প্রকৃত দ্রবণ ও কোলয়েড দ্রবণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলো কি ? (C. U. 83)

(f) পরাপরিস্রাবণের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব কি ? (C. U. 82)

পাঁচ

প্রাণরসায়ন

BIOCHEMISTRY
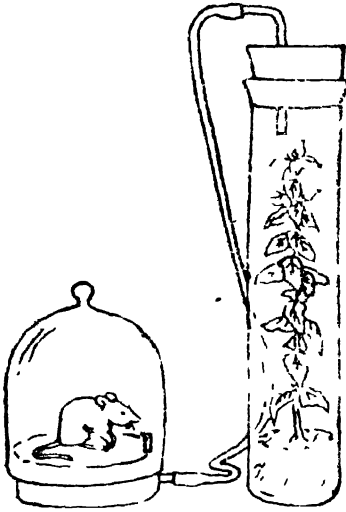
যেসব আণবিক উপাদানের দ্বারা জীবনের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে তাদের অনুশীলনের নাম **প্রাণরসায়ন** (biochemistry)। প্রাণরসায়ন একাধারে তাই জীবনের অণুপরমাণুর জটিল রসায়ন, অপরপক্ষে তেমনি এটি পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন এবং নানা-প্রকার শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় অণুপরমাণুর পরিবর্তনের তথ্য সম্বলিত রসায়নও। বর্তমানকালে প্রাণরসায়ন বিভিন্ন কারণে নানাবিধ উত্তেজনা ও সফলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। **প্রথমত**, জীবনের কিছু কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়ার রাসায়নিক ভিত্তি অবগত হওয়া গেছে। যেমন, DNA-এর দ্বি-পেঁচাল গঠনের আবিষ্কার, বংশ সংকেতের (genetic code) রহস্যভেদ, প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠনের নির্ধারণ, বিপাকক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত

বিক্রিয়াপথের অনুধাবন প্রভৃতি প্রাণরসায়নের সাফল্যের নানা দিক। **দ্বিতীয়ত,** জীবনের বহুরূপে প্রকাশের মূল আণবিক বিন্যাস ও নীতি একই। যেমন, আণবিকস্তরে মানুষ ও ই. কোলির (Escherichia Coli) মত ব্যাকটেরিয়ার অনেক কিছুই একই রকম। প্রোটিনসংশ্লেষণের জন্য DNA থেকে RNA এর মধ্যে যে বংশসংকেতের সঞ্চালন হয় তা উভয় ক্ষেত্রে একই রকম। উভয়েই শক্তি হিসাবে ATP কে ব্যবহার করে। **তৃতীয়ত,** প্রাণরসায়ন চিকিৎসা শাস্ত্রে তার ক্রমবর্ধমান সাফল্যের ছাপ ফেলে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, রোগের সনাক্তকরণে এনজাইম অ্যাসে (enzyme assay) বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সিরামে কোন এনজাইমের মাত্রা নির্ধারণ করে রোগীর হৃৎপেশীর অবক্ষয় বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান (myocardial infarction) হয়েছে কিনা তা জানা যায়। রোগের সংগে সম্পর্কযুক্ত আণবিক প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রেও প্রাণরসায়নের গুরুত্ব সর্বাধিক। যেমন, বিপাকের জন্মগত ত্রুটি (inborn error of metabolism), সিকল-সেল অ্যানিমিয়া (sickle-cell anemia) প্রভৃতি। **চতুর্থত** জীবনবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সবচেয়ে রহস্যাবৃত ও মৌলিক কিছু সমস্যার সমাধানেও প্রাণরসায়নের অগ্রগতি বিশেষভাবে সহায়ক। এরকম কিছু সমস্যা ও প্রশ্ন, একটিমাত্র একক কোষ থেকে কিভাবে পেশীকোষ, যকৃৎ কোষ, মস্তিষ্ককোষ বা নিউরোনের মত ভিন্ন ধরনের কোষ উৎপন্ন হয়? একটি জটিলতর অংগের গঠনে বিভিন্ন ধরনের কোষগুলো কিভাবে পরস্পরকে খুঁজে বের করে? কোষের বৃদ্ধি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? স্মৃতি গড়ে উঠার প্রক্রিয়া কি? ক্যান্সারের কারণ কি? আলো কিভাবে রেটিনাতে স্নায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন করে? মানসিক অসংগতি বা সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) কার দ্বারা উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।

জীবনের মৌলিক উপাদান

The Elementary Composition of Life.

শতাধিক মৌলিক পদার্থের মধ্যে মাত্র 19টি মৌলিক পদার্থ সব রকম জীবন্ত কোষের পক্ষে অপরিহার্য। কোষের উৎস প্রাণী, উদ্ভিদ বা জীবাণু যাই হোক না কেন এই উপাদানগুলো সবরকম কোষে প্রায় সমান অনুপাতে থাকে (1 নং তালিকা)। কোষের মোট ওজনের প্রায় 98 শতাংশ 6টি অধাতুর (nonmetals) দ্বারা গঠিত। আবার এই ছটি অধাতু (O, C, H, N, P এবং S) দ্বারাই

কোষের প্রোটোপ্লাজম গড়ে ওঠে এবং তার থেকে কোষের কার্যকরী উপাদান যথা, কোষপ্রাচীর, কোষঝিল্লি, জিন, এনজাইম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

এই 6টি পদার্থকে সমুদ্র, ভূত্বক ও পৃথিবীর আবহমণ্ডলে তুলনামূলকভাবে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এজন্যই এরা জীবনের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় এই যুক্তি মানা যায় না, কারণ কার্বনের চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের প্রাচুর্য বেশী, তবু এই উপাদানটি জীবনের পক্ষে অপরিহার্য নয়। তবে এই 6টি উপাদানের এমন কিছু স্বকীয় ধর্ম রয়েছে যার থেকে অনুমান করা যায় এরা জীবনের অপরিহার্য উপাদান হবার উপযোগী। এই ধর্মগুলো আপাতদৃষ্টিতে

1 নং তালিকা ঃ জীবন্ত কোষের মৌলিক উপাদান।

মৌলিক পদার্থ	শতকরা ওজন
অক্সিজেন (O)	65·00
কার্বন (C)	18·00
হাইড্রোজেন (H)	10·00
নাইট্রোজেন (N)	3·00
ক্যালসিয়াম (Ca)	1·50
ফসফরাস (P)	1·00
পটাসিয়াম (K)	0·35
সালফার (S)	0·25
সোডিয়াম (Na)	0·15
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	0·05
অন্যান্য পদার্থ (Cu, Zn, Se, Mo, F, Cl, I, Mn, Co, Fe)	0·70
	মোট 100·00

নিম্নরূপ ঃ (1) ক্ষুদ্র পারমাণবিক ব্যাসার্ধ, (2) 1, 2, 3 এবং 4-ইলেকট্রন-বণ্ড গঠন করার ক্ষমতা এবং (3) যৌগিক বণ্ড তৈরী করার ক্ষমতা। ক্ষুদ্র পরমাণু সবচেয়ে দৃঢ় ও সবচেয়ে সুস্থির (stable) বণ্ড গঠন করতে পারে। গাঠনিক উপাদান হিসাবে এটি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। H, O, N এবং C হল সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরমাণু যারা যথাক্রমে 1, 2, 3 এবং 4টি ইলেকট্রন বণ্ড গঠন করতে পারে। এর ফলে খুব স্বচ্ছন্দে অণুর ডিজাইন বা আণবিক বিন্যাস করা সম্ভবপর হয়। একই কারণে O, N, C, P ও S সহজে যৌগিক বণ্ড গঠন করতে পারে।

আণবিক মডেল (Molecular Models)

জৈব অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন (three dimensional structure) বোঝাবার

জন্য নানাপ্রকার মডেল ব্যবহার করা হয়। এসব আণবিক মডেলে পরমাণুকেও মডেল হিসাবে চিহ্নিত করে ব্যবহার করতে হয়। এধরনের তিনটি পারমাণবিক মডেলের কথা এখানে উল্লেখ করা হল : (a) **স্থান-পূর্তি মডেল** (space-filling model, (b) **বল-ও-কাঠি মডেল** (ball and stick model) এবং (c) **কাঠাম মডেল** (skeletal model)। এই তিনটি মডেলের মধ্যে স্থান-পূর্তি মডেল সবচেয়ে বাস্তব সম্মত (5-2নং চিত্র), কারণ এই মডেলে কোন পরমাণুর আকৃতি ও গঠন বণ্ডের ধর্ম ও ভ্যানডার-ওয়ালস ব্যাসার্ধের (Van der Waals) দ্বারা নির্ধারিত হয়। অবশ্য বল-ও কাঠি মডেল প্রায়ই ব্যবহার করা হয় যদিও সেটি আগেরটির মত তেমন বাস্তব সম্মত নয়। তবে বণ্ড গঠনের
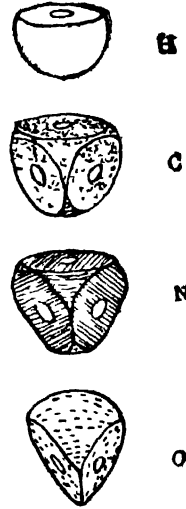
5-2 নং চিত্র : হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের স্থানপূর্তি মডেল।

ব্যবস্থা শেষোক্ত ক্ষেত্রে অনেকটা সহজ এবং কাঠির সরু দিক বণ্ডটি কোনদিকে প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ বইয়ের সমতল পৃষ্ঠার সামনে না পেছনের দিকে তা দেখিয়ে
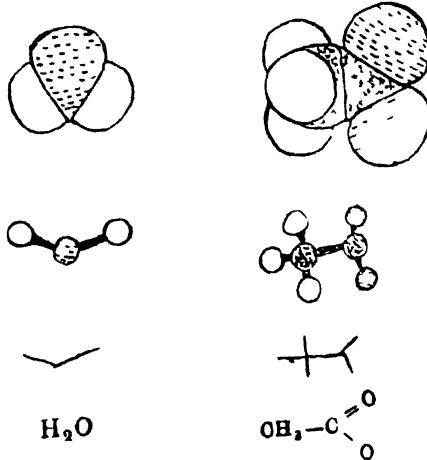
5-3 নং চিত্র : জল ও অ্যাসিটেটের স্থান-পূর্তি, বল-ও-কাঠি ও কাঠাম মডেল।

দেয়। এছাড়া এই মডেলে অধিকতর জটিল আণবিক গঠনকেও প্রত্যক্ষ করা যায়। কাঠাম মডেলে আরো সহজে কোন অণুর প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। শেষোক্ত মডেলকে বৃহদাকারের জৈব অণুর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। যেমন, হাজার হাজার পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত প্রোটিন।

আইসোমার (Isomers)

যেসব রাসায়নিক পদার্থের স্থূল সংকেত (empirical formula) একই অর্থাৎ একই মৌলিক উপাদানে গঠিত কিন্তু রাসায়নিক ধর্ম ও কাঠাম (structure) আলাদা তাদেব **আইসোমার** (গ্রীক, isos = সদৃশ, meros = অংশ) বলা হয়।

যেমন, C_3H_8O স্থূলসংকেত সম্পন্ন 3টি আইসোমার সম্ভব ঃ

$CH_3CH_2CH_2OH$
1-প্রোপানোল

$$\begin{matrix} CH_3 \\ CH_3 \end{matrix} \!\!> CHOH$$
2-প্রোপানোল

$CH_3-O-CH_2CH_3$
মিথাইলইথাইল ইথার

স্টেরিওআইসোমার (Sterioisomers)

যেসব রাসায়নিক পদার্থের কাঠাম সংকেত (structural formula) এক কিন্তু ত্রিমাত্রিক অবস্থানে পরমাণু ও রাসায়নিক গ্রুপের বিন্যাস আলাদা তাদের **স্টেরিওআইসোমার** (sterioisomers) বলা হয়। **অপ্রতিসম কার্বন পরমাণুর** (asymmetric carbon atom) উপস্থিতির জন্য এধরনের স্টেরিও-আইসোমারের সৃষ্টি হয়। কার্বন পরমাণুর সংগে 4টি পৃথক পরমাণু বা গ্রুপ সংযুক্ত হলে তাকে অপ্রতিসম কার্বন বলা হয়। গ্লুকোজে 4টি অপ্রতিসম কার্বন পরমাণুর উপস্থিতির জন্য গ্লুকোজের 16টি স্টেরিওআইসোমার সম্ভব। গ্লিসার্যালডেহাইডের একটি অপ্রতিসম কার্বন পরমাণু থাকার জন্য তার 2টি স্টেরিওআইসোমার রয়েছে।

$$\begin{array}{c} CHO \\ | \\ H-C-OH \\ | \\ CH_2OH \end{array} \qquad \begin{array}{c} CHO \\ | \\ HO-C-H \\ | \\ CH_2OH \end{array}$$

D-গ্লিসার্যালডেহাইড L-গ্লিসার্যালডেহাইড

ওপটিক্যাল আইসোমার (Optical Isomers)

অপ্রতিসম কার্বনপরমাণুসম্পন্ন যে সব রাসায়নিক পদার্থের কাঠাম-সংকেত এক কিন্তু আলোক সক্রিয়তা (optical activity) ভিন্ন তাদের **ওপটিক্যাল আইসোমার** (optical isomers) বলা হয়। অপ্রতিসম কার্বন পরমাণুর উপস্থিতির জন্য এসব আইসোমার আলোক সক্রিয় হয়। **অর্থাৎ এসব পদার্থের** মধ্য দিয়ে সমবর্তিত আলোকে (polarized light) পাঠালে তা বাম বা দক্ষিণ মুখে আবর্তিত হয়। এই আবর্তনকে **আলোক ঘূর্ণন** (optical rotation) বলা হয়। যেসব ওপটিক্যাল আইসোমার **সমতলে সমবর্তিত আলোকে** (plan-polarized light) ঘড়ির কাঁটার দিকে বা দক্ষিণমুখে ঘুরায় তাদের **দক্ষিণাবর্ত** (dextrorotatory) এবং যারা সমবর্তিত আলোকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বা বামদিকে ঘুরায় তাদের **বামাবর্ত** (levorotatory) বলা হয়। দক্ষিণাবর্তনকে যোগচিহ্ন (+) এবং বামাবর্তনকে বিয়োগচিহ্ন (−) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন, D-গ্লিসার‍্যালডেহাইড দক্ষিণাবর্ত এবং D-গ্লিসারিক অ্যাসিড বামাবর্ত, এদের তাই D (+) গ্লিসার‍্যালডেহাইড এবং D (−) গ্লিসারিক অ্যাসিড হিসাবে প্রকাশ করা যায়ঃ

D (+) গ্লিসার‍্যালডেহাইড	D (−) গ্লিসারিক অ্যাসিড
CHO	$COOH$
$H-C-OH$	$H-C-OH$
CH_2OH	CH_2OH
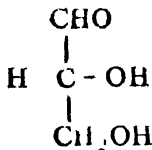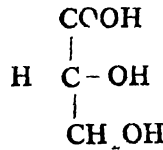
D (+) গ্লিসার‍্যালডেহাইড D (−) গ্লিসারিক অ্যাসিড।

এনানটিওমার (Enantiomer)

যেসব ওপটিক্যাল আইসোমারের আলোক ঘূর্ণন (optical rotation) সমান কিন্তু বিপরীতমুখী তাদের **এনানটিওমার** বলা হয়। এদের প্রত্যেকটির
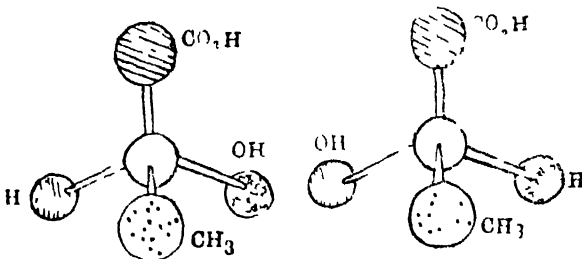
6-4 নং চিত্র ঃ ল্যাকটিক অ্যাসিডের এনানটিওমারের বল ও-কাঠি মডেল।

গঠনকাঠামো একে অন্যের দর্পন প্রতিবিম্ব (mirrot image) বিশেষ। ল্যাকটিক অ্যাসিডের এরকম 2টি এনানটিওমার আছে, (+) ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং (−) ল্যাকটিক অ্যাসিড (5-4 নং চিত্র)।

এসব এনানটিওমারের রাসায়নিক ধর্ম এক কিন্তু কিছু ভৌত ধর্ম এবং প্রায় সব শারীরবৃত্তীয় ধর্মই সম্পূর্ণ আলাদা। কোন দ্রবণে সমপরিমাণে দুটো এনানটিওমার থাকলে সেই মিশ্রণকে **র‍্যাসিমিক মিশ্রণ** (racemic mi‸ture) বলা হয়। এজাতীয় মিশ্রণের আলোক ঘূর্ণন শূন্য।

সিজ-ট্রান্স আইসোমার (Cis-Trans Isomers)

সিজ-ট্রান্স আইসোমারকে **জিওমেট্রিক আইসোমারও** (geometric isomers) বলা হয়। দ্বিবন্ধ বা ডাবল বণ্ড (double bond) দৃঢ় হবার ফলে তার সংগে যুক্ত পরমাণু বা গ্রুপ একক বণ্ডের সংগে যুক্ত পরমাণু বা গ্রুপের মত মুক্তভাবে আবর্তিত হতে পারে না। ফলে ডাবল বণ্ডের উভয় প্রান্তে পরমাণু বা গ্রুপের বিন্যাস থেকে সিজ-ট্রান্স আইসোমারের সৃষ্টি হয় কোন আইসোমারের ডাবল বণ্ডের একই পাশে নির্দিষ্ট পরমাণু বা গ্রুপসমূহ বিন্যস্ত হলে তাকে **সিজ-আইসোমার** (ল্যাটিন, cis—একই পার্শ্বে) এবং ডাবল বণ্ডের উভয় পার্শ্বে পরমাণু বা গ্রুপগুলো বিন্যস্ত হলে তাকে **ট্রান্স আইসোমার** (trans isomer) বলা হয়। সিজ ও ট্রান্স আইসোমারের রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় ধর্ম আলাদা।

H H
>=<
সিজ

H
>=<
H
ট্রান্স

HOOC H
C
||
C
HOOC H
সিজ আইসোমার (মেলেইক অ্যাসিড)
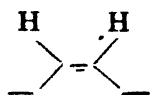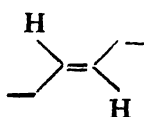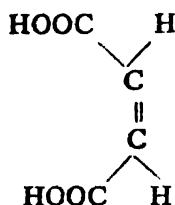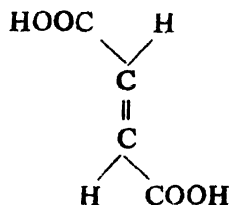
HOOC H
C
||
C
H COOH
ট্রান্স আইসোমার (ফিউমারিক অ্যাসিড)

অ্যানোমার (Anomers)

বিভিন্ন শর্করা ও গ্লাইকোসাইডের 1 কার্বন পরমাণুতে −H ও −OH এর বিন্যাস থেকে অ্যানোমার সৃষ্টি হয়। ফিশারের প্রক্ষেপ সংকেত অনুসারে 1

কার্বনে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ (−OH) ডানপাশে থাকলে তাকে α ফর্ম এবং বাঁপাশে থাকলে তাকে β-ফর্ম বলা হয়। শর্করা বা গ্লাইকোসাইডের α ও β ফর্মকে অ্যানোমার বলা হয়। গ্লুকোজের দুটো অ্যানোমার হল α-D-গ্লুকোজ এবং

```
  H   OH               OH   H
   \ /                   \ /
    C———┐                 C————
    |   |                 |
H - C - OH  O         H - C - OH  O
    |       |             |       |
    α-ফর্ম                β-ফর্ম
```
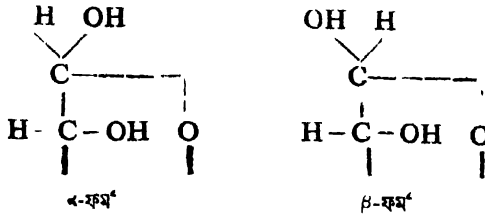
β-D-গ্লুকোজ। শর্করার 1-কার্বন পরমাণুকে অ্যানোমারিক কার্বন (anomeric carbon) বা কার্বনীল কার্বন (carbonyl carbon) বলা হয়।

এপিমার (Epimers)

গ্লুকোজের 2, 3 ও 4 কার্বন পরমাণুতে −H ও −OH এর পারস্পরিক স্থানবিনিময়ের দ্বারা যেসব আইসোমারের সৃষ্টি হয় তাদের **এপিমার** (epimers) বলা হয়। গ্লুকোজের জৈবসক্রিয় এপিমারের মধ্যে প্রধান : ম্যানোজ (mannose) এবং গ্যালাকটোজ।

অ্যালডোজ-কিটোজ আইসোমার (Aldose-Ketose Isomers)

ফ্রাকটোজ ও গ্লুকোজের আণবিক সংকেত একই রকম। কিন্তু কাঠাম-সংকেত (structural formula) আলাদা। কারণ ফ্রাকটোজের 2-কার্বন পরমাণু কিটোনগ্রুপের (>CO) অংশ। তাই সেটি অ্যালডোজ না হয়ে কিটোজ সাধারণত 1-কার্বন পরমাণুতে একটি মুক্ত −H থাকলে সেটি অ্যালডোজ এবং $-CH_2OH$ গ্রুপের দ্বারা হাইড্রোজেনটি প্রতিস্থাপিত হলে শর্করাটি কিটোজে পরিণত হয়।

ইরীথ্রো-থ্রিও আইসোমার (Erythro-threo Isomers)

দুটো অপ্রতিসম কার্বন পরমাণু সম্পন্ন আইসোমারের ক্ষেত্রে এধরনের নামকরণ করা হয়ে থাকে। নামের উৎস 4-কার্বন যুক্ত শর্করা ইরীথ্রোজ (erythrose) ও থ্রিওজ (threose)। যে আইসোমারের 2টি সদৃশ গ্রুপ (যেমন, −OH গ্রুপ), সমপার্শ্বে অবস্থান করে তাকে **ইরীথ্রো আইসোমার** এবং যার সদৃশ গ্রুপ দুটি বিপরীত পার্শ্বে অবস্থান করে তাকে **থ্রিও আইসোমার** বলা হয়।

```
 O    O              O    O
      |              |    |
 —  — |             —|    |—
      |              |— —|
 —  — |              |    |
      |              |    |
```

ইরীথ্রো আইসোমার   থ্রিও আইসোমার

```
    CHO          CHO            CHO            CHO
     |            |              |              |
H – C – OH   HO – C – H     HO – C – H     H – C – OH
     |            |              |              |
H – C – OH   HO – C – H      H – C – OH   HO – C – H
     |            |              |              |
   CH2OH        CH2OH          CH2OH          CH2OH
```

D(–) ইরীথ্রোজ   L(+) ইরীথ্রোজ   D(–) থ্রিওজ   L(+) থ্রিওজ
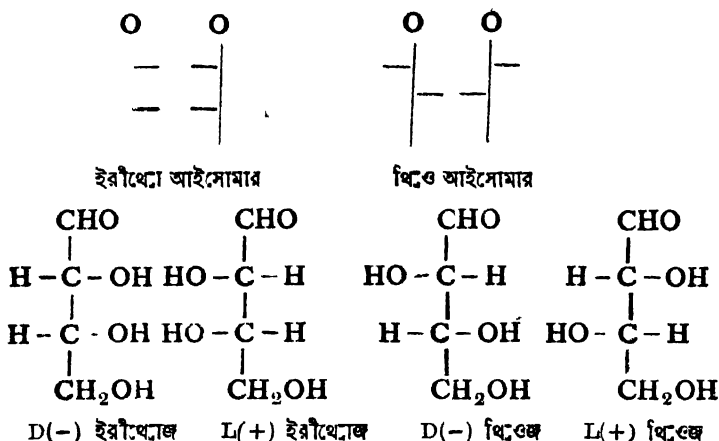
ক্রিয়াশীল গ্রুপ
Functional Group

মৌলিক পদার্থের (C, H, O, N ও S) সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক ও ভৌতধর্মযুক্ত বিশেষ ধরনের বিন্যাসকে **ক্রিয়াশীল গ্রুপ** (functional group) বলা হয়। এসব ক্রিয়াশীল গ্রুপের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মের উপর নির্ভর করেই ছোট-বড় নানা-প্রকার অণুর ধর্মসম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াশীল গ্রুপের মধ্যে প্রধান ঃ

1. অ্যালকোহল (alcohol)
2. অ্যালডেহাইড ও কিটোন (aldehyde and ketone)
3. কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড (carboxylic acid)
4. অ্যামাইন (amines)

1. অ্যালকোহল (Alcohol) ঃ পোলার বা হাইড্রোক্সি (OH) গ্রুপযুক্ত যৌগিক পদার্থকে **অ্যালকোহল** বলা হয়। শর্করা, কিছুসংখ্যক লিপিড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড এর উদাহরণ। হাইড্রোক্সি গ্রুপ ছাড়া এসব পদার্থের বাকী অংশ ননপোলার (nonpolar) বা অ্যালকাইল (alkyl) হিসাবে পরিচিত। এদের তাই **হাইড্রোক্সিলযুক্ত হাইড্রোকারবোন** (hydroxylatal hydrocarbon) বা **জলের অ্যালকাইললব্ধ** পদার্থ (alkyl derivatives of water) বলা হয়। অ্যালকোহল জলে কতটুকু দ্রবীভূত হবে তা নির্ভর করে তার মধ্যে নিহিত কার্বন পরমাণুর সংখ্যার উপর। 3টি পর্যন্ত কার্বন পরমাণুযুক্ত অ্যালকোহল জলে সহজে দ্রবীভূত হলেও কার্বন পরমাণুর সংখ্যার বৃদ্ধি সংগে সংগে অর্থাৎ এদের

নমপোলার অংশের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির সংগে জলে দ্রবীভূত হবার ক্ষমতাও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। অ্যালকোহলের যে কার্বন পরমাণুতে −OH গ্রুপ থাকে তার সংগে একটিমাত্র অ্যালকোহল গ্রুপ যুক্ত হলে তাকে **প্রাইমারী অ্যালকোহল** (primary alcohol), দুটো অ্যালকোহল গ্রুপ যুক্ত হলে **সেকেণ্ডারী অ্যালকোহল** (secondary alcohol) এবং তিনটি অ্যালকাইল গ্রুপ যুক্ত হলে **টারশিয়ারী অ্যালকোহল** (tertiary alcohol) বলা হয়।

প্রাইমারী অ্যালকোহল ঃ প্রাইমারী বিউটাইল অ্যালকোহল।

$$CH_3\ CH_2\ CH_2\ CH_2-OH$$

সেকেণ্ডারী অ্যালকোহল ঃ সেকেণ্ডারী বিউটাইল অ্যালকোহল।

$$CH_3\ CH_2-\overset{\displaystyle H}{\overset{|}{\underset{\underset{\displaystyle CH_3}{|}}{C}}}-OH$$

টারশিয়ারী অ্যালকোহল ঃ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল

$$CH_3-\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{\underset{\displaystyle CH_3}{|}}{C}}}-OH$$
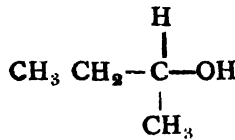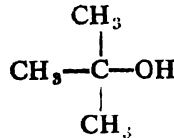
মনোহাইড্রিক (একটিমাত্র −OH যুক্ত) বা পলিহাইড্রিক (একাধিক −OH যুক্ত) এই উভয় প্রকার অ্যালকোহলই শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শর্করা পলিহাইড্রিক অ্যালকোহললব্ধ পদার্থ। **স্টেরোল** বা **ইনোসিটোল** পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল বিশেষ। পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল অধিকমাত্রায় জলে দ্রবণীয়। দেখা গেছে 6টি বা তারও বেশী কার্বন পরমাণু সম্পন্ন অ্যালকোহল (যেমন, শর্করা) অত্যধিক জলে দ্রবণীয়।

দেহে অ্যালকোহলের নিম্নলিখিত সদৃশ বিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় ঃ

(a) **জারণ** (Oxidation) ঃ শুধুমাত্র প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী অ্যালকোহলই তীব্র জারণধর্মী পদার্থের দ্বারা যথাক্রমে অ্যালডেহাইড ও কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড বা কিটোনে জারিত হয়।

প্রাইমারী ঃ $R-CH_2OH \xrightarrow{O} RCHO + RCOOH$

সেকেণ্ডারী ঃ $\begin{matrix} R_1 \\ R_2 \end{matrix}\!\!>\!CHOH \xrightarrow{O} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \end{matrix}\!\!>\!C=0$
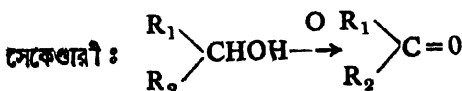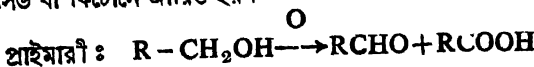
(b) **এস্টার উৎপাদন** (Esterification) : প্রাইমারী সেকেণ্ডারী বা টারশিয়ারী অ্যালকোহল এবং একটি অ্যাসিড থেকে জল বিমুক্ত হলে এস্টার উৎপন্ন হয়। অ্যাসিড কোন জৈব অ্যাসিড হতে পারে।

$$R-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-OH+HO-R_1\longrightarrow R-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-O-R$$
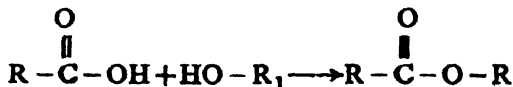
(c) **ইথার উৎপাদন** (Ether formation) : ইথার হল প্রাইমারী। লব্ধ পদার্থ যেখানে $-OH$ গ্রুপের হাইড্রোজেন অ্যালকাইল গ্রুপের $(R-O-R_1)$ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, অবশ্য জীবন্ত কলাকোষে ইথার-সংযোগ সাধারণত দেখা যায় না।

2. **অ্যালডেহাইড ও কিটোন** (Aldehydes and Ketones) : অ্যালডেহাইড ও কিটোনে তীব্র বিজারকধর্মী কার্বনিল গ্রুপ $>C=O$ রয়েছে। অ্যালডেহাইডে কার্বনিল গ্রুপের কার্বন পরমাণুর সংগে 1টি অ্যালকাইল গ্রুপ এবং কিটোনে 2টি অ্যালকাইল গ্রুপ যুক্ত থাকে।

$$R-\overset{\overset{\displaystyle H}{|}}{C}=O \qquad\qquad \begin{matrix}R\\R_1\end{matrix}\!\!>C=O$$
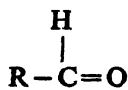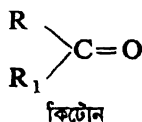
অ্যালডেহাইড　　　　　কিটোন

শর্করা পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল ছাড়াও অ্যালডেহাইড বা কিটোন হয়।

অ্যালডেহাইড ও কিটোনের কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া নিম্নরূপ :

(a) **জারণ** (Oxidation) : অ্যালডেহাইডের জারণ থেকে কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় :

$$R-\overset{\overset{\displaystyle H}{|}}{C}=O\xrightarrow{O}R-COOH$$
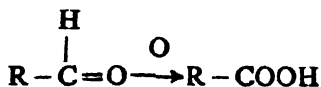
কিটোন সহজে জারিত হয় না, কারণ $C-C$ বণ্ড না ভাঙ্গলে তারা হাইড্রোজেন হারায় না।

(b) **বিজারণ** (Reduction) : অ্যালডেহাইড বিজারিত হলে অনুরূপ প্রাইমারী অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়, কিন্তু কিটোন বিজারিত হলে অনুরূপ সেকেণ্ডারী অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।

অ্যালডেহাইড : $R-\overset{\overset{\displaystyle H}{|}}{C}=O\xrightarrow{2H}R-CH_2-OH.$

কিটোন ঃ $R(R_1)C=O \xrightarrow{2H} R(R_1)CH-OH.$
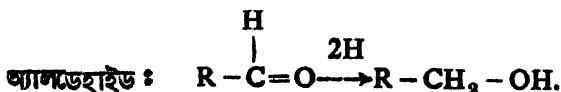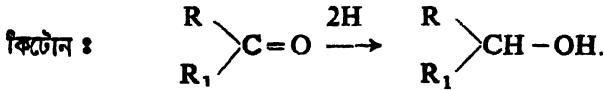
(c) **হেমিঅ্যাসিটাল ও অ্যাসিটাল উৎপাদন** (Hemiacetal and Acetal Formation) **ঃ** অম্ল মাধ্যমে অ্যালডেহাইড অ্যালকোহলের এক অথবা 2টি হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সংগে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে **হেমিঅ্যাসিটাল ও অ্যাসিটাল** উৎপাদন করে।

$$R-CH=O + R_1OH \longrightarrow R-CH(OH)-O-R_1$$

হেমিঅ্যাসিটাল

$$R-CH=O + 2R_1OH \longrightarrow R-CH(OR_1)-OR_1 + H_2O$$
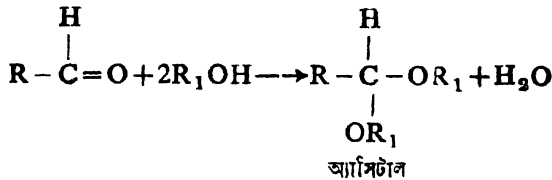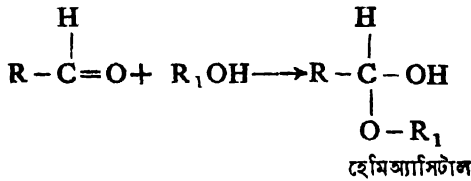
অ্যাসিটাল

একই অণুর কার্বনিল ও অ্যালকোহল এভাবে বিক্রিয়া করে অন্তর্বর্তী হেমি-অ্যাসিটাল হিসাবে থাকতে পারে। উদাহরণ, অ্যালডোজ শর্করা।

(d) **হেমিকেটাল ও কেটাল উৎপাদন** (Hemiketal and ketal Formation) **ঃ** অম্ল মাধ্যমে কিটোন অ্যালকোহলের একটি বা 2টি **হাইড্রোক্সিল** গ্রুপের সংগে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে **হেমিকেটাল** বা **কেটাল** উৎপন্ন করে।

$$R(R_1)C=O + R_2OH \longrightarrow R(R_1)C(OR_2)(OH)$$

হেমিকেটাল

$$R(R_1)C=O + 2R_2OH \longrightarrow R(R_1)C(OR_2)(OR_2) + H_2O$$

কেটাল
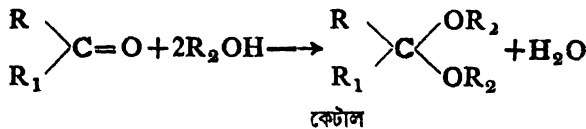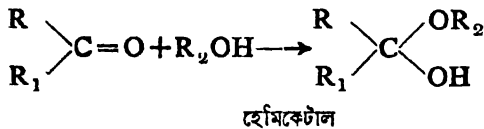
(e) **থায়োহেমিঅ্যাসিটাল ও থায়োঅ্যাসিটাল উৎপাদন** (Thiohemiacetal

and thioacetal Formation) ঃ থায়োঅ্যালকোহলের সংগে বিক্রিয়া করে অ্যালডেহাইড থায়োহেমিঅ্যাসিটাল ও থায়োঅ্যাসিটাল উৎপাদন করতে পারে।

$$R-\overset{\overset{H}{|}}{C}=O+R_1-SH \longrightarrow R-\overset{\overset{H}{|}}{\underset{\underset{S-R_1}{|}}{C}}-OH$$
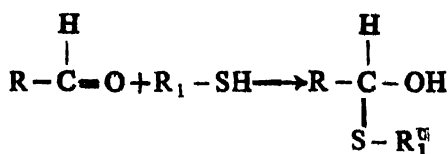
থায়োহেমিঅ্যাসিটাল

(f) অ্যালডোল সংযুক্তিভবন (Aldol condensation) ঃ ক্ষারীয় দ্রবণে অ্যালডেহাইড এবং কিছুটা কিটোন তাদের কার্বনিল গ্রুপ ও ∝-কার্বন পরমাণুতে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অ্যালডোল বা β-হাইড্রোক্সি অ্যালডেহাইড বা কিটোন উৎপাদন করে।

$$CH_3-\overset{\overset{H}{|}}{C}=O + CH_3-\overset{\overset{H}{|}}{C}=O \xrightarrow{OH^-} CH_3-\overset{\overset{H}{|}}{\underset{\underset{OH}{|}}{C}}-CH_2-\overset{\overset{H}{|}}{C}=O$$
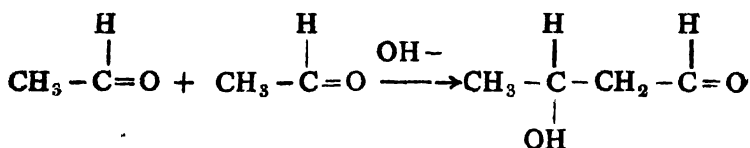
এভাবে উৎপন্ন β-হাইড্রোক্সি অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

3. কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড (Carboxylic Acid) ঃ কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের একই কার্বন পরমাণুতে একটি কার্বনিল গ্রুপ (>C=O) এবং একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ (–OH) থাকে। মৃদু অ্যাসিড হিসাবে এটি কাজ করে এবং অংশত বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ও কার্বোক্সিলেট অ্যানায়ন ($R-COO^-$) উৎপাদন করে।

কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া নিম্নরূপ ঃ

(a) বিজারণ (Reduction) ঃ সম্পূর্ণ বিজারণ থেকে অনুরূপ প্রাইমারী অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।

$$R-COOH \xrightarrow{4H} R-CH_2OH+H_2O$$
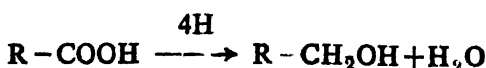
(b) অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড উৎপাদন (Acid Anhydride

Formation) : দুটো কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের কার্বোক্সিলিক গ্রুপের বিক্রিয়া থেকে এক অণু জল বেরিয়ে গেলে **অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড** উৎপন্ন হয়।

$$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH+HO-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-R_1 \longrightarrow R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-R_1+H_2O$$
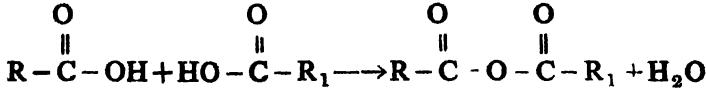
বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী দুটো অ্যাসিডই এক ধরণের হলে **সদৃশ অ্যানহাইড্রাইড** (symmetrical anhydride) উৎপন্ন হয়। অ্যাসিড দুটো পৃথক হলে **মিশ্র অ্যানহাইড্রাইড** (mixed anhydride) উৎপন্ন হয়।

c) **অ্যামাইড উৎপাদন** (Amide Formation) **:** কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়া বা একটি অ্যামাইনের মধ্য থেকে এক অণু জলকে বিযুক্ত করলে **অ্যামাইড** উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{অ্যাসিটিক অ্যাসিড}}{CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH}+H_2N \longrightarrow \underset{\text{অ্যাসিট্যামাইড}}{CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-NH_2}+H_2O$$
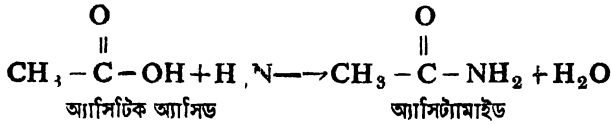
অ্যামাইডের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল **পেপটাইড** (peptide) যা একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইনো গ্রুপের সংগে আরেকটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপের বিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়।

$$R-\overset{COOH}{\overset{|}{\underset{H}{\underset{|}{C}}}}-NH_2+HOOC-\overset{H}{\overset{|}{\underset{NH_2}{\underset{|}{C}}}}-R_1 \rightarrow R-\overset{COOH}{\overset{|}{\underset{H}{\underset{|}{C}}}}-\underset{H}{\underset{|}{N}}-\overset{O}{\overset{\|}{\underset{NH_2}{\underset{|}{C}}}}-R_1+H_2O$$

পেপটাইড বন্ড
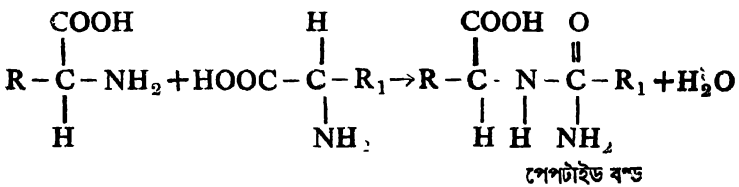
4. **অ্যামাইন** (Amines) **:** অ্যামাইন হল অ্যামোনিয়ার অ্যালকাইল লব্ধ পদার্থ। স্বভাবত এরা গ্যাসীয় বা উদ্বায়ী তরল পদার্থ যাদের গন্ধ অ্যামোনিয়ার মত, তবে অনেকটা মাছের গন্ধযুক্ত। অ্যামোনিয়ার এক, দুই ও তিন নম্বর হাইড্রোজেনের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী ও টারশিয়ারী অ্যামাইন উৎপন্ন হয়। অ্যামাইনের আচরণ অ্যামোনিয়ার মত।

কার্বোহাইড্রেট

Carbohydrate

1 **কার্বোহাইড্রেটের সংজ্ঞা ঃ** কার্বোহাইড্রেট সাধারণত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগবিশেষ। সব ক্ষেত্রে সমান না হলেও সাধারণভাবে কার্বোহাইড্রেটে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত জলে তাদের অনুপাতের সমান, অর্থাৎ 2 ঃ 1। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কার্বোহাইড্রেটের সাধারণ সংকেত $C_n(H_2O)$। অবশ্য এই সংজ্ঞার যথেষ্ট ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। যেমন, র‍্যাম্নোজ (rhamnose)। এই পদার্থটি ($C_6H_{12}O_5$) একটি কার্বোহাইড্রেট হলেও তার হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত উপরের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। তেমনি অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH), ল্যাক্‌টিকঅ্যাসিড (CH_3 CHOH COOH), ফরম্যাল্‌ডেহাইড (HCHO) ইত্যাদি পদার্থের হাইড্রোজেনের অনুপাত উপরের সংজ্ঞার আওতায় এলেও তারা কার্বোহাইড্রেট নয়। কার্বোহাইড্রেটকে তাই **বহু হাইড্রোক্সিলযুক্ত অ্যাল্‌ডেহাইড** (CHO) **বা কিটোন** (CO) বলা হয়।

2. **কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিন্যাস** (Classification of carbohydrates) ঃ একক শর্করা বা সরল শর্করার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। কার্বোহাইড্রেট 4 প্রকার। যথা ঃ (a) একক শর্করা (monosaccharide), (b) দ্বিশর্করা (disaccharide), (c) স্বল্প শর্করা (oligosaccharide) এবং (d) যৌগ শর্করা (polysaccharide)।

2(a). **একক শর্করা** (Monosaccharide, গ্রীক—monos=এক, sakharon=শর্করা) ঃ একটিমাত্র অণু নিয়ে যে সব সরল শর্করা গঠিত তাদের একক শর্করা বলা হয়। **গ্লুকোজ** (glucose), **ফ্রাক্‌টোজ** (fructose), **গ্যালাক্‌টোজ** (galactose) ইত্যাদি এ জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের উদাহরণ। একক শর্করার মধ্যে এক বা একাধিক কার্বন থাকে। গ্লুকোজ, ফ্রাক্‌টোজ ও গ্যালাক্‌টোজের মধ্যে 6টি করে কার্বন থাকে, তাদের তাই **হেক্‌সোজ** (hexose) বা 6টি কার্বনযুক্ত একক শর্করা বলা হয়। হেক্‌সোজে অ্যাল্‌ডেহাইড (CHO) বা কিটোন (CO) গ্রুপের উপস্থিতির জন্য তাদের অ্যাল্‌ডো-হেক্‌সোজ (aldohexose) এবং কিটো-হেক্‌সোজ (ketohexose) নামে অভিহিত করা হয়। ফ্রাক্‌টোজ একটি কিটো-হেক্‌সোজ। গ্লুকোজ ও গ্যালাক্‌টোজ দুটো অ্যাল্‌ডো-হেক্‌সোজ (2নং তালিকা)।

2নং তালিকা : শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেকসোজ শর্করা।

শর্করা	উৎস	গুরুত্ব ও বিক্রিয়া
ডি-গ্লুকোজ (D-glucose)	দ্রাক্ষা, কমলা লেবু, আম প্রভৃতি ফলের রস, ম্যালটোজ, ল্যাক্‌টোজ, সুক্রোজ ও শ্বেতসার প্রভৃতির আর্দ্রবিশ্লেষণ	রক্ত-শর্করা হিসাবে পরিচিত। বেনেডিক্‌ট, ফেলিংস ও বারু-ফোয়েডের বিকারককে ইহা বিজারিত করে এবং HNO_3 এর সংগে দ্রবণীয় শর্করাঅম্ল উৎপন্ন করে।
ডি-ফ্রাক্‌টোজ (D-fructose)	আপেল ইত্যাদি ফলের রস, মধু এবং সুক্রোজ ইত্যাদির আর্দ্র-বিশ্লেষণ	অন্ত্র ও যকৃতে ইহা গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। উপরিউক্ত বিকারকগুলোকে বিজারিত করে। সেলিওয়ানোফের বিকার-কের সংগে উত্তপ্ত করলে লাল-বর্ণ উৎপন্ন করে।
ডি-গ্যালাক্‌টোজ (D-galactose)	ল্যাক্‌টোজের আর্দ্রবিশ্লেষণ	যকৃতে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। মাতৃস্তনে সংশ্লেষিত হয় এবং দুগ্ধ শর্করা গঠন করে। ডি-গ্লুকোজে বর্ণিত বিকারককে বিজারিত করে এবং HNO_3 এর সংগে অদ্রবণীয় মিউসিক (music) অ্যাসিড উৎপন্ন করে।
ডি-ম্যানোজ (D-Mannose)	উদ্ভিদজাত গাম (gum) ও ম্যানোস্যানের (manosans) আর্দ্রবিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায়।	অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিনের সংগে গ্লাইকোপ্রোটিন হিসাবে থাকে। গ্লুকোজের মতই বিকারককে বিজারিত করে।

2(b). দ্বিশর্করা (Disaccharide) : শুধুমাত্র দু'টো একক শর্করার অণুর সমন্বয়ে দ্বিশর্করা গঠিত হয়। দুগ্ধ শর্করা বা ল্যাক্‌টোজ (lactose), শুঁড়িশর্করা বা ম্যাল্‌টোজ (maltose) এবং ইক্ষু শর্করা বা সুক্রোজ এজাতীয় কার্বোহাইড্রেটের উদাহরণ। আদ্রবিশ্লেষণে প্রতিটি দ্বিশর্করা থেকে দুটি করে একক শর্করা উৎপন্ন হয় (3নং তালিকা)। দ্বিশর্করার সাধারণ সংকেত $C_n(H_2O)_{n-1}$।

3নং তালিকা : দ্বিশর্করা।

শর্করা	উৎস	আদ্র বিশ্লেষণ
ল্যাক্‌টোজ	দুধ এবং গর্ভাবস্থায় মূত্রে পাওয়া যেতে পারে। মাতৃস্তনে গ্লুকোজ থেকে উৎপন্ন হয়।	গ্লুকোজ + গ্যালাক্‌টোজ
ম্যাল্‌টোজ	শুঁড়ি বা মদ, শ্বেতসারের আদ্র বিশ্লেষণ	গ্লুকোজ + গ্লুকোজ
সুক্রোজ	ইক্ষু, মিষ্টি আলু বিট আনারস ইত্যাদি।	গ্লুকোজ + ফ্রাক্‌টোজ

2(c). স্বল্প শর্করা (Oligosaccharide, গ্রীক, oligos—কতিপয়) : দুই থেকে দশটি একক শর্করার সমন্বয়ে স্বল্প শর্করা গঠিত হয়।

যেমন : দ্বিশর্করা, ত্রিশর্করা, চতুঃশর্করা, পঞ্চশর্করা ইত্যাদি। ত্রিশর্করার উদাহরণ, র‍্যাফিনোজ (raffinose)। র‍্যাফিনোজের আদ্র বিশ্লেষণে ফ্রাকটোজ, গ্লুকোজ ও গ্যালাক্‌টোজ পাওয়া যায়। বিট, তুলো বীজ ও ছত্রাকে ইহা পাওয়া যায়। জেন্‌টিয়ানোজ (gentianose) এ রকম আর একটি ত্রিশর্করা, যার আদ্র বিশ্লেষণে ফ্রাক্‌টোজ, গ্লুকোজ এবং গ্লুকোজ পাওয়া যায়। চতুঃশর্করা ও পঞ্চশর্করার উদাহরণ যথাক্রমে স্করোডোজ (scorodose, পেঁয়াজ ও রসুন) এবং ভারবাস্কোজ (Verbascose)।

2(c). যৌগ শর্করা (Polysaccharide, গ্রীক, polus = বহু) : দশের অধিক একক শর্করার সমন্বয়ে যৌগ শর্করা গঠিত হয়। যৌগ শর্করার সাধারণ সংকেত ($C_6H_{10}O_5$)। শ্বেতসার বা স্টার্চ (starch), গ্লাইকোজেন (glycogen), ডেক্সট্রিন (dextrin) ইত্যাদি, এজাতীয় শর্করা। একক শর্করা 1-4 এবং 1-6 যোজকের (linkage) দ্বারা যুক্ত হয়ে যৌগ শর্করা গঠন করে।

যে সব যৌগ শর্করার আর্দ্রবিশ্লেষণে শুধুমাত্র গ্লুকোজ অণু পাওয়া যায় তাদের গ্লুকোসান (glucosan) বলা হয়। উপরিউক্ত তিনটি যৌগশর্করাই

4নং তালিকা : যৌগ শর্করা।

নাম	উৎস	আয়োডিনের সংগে বিক্রিয়া (আর্দ্রবিশ্লেষণ)
শ্বেতসার (starch)	ভাত, আলু, রুটি, ইত্যাদি।	গাঢ় নীলবর্ণ (গ্লুকোজ)
(a) অ্যামাইলোজ (amylose) 15—20%	শ্বেতসারের অংশবিশেষ। শাখাবহুল গঠন নয়।	নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ (গ্লুকোজ)
(b) অ্যামাইলো-পেক্টিন (amylopectin) 80—85%	শ্বেতসারের অংশবিশেষ, শাখাবহুল। উভয়েই 24-30টি গ্লুকোজ অণু নিয়ে গঠিত।	লোহিতবেগনি (গ্লুকোজ)
গ্লাইকোজেন (glycogen)	প্রধানত যকৃত ও পেশী। শাখাবহুল গঠন।	লোহিতবাদামী বর্ণ (গ্লুকোজ)
ডেক্সট্রিন (dextrin)	মধু এবং শ্বেতসারের আর্দ্রবিশ্লেষণ।	লোহিতবাদামী বর্ণ (গ্লুকোজ)
(a) ইরীথ্রোডেক্সট্রিন (erythrodextrin)	শ্বেতসারের আর্দ্রবিশ্লেষণের প্রথমাবস্থায় উৎপন্ন হয়।	লোহিত বর্ণ (গ্লুকোজ)
(b) অ্যাক্রোডেক্সট্রিন (achrodextrin)	ইরীথ্রোডেক্সট্রিনের পরে উৎপন্ন হয়।	বর্ণ উৎপন্ন হয় না (গ্লুকোজ)
ইনুলিন (inulin)	স্ফীতকন্দ (tuber), ডালিয়া (dalhia), হাতিচোক (artichoke) প্রভৃতির মূলে এবং পেঁয়াজরসুনে পাওয়া যায়।	বর্ণ উৎপন্ন হয় না (ফ্রাক্টোজ)

গ্লুকোসান। শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যৌগ শর্করার বৈশিষ্ট্য 4নং তালিকায় বর্ণিত হয়েছে।

বিজারণ ও অবিজারণধর্মী শর্করা
Reducing and Non-reducing Sugars

বিজারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে শর্করাকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়।

1 **বিজারণধর্মী শর্করা** (Reducing Sugars): যেসব শর্করার অ্যালডেহাইড (–CHO) ও কিটোন গ্রুপ (–CO) মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং ক্ষারীয় দ্রবণে যারা এনেডায়োলে (enediols) রূপান্তরিত হয়ে শক্তিশালী **বিজারক পদার্থ** (reducing agent) হিসাবে কাজ করে তাদের **বিজারণধর্মী শর্করা** বলা হয়। এনেডায়োল (ডাবল বণ্ডে দুটো OH গ্রুপ) অবস্থায় এরা Cu^{++}, Ag^{+}, Hg^{++}, Bi^{++}, $Fe\ (CN)_6^{---}$ প্রভৃতি জারকধর্মী আয়নকে বিজারিত করে এবং নিজেরা জারিত হয়ে সুগার অ্যাসিড বা শর্করা অম্ল তৈরী করে।
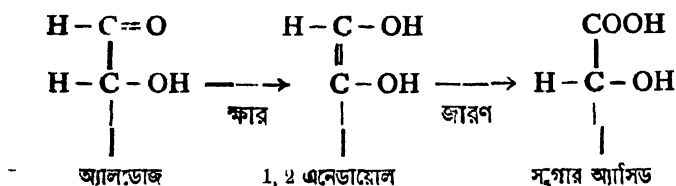
গ্লুকোজ, ফ্রাকটোজ, গ্যালাকটোজ প্রভৃতি একক শর্করা, ল্যাকটোজ ও ম্যাল্টোজ এই দুটো দ্বিশর্করা ও ডেক্সট্রিন নামক যৌগ শর্করা বিজারণধর্মী শর্করার উদাহরণ। বিজারণধর্মী শর্করা বেনেডিকট ও ফেলিংগের বিকারককে বিজারিত করে এবং সবুজ, হলদে বা লাল অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে।

2. **অবিজারণধর্মী শর্করা** (Non-reducing sugars): যেসব শর্করার মধ্যে অ্যালডেহাইড (—CHO) কিটোন গ্রুপ (—CO) মুক্ত অবস্থায় থাকে না তাদের **অবিজারণধর্মী শর্করা** বলা হয়। এসব শর্করার সাহায্যে বেনেডিকট, ফেলিংগ বা এ জাতীয় পরীক্ষা সম্পাদন করলে কোন রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। দ্বিশর্করা সুক্রোজ এজাতীয় শর্করার একটি উদাহরণ। সুক্রোজের অ্যালডেহাইড ও কিটোন গ্রুপ 1,2 রাসায়নিক বণ্ডে আবদ্ধ থাকে তাই বিজারণক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য আর্দ্রবিশ্লেষণে এই বণ্ড বিচ্ছিন্ন হলে সুক্রোজ বিজারণধর্মী শর্করার মতই সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। প্রায় সব যৌগ শর্করাই অবিজারণধর্মী শর্করা।

ডি ও এল আকৃতির শর্করা

D and L Forms of Sugars

তিনটি কার্বন পরমাণু সম্পন্ন শর্করা গ্লিসারোজের (glycerose) কাঠামোতে H ও OH গ্রুপ দুটি দুভাবে বিন্যস্ত হয়ে থাকতে পারে, ফলে গ্লিসারোজের দুটি গঠনকাঠামো পাওয়া যায় যারা পরস্পর দর্পন প্রতিকৃতি (mirror image) গঠন করে। অ্যালকোহলযুক্ত প্রান্তীয় কার্বনপরমাণুর সন্নিহিত কার্বনপরমাণুতে (গ্লুকোজে 5 নং কার্বন পরমাণু) OH গ্রুপ ডান পাশে থাকলে তাকে **ডি-আকৃতি** (D-form) এবং বাঁ-পাশে থাকলে তাকে **এল-আকৃতির** (L-form) বলা হয়।
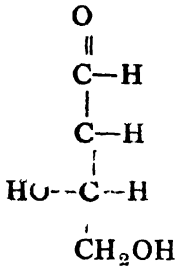
এল-গ্লিসারোজ (L-গ্লিসার্যালডেহাইড)   ডি গ্লিসারোজ (D-গ্লিসার্যালডেহাইড)
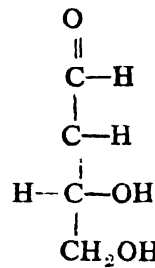
যেসব শর্করার গঠন ডি-গ্লিসারোজের মত তাদের **ডি শর্করা** (D-sugars) বা ডি-আকৃতির শর্করা বলা হয়। তেমনি শর্করার গঠনকাঠামো এল-গ্লিসারোজের মত হলে তাদের **এল শর্করা** (L-sugars) বা এল-আকৃতির শর্করা বলা হয়। গ্লুকোজের ডি ও এল-আকৃতি নিম্নে প্রদত্ত হল :
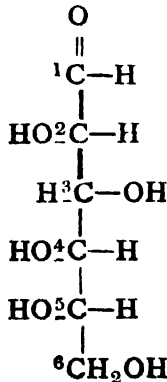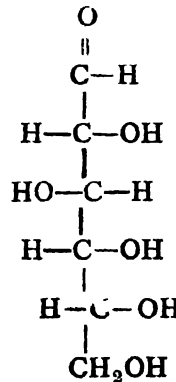
এল-গ্লুকোজ   ডি-গ্লুকোজ

শর্করার এজাতীয় শ্রেণীবিভাগের সংগে আলোক-ঘূর্ণনের (optical rotation) কোন সম্পর্ক নেই।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিপাকের সংগে সম্পর্কযুক্ত প্রায় সব একক শর্করা বা মনোস্যাকারাইডই ডি-আকৃতিবিশিষ্ট। ফ্রাকটোজ ও গ্লুকোজ ডি-শ্রেণীর শর্করা; তাদের এল-শ্রেণী সাধারণত প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। প্রাণীদেহের এনজাইম শুধুমাত্র যে কোন একটি শ্রেণীর (ডি বা এল) শর্করার উপর ক্রিয়া করতে পারে। যেমন, ডি-আকৃতির শর্করাকে প্রাণী ও জীবাণু বিপাক করতে পারে, কিন্তু এল আকৃতির শর্করাকে পারে না।

ডিঅক্সি সুগার

Deoxy sugars
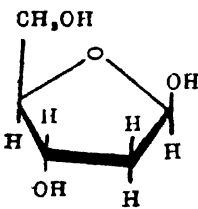
ডিঅক্সি সুগার বা ডিঅক্সি শর্করা বলতে সেসব শর্করাকে বোঝায় যাদের বলয় গঠনের সংগে যুক্ত কোন একটি হাইড্রোক্সিল গ্রুপকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপন করে থাকে। জৈবিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন পদার্থের হাইড্রোলাইসিস বা আদ্রবিশ্লেষণে এদের পাওয়া যায়। নিউক্লিক অ্যাসিডে (DNA) ডিঅক্সিরাইবোজ deoxyribose) এজাতীয় শর্করার একটি উদাহরণ।

5-5 নং চিত্র : ডিঅক্সিরাইবোজ বা 2-ডি অক্সি-D-রাইবোফিউরানোজ।

অ্যামাইনো সুগার

Amino Sugar

যে সব শর্করায় একটি অ্যামাইনোগ্রুপ থাকে তাদের অ্যামাইনো সুগার বা অ্যামাইনো শর্করা বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে, ডি-গ্লুকোসামিন, ডি-গ্যালাকটোসামিন এবং ডি-ম্যানোসামিনের নাম করা যেতে পারে। এদের প্রত্যেককেই প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। গ্লুকোসামিন হায়ালুরোনিক অ্যাসিডের একটি উপাদান। কনড্রোইটিন সালফেটের উপাদান গ্যালাকটোসামিন এবং মিউকোপ্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ম্যানোসামাইন (mannosamine)।
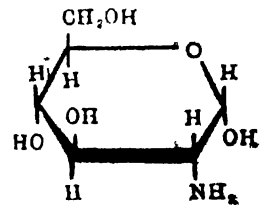
5-6 নং চিত্র : গ্লুকোসামিন বা 2-অ্যামাইনো-D-গ্লুকোপাইরানোজ।

ইরীথ্রোমাইসিন (erythromycin), কার্বোমাইসিন (carbomycin)

প্রভৃতি বহু অ্যাণ্টিবায়োটিক্সে অ্যামাইনো সুগার থাকে। ইরীথ্রোমাইসিনে ডাই-মিথাইল অ্যামাইনো সুগার থাকে। কার্বোমাইসিনে পাওয়া যায় 3-অ্যামাইনো সুগার, 3-অ্যামাইনো-ডি-রাইবোজ। অ্যাণ্টিবায়োটিক্স ওষুধের সক্রিয়তা এই অ্যামাইনো সুগারে নিহিত থাকে বলে ধারনা করা হয়।

মিউকোপলিস্যাকারাইড

Mucopolysaccharide

মিউকোপলিস্যাকারাইড শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক ধরনের যৌগ-পদার্থ। এরা প্রোটিনের সংগে যুক্ত হয়ে মিউকোপ্রোটিন (mucoprotein) গঠন করে। মিউকোপলিস্যাকারাইড প্রধানত হেক্সোজ, পেন্টোজ, অ্যামাইনো-সুগার এবং ইউরোনিক অ্যাসিডের (uronic acid) সমন্বয়ে গঠিত।

শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিউকোপলিস্যাকারাইড হল: (a) হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, (b) হেপারিন, (c) কনড্রোইটিন সালফেট এবং (d) ব্লাড-গ্রুপ পলিস্যাকারাইড।

1. **হায়ালুরোনিক অ্যাসিড** (Hyaluronic acid): একে প্রধানত কাচীয় নেত্ররস (vitreous humor), দেহচর্ম, নাভীরজ্জু (umbilical cord), সন্ধিরস (synovial fluid) এবং কোন কোন ব্যাক্‌টেরিয়াতে পাওয়া যায়। ইহা একাধারে যেমন দেহের সংযোজক কলা এবং দেহকলার জেলিসদৃশ বনিয়াদ পদার্থের (ground substance) উপাদান হিসাবে অবস্থান করে অপর দিকে তেমনি সন্ধিতে joints পিচ্ছিলকারক এবং আঘাতরোধক (shock-absorbent) হিসাবে কাজ করে।

হায়ালুরোনিক অ্যাসিডের আদ্রবিশ্লেষণে সমঅণু ডি-গ্লুকোজ, ডি-গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। এর আণবিক ওজন প্রায় 3-4 মিলিয়ন।

2. **হেপারিন** (Heparin): তঞ্চনরোধক পদার্থ (anticoagulant) হিসাবে হেপারিনকে যকৃৎ, ফুসফুস, থাইমাস, প্লীহা এবং রক্তে পাওয়া যায়। আদ্রবিশ্লেষণে হেপারিন থেকে গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড, গ্লুকোস্যামিন (glucosa-mine), অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। হেপারিনের আণবিক ওজন 17000 থেকে 20,000।

3. **কনড্রোইটিন সালফেট** (Chondroitin sulfates): এই পদার্থকে অস্থি, তরুণাস্থি, কণ্ডরা, চর্ম, কর্ণিয়া এবং হৃৎপিণ্ডের কপাটিকায় পাওয়া যায়।

পদার্থটি N-অ্যাসিটাইল-2-অ্যামাইনো-2-ডিঅক্সি-ডি-গ্যালাক্টোজ, ডি-গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত।

4. **ব্লাড-গ্রুপ পলিস্যাকারাইড** (Blood group polysaccharide) : এই পদার্থকে লোহিতকণিকা, লালা, মিউসিন (পাকস্থলী), পুঁজ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। এই পদার্থ যখন প্রোটিনের সংগে যুক্ত হয়, তখন রক্তকণিকার A, B, O, Rh এবং অন্যান্য অ্যান্টিজেন গঠন করে এবং এভাবে রক্তকে বিভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক করে। রক্তস্থিত ব্লাড-গ্রুপ পলিস্যাকারাইড প্রধানত ডি-গ্লুকোসামিন এবং সরল শর্করার সমন্বয়ে গঠিত।

আলোক ঘূর্ণন ও পোলারিমিটার
Optical Rotation and Polarimeter.

বায়োট (Biot) 1815 সালে লক্ষ্য করেন কিছু পদার্থ যেমন, তার্পিন তেল (turpentine), টারটারিক অ্যাসিড ও শর্করার দ্রবণ, সমবর্তিত আলোর আবর্তন ঘটায় যখন এই আলো তাদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। পদার্থের দ্বারা সমবর্তিত আলোর বাম বা দক্ষিণ মুখী এজাতীয় আবর্তনকে **আলোক ঘূর্ণন** (optical rotation) বলা হয়। যেসব পদার্থ এই সক্রিয়তা প্রদর্শন করে তাদের **আলোক-সক্রিয় পদার্থ** (optically active substances) নামে অভিহিত করা হয়। এখন জানা গেছে বহু পদার্থ এই ধর্মের অধিকারী। কার্বোহাইড্রেট, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ জৈব পদার্থ আলোক সক্রিয়তা প্রদর্শন করে এবং সমবর্তিত আলো তাদের দ্রবণের মধ্য দিয়ে প্রেরিত হলে তারা সেই আলোকে ডান বা বাঁদিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার দিকে বা তার বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

1. **সমবর্তিত আলো** (Polarized Light) : তরংগ মতবাদ অনুসারে আলো তড়িৎ-চুম্বকীয় উত্তেজনা হিসাবে গতির অভিমুখে তরংগের আকারে সঞ্চালিত হয়। একক তলে আন্দোলিত এই আলোর উপাংশকে (component) প্রতিফলন বা প্রতিসরণের মাধ্যমে পৃথক করা সম্ভব হয়। একই তলে পৃথকীকৃত আলোর **উপাংশকে সমতল সমবর্তিত আলো** (Plane-polarized light) বলা হয়।

স্বচ্ছ ক্যালসাইট ($CaCO_3$) বা আইসল্যাণ্ড স্পারের কেলাসের মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মি পাঠালে তা দুটো অংশে বিভক্ত হয় :

(a) সাধারণ রশ্মি (ordinary ray) যা প্রতিসরণের সূত্র মেনে চলে এবং

(b) অতিসাধারণ রশ্মি (extraordinary ray) যা স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিসরিত হয় না।

প্রতিটি রশ্মিগুচ্ছের আলোই সমতল সমবর্তিত হয় এবং উভয়ের সমবর্তনের তল পরস্পর সমকোণে অবস্থান করে।

নিকোল (Nicol) প্রিজমের ব্যবস্থাপনায় সাধারণ রশ্মি পরিত্যক্ত হয়, শুধুমাত্র অতিসাধারণ রশ্মি সঞ্চালিত হয়। নিকোল প্রিজম প্রস্তুতের সময় আইসল্যাণ্ড স্পার কেলাসকে কোন একটি তলে কাটা হয় এবং খণ্ডগুলোকে কানাডা বালসম (Canda balsam) দিয়ে এমনভাবে জোড়া দেওয়া হয় যাতে আলোক অক্ষের একটি নির্দিষ্ট কোণে অসমবর্তিত আলোকে তার মধ্য দিয়ে প্রেরণ করা হলে দুটো খণ্ডের সংযোগস্থল থেকে সাধারণ রশ্মি সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু অতিসাধারণ রশ্মি তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে (5-7নং চিত্র)।
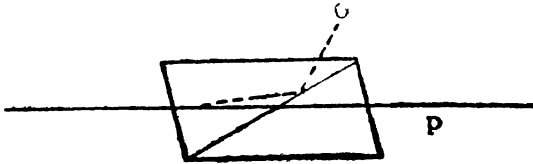
5-7 নং চিত্র : নিকোল প্রিজম। O-সাধারণ আলো, P-সমবর্তিত আলো।

সাধারণ রশ্মি ও সমতল সমবর্তিত আলোকে প্রস্থচ্ছেদে যেভাবে দেখা যায় তা 5-8 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। সাধারণ আলোক রশ্মি সব তলে আন্দোলিত হয়, অপরপক্ষে সমতল সমবর্তিত আলো একটি তলে আবর্তিত হয়।
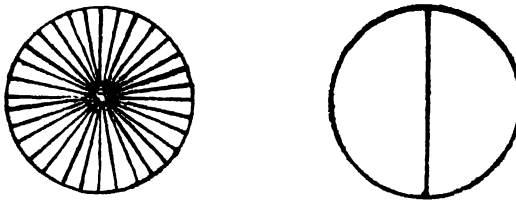
5-8 নং চিত্র : সাধারণ ও সমতল সমবর্তিত আলোর আন্দোলন। বাঁ-পাশে সাধারণ আলো, ডানপাশে সমতল সমবর্তিত আলো।

2. **পোলারিমিটার (Polarimeter) :** যে যন্ত্রের সাহায্যে সঠিকভাবে আলোক-ঘূর্ণনের পরিমাপ করা যায় তাকে **পোলারিমিটার** বা **পোলারিস্কোপ** বলা হয়। 5-9 নং চিত্রে একটি পোলারিমিটারের কার্যকারিতা প্রদর্শিত হয়েছে।

যেহেতু বিভিন্ন তরংগদৈর্ঘ্যের সমবর্তিত আলোর ঘূর্ণন বিভিন্ন হয় সেহেতু পোলারিমিটারে একবর্ণীয় আলো (monochromatic light) ব্যবহার করা হয়। প্রজ্বলিত (incandescent) সোডিয়াম বা পারদ থেকে নির্গত আলোকে
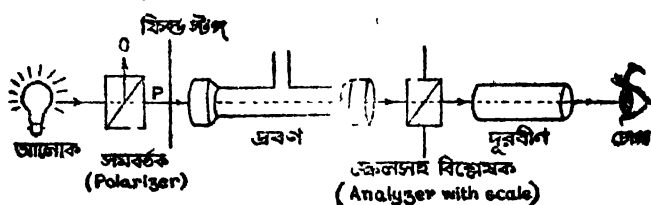
5-9 নং চিত্র : পোলারিমিটার।

সাধারণত ব্যবহার করা হয়। আলোর উৎস হিসাবে বিশেষ বৈদ্যুতিক ল্যাম্প পাওয়া যায়। তাছাড়া আলোক রশ্মিকে বিশুদ্ধ করার জন্য পোলারিমিটারের বিভিন্ন ধরণের বিশেষ বিশেষ ফিলটার থাকে। পোলারিমিটারে সবচেয়ে সন্তোষজনক ভাবে যে আলো ব্যবহার করা যায় তা হল হরিদ্রাভ-সবুজ পারদ লাইট (5461 Å)।

উপরের চিত্রে P হল নিকোল প্রিজম যা একবর্ণীয় আলোকে সমতল সমবর্তিত আলোতে রূপান্তরিত করতে পারে। এই আলো এরপর দ্রবণে রক্ষিত নল ও বিশ্লেষক নিকোল প্রিজমের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে এবং পরিশেষে লেন্স-সংস্থা বা দূরবীণে গিয়ে পৌঁছয়। দূরবীণ থেকে চোখে।

প্রান্তদেশে ভার্নিয়ার স্কেলযুক্ত একটি বৃহদাকার চাকতি বা ডিস্কের কেন্দ্রদেশে বিশ্লেষক নিকোল প্রিজমকে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে প্রিজমটিকে তার অক্ষের চারিদিকে ঘুরানো যায় এবং স্কেলের সাহায্যে ঘূর্ণন-কোণকে ডিগ্রি ও তার ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায়। বিশ্লেষক নিকোল প্রিজমকে ঘুরালে তার অক্ষ যখন P প্রিজমের অক্ষের অনুরূপ হয় তখনই শুধু সমবর্তিত আলো P থেকে বিশ্লেষক প্রিজমের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। দর্শক তখন আলোকিত ফিল্ড দেখতে পায়। বিশ্লেষক প্রিজমকে এরপর তার নিজের আলোক অক্ষে (optical axis) ঘুরিয়ে আনলে আলো P থেকে তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না, ফলে দূরবীণের মধ্য দিয়ে কোন দর্শক তাকালে অন্ধকার ফিল্ড দেখে।

3. **আলোক ঘূর্ণন** (optical rotation) : আলোক সক্রিয় পদার্থের দ্রবণকে পোলারিমিটারের নলে রেখে তার মধ্যদিয়ে সমবর্তিত আলোকে পাঠালে তা ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে (clockwise) অথবা বিপরীত দিকে আবর্তিত

হয় (5-10 নং চিত্র)। যে সব পদার্থ সমবর্তিত আলোকে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে বা ডান দিকে আবর্তন করে তাদের **দক্ষিণাবর্ত** (dextro-rotatory) এবং যারা এই আলোকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বা বাম দিকে আবর্তন করে তাদের **বামাবর্ত** (levorotatory) বলা হয়। দক্ষিণাবর্তনকে যোগচিহ্ন (+)
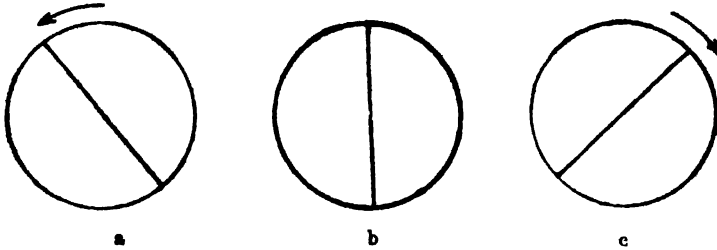
5-10 নং চিত্র ঃ আলোক ঘূর্ণন। a—বামাবর্ত। b—ঘূর্ণনের পূর্বাবস্থা। c—দক্ষিণাবর্ত।

এবং বামাবর্তনকে বিয়োগ চিহ্ন (−) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন, ডি-গ্লুকোজ দক্ষিণাবর্ত শর্করা এবং ডি-ফ্রাকটোজ বামাবর্ত শর্করা ; এদের ডি (+) গ্লুকোজ এবং ডি (−) ফ্রাকটোজ হিসাবে প্রকাশ করা যায়।

আলোক ঘূর্ণন পদার্থের **অপ্রতিসমতার** (asymmetry) জন্য সংঘটিত হয় এবং কার্বনযুক্ত যোগের ক্ষেত্রে পদার্থের অণুনিহিত কার্বনপরমাণুর অপ্রতিসমতার উপর নির্ভরশীল। কার্বন পরমাণুর 4টি যোজকের বাহুবন্ডের সংগে পৃথক চারটি পরমাণু বা গ্রুপ যুক্ত থাকলে তাকে অপ্রতিসম কার্বন বলা হয়। যেমন,
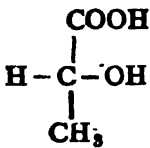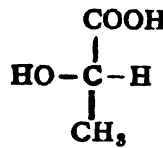
বামাবর্ত ল্যাকটিক অ্যাসিড   দক্ষিণাবর্ত ল্যাকটিক অ্যাসিড

যখন কোন পদার্থের অণুর মধ্যে দুই বা ততোধিক অপ্রতিসম কার্বন পরমাণু থাকে তখন সমবর্তিত আলোর উপর পদার্থটির প্রভাব সবকটি অপ্রতিসম কার্বন পরমাণুর প্রভাবের যোগফলের সমান হয়। আবার পদার্থের অণুটিকে সমতলের উভয় পার্শ্বে অর্ধ দর্পন-প্রতিবিম্বে (mirror-image haves) ভাগ করা সম্ভব হলে পদার্থটির উভয় অংশের আলোক ঘূর্ণন সমান ও বিপরীত হয়, ফলে পদার্থটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এ ছাড়া বামাবর্ত ও দক্ষিণাবর্ত পদার্থ

সমান সমান পরিমাণে কোন মিশ্রণে থাকলে তাও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। শেষোক্ত মিশ্রণকে র‍্যাসিমিক (racemic) বলা হয়।

জানা গেছে কোন অণুর পরমাণু ও গ্রুপের তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র (field) সমবর্তিত আলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার তলের আবর্তন ঘটায়।

4. আলোক ঘূর্ণনের নীতি (Principles of optical rotation) : আলোক ঘূর্ণনের সবরকম নিয়ম বা নীতির প্রবক্তা বায়োট। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলো সরাসরি ব্যবহারে লাগে :

(a) একটি নির্দিষ্ট তরংগদৈর্ঘ্যে কোন একটি আলোক সক্রিয় পদার্থের আলোক ঘূর্ণন সুনির্দিষ্ট।

(b) আলোক ঘূর্ণন আলোক সক্রিয় পদার্থের গাঢ়ত্বের সংগে সমানুপাতিক।

(c) আলো যে দ্রবণের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তার পুরুত্বের সংগে আলোক ঘূর্ণন সমানুপাতিক।

(d) আলোক ঘূর্ণন তাপমাত্রার সংগে পরিবর্তিত হয়। তাপমাত্রার বৃদ্ধির সংগে কোন কোন পদার্থের আলোক ঘূর্ণন বৃদ্ধি পায়, আবার কোন কোন পদার্থের আলোক ঘূর্ণন হ্রাস পায়।

(e) আলোর বিভিন্ন তরংগদৈর্ঘ্যে আলোক ঘূর্ণনও বিভিন্ন হয় এবং ক্ষুদ্রতর তরংগদৈর্ঘ্যে আলোক ঘূর্ণন অধিকতর বেশী হয়।

(f) পদার্থ যে দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় তার প্রকৃতির সংগে আলোক ঘূর্ণনেরও পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

উপরের এই নিয়মনীতিগুলোর ভিত্তিতে সবরকম পদার্থের আলোক ঘূর্ণনের মান যাতে তুলনা করা যায় তার জন্য পদার্থের আলোক ঘূর্ণনকে একটিমাত্র সংজ্ঞার আওতায় নিয়ে আসা হয়। এর নাম **সুনির্দিষ্ট ঘূর্ণন** (specific-rotation)। 1 ডেসিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি নলে প্রতি মিলিলিটারে 1 গ্রাম পদার্থের যে আলোক ঘূর্ণন (ডিগ্রিতে) পাওয়া যায় তাকে সুনির্দিষ্ট ঘূর্ণন বলা হয়। কোন একটি পদার্থের দ্রবণের ঘূর্ণন থেকে বিশুদ্ধ পদার্থটির সুনির্দিষ্ট ঘূর্ণন নিম্নলিখিত সম্পর্ক থেকে নির্ধারণ করা যায় :

$$[R]_D^T = \frac{Robs \times 100}{L \times C}$$

যেখানে $[R]_D^t$ = T তাপমাত্রা ও সোডিয়াম D-আলোয় নির্দিষ্ট ঘূর্ণন,

Robs = পর্যবেক্ষণকৃত ঘূর্ণন,

L = পোলারিমিটারের নলের ডেসিমিটারে দৈর্ঘ্য,

C = 100 মিলিলিটার দ্রবণে পদার্থের পরিমাণ (গ্রামে)।

সাধারণত 20° সেন্টিগ্রেডে পর্যবেক্ষণ করা হয়। দ্রাবকও নির্দিষ্ট থাকা উচিত।

উদাহরণ : ধরা যাক একটি আলোক সক্রিয় পদার্থ দ্রবণে প্রতি 100 মিলি-লিটারে 5 গ্রাম হিসাবে রয়েছে; এই দ্রবণের পর্যবেক্ষণকৃত ঘূর্ণন +0·8°, পোলারিমিটারের নলের দৈর্ঘ্য 2 ডেসিমিটার, তাপমাত্রা 20°C এবং ব্যবহৃত আলো সোডিয়াম D-লাইট। পদার্থটির সুনির্দিষ্ট ঘূর্ণনের পরিমাপ হবে।

$$[R]_D^{20} = \frac{+0{\cdot}8 \times 100}{2 \times 5} = \frac{+80}{10} = +8^\circ$$

5. **মিউটারোটেশন** (Mutarotation) : সদ্য প্রস্তুতীকৃত শর্করার দ্রবণকে কিছুক্ষণ ধরে ফেলে রেখে দিলে তার আলোক ঘূর্ণনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শর্করার আলোক ঘূর্ণনের এই পরিবর্তনকে **মিউটারোটেশন** (mutarotation) বলা হয়। মিউটারোটেশন বিজারণধর্মী শর্করার সাধারণ ধর্ম হিসাবে পরিগণিত, যদিও কিছুসংখ্যক কিটোন শর্করা এর ব্যতিক্রম।

অ্যালডেহাইড ও কিটোন গ্রুপসম্পন্ন একক শর্করা সাধারণত শৃংখলাকার কাঠামো হিসাবে অবস্থান করে বলে ধারণা করা হত, কিন্তু এখন জানা গেছে কেলাসিত অবস্থায় এবং এমনকি দ্রবণেও বলয়াকার হিসাবে অবস্থান করে। আরোও জানা গেছে এই বলয়াকার শর্করা কিছু পরিমাণ শৃংখলাকার শর্করার সংগে **গতীয় সাম্যাবস্থায়** (dynamic equilibrium) বা **টটোমারিক আকারে** (tautomaric form) অবস্থান করে।

টারনেটের (Tarnet) কাছ থেকে মিউটারোটেশনের সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি বিভিন্ন অবস্থায় কেলাসনের মাধ্যমে ডি-গ্লুকোজের 2টি আইসোমার তৈরী করেন। কক্ষ উষ্ণতায় লঘু অ্যালকোহল বা জলীয় দ্রবণ থেকে গ্লুকোজকে যখন কেলাসিত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার প্রারম্ভিক সুনির্দিষ্ট আলোক ঘূর্ণন +112° ডিগ্রিতে পরিবর্তিত হয়। এই আলোক-ঘূর্ণনসম্পন্ন সদ্য প্রস্তুতিকৃত গ্লুকোজের দ্রবণকে কিছুক্ষণ ফেলে রাখলে তার আলোক ঘূর্ণন +52·5° ডিগ্রিতে নেমে আসে। অপরপক্ষে 98°C তাপমাত্রার চেয়ে বেশী

তাপমাত্রায় জলীয় দ্রবণ থেকে গ্লুকোজের কেলাসন সংঘটিত হলে যে গ্লুকোজ পাওয়া যায় তার প্রারম্ভিক নির্দিষ্ট আলোক ঘূর্ণন +19° ডিগ্রী থাকে। শেষোক্ত আলোক ঘূর্ণনসম্পন্ন গ্লুকোজের দ্রবণকেও কিছুক্ষণ রেখে দিলে তার আলোক ঘূর্ণন +52·5 ডিগ্রিতে ওঠে আসে। প্রথম আইসোমারকে ∝-D-গ্লুকোজ এবং দ্বিতীয় আইসোমারকে β-D-গ্লুকোজ বলা হয়।

$$+112^\circ \longrightarrow +52{\cdot}5^\circ \longleftarrow +19^\circ$$
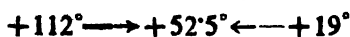
∝-D-গ্লুকোজ β-D-গ্লুকোজ

(বলয়াকার) (শৃঙ্খলাকার) (বলয়াকার)

এভাবে টারনেটের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেল, গ্লুকোজ আইসোমার আকারে অবস্থান করে এবং দ্রবণে তারা একই মিশ্রণসাম্যে পরিবর্তিত হয়।

∝-D-গ্লুকোজ +112° D-গ্লুকোজের শৃঙ্খল আকৃতি β-D-গ্লুকোজ +19°
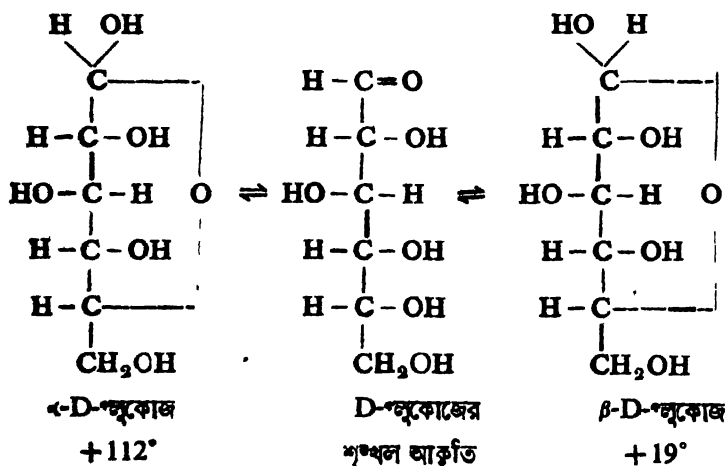
দ্রবণে সাম্যাবস্থায় গ্লুকোজের দুই তৃতীয়াংশ β-আইসোমার হিসাবে অবস্থান করে। বিশুদ্ধ দ্রবণে সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তি ও মিউটারোটেশন সম্পূর্ণ হতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। তবে হাইড্রোক্সিল আয়ন বা হাইড্রোজেন আয়নের উপস্থিতিতে এই ঘটনা দ্রুত সংঘটিত হয়। হাইড্রোজেন আয়নের চেয়ে হাইড্রোক্সিল আয়ন এক্ষেত্রে প্রায় 40,000 গুণ বেশী সক্রিয়।

শর্করার ∝ ও β আকৃতিকে অ্যানোমার (anomers) বলা হয়। যে কার্বন পরমাণুটি ∝ ও β অ্যানোমার আকৃতি প্রদান করে তাকে 'অ্যানোমারিক কার্বন পরমাণু' বলা হয়।

6. **ইনভারসোন (Inversion) :** দ্রবণে দ্বিশর্করা সুক্রোজের আলোক ঘূর্ণন +66·5° ডিগ্রি। লঘু অ্যাসিড বা এনজাইমের (সুক্রেজ বা ইনভারটেজ)

দ্বারা সুক্রোজ যখন গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হয় তখন তার আলোক ঘূর্ণন ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকে পরিবর্তিত হয়। এই ঘটনাকে ইনভারসোন (inversion) বলা হয়। ফ্রাকটোজ বামাবর্ত শর্করা এবং গ্লুকোজ দক্ষিণাবর্ত শর্করা, তবে ফ্রাকটোজের বামাবর্তন (−92°) গ্লুকোজের দক্ষিণাবর্তনের (+52·50) চেয়ে অনেক বেশী বলে আর্দ্রবিশ্লেষণের পর সুক্রোজের আলোক ঘূর্ণন ঠিক উল্টো হয়।

$$C_6H_{22}O_{11} + H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$$

সুক্রোজ	গ্লুকোজ	ফ্রাকটোজ
+66·5°	+52·5°	−92°
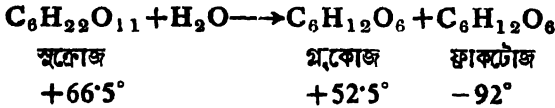
আর্দ্রবিশ্লেষণের পর গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজের মিশ্রণকে ইনভারট সুগার (invert sugar) বলা হয়। মধুতে আনুপাতিকভাবে ইনভার্ট সুগারের পরিমাণ খুব বেশী থাকে।

কার্বোহাইড্রেটের গঠন

Structure of Carbohydrate

কার্বোহাইড্রেটের গঠন-কাঠামো যেমন সরল শৃঙ্খলাকারের (straight chain) হয়, তেমনি তারা বলয়াকার (ring) হিসাবেও অবস্থান করে। এমন অসংখ্য কার্বোহাইড্রেট রয়েছে যাদের প্রতিটি অণুস্থিত পরমাণু ও রাসায়নিক গ্রুপের সংখ্যা সমান, তবু তারা ভিন্ন। যেমন, $C_6H_{12}O_6$ স্থূল সংকেতবিশিষ্ট অন্ততপক্ষে 16টি ভিন্ন ভিন্ন সরল শর্করা রয়েছে যাদের গঠন কাঠামো একই, কিন্তু তাদের পরমাণু ও রাসায়নিক গ্রুপের বিন্যাস আলাদা হওয়ার ফলে তারা ভিন্ন হয়। এই ঘটনা **স্টেরিওআইসোমারিজম** (sterioisomerism) নামে পরিচিত এবং শর্করাসমূহ **স্টেরিওআইসোমার** (sterioisomer) নামে পরিগণিত। এদের তিনটির সরল শৃঙ্খলাকার সংকেত নিম্নরূপ :

```
    CHO              CHO              CHO
     |                |                |
  H—C—OH           H—C—OH          HO—C—H
     |                |                |
 HO—C—H           HO—C—H          HO—C—H
     |                |                |
  H—C—OH          HO—C—H           H—C—OH
     |                |                |
  H—C—OH           H—C—OH           H—C—OH
     |                |                |
   CH2OH            CH2OH            CH2OH
```
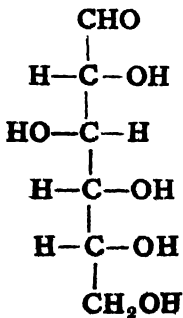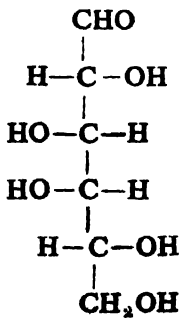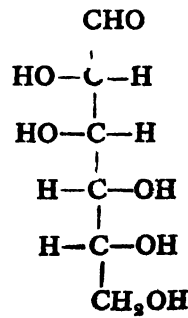
ডি-গ্লুকোজ ডি-গ্যালাকটোজ এল-ম্যানোজ

1. মনোস্যাকারাইড বা একক শর্করার গঠন (Structure of Monosaccharides) ঃ মনোস্যাকারাইড বা একক শর্করা দ্রবণে খুব সামান্য পরিমাণে মুক্ত শৃঙ্খল (open-chain) বা সরল শৃঙ্খল কাঠামোয় অবস্থান করে। এজাতীয় গঠন কাঠামোকে ব্যবহার করে মনোস্যাকারাইডের কিছু ধর্মের পর্যালোচনা সম্ভব হয়। ডি-গ্লুকোজ (অ্যালডো-হেক্সোজ) ও ডি-ফ্রাকটোজের (কিটো-হেক্সোজ) মুক্ত শৃঙ্খল কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

D-গ্লুকোজ:

$$O{=}{}^{1}C{-}H$$
$$H-{}^{2}C-OH$$
$$HO-{}^{3}C-H$$
$$H-{}^{4}C-OH$$
$$H-{}^{5}C-OH$$
$${}^{6}CH_2OH$$

D-ফ্রাকটোজ:

$${}^{1}CH_2OH$$
$${}^{2}C{=}O$$
$$HO-{}^{3}C-H$$
$$H-{}^{4}C-OH$$
$$H-{}^{5}C-OH$$
$${}^{6}CH_2OH$$
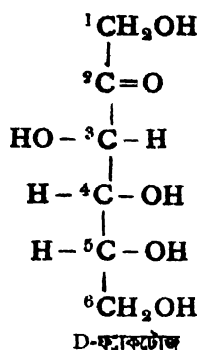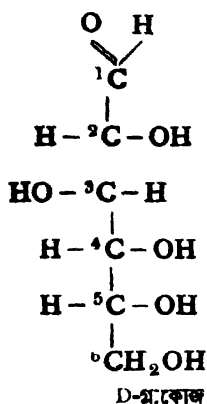
সাধারণত গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজের মুক্ত-শৃঙ্খল কাঠামো চক্রাকারে সংযুক্ত হয়ে দ্রবণে বলয় বা রিং (rings) গঠন করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে সাধারণ-
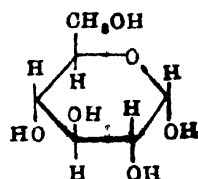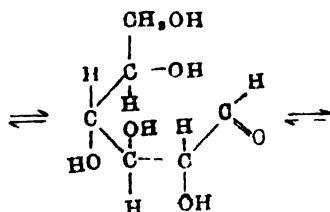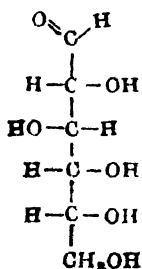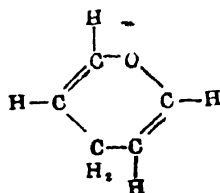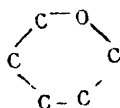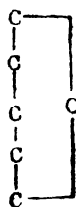
5-11 নং চিত্র ঃ উপরে পাইরান রিং ও পাইরান। নীচে গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোপাইরানোজ-এর উৎপাদন।

ভাবে একটি অ্যালডেহাইড একটি অ্যালকোহলের সংগে বিক্রিয়া করে হেমি-অ্যাসিটাইল (hemiacetal) উৎপন্ন করতে পারে। গ্লুকোজের মুক্ত-শৃংখলের C-1 স্থিত অ্যালডেহাইড C-5 স্থিত হাইড্রোক্সিলের সংগে বিক্রিয়া করে **আন্তর-আণবিক হেমিঅ্যাসিটাইল** (intramolecular hemiacetal) গঠন করে। এভাবে ছয়-সদস্যযুক্ত যে শর্করা-বলয় বা রিং গঠিত হয় তাকে **পাইরানোজ** (pyranose) বলা হয়। কারণ 6 সদস্যযুক্ত পদার্থ (5টি কার্বন ও একটি অক্সিজেন) 'পাইরান'-এর (pyran) সংগে তার সাদৃশ্য রয়েছে (5-11 নং চিত্র)।

একইভাবে কিটোন একটি অ্যালকোহলের যুক্ত হয়ে **হেমিকেটাল** (hemiketal) গঠন করে। ফ্রাকটোজের মুক্ত শৃংখলের C-2 স্থিত কিটো গ্রুপ C-5 স্থিত হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সংগে বিক্রিয়া করে **আন্তর-আণবিক হেমিকেটাল** (intramolecular hemiketal) গঠন করে। এভাবে পাঁচ সদস্যযুক্ত যে শর্করা-বলয় বা রিং গঠিত হয় তাকে **ফিউরানোজ** (furanose) বলা হয়, কারণ 5 সদস্যযুক্ত পদার্থ (4টি কার্বন ও একটি অক্সিজেন) 'ফিউরান' (furan) এর সংগে তার সাদৃশ্য রয়েছে (5-12 নং চিত্র)।
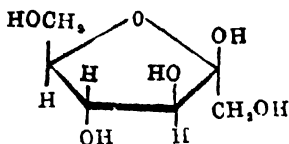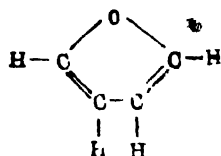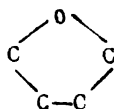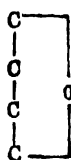
5-12 নং চিত্র : উপরে ফিউরান-রিং ও ফিউরান। নীচে ফ্রাকটো-ফিউরানোজ।

উপরে গ্লুকোপাইরানোজ ও ফ্রাকটোফিউরানোজের যে কাঠামো-সংকেত দেওয়া হয়েছে তা হাওয়র্থ (Haworth) এর অভিমত অনুসারেই করা হয়েছে। বলয়

বা রিং-এর তল কাগজের তলের সংগে প্রায় সমকোণে অবস্থান করে এবং বলয়ের গাঢ় রেখা পাঠকের সবচেয়ে কাছে অবস্থান করে।

গ্লুকোজ যখন চক্রাকারে রূপান্তরিত হয় তখন অতিরিক্ত অপ্রতিসম কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। মুক্ত-শৃঙ্খলের কার্বনিল কার্বন-পরমাণু বা কার্বন-1 বলয়ের অপ্রতিসম কেন্দ্রে পরিণত হয়। এভাবে দুটো বলয় কাঠামোর সৃষ্টি হয়ঃ α-D গ্লুকোপাইরানোজ এবং β-D-গ্লুকোপাইরানোজ (5-13 নং চিত্র)। প্রথমটির ক্ষেত্রে C-1 স্থিত হাইড্রোক্সিল গ্রুপ বলয় বা রিং-এর তলের নীচে অবস্থান করে এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে উপরে অবস্থান করে।
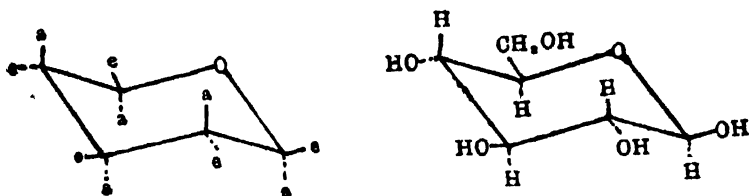
5-13 নং চিত্রঃ পাইরানোজের চেয়ার আকৃতি।
ডানপাশে β-D-গ্লুকোজ। a = অক্ষদেশীয়। e = বিষুবদেশীয়।

ছটি সদস্যযুক্ত পাইরানোজ-রিং সমতলীয় নয়। চেয়ার-আকৃতিবিশিষ্ট (chair form) হয়। দুধরনের প্রতিস্থাপক (substituents) হলঃ অক্ষদেশীয় (axial) এবং বিষুবদেশীয় (equatorial)। বিটা-D-পাইরানোজের সবকটি হাইড্রোক্সিল গ্রুপই বিষুবদেশীয়।

2. **ডাইস্যাকারাইড বা দ্বিশর্করার গঠন** (Structure of disaccharides) ঃ তিনটি প্রয়োজনীয় দ্বিশর্করা হল ম্যালটোজ, সুক্রোজ ও ল্যাকটোজ। ম্যালটোজ α-1, 4 গ্লাইকোসাইড যোজকের দ্বারা দুটো গ্লুকোজ অণুর সংগে যুক্ত থাকে (5-14 নং চিত্র)। তবে আইসোম্যালটোজ α-1, 6 গ্লাইকোসাইড (glycoside) যোজকের দ্বারা সংযুক্ত হয়। ম্যালটেজ এনজাইমের দ্বারা এটি আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হয়।

সুক্রোজে গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজ অণু α-1, 2 গ্লাইকোসাইড যোজকের দ্বারা যুক্ত থাকে। ফলে সুক্রোজে বিজারণধর্মী কোন গ্রুপ মুক্ত অবস্থায় থাকে না।

সুক্রোজ তাই অবিজারণধর্মী শর্করা (monreducing sugar)। সুক্রেজ এনজাইম সুক্রোজকে গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে।
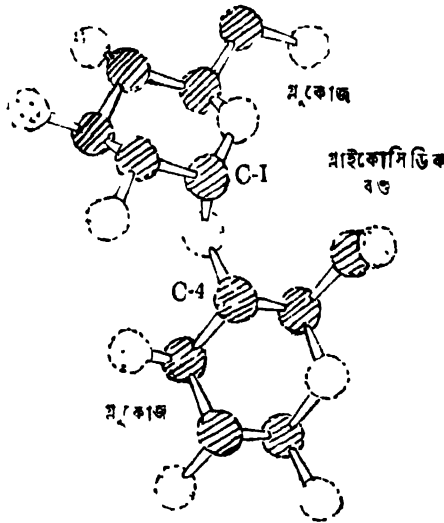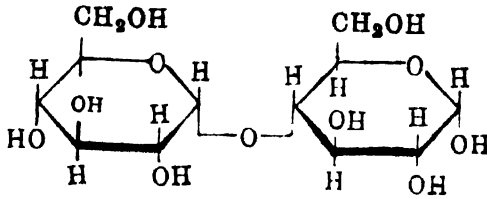
5-14 নং চিত্র : ম্যালটোজের গঠন (α-আকৃতি), নীচে মডেল।

ল্যাকটোজও একটি বিজারণধর্মী শর্করা। হাওয়র্থ (Haworth) ও লংগের (Long) কাজ থেকে জানা গেছে এটি β-1, 4 গ্লাইকোসাইড যোজকের দ্বারা
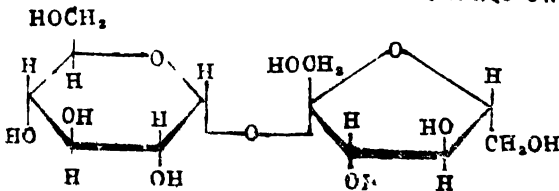
5-15 নং চিত্র : সুক্রোজের গঠন।

গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ অণুর সংগে যুক্ত হয় (5-16 নং চিত্র)। তবে কেলাসিত অবস্থায় α-আকৃতিতে থাকে।

3. **পলিস্যাকারাইডের গঠন** (Structure of polysaccharides) : গ্লাইকোজেন, স্টার্চ, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি পলিস্যাকারাইড প্রাণী ও উদ্ভিদের উৎস থেকে আসে। গ্লাইকোজেনকে প্রাণীজ পলিস্যাকারাইড, স্টার্চকে উদ্ভিদজাত পলিস্যাকারাইড এবং ডেক্সট্রিন এদের উভয়ের পরিপাকলব্ধ পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায়।
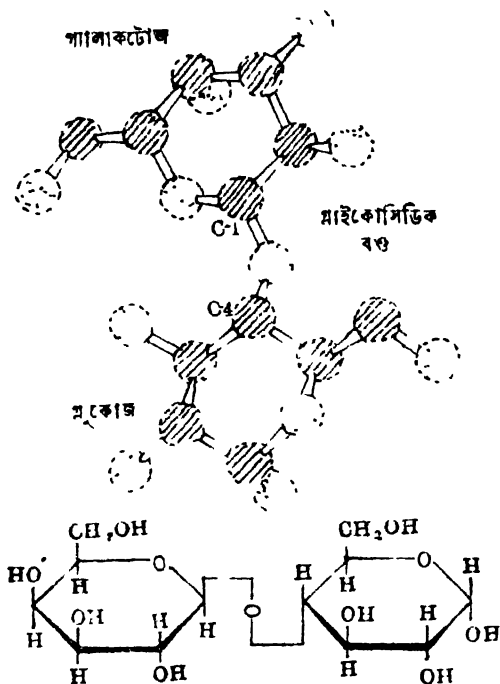
5-16 নং চিত্র : ল্যাকটোজের গঠন, উপরে মডেল।

(a) **গ্লাইকোজেন** (Glycogen) : গ্লাইকোজেন গ্লুকোজ অণুর পলিমার (5-17 নং চিত্র) এবং অত্যধিক আণবিক ভরসম্পন্ন পদার্থ। গ্লাইকোজেনে অধিকাংশ গ্লুকোজ অণুই ∝-1, 4-গ্লাইকোসাইড বণ্ডের দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। গ্লাইকোজেনে ∝-1, 6-গ্লাইকোসাইড বণ্ড শাখা সৃষ্টি করে এবং গড়ে 10 টি ∝-1,4 বণ্ডের পরই একটি ∝-1, 6 বণ্ড গঠিত হয়। এভাবে গ্লাইকোজেন একটি শাখাল পলিস্যাকারাইড হিসাবে দেহে অবস্থান করে।

(b) **স্টার্চ** (Starch) : স্টার্চ আর একটি সাধারণ পলিস্যাকারাইড এবং পুষ্টি-ভাণ্ডার হিসাবে উদ্ভিদে সঞ্চিত থাকে। স্টার্চকে দুভাবে প্রকৃতিতে পাওয়া

বায় ঃ (i) **আমাইলোজ** (Amylose) হিসাবে এবং (ii) **অ্যামাইলোপেকটিন** (Amylopectin) হিসাবে। আমাইলোজে গ্লুকোজ শুধুমাত্র α-1, 4-যোজকের দ্বারা সংযুক্ত থাকে। তাই শাখাল (branched) নয়। অপরপক্ষে, অ্যামাইলোপেকটিন গ্লাইকোজেনের মতই α-1, 4 এবং α-1, 6 গ্লাইকোসাইড বন্ড গঠন করে। দেখা গেছে গড়ে 30 টি α-1, 4-বণ্ডের পরই একটি করে α-1, 6-বণ্ড থাকে। অতএব গ্লাইকোজেন থেকে পার্থক্য হল, আমাইলোপেকটিনের শাখাপ্রশাখা তুলনামূলকভাবে অনেক কম।
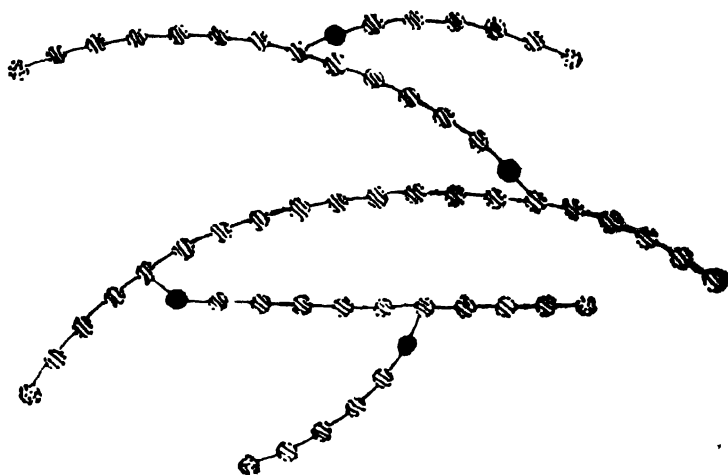
5-17 নং চিত্র ঃ গ্লাইকোজেনেব গঠন। কাল বল. α-1, 6-গ্লাইকোসাইড বণ্ড।

মানুষ খাদ্য হিসাবে যত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করে তার অর্ধেকেরও বেশী হল স্টার্চ। লালাগ্রন্থি ও অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত এনজাইম **α-অ্যামাইলেজ** অ্যামাইলোপেকটিন ও অ্যামাইলোজকে দ্রুত আদ্র'বিশ্লিষ্ট করতে পারে এবং α-1, 4-যোজককে আদ্র'বিশ্লিষ্ট করে **ম্যালটোজ, ম্যালটোট্রায়োজ** এবং **α-ডেক্সট্রিন** উৎপন্ন করে। আলফা ডেক্সট্রিনে α-1, 4-বণ্ড ছাড়া α-1, 6-বণ্ড থাকে। **α-ডেক্সট্রিনেজ** (α-dextinase) নামক এনজাইমের দ্বারা α-1, 6 বণ্ড বিশ্লিষ্ট হয়।

(c) **ডেক্সট্রান** (Dextran) ঃ শুধুমাত্র গ্লুকোজ অণুর দ্বারা গঠিত এটিও একটি পলিস্যাকারাইড বিশেষ। ডেক্সট্রানে গ্লুকোজ অণু প্রধানত α-1, 6 বণ্ডের দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই পদার্থ প্রধানত ইস্ট ও ব্যাকটেরিয়াতে সঞ্চিত থাকে। কখনও কখনও α-1, 2, α-1, 3 এবং α-1, 4 যোজকের দ্বারা শাখা প্রশাখা তৈরী হতে পারে।

(d) **সেলুলোজ** (Cellulose) : উদ্ভিদের আর একটি প্রধান পলিস্যাকারাইড হল সেলুলোজ। বায়োস্ফিয়ারের অর্ধেকেরও বেশী জৈব কার্বন এই পদার্থে পাওয়া যায়। সেলুলোজ β-1, 4-বন্ড দ্বারা গঠিত শাখাবিহীন গ্লুকোজের পলিমার বিশেষ। স্তন্যপায়ী প্রাণী এই পদার্থটিকে পরিপাক করতে পারে না। জাবর কাটা প্রাণীতে রুমিন্যাট ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা পৌষ্টিক নালীতে পদার্থটির পরিপাক সম্পন্ন হতে পারে। পতঙ্গ, কাঁকড়াজাতীয় প্রাণীর বহিঃকঙ্কালে চিটিন (chitin) নামক আর একটি পদার্থ পাওয়া যায় যার α-1, 4 বন্ডে N-অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামিন থাকে।

মনোস্যাকারাইডের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়া

মনোস্যাকারাইড বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এসব বিক্রিয়া থেকে মনোস্যাকারাইডের গঠনকাঠামো সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়।

1. **আয়োডো যৌগ** (Iodo Compound) : অ্যালডোজকে গাঢ় হাইড্রিওডিক অ্যাসিডের (HI) উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে তার সবকটি অক্সিজেনই হারায় এবং একটি আয়োডো যৌগে রূপান্তরিত হয়। যেমন, গ্লুকোজ আয়োডো হেক্সেনে ($C_6H_{13}I$) রূপান্তরিত হয়। লব্ধ পদার্থটি একটি সরল শৃঙ্খলাকার পদার্থ (স্বাভাবিক হেক্সেনের মত)। এর থেকে প্রমাণিত হয় শর্করার মধ্যে কোন শাখা নেই।

2. **অ্যাসিটাইলেশন** (Acetylation) : শর্করা এস্টার উৎপাদন করতে পারে অর্থাৎ অ্যাসিটাইলক্লোরাইডের (CH_3COCl) সংগে অ্যাসিটাইলেশন ঘটাতে পারে। এর থেকে প্রমাণিত হয় শর্করাতে অ্যালকোহল গ্রুপ রয়েছে। একটি শর্করা যতসংখ্যক অ্যাসিটাইল গ্রুপ নিতে পারে তার ততটি অ্যালকোহল গ্রুপ আছে। 5 টি অ্যালকোহল গ্রুপের (OH) উপস্থিতির জন্য গ্লুকোজের অ্যাসিটাইলেশন থেকে পেনটা অ্যাসিটেট (Pentaacetate) পাওয়া যায়।

3. **বিজারণ ও অবিজারণ ধর্ম** (Reducing and non-reducing properties) : যে সব শর্করার অ্যালডেহাইড (–CHO) ও কিটোন গ্রুপ (-CO) মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং ক্ষারীয় দ্রবণে যারা এনেডায়োল (enediols) রূপান্তরিত হয়ে শক্তিশালী বিজারক পদার্থ (reducing agent) হিসাবে কাজ করে তাদের বিজারণ ধর্মী শর্করা (reducing sugar) বলা হয়। এনেডায়োল (ডাবল বন্ডে দুটো OH গ্রুপ) অবস্থায় এরা Cu^{++}, Ag^{+}, Hg^{++}, Bi^{++},

$Fe(CN)_6^{-3}$ প্রভৃতি জারক ধর্মী আয়নকে বিজারিত করে এবং নিজেরা জারিত হয়ে সুগার অ্যাসিড বা শর্করা তৈরী করে।

$$\begin{array}{c} H-C=O \\ | \\ H-C-OH \\ | \\ R \end{array} \xrightarrow{\text{ক্ষার}} \begin{array}{c} H-C-OH \\ \| \\ C-OH \\ | \\ R \end{array} \xrightarrow{\text{জারণ}} \begin{array}{c} COOH \\ | \\ H-C-OH \\ | \\ R \end{array}$$

অ্যালডোজ 1, 2. এনেডায়োল সুগার অ্যাসিড
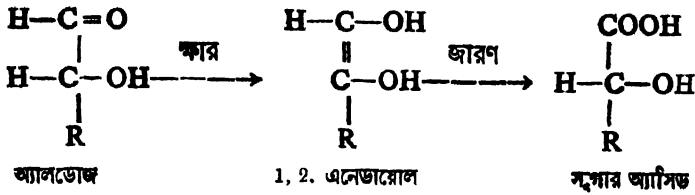
যে সব শর্করার অ্যালডেহাইড ও কিটোন গ্রুপ মুক্ত অবস্থায় থাকে না তাদের **অবিজারণধর্মী শর্করা** (non-reducing sugar) বলা হয়।

গ্লুকোজ, ফ্রাকটোজ, গ্যালাকটোজ, ল্যাকটোজ, ম্যালটোজ ও ডেক্সট্রিন বিজারণ-ধর্মী শকরার। অপরপক্ষে সুক্রোজ, স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন অবিজারণধর্মী শর্করা।

4. **অম্ল ও ক্ষারের ক্রিয়া** (Action of acid and alkali) : সালফুরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রভৃতি গাঢ় খনিজ অ্যাসিড কার্বোহাইড্রেটের সংগে বিক্রিয়া করে **ফারফিউরাল** (furfural) এবং **ফারফিউরালজাত পদার্থ** (furfural derivatives) উৎপন্ন করে। গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে ফুটালে ফ্রাকটোজ, সুক্রোজ ও পেনটোজ দ্রুত ফারফিউরাল উৎপন্ন করে, কিন্তু গ্লুকোজ, ম্যালটোজ, ল্যাকটোজ ও পলিস্যাকারাইড ফারফিউরাল উৎপাদনে বেশ সময় নেয়। হেক্সোজ গাঢ় অ্যাসিডের উপস্থিতিতে হাইড্রোক্সিমিথাইল ফারফিউরাল (hydroxymethyl furfural) উৎপন্ন করে।

$$C_5H_{10}O_5 \xrightarrow{HCl} \begin{array}{c} HC-CH \\ \|\quad\;\; \| \\ C\quad\; C-CHO \\ \lfloor\!-O-\!\rfloor \end{array}$$

পেনটোজ ফারফিউরাল

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{HCl} HOCH_2-\begin{array}{c} HC-CH \\ \|\quad\;\; \| \\ C\quad\; C-CHO \\ \lfloor\!-O-\!\rfloor \end{array}$$

হেক্সোজ হাইড্রোক্সিমিথাইল ফারফিউরাল
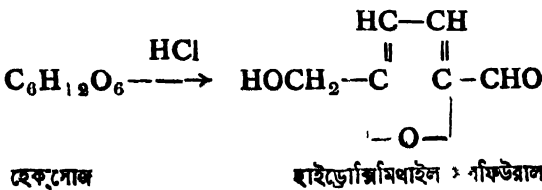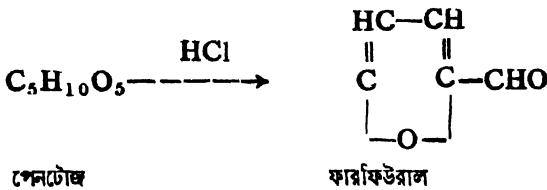
ক্ষারের উপস্থিতিতে মনোস্যাকারাইড এবং অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট (যাদের অ্যালডেহাইড ও কিটোন গ্রুপ মুক্ত থাকে) এনেডায়োল ও এনোল সল্ট উৎপন্ন

করে। ডাবল বন্ডযুক্ত কার্বনে দুটো কার্বোক্সিল ($-OH$) যুক্ত হয় বলে কার্বোহাইড্রেটের এনোল ফর্মকে এনেডায়োল বলা হয়। তবে কোন এনোল গ্রুপটি প্রথমে সল্ট উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তা বলা মুস্কিল।

$$\begin{array}{c} H-C=O \\ | \\ H-C-OH \\ | \\ R \end{array} \rightleftharpoons \begin{array}{c} H-C-OH \\ \| \\ C-OH \\ | \\ R \end{array} + NaOH \rightleftharpoons \begin{array}{c} H-C-ONa \\ | \\ C-OH \\ | \\ R \end{array}$$

হেক্সোজ 1,2-এনেডায়োল এনেডায়োল সল্ট
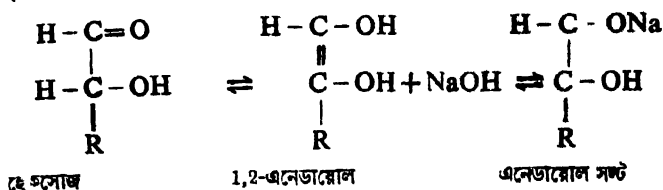
5. **ওসাজোন উৎপাদন** (Osazone formation) **:** ওসাজোন উৎপাদনের মাধ্যমে শর্করাজাত পদার্থকে কেলাসিত অবস্থায় নিয়ে আসা যায়। এসব পদার্থের নির্দিষ্ট কেলাসকাঠামো, গলনাংক এবং অধঃক্ষেপ-কাল (precipitation times) নির্দিষ্ট থাকে এবং এরা শর্করার সনাক্তকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

শর্করার ওসাজোন নিম্নলিখিতভাবে উৎপন্ন হয় ; শর্করার দ্রবণের সংগে ফেনাইল হাইড্রাজিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং সোডিযাম অ্যাসিটেটের মিশ্রণ মেশানো হয়, এর-পর ফুটন্ত জলগাহে এই মিশ্রণকে উত্তপ্ত করা হয়।

অ্যালডেহাইড ও কিটোন গ্রুপের কার্বনিল কার্বন ও তার পরবর্তী কার্বন পরমাণু বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, অ্যালডোজের সংগে ফেনাইল হাইড্রাজিন বিক্রিয়া করে প্রথমে ফেনাইল হাইড্রাজোন (phenylhydra-zone) উৎপন্ন করে। শেষোক্ত পদার্থটি ফেনাইলহাইড্রাজিনের অণুর সংগে বিক্রিয়া করে ওসাজোন উৎপন্ন করে।

$$\begin{array}{l} HC=O \\ | \\ HC-OH \\ | \\ R \end{array} + H_2N-NH-C_6H_5 \rightarrow \begin{array}{l} HC=N-NH-C_6H_5 \\ | \\ HC-OH \\ | \\ R \end{array} + H_2O$$
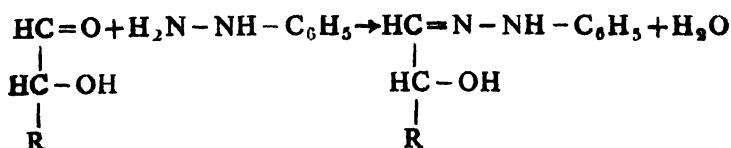
অ্যালডোজ + ফেনাইল হাইড্রাজিন ফেনাইল হাইড্রাজোন + জল

$$\begin{array}{l} HC=N-NH-C_6H_5 \\ | \\ HC-OH \\ | \\ R \end{array} + 2H_2N-NH-C_6H_5 \rightarrow \begin{array}{l} HC=N-NH-C_6H_5 \\ | \\ C=N-NH-C_6H_5 \\ | \\ R \end{array} + NH_3 + C_6H_5NH_2$$
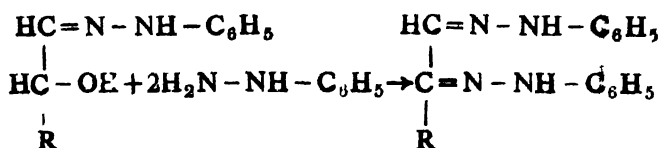
ফেনাইল হাইড্রাজোন + ফেনাইলহাইড্রাজিন ওসাজোন + অ্যামোনিয়া + অ্যানিলিন

কিটোজও একই ধরণের বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। গ্লুকোজ, ফ্রাকটোজ ও ম্যানোজের (mannose) কেলাসকাঠামোর তুলনা করে দেখা গেছে এরা একই ধরণের ওসাজোন উৎপন্ন করে। তবে গ্যালাকটোজের ওসাজোন সম্পূর্ণ আলাদা।

6. **জারণ** (Oxidation) : অ্যালডোজের জারণ থেকে অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। অ্যালডেহাইড গ্রুপের জারণ থেকে অ্যালডোনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, তবে অ্যালডেহাইড গ্রুপ অপরিবর্তিত থাকলে অণুর অপরপ্রান্তের প্রাথমিক অ্যালকোহল গ্রুপ জারিত হয়ে ইউরোনিক অ্যাসিড (uronic acid) উৎপন্ন করে।
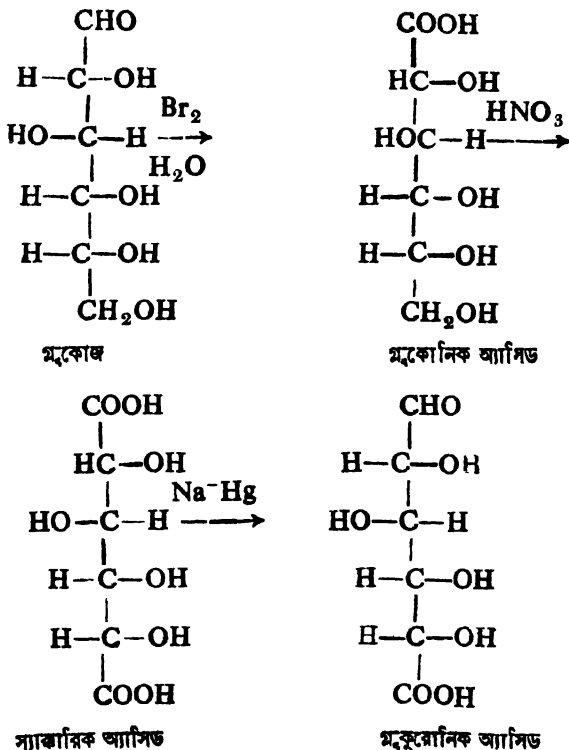
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মুক্ত অ্যালডেহাইড গ্রুপের উপস্থিতির জন্য গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড 'বিজারণ ধর্ম' প্রদর্শন করে। গ্যালাকটোজ গাঢ় HNO_3 অ্যাসিডের দ্বারা জারিত হয়ে ডাইকার্বোক্সিলিক মিউসিক অ্যাসিড (mucic acid) উৎপন্ন করে। এই পদার্থটি দ্রুত কেলাসিত হয়। ফলে এই বিক্রিয়াকে

সনাক্তকরণ পরীক্ষা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গ্যালাক্টুরোনিক অ্যাসিডকে প্রকৃতজাত পদার্থ (পেকটিন) হিসাবে ও পাওয়া যায়।

কার্বোহাইড্রেটের বর্ণবিক্রিয়া

Colour Ractions of Carbohydrates

1. **মোলিশের পরীক্ষা** (Molisch's test) : টেস্টটিউবে কিছুটা দ্রবণ নিয়ে তাতে দু'তিন ফোঁটা অ্যালকোহলযুক্ত অ্যাল্ফান্যাপ্থল মেশান হয়। এরপর টেস্টটিউবকে কাত করে তার গা বেয়ে তীব্র সালফিউরিক অ্যাসিডকে এমনভাবে ঢালা হয়, যাতে অম্ল-শর্করার দ্রবণের মধ্যে একটি স্তরের সৃষ্টি হয়। দুটো তরলের সংযোগস্থলে একটি বেগুনী রঙের আবির্ভাব ঘটে।

2. **বেনেডিক্টের পরীক্ষা** (Benedict's test) : একটি টেস্টটিউবে সামান্য পরিমাণ শর্করার দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা বেনেডিক্টের বিকারক মেশান হয়। মিশ্রণটিকে এরপর উত্তপ্ত করলে প্রথমে ইহা হলদে এবং পরে লালবর্ণে পরিণত হয।

3. **ফেলিংগের পরীক্ষা** (Fehling's test) : একটি টেস্টটিউবে ফেলিংগের 1 ও 2নং বিকারককে সমানভাবে মিশিয়ে তার মধ্যে শর্করার দ্রবণ মেশান হয়। মিশ্রণটিকে উত্তপ্ত করলে তা পূর্বের মতই লালবর্ণ ধারণ করে।

4. **ফ্লরোগ্লুসিনোলহাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরীক্ষা** (Phloroglucinol hydrochloric acid test) : গ্যালাক্টোজ বা পেনটোজ শর্করার দ্রবণকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংগে মিশ্রিত করে মিশ্রণকে ফুটালে লালবর্ণের আবির্ভাব ঘটে।

5. **বারফোয়েডের পরীক্ষা** (Barfoed's test) : এই পরীক্ষার দ্বারা একক শর্করাকে দ্বিশর্করা থেকে আলাদা করা যায়। একটি টেস্টটিউবে শর্করার দ্রবণের সংগে বারফোয়েডেব বিকারককে মিশিয়ে মিশ্রণকে উত্তপ্ত ও পরে ঠাণ্ডা করলে লাল রঞ্জক (pigments) নীচে জমা হয়।

6. **সেলিওয়ানোফের পরীক্ষা** (Seliwanoff's test) : শুধুমাত্র কিটো-শর্করা (keto surgars) এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। একটি টেস্ট-টিউবে শর্করার দ্রবণের সংগে সেলিওয়ানোফের বিকারক মিশ্রিত করে মিশ্রণকে উত্তপ্ত ও পরে ঠাণ্ডা করলে লালবর্ণ ধারণ করে।

7. **মুরের পরীক্ষা** (Moore's test) : শর্করার দ্রবণের সংগে লঘু ক্ষার (alkali) মিশ্রিত করে মিশ্রণকে উত্তপ্ত করলে বাদামী ও লাল বর্ণ পাওয়া যায়।

লিপিড
LIPID

লিপিড প্রকৃতিজাত একপ্রকার স্নেহজাতীয় পদার্থ। এরা জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু ইথার, ক্লোরোফর্ম বেঞ্জিন, অ্যাসিটোন প্রভৃতি স্নেহদ্রাবকে দ্রবণীয়। সাধারণভাবে লিপিড স্নেহঅম্লের এস্টারবিশেষ (esters of fatty acids) এস্টার অ্যালকোহল ও অ্যাসিডের লবণ।

লিপিডের শ্রেণীবিন্যাস
Classification of Lipids

লিপিডকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (a) সরল লিপিড (simple lipids) এবং (b) যৌগ লিপিড (compound lipids)।

1. **সরল লিপিড :** যে সব লিপিডের বিশ্লেষণে স্নেহপদার্থ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না, তাদের সরল লিপিড বলা হয়। সরল লিপিডকে আবার দুভাবে বিভক্ত করা যায়। যথা : (a) স্নেহদ্রব্য (fats) এবং (b) মোমজাতীয় পদার্থ (waxes)।

(a) **স্নেহদ্রব্য (Fats) :** ফ্যাটিঅ্যাসিডের গ্লিসারল এস্টারকে (glycerol esters of fatty acids) স্নেহদ্রব্য বলা হয়। গ্লিসারল 3টি হাইড্রোক্সিল যুক্ত (–OH) অ্যালকোহল পদার্থ। তিনটি ফ্যাটিঅ্যাসিডের (fatty acids) সংগে যুক্ত হয়ে এটি **ট্রাইগ্লিসারাইড** (triglyceride) উৎপন্ন করে। এটি এক বা দুটি ফ্যাটি অ্যাসিডের সংগেও যুক্ত হতে পারে এবং আলফা বা বিটা-**মনোগ্লিসারাইড** অথবা আলফা-বিটা **ডাইগ্লিসারাইড** উৎপন্ন করতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া স্নেহদ্রব্য ভিন্নধর্মী হয়। এস্টারে ভিন্ন প্রকৃতির ফ্যাটিঅ্যাসিডের উপস্থিতিই এর প্রধান কারণ।

গ্লিসারল	সরল ট্রাইগ্লিসারাইড	মিশ্র ট্রাইগ্লিসারাইড
$H_2C\alpha-OH$	$H_2C\alpha-O-CO-R$	$H_2C\alpha-O-CO-R_1$
$HC\beta-OH$	$HC\beta-O-CO-R$	$HC\beta-O-CO-R_2$
$H_2C\gamma-OH$	$H_2C\gamma-O-CO-R$	$H_2\gamma-O-CO-R_3$
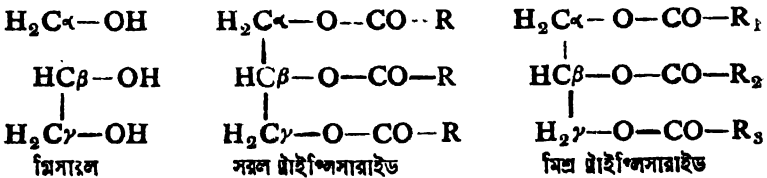
কক্ষ উষ্ণতায় যেসব স্নেহদ্রব্য তরল অবস্থায় থাকে তাদের তেল (oil) বলা হয়। বাদাম তেল, নারিকেলের তেল, সয়াবিনের তেল, অলিভ তেল, মাখন, ঘি ইত্যাদি স্নেহদ্রব্যের উদাহরণ।

(b) **মোমজাতীয় পদার্থ :** গ্লিসারল ছাড়া অন্যান্য অ্যালকোহলের সংগে ফ্যাটিঅ্যাসিডের যে এস্টার উৎপন্ন হয় তাকে মোম বা **মোমজাতীয় পদার্থ** বলা হয়। প্রকৃতিজাত মোম খুবই জটিল। মানবদেহে মোমজাতীয় যে পদার্থ সচরাচর দেখা যায় তা কোলেস্টারলের (cholesterol) এস্টারবিশেষ। রক্ত, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (adrenal gland), গোনাড (gonad), ত্বকের সেবাসিয়াস (cebaceous) গ্রন্থি প্রভৃতিতে এজাতীয় মোমপদার্থ পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতিজাত মোম সাধারণ উষ্ণতায় যেমন কঠিন থাকে তেমনি স্নেহ-দ্রব্যের মত সহজে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট (hydrolysed) হয় না। প্রকৃতিতে তিন প্রকার মোমের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। যথা : মৌমাছিজাত মোম (myricyl palmitate), ল্যানোলিন (lanoline) এবং স্পারম্যাসেটি (spermaceti) বা শুক্রাণুমোম, যা তিমির শুক্রাণুর মস্তকে পাওয়া যায়।

2. **যৌগলিপিড :** স্নেহপদার্থের সংগে অ-স্নেহপদার্থের সংযোগে যৌগ লিপিড উৎপন্ন হয়। যৌগ লিপিডকে পুনরায় 5 ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (a) ফসফরাসযুক্ত লিপিড বা ফসফোলিপিড (phospholipids), (b) শর্করাযুক্ত লিপিড বা গ্লাইকোলিপিড (glycolipids), (c) প্রোটিনযুক্ত লিপিড বা প্রোটিওলিপিড (proteolipids), (d) সালফারযুক্ত লিপিড বা সালফোলিপিড (sulpholipids) এবং (e) গ্যাংগ্লিওসাইড (gangliosides)।

(a) **ফসফোলিপিড :** স্নেহদ্রব্য, ফসফোরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রোজেন-যুক্ত বেসের (base) সমন্বয়ে ফসফোলিপিড গঠিত। লেসিথিন্ (lecithin), সেফালিন (cephalin) এবং স্ফিংগোমায়েলিন (sphingomyelin) এই তিন শ্রেণীর ফসফোলিপিড প্রধান।

লেসিথিনের মধ্যে গ্লিসারলের একটি অণু, ফ্যাটি অ্যাসিডের দুটো অণু, ফসফোরিক অ্যাসিডের একটি অণু এবং ফসফোরিক অ্যাসিডের সংগে যুক্ত নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ কোলিন (choline) অবস্থিত। জলে ডুবিয়ে রাখলে এই পদার্থ ফেঁপেফুলে ওঠে এবং অবদ্রব (emulsion) সৃষ্টি করে। আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে ইহা জল ও অক্সিজেন শোষণ করে এবং কালচে প্লাসটিকের মতো দেখায়।

সেফালিনের গঠন লেসিথিনের মতোই। কোলিনের স্থানে শুধু অ্যামাইনো-ইথাইল অ্যালকোহল (aminoethyl alcohol) রয়েছে। ইহা স্নায়ুকলা, ডিমের পীতাংশ (egg-yolk), দুধ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

$$HOCH_2-CH_2-\overset{+}{N}\equiv(CH_3)_3$$

কোলিন

$$\begin{array}{l} \qquad\qquad\quad CH_2-O-CO-R \\ \qquad\qquad\quad | \\ R-CO-O-CH \\ \qquad\qquad\quad | \qquad\qquad O \\ \qquad\qquad\quad | \qquad\qquad \| \\ \qquad\qquad\quad CH_2-O-P-O-CH_2-\overset{+}{N}\equiv(CH_3)_3 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad | \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad OH \end{array}$$

α-লেসিথিন

$$\begin{array}{l} \qquad\qquad\quad CH_2-O-CO-R \\ \qquad\qquad\quad | \\ R-CO-O-CH \qquad\quad O \\ \qquad\qquad\quad | \qquad\qquad \| \\ \qquad\qquad\quad CH_2-O-P-O-CH_2-CH_2-NH_3^+ \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad | \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad O \end{array}$$

α-সেফালিন

$$\begin{array}{l} H_3C-(CH_3)_{12}-CH=CH-CH-CH-CH_2 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad | \qquad | \qquad | \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad OH \quad NH_2 \quad OH \end{array}$$

স্ফিংগোসিন

$$\begin{array}{l} \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad O \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \| \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad {}^-O-P-O\cdot CH_2\cdot CH_2\text{-}N \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad | \qquad\qquad\qquad \equiv(CH_3)_3 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad O \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad | \\ H_3C\text{-}(CH_2)_{12}\text{-}CH=CH\text{-}CH\text{-}CH\text{-}CH_2 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad | \qquad | \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad OH \quad NH \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad | \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad C=O \\ \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad R' \leftarrow \text{ফ্যাটি অ্যাসিড গ্রুপ} \end{array}$$
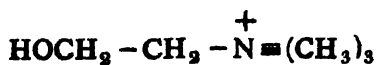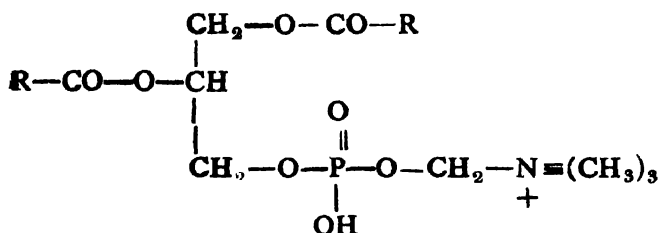
স্ফিংগোমায়েলিন

স্ফিংগোমায়েলিনের গঠনও লেসিথিনের মতো। গ্লিসারলের স্থানে শুধুমাত্র নাইট্রোজেনঘটিত অ্যালকোহল স্ফিংগোসিন (sphingosine) রয়েছে। ইহা আলোবাতাসে স্থিতিশীল একটি কেলাস পদার্থ। স্নায়ুকোষ, দুধ ও ডিমের পীতাংশে একে বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

(b) **গ্লাইকোলিপিড :** গ্যালাক্টোজ নামক একক শর্করাকে এজাতীয় যৌগ লিপিডে দেখতে পাওয়া যায়। এই শর্করাটি ছাড়া গ্লাইকোলিপিডের গঠন ঠিক স্ফিংগোমায়েলিনের মতো। স্নেহঅম্লের বিভিন্নতার জন্য এজাতীয় লিপিড ভিন্নধর্মী হয়। মস্তিষ্কে গ্লাইকোলিপিড প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মায়েলিন শীথ (myelin sheath) এবং মস্তিষ্কের শ্বেত পদার্থে (white matter) এর প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশী। গউচায়ের (Gaucher) রোগে যকৃৎ ও পিত্তে এর প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়।

(c) **প্রোটিওলিপিড :** ফস্ফোলিপিডের সংগে প্রশমিত অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত হয়ে প্রোটিনযুক্ত লিপিড উৎপন্ন হয়। এরা ক্লোরোফর্ম ও মিথানোলের (methanol) মিশ্র দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। প্রধানত মস্তিষ্কে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

(d) **সালফোলিপিড :** ইহা স্ফিংগোসিন সেরিব্রোনিক অ্যাসিড (sphingosine cerebronic acid) ও গ্যালাক্টোজের সালফিউরিক এস্টার (sulphuric ester)। শুক্রাশয়, বৃক্ক, যকৃৎ, মস্তিষ্ক প্রভৃতিতে এই পদার্থকে দেখতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্কে এর প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশী।

(e) **গ্যানগ্লিওসাইড :** এই পদার্থ স্নেহঅম্ল, শর্করা, সিয়ালিক অ্যাসিড (sialic acid) এবং হেক্সোজ-অ্যামাইন (hexose amine) নিয়ে গঠিত। মস্তিষ্ক, স্নায়ুকোষ, লোহিতকণিকা ও পিত্তে এই পদার্থটিকে দেখতে পাওয়া যায়।

লিপিড সম্বন্ধে কতকগুলো জ্ঞাতব্য বিষয়

Some Important Imformations About Lipids

1. **স্যাপোনিফিকেশন সংখ্যা : (Saponification number) :** সোডিয়াম ও পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাহায্যে স্নেহদ্রব্যকে ফুটালে স্নেহ-অম্লের লবণ বা সাবান (soaps) উৎপন্ন হয় এবং গ্লিসারল নির্গত হয়। এভাবে স্নেহদ্রব্য ও হাইড্রোক্সাইডের সংযুক্তি ঘটিয়ে সাবান উৎপাদনের পদ্ধতিকে স্যাপোনিফিকেশন বলা হয়। এক গ্রাম স্নেহ-দ্রব্যের আর্দ্রবিশ্লেষণ থেকে

উৎপন্ন মোট স্নেহঅম্লকে প্রশমিত করতে যত মিলিগ্রাম পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রয়োজন হয় তাকে স্যাপোনিফিকেশন সংখ্যা বলা হয়। স্যাপোনিফিকেশন সংখ্যার দ্বারা কোন স্নেহদ্রব্যে যে পরিমাণ স্নেহঅম্ল থাকে তাদের গড় আণবিক ওজন নির্ণয় করা যায়।

2. **আয়োডিন সংখ্যা** (Iodine number) : স্নেহদ্রব্যস্থিত স্নেহঅম্লের দ্বিবন্ধের (double bond) মধ্যে যে অসংপৃক্তি (unsaturation) রয়েছে, আয়োডিন বা ব্রোমিন তার সংগে সংযুক্ত হতে পারে। প্রতি 100 গ্রাম স্নেহদ্রব্যের সংগে যত গ্রাম আয়োডিন এভাবে যুক্ত হয় তাকে **আয়োডিন সংখ্যা** বলা হয়। আয়োডিন সংখ্যার সাহায্যে কোন স্নেহদ্রব্যের অসংপৃক্তির মাত্রা নির্ণয় করা যায়।

3. **অম্লসংখ্যা** (Acid number) : অধিকাংশ প্রকৃতিজাত স্নেহদ্রব্যকে অনেকদিন ধরে ফেলে রাখলে তাদের মধ্যে যে দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ জন্মায় তাকে স্নেহদ্রব্যের **র‍্যান্সিডিটি** (rancidity) বলা হয়। র‍্যান্সিডিটি স্নেহদ্রব্যের অংশত আর্দ্রবিশ্লেষণের জন্য হয়ে থাকে। এই আর্দ্রবিশ্লেষণে স্নেহঅম্ল ও গ্লিসারল নির্গত হয়। র‍্যান্সিডিটির মাত্রা নির্ণয় করতে অম্লসংখ্যা ব্যবহার করা হয়। 1 গ্রাম স্নেহদ্রব্য থেকে মুক্ত স্নেহঅম্লের প্রশমনে যত মিলিগ্রাম KOH-এর প্রয়োজন হয় তাকে **অম্ল সংখ্যা** বলা হয়।

4. **বনস্পতি ঘি উৎপাদন** (Hydrogenation) : সস্তা দামের অসংপৃক্ত তেলের সংগে হাইড্রোজেনের সংযুক্তি ঘটিয়ে বনস্পতি ঘি উৎপাদন করা হয়। নিকেল (nickel) ধাতুকে এ সব ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হাইড্রোজেন সংযুক্তি অধিক হলে তেলের সংপৃক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তা কঠিন আকার ধারণ করে। কঠিন বনস্পতি সহজে হজম হয় না বা শোষিত হয় না।

ফ্যাটি অ্যাসিড (Fatty Acids)

ফ্যাটের আর্দ্রবিশ্লেষণ থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়। প্রকৃতিজাত ফ্যাটে যেসব ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে তারা সাধারণত জোড় সংখ্যক কার্বন-পরমাণু সম্পন্ন এবং সরল শৃঙ্খলাকার পদার্থ। চেন বা শৃঙ্খল সম্পৃক্ত (ডাবল বণ্ডবিহীন) বা অসম্পৃক্ত (এক বা একাধিক ডাবল বণ্ডযুক্ত) হতে পারে। সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের শেষে অ্যানোইক (anoic) ব্যবহার করা হয়। যথা, ওকটানোইক অ্যাসিড (octanoic acid)। অপরপক্ষে, অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের শেষে

এনোইক (enoic) ব্যবহার করা হয়। যথা, ওক্টাডেসিনোইক অ্যাসিডন (octadecenoic acid)। কার্বোক্সিল কার্বন (কার্বন নং 1) থেকে পরবর্তী কার্বন পরমাণুর সংখ্যা চিহ্নিত করা হয়। কার্বোক্সিল কার্বনের পরবর্তী কার্বন পরমাণুকে (2নং) α-কার্বন, তার পরবর্তী কার্বনকে (3নং) β-কার্বন এবং প্রান্তীয় মিথাইলযুক্ত কার্বনকে ω-কার্বন বলা হয়।

$$\underset{\omega}{H_3C} - (CH_2)n - \underset{\beta}{\overset{3}{C}} - \underset{\alpha}{\overset{2}{C}} - \overset{1}{C}\begin{matrix} \diagup O \\ \diagdown OH \end{matrix}$$
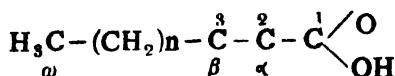
1. **সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড** (Saturated fatty acids) ঃ স্বল্প দৈর্ঘ্যের ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রথম সদস্য হিসাবে অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে চিহ্নিত করা হয়। এই শ্রেণীর সাধারণ ফরমুলা ঃ $C_nH_{2n+1}COOH$। এসব অ্যাসিডের উদাহরণ 5নং তালিকায় উপস্থাপিত করা হয়েছে। মোমে এর চেয়ে বেশী কার্বন পরমাণু সম্পন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডকেও পাওয়া যায়। কিছু সংখ্যক শাখাল ফ্যাটি অ্যাসিডকেও উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে পাওয়া গেছে।

5নং তালিকা ঃ সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড।

অ্যাসিটিক অ্যাসিড	CH_3COOH
প্রোপিওনিক অ্যাসিড	C_2H_5COOH
বিউটিরিক অ্যাসিড	C_3H_7COOH
ক্যাপ্রোইক অ্যাসিড	$C_5H_{11}COOH$
ক্যাপরীলিক অ্যা সড (ওকটানোইক)	$C_7H_{15}COOH$
ডেকানোইক অ্যাসিড (ক্যাপরিক ৷	$C_9H_{19}COOH$
লউরিক অ্যাসিড	$C_{11}H_{23}COOH$
মিরিস্টিক অ্যাসিড	$C_{13}H_{27}COOH$
প্যালমিটিক অ্যাসিড	$C_{15}H_{31}COOH$
স্টিয়ারিক অ্যাসিড	$C_{17}H_{35}COOH$
অ্যারাকিডিক অ্যাসিড	$C_{19}H_{39}COOH$
বেহেনিক অ্যাসিড	$C_{21}H_{43}COOH$
লিগনোসেরিক অ্যাসিড	$C_{23}H_{47}COOH$

2. **অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড** (Unsaturated Fatty Acids) ঃ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডকে তাদের অসম্পৃক্তির মাত্রার উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

(a) **একটি ডাবলবণ্ডযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড** (Monounsaturated fatty acid) ঃ একটি ডাবলবণ্ডযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সাধারণ ফরমুলা ঃ $C_nH_{2n-1}COOH$ উদাহরণ ঃ ওলেইক অ্যাসিড ও পালমিটোলেইক অ্যাসিড। এদের প্রায় সব ফ্যাটেই পাওয়া যায়।

(b) **একাধিক ডাবলবণ্ডযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড** (Polyunsaturated fatty acids) ঃ যে সব ফ্যাটি অ্যাসিডের ডাবলবণ্ড দুই বা ততোধিক তারা নিম্নরূপ ঃ

1. দুটো ডাবলবণ্ডযুক্ত ঃ সাধারণ ফর্মুলা ঃ $C_nH_{2n-3}COOH$। **উদাহরণ** ঃ লিনোলেইক অ্যাসিড।

2. তিনটি ডাবলণ্ডবযুক্ত ঃ সাধারণ ফর্মুলা ঃ $C_nH_{2n-5}COOH$। **উদাহরণ** ঃ লিনোলেনিক অ্যাসিড।

3. চারটে ডাবলবণ্ডযুক্ত ঃ সাধারণ ফর্মুলা : $C_nH_{2n-7}COOH$। **উদাহরণ** : অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড।

এছাড়া অন্যান্য ধরণের কিছু ফ্যাটি অ্যাসিডকেও জৈব পদার্থে পাওয়া যায়। মাছের তেলে এধরণের কিছু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়।

3. **অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড** (Essential fatty acids) ঃ স্তন্যপায়ী প্রাণী এনজাইমের অনুপস্থিতে C-9 এর পরবর্তী ফ্যাটি অ্যাসিড চেনের কোন কার্বন পরমাণুতে কোন দ্বিবন্ধ বা ডাবলবণ্ড সংযোগ করতে পারে না। ফলে **লিনোলেনিক অ্যাসিড** (linolenic acid), **লিনোলেইক অ্যাসিড** (linoleic acid) ও **অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড** (arachidonic acid) দেহে উৎপন্ন হতে পারে না। আবার দেহে অন্যান্য অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সংশ্লেষণের প্রাথমিক উপাদান হিসাবেও এরা খুব প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, দেখা গেছে এদের অনুপস্থিতিতে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ত্বক ও কিডনিতে ঘা (lesions) দেখা দেয় এবং প্রাণী বন্ধ্যা হয়ে পড়ে। এই তিনটি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডকে খাদ্যের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। এদের তাই **অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড** বলা হয়।

স্টেরোয়েড পদার্থ

Steroid Compound

স্টেরোয়েডের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ফ্যাট বা স্নেহদ্রব্যের অনুরূপ। **অর্থাৎ** এরাও জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু স্নেহদ্রাবকে দ্রবণীয়। সোডিয়াম

হাইড্রোক্সাইডের সাহায্যে স্টেরোয়েড পদার্থকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। স্টেরোয়েডের উদাহরণ : কোলেস্‌টারল (cholesterol) এবং অন্যান্য স্টেরোল, পিত্ত অম্ল (bile acid), নারীপুরুষের যৌন হরমোন, অ্যাড্‌রেন্যাল গ্রন্থির হরমোন ইত্যাদি। শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে এদের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, তেমনি তাদের জৈবিক সক্রিয়তা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ভিন্নধর্মী। তবে একটি জিনিস তাদের মধ্যে অভিন্ন, তা হল তাদের কাঠামো-নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসকে বলা হয় পারহাইড্রো-সাইক্লোপেন্‌টানোফেনান্‌থ্রীন নিউক্লিয়াস (perhydrocyclo-pentano-phenanthrene nucleus)। নিম্নে নিউ-ক্লিয়াসটিকে উপস্থিত করা হয়েছে।
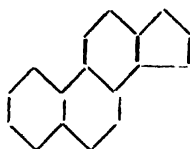
5-18 নং চিত্র : স্টেরোয়েড নিউক্লিয়াস।

1. **স্টেরোল ও কোলেস্‌টারল** (Sterol and cholesterol) : সব স্টেরোলই স্টেরোয়েড অ্যাল্‌কোহল। এরা সব সময়ে ফসফোলিপিডের সংগে সংযুক্ত থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেরোলের নাম কোলেস্‌টারল। মানবদেহের প্রায় সর্বত্রই এই পদার্থটি ছড়িয়ে আছে। এর লব্ধপদার্থ (derivatives) ডাই-হাইড্রোকোলেস্‌টারল (dihydrocholesterol) এবং 7 ডেহাইড্রোকোলেস্‌টারলের (7-dehydrocholesterol) সংগে একে একত্রে থাকতে দেখা যায়। শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছুসংখ্যক স্টেরোল কোলেস্‌টারল থেকেই উৎপন্ন হয়। যথা : ভিটামিন ডি, আর্‌গোস্টারল (ergosterol), নারীপুরুষের যৌন হরমোন, অ্যাড্‌রেন্যাল গ্রন্থির বহিঃস্তরীয় হরমোনসমূহ ইত্যাদি।

বিভিন্ন কোষে কোলেস্‌টারলের পরিমাণ বিভিন্ন। প্রধানত মস্তিষ্ক, স্নায়ু-কোষ, অ্যাড্‌রেন্যাল গ্রন্থি এবং ডিমের পীতাংশে এর প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশী। মস্তিষ্কের শুষ্ক শ্বেতপদার্থে প্রায় 14 শতাংশ এবং মেরুদণ্ডে 10 থেকে 15 শতাংশ কোলেস্‌টারল দেখতে পাওয়া যায়। পেশী থেকে গ্রন্থিতে কোলেস্‌টারলের পরিমাণ বেশী। হৃৎ ও অনৈচ্ছিক পেশীতে ঐচ্ছিক পেশীর চেয়ে বেশী পরিমাণে কোলেস্‌টারল দেখতে পাওয়া যায়। শুষ্ক কলাকোষে কোলেস্‌টারলের শতকরা হিসাব 6নং তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

6 নং তালিকা

শুষ্ক কলাকোষ	শতাংশ
মস্তিষ্কের ধূসরপদার্থ (grey matter)	6
মস্তিষ্কের শ্বেতপদার্থ (white matter)	14
বৃক্ক	1·6
প্লীহা	1·5
ত্বক	1·3
যকৃৎ	0·93
মাতৃস্তন	0·70
রক্ত	0 65
অনৈচ্ছিক পেশী···	0·55
ঐচ্ছিক পেশী	0·25

বয়স্ক পেশীর চেয়ে ভ্রূণপেশীতে কোলেস্টারল বেশী পরিমাণে থাকে। ইহা মুক্ত অবস্থা ও স্নেহঅম্লের এস্টার হিসাবে অবস্থান করে। মুক্ত অবস্থায় কোলেস্টারলের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। এস্টার অবস্থায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।
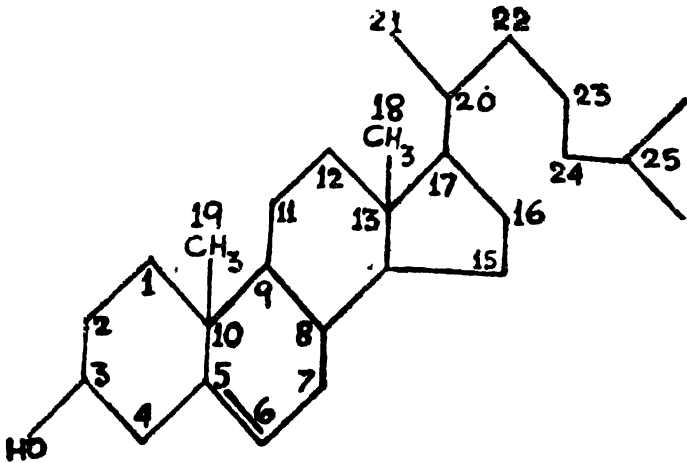
5-19 নং চিত্র : কোলেস্টারল।

রক্তকোষ ও পিত্তে কোলেস্টারলকে মুক্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। দেখা গেছে কলাকোষের সক্রিয়তার সংগে কোলেসটারলের উপস্থিতি অনেকটা সমানুপাতিক। ফসফোলিপিডের সংগে ইহা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে সহাবস্থান করে ও স্নায়ুতন্ত্রে অন্তরক পদার্থ (insulating substance) হিসাবে কাজ করে।

কোলেসটারলও একই সাইক্লো-পেন্‌টানো-ফেনান্‌থ্রীন নিউক্লিয়াস নিয়ে গঠিত। নিউক্লিয়াসটি বিজারিত অবস্থায় থাকে। 5 এবং 6 নম্বর পরমাণুতে একটি দ্বিবন্ধ (double bond) এবং 18 ও 19 নম্বর পরমাণুর সংগে একটি করে মিথাইল (methyl) গ্রুপ যুক্ত থাকে (5- 9 নং চিত্র)।

কোলেসটারল সাদা কেলাস পদার্থ। জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু ইথার, অ্যাল্‌কোহল, ক্লোরোফর্ম এবং স্নেহদ্রাবকে দ্রবণীয়। কেলাসের আকৃতি বিষমকোণী সমচতুর্ভুজ (rhombic) বা আয়তক্ষেত্রের মত। স্নেহদ্রব্যের সংগে যুক্ত হলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জল শোষণ করে এবং অবদ্রব সৃষ্টি করে।

কোষঝিল্লি, মিসেল, লাইপোসোম ও ইমালসোন

লিপিড সাধারণত জলে অদ্রবণীয় কারণ তাদের মধ্যে ননপোলার হাইড্রোকার্বন গ্রুপের প্রাধান্য বেশী। তবে, ফ্যাটি অ্যাসিড, কিছু ফসফোলিপিড এবং স্ফিংগোলিপিডের মধ্যে পোলার গ্রুপ বেশী সংখ্যায় রয়েছে। যার ফলে তারা অংশত জলে এবং অংশত ননপোলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। এসব অণু তাই তেল জলের আন্তরতলে (interfaces) বিন্যস্ত হয়। পোলার গ্রুপ জলে এবং ননপোলার গ্রুপ তেলে অবস্থান করে। এধরনের দুটো স্তরের বিন্যাসে জৈব ঝিল্লি বা কোষঝিল্লি গঠিত হয়, যা প্রায় 5nm পুরু হয়। যখন জলীয় মাধ্যমে পোলার লিপিড একটি সংকট মাত্রায় (critical concentration) অবস্থান করে তখন তারা মিসেল (micell) গঠন করে। মিসেলে পিত্ত লবণের উপস্থিতিতে ও পরিপাকলব্ধ পদার্থের সংমিশ্রণে যে মিশ্র মিসেল উৎপন্ন হয় তা ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে ফ্যাটের বিশোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলীয় মাধ্যমে লিপিডের দ্বিস্তরীয় বিন্যাসকে লাইপোসোম বলা হয় অর্থাৎ জলীয় মাধ্যমের একটি অংশকে ঘিরে দ্বিস্তরীয় লিপিডের যে গোলক সৃষ্টি হয় তাদের লাইপোসোম বলে। ইমালসোন জলীয় মাধ্যমে ননপোলার লিপিডের দ্বারা গঠিত বৃহদাকৃতি কণাবিশেষ। অবদ্রব বা ইমালসোন উৎপাদনকারী পদার্থের (যেমন, লেসিথিন) দ্বারা এটি স্থিতিশীলতা লাভ করে, কারণ এই পদার্থগুলো জলীয় মাধ্যম ও ননপোলার পদার্থের মধ্যে একটি পৃথক আবরণ সৃষ্টি করে।

প্রোটিন

Protein

প্রোটোপ্লাজমের উপাদান হিসাবে প্রোটিনের গুরুত্ব যতখানি খাদ্যহিসাবেও তার গুরুত্ব ততখানি। প্রোটিন একটি **জটিল নাইট্রোজেনঘটিত জৈবপদার্থ**। নাইট্রোজেন ছাড়া এতে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং কখনও কখনও গন্ধক বা ফসফরাস থাকে। প্রোটিনের মৌলিক উপাদান নিম্নরূপ: C—54%; H—7%; N—16%; O—22%; P (সব প্রোটিনে নয়)—1% এবং S (সব প্রোটিনে নয়)—0 6%।

বিভিন্ন প্রোটিনের সম্পূর্ণ আর্দ্রবিশ্লেষণ থেকে 20'ট অ্যামাইনোঅ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতিটি প্রোটিন অণু অসংখ্য অ্যামাইনোঅ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত। অ্যামাইনোঅ্যাসিড জৈব অম্লবিশেষ। প্রতিটি অ্যামাইনোঅ্যাসিডের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একটি **অ্যামাইনো গ্রুপ** ($-NH_2$) এবং একটি মুক্ত **কার্বোক্সিল গ্রুপ** ($-COOH$) থাকে। সাধারণত অ্যামাইনোঅ্যাসিডের স্থূলসংকেত $R—CH\ NH_2.COOH$। **প্রোটিন যোজকের** (peptide linkage) দ্বারা অ্যামাইনোঅ্যাসিড পরপর যুক্ত হয়ে বৃহৎ আণবিক ওজনসম্পন্ন প্রোটিন অণুর সৃষ্টি করে।

প্রোটিনের প্রকৃতি কোলয়েড। কিন্তু কিছু সংখ্যক প্রোটিনকে আবার কেলাসিত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রতিটি প্রোটিনের নির্দিষ্ট **সমতড়িৎ বিন্দু** isoelectric point) রয়েছে। প্রোটিন অধঃক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু অধঃক্ষেপণে অণুর ভেতরে কোন পরিবর্তন হয় না। শুধুমাত্র তঞ্চিত (coagulated) হলে অণুর অভ্যন্তরে পরিবর্তন ঘটে।

প্রোটিনের শ্রেণীবিন্যাস

Clssification of Proteins

প্রোটিনকে সাধারণত 3 ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা: (1) সরল প্রোটিন (simple protein), (2) সংযুক্ত প্রোটিন (conjugate protein) এবং (3) লব্ধ প্রোটিন (derived protein)।

1. **সরল প্রোটিন:** সরল প্রোটিন বিশুদ্ধ-প্রোটিন। আর্দ্রবিশ্লেষণে শুধুমাত্র অ্যামাইনোঅ্যাসিড ছাড়া এসব প্রোটিন থেকে অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না। অ্যালবুমিন (albumin), গ্লোবিউলিন (globulin), গ্লিয়াডিন (gliadin), প্রোটামিন (protamine) ইত্যাদি সরল প্রোটিনের উদাহরণ। নিম্নে সংক্ষেপে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

(a) **প্রোটামিন :** একে কোন কোন মাছের শুক্রাণুতে পাওয়া যায়। প্রোটামিন তীব্র ক্ষারধর্মী পদার্থ ; ইহা তাপে তঞ্চিত হয় না। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে ইহা দ্রবণীয়।

(b) **হিস্টোন** (Histone) **:** হিমোগ্লোবিন ও থাইমাস গ্রন্থিতে পাওয়া যায়। জল ও মৃদু খনিজ অম্লে দ্রবণীয়, ক্ষারধর্মী এবং লবণের উপস্থিতিতে ইহা তাপে তঞ্চিত হয়।

(c **অ্যালবুমিন :** ডিমের শ্বেত অংশ, সিরাম অ্যালবুমিন, দুধের ল্যাক্টো-অ্যালবুমিন (lactoalbumin) , পেশীর মায়োঅ্যালবুমিন (myoalbumin), গমের লিউকোসিন (leucosin) ইত্যাদি অ্যালবুমিনের উদাহরণ।

অ্যালবুমিন উভধর্মী। পাতিত জল ও লবণের দ্রবণে ইহা দ্রবীভূত হয়। অম্ল,-ক্ষারক ও তাপে ইহা তঞ্চিত হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট ও কপার সালফেটের সংপৃক্ত দ্রবণে অ্যালবুমিন অধঃক্ষিপ্ত হয়। .

(d) **গ্লোবিউলিন :** রক্তের সিরাম গ্লোবিউলিন, ডিমের পীতাভ ওভোগ্লোবিউ-লিন (ovoglobulin), চোখের কেলাসিত লেন্সের ক্রিস্টালিন (crystallin), প্লাজমার ফাইব্রিনোজেন ইত্যাদি এজাতীয় প্রোটিন।

গ্লোবিউলিন পাতিত জলে অদ্রবণীয়, তবে মৃদু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপে ও অম্লে ইহা তঞ্চিত হয়। অর্ধসংপৃক্ত অ্যামোনিয়াম সালফেট বা পূর্ণসংপৃক্ত ম্যাগনেসিয়াম সালফেটে ইহা অধঃক্ষিপ্ত হয়।

(e) **গ্লিয়াডিন :** বার্লি, গম, ভুট্টা প্রভৃতিতে গ্লিয়াডিন পাওয়া যায়। মৃদু অ্যালকোহলের দ্রবণে ইহা দ্রবীভূত হয়।

(f) **স্ক্লেরোপ্রোটিন** (Scleroprotein) **:** প্রাণীর বহিরাবরণ ও সংযোগ-রক্ষাকারী কলার ইহা মুখ্য উপাদান। কেশ, নখ, শিং, ক্ষুর ইত্যাদির কেরাটিন, স্থিতিস্থাপক কলা, তরুণাস্থি, সন্ধিবন্ধনী ইত্যাদির ইলাস্টিন, কংকাল ও তন্তুময় কলার কোলাজেন, দাঁত ও অস্থির ওসেইন (ossein) ইত্যাদি এজাতীয় প্রোটিনের উদাহরণ।

পাতিত জল বা মৃদু লবণের দ্রবণে ইহা অদ্রবণীয়।

(g) **গ্লুটেলিন :** গম, চাল, (**ওরিজেনিন**—oryzenin) ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। ইহা লঘু অম্ল ও ক্ষারকে দ্রবণীয়, কিন্তু প্রশমিত দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না। তাপে ইহা তঞ্চিত হয়।

2. **সংযুক্ত প্রোটিন :** সরল প্রোটিনের সংগে প্রসথেটিক মূলকের সংযুক্তিতে সংযুক্ত প্রোটিন উৎপন্ন হয়। **ফসফোপ্রোটিন** (phosphoprotein),

গ্লাইকোপ্রোটিন (glycoprotein), নিউক্লিওপ্রোটিন (nucleoprotein), ক্রোমোপ্রোটিন (chromoprotein), লাইপোপ্রোটিন (lipoprotein), মেটালোপ্রোটিন (metalloprotein) প্রভৃতি সংযুক্তপ্রোটিনের উদাহরণ। নিম্নে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

(a) **ফস্ফোপ্রোটিন:** ফস্ফরিক অ্যাসিডের সংগে প্রোটিনের অণু সংযুক্ত হয়ে এজাতীয় প্রোটিন উৎপন্ন করে। ফস্ফোপ্রোটিন অম্লধর্মী, জলে অদ্রবণীয় কিন্তু ক্ষারকে দ্রবণীয়। ক্ষারকীয় দ্রবণে তাপপ্রয়োগে ইহা তঞ্চিত হয় না। ডিমের পিতাভ ভাইটেলিন (vitellin), দুধের ক্যাসিনোজেন (caseinogen) প্রভৃতি এর উদাহরণ।

(b) **গ্লাইকোপ্রোটিন:** কার্বোহাইড্রেটের সংগে প্রোটিনের সংযুক্তিতে গ্লাইকোপ্রোটিন উৎপন্ন হয়। কার্বোহাইড্রেট জটিল মিউকোপলিস্যাকারাইড (mucopolysaccharide) হিসাবে প্রোটিনে অবস্থান করে। ইহা তাপে তঞ্চিত হয় না। শ্লেষ্মাঝিল্লি ও অন্যান্য গ্রন্থির শ্লেষ্মাক্ষরণে এজাতীয় প্রোটিন দেখতে পাওয়া যায়।

(c) **নিউক্লিওপ্রোটিন:** প্রোটিনের সংগে নিউক্লিক অ্যাসিডের (nucleic acid) সংযুক্তিতে নিউক্লিওপ্রোটিন সৃষ্ট হয়। নিউক্লিক অ্যাসিডে ফস্ফরিক অ্যাসিড, রাইবোজ শর্করা এবং পিউরিন ও পিরাইমিডিন বেস থাকে।

(d) **ক্রোমোপ্রোটিন:** প্রোটিন ও অপর কোন রঞ্জক পদার্থ একত্রে ক্রোমোপ্রোটিন গঠন করে। রক্তের হিমোগ্লোবিন, রেটিনা বা অক্ষিপটের রডোপ্সিন (rhodopsin), সাইটোক্রোম (cytochrome), ফ্ল্যাভোপ্রোটিন (flavoprotein) প্রভৃতি এজাতীয় প্রোটিনের উদাহরণ।

(e) **লাইপোপ্রোটিন:** ফস্ফোলিপিডের সংগে প্রোটিনের সংযুক্তিতে লাইপোপ্রোটিন উৎপন্ন হয়। প্লাজমা, রক্তকোষ, ডিম, দুধ, কোষের নিউক্লিয়াস, কোষঝিল্লি ইত্যাদিতে লাইপোপ্রোটিন পাওয়া যায়।

(f) **মেটালোপ্রোটিন:** লোহা, তামা, ম্যাগ্নেসিয়াম, ম্যাংগানিজ, কোবাল্ট ইত্যাদি ধাতুর সংগে প্রোটিনের সংযুক্তিতে মেটালোপ্রোটিনের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন জাতের এন্‌জাইমে মেটালোপ্রোটিনের সাক্ষাৎ মেলে।

3. **লব্ধপ্রোটিন:** সরল বা সংযুক্ত প্রোটিনের আর্দ্রবিশ্লেষণে লব্ধপ্রোটিন উৎপন্ন হয়। আর্দ্রবিশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন লব্ধপ্রোটিন উৎপন্ন হয়। যথা: প্রোটিন→প্রোটিন [illegible]

→প্রোটিওস (proteose)→পেপ্টোন (peptone)→পেপটাইড (peptide)।
পেপ্টাইড থেকে পরিশেষে অ্যামাইনোঅ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

প্রোটিন কাঠামোর বণ্ড
Bonds of Protein Structure

প্রোটিন কাঠামোর স্থিতিশীলতা বজায় রাখে 2 প্রকারের দৃঢ় বণ্ড (পেপটাইড ও ডাইসালফাইড) এবং 2 ধরনের দুর্বল বণ্ড (হাইড্রোজেন ও হাইড্রোফোবিক)।

1. **পেপটাইড বণ্ড** (Peptide Bonds): প্রোটিনের প্রাথমিক কাঠামোয় L-α-অ্যামাইনো অ্যাসিডসমূহ α-পেপটাইড বণ্ডের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হয়। একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইনো গ্রুপের সংগে অপর অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ যুক্ত হয়ে পেপটাইড বণ্ড গঠন করে।

2. **ডাইসালফাইড বণ্ড** (Disulfide Bond): দুটো সমান্তরাল পেপটাইড চেনের সিসটেইন (cysteine) স্থিত সালফহাইড্রেল গ্রুপ (—SH) পরস্পর সংযুক্ত হয়ে ডাইসালফাইড বণ্ড গঠন করে। এই বণ্ড তুলনামূলকভাবে অধিকতর স্থিতিশীল। নিচের দুটো পেপটাইড চেন ডাইসালফাইড বণ্ডের দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে।

```
 \                              /
 NH                            NH
 /                              \
 C=O                            C=O
 \                              /
 CH—CH2—S—S—CH2—CH
 /                              \
 NH                             NH
 \                              /
 C=O                            C=O
 /                              \
```
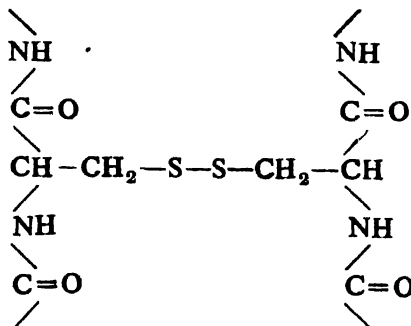
3. **হাইড্রোজেন বণ্ড** (Hydrogen Bonds): বিভিন্ন পেপটাইড বণ্ডের নাইট্রোজেন ও কার্বনীল অক্সিজেনের অন্তর্বর্তী স্থানে হাইড্রোজেন পরমাণুর অংশগ্রহণে হাইড্রোজেন বণ্ড উৎপন্ন হয়। প্রতিটি হাইড্রোজেন বণ্ডই খুব দুর্বল হয়। প্রোটিনের কাঠামোয় এদের উপস্থিত খুব বেশী বলে এদের গুরুত্ব রয়েছে। প্রোটিন অপ্রাকৃত (denatured) হলে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন ও

হাইড্রোফোবিক বণ্ডই ভেংগে যায়। পেপটাইড ও ডাইসালফাইড বণ্ডের কোন পরিবর্তন হয় না।
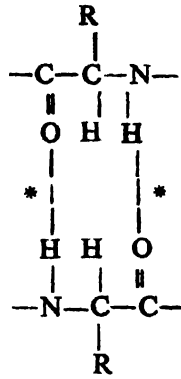
5-20 নং চিত্র : *হাইড্রোজেন বণ্ড।

4. **হাইড্রোফোবিক বণ্ড** (Hydrophobic Bonds) : প্রোটিনে প্রশমিত অ্যামাইনো অ্যাসিডের ননপোলার পার্শ্বচেন পরস্পর সন্নিকটে এলে যে আকর্ষ বলের সৃষ্টি হয় তাকে হাইড্রোফোবিক বণ্ড বলা হয়। প্রোটিনের কাঠামো বজায় রাখতে এর গুরুত্ব সমধিক।

5. **ইলেক্ট্রোস্টেটিক বণ্ড** (Electrostatic Bonds) : বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের পার্শ্বচেনে বিপরীত ধর্মী আধানযুক্ত গ্রুপের মধ্যে যে সল্ট বণ্ড (salt bonds) উৎপন্ন হয় তাকে ইলেক্ট্রোস্টেটিক বণ্ড বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ : লাইসিনের ইপসিলোন-অ্যামাইনো গ্রুপে শারীরবৃত্তীয় PH-এ একটি ধনাত্মক আধান (+1) থাকে এবং অ্যাসপারটিক অ্যাসিডের কার্বক্সিল গ্রুপে একটি ঋণাত্মক আধান (−1) থাকে। অতএব এই দুটো গ্রুপ পরস্পর স্থিতিতড়িৎ আকর্ষণে মিথষ্ক্রিয়া ঘটাতে পারে।

প্রোটিনের কাঠামো বিন্যাস

Orders of Protein Structure

প্রোটিনের কাঠামো বিন্যাসকে 4 ভাগে বিভক্ত করা যায় : (1) প্রথম পর্যায়-ভুক্ত কাঠামো (primary structure), (2) দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত কাঠামো (secondary structure), (3) তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত কাঠামো (tertiary structure) এবং (4) চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত কাঠামো (quarternary structure)।

1. **প্রথম পর্যায়ভুক্ত কাঠামো** (Primary Structure) : পলিপেপটাইড চেনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পর্যায়ক্রমিক সরলরেখ বিন্যাসকে প্রোটিনের প্রথম পর্যায়ভুক্ত কাঠামো হিসাবে গণ্য করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোন পলিপেপ-

টাইড চেনে সবকটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের পর্যায়ক্রম, রাসায়নিক গঠন ও সংখ্যা জানা থাকলে তার প্রথম পর্যায়ের কাঠামোও নির্ধারিত হয়।

2. **দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত কাঠামো** (Secondary Structure) : পলিপেপটাইড চেন ভাঁজ হয়ে যখন কুণ্ডলীকৃতভাবে ডাইসালফাইড ও হাইড্রোজেন বণ্ডের দ্বারা আবদ্ধ হয় তখন তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত কাঠামো হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

3. **তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত কাঠামো** (Tertiary Structure) : প্রোটিনের কুণ্ডলীকৃত বা পেছাল চেন পরস্পর বিন্যস্ত হয়ে যখন নির্দিষ্ট স্তর বা তন্তু হিসাবে অবস্থান করে তখন তাকে তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত কাঠামো হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রোটিনের এই কাঠামো দুর্বল আন্তর-আণবিক বল (যেমন, হাইড্রোজেন বণ্ড) বা ভ্যানডার ওয়ালস্ বলের (Van der Waals forces) দ্বারা সুরক্ষিত হয়। যেমন, টব্যাকো মোজাইক ভাইরাস তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত কাঠামোর অধিকারী যা দেখতে অনেকটা শস্যদানার শাঁসের মত।

4. **চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত কাঠামো** (Quarternary Structure) : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত কাঠামো ছাড়াও প্রোটিনের গঠনে চতুর্থ আরেক ধরণের কাঠামো-বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় যাকে প্রোটিনের চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত কাঠামো নামে অভিহিত করা হয়। এই কাঠামোয় বহু মনোমার একক (monomeric units), যাদের কোনটা প্রথম পর্যায়ভুক্ত, কোনটা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত আবার কোনটা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত কাঠামোর অধিকারী, একসংগে সংযুক্ত হতে পারে। সদৃশ বা বিসদৃশ এসব উপবিভাগের সমন্বয়ে যে প্রোটিন কাঠামো গঠিত হয় তাকে চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত কাঠামো বলা হয়।

অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino Acids)

প্রোটিনের আর্দ্রবিশ্লেষণ থেকে প্রায় 20টি α-অ্যামাইনো অ্যাসিড (α-amino acids) পাওয়া যায়। α-অ্যামাইনো অ্যাসিডের α-কার্বন পরমাণুতে অ্যামাইনো ($-NH_2$) ও কার্বোক্সিল ($-COOH$) গ্রুপ থাকে।

$$\begin{array}{c} H \\ | \\ R-C_{\alpha}-NH_2 \\ | \\ COOH \end{array}$$
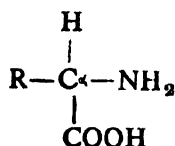
α-অ্যামাইনো অ্যাসিড

গ্লাইসিন ছাড়া প্রতিটি অ্যামাইনো অ্যাসিডে অন্ততঃপক্ষে একটি করে অপ্রতিসম কার্বন পরমাণু (asymmetric carbon atom) থাকে। অ্যামাইনো অ্যাসিড তাই আলোক সক্রিয় (optically active) পদার্থ।
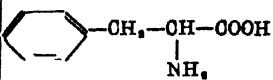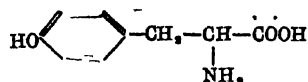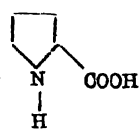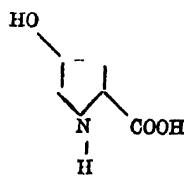
পার্শ্বচেনের গঠনের উপর ভিত্তি করে অ্যামাইনো অ্যাসিডকে মোট 7 ভাগে বিভক্ত করা যায়। 7নং তালিকায় অ্যামাইনো অ্যাসিডের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে।

7 নং তালিকা ঃ অ্যামাইনোঅ্যাসিডের শ্রেণীবিন্যাস

শ্রেণী (Group)	সংযুক্তি-সংকেত (structural formula) রাসায়নিক নাম (chemical name)
1. অ্যালিফ্যাটিক পার্শ্ব চেনসম্পন্ন (with Aliphatic side chain) (a) গ্লাইসিন (glycine)	$H-CH(NH_2)-COOH$ অ্যামাইনো অ্যাসেটিক অ্যাসিড (amino acetic acid)
(b) অ্যালানিন (alanine)	$CH_3-CH(NH_2)-COOH$ আলফা-অ্যামাইনো প্রপিওনিক অ্যাসিড (α-amino propionic acid)
(c) ভ্যালিন (valine)	$(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$ আলফা-অ্যামাইনো অ্যাইসোভ্যালেরিক অ্যাসিড (α-aminoisovaleric acid)
(d) লিউসিন (leucine)	$(CH_3)_2CH-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ α-অ্যামাইনো অ্যাইসোক্যাপরোইক অ্যাসিড (α-aminoisocaproic acid)
(e) আইসোলিউসিন (isoleucine)	$CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH(NH_2)-COOH$ α-অ্যামাইনো β-মিথাইল-ভ্যালেরিক অ্যাসিড (α-amino β-methyl-valeric acid)

শ্রেণী	সংযুক্তি সংকেত ও রাসায়নিক নাম
2. হাইড্রোক্সিল পার্শ্ব চেন-সম্পন্ন side chain with OH group)	
(a) সেরিন (serine)	$CH_2-CH-COOH$ (OH on CH_2, NH_2 on CH) ∝-অ্যামাইনো β হাইড্রোক্সি প্রপিওনিক অ্যাসিড (∝-amino β-hydroxy propionic acid)
(b) থ্রিওনিন (threonine)	$CH_3-CH-CH-COOH$ (OH on first CH, NH_2 on second CH) ∝-অ্যামাইনো β-হাইড্রোক্সি-n বিউটারিক অ্যাসিড (∝-omino β-hydroxy-n butyric acid)
3. সালফার পরমাণু পার্শ্ব-চেনসম্পন্ন (side chain with sulfur atoms)	
(a) সিসটেইন (systeine)	$CH_2-CH-COOH$ (SH on CH_2, NH_2 on CH) ∝-অ্যামাইনো β-মারক্যাপটো প্রপিওনিক অ্যাসিড (∝-amino β-mercapto propionic acid)
(b) মেথিওনিন (methonine)	$CH_2-CH_2-CH-COOH$ ($S-CH_3$ on first CH_2, NH_2 on CH) ∝-অ্যামাইনো γ-মিথাইলথাও-n-বিউটারিক অ্যাসিড (∝-amino γ-mithylthio-n-butyric acid)
4. অ্যাসিডিক গ্রুপ পার্শ্ব-চেন-সম্পন্ন (side chains with acidic groups)	
(a) অ্যাসপারটিক অ্যাসিড (Aspartic acid)	$HOOC-CH_2-CH-COOH$ (NH_2 on CH) ∝-অ্যামাইনো সাকসিনিক অ্যাসিড (amino succinic acid)
(b) গ্লুটামিক অ্যাসিড (glutamic acid)	$HOOC-CH_2-CH_2-COOH$ (NH_2 on second CH_2) 2-অ্যামাইনো গ্লুটারিক অ্যাসিড (2-amino glutaric acid)

শ্রেণী	সংক্ষিপ্ত সংকেত ও রাসায়নিক নাম
5. ক্ষারকীয় গ্রুপ পার্শ্ব চেন-সম্পন্ন (side chains with basic groups)	
(a) লাইসিন (lysine)	$CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH$, প্রথম CH_2-তে NH_2 যুক্ত 2, 6-ডাই অ্যামাইনো হেক্সানোইক অ্যাসিড (2, 6-diaminohexanoic acid)
(b) আর্জিনিন (arginine)	$H-N(C(=NH)NH_2)-CH_2-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ 2-অ্যামাইনো-5-গ্যুয়ানিডোভ্যালেরিক অ্যাসিড (2-amino-5-guanidovaleric acid)
(c) হিস্টিডিন (histidine)	NH ⟨ইমিডাজোল বলয়⟩ N — $CH_2-CH(NH_2)-COOH$ 2-অ্যামাইনো-1 H-ইমিডাজোল-4-প্রোপানোইক অ্যাসিড (2-amino-1 H-imidazole-4-propanoic acid)

শ্রেণী	সংক্ষিপ্ত সংকেত ও রাসায়নিক নাম
6. অ্যারোম্যাটিক বলয় সম্পন্ন (with aromatic ring)	
(a) ফেনাইল অ্যালানিন (Phenylalanine)	$C_6H_5-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ 2-অ্যামাইনো-3-ফেনাইলপ্রোপানোইক অ্যাসিড (2-amino-3-phenylpropanoic acid)
(b) টাইরোসিন (tyrosine)	$HO-C_6H_4-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ 2-অ্যামাইনো-3-(4-হাইড্রোক্সিফেনাইল) প্রোপানোইক অ্যাসিড
(c) হিস্টিডিন (উপরে বর্ণিত)	
7. ইমিনো অ্যাসিড (Imino Acid)	
(a) প্রোলাইন (Proline)	(pyrrolidine ring: N–H, COOH) 2-পাইরোলিডিন কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড
(b) 4-হাইড্রক্সি প্রোলাইন (4-hydrox proline)	(pyrrolidine ring: HO, N–H, COOH) 4-হাইড্রোক্সি-2-পাইরোলিডিন কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড

অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড (Essential aminoacids) : কিছু-সংখ্যক অ্যামাইনোঅ্যাসিড দেহের অভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হতে পারে না, অথচ তারা দেহের পক্ষে অপরিহার্য। এসব অ্যামাইনোঅ্যাসিডকে বাহির থেকে গ্রহণ করতে হয়। তাদের তাই **অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড** নামে অভিহিত করা হয়। **রোজ** (Rose) এদের ৪ ভাগে বিভক্ত করেছেন যথা : (a) **ট্রিপ্টোফান** (tryptophan), (b) **ফেনাইল অ্যালানিন** (phenylalanine), (c) **লাইসিন** (lysine), (d) **থ্রিওনিন** (threonine), (e) **ভ্যালিন** (valine), (f) **মিথিওনিন** (methionine), (g) **লিউসিন** (leucine) **এবং** (h) **আইসোলিউসিন** (isoleucine)।

প্রোটিনের কতকগুলো বিশেষ ধর্ম

Some Important Properties of Protein

প্রোটিনের বিশেষ ধর্মাবলী নিম্নে বিবৃত হল :

1. **জুইটার আয়ন ও সমতড়িৎ বিন্দু** (Zwitter ions and isoelectric point) : প্রতিটি প্রোটিনে অন্ততঃপক্ষে একটি কার্বক্সিল ($-COOH$) ও একটি অ্যামাইনো ($-NH_2$) গ্রুপ থাকে। প্রোটিন তাই **উভধর্মী পদার্থ** (amphoteric substance)। দেখা গেছে কেলাসিত অবস্থায় অ্যামাইনো-অ্যাসিডের এই দুটো গ্রুপ আয়নিত অবস্থায় থাকে এবং **দ্বিমেরু আয়ন** (bipolar ion) বা **জুইটার আয়ন** গঠন করে। এই অবস্থায়-COOH গ্রুপের H^+ আয়ন-NH_2 গ্রুপে স্থানান্তরিত হয়। এই পদ্ধতিকে আভ্যন্তরীণ **লবণ** (internal salts) উৎপাদন বলা হয়। অম্লদ্রবণে প্রোটিন তাই ধনাত্মক।

$$\underset{\text{R}}{NH_3^+-\underset{|}{CH}-COOH} \underset{H^+}{\rightleftharpoons} \underset{\text{R}}{NH_3^+-\underset{|}{CH}-COO^-} \underset{H^+}{\rightleftharpoons} \underset{\text{R}}{NH_2\underset{|}{CH}-COO^-}$$
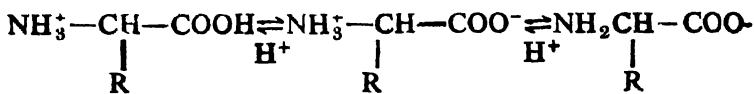
ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত　　　　জুইটার আয়ন　　　　ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত

একটা নির্দিষ্ট pH মানে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন পরস্পর সমান থাকে। প্রোটিন এই অবস্থায় তড়িৎক্ষেত্রে (electrical field) গতিশীল নয়। এই নির্দিষ্ট pH বিন্দুকে প্রোটিনের **সমতড়িৎ বিন্দু** (isoelectric point) বলা হয়। সমতড়িৎ বিন্দু বিভিন্ন প্রোটিনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়।

2. **ইলেক্ট্রোফরেসিস** (Electrophoresis) : তড়িৎক্ষেত্রে প্রোটিন অণুর ধনাত্মক মেরু (cathode) বা ঋণাত্মক মেরুর (anode) দিকে বিচলনকে **ইলেক্ট্রোফরেসিস** বলা হয়। এই ধর্মকে ব্যবহার করে **টিসেলিয়াস**

---

1. পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থা অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(Tiselius) বিভিন্ন প্রোটিন অণুকে পৃথক করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ক্ষারকীয় বাফার দ্রবণে (pH 8·6) প্রোটিন ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত এবং তড়িৎক্ষেত্রে ধনাত্মক মেরু বা ক্যাথোডের দিকে এগিয়ে যায়। বিভিন্ন প্রোটিনের আণবিক ওজন বিভিন্ন হওয়ায় তাদের উপরিস্থিত আধানের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। ফলে তড়িৎক্ষেত্রে তাদের গতিও ভিন্ন হয়।

টিসেলিয়াসের পদ্ধতিকে আরো সহজতর করে পেপার ইলেক্‌ট্রোফরেসিস (paper electrophoresis) পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষারকীয় বাফার দ্রবণে সিক্ত এক ফালি ফিলটার পেপারকে দুটো গ্লাস্‌প্লেটের মধ্যে রাখা হয় (5-21নং চিত্র)। পেপারের মুক্ত অংশ দু'টোকে দুপাশের বাফার
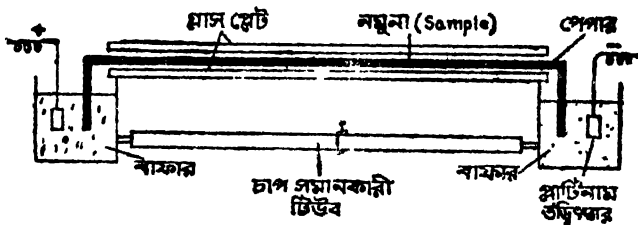
5-21 নং চিত্র : ইলেকট্রোফরেসিস।

দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। প্রতিটি বাফার দ্রবণে একটি করে প্লাটিনাম তড়িৎদ্বার (electrode) যুক্ত করা হয়। এরপর তড়িৎপ্রবাহ চালনা করলে প্রোটিনের অণুগুলো ধনাত্মক মেরুর দিকে এগিয়ে যায়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর পেপারটিকে তুলে শুকিয়ে নেওয়া হয় এবং সামান্য পরিমাণ ব্রোমো-ফেনল ব্লু (bromophenol blue) মিশ্রিত মারকিউরিক ক্লোরাইডের (mercuric chloride) অ্যালকোহলীয় দ্রবণে ডুবান হয়। পেপারটিকে পরে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। সাদার মধ্যে প্রোটিনের ডোরাগুলো (band) নীলবর্ণ ধারণ করে। ডোরার দূরত্ব ও আণবিক ওজনের উপর ভিত্তি করে প্রোটিনকে এরপর আলাদা আলাদাভাবে সনাক্ত করা যায় (5-22নং চিত্র)।
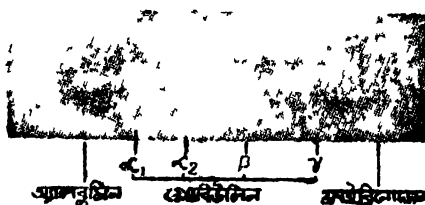
5-22 নং চিত্র

3. ক্রোমাটোগ্রাফি (Chromatography) : বিভিন্ন দ্রব্যকে

অ্যামাইনোঅ্যাসিডের দ্রবণ-ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাদের এই আপেক্ষিক দ্রবণ-ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে একফালি ফিলটার কাগজে তাদের পৃথক করা সম্ভবপর হয়। অ্যামাইনোঅ্যাসিড পৃথকীকরণের এই পদ্ধতির নাম পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি (**paper chromatography**)।
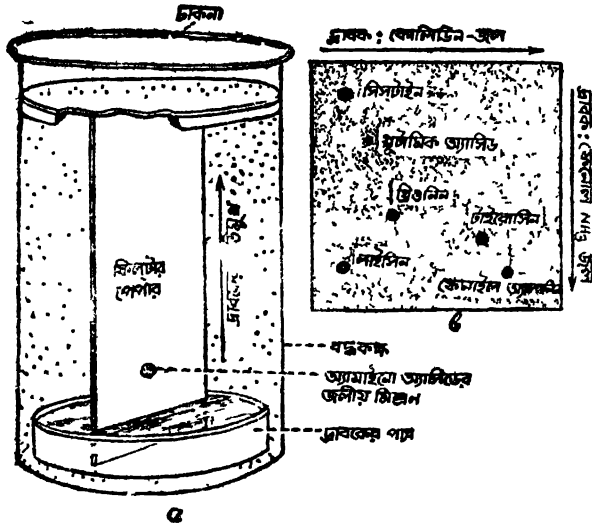
5-23 নং চিত্র : (a) উর্ধ্বগ পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি, (b) দ্বিমাত্রক পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি।

একফালি ফিলটার পেপারে অ্যামাইনোঅ্যাসিডের একবিন্দু জলীয় মিশ্রণকে ছাড়া হয়। এরপর পেপারটিকে এমনভাবে একটি বদ্ধ কক্ষে এঁটে দেওয়া হয় যাতে ফিলটার-ফালির নিম্নাংশ জলের সংগে সংপৃক্ত একটি জৈব দ্রাবকে (যেমন অ্যালকোহল) ডুবে থাকে (5-23 নং চিত্র)। জৈব দ্রাবক ফিলটার পেপার বেয়ে উপরে অ্যামাইনোঅ্যাসিডযুক্ত জলবিন্দুকে স্পর্শ করে এবং পরিশেষে তাকে অতিক্রম করে আরও উর্ধ্বদিকে আরোহণ করে। যেসব অ্যামাইনোঅ্যাসিড জলের চেয়ে জৈব দ্রাবকে অধিকতর দ্রবণীয়, তারা দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়ে তার সংগেই উপর দিকে উঠতে থাকে এবং জলে দ্রবণীয় অ্যামাইনোঅ্যাসিড পেছনে পড়ে থাকে। দেখা গেছে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রতিটি অ্যামাইনোঅ্যাসিড একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

ফিলটার পেপারকে এরপর সরিয়ে এনে শুকনো করা হয় এবং তার উপর নিনহাইড্রিন (ninhydrin) ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই রাসায়নিক পদার্থটি অ্যামাইনোঅ্যাসিডের সংগে বিক্রিয়া ঘটিয়ে তাকে বর্ণযুক্ত করে তোলে, ফলে তার

অবস্থানকে সহজেই সনাক্ত করা যায়। যেহেতু প্রতিটি অ্যামাইনোঅ্যাসিড একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে, সেহেতু একটি পরিচিত বিন্দুর সংগে তুলনা করে প্রাথমিক ভাবে তাদের সনাক্ত করা সম্ভবপর হয়।

যখন অধিকসংখ্যক অ্যামাইনোঅ্যাসিড একত্রে সংমিশ্রিত থাকে, তখন একটি বৃহৎ ফিলটার পেপারের একটি নির্দিষ্ট প্রান্তে ক্রোমাটোগ্রাফ নেওয়া হয়। পেপারটিকে এরপর সরিয়ে এনে শুকোন হয় এবং 90° কোণে ঘুরিয়ে পৃথক একটি দ্রাবকে রেখে পুনরায় ক্রোমাটোগ্রাফ নেওয়া হয়। অ্যামাইনোঅ্যাসিডকে এভাবে পৃথকীকরণের নাম **দ্বিমাত্রিক ক্রোমাটোগ্রাফি** (two dimentional chromatography—5-23নং চিত্র)।

প্রোটিনের সাধারণ বিক্রিয়াসমূহ
General Reactions of Proteins

প্রোটিনের সাধারণ বিক্রিয়াসমূহ নিম্নে আলোচিত হল:

1. **অধঃক্ষেপ** (precipitation): দ্রবণ থেকে প্রোটিনকে নানাপ্রকার বিকারকের (reagents) সাহায্যে অধঃক্ষিপ্ত করা যায়। বিকারকের মধ্যে প্রধান: (i) অ্যালকোহল, ii) প্রশমিত লবণ (যেমন, অ্যামোনিয়াম লবণ), (iii) তীব্র খনিজ অম্ল (যেমন, নাইট্রিক অ্যাসিড), (iv) গুরুধাতুর লবণ (salt of heavy metals), (v) অ্যালক্যালোয়েডীয় বিকারক (alkaloidal reagent) যথা: ফসফোটাংগস্টিক অ্যাসিড (phosphotungstic acid), পিক্রিক অ্যাসিড় (picric acid), ট্যানিক অ্যাসিড (tannic acid), সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড (sulphosalicylic acid) ইত্যাদি।

2. **তাপ তঞ্চন** (Heat coagulation): উত্তাপে অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিন অণুর অভ্যন্তরে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই পরিবর্তনকে তঞ্চন বলা হয়। তঞ্চনের ফলে তারা অপ্রাকৃত (denatured) প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়। অপ্রাকৃত প্রোটিনের দ্রবণকে ফুটালে তাদের মধ্যে অধঃক্ষেপণের প্রবণতা দেখা যায়, কারণ সমতড়িৎ বিন্দুতে অপ্রাকৃত প্রোটিন অদ্রবণীয় হয়।

3. **বর্ণবিক্রিয়া** (Colour reactions): প্রোটিনের অনেকগুলো বর্ণ-বিক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে। তার মধ্যে অধিকাংশ পরীক্ষাই কোন নির্দিষ্ট অ্যামাইনো-অ্যাসিড মূলকের (radicals) উপর নির্ভরশীল। নিম্নে পরীক্ষাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(a) **বাইউরেট পরীক্ষা** (Biuret test): যেসব প্রোটিনের অন্তত-

পক্ষে দু'টো প্রোটিন গ্রুপ (—CO—NH—) থাকে, তারাই এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। একটা টেস্ট-টিউবে প্রোটিনের দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে প্রায় সমপরিমাণ গাঢ় NaOH এর দ্রবণ ঢালা হয়। মিশ্র দ্রবণকে এরপর নেড়ে তার মধ্যে এক কি দু'ফোটা 1% কপার সালফেট দ্রবণ মেশালে একটি পরিষ্কার বেগুনী বর্ণের আবির্ভাব ঘটে। পেপটোনের ক্ষেত্রে ফ্যাকাশে লালের (pink) উদ্ভব হয়।

(b) **জ্যানথোপ্রোটিন বিক্রিয়া** (Xanthoprotein reaction): যে সব প্রোটিনে ফেনাইল গ্রুপ (phenyl group) বর্তমান তারা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। একটা টেস্টটিউবে খানিকটা প্রোটিনের দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে কয়েক ফোটা তীব্র নাইট্রিক অ্যাসিড মেশান হয়। দ্রবণে সাদা, অধঃক্ষেপ পড়ে, যাকে উত্তপ্ত করলে হলুদবর্ণ ধারণ করে এবং অংশত দ্রবীভূত হয়ে দ্রবণকে হলদে করে তোলে। এই দ্রবণকে এরপর ঠাণ্ডা করে তাতে NaOH মেশালে হলুদবর্ণ কমলাবর্ণে পরিবর্তিত হয়।

(c) **মিলোনের বিক্রিয়া** (Millon's reaction): যে সব প্রোটিনে অ্যামাইনোঅ্যাসিড টাইরোসিন (tyrosin) থাকে তারাই মিলোনের বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। একটা টেস্টটিউবে খানিকটা প্রোটিনের দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে কয়েক ফোটা মিলোনের বিকারক (reagent) মেশালে প্রথমে সাদা অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। উত্তাপে এই অধঃক্ষেপ পরিবর্তিত হয়ে ইটের বর্ণ ধারণ করে। পেপটোনের ক্ষেত্রে অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়ে দ্রবণকে লাল করে তোলে।

(d) **এডামকুইজের বিক্রিয়া** (Adamkiewiez's reaction): অ্যামাইনোঅ্যাসিড ট্রিপটোফ্যানের (tryptophan) উপস্থিতিতে প্রোটিন এই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। একটি টেস্টটিউবে প্রোটিনের দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে বেশী পরিমাণে গ্লাসিয়েল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (glacial acetic acid) মেশান হয়। মিশ্রণকে এরপর উত্তপ্ত করে পরে ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয়। ঠাণ্ডা টেস্ট-টিউবের গা বেয়ে গাঢ় সালফুরিক অ্যাসিড ঢালা হয়। দুটো তরলের সংযোগ-স্থলে ঈষৎ বেগুনীবর্ণের (purple) আবির্ভাব ঘটে।

ভাইরাস
Virus

ভাইরাস একপ্রকার **নিউক্লিওপ্রোটিন**। এরা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। একাধারে এরা সজীব ও নির্জীব। অর্থাৎ জড় ও জীবনের

সীমারেখায় এদের অবস্থান। প্রাণীর মত এদের যেমন বৃদ্ধি ও প্রজননক্ষমতা রয়েছে, তেমনি বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে (নিউক্লিওপ্রোটিন) কেলাসিত অবস্থায় এদের পাওয়া যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জা (influenza), পীতজ্বর (yellow fever), হাম (measles) প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বাহক এই ভাইরাস। তামাক পাতার মোজাইক (mosaic) রোগের জন্য দায়ী বলে এদের **টোবাকো মোজাইক ভাইরাস** (tobaco mosaic virus) বলা হয়।

ভাইরাসের আণবিক ওজন প্রায় 60,000,000 এবং সমতড়িৎ বিন্দু pH 3·49। কেলাসিত নিউক্লিওপ্রোটিন ভাইরাসে RNA-এর পরিমাণ 5 শতাংশ। RNA শৃঙ্খল (spiral) আকারে অবস্থান করে এবং তাদের বাইরে প্রোটিনের আবরণ থাকে। এই প্রোটিন-আবরণ RNA-কে রক্ষা করে। RNA-ই সংক্রামক রোগের বাহক।

উদ্ভিদজাত ভাইরাস শুধুমাত্র RNA এবং প্রাণীজ ভাইরাস RNA অথবা DNA দ্বারা গঠিত। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে 1 শতাংশ RNA, পক্ষাঘাত রোগের ভাইরাসে 30 শতাংশ RNA এবং গোবীজ ভাইরাসে (Vaccinia) 6 শতাংশ DNA থাকে। উদ্ভিদজাত ভাইরাস থেকে প্রাণীজ ভাইরাসের গঠন বেশী জটিল।

এন্‌জাইম
ENZYME

1. **অজৈব অনুঘটক ও এন্‌জাইম** (Inorganic catalyst and enzyme) : যে সব পদার্থ কোন চলমান রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত করে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে তাদের **অনুঘটক** (catalyst) বলা হয়। অনুঘটক রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করায় না বা উভয়মুখী (reversible) বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থাকে প্রভাবিত করে না। 1825 সালে **বার্জেলিয়াস** (Berzelius) লক্ষ্য করেন, জীবন্ত কোষের দ্বারা উৎপন্ন কিছু সংখ্যক পদার্থও অজৈব অনুঘটকের মতই ক্রিয়া করে। 1875 সালে কুনে (Kuhne) তাদের নাম দিলেন **এন্‌জাইম**। **এন্‌জাইমও এক ধরনের জৈব অনুঘটক, যাদের জীবন্ত কোষ উৎপন্ন করে, কিন্তু তাদের সক্রিয়তা জীবন্ত কোষের উপর নির্ভর করে না।**

অজৈব অনুঘটকের সংগে এন্‌জাইমের পার্থক্য হ'ল : (1) এন্‌জাইম জৈবপদার্থ, প্রোটিন ধর্মী এবং কোলয়েড প্রকৃতির : (2) নির্দিষ্ট যৌগকের

(substrates) উপর ক্রিয়া করে তারা নির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটায় ; (3) উত্তাপে সহজেই তারা বিনষ্ট হয় ; (4) নির্দিষ্ট pH সীমার মধ্যে তারা সক্রিয়, (5) অম্ল বা ক্ষারকের দ্বারা তারা বিনষ্ট হয় এবং (6) দৈহিক তাপমাত্রায় তারা কাজ করে।

2. **এনজাইমের রাসায়নিক প্রকৃতি** (Chemical nature of enzyme) ঃ এনজাইমের রাসায়নিক প্রকৃতি নিম্নরূপ ঃ (1) এনজাইমের প্রকৃতি প্রোটিন। প্রোটিন প্রকৃতির বলে তারা ঝিল্লিবিশ্লেষণ-যোগ্য নয়। প্রোটিন নয় এমন একটি অংশও এনজাইমের সংগে সংযুক্ত থাকে। সংযুক্ত অংশটি প্রোটিনের সংগে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকলে তাকে 'প্রোসথেটিকগ্রুপ (prosthetic group) এবং শিথিলভাবে আবদ্ধ থাকলে (ফলে সহজেই আলাদা করা সম্ভব) তাকে কো-এনজাইম (co-enzyme) বলা হয়। (2) এনজাইমেরই অণু প্রোটিনের অণুর মতই বৃহদাকার এবং প্রোটিনের মতই আণবিক ওজনসম্পন্ন। (3) কিছু ' ংখ্যক লিপিড বিশ্লেষণকারী এনজাইম ছাড়া সব এনজাইমই জল, গ্লিসারল এবং তীব্র অ্যালকোহলে দ্রবণীয় প্রোটিন অধঃক্ষেপকারী পদার্থের দ্বারা এরা অধঃক্ষিপ্ত হয়। (4) এনজাইমের তীব্র দ্রবণ বাইউরেট (Biuret), জ্যানথোপ্রোটিক (xanthoproteic) প্রভৃতি প্রোটিনের আদর্শ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, (5) এনজাইমের আর্দ্রবিশ্লেষণে প্রোটিনের মতই অ্যামাইনো-অ্যাসিড পাওয়া যায়, (6) অধিক উত্তাপে প্রোটিনের মত এনজাইমও তঞ্চিত ও নিষ্ক্রিয় হয়, (7) প্রোটিনের মতই প্রতিটি এনজাইমের সমতড়িৎবিন্দু নির্দিষ্ট এবং এই নির্দিষ্ট সমতড়িৎ pH এ তারা সর্বাপেক্ষা কম দ্রবণীয় ; (৪) প্রোটিনের অণুতে মৌলিক উপাদান ও তাদের অনুপাত পাওয়া যায়। এসব কারণে এনজাইমকে প্রোটিন বলা হয়।

3. **এনজাইমের পৃথকীকরণ** (Isolation of enzyme ঃ এনজাইমের বিভিন্ন ধর্ম, কার্য-পদ্ধতি, বিক্রিয়ার হার প্রভৃতির বিস্তৃত ও সঠিক পর্যালোচনার জন্য তাদের নিষ্কাশণ ও শোধন প্রয়োজন। অধিকাংশ এনজাইমই কোষের অভ্যন্তর থেকে জৈবিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। কিছুসংখ্যক এনজাইম অবশ্য কোষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ভিন্ন স্থানে পৌঁছে ক্রিয়া করে। যেমন ঃ অগ্ন্যাশয়ের (pancreas) এনজাইমসমূহ।

কোষস্থিত এনজাইমকে নিষ্কাশণের জন্য কোষকে স্ফটিকদানার (quartz band) সাহায্যে চূর্ণ করা হয় বা যান্ত্রিক হোমোজেনাইজারের (homo-

genizer) অথবা শ্রবণোত্তর শব্দতরংগের (ultrasonic waves) দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হয়। ভগ্নাবশেষকে এরপর জল বা বাফার দ্রবণের সাহায্যে
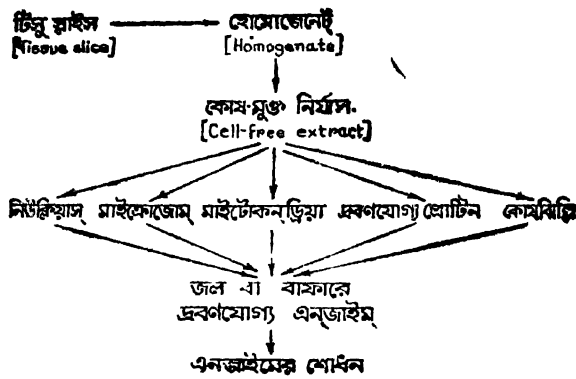
5-24 নং চিত্র : এনজাইমের পৃথকীকরণ পদ্ধতি।

নিষ্কাশিত করা হয়। দ্যুটো তরলে দ্রবণযোগ্য এনজাইমগুলো নিষ্ক্রান্ত হয়, বাকীরা ভগ্নাবশেষে থেকে যায়। এদের এরপর শোধন করা হয়।

4. **এনজাইমের কার্যপদ্ধতি** (Mode of enzyme action) : এনজাইম যে সব পদার্থের উপর ক্রিয়া করে তাদের **যৌগক** (substrate) বলা হয়। লক্ষ্য করা গেছে যৌগকের অণু আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হবার পূর্বে এনজাইমের সংগে সংযুক্ত হয় এবং পরে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ হিসাবে এনজাইমের উপরিতল থেকে নির্গত হয়। **মাইকেলিস** (Michaelis) এবং **মেনটন** (Menton) প্রথমে এই ঘটনার পর্যবেক্ষণ করেন এবং **এনজাইম-যৌগক যোগ** (enzyme substrate complex) গঠনের মতবাদ প্রচার করেন। তাঁদের এই মতবাদ আজও স্বীকৃত। এর বক্তব্য হল : এনজাইম-বিক্রিয়া দ্যুটো পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ে এনজাইম (E) যৌগকের (S) সংগে যুক্ত হয়ে এনজাইম-যৌগক যোগ (ES) গঠন করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই অন্তর্বর্তী যোগ বিশ্লিষ্ট হলে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ (P) নির্গত হয় এবং এনজাইম মুক্ত হয়। যথা :

(1) $E + S \rightleftharpoons ES$

(2) $ES \rightarrow E + P$

একটি অন্তর্বর্তী যোগ সৃষ্টি না হয়ে পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো অন্তবর্তী যোগ গঠিত হতে পারে। যেমন,

$$E + S \rightleftharpoons ES \rightleftharpoons ES' \rightleftharpoons ES'' \rightleftharpoons EP \rightarrow E + P$$

এন্‌জাইমের আকৃতি যৌগকের চেয়ে প্রায় 500 গুণ বেশী। বিক্রিয়ার সময় যৌগক এনজাইমের উপরিতলে তাই খুব সীমিত স্থানই দখল করে। দেখা গেছে এন্‌জাইমের উপরিতলে 1 থেকে 7টি ক্রিয়াকেন্দ্র (active centre) থাকে। ফিশারের (Fisher) মতে একটি তালাতে যেমন চাবিতে এঁটে বসে, যৌগকও তেমনি এন্‌জাইমের ক্রিয়াকেন্দ্র দখল করে বসে। তাঁর মতে দুই বা ততোধিক যৌগক এভাবে চাবি-তালা মডেলে পরস্পর বিক্রিয়া করতে পারে।
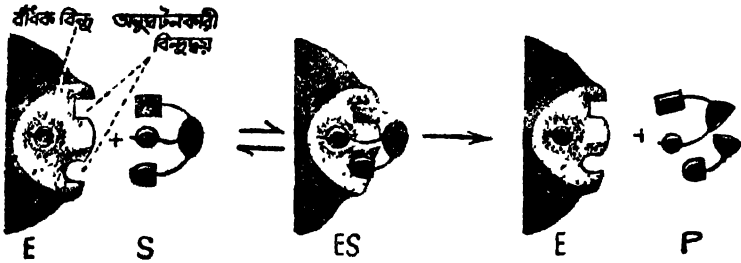
5-25 নং চিত্র : এনজাইমের একটি ক্রিয়াকেন্দ্র।

বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এন্‌জাইমের প্রতিটি ক্রিয়াকেন্দ্রে তিনটি বিন্দু থাকে। এই তিনটি বিন্দুতে যৌগক এন্‌জাইমের সংগে মিলিত হয়। একে ত্রিবিন্দু সংযুক্তি (three point attachment) বলা হয়। তিনটি বিন্দুর দু'টোতে অনুঘটনক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। আবার বিন্দু দু'টোর প্রতিটির অনুঘটনক্রিয়া আলাদা। তৃতীয়টি বাঁধক বিন্দু (binding group)।

বিভিন্ন অ্যামাইনোঅ্যাসিড বা অ্যামাইনোঅ্যাসিডস্থিত সক্রিয় গ্রুপ এন্‌জাইমের ক্রিয়াকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। অ্যামাইনোঅ্যাসিডের সক্রিয় গ্রুপ বা আয়ন অ্যাসিড বা ক্ষারক হিসাবে, নিউক্লিয়াস-আসক্ত গ্রুপ (nucleophilic group) বা ইলেক্ট্রোন-আসক্ত গ্রুপ (electrophilic group) হিসাবে এন্‌জাইম-বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। সেরিন (⁻OH), সিস্টাইন (⁻SH), হিসটিডিন (ইমিডাজোল গ্রুপ) এবং টাইরোসিন এন্‌জাইমের ক্রিয়াকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।

নির্দিষ্ট উদাহরণের দ্বারা এন্‌জাইমের বিক্রিয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে আরও আলোকপাত করা সম্ভবপর : (1) কাইমোট্রিপ্‌সিন ও সংশ্লেষিত এস্টার যোগ :

কাইমোট্রিপ্‌সিন এস্টার যৌগকের উপর ক্রিয়া করে তাকে নিম্নলিখিতভাবে আর্দ্র বিশ্লিষ্ট করে :

$$F+S\rightleftharpoons ES\rightarrow ES'\rightarrow E+P_2$$
$$+$$
$$P_1$$
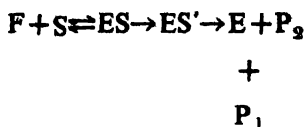
এখানে ES এনজাইম-যৌগ ; ES' অ্যাসাইল এন্‌জাইম যৌগ ; P_1, যৌগক থেকে নির্গত মূলক এবং P_2, অ্যাসাইল গ্রুপ।

(2) **ফস্‌ফোগ্লুকোমিউটেজ ও গ্লুকোজ I-PO_4 :** এন্‌জাইম এক্ষেত্রে গ্লুকোজ-I-PO_4-এর সংগে ফস্‌ফেট-সংযুক্তি ঘটিয়ে প্রথমে গ্লুকোজ-I, 6 ডাই-
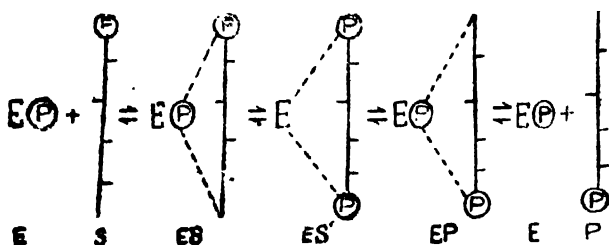
5-26 নং চিত্র :

ফস্‌ফেট গঠন করে। এরপরই ইহা উৎপন্ন ডাইফস্‌ফেট থেকে ফস্‌ফেট গ্রহণ করে, ফলে গ্লুকোজ-6-PO_4 উৎপন্ন হয়।

(3) **অ্যাল্‌কালাইন ফস্‌ফাটেজ :** অ্যাল্‌কালাইন ফস্‌ফাটেজে
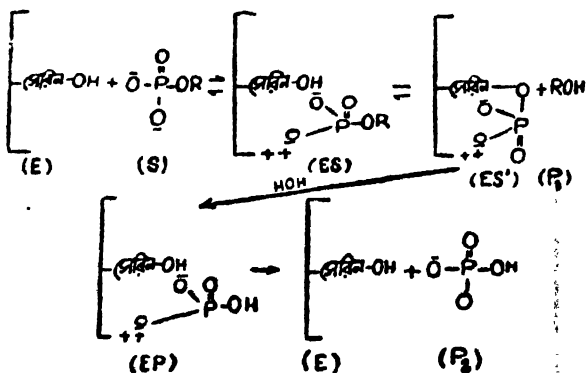
5-27 নং চিত্র : P_1 = অ্যালকোহল, P_2 = অর্থোফস্‌ফেট

অ্যামাইনোঅ্যাসিড সেরিনের-OH মূলক ক্রিয়াকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।

এনজাইম প্রথমে যৌগকের সংগে সংযুক্ত হয়ে, পরে ফস্ফরাসযুক্ত হয় এবং অ্যালকোহল গ্রুপ নির্গত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এনজাইম আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হয় এবং অর্থোফসফেট নির্গত হয় (5-27নং চিত্র)।

এনজাইমের কার্যপদ্ধতি বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এসব অবস্থার পরিবর্তনে এনজাইমের কার্যপদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে। P^H, তাপমাত্রা প্রতিরোধক, সক্রিয়কারক, যৌগকের তীব্রতা প্রভৃতি এনজাইমের কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটায়।

2. **এনজাইম গতিবিদ্যা** (Enzyme kinetics) : এনজাইম বিক্রিয়া কোন কোন শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় দ্রুত সম্পন্ন হয়, আবার কখনও এসব অবস্থার পরিবর্তনে বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগের পরিবর্তন ঘটে। **এনজাইম গতিবিদ্যার** সাহায্যে এনজাইম বিক্রিয়ার গতিবেগ এবং গতিবেগের উপর প্রভাব-বিস্তারকারী অবস্থার অনুশীলন করা যায়। রাসায়নিক বা এনজাইম বিক্রিয়ার গতিবেগকে **বিক্রিয়াক্রমে** (order of reaction) শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। বিক্রিয়াক্রম বলতে বিক্রিয়মাধ্যমের অণু-পরমাণুর সংখ্যাকে বুঝায়, যাদের তীব্রতা বিক্রিয়ার হারকে পরিচালিত করে।

যে বিক্রিয়াক্রমে বিক্রিয়ার হার নির্দিষ্ট থাকে এবং যৌগকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে না, তাকে **শূন্যক্রম বিক্রিয়া** (zero order reaction) বলা হয়। x বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ এবং t সময় হলে, শূন্যক্রম বিক্রিয়াকে নিম্নলিখিত সম্পর্কের দ্বারা প্রকাশ করা যায় :

$$\frac{dx}{dt} = k$$

এখানে k° একটি ধ্রুবক। নির্দিষ্ট পরিমাণ এনজাইমের উপস্থিতিতে x বা t এর মান নির্ধারণ করা সম্ভব। যৌগকের তীব্রতা অত্যধিক হলে, এনজাইম বিক্রিয়া প্রায়ই শূন্যক্রমের হয়।

যে বিক্রিয়াক্রমে বিক্রিয়ার হার মাধ্যমস্থিত যৌগকের তীব্রতার সমানুপাতিক তাকে **প্রথমক্রম বিক্রিয়া** (first order reaction বলা হয়। যৌগক তুলনামূলকভাবে অদ্রবণীয় হলে বা যৌগকের তীব্রতা অপ্রতুল হলে এনজাইম সংপৃক্ত হতে পারে না ; এক্ষেত্রে বিক্রিয়া প্রথমক্রমের হয়। এনজাইম বিক্রিয়ার অন্তিম-পর্যায়েও বিক্রিয়া প্রধানতঃ প্রথমক্রমের হয়।

প্রথমক্রমের বিক্রিয়াকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ

$$\frac{dx}{dt} = k'(a-x)$$

এক্ষেত্রে, a যৌগকের প্রাথমিক তীব্রতা, x যৌগকের পরিবর্তিত তীব্রতা এবং k' প্রথমক্রম বিক্রিয়া-হারের ধ্রুবক। অতএব, (a − x) যে কোন সময়ে মাধ্যমস্থিত যৌগকের তীব্রতাকে বুঝায়। বিক্রিয়াহার তাই এই পরিমাণের সংগে সমানুপাতিক।

মাইকেলিস-মেন্টন সমীকরণ ও ধ্রুবক (Michaelis-Menton equation and constant) ঃ pH, তাপমাত্রা এবং এনজাইমের তীব্রতা অপরিবর্তিত থাকলে, যৌগকের (S) উপর এনজাইমের (E) আসক্তি কতটুকু তা নির্ধারণ করা যায় মাইকেলিস-মেনটন ধ্রুবকের (Km) দ্বারা। এই ধ্রুবক এনজাইম-বিক্রিয়ার একটি বিশেষত্ব। এনজাইমের আসক্তির সংগে এনজাইম-বিক্রিয়ার হার সমানুপাতিক।

এনজাইম ও যৌগকের পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া নিম্নরূপ ঃ

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_3} P + E$$
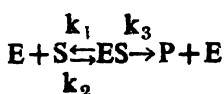
এক্ষেত্রে, k_1 = অগ্রমুখী বিক্রিয়াহারের ধ্রুবক, K_2 = পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া হারের ধ্রুবক এবং k_3 = ES বিশ্লিষ্ট হয়ে যে হারে এনজাইম ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ নির্গত করে তার ধ্রুবক। মাইকেলিস ও মেনটনের ধারণা হয়েছিল Km প্রধানত ES এর বিক্রিয়াহারের ধ্রুবক এবং এর পরিমাণ k_2/k_1। পরে দেখা গেল Km আসলে $(k_1+k_3)/k_2$ এর সমান।

উপরের বিক্রিয়ায় যদি C = এনজাইমের মোট পরিমাণ, A = এনজাইম-যৌগক যৌগের পরিমাণ এবং x = যৌগকের পরিমাণ (যা খুব বেশী) হয়, তাহ'লে (C − A = মুক্ত এনজাইমের পরিমাণ হবে। এক্ষেত্রে,

$$Km = \frac{(C-A)x}{A} = \frac{Cx - Ax}{A} = \frac{Cx}{A} - x$$

অথবা, $$Km + x = \frac{Cx}{A}$$

$$\therefore \quad A = \frac{Cx}{Km + x}$$

v সমগ্র এনজাইম বিক্রিয়ার নির্দিষ্ট গতিবেগের পরিমাপক হলে, $v = k_3 A$ এবং $\frac{v}{k_3} = A$ হবে।

অতএব, $\frac{v}{k_3} = \frac{Cx}{Km+x}$ বা $v = \frac{k_3 Cx}{Km+x}$

এনজাইম বিক্রিয়ার সর্বাধিক গতিবেগ V তখনই পাওয়া সম্ভবপর যখন সবকটি এনজাইমই যৌগকের সংগে সংযুক্ত হতে পারে এবং ES থেকে লব্ধ পদার্থের উপাদান সর্বাধিক হয়। এই অবস্থায়,

$$A = C \text{ এবং } V = k_3 A = k_3 C$$

V-এর মান উপরের সমীকরণে প্রতিস্থাপন করলে যে সমীকরণটি পাওয়া যায় তাকে মাইকেলিস-মেন্‌টোন সমীকরণ বলা হয়ঃ

$$v = \frac{Vx}{Km+x}$$

এই সমীকরণ থেকে স্পষ্টতই দেখা যায়, x-এর পরিমাণ বৃদ্ধির সংগে বিক্রিয়ার হারও বৃদ্ধি পায় এবং x এর পরিমাণ অত্যাধিক বৃদ্ধি পেলে বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগও সর্বাধিক স্তরে পৌঁছায়। এন্‌জাইমের বিক্রিয়া প্রথমার্ধে তাই প্রথম-ক্রমের এবং সর্বাধিক গতিবেগে শূন্যক্রমে দাঁড়ায় (5-28aনং চিত্র)।
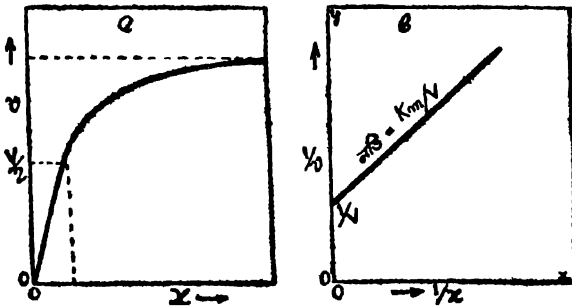
5-28 নং চিত্রঃ

মাইকেলিস ও মেন্‌টোনের এই সমীকরণকে সরলরেখ সমীকরণে ($y = mx + c$) রূপান্তরিত করলে, সর্বাধিক গতিবেগ V কে অন্তরছেদ (intercept) হিসাবে পাওয়া যায়। মাইকেলিস-মেন্‌টোন সমীকরণকে উল্টে নিলে ইহা সরলরেখ সমীকরণে রূপান্তরিত হয়। যথাঃ

$$\frac{1}{v} = \frac{Km+x}{Vx} = \frac{Km}{Vx} + \frac{x}{Vx} = \frac{Km}{V}\frac{1}{x} + \frac{1}{V}$$

$$\text{অর্থাৎ } \frac{1}{v} = \frac{Km}{V}.\frac{1}{x} + \frac{1}{V}$$

1/vকে y-অক্ষে এবং 1/xকে x-অক্ষে উপস্থাপিত করলে যে সরলরেখা পাওয়া যায় (5-28b নং চিত্র), তাতে সরলরেখার নতি (slope) Km/V এবং y অক্ষে অন্তরচ্ছেদ 1/V-এর সমান।

Km ধ্রুবকের গুরুত্ব (Significance of Km) : এনজাইমের সর্বাধিক গতিবেগের (V) অর্ধেক গতিবেগে (V/2) Km ধ্রুবক যৌগকের তীব্রতার সমান হয়, অর্থাৎ V = 1 এবং v = V/2 = ½ ধরলে, সমীকরণ থেকে পাওয়া যায় :

$$\frac{1}{2} = \frac{1x}{Km+x} \text{ বা, } Km+x = 2x \text{ বা, } Km = x$$

সুতরাং Km এর একককে যৌগকের এককের মতই মোল/লিটারে প্রকাশ করা হয়।

6. এনজাইম ক্রিয়ায় প্রভাববিস্তারকারী কারণসমূহ (Factors influencing the enzymatic activity) :

(a) **অনুকূল উষ্ণতা (Optimum temperature) :** একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় এনজাইমের সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশী হয়। এই উষ্ণতাকে **অনুকূল উষ্ণতা** বলা হয়। প্রাণীজ এনজাইমের অনুকূল উষ্ণতা 30° থেকে 50° সেলসিয়াসের (Celsius) মধ্যে সীমিত থাকে। এর ঊর্ধ্বে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে এনজাইম বিনষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হয়। প্রাথমিকভাবে উষ্ণতা-বৃদ্ধির সংগে এনজাইমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

(b) **অনুকূল pH (Optimum pH) :** হাইড্রোজেন আয়নের তীব্রতার পরিবর্তন সম্বন্ধে এনজাইম খুবই সচেতন। একটা নির্দিষ্ট pH সীমার মধ্যে তারা সর্বাপেক্ষা সক্রিয়। এই pH কে **অনুকূল** pH বলা হয়। হাইড্রোজেনের তীব্রতা এই অনুকূল pH থেকে সামান্য পরিবর্তিত হলে এনজাইমের সক্রিয়তার যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়। পেপসিন ও ট্রিপসিন এনজাইমের অনুকূল pH যথাক্রমে 2 এবং 8·3।

(c) **যৌগকের তীব্রতা (Concentration of substrate) :** একটা নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে এনজাইমের সক্রিয়তা যৌগকের তীব্রতার সমানুপাতিক। যৌগকের তীব্রতার একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় এনজাইমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু অত্যধিক যৌগকের উপস্থিতিতে এনজাইমের বিক্রিয়ার হার অপরিবর্তিত থাকে বা হ্রাস পায়।

(d) **এন্‌জাইমের তীব্রতা** (Concentration of enzyme) ঃ এন্‌জাইমের তীব্রতা-বৃদ্ধির সংগে এনৃজাইমের সক্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে অপরিশুদ্ধ পেপ্‌সিন ও ট্রিপ্‌সিনের সক্রিয়তা তাদের তীব্রতার বর্গমূলের সংগে সমানুপাতিক।

(e) **বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের তীব্রতা** (Concentration of Products) ঃ বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের প্রকৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ যৌগকের সংগে সাদৃশ্যযুক্ত হয়। তাই এদের তীব্রতা-বৃদ্ধিতে এনৃজাইমের সক্রিয়তা হ্রাস পেতে দেখা যায়। এরা এন্‌জাইমের ক্রিয়াকেন্দ্রকে বেদখল করে রাখে, ফলে এনৃজাইমের সক্রিয়তা হ্রাস পায়।

(f) **জারণ** (Oxidation) ঃ কিছু সংখ্যক এনৃজাইম বিজারক পদার্থের দ্বারা সক্রিয় হয় এবং মৃদু জারক পদার্থের সংস্পর্শে বা অক্সিজেন সংযোগে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সাল্‌ফ্‌হাইড্রিল (sulfhydryl) জাতীয় এন্‌জাইম এই পর্যায়ে পড়ে।

(g) **নির্দিষ্টতা** (Specificity) ঃ প্রতিটি এন্‌জাইম একটি নির্দিষ্ট যৌগকের উপর ক্রিয়া করে। নির্দিষ্টতা তাদের একটি বিশেষ ধর্ম। আর্‌জিনেজ (arginase) এনৃজাইম শুধুমাত্র আর্‌জিনিনের উপরই ক্রিয়া করতে পারে, অন্য কোন যৌগকের উপর পারে না। লিপিড বিশ্লিষ্টকারী এনৃজাইম কখনও কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটিন যৌগকের উপর সক্রিয় নয়। লাইপেজ, এস্টারেজ প্রভৃতি এনৃজাইমের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টতার খানিকটা শৈথিল্য দেখতে পাওয়া যায়। লাইপেজ শুধুমাত্র লিপিডের উপরই ক্রিয়া করে না, এস্টারজাতীয় যৌগকের উপরও ক্রিয়া করে।

(b) **সক্রিয়কারক** (Activator) ঃ প্রথমাবস্থায় এনৃজাইম প্রায়ই নিষ্ক্রিয় থাকে। তাদের সক্রিয় করে তুলতে কিছু সংখ্যক আয়ন বা অণুর প্রয়োজন হয়। এই সব আয়ন বা অণুকে এনৃজাইমের **প্রতিরোধক** বলা হয়। যেমন ঃ (1) ধনাত্মক আয়ন ঃ Mg^{++} আয়নের উপস্থিতি ছাড়া ডেঅক্সি-রাইবো-নিউক্লিয়েজ (deoxyribonuclease) এনৃজাইম সক্রিয় হয় না।

(2) ঋণাত্মক আয়ন ঃ নির্দিষ্ট pH মানে Cl^- আয়নের উপস্থিতি অ্যামাইলেজ এনৃজাইমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে (3) সাল্‌ফ্‌হাইড্রিলজাতীয় পদার্থের উপস্থিতিতে কোন কোন পেপ্‌টিডেজ এনৃজাইমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

(i) **প্রতিরোধক** (Inhibitors) ঃ যৌগকের সাদৃশ্যযুক্ত কিছুসংখ্যক পদার্থ

এনজাইমের ক্রিয়ায় বাধাদান করে, এদের **প্রতিরোধক** বলা হয়। প্রতিরোধক দু-প্রকারের হয়। যথা : (1) **প্রতিযোগী প্রতিরোধক** (competitive inhibitors) এবং (2) **অপ্রতিযোগী প্রতিরোধক** (noncompetitive inhibitors)। প্রতিযোগী প্রতিরোধক এনজাইমের ক্রিয়াকেন্দ্রের জন্য যৌগকের সংগে প্রতিযোগিতা করে। এই ধরনের প্রতিরোধকের তীব্রতা-বৃদ্ধিতে এনজাইমের সক্রিয়তা হ্রাস পায় বা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। যেমন, ম্যালোনিক অ্যাসিডের (malonic acid) গঠন অনেকটা সাক্সিনিক অ্যাসিডের (succinic acid) মত হওয়ায়, প্রথমটি এনজাইম সাক্সিনিক ডেহাইড্রোজেনেজের (succinic dehydrogenase) প্রতিযোগী প্রতিরোধক হিসাবে কার্য করে। ম্যালিক অ্যাসিড (malic acid) এবং অক্সালো-অ্যাসেটিক অ্যাসিড (oxaloacetic acid) পরস্পর প্রতিযোগী প্রতিরোধক হিসাবে কার্য করে। যৌগকের তীব্রতা বৃদ্ধি করে এজাতীয় প্রতিরোধকে অপসারণ করা হয়।

অপরপক্ষে অপ্রতিযোগী প্রতিরোধক এনজাইমের ক্রিয়াকেন্দ্রে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয় এবং এনজাইমকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে। যৌগকের তীব্রতা বৃদ্ধি করে এজাতীয় প্রতিরোধকে অপসারণ করা সম্ভবপর নয়। ধাতুঘটিত আয়ন প্রধানত এধরনের প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে।

7. **এনজাইমের শ্রেণীবিন্যাস** (Classification of enzymes) : এনজাইমের বিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে অধুনা এনজাইমের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। এনজাইম-বিক্রিয়াকে মোটামুটি 6 ভাগে বিভক্ত করা যায়। এনজাইমও তাই 6 শ্রেণীর। নিম্নে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল :

(i) **আর্দ্রবিশ্লেষণকারী এনজাইম** (Hydrolases) : এজাতীয় এনজাইম এস্টার, পেপটাইড, গ্লাইকোসিল, C—C, P—N প্রভৃতি যোজককে বিশ্লিষ্ট করে। যেমন : (a) এস্টার যোজকের উপর বিক্রিয়াকারী এনজাইম : সিউডো-কোলিনেস্টারেজ,

অ্যাসাইলকোলিন + H_2O = কোলিন + অ্যাসিড
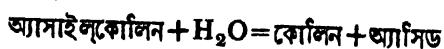
(b) গ্লাইকোসিল যোগের উপর বিক্রিয়াকারী এনজাইম : বিটা-গ্যালাক্টোসিডেজ,

বিটা-ডি-গ্যালাক্টোসাইড + H_2O = অ্যালকোহল + ডি-গ্যালাক্টোজ
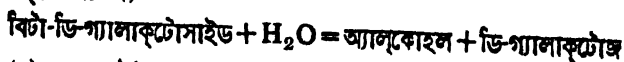
(c) পেপটাইড যোজকের উপর বিক্রিয়াকারী এনজাইম : পেপসিন, রেনিন, কাইমোট্রিপসিন ইত্যাদি।

(2) **পরিবৃত্তি এনজাইম** (Transferase) ঃ যেসব এনজাইম দুটো বিক্রিয়কের মধ্যে (S_1, S_2) একটা নির্দিষ্ট গ্রুপ বা মূলককে (M) স্থানান্তরিত করে তাদের পরিবৃত্তি এনজাইম বলা হয়।

$$S_1-M+S_2=S_1+S_2-M.$$
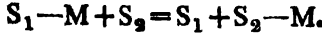
এই শ্রেণীর এনজাইম একক-কার্বনযুক্ত অ্যালডেহাইড বা কিটোনের অবশেষ (residues), গ্লাইকোসিল, সালফার ও ফসফরাসযুক্ত মূলক প্রভৃতিকে স্থানান্তরিত করে। যেমন ঃ

(a) ফসফরাসযুক্ত মূলক-স্থানান্তরকারী এনজাইম ঃ হেক্সোকাইনেজ,

ডি-হেক্সোজ + ATP = ডি-হেক্সোজ-6-ফসফেট + ADP.
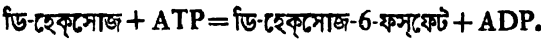
(b) গ্লাইকোসিল স্থানান্তরকারী এনজাইম ঃ ফসফোরীলেজ,

(আলফা-1, 4-গ্লুকোসিল) n + অর্থোফসফেট

= (আলফা-1, 4-গ্লুকোসিল) $_{n-1}$ + আলফা-ডি-গ্লুকোজ-1-ফসফেট।
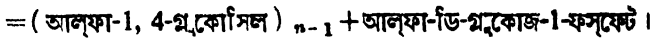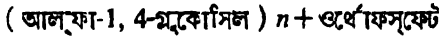
(3) **জারণ-বিজারণ এনজাইম** (Oxido-reductases) ঃ যেসব এনজাইম দুটো বিক্রিয়কের (S_1, S_2) জারণ-বিজারণক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তাদের জারণ-বিজারণ এনজাইম বলা হয়।

S_1 (জারিত) + S_2 (বিজারিত) = S_1 (বিজারিত) + S_2 (জারিত)

এজাতীয় এনজাইমকে পূর্বে ডেহাইড্রোজেনেজ বা অক্সিডেজ হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হত। CH—CH, C=O, CH—OH, CH—NH_2 এবং CH=NH, প্রভৃতি গ্রুপের জারণ-বিজারণে এরা বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। যেমন ঃ

(a) CH—NH_2 গ্রুপের উপর বিক্রিয়াকারী এনজাইম ঃ যকৃতের গ্লুটামিক ডেহাইড্রোজেনেজ ঃ

এল-গ্লুটামেট + H_2O + NAD = আলফা-কিটোগ্লুটারেট + NH_3 + NADH + H^+
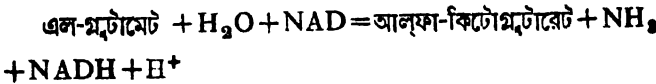
(b) CH—OH গ্রুপের উপর বিক্রিয়াকারী এনজাইম ঃ অ্যালকোহল ডেহাইড্রোজেনেজ ঃ

অ্যালকোহল + NAD^+ = অ্যালডেহাইড বা কিটোন + NADH + H^+
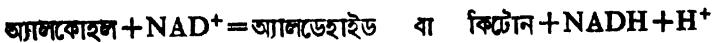
(c) হিম (haeme) গ্রুপের উপর বিক্রিয়াকারী এনজাইম ঃ সাইটোক্রোম অক্সিডেজ ঃ

4টি বিজারিত সাইটোক্রোম C + O_2 + $4H^+$

= 4টি জারিত সাইটোক্রোম C + $2H_2O$
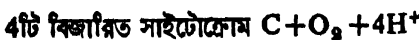
(4) **অনার্দ্র-বিশ্লেষণধর্মী এন্‌জাইম** (lysase) : যেসব এন্‌জাইম অনার্দ্র-বিশ্লেষণের (other than hydrolysis) দ্বারা যৌগকের গ্রুপকে স্থানান্তরিত করে অথচ দ্বি-বন্ধ রেখে দেয়, তাদের অনার্দ্রবিশ্লেষণধর্মী এন্‌জাইম বলা হয়।

$$\begin{array}{l} y-x \\ | \\ c-c \rightarrow y-x^{1} c=c \end{array}$$
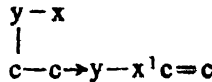
এজাতীয় এন্‌জাইম C–C, C–N, C–O, C–S প্রভৃতি যোজকের উপর ক্রিয়া করে। যেমন, অ্যাল্‌ডোলেজ এবং ফিউম্যারেজ :

(a) কিটোজ-1 ফস্‌ফেট = ডাই-হাইড্রোক্সি-অ্যাসিটোন ফস্‌ফেট + অ্যাল্‌ডেহাইড

(b) এল-ম্যালেট = ফিউম্যারেট + H_2O

(5) **আইসোমারেজ** (Isomerase, গ্রীক—isos = সমান, meros = অংশ) : এজাতীয় এন্‌জাইম আইসোমারের (isomers) পারস্পরিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করে। যেমন :

(a) সিজ-ট্রান্স আইসোমারেজ (ল্যাটিন—cis = একইপার্শ্বে, trans = অপর পার্শ্বে) : রেটিনিন আইসোমারেজ,

সিজ-রেটিনিন ⇌ ট্রান্স-রেটিনিন

(b) অ্যাল্‌ডোজ ও কিটোজের উপর বিক্রিয়াকারী এন্‌জাইম : ট্রায়োজ ফস্‌ফেট আইসোমারেজ,

ডি-গ্লিসার্যালডেহাইড-3-ফস্‌ফেট ⇌ ডাই-হাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফস্‌ফেট

(c) অ্যালানিন্ র‍্যাসিমেজ : এল-অ্যালানিন ⇌ ডি-অ্যালানিন্।

(6) **অনুবন্ধী এনজাইম** (Ligases, ligase = বন্ধন করা) : যেসব এন্‌জাইম বিক্রিয়ার সময় C—S, C—O, C—C ইত্যাদি যোজক উৎপন্ন করে তাদের অনুবন্ধী এন্‌জাইম বলা হয়। যেমন :

(a) C–S যোজক উৎপাদনকারী এন্‌জাইম : সাক্‌সিনিক থায়োকাইনেজ, সাক্‌সিনেট + কো-এ + GTP = সাক্‌সিনাইল-কো-এ + অজৈব ফস্‌ফেট + GDP.

(b) C—N যোজক উৎপাদনকারী এন্‌জাইম : গ্লুটামিন সিন্‌থেটেজ, এল-গ্লুটামেট + NH_3 + ATP = এল-গ্লুটামিন + অর্থোফস্‌ফেট + ADP

8. **কো-এন্‌জাইম** (Co-enzyme) : প্রোটিন নয় এমন যে অংশটি এন্‌জাইমের সংগে যুক্ত থেকে এন্‌জাইমকে সুষ্ঠু সক্রিয়তা দান করে তাকে **কো-এন্‌জাইম** বলা হয়। কো-এন্‌জাইমসমেত সমগ্র এন্‌জাইমকে **হলো-এন্‌জাইম** (holoenzyme) বলা হয়। সংযুক্ত অংশটি প্রোটিনের সংগে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকলে তাকে প্রোস্‌থেটিক গ্রুপ এবং শিথিলভাবে আবদ্ধ থাকলে (যাকে সহজেই পৃথক করা যায়) তাকে কো-এন্‌জাইম আখ্যা দেওয়া হয়। অবশ্য দুটো শব্দই এখন একই অর্থে ব্যবহার করা হয়।

কো-এনজাইম তাপসহ কেলাস পদার্থ। তারা জৈব পদার্থবিশেষ। অধিকাংশ কো-এনজাইমই নিউক্লিওটাইডধর্মী। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা একক যৌগ হিসাবে থাকে না, মিশ্র যৌগ হিসাবে অবস্থান করে। অধিকাংশ ভিটামিনকে কো-এনজাইম হিসাবে কাজ করতে দেখা যায়।

কো-এনজাইমকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, (a) হাইড্রোজেনবাহী কো-এনজাইম (hydrogen carrying co-enzyme) এবং (b) মূলকবাহী কো-এনজাইম (group-carrying co-enzyme)। যেসব ভিটামিনকে কো-এনজাইমের পর্যায়ে উন্নীত করা যায় না, তাদের কো-ফ্যাক্টর বলা হয়। নিম্নে এদের উদাহরণ দেওয়া হল :

(a) **হাইড্রোজেনবাহী কো-এনজাইম :** হাইড্রোজেনবাহী কো-এনজাইমের মধ্যে প্রধান : (1) **পিরাইডিন নিউক্লিওটাইড**, (2) **ফ্লেভিন নিউক্লিওটাইড** এবং (3) **লাইপোইক অ্যাসিড**।

পিরাইডিন নিউক্লিওটাইডের মধ্যে প্রধান নিকোটিন্যামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড বা NAD (পূর্বে একে কো এনজাইম I বা DPN বলা হত) এবং নিকোটিন্যামাইড অ্যাডেনিন ডাই-নিউক্লিওটাইড ফস্‌ফেট বা NADP (পূর্বে কো-এনজাইম II বা TPN বলা হত।)

ফ্ল্যাভিন নিউক্লিওটাইডের মধ্যে প্রধান ফ্লেভিন মনোনিউক্লিওটাইড বা FMN এবং ফ্লেভিন অ্যাডেনিন ডাই-নিউক্লিওটাইড বা FAD।

(b) **মূলকবাহী কো-এনজাইম :** মূলকবাহী কো-এনজাইমের মধ্যে প্রধানতঃ (i) অ্যাডেনোসিন ফস্‌ফেট : অ্যাডেনোসিন ট্রাইফস্‌ফেট বা ATP, অ্যাডেনোসিন ডাইফস্‌ফেট বা ADP এবং অ্যাডেনোসিন, মনোফস্‌ফেট বা AMP. (ii) ইউরিডিন ফস্‌ফেট : ইউরিডিন ডাইফস্‌ফেট গ্লুকোজ বা UDPG. (iii) সাইটিডিন ফস্‌ফেট : সাইটিডিন ডাইফস্‌ফেট কোলিন বা CDPC, (iv) গুয়ানোসিন ফস্‌ফেট, (v) শর্করা ফস্‌ফেট, (vi) থায়ামিন পাইরোফস্‌ফেট, (vii) কো-এনজাইম A, (viii) পিরাইডোক্সাল ফস্‌ফেট এবং (ix) ফলিক অ্যাসিড।

কো-ফ্যাক্টরের মধ্যে প্রধান বায়োটিন, ভিটামিন B_{12}, অ্যাসকোর্বিক অ্যাসিড, কোলিন, ভিটামিন K ইত্যাদি।

জৈবিক জারণ ও বিজারণ

Biological Oxidation and Reduction

1. **জারণ ও বিজারণ** (Oxidation and reduction) : প্রাণীদেহে জারণ-বিজারণক্রিয়া শক্তিশালী এনজাইমের নিয়ন্ত্রণাধীনে শুধুমাত্র দৈহিক উষ্ণতায়

সুসম্পন্ন হয় এবং জৈবিক শক্তির উদ্ভব ঘটে। জারণক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং খাদ্যবস্তু রক্তসংবহনের মাধ্যমে কলাকোষে পৌঁছায়। জারণক্রিয়া বলতে বুঝায়,

(a) অক্সিজেন সংযুক্তি। যেমন, অ্যালডেহাইডের (aldehyde) জারণ,

$$R.CHO+\frac{1}{2}O_2 \rightleftharpoons R.COOH$$

(b) হাইড্রোজেনের অপসারণ। যেমন, অ্যালকোহলের জারণ,

$$R.CH_2OH \rightleftharpoons R.CHO+2H$$

(c) ইলেকট্রন অপসারণ। যেমন, ধাতুর জারণ,

$$Fe^{++} \rightleftharpoons F^{+++}+e$$

এর বিপরীত পরিবর্তনকে বিজারণ বলে। এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তা হ'ল, জারণ বা বিজারণক্রিয়া কখনও এককভাবে চলতে পারে না। **যখনই একটি পদার্থ জারিত হয় তখন অপরটি (জারকপদার্থ) অবশ্যই বিজারিত হয়।** এর বিপরীত বক্তব্যটিও সত্য।

2. **জৈবিক জারণ ও বিজারণের মতবাদ** (Theories of biological oxidation and reduction) : শক্তির চাহিদামতো মানুষের কলাকোষে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর (যথা : শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, স্নেহঅম্ল ইত্যাদি) জারণক্রিয়া অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এবং দ্রুতগতিতে সুসম্পন্ন হয়। জৈব জারণক্রিয়া জলীয় দ্রবণে, তুলনামূলকভাবে কম উষ্ণতায়, প্রায় প্রশমিত বিক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এনজাইমের নিয়ন্ত্রণে সংঘটিত হয়। জৈব জারণক্রিয়া খুব জটিল হলেও তার মূলনীতি নিম্নরূপ :

(a) জারণক্রিয়ার প্রারম্ভে খাদ্যবস্তুর নির্দিষ্ট হাইড্রোজেন পরমাণুকে নির্দিষ্ট ডেহাইড্রোজেনেজ (dehydrogenase) এনজাইমের সাহায্যে সক্রিয়তা লাভ (activation) করতে হয়।

(b) দ্বিতীয়ত, সক্রিয় হাইড্রোজেনকে খাদ্যবস্তু থেকে কোন একটি হাইড্রোজেন বাহকে (carrier) বা পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো হাইড্রোজেন বাহকে স্থানান্তরিত করতে হয়। খাদ্যবস্তু থেকে হাইড্রোজেনের এই অপসারণে খাদ্যবস্তু জারিত হয়।

(c) অন্তিম ধাপে, বাহকস্থিত হাইড্রোজেনের সংগে, অক্সিজেনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযুক্তি ঘটে, যার ফলে H_2O উৎপন্ন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অক্সিজেন সরাসরি সক্রিয় হাইড্রোজেনের সংগে সংযুক্ত হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে সক্রিয় হাইড্রোজেনকে অক্সিজেনের কাছে পৌঁছতে হয়।

(d) এছাড়া, কার্বনডাই-অক্সাইডের বিযুক্তি (decarboxylation) এবং জলযোজন (hydration), এই দুটো পদ্ধতি কোন কোন ক্ষেত্রে জৈব জারনের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে।

জৈব জারনক্রিয়া দু'ভাগে সম্পন্ন হয়। প্রথমত, অক্সিজেন সরাসরি সক্রিয় হাইড্রোজেনের সংগে সংযুক্ত হয়। এই কার্যে ফেনোল অক্সিডেজ (phenol oxidase), ক্যাটালেজ (catalase), পেরোক্সিডেজ (peroxidase), অ্যামাইনো-অ্যাসিড অক্সিডেজ (amino acid oxidase), গ্লুকোজ অক্সিডেজ (glucose oxidase) প্রভৃতি এনজাইম সহায়তা করে।

দ্বিতীয় প্রকার জারনক্রিয়া উপরিউক্ত মতবাদ অনুযায়ী প্রধানত মাইটো-কন্ড্রিয়াতেই (mitochondria) সম্পন্ন হয়। কারণ মাইটোকন্ড্রিয়াতে প্রচুর পরিমাণে পিরাইডিন নিউক্লিওটাইড (pyridine nucleotides) এবং
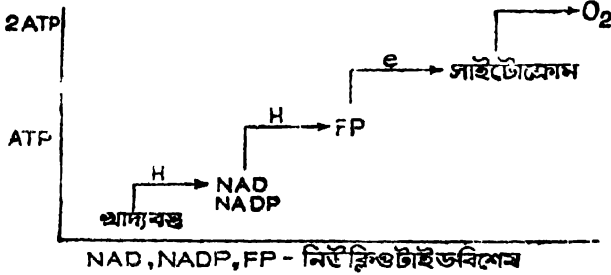
5-29 নং চিত্র

সাইটোক্রোম (cytochromes) পদার্থ রয়েছে, যারা পর্যায়ক্রমে সক্রিয় হাইড্রোজেনের বাহক হিসাবে কাজ করে। সবরকম সাইটোক্রোম পদার্থই লৌহযুক্ত পদার্থ এবং শুধুমাত্র এ কারণেই তারা ইলেকট্রনের বাহক হিসাবে সক্রিয়। মাইটোকন্ড্রিয়াস্থিত এই পদার্থগুলো পর্যায়ক্রমে বিজারিত ও জারিত হয় এবং এদের এই জারন-বিজারনের ফলে যে জারন-বিজারন বিভবের সৃষ্টি হয় তার দ্বারাই জৈবশক্তি (ATP) উৎপন্ন হয় (5-29নং চিত্র)।

প্রশ্নাবলী

1. কার্বোহাইড্রেট বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ তাদের শ্রেণীবিন্যাস কর এবং সংক্ষেপে বিজারণধর্মী শর্করার ধর্ম বিবৃত কর। (O. U. '68, '70, '72)

2. কিছুসংখ্যক সাধারণ অ্যাল্ডো-হেক্সোজ ও কিটো-হেক্সোজ শর্করার উদাহরণ দাও। কোন্ কোন্ পরীক্ষার দ্বারা নিম্নলিখিত পদার্থগুলোকে সনাক্ত করা যায় লিখ: গ্যালাকটোজ, ফ্রাকটোজ, ল্যাক্টোজ ও সুক্রোজ। (O. U. '63)

3. প্রতিটির দু'টো করে উদাহরণসহ কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিন্যাস কর। মানুষের পৌষ্টিকনালীর কার্বোহাইড্রেট বিশ্লিষ্টকারী এনজাইমসমূহের নাম, উৎস ও সক্রিয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (O. U. '74)

4. একটি পোলারিমিটারের বর্ণনা দাও। আলোক-ঘূর্ণন কী? আলোক-ঘূর্ণনের কারণ বিবৃত কর।

5. (A) একক শর্করার নিম্নলিখিত ধর্মগুলো আলোচনা কর:

(a) বিজারণ, (b) জারণ, (c) এস্টার উৎপাদন, (d) আলোক ঘূর্ণন।

(B) বিভিন্ন প্রকার ফসফোলিপিড সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (C. U. 86)

6. শর্করার আলোক-ঘূর্ণন বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা কর। কিভাবে তুমি গ্লুকোজের পাইরানোজ এবং ফ্রাকটোজের ফিউরানোজ গঠন লিখবে। (C. U. H. '77)

7. কার্বোহাইড্রেটের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা কর। কার্বোহাইড্রেটের কতকগুলো বর্ণ-বিক্রিয়ার উল্লেখ কর।

8. যৌগশর্করা বলতে কি বোঝায়? সাধারণ চারটি যৌগশর্করার নাম কর। পেশী-সঞ্চালনের সময় গ্লাইকোজেন ভাঙ্গনের পদ্ধতি বর্ণনা কর। (C. U. . '77)

9. লিপিড বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ লিপিডের শ্রেণীবিন্যাস কর। পৌষ্টিকনালীর লিপিডবিশ্লিষ্টকারী এনজাইমসমূহের উল্লেখ কর। লিপিড কিভাবে ক্ষুদ্রান্ত্রে বিশোষিত হয়। (C. U. '75)

(N. B. প্রশ্নের শেষাংশ পরিপাকতন্ত্রে দ্রষ্টব্য।)

10. প্রোটিন বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ তাদের শ্রেণীবিন্যাস কর। (C. U. '71)
প্রোটিনের কতকগুলো বর্ণবিক্রিয়ার উল্লেখ কর। (C. U. '69, '73)

11. সংক্ষেপে সরল প্রোটিন ও সংযুক্ত প্রোটিন সম্বন্ধে আলোচনা কর। সরল প্রোটিনের আর্দ্রবিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায় কী কী? বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা কি করে বুঝবে? (C U. 64)

12. প্রোটিনের এরূপ 4টি বর্ণবিক্রিয়ার বর্ণনা কর যার দ্বারা তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পার যে প্রোটিনে (a) দুই-এর অধিক পেপটাইড বন্ধনী আছে (b) ফিনাইল গ্রুপ আছে, (c) টাইরোসিন আছে। (d) সিসটাইন আছে। (C. U. '85)

13. ইলেকট্রোফোরেসিস কাকে বলে? এর প্রয়োজনীয়তা কী? পেপার ইলেকট্রো-ফোরেসিস পদ্ধতির বর্ণনা কর। ক্রোমাটোগ্রাফি কী জিনিষ?

14 অনুঘটক ও এনজাইমের সংজ্ঞা লিখ। যেসব কারণসমূহ এনজাইমের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কর। (C U. '65)

15. এনজাইম বলতে কী বুঝায়? এনজাইমের কার্যপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C. U. '67, '76)

16. এনজাইম ক্রিয়া ও প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার আলোচনা কর। (C. U. H. '76)

17. এনজাইম গতিবিদ্যা সম্বন্ধে যা জান লিখ।

18. টীকা লিখ:

(1) জুইটার আয়ন ('76) ও সমতড়িৎবিন্দু, (2) আলোক-ঘূর্ণন, (3) কোলেস্টারোল ('66, '71, '73), (4) ফসফোলিপিড ('67), (5) গ্লাইকোলিপিড, (6) আয়োডিন সংখ্যা, (7) বনস্পতি, (8) স্যাপোনিফিকেশন সংখ্যা (9) ভাইরাস, (10) কো-এনজাইম ('72, '77), (11) মিউকোপলিস্যাকারাইড, (12) সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড কি ও তাদের উদাহরণ ('8.), (13) শ্বেতসার ও আয়োডিন দ্রবণ ('86) (14) নারিকেল তেলের আয়োডিন সংখ্যা ও স্যাপোনিফিকেশন সংখ্যা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য (85), (15) অ্যালবুমিন ও জিলাটিনের পৃথকীকরণ পরীক্ষা ('85) (16) এনজাইম ও কো-এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য ('84), (17) ফসফোপ্রোটিন ও গ্লাইকোপ্রোটিনের মধ্যে পার্থক্য ('84), (18) অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড ('83)।

ছয়

পৌষ্টিক তন্ত্র

ALIMENTARY SYSTEM
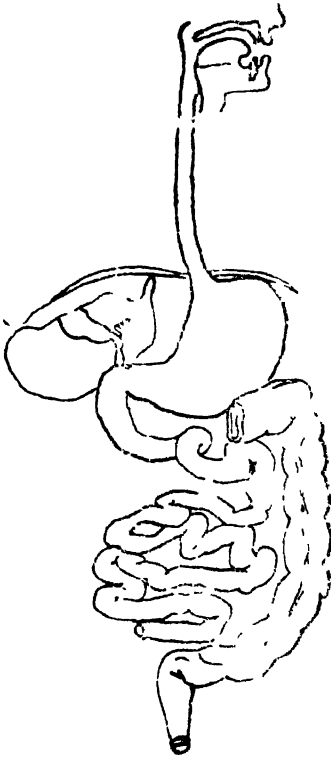
মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র পৌষ্টিকনালী এবং জিহ্বা, দাঁত ও পরিপাকের সংগে সম্পর্কযুক্ত আনুষংগিক গ্রন্থিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। পৌষ্টিকনালী পুনরায় মুখগহ্বর, গলবিল, গ্রাসনালী পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, মলাশয় ও মলনালীর সমন্বয়ে গঠিত। আনুষংগিক গ্রন্থি-, সমূহের মধ্যে প্রধান লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় যকৃৎ ও পিত্তথলি।

পৌষ্টিকনালীর শুরুতে মুখগহ্বর। মুখগহ্বরকে ঘিরে এবং তার অভ্যন্তরে যেসব দেহাংগের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে প্রধান ঠোঁট, গাল, দাঁত, মাড়ি, জিহ্বা এবং তালু। মুখগহ্বরে এসে উন্মুক্ত হয় লালাগ্রন্থির লালানালী। লালাগ্রন্থি তিনজোড়া গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত: (a) **কর্ণসন্নিহিত গ্রন্থি** (parotid gland), (b) **অধঃচোয়াল**

গ্রন্থি (submandibular gland) এবং (c) অধঃজিহ্বা গ্রন্থি (sublingual gland)। অধঃজিহ্বা গ্রন্থি সূক্ষ্ম রিভিনাসের নালীর (ducts of Rivinus) মাধ্যমে ফ্রেনুলামের (frenulum) পাশ দিয়ে মুখগহ্বরের তলদেশে উন্মুক্ত হয়। কর্ণসন্নিহিত গ্রন্থি স্টেনসেনের নালীর (Stensen's duct) মাধ্যমে এবং অধঃচোয়াল গ্রন্থি ওয়ারটোনের নালীর (Wharton's duct) মাধ্যমে মুখগহ্বরে প্রবেশ করে (6-3 নং চিত্র)।

6-2 নং চিত্র ঃ মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্র।

মুখগহ্বরের পরবর্তী অংশ গলবিল (pharynx) নামে পরিচিত। ইহা করোটির গোড়া থেকে ক্রিকয়েড তরুণাস্থি (cricoid cartilage) পর্যন্ত

বিস্তৃত থাকে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 5-6 ইঞ্চি। কোমল তালু (soft palate) এবং আলজিবের (uvula) দ্বারা ইহা অসম্পূর্ণভাবে ঊর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশে বিভক্ত থাকে।

গলবিলের পরবর্তী অংশ গ্রাসনালী। এর দৈর্ঘ্য 10-12 ইঞ্চি। গ্রাসনালীর পরই পাকস্থলী শুরু হয়। পাকস্থলীর শুরুতে কার্ডিয়াক স্ফিংটার (cardiac sphincter) বা গলীমুখ পেশীবলয়ের অবস্থান। পাকস্থলীর আকৃতি অনেকটা বাঁকা হুকের মত (6-4 নং চিত্র)। তিনটি অংশের সমন্বয়ে ইহা গঠিত: (1) ফানডাস (fundus) বা আমাশয়স্কন্ধ, (2) বডি (body) বা মধ্যস্কন্ধ এবং পাইলোরাস (pylorus) বা প্রণালী স্কন্ধ। ফানডাস গ্রাসনালীর শেষ প্রান্তের সংগে সমান্তরাল সরলরেখায় অবস্থান করে। পরবর্তী উল্লম্ব অংশ
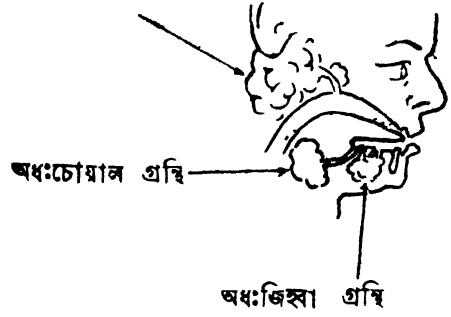
6-3 নং চিত্র: লালাগ্রন্থি।
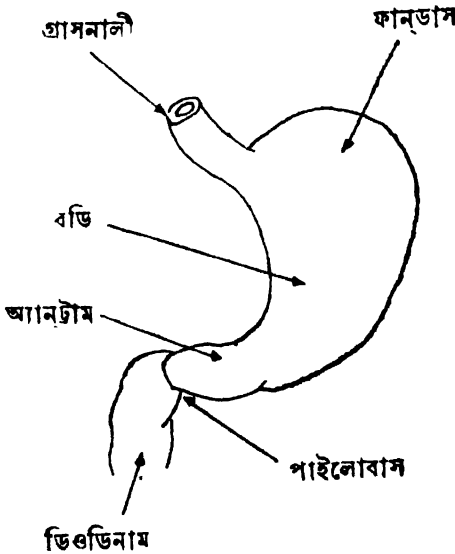
6-4 নং চিত্র: পাকস্থলী।

বডি বা মধ্যস্কন্ধ নামে পরিচিত। বডি পাইলোরাস থেকে একটি সুস্পষ্ট কৌণিক দূরত্বে অবস্থান করে। এই কোণ (incisura angularis) থেকে পাকস্থলীর শেষপ্রান্তের পাইলোরিক স্ফিংটার বা প্রণালীবলয় (pyloric sphincter) পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ পাইলোরাস নামে পরিচিত। পাইলোরাসের প্রথম প্রশস্ত অংশকে পাইলোরিক অ্যানট্রাম (pyloric antrum) বা প্রণালীকক্ষ এবং পরবর্তী অপ্রশস্ত নলাকার অংশকে পাইলোরিক ক্যানাল (pyloric canal) বা প্রণালীনালী বলা হয়।

পাকস্থলীর পরবর্তী অংশ **ক্ষুদ্রান্ত্র**। একে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (1) ডিওডিনাম (deodenum) বা **গ্রহণী**, (2) জেজুনাম (jejunum) বা **মধ্যক্ষুদ্রান্ত্র** এবং (3) ইলিয়াম (ileum) বা **নিম্নক্ষুদ্রান্ত্র**। মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় 25 ফুট বা 7·6 মিটার। ক্ষুদ্রান্ত্রের এই বিরাট দৈর্ঘ্যের জন্য তার পৃষ্ঠতলীয় ক্ষেত্রফল অত্যন্ত বেশী হয়। ফলে গৃহীত খাদ্যবস্তু পরিপাক ও বিশোষণে প্রচুর সময় পায়।

সাধারণ পিত্তনালী ও অগ্ন্যাশয়নালী সম্মিলিতভাবে **ভ্যাটারের নালী-স্ফীতির** (ampula of Vater) মাধ্যমে ডিওডিনামে উন্মুক্ত হয়। **পিত্তনালী** পিত্তাশয় (gall bladder) থেকে উৎপন্ন হয়। পিত্তাশয় একটি ফাঁপা, নাশপাতি আকারের অংগাবিশেষ, যা তির্যকভাবে যকৃতের নিম্নতলে অবস্থান করে। ইহা ফান্ডাস, বডি ও নেক্ (neck) এই তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। যকৃৎ দেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি হিসাবে মধ্যচ্ছদার ঠিক নিম্নদেশে উদর-গহ্বরের ঊর্ধ্বে ও ডানপাশে অবস্থিত। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসাবে ইহা পিত্তরস ক্ষরণ করে, যা প্রথমে যকৃৎনালী ও পরে সাধারণ পিত্তনালীর মাধ্যমে গ্রহণী বা ডিওডিনামে পৌঁছয় (6-5নং চিত্র)। **অগ্ন্যাশয়নালী** অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা গ্রন্থির ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট (intercalated
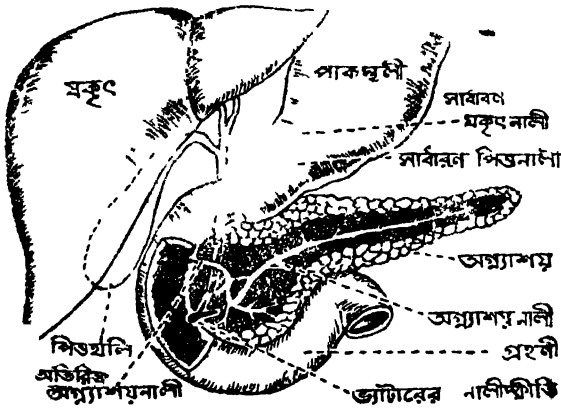
6-5নং চিত্র : যকৃৎ, পিত্তাশয় ও অগ্ন্যাশয়।

duct) থেকে উৎপন্ন হয়। এই ডাক্‌ট বা নালীসমূহ পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রধান অগ্ন্যাশয় নালী বা উইর্সাং নালী (duct of Wirsung) গঠন করে। অগ্ন্যাশয় নালী অগ্ন্যাশয়ের জারকরসকে ভ্যাটারের নালীস্ফীতির মাধ্যমে ডিওডিনামে

পৌঁছে দেয়। এছাড়া অগ্ন্যাশয়ে অতিরিক্ত অগ্ন্যাশয়নালী (accessory pancreatic duct) বা স্যান্টোরিনির নালী (duct of Santorini) থাকে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের পরই বৃহদন্ত্র শুরু হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের মধ্যবর্তী স্থানে ইলিও-কোলিক স্ফিংটারের (ileocolic sphincter) অবস্থান। বৃহদন্ত্রের গোড়াতে ভারমিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স (vermiform appendix) বা কীটোপাংগ অবস্থিত।
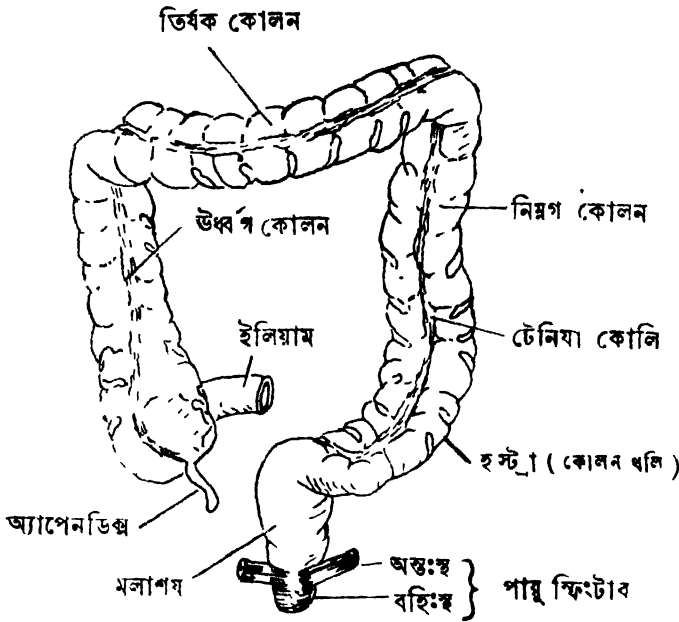
6-6 নং চিত্র : বৃহদন্ত্র।

বৃহদন্ত্রের পরবর্তী অংশ মলাশয় ও মলনালী নামে পরিচিত। মলাশয় 6-7½ ইঞ্চি দীর্ঘ। মলনালী পায়ুছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়।

পৌষ্টিকনালীর কলাস্থানিক গঠন
Histology of Alimentary Canal

পৌষ্টিক নালী প্রধানত 4টি স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। প্রস্থচ্ছেদে এই স্তরগুলো ভেতর থেকে বাইরের দিকে নিম্নলিখিতভাবে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত থাকে : (a) শ্লেষ্মাস্তর (mucosa), (b) অধঃশ্লেষ্মাস্তর (submucosa), (c) বহিঃস্থ পেশীস্তর (muscularis externa) এবং (d) সেরাসস্তর (serosa)। পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশের গঠনগত পরিবর্তন প্রধানত তাদের শ্লেষ্মাস্তরেই

পরিলক্ষিত হয় এবং এই পরিবর্তন তাদের বিভিন্ন কার্যাবলীর সংগে ঘনিষ্টভাবে সংগতিপূর্ণ। মুখগহ্বর ও গলবিলে শ্লেষ্মান্তর ছাড়া অন্য কোন স্তরই সম্পূর্ণভাবে বিন্যস্ত থাকে না। গ্রাসনালীর শুরু থেকে অতিরিক্ত যে উপাদানের আবির্ভাব ঘটে তাকে পেশীশ্লেষ্মাস্তর (muscularis mucosa) নামে অভিহিত করা হয়।
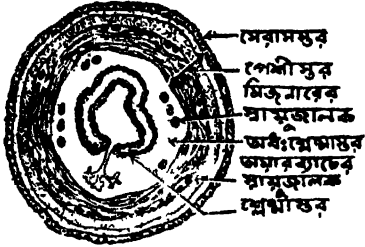
6-7নং চিত্র : পৌষ্টিকনালীর স্তর।

ইহা অনৈচ্ছিক পেশীর সমন্বয়ে গঠিত এবং এর অধিকাংশ পেশীতন্তুই অনুদৈর্ঘ্যে বিস্তৃত থাকে। পাকস্থলী ছাড়া অন্যত্র বহিঃস্থ পেশীস্তর (muscularis externa) দুটো নিয়মিত স্তরের দ্বারা গঠিত : (1) অন্তঃস্থ বৃত্তাকার স্তর (inner circular layer) এবং 2 বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য স্তর (outer longitudinal layer)। অন্যান্য জৈব থলীর মত পাকস্থলীর পেশী অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত থাকে, বিশেষত উর্ধ্বাংশে। ব্যবচ্ছেদে তিনটি অস্পষ্ট পেশীস্তর দেখা যায়। পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশে অধঃ-শ্লেষ্মান্তরও ভিন্ন হয়, বিশেষভাবে পৌষ্টিকগ্রন্থির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির দিক দিয়ে।

গ্রাসনালী থেকে শুরু করে সমগ্র পৌষ্টিক নালীতে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দুটো স্নায়ুজালকের (nerve plexus) উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় : (a) মেইজ্নারের স্নায়ুজালক (Meissner's plexus), একে অধঃশ্লেষ্মান্তরে দেখা যায় : (b) অয়ারব্যাচের স্নায়ুজালক (Auerbach's plexus), একে বহিঃস্থ পেশীস্তরের অন্তর্বর্তী স্তরদুটোর মধ্যে দেখা যায়।

মুখগহ্বর ও গলবিল
Oral Cavity and Pharynx

শ্লেষ্মাস্তর প্রধানতঃ দুটো উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত : একটি আবরণীকলার স্তর (lining) এবং অপরটি সংযোগরক্ষাকারী কলার ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া (lamina propria)। দাঁতের উপরিতল ছাড়া সমগ্র মুখগহ্বরটি স্তরীভূত আবরণীকলার দ্বারা আবৃত থাকে। ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া অধিকতর ঘন হয় এবং অধঃশ্লেষ্মান্তর কিছুসংখ্যক নির্দিষ্ট অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়।

গলবিল তিনটি স্তরের সমন্বয়ে গঠিত : (a) শ্লেষ্মাস্তর, (b) পেশীস্তর এবং (c) সেরাসস্তর। অধঃশ্লেষ্মাস্তর অনুপস্থিত। শ্লেষ্মাস্তরের আবরণীকলা গলবিলের সব স্থানে সমান নয়। নাসা গলবিলে ইহা কেশাকার ছদ্মস্তরীভূত স্তম্ভাকার ধরনের (ciliated pseudostratified columnar type)। নিম্নাংশে ইহা স্তরীভূত আচ্ছাদক আবরণী কলায় রূপান্তরিত হয়। গলবিলের ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া একটি বলিষ্ঠ, তন্তুময় স্থিতিস্থাপক স্তর। পেশীস্তর অস্থিপেশীর সমন্বয়ে গঠিত এবং অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত থাকে। সেরাসস্তরও তন্তুময় স্থিতিস্থাপক কলার একটি বলিষ্ঠ স্তর, যা গলবিলকে চারিপাশের অংগসমূহে আটকে রাখে। নাসা-গলবিলে লসিকাকলার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এদের সমাবেশকে ফ্যারিন্জিয়েল টন্সিল নামে অভিহিত করা হয়।

গ্রাসনালী
Esophagus

পৌষ্টিক নালীর মধ্যে গ্রাসনালী সর্বাধিক পেশীবহুল অংশ। জল ও খাদ্য গ্রহণের সময় ছাড়া বহিঃস্থ পেশীস্তরের অন্তঃস্থ বৃত্তাকার স্তরের সংকোচনের ফলে
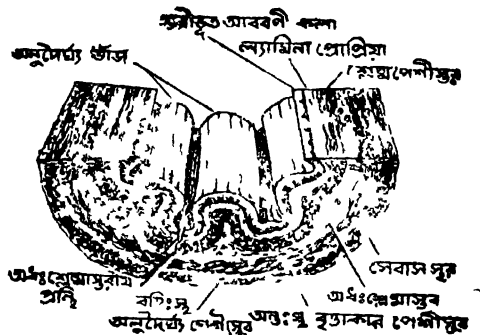
6-8 নং চিত্র : গ্রাসনালীর প্রস্থচ্ছেদ।

গ্রাসনালীর অভ্যন্তরে অনুদৈর্ঘ্য ভাঁজের সৃষ্টি হয় (6-8নং চিত্র)। গ্রাসনালী 4টি স্তর ও গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। স্তরগুলোর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

1. শ্লেষ্মাস্তর (mucosa) : শ্লেষ্মাঝিল্লি স্তরীভূত আচ্ছাদক আবরণী কলার দ্বারা গঠিত। ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া সংযোগরক্ষাকারী কলার সূক্ষ্ম তন্তুর দ্বারা গঠিত। তন্তুজালে ফাইব্রোব্লাস্ট ও হিস্টিওসাইট কোষ এবং কোন কোন অংশে লিম্ফোসাইটের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। পেশীশ্লেষ্মাস্তর (muscularis

mucosa) প্রধানত অনুদৈর্ঘ্য অনৈচ্ছিক পেশীর সমন্বয়ে গঠিত। কিছুসংখ্যক অন্তঃস্থ পেশীতন্তু বৃত্তাকারে বিন্যস্ত থাকে।

2. **অধঃশ্লেষ্মান্তর** (Submucosa) : ইহা প্রধানত স্থূল ও শিথিলভাবে বিক্ষিপ্ত কোলাজেন তন্তুর দ্বারা গঠিত। অধঃশ্লেষ্মান্তরে অধিকতর বৃহদাকারের রক্তনালী, লসিকানালী এবং কখনও কখনও পরাস্বতন্ত্র গ্যাংগ্লিয়ন স্নায়ুকোষের জালকে (plexus) দেখা যায়।

3. **বহিঃস্থ পেশীস্তর** (Muscularis externa) : গ্রাসনালীর প্রথম এক-চতুর্থাংশ বা তারও কম অংশের বহিঃস্থ পেশীস্তর প্রধানত অস্থিপেশীর দ্বারা গঠিত। গলবিলের সংযোগস্থলে ইহা পর্যায়ক্রমে নিয়মিতভাবে অন্তঃস্থ বৃত্তাকাব এবং বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য স্তবে বিন্যস্ত হয। প্রতিটি স্তরে কিছুসংখ্যক অনৈচ্ছিক পেশীতন্তুর আবির্ভাব ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গ্রাসনালীর শেষের দিকে অস্থিপেশী সামগ্রিকভাবে অনৈচ্ছিক পেশীর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।
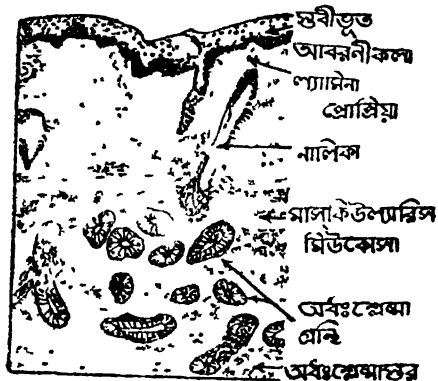
6-9 নং চিত্র : গ্রাসনালীর কলাস্থানিক গঠন।

4. **সেরাসস্তর** (Serous layer) : সেরাসস্তর প্রধানত শিথিলভাবে বিন্যস্ত সংযোগরক্ষাকারী কলা দ্বারা গঠিত। এই স্তর গ্রাসনালীকে তার চারিপাশের দেহাংগের সংগে আবদ্ধ করে রাখে।

গ্রাসনালীস্থিত গ্রন্থি (Glands of esophagus) : গ্রাসনালীর শ্লেষ্মান্তর ও অধঃশ্লেষ্মান্তরে গ্রন্থি দেখতে পাওয়া যায়। শ্লেষ্মান্তরীয় (mucosal gland) গ্রাসনালীর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন অংশের ল্যামিনা প্রোপ্রিয়াতে নিহিত থাকে। এরা শাখাযুক্ত নলাকার গ্রন্থি। এরা শ্লেষ্মাজাতীয় পদার্থ ক্ষরণ করে। অধঃশ্লেষ্মান্তরীয় গ্রন্থির (submucosal glands) আকৃতি আদর্শ শ্লেষ্মাথলীর (mucous alveoli) মত। ক্ষুদ্র গ্রন্থিনালী পরস্পর যুক্ত হয়ে যে প্রধান নালী গঠিত হয় তা অধঃশ্লেষ্মান্তর ও শ্লেষ্মান্তরের মাধ্যমে নির্গত হয় এবং নির্গমনের আগে নালীস্ফীতি গঠন করে।

পাকস্থলী

Stomach

পাকস্থলী গ্রাসনালী থেকে ডিওডিনাম পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। গ্রাসনালী স্তরীভূত থেকে সরল স্তম্ভাকার কলায় রূপান্তরিত হয়।

1. **শ্লেষ্মাস্তর** (mucosa) : পাকস্থলীর শ্লেষ্মাস্তর উপরিতলীয় আবরণী কলা, ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া, পেশীশ্লেষ্মাস্তর এবং পাকস্থলীয় গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত।

(a) **উপরিতলীয় আবরণীকলা** (the surface epithelium) : উপরিতলীয় আবরণীকলা স্তম্ভাকার আবরণীকোষের দ্বারা গঠিত। আবরণীকোষের পেয়ালাসদৃশ শীর্ষদেশ **মিউসিজেনে** (mucigen) পূর্ণ থাকে। এই মিউসিজেন নিউট্রাল পলিস্যাকারাইড বিশেষ। নিউক্লিয়াস গোলাকার বা ডিম্বাকার হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের আববণীকোষের মত এদেব মুক্তপ্রান্ত ডোবাদার (striated) নয়। তবে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে এদের মুক্তপ্রান্তে মাইক্রোভিলাস (microvilli) পরিলক্ষিত হয়।

আবরণীকলা যতই গ্যাস্ট্রিক পিটের (gastric pits) গভীরে প্রবেশ করে
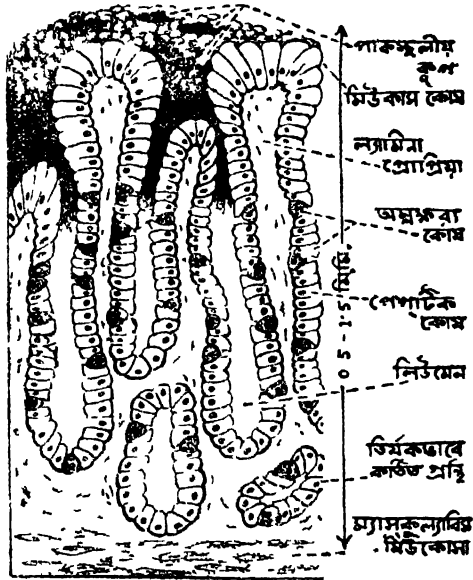
6-10 নং চিত্র : পাকস্থলীর উপরতলীয় আবরণী কলা।

ততই আবরণীকোষের উচ্চতা হ্রাস পায়। মিউসিজেনও সংকীর্ণ শীর্ষঅঞ্চলে সীমিত হয়ে পড়ে (6-10নং চিত্র)।

(b) **ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া** (Lamina propria) : ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া প্রধানত সূক্ষ্ম সংযোগী কলাতন্তু, সংযোগী কলাকোষ এবং গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। ল্যামিনা প্রোপ্রিয়াতে কখনও কখনও অনৈচ্ছিক পেশীকোষও পরিলক্ষিত হয়। এর কোন কোন অঞ্চলে গ্রন্থির সংখ্যা এত বেশী থাকে, যার ফলে সংযোগী কলা-তন্তু শীর্ণ স্ট্রাণ্ডে (strand) হ্রস্বীভূত হয়। এই অঞ্চলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল **সলিটারী ফলিকল** (solitary follicles)। সলিটারী ফলিকল উপলসিকা পিণ্ড বিশেষ (lymphatic nodules)। পাইলোরাসে প্রায়ই এদেরে দেখা যায়।

(c) **পেশীশ্লেষ্মাস্তর** (Muscularis mucosa) : এই শীর্ণস্তর অনৈচ্ছিক পেশীর দ্বারা গঠিত। অনৈচ্ছিক পেশীতন্তু বৃত্তাকার ও অনুদৈর্ঘ্য এই উভয় ভাবেই বিস্তৃত থাকে। গ্রন্থিসমূহের অন্তর্বর্তী স্থানে ল্যামিনা-প্রোপ্রিয়া পর্যন্ত ইহা সম্প্রসারিত থাকে।

(d) **পাকস্থলীয় গ্রন্থি** (Glands of stomach) : তিন ধরনের পা ক স্থ লীয় গ্র ন্থি র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় :

(a) **থলিগ্রন্থি** (cardiac gland), (b) **পাকাশয় গ্রন্থি** (gastric gland) এবং (c) **প্রণালীগ্রন্থি** (pyloric gland)।

কার্ডিয়াক গ্ল্যাণ্ড বা থলিগ্রন্থিকে গ্রাসনালী ও পাকস্থলীর সন্নিহিত থলিঅঞ্চলে দেখা যায়। পাকাশয়গ্রন্থি শ্লেষ্মাস্তরের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়েই বিস্তৃত থাকে। প্রণালীগ্রন্থি পাইলোরাসের উপরের অংশে দেখা যায়।

পাকাশয়গ্রন্থি পাকস্থলীর জারকরসের প্রয়োজনীয় উপাদান ক্ষরণ করে। অপর গ্রন্থিদ্বয় শ্লেষ্মাগ্রন্থি হিসাবে সক্রিয়।

পাকাশয় গ্রন্থি (Gastric gland) : পাকাশয়গ্রন্থি সরল, কখনও শাখাযুক্ত, নলাকার গ্রন্থিবিশেষ। গ্যাসট্রিক পিটে 3-7টি গ্রন্থি উন্মুক্ত হয়। প্রতিটি গ্রন্থি, (a) বহির্মুখ, (b) গ্রীবা (কুঞ্চিত অংশ), (c) দেহ (গ্রন্থির প্রধান অংশ) এবং (d) সামান্য স্ফীত ও বদ্ধ প্রান্তীয় ফানডাসের সমন্বয়ে গঠিত।

পাকাশয় গ্রন্থির প্রধান অংশে যেসব কোষের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে প্রধান : (1) **প্রধান বা পেপসিনক্ষরা কোষ** (cheif or peptic cell), (2) **প্রাচীরকোষ** (parietal) বা **অম্লক্ষরা কোষ** (oxyntic cell) (3) **শ্লেষ্মাক্ষরা গ্রীবাকোষ** (mucous neck cell) এবং (4) **আর্জেনটাফিন**

সেল (argentafin cell) বা রূপাসক্ত কোষ শেষোক্ত কোষকে বিশেষ ধরনের বর্ণপ্রয়োগের মারফৎ সনাক্ত করতে হয়।

প্রধান বা পেপ্‌সিনক্ষরা কোষ সংখ্যায় ও আকারে সুবৃহৎ। এরা এন্‌জাইম পেপ্‌সিনের পূর্বসূরী **পেপ্‌সিনোজেনের** (pepsinogen) সংশ্লেষণ ও ক্ষরণ ঘটায়। এছাড়া ইঁদুরের পেপ্‌সিনক্ষরা কোষ (মানুষের প্রাচীর কোষ) একটি **গ্লাইকোপ্রোটিন** (আণবিক ওজন 60,000) ক্ষরণ করে, যা স্বাশ্রয়ী উপাদান (intrinsic factor) হিসাবে ভিটামিন B_{12} এর বিশোষণে সহায়তা করে।

প্রধান বা পেপ্‌সিনক্ষরা কোষ আয়তাকার বা পিরামিডসদৃশ। নিউক্লিয়াস নিম্ন-অর্ধাংশে অবস্থান করে। নিউক্লিয়াসের নিম্ন ও পার্শ্বদেশে যেসব ক্ষারাসক্ত পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তারা প্রধানতঃ অন্তঃকোষজালক, রাইবোসোম ও RNA-এর সমন্বয়ে গঠিত। কোষের শীর্ষদেশে সূক্ষ্ম সাইটোপ্লাজমীয় জালক স্থানে **জাইমোজেন কণার** (zymogen) অবস্থান। জাইমোজেনকণা পেপ্‌সিনোজেন হিসাবে সঞ্চিত থাকে।

প্যারাইটাল বা প্রাচীর কোষ HCI ক্ষরণ করে। এদের আকৃতি ডিম্বাকার বা বহুভুজাকার। নিউক্লিয়াস কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। কোষে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা 2 বা তারও বেশী হতে পারে। সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানাদার অ্যাসিড অ্যানিলিনের দ্বারা বর্ণযুক্ত হয়), অসংখ্য মাইটোকন্‌ড্রিয়াযুক্ত এবং মসৃণ অন্তঃকোষজালক সম্পন্ন। গ্রন্থির গ্রীবাস্থানে এদের সংখ্যা সর্বাধিক। আন্তর কোষীয় ক্যানালিকুলাসের (intercellular canaliculi) মাধ্যমে এরা গ্রন্থির অভ্যন্তরের সংগে সংযোগ রক্ষা করে।

শ্লেষ্মাক্ষরা গ্রীবাকোষ দেখতে ঘনতলাকার বা অনুচ্চ স্তম্ভাকার। এদের সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানাযুক্ত। ডিম্বাকৃতি নিউক্লিয়াস গোড়ার দিকে অবস্থান করে। সূক্ষ্ম দানা ক্ষুদ্রাকার মিউসিজেনকণা বিশেষ (mucigen granules)। এই মিউসিজেন একটি অ্যাসিড মিউকোপলিস্যাকারাইড (acid mucopolysaccharide)। অপরপক্ষে আবরণীকোষে মিউসিনোজেন নিউট্রাল পলিস্যাকারাইড। গ্রীবাকোষের ক্ষরণপদার্থ HCI এবং প্রোটিন-বিশ্লিষ্টকারী এন্‌জাইমের আক্রমণ থেকে পাকাশয় গ্রন্থিকে সুরক্ষা করে।

আর্‌জেন্‌টাফিন সেল বা রৌপ্যাসক্ত কোষ সিল্‌ভার অ্যামোনিয়াম অক্সাইডের দ্বারা বর্ণযুক্ত হয় এবং তাদের সাইটোপ্লাজমীয় দানা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ক্রোমেট

(chromates) প্রয়োগে এই দানাগুলো ঈষৎ বাদামী-হলদে বর্ণের হয়। আরজেন্টাফিন সেল অন্তঃক্ষরা কোষ। অন্ত্রপাকাশয়ে যে 5 ধরনের অন্তঃক্ষরা

6-11 নং চিত্র : পাকস্থলীর কলাস্থানিক গঠন।

কোষের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে (Forssmann et al, 1967), তাদের প্রায় অধিকাংশই আরজেন্টাফিন সেল। টাইপ I অন্ত্রপাকাশয় অন্তঃক্ষরা কোষ অন্ত্রপাকাশয়ের সর্বত্রই ছড়িয়ে থাকে। তবে ডিওডিনামে তাদের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশী। পাকস্থলীতে এই পিরামিডসদৃশ কোষের মুক্তপ্রান্তে মাইক্রোভিলাস থাকে। ক্ষরণকণা (secretory granules) প্রধানত কোষের গোড়ার দিকে অবস্থান করে। টাইপ I কোষ সেরোটোনিন (serotonin) ক্ষরণ করে, যা অনৈচ্ছিক পেশীর সংকোচন ঘটায়। টাইপ II অন্তঃক্ষরা কোষের গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনেকটা অগ্ন্যাশয়ের আলফা কোষের মত। এদের প্রধানত পাকস্থলীতে দেখা

যায়। এছাড়া ডিওডিনামের ব্রুনার গ্রন্থি এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের লীবার কুহ্নের গ্রন্থিতেও এদের দেখা যায়। গোলাকার এই কোষগুলোর গল্‌জি বডি ও সাইটোপ্লাজমীয় দানা (500-700mμ ব্যাসসম্পন্ন) কোষের গোড়ার দিকে অবস্থান করে। টাইপ II কোষ **এন্টারোগ্লুকাগোন** (enteroglucagon) ক্ষরণ করে। **টাইপ** III অন্তঃক্ষরা কোষের গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনেকটা অগ্ন্যাশয়ের ডেল্টা-কোষের মত। এদের সাইটোপ্লাজমে প্রায় 150-250mμ ব্যাসসম্পন্ন দানার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এরা সম্ভবত **গ্যাস্ট্রিন** (gastrin) ক্ষরণ করে। **টাইপ** IV কোষ পাইলোরাসের সন্নিহিত শ্লেষ্মাঝিল্লিতে এবং **টাইপ** V কোষকে প্রধানত পাইলোরাসে দেখা যায়।

প্রণালীগ্রন্থি (Pyloric gland) : এরা সরল, শাখাযুক্ত এবং নলাকার গ্রন্থি। গ্রন্থিকোষ দেখতে পাকাশয়গ্রন্থির শ্লেষ্মাক্ষরা গ্রীবাদেশীয় কোষের মত। এদের ক্ষরণপদার্থও স্বতঃপরিপাককে রোধ করে। এই কোষগুলো তুলনামূলকভাবে লম্বাটে এবং তাদের নিউক্লিয়াস ডিম্বাকার। প্রাচীরকোষও এই গ্রন্থিতে দেখা যায়।

থলিগ্রন্থি (Cardiac gland) : গ্রাসনালীর সন্নিহিত অঞ্চলে গ্রন্থিকোষ স্বচ্ছ ; পরবর্তী কোষগুলোতে প্রধান ও প্রাচীর কোষের আর্বিভাব ঘটে।

2. **অধঃশ্লেষ্মাস্তর** (Submucosa) : ইহা স্থূল ও শ্লথভাবে বিন্যস্ত সংযোগরক্ষাকারী কলার সমন্বয়ে গঠিত। এই স্তরে বৃহদাকৃতি রক্তনালী, স্নায়ু ও মেজ্নারের স্নায়ুজালকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

3. **পেশীস্তর** (Muscular coat) : পাকস্থলী প্রধানত তিনটি পেশীস্তরের সমন্বয়ে গঠিত : (1) অন্তঃস্থ তির্যক (inner oblique), (2) মধ্যস্থ বৃত্তাকার (middle circular) এবং (3) বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য (outer longitudinal)। ফান্ডাসে পেশীর বাণ্ডেল এলোপাতাড়িভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে, তাই সেখানে তিনটি স্তরকে পৃথক করা সম্ভবপর হয় না। পাইলোরাসে অন্তঃস্থ মধ্যস্তর অধিকতর পুরু হয়ে পাইলোরিক স্ফিংটার বা প্রণালী পেশীবলয় গঠন করে।

4. **সেরাস্তর** (Serosa) : সেরাসস্তর শ্লথভাবে বিন্যস্ত সংযোগরক্ষাকারী কলা এবং তাকে আবৃতকারী মেসোথেলিয়ামের (mesothelium) সমন্বয়ে গঠিত।

ক্ষুদ্রান্ত্র
Small Intestine

ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনাম, জেজুনাম এবং ইলিয়ামের মধ্যে গঠনগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, অধঃশ্লেষ্মান্তর **ব্রুনার গ্রন্থির** (Brunner's gland) উপস্থিতির দরুণ ডিওডিনামকে যেমন সহজভাবে সনাক্ত করা যায়, তেমনি লসিকাকলার সমাবেশ **পেয়ার প্যাচের** (Peyer's patches) উপস্থিতি দেখে ইলিয়ামকে চেনা যায়।

ক্ষুদ্রান্ত্রকে অনুদৈর্ঘ্যে কেটে উন্মুক্ত করলে তার অন্তঃস্থ প্রাচীরে যেসব পরস্পর সমান্তরাল এবং অংশত বৃত্তাকার বা তির্যক ভাঁজ পরিলক্ষিত হয় তাদের **প্লিকা সারকুলারিস** (plicae circularis) নামে অভিহিত করা হয়। ডিওডিনামের ঊর্ধ্বাংশে এরা অনুপস্থিত, জেজুনামে সর্বোচ্চ এবং ইলিয়ামে নাতিদীর্ঘ। ক্ষুদ্রান্ত্র খাদ্যের দ্বারা স্ফীত হয়ে উঠলেও এই ভাঁজগুলো পাকস্থলীর মত অদৃশ্য হয়ে যায় না।

ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মান্তরের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তার অঙ্গুলীসদৃশ প্রক্ষেপ বা **ভিলাস** (Villi)। ডিওডিনামে এরা **পত্রাকার**, জেজুনামে **গোলাকার** এবং ইলিয়ামে **মুগুরাকৃতি** (club shaped)। শ্লেষ্মান্তরে সম্প্রসারিত যেসব সরল নলাকার গ্রন্থি ভিলাসের অন্তর্বর্তী স্থানে উন্মুক্ত হয় তাদের **লীবারকুহনের গ্রন্থি** (Crypts of Lieberkuhn) নামে অভিহিত করা হয়।

1. **শ্লেষ্মান্তর** (Mucosa) : শ্লেষ্মান্তর উপরিতলীয় আবরণীকলা, গ্রন্থিময় ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া এবং পেশীশ্লেষ্মান্তরের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতি বর্গমিলিমিটার শ্লেষ্মাঝিল্লিতে ভিলাসের সংখ্যা 20-30টি। জেজুনামে এদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু ইলিয়ামে বেশী। প্রতিটি ভিলাসের কেন্দ্রস্থলে বদ্ধপ্রান্ত লসিকানালী বিন্যস্ত থাকে। এরা **ল্যাকটিয়েল** (lactial) নামে পরিচিত। স্নেহপদার্থের পরিবহনে এরা অংশগ্রহণ করে। স্নেহপদার্থের উপস্থিতির জন্য এদের দুধের মত সাদা দেখায়।

আবরণীকলা (Epithelium) : ভিলাসকে আবৃতকারী আবরণীঝিল্লি স্তম্ভাকার আবরণী কোষের দ্বারা গঠিত। দুধরনের কোষ এই ঝিল্লিতে দেখা যায় : (a) **স্তম্ভাকার বিশোষণধর্মী কোষ** (columnar absorbing cell) এবং (b) **গোবলেট কোষ** (goblet cell)। প্রথম প্রকার কোষের

সাইটোপ্লাজমে সূক্ষ্ম দানাদার পদার্থ পূর্ণ থাকে। খাদ্য বিশোষণের সময়ে এদের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সাইটোপ্লাজমে প্রায়ই স্নেহকণা দেখা যায়। কোষের নিউক্লিয়াস ডিম্বাকার এবং সাধারণত কোষের নিম্ন-অর্ধাংশে অবস্থান করে। এদের প্রান্তদেশ ডোরাদার (striated free boarder)। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, কোষের প্রান্তীয় ডোরা ঘনসন্নিবিশিষ্ট **মাইক্রোভিলাসে** (microvilli) গঠিত। বিভিন্ন কোষে এদের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন, ভিলাসশীর্ষে এদের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য প্রায় 1-1·5μ। অতিবিবর্ধক ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফে দেখা যায়, মাইক্রোভিলাসের উপরিস্থিত ঝিল্লির বহির্দেশে অত্যন্ত সূক্ষ্ম শাখাযুক্ত আঁশ বিন্যস্ত থাকে, যা ঝিল্লির উপরিতলে একটি আঁশ-আস্তরণ (fuzzy coat) গঠন করে। বর্ণবিক্রিয়ায় প্রমাণিত হয়েছে আঁশ-আস্তরণ প্রোটিন-পলিস্যাকারাইডে গঠিত। ইহা 0·1—0·5μ পুরু।

প্রতিটি মাইক্রোভিলাসের কেন্দ্রদেশে অনুদৈর্ঘ্যে বিন্যস্ত যেসব সূক্ষ্ম আঁশ বা ফিলামেন্টের (filament) সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, তারা নিম্নপ্রান্তে সাইটোপ্লাজমীয় প্রান্তীয় জালকে (terminal web) গিয়ে মুক্ত হয়। এই প্রান্তীয় জালক সন্নিহিত অঞ্চল সাইটোপ্লাজমীয় কোষপদার্থ থেকে মুক্ত থাকে।

6-12 নং চিত্র : ক্ষুদ্রান্ত্রীয় ভিলাস।

কোষের ডোরাদার মুক্তপ্রান্তে বিভিন্ন ধরনের এন্‌জাইমের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। অতএব ইহা যে শুধুমাত্র বিশোষণ ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তা নয়, পরিপাকের অন্তিম পর্যায়ে এনজাইমেরও সরবরাহ করে। অ্যাল্‌কালাইন ফস্‌ফাটেজ, ম্যালটেজ, অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট, অ্যামাইনো পেপ্‌টিডেজ প্রভৃতি এনজাইম এই অংশে পরিলক্ষিত হয়।
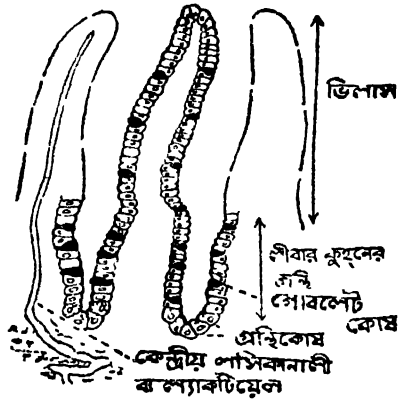
কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিবডি, মসৃণ অন্তঃকোষজালক, মুক্ত রাইবোসোম প্রভৃতিও সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

দুটো সন্নিহিত স্তম্ভাকার ক্ষরণধর্মী কোষ পরস্পর যে আন্তরকোষীয় সংযোগ (intercellular attachment) স্থাপন করে, তার তিনটি পর্যায়ক্রম লক্ষ্য

6-14নং চিত্র : ডিওডিনামের আণুবীক্ষণিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য।

করা যায় : (1) **জন্‌লা অক্‌লুডেন্‌স** (zonula occludens), (2) **জন্‌লা অ্যাডহারেন্‌স** (zonula adherens) এবং (3) **ডেস্‌মোসোম** (desmosome) বা **ম্যাকুলা অ্যাড্‌হারেনস্‌** (macula adherens) (6-13নং চিত্র)।

গোবলেট কোষ এককোষী শ্লেষ্মাক্ষরা গ্রন্থিহিসাবে স্তম্ভাকার বিশোষণধর্মী কোষের মধ্যে বিক্ষিপ্ত থাকে। প্রথমে এসব কোষে খুব স্বল্পসংখ্যক মিউসিজেন কণা (mucigen granules) দেখা যায়। কোষের শীর্ষদেশে মিউসিজেন কণার সংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে এই কোষগুলো সম্প্রসারিত হয় এবং আদর্শ গোবলেট কোষের আকার ধারণ করে। সাধারণভাবে বর্ণপ্রয়োগের সময় মিউসিজেনকণা দ্রবীভূত হয়ে যাওয়ার ফলে এই কোষগুলোকে শূন্যগর্ভ মনে হয়। বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা মিউসিজেনকণাকে সংরক্ষণ করলে দেখা যায়, এরা ক্ষারাসক্ত, বহুবর্ণগ্রাহী ও পিরিওডিক অ্যাসিড স্কিফ (periodic acid schiff) সুগ্রাহী। এদের মাইক্রোভিলাস নাতিদীর্ঘ এবং স্বল্পসংখ্যক।

গোবলেট কোষের সংখ্যা ডিওডিনামে কম, তবে এদের সংখ্যা এর পরই জেজুনাম ও ইলিয়ামে বৃদ্ধি পায়।

লীবার কুহনের গ্রন্থি ক্ষুদ্রান্ত্রের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এরা সরল নলাকার গ্রন্থিবিশেষ। গ্রন্থি যে স্থানে গিয়ে উন্মুক্ত হয়, গ্রন্থিঝিল্লির আবরণী কোষ সেখানে ভিলাসের আবরণীকোষের সংগে একই সংগে মিশে যায়। গ্রন্থির ফান্‌ডাসে সন্নিহিত গ্রন্থিকোষ অধিকতর কম পরিণত হয় এবং স্তম্ভাকার বিশোষণধর্মী কোষের থেকেও কম উচ্চ হয়। শেষপ্রান্তে মাইক্রোভিলাস রয়েছে যা খুব পরিণত নয়, মাত্র 0·5μ বা তার চেয়েও কম দৈর্ঘ্যের।

লীবার কুহনের গ্রন্থিতে গোবলেট কোষের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থির উর্ধ্বাংশে এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হলেও, গ্রন্থির গোড়ার ঠিক উপরেও তাদের দেখা যায়।

এছাড়া লীবার কুহনের গ্রন্থির গভীরে স্থূল দানাদার **প্যানেথ কোষের** (cells of Paneth) সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। **আর্‌জেন্‌টাফিন কোষের** উপস্থিতিও লীবার কুহনের গ্রন্থিতে দেখা যায়। কখনও কখনও ভিলাসের আবরণীকোষের মধ্যেও এদের দেখা যায়। এদের সংখ্যা ডিওডিনামে বেশী, জেজুনাম ও ইলিয়ামে কম, অ্যাপেন্ডিক্সে প্রচুর।

ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া (Lamina propria) : ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া ভিলাসের

কেন্দ্রস্থলে, লীবার কুহ্ন গ্রন্থির অন্তর্বর্তী স্থানে এবং এই গ্রন্থি ও পেশী-শ্লেষ্মান্তরের মধ্যে অবস্থান করে। জালকতন্তু, সূক্ষ্মকোলাজেনতন্তু ও অসংখ্য স্থিতিস্থাপক তন্তুর সমন্বয়ে ইহা গঠিত। যেসব সংযোগরক্ষাকারী কলাকোষ এর মধ্যে নিহিত থাকে, তার মধ্যে প্রধানত ফাইব্রোব্লাস্ট, প্লাজমা কোষ, মাস্ট কোষ, ইওসিনোফিল ইত্যাদি। এর বিভিন্ন স্থানে লিম্ফোসাইটের প্রাচুর্য'ও লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া ল্যামিনা প্রোপ্রিয়াতে যেসব লসিকাকোষ থাকে তারা ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে যেসব লসিকাপিণ্ড গঠন করে তাদের **সলিটারী নোডিউল** (solitary nodules) বলা হয়। পাকস্থলীর চেয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।
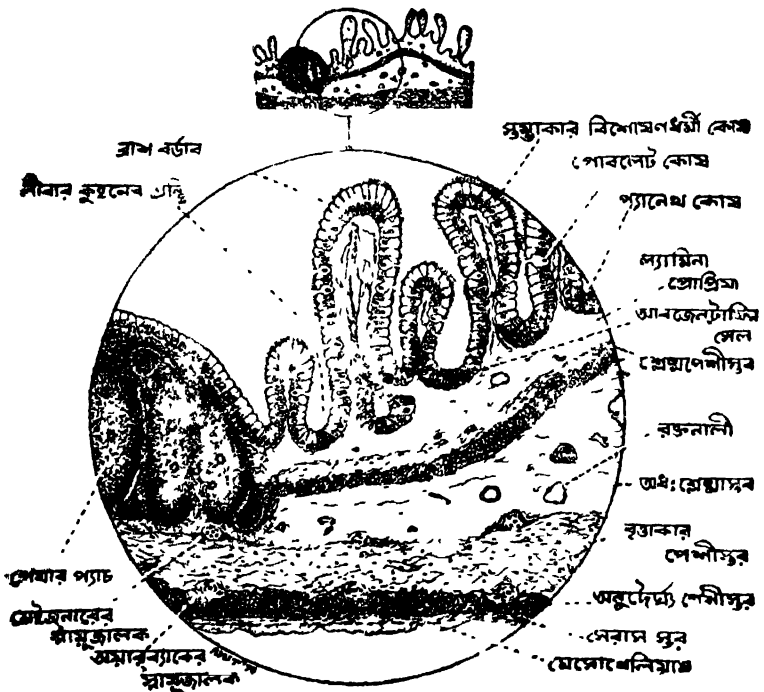
6-14 নং চিত্র : ইলিয়ামের আণুবীক্ষণিক গঠন।

ইলিয়ামে বহুসংখ্যক সলিটারী নোডিউল একস্থানে পুঞ্জীভূত হয়ে পেয়ার প্যাচ (peyer's patches) গঠন করে। প্রতিটি পেয়ার প্যাচে 10-70টি সলিটারী নোডিউল থাকে। এরা দেখতে গোলাকার কিন্তু ভিলাসের দ্বারা আবৃত থাকে না। একটিমাত্র স্তম্ভাকৃতি আবরণীকোষের একটি স্তর একে ক্ষুদ্রান্ত্রের লিউমেন (lumen) থেকে পৃথক করে রাখে। পেয়ার প্যাচের মূলদেশ

ল্যামিনা প্রোপ্রিয়াতে সীমিত থাকতে পারে না, অধঃশ্লেষ্মান্তরে সম্প্রসারিত হয়।

পেশীশ্লেষ্মান্তর শীর্ণ এবং অন্তঃস্থ বৃত্তাকার ও বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য অনৈচ্ছিক পেশীস্তরে তা গঠিত।

2. **অধঃশ্লেষ্মান্তর** (Submucosa) : পাকস্থলীর মত ক্ষুদ্রান্ত্রের অধঃশ্লেষ্মান্তরও শ্লথবিন্যস্ত সংযোগীকলা, বৃহদাকারের রক্তনালী ও লসিকানালীর সমন্বয়ে গঠিত। ডিওডিনামের অধঃশ্লেষ্মান্তরে **ব্রুনার গ্রন্থি** দেখা যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্যত্র এই গ্রন্থি অনুপস্থিত। ডিওডিনামের নিম্নপ্রান্তেও ব্রুনার গ্রন্থি অনুপস্থিত থাকে। এরা শাখাপ্রশাখাযুক্ত যৌগিক গ্রন্থি। স্তম্ভাকার আবরণীকোষের দ্বারা গঠিত। এরা অ্যালকালাইন মিউকোয়েড পদার্থ ক্ষরণ করে।

3. **বহিঃস্থ পেশীস্তর** (Muscularis externa) : ইহা দুটো সুস্পষ্ট বৃত্তাকার ও অনুদৈর্ঘ্য অনৈচ্ছিক পেশীস্তরে গঠিত। সংযোগরক্ষাকারী কলা পেশীতন্তুকে গ্রুপ ও বাণ্ডেলে বিভক্ত করে।

4 **সেরাসস্তর** Serosa) : পাকস্থলীর মত ইহা শ্লথ সংযোগরক্ষাকারী কলায় গঠিত এবং মেসোথেলিয়াম স্তরের দ্বারা আবৃত থাকে।

বৃহদন্ত্র

Large Intestine

পৌষ্টিকনালীর অন্যান্য অংশের মত বৃহদন্ত্রও 4টি স্তরে গঠিত।

1. **শ্লেষ্মান্তর** (Mucosa) : বৃহদন্ত্রের শ্লেষ্মান্তর মসৃণ এবং তাতে প্লিকা (plica) বা ভিলাস থাকে না। দীর্ঘ, ঋজু, নলাকার গ্রন্থিসমূহ সমগ্র শ্লেষ্মান্তরে বিস্তৃত থাকে। এদের লীবার কুহনের গ্রন্থি বলা হয়।

উপরিতলীয় আবরণীঝিল্লি স্তম্ভাকার বিশোষণধর্মী আবরণীকোষের দ্বারা গঠিত। এদের মুক্তপ্রান্তও ডোরাদার, তবে সংকীর্ণ। গোবলেট কোষ পূর্বোক্ত কোষের অন্তবর্তী স্থানে অবস্থান করে। এদের সংখ্যা বৃহদন্ত্রে সবচেয়ে বেশী। এই দুধরনের কোষ যথাক্রমে জলের বিশোষণ ও প্রচুরশ্লেষ্মা ক্ষরণের জন্য দায়ী। শ্লেষ্মা বৃহদন্ত্রের আবরণীঝিল্লির উপরিতলে পিচ্ছিলকারী পদার্থ হিসাবে পর্যায়ক্রমে শুকিয়ে যাওয়া মলের অগ্রগমনে সহায়তা করে।

ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া গ্রন্থির অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করে এবং অত্যন্ত সীমিত স্থান দখল করে থাকে, কারণ গ্রন্থিসমূহ খুব সন্নিকটে অবস্থান করে।

সলিটারী নোডিউল শ্লেষ্মাস্তরে অবস্থিত হলেও শ্লেষ্মাপেশীস্তর ও অধঃশ্লেষ্মাস্তরে বিস্তৃত হয়।

2. **অধঃশ্লেষ্মাস্তর** (Submucosa) ঃ শ্লথভাবে বিন্যস্ত সংযোগী-কলা, বৃহদাকারের রক্তনালী ও মেইজ্‌নারের স্নায়ুজালকের সমন্বয়ে অধঃশ্লেষ্মাস্তর গঠিত।

3. **বহিঃস্থ পেশীস্তর** (Muscularis externa) ঃ এই স্তরের গঠন বিন্যাসে খানিকটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অন্তঃস্থবৃত্তাকার স্তর সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট। এই স্তর একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে স্থূল হয়ে পড়ে বলে সমগ্র বৃহদন্ত্রের আকৃতি শ্রেণীবদ্ধ থলের মত দেখায়। অপরপক্ষে, অনুদৈর্ঘ্য পেশীস্তর তিনটি বলিষ্ঠ, সমদূরবর্তী অনুদৈর্ঘ্য বাণ্ডে রূপান্তরিত হয়। একে **টেনিয়া কোলি** (Tenia Coli) নামে অভিহিত করা হয়। এদের অন্তর্বর্তী স্থানের অনুদৈর্ঘ্য পেশী অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে পড়ে। বৃত্তাকার পেশীর সন্নিহিত বহির্দেশে সংযোগী-কলা ও তার মধ্যে নিহিত ওয়ারব্যাচ্ স্নায়ুজালক থাকে।
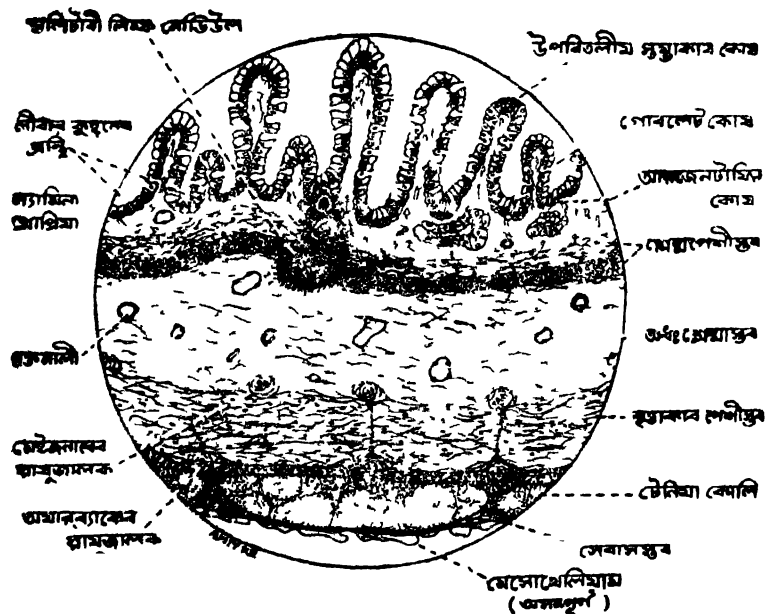
6-15 নং চিত্র ঃ বৃহদন্ত্রের আণুবীক্ষণিক গঠন।

4. **সেরাসস্তর** (Serosa) ঃ ইহা সংকীর্ণ সংযোগীকলা ও তাকে আবৃত-কারী মেসোথেলিয়ামের দ্বারা গঠিত। স্থানে স্থানে মেসোথেলিয়াম না

থাকার দরুণ সংযোগরক্ষাকারী কলা বৃহদন্ত্রকে তার সন্নিহিত দেহাংগের সংগে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারে।

ভার্মিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্সের 4টি স্তরের গঠনবিন্যাসও একই ধরনের।

মলাশয়

Rectum

মলাশয়ের গঠন প্রায় বৃহদন্ত্রের মতই। শ্লেষ্মান্তরে লীবার কুহনের গ্রন্থি আরও দীর্ঘ হয়। টোনিয়াকোলি অদৃশ্য হয় এবং সদৃশ অনুদৈর্ঘ্য পেশীস্তর গঠিত হয়। সেরাসস্তর অসম্পূর্ণ। ধারণঝিল্লি (mesentery) অনুপস্থিত।

মলনালী

Anal Canal

শ্লেষ্মাস্তরে স্থায়ী অনুদৈর্ঘ্য ভাজ (columns of Morgani) লক্ষ্য করা যায়। পায়ুরন্ধ্রের প্রায় 0·5 ইঞ্চি অদূরে এই ভাঁজগুলো অদৃশ্য হয়। এরা অনৈচ্ছিক পেশীর দ্বারা গঠিত। প্রতিটি ভাঁজে একটি ধমনী ও একটি করে শিরার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মলদ্বারের ঊর্ধ্ব শ্লেষ্মাস্তরের আবরণীঝিল্লি সরল স্তম্ভাকার কোষ, গোবলেট কোষ ও লীবার কুহনের গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। মলদ্বারে আবরণীঝিল্লি স্তরীভূত অকঠিন আবরণী কলায় রূপান্তরিত হয়। এরপরই ইহা বহিস্ত্বকে রূপান্তরিত হয়। লোম, সেবাসিয়াস গ্রন্থি, স্বেদগ্রন্থি প্রভৃতি পায়ুরন্ধ্রে আবির্ভূত হয়। তাছাড়া এই অংশের পেশীশ্লেষ্মান্তর অপসারী পেশীগুচ্ছে বিভক্ত হয়ে এরপর অদৃশ্য হয়।

অধঃশ্লেষ্মাস্তরে রক্তজালিকার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। শিরাগুলো প্রায় কুণ্ডলীকৃতভাবে বিন্যস্ত থাকে।

অনৈচ্ছিক পেশীর বৃত্তাকার স্তর পুরু হয়ে অন্তঃস্থ পায়ুবলয়ে (anal sphincter) পরিণত হয়। অনৈচ্ছিক পেশীর অনুদৈর্ঘ্য স্তর পায়ুবলয়ের উপরে বিস্তারলাভ করে এবং তারপরই সংযোগীকলায় ছড়িয়ে পড়ে। বহিঃস্থ স্ফিংটার বা পেশীবলয় ঐচ্ছিক পেশীর দ্বারা গঠিত হয়।

জিহ্বা ও আনুষংগিক গ্রন্থির কলাস্থানীয় গঠন

Histology of Tongue and Accessory Glands

জিহ্বা (Tongue)ঃ তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে জিহ্বা গঠিত। এই উপাদান তিনটি **আবরণীকলা, পেশী ও গ্রন্থি।** আবরণীকলা কঠিন ও

স্তরীভূত। **স্বাদকুঁড়ি** (taste buds) এবং **পিড়কা বা প্যাপিলা** (papilla) নামক দু'ধরনের বিশেষ দেহাংশ এর উপরে দেখা যায়। স্বাদকুঁড়িকে **ইন্দ্রিয়স্থান** (sense organ) বলা হয়। এদের নিম্নাংশ ফ্লাস্কের মত প্রশস্ত। এরা স্তরীভূত আচ্ছাদক আবরণীকলার দ্বারা আবৃত থাকে। প্যাপিলা বা পিড়কা শ্লেষ্মাঝিল্লির সূক্ষ্ম উদ্‌গত অংশবিশেষ। প্রায় 4 রকমের প্যাপিলা জিহ্বাতে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন: (a) **বেষ্টন প্যাপিলা** (cincumvallate papilla): সংখ্যায় এরা 6 থেকে 19-টির বেশী নয়। জিহ্বার বিপরীত পার্শ্বে ইংরাজী 'V'-এর আকারে এরা বিন্যস্ত থাকে। (b) **সূত্রাকার বা শাংকব প্যাপিলা** (filiform or conical papilla): এদের আকৃতি শংকুর মত। কেরাটিনযুক্ত (keratinised) আচ্ছাদক আবরণীকলার দ্বারা এরা গঠিত এবং ল্যামিনা প্রপ্রিয়ার (lamina propria) উপরে অবস্থিত। (c) **ছত্রাকবৎ প্যাপিলা** (fungiform papilla): তন্তুময় ল্যামিনা প্রপিয়ার উপরে অবস্থিত এবং আচ্ছাদক আবরণী-কলার দ্বারা আবৃত এই প্যাপিলার আকৃতি অনেকটা চেপ্‌টা, গোলাকার ছত্রাকের মত। (d) **পত্রাকার প্যাপিলা** (foliate papilla): পার্শ্বরেখার পশ্চাদংশে এরা তির্যক ভাঁজ হিসাবে অবস্থান করে (6-16নং চিত্র)।
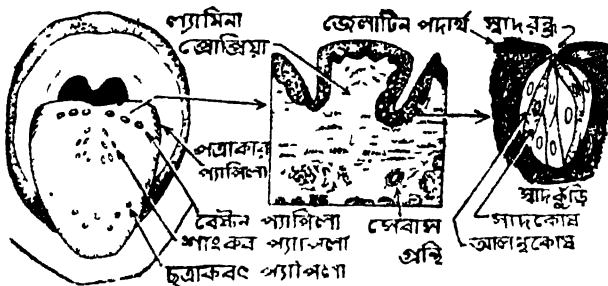
6-16 নং চিত্র: জিহ্বার স্বাদকুঁড়ি।

জিহ্বাস্থিত পেশী তির্যক ডোরাযুক্ত ঐচ্ছিক পেশী। যে 3 ধরনের গ্রন্থি জিহ্বায় দেখতে পাওয়া যায়, তাদের নাম **শ্লেষ্মাক্ষরাগ্রন্থি, সেরাসগ্রন্থি** এবং **লসিকাগ্রন্থি**। শেষোক্ত গ্রন্থি জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগে প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে। সম্মিলিত ভাবে এদের **জিহ্বাগত টনসিল** (lingual tonsil) বলা হয়।

আস্বাদন-অনুভূতি কোরডা টিম্‌প্যানিক (chorda tympanic): মুখ-স্নায়ুর শাখা) ও **গ্লসোফ্যারিংজিয়েল** (glossopharyngeal) স্নায়ুর

মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। এছাড়া সাধারণ অনুভূতিসমূহ (যথা : স্পর্শ, চাপ, উষ্ণতা ইত্যাদি) ট্রাইজেমিনেল (trigeminal) স্নায়ুর মারফৎ পরিবাহিত হয়।

লালাগ্রন্থি
Salivary Gland

কর্ণসন্নিহিত (parotid), অধঃচোয়াল (submandibular) এবং অধঃজিহ্বা (sublingual) এই তিনটি লালাগ্রন্থি আদর্শ স্তবক গ্রন্থিবিশেষ। গ্রন্থিকোষ, রক্তনালী, লসিকা ও স্নায়ুসমন্বিত যোজক-কলার কাঠামোয় এরা অবস্থান করে। মানুষের প্যারোটিড বা কর্ণসন্নিহিত গ্রন্থি সেরাস গ্রন্থি। অপর দুটিতে সেরাস ও মিউকাস (mucous) এই উভয়ধর্মী গ্রন্থিথলি (alveoli) দেখা যায়। এদের তাই মিশ্রগ্রন্থি নামে অভিহিত করা হয়। এক একটি গ্রন্থিথলির চারিপাশে গ্রন্থিকোষ একটিমাত্র স্তরে বিন্যস্ত থাকে। গ্রন্থিথলি থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালিকা নির্গত হয়ে পরস্পর যুক্ত হয় এবং বৃহৎ নালীর সৃষ্টি করে, যা লালাগ্রন্থি হিসাবে মুখগহ্বরে প্রবেশ করে।

1. **কর্ণসন্নিহিত গ্রন্থি** (Parotid gland) : কর্ণসন্নিহিত গ্রন্থি মানুষ, কুকুর, বিড়াল ও র‍্যাবিটে সর্ববৃহৎ লালাগ্রন্থি এবং সম্পূর্ণভাবে সেরাসধর্মী। সেরাসগ্রন্থি ও যোজককলার কাঠামো ছাড়াও নির্দিষ্ট যোজককলার ক্যাপসুলে ইহা আবৃত থাকে। সংযোজক কলাপ্রাচীর সমগ্র গ্রন্থিকে লোব (lobe) ও লোবিউলে (lobules) বিভক্ত করে। লোবিউলের মধ্যে অবস্থিত লালানালিকা (salivary duct) স্তম্ভাকৃতি আবরণীকোষের দ্বারা গঠিত। ক্ষরণপ্রক্রিয়ায় এরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এদের স্ট্রায়েটেড ডাক্ট (striated ducts) নামে অভিহিত করা হয়। স্ট্রায়েটেড ডাক্ট ও গ্রন্থিথলির মধ্যে যেসব সংকীর্ণ নালিকা গ্রন্থিথলি থেকে উৎপন্ন হয়, তাদের ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট (intercalated duct) বলা হয়। এরা চেপ্টাকৃতি আবরণী কলায় গঠিত। সেরাস গ্রন্থিতে কখনও কখনও চর্বিকোষ দেখা যায়। যাদের আকৃতি বয়স বৃদ্ধির সংগে বৃদ্ধি পায়।

সেরাসগ্রন্থি পিরামিডসদৃশ আবরণী কোষের দ্বারা গঠিত। কোষগুলো ভিত্তিঝিল্লির (basement membrane) উপর অবস্থান করে। এই সব কোষের আকৃতি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে নিউক্লিয়াসকে গোড়ার দিকে ঠেলে দেয়। কোষগুলোও খানিকটা স্ফীত হয়ে ওঠে। সক্রিয় অবস্থায় এই দানাগুলোর সংখ্যা হ্রাস পায় এবং তারা শুধুমাত্র কোষের শীর্ষদেশ দখল করে
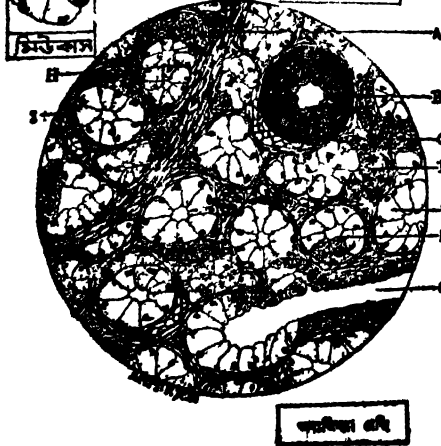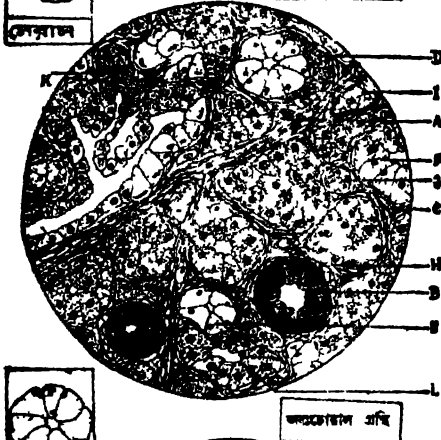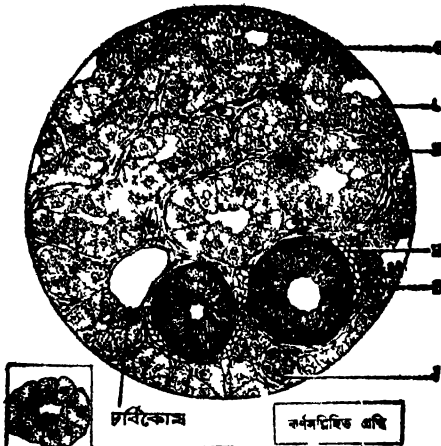
থাকে। এদেরে **জাইমোজেন দানা** (**zymogen granules**) নামে অভিহিত করা হয। এরা গ্রন্থির এনজাইমেব ক্ষরণ ঘটায়।

কোষের গোড়ার দিকে অসংখ্য বর্ণাসক্ত পদার্থের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এবা অমসৃণ অন্তঃকোষজালকেব গায়ে এটে থাকা রাইবোসোম গুটিকা। তাছাড়া সমান্তবালভাবে বিন্যস্ত বড় আকৃতির মাইটোকন্ড্রিয়া ও অন্তঃকোষ জালকের উপস্থিতিতে এই অংশকে ডোরাদাব মনে হয। বাইবোসোমেব গায়েই প্রোটিন এনজাইমেব সংশ্লেষণ সংঘটিত হয়। এ ভাবে সংশ্লেষিত এনজাইম পলিস্যাকাবাইডেব সংগে যুক্ত হয়ে ঝিল্লি--সীমিত জাইমোজেন দানায পরিণত হয।

6-17 নং চিত্র ঃ

লালাগ্রন্থির আণুবীক্ষণিক গঠন। A—ইন্টাব লোবুলার সেপ্টাম, B—স্ট্রায়েটেড ডাক্ট, C—ইনট্রালোবুলার ডাক্ট, D—সেরাস ডেমিলুন, F—মিউকাস গ্রন্থিথলি, F—মিশ্র গ্রন্থিথলি, G—ট্রানসলোবুলার ডাক্ট, H—বক্তজালিকা, I—উপশিরা, J—ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট, K—বাসকেট কোষ, L—সেরাস গ্রন্থিথলি। সেরাস =সেরাস গ্রন্থিথলি; মিউকাস= মিউকাস গ্রন্থিথলি।

এবং কোষশীর্ষের দিকে এগিয়ে যায়। এ ছাড়া সন্নিহিত কোষের অন্তর্বর্তী স্থানে অন্তরকোষীয় ক্যানালিকুলাস (intercellular canaliculi) দেখা যায়।

সেরাসকোষ ছাড়াও বিশেষ প্রয়োগকৌশলের মাধ্যমে সেরাস কোষ ও ভিত্তি-ঝিল্লির অন্তর্বর্তী স্থানে বিশেষ ধরনের নক্ষত্রাকৃতি কোষের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এদের **বাস্‌কেট কোষ** (basket cells) বলা হয়। স্বেদগ্রন্থির **মায়োএপিথেলিয়াম** কোষের সংগে এদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এদের সংকোচন ক্ষরণপদার্থকে ক্ষরণনালিকায় নিঃসৃত হতে সহায়তা করে।

2. **অধঃচোয়াল গ্রন্থি** (Submandibular gland): মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অধঃচোয়াল গ্রন্থি মিশ্র গ্রন্থিবিশেষ, তবে সব প্রাণীতে সেরাস ও মিউকাস গ্রন্থিথলির অনুপাত সমান নয়। মানুষে সেরাস গ্রন্থিথলির সংখ্যা মিউকাসের চেয়ে বেশী। এদেরও সুস্পষ্ট ক্যাপসুল থাকে। অধঃ-চোয়াল গ্রন্থির স্ট্রায়েটেড ডাক্‌ট কর্ণসন্নিহিত গ্রন্থির ডাক্‌টের চেয়ে অধিকতর দীর্ঘ এবং সংখ্যায় বেশী। ইন্‌টারক্যালেটেড ডাক্‌টও তুলনামূলকভাবে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও সংকীর্ণ।

মিউকাস গ্রন্থিথলির প্রান্তদেশে কখনও কখনও সেরাসকোষের আবরণ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ক্ষীণ চন্দ্রাকার সেরাস গ্রন্থিথলি কখনও কখনও মিউকাস গ্রন্থিথলিকে বেষ্টন করে রাখে। এদের সেরাস ডেমিলুন্‌স্ (demilunes) বলা হয়। হিমাটক্সিলিন-ইওসিন বর্ণপ্রয়োগে বিশুদ্ধ মিউকাস গ্রন্থিগুলি হালকা নীলবেগনি বর্ণ ধারণ করে, অপরপক্ষে সেরাস গ্রন্থিথলি গাঢ় রক্তবেগনি বর্ণ ধারণ করে। মিউকাস গ্রন্থিথলীর নলীপথ (lumen) বেশ বৃহদাকারের এবং তাতে অনেক মিউসিন পদার্থের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। মিউকাস কোষ ভিত্তিঝিল্লির উপর অবস্থান করে এবং তাদের প্রান্তরেখাও সুস্পষ্ট। কোষগুলো যখন **মিউসিজেন দানায়** (mucigen granules) পূর্ণ হয়ে উঠে, তখন নিউক্লিয়াস কোষের গোড়ার দিকে চাপ্টা আকার ধারণ করে। পরীক্ষাগারের সাধারণ প্রয়োগপ্রস্তুতিতে মিউসিজেন দানা দ্রবীভূত হয়, ফলে এদের সাইটো-প্লাজমে কিছুসংখ্যক অধঃক্ষিপ্ত দানা ও শুধু জালকপদার্থ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। ক্ষরণপদার্থ নিঃসরণের পর কোষনিউক্লিয়াস গোলাকার বা ডিম্বাকার আকৃতি ধারণ করে। কোষসাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকলেও বর্ণাসক্ত

পদার্থ (অমসৃণ অন্তঃকোষজালক পদার্থ) প্রায় থাকে না। সান্নিহিত কোষের অন্তর্বর্তী স্থানে ক্যানালিকুলাস দেখা যায় না।

সেরাস গ্রন্থিথলির গঠন কর্ণসান্নিহিত গ্রন্থিথলির মতই।

3. **অধঃজিহ্বা গ্রন্থি** (Sublingual gland) **:** মানুষ, কুকুর, বেড়াল র‍্যাবিট এবং মেষে অধঃজিহ্বা গ্রন্থি মিশ্র লালাগ্রন্থি। মানুষে ইহা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র লালাগ্রন্থি এবং এই গ্রন্থিতে সেরাসের চেয়ে মিউকাস গ্রন্থিগুলির প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। খুব কম সংখ্যক সেরাস গ্রন্থিথলি দেখতে পাওয়া যায়। মিউকাস গ্রন্থিথলির চারপাশে এরা অর্ধচন্দ্রাকারে বিন্যস্ত থাকে।

অধঃজিহ্বা গ্রন্থির চারিপাশে সুস্পষ্ট ক্যাপসুল নেই। এছাড়া আদর্শ লালা-নালিকা বা স্ট্রায়েটেড ডাক্ট বিরল। ইন্‌টারক্যালেটেড ডাক্টের সংখ্যাও একই ভাবে খুব কম, কারও কারও মতে একেবারে নেই। গ্রন্থিগুলি অনেকটা লম্বাটে।

অগ্ন্যাশয়

Pancreas

অগ্ন্যাশয় অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা এই উভয়প্রকার গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। লালাগ্রন্থির মত অগ্ন্যাশয়ের অধিকাংশই স্তবকগ্রন্থি। শ্লথ সংযোজক কলার সূক্ষ্ম ঝিল্লির দ্বারা সমগ্র গ্রন্থি আবৃত থাকে। এই ঝিল্লি গ্রন্থির বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করে গ্রন্থিকে লতি বা লোবিউলে (lobules) বিভক্ত করে।

অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি যৌগিক নলাকার গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। গ্রন্থির প্রান্তীয় ক্ষরণশীল অংশকে গ্রন্থিথলি নামে অভিহিত করা হয়। এরা কিছুটা লম্বাটে ও কুণ্ডলীপাকান। অগ্ন্যাশয়ের জারকরস এদের দ্বারাই ক্ষরিত হয়। এই সব গ্রন্থিথলি থেকে নির্গত ইন্‌টারক্যালেটেড ডাক্ট পরস্পর মিলিত হয়ে প্রধান অগ্ন্যাশয়নালী বা উইর্সাং নালী (duct of Wirsung) গঠন করে।

প্রতিটি ক্ষরণশীল গ্রন্থিকোষের অভ্যন্তরে দুটো পৃথক অঞ্চল লক্ষ্য করা যায়। একটিকে শীর্ষাঞ্চল (apical zone) এবং অপরটিকে পাদ অঞ্চল (basal zone) বলা হয়। কোষের শীর্ষাঞ্চলে জাইমোজেন দানার (zymogen granules) উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্থিতাবস্থায় এদের সংখ্যা সর্বাধিক। খাদ্য পরিপাকের সময় এদের সংখ্যা হ্রাস পায়। কোষের গোড়ার দিকে নিউক্লিয়াসের অবস্থান। কোষের গোড়ার দিকে অসংখ্য বর্ণাসক্ত (chromophilic) বা ক্ষারাসক্ত

(basophilic) পদার্থ লক্ষ্য করা যায়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেছে এই অংশ সমান্তরাল বা সমকেন্দ্রিকভাবে বিন্যস্ত অন্তঃকোষ জালকে পূর্ণ থাকে।
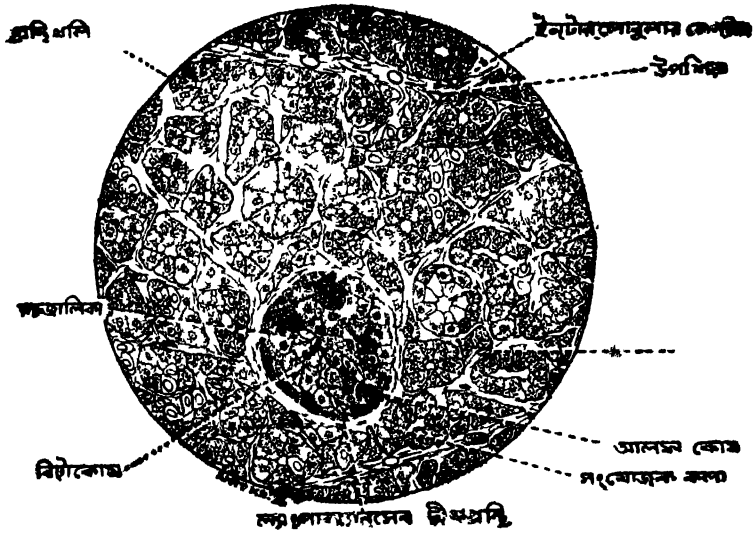
6-14 নং চিত্র ঃ অগ্ন্যাশযেব আণুবীক্ষণিক গঠন।

এদেব গাযে অসংখ্য বাইবোসোম গুটিকা থাকার ফলে এই অঞ্চল ক্ষারাসক্ত হয়। এছাড়া লম্বাটে ধবনের মাইটোকনড্রিয়াব প্রাচুর্য এই অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়।

অনেক গ্রন্থিথলিব মধ্যেই এক বা একাধিক ঘনতলাকার আবরণীকোষ দেখা যায়। এবা ক্ষরণশীল কোষেব শীর্ষাঞ্চলের সংস্পর্শে অবস্থান করে। এদের সেনট্রো অ্যাসিনার সেল (centro-acinar cell) বা কেন্দ্রগত গ্রন্থিকোষ নামে অভিহিত করা হয়। এদের সাইটোপ্লাজমে কোনপ্রকার ক্ষরণধর্মী দানাদার পদার্থ দেখা যায় না।

বহিঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে কিছুসংখ্যক কোষ একত্রিত হযে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত এক একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি গঠন করে। বহিঃক্ষরা গ্রন্থিতে বিক্ষিপ্ত এ ধরনের অন্তক্ষরা গ্রন্থিকে ল্যাংগারহ্যানসের-দ্বীপগ্রন্থি (islets of Langerhans) নামে অভিহিত করা হয়। গ্রন্থিকোষে সাইটোপ্লাজম খুব কম থাকে। প্রধানত দুধরনের গ্রন্থিকোষ দ্বীপগ্রন্থিতে দেখা যায়। এদেব আলফা (α) ও বিটা (β) কোষ বলা হয়। আলফা কোষের সংখ্যা 15-25 শতাংশ এবং বিটা কোষের 60-70 শতাংশ। আলফাকোষ গ্লুকাগোন এবং বিটাকোষ ইনসুলিন ক্ষরণ

করে। এছাড়া গামা (γ) ও ডেল্‌টা (δ) এই দু ধরনের কোষকে খুব কম সংখ্যায় গ্রন্থিতে দেখা যায়। ডেল্‌টা কোষ সোমাটোস্টেটিন ক্ষরণ করে। গামাকোষের ভূমিকা এখনও জানা যায়নি।

যকৃৎ

Liver

যকৃৎ দেহের সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার গ্রন্থি। ইহা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসাবে পিত্তরস ক্ষরণ করে এবং নালীসংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিবহন করে। এছাড়া ইহা দেহের সর্বপ্রকার বিপাকক্রিয়ার সংগে জড়িত। রেচন যন্ত্র হিসাবেও ইহা কাজ করে। যকৃৎ বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় কার্যের অধিকারী হলেও তার কোষাবলীর মধ্যে এমন কোন শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবা যায় না যাতে বলা যায়, কোন এক শ্রেণীর কোষ কোন একটি বিশেষ কাজের জন্য দায়ী।
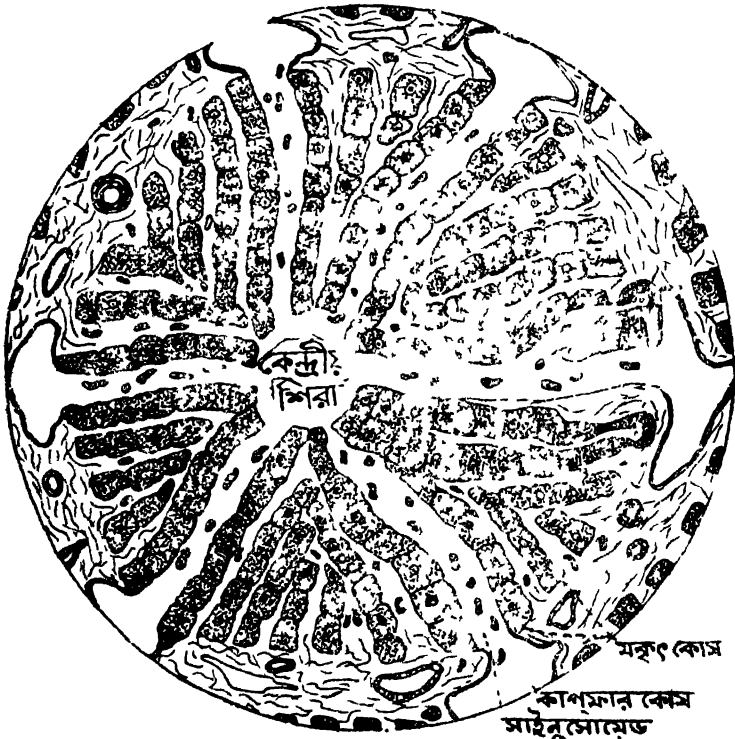
6-19 নং চিত্র : যকৃতের একটি লোবিউলের গঠন।

অনেকগুলো চিড় বা ফিশার (fissures) যকৃৎকে 4টি অসম্পূর্ণ লোবে বিভক্ত

করে। পেরিটোনিয়াম থেকে উৎপন্ন টিউনিকা সেরোসার (tunica serosa) মধ্যে ইহা অবস্থান করে এবং সংযোজক কলার সূক্ষ্ম ক্যাপ্সুলের দ্বারা আবৃত থাকে। ক্যাপ্সুলে প্রচুর পরিমাণে স্থিতিস্থাপক তন্তু বিস্তৃত থাকে।

যকৃৎ অসংখ্য লোবিউলের (lobules) সমন্বয়ে গঠিত। অন্যান্য প্রাণীতে লোবিউল সম্পূর্ণভাবে সংযোজক কলার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকলেও মানুষে সংযোজক কলার স্বল্পতার জন্য পরিবেষ্টন অসম্পূর্ণ হয়। প্রতিটি লোবিউলের আকৃতি বেলনাকার (cylindrical) বা অসমানভাবে প্রিজমাকার। এরা 1 মিলিমিটার প্রশস্ত এবং প্রায় 2 মিলিমিটার দীর্ঘ।

প্রতিটি লোবিউলকে যকৃতের শারীরস্থানীয় একক হিসাবে গণ্য করা হয়। ইহা দুটো উপাদানের সমন্বয়ে গঠিতঃ (a) যকৃৎকোষ এবং (b) পরস্পর যোগসূত্র স্থাপনকারী রক্তনালী। যকৃৎকোষ পরস্পর শ্রেণীবদ্ধভাবে বিন্যস্ত হয়ে যে সব কর্ড (cords) বা রজ্জুর সৃষ্টি করে তারা লোবিউলের কেন্দ্রীয় শিরার চারিপাশে গরুর গাড়ীর চাকার পাকির মত বিন্যস্ত থাকে (6-19 নং চিত্র)। মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এই বিন্যাসের খানিকটা রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। কোষগুলো এ ক্ষেত্রে প্লেট (plates) বা ফলকের আকারে বিন্যস্ত থাকে।

প্রতিটি যকৃৎকোষের নিউক্লিয়াস কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে এবং এক বা একাধিক সুস্পষ্ট নিউক্লিওলাস থাকে। বহু নিউক্লিওলাসযুক্ত যকৃৎকোষও কখনও কখনও দেখা যায়, বিশেষ করে দুটো নিউক্লিয়াসযুক্ত যকৃৎকোষ।

যকৃৎকোষের মাইটোকন্ড্রিয়া দেখতে গোলাকার, রডের আকৃতিবিশিষ্ট অথবা ফিতের মত (filamentous)। গল্‌জি বডি নিউক্লিয়াসের সন্নিকটে অথবা কোষের প্রান্তদেশে ও বাইল ক্যানালিকুলাসের (bile canaliculus) নিম্নদেশে অবস্থান করে। গল্‌জি বডি পিত্তরস (bile) ক্ষরণের সঞ্চয়স্থান হিসাবে কাজ করে। সাইটোপ্লাজমে যেসব ক্ষারাসক্ত পদার্থ দলবদ্ধভাবে ছড়িয়ে থাকে, তারা প্রধানত নিউক্লিওপ্রোটিনে গঠিত। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেছে এসব পদার্থ দলবদ্ধ, অসংযুক্ত রাইবোসোম এবং অন্তঃকোষজালকের সংগে যুক্ত রাইবোসোমের সমন্বয়ে গঠিত। লাইসোসোম (lysosome) এবং পেরোক্সিসোম (peroxisome) নামক আর এক ধরনের পদার্থ সাইটোপ্লাজমে দেখা যায়। কোন কোন প্রাণীতে (মানুষে নয়) পেরোক্সিসোমের কেন্দ্রদেশে নিওক্লিওড (nucleoid) থাকে। ইউরেট অক্সিডেজ (urate oxidase) নিওক্লিওডে

অবস্থান করে। মানুষের পেরোক্সিসোমে নিউক্লিওড উপাদানটি নেই বলে মানুষের যকৃতে ইউরেট অক্সিডেজ এনজাইম অনুপস্থিত। পেরোক্সিসোমে ক্যাটালেজ (catalase) সমেত অক্সিডেটিভ এনজাইমের (oxidative enzyme) সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। সাইটোপ্লাজমে এছাড়া সাধারণভাবে গ্লাইকোজেন, স্নেহদানা, রঞ্জকদানা (পিত্ত রঞ্জকদানা) প্রভৃতি দেখা যায়।

পোর্টাল শিরা, যকৃৎধমনী এবং পিত্তনালী যোজককলার আবরণীস্তরের মধ্য দিয়ে যকৃতে প্রবেশ করে। যকৃতে প্রবেশ করার পর এই সব রক্তনালী শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে এবং যেখানে সেখানে যকৃৎধমনী ও পোর্টাল শিরার মধ্যে ধমনীশিরা নালীসংযোগ (anastomosis) গঠন করে। যকৃতের লোবের অন্তর্বর্তী পোর্টাল শিরা ও যকৃৎধমনী পরিশেষে সাইনুসোয়েডে প্রবেশ করে। সাইনুসোয়েড R-E তন্ত্রের অন্তর্গত আগ্রাসক কোষের দ্বারা আবৃত থাকে। এই আগ্রাসক কোষকে কুপ্‌ফার কোষ (Kupffer cells) বলা হয়। যকৃৎকোষের প্রতিটি বিকীর্ণস্তম্ভের (radiating column) এক পাশ দিয়ে একটি করে রক্তজালিকা কেন্দ্রীয় শিরার দিকে অগ্রসর হয় এবং বিপরীত পার্শ্ব থেকে আগত পিত্তনালীর (bile duct) সংগে মিলিত হয়ে প্রান্তীয় পিত্তনালীতে উন্মুক্ত হয়। লোবিউলের অন্তর্বর্তী পিত্তনালী সংযোজক কলার সেপ্‌টামের (septum) মধ্য দিয়ে পোর্টাল শিরা ও যকৃৎধমনীর সংগে পাশাপাশিভাবে অগ্রসর হয়। যকৃৎজালকে অসংখ্য মাস্টকোষের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

পিত্তাশয়

Gall Bladder

পিত্তাশয়ের প্রাচীর তিনটি স্তরের দ্বারা গঠিত : (a) শ্লেষ্মাস্তর (mucosa), (b) পেশীস্তর (muscularis) এবং (c) সেরাসস্তর (serosa)। শ্লেষ্মাস্তর অসংখ্য ভাঁজের সৃষ্টি করে এবং তাদের অন্তর্বর্তী স্থানে বহুভুজী অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। আবরণীঝিল্লি দীর্ঘ স্তম্ভাকার কোষের দ্বারা গঠিত। ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস কোষের গোড়ার দিকে অবস্থান করে। এদের শীর্ষদেশে অনুচ্চ মাইক্রোভিলাস এবং মাইক্রোভিলাসের উপরে কেশাকার প্রক্ষেপ বা ফাজ (fuzz) দেখা যায় (ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে)। ল্যামিনা প্রপ্রিয়া সংযোজক কলায় গঠিত। সংযোজক কলায় অসংখ্য রক্তজালিকা ও স্বল্পসংখ্যক অনৈচ্ছিক পেশীতন্তু লক্ষ্য করা যায়। পিত্তাশয়ের গ্রীবাদেশীয় শ্লেষ্মাস্তরে নলাকার গ্রন্থি দেখা যায়।

পিত্তাশয়ের পেশীস্তর জড়ান অনৈচ্ছিক পেশীতন্তুতে গঠিত। ল্যামিনা প্রপিয়ার সন্নিকটে অনুদৈর্ঘ্য পেশীর ব্যাণ্ডেল লক্ষ্য করা যায়। বাকী পেশীতন্তু প্রধানত বৃত্তাকারে বিন্যস্ত থাকে।

সেরাসস্তর যথেষ্ট পুরু। পেশীস্তরের পরবর্তী সংযোজক কলা তন্তুময়, তার পরবর্তী সংযোজককলায় রক্তনালী, লসিকানালী এবং স্নায়ুর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। বহির্দেশীয় উপরিতল পেরিটনিয়ামের দ্বারা আবৃত থাকে।

পিত্তাশয়ের প্রাচীরে লিম্ফ নোড দেখা যায়। প্রচুর পরিমাণে জল ও খনিজ ধাতুর (mineral salts) বিশোষণের মাধ্যমে ইহা সঞ্চিত পিত্তরসকে অধিকতর গাঢ় করে।

পৌষ্টিকনালীর কার্যাবলী
Functions of Alimentary Tract

পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশ যেসব কার্য সম্পন্ন করে, পৃথক পৃথকভাবে তাদের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে বিবৃত হল।

1. **মুখগহ্বর** (Oral cavity) : মুখগহ্বর যেসব কার্য সম্পাদন করে তার মধ্যে প্রধান : (a) খাদ্যবস্তুর গ্রহণ, (b) দাঁত ও জিহ্বার সাহায্যে খাদ্যবস্তুকে চিবিয়ে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে পরিণত করা, (c) খাদ্যবস্তুকে লালারসের সংগে মিশিয়ে পিণ্ড বা দলা তৈরী করা, (d) এভাবে পিণ্ড বা দলা তৈরীর মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর গলাধঃকরণে সহায়তা করা, (e) জিহ্বার দ্বারা খাদ্যবস্তুর আস্বাদ নেওয়া এবং (f) কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্যকে সামান্য পরিমাণে পরিপাক করা।

2. **জিহ্বা** (Tongue) : জিহ্বা (a) চর্বন, (b) আস্বাদন, (c) গলাধঃকারণ, (d) কথা বলা, (e) শ্লেষ্মা ও জলীয় পদার্থের ক্ষরণ করা প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করে।

3. **গলবিল** (Pharynx) : গলবিল (a) গলাধঃকরণ প্রতিবর্তের (খাদ্যবস্তু গলবিলের গ্রাহককোষে উদ্দীপনা দিলে এই প্রতিবর্ত উৎপন্ন হয়) সহায়তায় খাদ্যবস্তুর গলাধঃকরণে সহায়তা করে, (b) নাক বা মুখ থেকে বায়ুকে স্বরযন্ত্রে পরিবহন করে কণ্ঠস্বর উৎপাদনে সহায়তা করে এবং (c) মুখগহ্বর থেকে খাদ্যবস্তুকে গ্রাসনালীতে পৌঁছে দেবার প্রেরণপথ হিসাবে কাজ করে।

4. **গ্রাসনালী** (Esophagus) ঃ গলবিল থেকে প্রাপ্ত খাদ্যকে ক্রম-সংকোচনের মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

5. **পাকস্থলী** (Stomach) ঃ পাকস্থলী যে সব প্রধান প্রধান কার্য সম্পন্ন করে, নিম্নে তা সন্নিবেশিত হল ঃ (a) **যান্ত্রিক কার্য** ঃ পাকস্থলী খাদ্যবস্তুকে গ্রহণ করে এবং তাদের সঞ্চয় করে রাখে। দ্বিতীয়ত, পাকস্থলীর সংকোচনে খাদ্যবস্তুর সংগে পাচকরসের সঠিক মিশ্রণ সম্ভবপর হয়। তৃতীয়ত, পাকস্থলীর সংকোচনে খাদ্যবস্তু ডিওডিনামে সহজে নিক্ষিপ্ত হয়। (b) **ক্ষরণ** ঃ পাকস্থলী পাচকরস ক্ষরণ করে, যা খাদ্যবস্তুর পরিপাকে সহায়ক। পাচকরসের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গলাধঃকৃত ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি বিনষ্ট করে। (c) **উদ্দীপক কার্য** ঃ পাকস্থলী **গ্যাসট্রিন** (gastrin), **ক্যাসেলের ইনট্রিনসিক ফ্যাকটর** (Castle's instrinsic factor), **সেরোটনিন**, **এনটারোগ্লুকাগোন** প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে। প্রথমটি একটি পাকস্থলীয় হরমোন। পাইলোরাসের শ্লেষ্মাঝিল্লি এর ক্ষরণের জন্য প্রধানত দায়ী। এই পদার্থটি জারকরস ক্ষরণের দ্বিতীয় দশায় উদ্দীপনা জোগায়। দ্বিতীয় পদার্থ একটি গ্লাইকোপ্রোটিন। ইহা পাকস্থলীর শ্লেষ্মাঝিল্লীর প্রাচীরকোষের দ্বারা ক্ষরিত হয় এবং ভিটামিন B_{12}-এর বিশোষণকার্যে সহায়তা করে। সেরোটনিন ও এনটারোগ্লুকাগোনও দুটো পাকস্থলীয় হরমোন আর্জেনটাফিন সেল এদের ক্ষরণ করে। (d) **পরিপাক** ঃ পাকস্থলীস্থিত পাচকরস খাদ্যবস্তুর পরিপাকে অংশগ্রহণ করে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাদ্যবস্তুর আর্দ্রবিশ্লেষণে সহায়তা করে। পেপসিন প্রোটিনকে পেপটোনে রূপান্তরিত করে। পাচকরসের লাইপেজ (ট্রাইবিউটারেজ) খুব সামান্য পরিমাণে স্নেহজাতীয় পদার্থের পরিপাকে সহায়তা করে। (e) **বিশোষণ** ঃ পাকস্থলী থেকে যে সব পদার্থ সামান্য পরিমাণে বিশোষিত হয়, তাদের মধ্যে প্রধান গ্লুকোজ, লবণজল, সামান্য পরিমাণ জল, অ্যালকোহল এবং কোন কোন ওষুধ। (f) **রেচন** ঃ মরফিন (morphine), প্রতিবিষ (toxin) প্রভৃতি পদার্থ পাকস্থলীর মাধ্যমে রেচিত হয়। (g) **প্রতিবর্ত-ধর্মী কার্য** ঃ পাকস্থলী থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবর্ত উৎপন্ন হয়। এসব প্রতিবর্তের মধ্যে প্রধান ঃ (1) পাকস্থলী-লালাগ্রন্থি প্রতিবর্ত (gastro-salivary reflex), লালাক্ষরণে এই প্রতিবর্ত অংশগ্রহণ করে ; (2) পাকস্থলী-অগ্ন্যাশয় প্রতিবর্ত, অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণে ইহা অংশগ্রহণ করে, (3) গ্যাসট্রো-ইলিয়াক প্রতিবর্ত (gastro-iliac reflx), নিম্ন-ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষাংশের ক্রমসংকোচনের জন্য

যা দায়ী এবং (4) গ্যাসট্রোকোলিক প্রতিবর্ত (gastro-colic reflex); পাকস্থলীতে খাদ্যবস্তু গ্রহণের প্রায় আধঘণ্টা পরে বৃহদন্ত্রে সংহত ক্রমসংকোচন পরিলক্ষিত হয়।

6. **ক্ষুদ্রান্ত্র** (Small intestine) : ক্ষুদ্রান্ত্র যে সব প্রধান প্রধান কার্য সম্পন্ন করে, নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল : (a) **বিশোষণ** (Absorption) : জল, লবণ, ভিটামিন এবং পরিপাকলব্ধ খাদ্যবস্তু প্রধানত ক্ষুদ্রান্ত্রের মাধ্যমেই বিশোষিত হয়। কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের পরিপাকলব্ধ পদার্থ সরাসরি ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে দ্বারসংস্থায় (portal system) বিশোষিত হয়। স্নেহপদার্থ প্রধানত ল্যাক্টিয়েলে বিশোষিত হয়। (b) **খাদ্যবস্তুর গ্রহণ** : ক্ষুদ্রান্ত্র পাকস্থলীর পাকমণ্ডকে গ্রহণ করে। (c) **আন্ত্রিক রস ক্ষরণ** (secretion of juice) : ক্ষুদ্রান্ত্রের গ্রন্থি থেকে আন্ত্রিক রস (succus entericus) ক্ষরিত হয়। এই পরিপাকরসে বিভিন্নপ্রকার এনজাইম এবং ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি অজৈব পদার্থ রয়েছে। তাছাড়া অগ্ন্যাশয়রস ও পিত্তরস এর সংগে এসে মিলিত হয়। (4) **পরিপাক** : ক্ষুদ্রান্ত্র কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ ও প্রোটিনজাতীয় পদার্থের পরিপাকে অংশগ্রহণ করে। (5) **রেচন** : ক্ষুদ্রান্ত্র প্রতিবিষ, গুরুধাতু, উপক্ষার (alkaloids) ইত্যাদির নিঃসরণে সহায়তা করে। এছাড়া অজীর্ণ খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্রান্ত্রের দ্বারা নিঃসৃত হয়। (6) **বিচলন** : আন্ত্রিক বিচলন খাদ্যবস্তুর সংগে এনজাইমের সংমিশ্রণ, তাদের বিশোষণ এবং নিম্নদিকে খাদ্যবস্তুর অগ্রগমন সহজতর করে। (7) **রক্তশর্করার নিয়ন্ত্রণ** : শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ক্ষুদ্রান্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। দেখা গেছে, ক্ষুদ্রান্ত্রের শর্করা-বিশোষণে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা রয়েছে (ঘণ্টায় 1·84 গ্রাম), যার অধিক শর্করা সে বিশোষণ করতে অসমর্থ হয়। (8) **দেহের জলসাম্য** বজায় রাখতে ক্ষুদ্রান্ত্র অংশ গ্রহণ করে। তৃষ্ণার ব্যাপারটা ক্ষুদ্রান্ত্রের সংগে জড়িত। ক্ষুদ্রান্ত্র দেহরসের (body fluid) সাম্যাবস্থার বিন্যাস ঘটিয়ে জলসাম্য বজায় রাখে। (9) ক্ষুদ্রান্ত্র রক্তের pH এর মাত্রা বজায় রাখতে অংশগ্রহণ করে। তবে কীভাবে ক্ষুদ্রান্ত্র এই কার্যে অংশগ্রহণ করে তার সঠিক পদ্ধতি জানা না গেলেও বিশ্বাস করা হয়, রক্তে ক্ষারাধিক্য হলে ক্ষারকীয় ফসফেট ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে নিঃসৃত হয় এবং জলের সংগে দেহ থেকে নির্গত হয়। অপরপক্ষে রক্তে অম্লাধিক্য দেখা দিলে ক্ষারকীয় ফসফেট ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে রক্তে বিশোষিত হয়।

7. **বৃহদন্ত্র** (Large intestine) : বৃহদন্ত্র বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পন্ন করে থাকে। নিম্নে তার প্রধান প্রধান কার্যের বর্ণনা দেওয়া হল : (a) **ক্ষরণ** : (Secretion) : বৃহদন্ত্রের শ্লেষ্মাস্তরে অবস্থানকারী গোব্লেট কোষ শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে এবং বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তরভাগকে পিচ্ছিল রাখে। বৃহদন্ত্রের গ্রন্থিরস ক্ষারধর্মী (pH8·4) হলেও মল অম্লধর্মী হয়। বৃহদন্ত্রে অবস্থানকারী ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা উৎপন্ন অম্ল প্রধানতঃ এর জন্য দায়ী (b) **বিশোষণ** (Absorption) : শতকরা 63 থেকে 80 ভাগ জল বৃহদন্ত্র থেকে বিশোষিত হয়। এছাড়া গ্লুকোজ, অ্যামাইনোঅ্যাসিড, দ্রবীভূত লবণজল, কোন কোন অবেদনিক ওষুধ (anaesthetic drug) প্রভৃতি বৃহদন্ত্র থেকে বিশোষিত হয়। (c) **মলোৎপাদন** (Formation of stool) : দৈনিক প্রায় 450 গ্রাম তরল মণ্ড (chyme) বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। বৃহদন্ত্র জলীয় অংশকে বিশোষণের মাধ্যমে তার থেকে প্রায় 135 গ্রাম আর্দ্র মল উৎপন্ন করে। (d) **রেচন** (Excretion) : প্রতিদিন গড়ে 135 গ্রাম আর্দ্র মল বৃহদন্ত্র থেকে নির্গত হয়। এছাড়া আর্সেনিক (arsenic), পারদ (mercury), বিস্মাথ (bismath) প্রভৃতি গুরু ধাতু বৃহদন্ত্রের মাধ্যমে রেচিত হয়। (e) **সংশ্লেষণ** (Synthesis) : বৃহদন্ত্রে অবস্থানকারী ব্যাক্টেরিয়া ফলিক অ্যাসিড (folic acid), ভিটামিন K এবং বি-কমপ্লেক্সের কিছুসংখ্যক ভিটামিনের সংশ্লেষণ ঘটায়। (f) **ব্যাক্টেরীয় পরিপাক** (Bacterial digestion) : বিভিন্ন ধরনের ব্যাক্টেরিয়া বৃহদন্ত্রে জন্ম নেয়। এসব ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে সাইটোক্রম পদার্থের পরিমাণ যেমন বেশী দেখা যায়, তেমনি তারা অন্যান্য রোগসৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া বা জীবাণুর বৃদ্ধিতে বাধাদান করে। অজীর্ণ খাদ্যবস্তুর উপর ক্রিয়া করে এসব ব্যাক্টেরিয়া কার্বোহাইড্রেটজাতীয় পদার্থ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড, জৈব অ্যাসিড ও স্নেহদ্রব্য থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল ও প্রোটিন থেকে অ্যামাইনোঅ্যাসিড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি উৎপন্ন করে। এছাড়া অ্যামাইনোঅ্যাসিড ট্রিপ্টোফ্যান (tryptophan) থেকে **ইন্ডোল** (indole) এবং **স্ক্যাটোল** (skatole—যা মলের দুর্গন্ধের জন্য দায়ী) উৎপন্ন করে। টাইরোসিন (tyrosine) ও ফেনাইল অ্যালানিন (phenylalanine) থেকে **ফেনোল** (phenol) এবং **ক্রেসোল** (cresol) উৎপন্ন করে।

8. **মলাশয় ও মলনালী** (Rectum and anal canal) : (a) মলাশয় অর্ধকঠিন মলের সঞ্চয়-আধার হিসাবে কাজ করে, (b) মলাশয়ের ক্রমোসংকোচন মলত্যাগের সহায়তা করে

মলাশয় পূর্ণ হয়ে উঠলে মলদ্বারের পেশীবলয় মলকে মলাশয়ে ধরে রাখতে সহায়তা করে। মলত্যাগের সময় মলনালী প্রসারিত হয়ে সহজভাবে মলত্যাগে সহায়তা করে।

9. **যকৃতের কার্যাবলী :** যকৃৎ দেহের অসংখ্য শারীরবৃত্তীয় কার্যের সংগে জড়িত। নিম্নে তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল। (1) **পিত্তরস :** যকৃৎ পিত্তরস উৎপাদন করে। (2) **কার্বোহাইড্রেটের বিপাক :** কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে ইহা বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। যকৃৎ গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন, প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ থেকে কার্বোহাইড্রেট, ল্যাক্টিক ও পাইরুভিক অ্যাসিড এবং গ্লিসারল থেকে কার্বোহাইড্রেট, কার্বোহাইড্রেট থেকে স্নেহপদার্থ ইত্যাদির সংশ্লেষণ ঘটায়। এছাড়া রক্তশর্করার গতিময় সাম্যাবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং কার্বোহাইড্রেটের (গ্লাইকোজেন হিসাবে) সঞ্চয়ভাণ্ডার হিসাবেও ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় অংগ। (3) **প্রোটিনের বিপাক :** প্লাজমাপ্রোটিন, ইউরিয়া প্রভৃতির সংশ্লেষণ ডেঅ্যামাইনেশন, ট্রান্স্ অ্যামাইনেশন প্রভৃতি যকৃতে সম্পন্ন হয়। (4) **স্নেহদ্রব্যের বিপাক :** স্নেহঅম্লের জারণ, কিটোনপদার্থ উৎপাদন, ফস্‌ফোলিপিডের সংশ্লেষণ, কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন থেকে স্নেহদ্রব্যের উৎপাদন প্রভৃতি যকৃতেই সম্পন্ন হয়। (5) **রক্ত :** প্লাজমাপ্রোটিন ও হেপারিনের (মাস্টকোষ) সংশ্লেষণ, রক্তের সঞ্চয়, লোহিতকণার বিনাশসাধন, ভ্রূণাবস্থায় লোহিতকণিকার উৎপাদন প্রভৃতি কার্যের সংগে যকৃৎ জড়িত। (6) **ভিটামিন :** যকৃৎ বিটা-কেরোটিন থেকে ভিটামিন A-এর সংশ্লেষণ ঘটায়। এছাড়া ভিটামিন A ও D-কে সঞ্চয় করে রাখে। ভিটামিন K এর সাহায্যে ইহা প্রথ্রম্বিন উৎপাদন করে। (7) **রেচন :** পিত্তকণা, কোলেস্টারোল, নানাপ্রকার প্রতিবিষ, ব্যাক্টেরিয়া, ওষুধ, কোন কোন গুরুধাতু (সাময়িকভাবে যকৃৎ ধরে রাখে) প্রভৃতি যকৃতস্থ পিত্তরসের সংগে নির্গত হয়। (8) **প্রতিরক্ষা ও প্রশমন :** যকৃতের R-E কোষ অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে ও ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতিকে আগ্রাসন করে। তাছাড়া নিকোটিন, স্টিক্‌নিন (styckine) প্রভৃতি ওষুধকে বিনাশ করে। (9) **অন্যান্য কার্য :** যকৃৎ অত্যধিক রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত উত্তাপকে শোষণ করে এবং এভাবে দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে কিছুটা অংশগ্রহণ করে।

পরিপাকরস

DIGESTIVE JUICES

পৌষ্টিকনালীর প্রধান কার্য খাদ্যের পরিপাক ও তার বিশোষণ। খাদ্যের পরিপাকের জন্য প্রয়োজন এনজাইম এবং এনজাইমের বিক্রিয়ার উপযুক্ত বিক্রিয়া মাধ্যম। এনজাইম ও তার তরল বিক্রিয়া-মাধ্যমকে সরবরাহ করে (a) পৌষ্টিকনালীর শ্লেষ্মা-অধঃশ্লেষ্মান্তরীয় অসংখ্য গ্রন্থি এবং (b) পৌষ্টিকনালী থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক কিছুসংখ্যক বহিঃক্ষরা গ্রন্থি, যারা তাদের ক্ষরণপদার্থকে নালীসংস্থার (duct system) মাধ্যমে পৌষ্টিকনালীর মধ্যে পৌঁছে দেয়। এসব গ্রন্থিনিঃসৃত জটিল তরল তাই **পরিপাকরস** নামে পরিচিত। একজাতীয় 5টি রস খাদ্য পরিপাকের সংগে জড়িত : (1) **লালারস** (saliva), (2) পাচকরস (gastric-juice), (3) **অগ্ন্যাশয়রস** (pancreatic juice), (4) **আন্ত্রিকরস** (succus entericus) এবং (5) **পিত্তরস** (bile)। শেষোক্ত পরিপাকরসে কোন এনজাইম থাকে না, তথাপি ইহা খাদ্য পরিপাকের পক্ষে অপরিহার্য। তাছাড়া প্রতিটি রসে খাদ্য পরিপাকের প্রয়োজনীয় সবরকম এনজাইম থাকে না, ফলে একটি নির্দিষ্ট পরিপাকরস কোন একটি আহার্যবস্তুকে সম্পূর্ণভাবে পরিপাক করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, লালারসে একমাত্র কার্বোহাইড্রেটের পরিপাককারী এনজাইম ছাড়া অন্য কোন এনজাইমের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় না। দ্বিতীয়ত এই এনজাইম কার্বোহাইড্রেটকেও সম্পূর্ণভাবে পরিপাক করতে পারে না। পাচকরসে তেমনি কার্বোহাইড্রেটের পরিপাককারী কোন এনজাইম থাকে না। কোন একটি হজমীরস তাই খাদ্যবস্তুকে নির্দিষ্ট একটি ধাপ পর্যন্ত পরিপাক করে, পরবর্তী হজমীরস এই প্রক্রিয়াকে আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এভাবেই পরিপাকক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। আবার প্রতিটি হজমীরসে এনজাইমসমূহ একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়ামাধ্যমে সর্বাধিক সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। যেমন, পাকস্থলীয় এনজাইম অ্যাসিড মাধ্যম ব্যতিরেকে সক্রিয় হতে পারে না। তেমনি ক্ষারীয় মাধ্যমে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অগ্ন্যাশয়রসের এনজাইম তেমনি ক্ষারীয় মাধ্যমে সক্রিয়, কিন্তু অ্যাসিড মাধ্যমে নিষ্ক্রিয়। পাচকরস তাই আম্লিক এবং অগ্ন্যাশয়রস ক্ষারীয়।

লালারস
Saliva

তিন জোড়া লালাগ্রন্থি সম্মিলিতভাবে যে মিশ্র লালারসের ক্ষরণ ঘটায় তা খানিকটা ঘোলাটে, আলোপ্রতিফলী ও চটচটে তরলবিশেষ। খাদ্যগ্রহণ বা খাদ্যের চিন্তা থেকে প্রচুর পরিমাণে লালারস ক্ষরিত হয় এবং তা মুখে এসে প্রবেশ করে। খাদ্য ছাড়াও সব সময়ে যে সামান্য পরিমাণ লালারস ক্ষরিত হয়, তা মুখগহ্বরকে আর্দ্র রাখতে এবং কথা বলতে সহায়তা করে।

সেরাস গ্রন্থি থেকে যে লালারস ক্ষরিত হয়, তা অত্যন্ত লঘু ও জলীয়; তাতে সামান্য পরিমাণে কঠিন পদার্থ থাকে, তবে এনজাইমের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। অপরপক্ষে মিউকাস গ্রন্থির ক্ষরণ ঘন, সান্দ্র এবং শ্লেষ্মাযুক্ত। লালারসের 70 শতাংশ আসে অধঃচোয়াল গ্রন্থি থেকে, 25 শতাংশ কর্ণসন্নিহিত গ্রন্থি থেকে এবং 5 শতাংশ আসে অধঃজিহ্বা গ্রন্থি থেকে। মানুষে প্রতিদিন প্রায় 1-1·5 লিটার লালারস ক্ষরিত হয়।

1. **উপাদান** (Composition): লালারস খানিকটা অম্লধর্মী, pH 5·3-6·85। তবে স্থির অবস্থায় রেখে দিলে অথবা ফোটালে লালারসের CO_2 নির্গত হয় এবং ইহা ক্ষারধর্মী হয়ে ওঠে। লালারস ক্ষারকীয় হয়ে পড়লে লালারসীয় উপাদানের অধঃক্ষেপ ঘটে যা দাঁতের ময়লা বা টার্টার (tartar) এবং লালানালীতে পাথর বা ক্যাল্‌কুলাসের (calculus) জন্য দায়ী। লালারসের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·002-1·012।

লালারসের 99·5 শতাংশই জল, বাকী 0·5 শতাংশ কঠিনপদার্থ। কঠিনপদার্থের মধ্যে জৈব, অজৈব ও গ্যাসীয় পদার্থের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ইস্ট সেল, ব্যাক্‌টেরিয়া, প্রোটোজোয়া, নিউট্রোফিল শ্বেতকণিকা এবং বিচ্ছিন্ন আবরণীকোষও লালারসে দেখা যায়। 1নং তালিকায় লালারসের উপাদানের সংক্ষিপ্তসার বিবৃত করা হয়েছে। ধূমপায়ীদের লালারসে থায়োসায়ানেটের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া দেহ বিষাক্ত হলে লালারসে সীসা, পারদ প্রভৃতি ধাতুও ক্ষরিত হয়। মানুষের লালারসে A, B, O এবং Le^a অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদের পরিমাণ প্রতিলিটারে 10-20 মিলিগ্রাম। লালারসনিহিত বাইকার্বনেট, ফসফেট এবং প্রোটিন বাফার হিসাবে কাজ করে।

1নং তালিকা : লালারসের উপাদান

জল	99·5 শতাংশ	
কঠিন পদার্থ	0·5 শতাংশ	
কঠিন পদার্থ :	প্রোটিন :	কোলেস্টারোল
	অ্যালবুমিন	অ্যাগ্লুটিনোজেন
	গ্লোবিউলিন	এনজাইম :
(a) জৈব পদার্থ	মিউসিন	টায়ালিন
(0·3 শতাংশ)	অন্যান্য :	মালটোজ (সামান্য)
	ইউরিয়া	লাইপেজ
	অ্যামাইনোঅ্যাসিড	ফসফাটেজ
	ইউরিক অ্যাসিড	কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ
	ক্রিয়েটিনিন	লাইসোজাইম (সামান্য)
	মিউকোপ্রোটিন	
(b) অজৈব পদার্থ	NaCl	ক্যালসিয়াম ফসফেট
(0·2 শতাংশ)	KCl	অম্লধর্মী সোডিয়াম ফসফেট
	$CaCO_3$	ক্ষারধর্মী সোডিয়াম ফসফেট
	ব্রোমাইড	পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট
(c) গ্যাসীয় পদার্থ	অক্সিজেন (1 মিলিলিটার)	
(প্রতি 100 মিলিলিটারে)	কার্বনডাইঅক্সাইড (50 মিলিলিটার)	
	নাইট্রোজেন (2·5 মিলিলিটার)	

এছাড়া লালারসে ক্যালিক্রেইন (kallikrein) নামক একটি এনজাইম থাকে, যা প্লাজমা-প্রোটিনের উপর ক্রিয়া করে ব্র্যাডিকাইনিন (bradykinin) নামক বাহসংকোচক পদার্থ উৎপন্ন করে। এই পদার্থটি লালাক্ষরণের সময় লালাগ্রন্থিস্থ রক্তনালীর প্রসারণ ঘটায়। লাইসোজাইম বিভিন্ন প্রকার ব্যাক্টেরিয়াকে (streptococci, staphylococci, meningococci ইত্যাদি) ধ্বংস করতে পারে।

2. **লালারসের কার্যাবলী** (Functions of saliva) **:** লালারস যে সব কার্য সম্পন্ন করে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো প্রধান **:**

(i) লালারস শুষ্ক খাদ্য বস্তুকে আর্দ্র করে গলাধঃকরণে সহায়তা করে।

(ii) মুখাভ্যন্তরকে আর্দ্র রেখে কথা বলতে সহায়তা করে।

(iii) লালারসের অবিরাম ক্ষরণে মুখাভ্যন্তর বা দাঁতে খাদ্যকণা সঞ্চিত হতে পারে না, ফলে ব্যাক্‌টেরিয়া জন্মাতে পাবে না। লাইসোজাইম এ ব্যাপারে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে।

(iv) উত্তপ্ত ও উদ্দীপক পদার্থকে তরল করে শ্লেষ্মাঝিল্লির ক্ষয়কে রোধ করে।

(v) আস্বাদনের অনুভূতিতে সহায়তা করে। আস্বাদন একপ্রকার রাসায়নিক অনুভূতি। অতএব কোন পদার্থ তরলে দ্রবীভূত না হলে তার আস্বাদনের অনুভূতি জাগ্রত হয় না।

(vi) কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্যের পরিপাকে সহায়তা করে। এনজাইম টায়ালিন শ্বেতসারকে বিশ্লিষ্ট করে ডেক্সট্রিন এবং দ্বি-শর্করা ম্যাল্‌টোজে রূপান্তরিত করে।

(vii) লালারস রেচনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ইউরিয়া, As, Bi, Pb, Hg প্রভৃতি গুরুধাতু, আয়োডিন, থায়োসায়ানেট এবং মাম্‌পস (mumps) প্রভৃতি ভাইরাসের রেচনে অংশগ্রহণ করে।

(viii) লালারসের বাইকার্বনেট, ফসফেট ও মিউসিন বাফার হিসাবে কার্য করে।

(ix) দেহের জলসাম্য (water balance) বজায় রাখতে ইহা অংশগ্রহণ করে। মুখাভ্যন্তরের আর্দ্রতা যখন হ্রাস পায়, তখন জিহ্বার উল্টো পিঠে অবস্থানকারী কিছুসংখ্যক স্নায়ুপ্রান্ত উদ্দীপিত হয় এবং তৃষ্ণার অনুভূতি জাগ্রত করে। ঘর্মনিঃসরণ, উদরাময় (diarrhoea) প্রভৃতি অবস্থায় লালারসের ক্ষরণ হ্রাস পায়। ফলে তৃষ্ণার অনুভূতি জাগ্রত হয়।

(x) কুকুর, মেষ প্রভৃতি প্রাণী অধিক উত্তাপে লালারস ক্ষরণ করে দৈহিক উষ্ণতা হ্রাস করে।

লালারসের ক্ষরণপদ্ধতি (Mechanism of secretion of saliva) **:** লালারসের ক্ষরণ বিশুদ্ধভাবে স্নায়বিক পদ্ধতি। লালাকেন্দ্র মস্তিষ্কের মেডালা-

স্থিত স্নায়ুজাল সংগঠনের (reticular formation) উত্তরা ও অধরা লালানিউক্লিয়াস নিয়ে গঠিত।

লালাগ্রন্থিতে **স্বতন্ত্র** (sympathetic) ও **পরাস্বতন্ত্র** (parasympathetic) উভয়প্রকার স্নায়ুতন্তুর উপস্থিতি লক্ষণীয়। সম্ভবত এক ধরনের স্নায়ু তরল পদার্থ ও লবণজাতীয় পদার্থের ক্ষরণে সহায়তা করে, অপরটি জৈব পদার্থ ক্ষরণের জন্য দায়ী। স্বতন্ত্র স্নায়ুতে বাহসংকোচক স্নায়ুতন্তু (vasoconstrictor fibres) রয়েছে যাদের উদ্দীপনা থেকে লালাক্ষরণ যথেষ্ট কম ও ঘন হয়। অপর পক্ষে পরাস্বতন্ত্রস্নায়ুতে বাহপ্রসারক স্নায়ুতন্তুর উপস্থিতি দেখা যায়। এদের উদ্দীপনায় রক্তনালীর প্রসারণ ঘটে এবং অধিক পরিমাণ লালারস ক্ষরিত হয়।
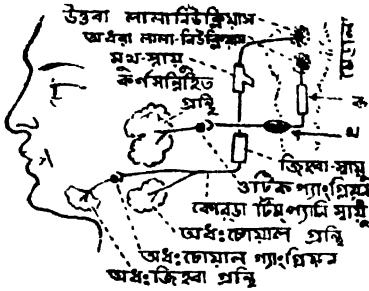
6-20নং চিত্র : (ক) গ্লসোফ্যারিন্‌জিয়েল স্নায়ু, (খ) টিম্প্যানিক স্নায়ুজালক।

লালারস ক্ষরণে দু শ্রেণীর প্রতিবর্ত (reflex) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে (a) **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** (conditioned reflex) এবং (b) **অনপেক্ষ প্রতিবর্ত** (unconditioned reflex)। খাদ্যবস্তু দর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি থেকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সক্রিয়তা লাভ করে এবং লালারস ক্ষরণে উদ্দীপনা জাগায়। অপরপক্ষে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার পর অনপেক্ষ প্রতিবর্ত সক্রিয় হয়। অনপেক্ষ প্রতিবর্তের উদ্দীপনার মুখ্য উৎসস্থল মুখগহ্বর। শ্লেষ্মাঝিল্লিতে খাদ্যবস্তুর উত্তেজনাদান, চর্বন, আস্বাদন প্রভৃতি প্রক্রিয়া সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা হিসাবে কার্য করে, ফলে অনপেক্ষ প্রতিবর্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং লালারস ক্ষরণে সহায়তা করে।

অন্যান্য যে সব অনপেক্ষ প্রতিবর্ত লালারস ক্ষরণে অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে প্রধান : (1) **গ্রাসনালী-লালাগ্রন্থি প্রতিবর্ত** : খাদ্যবস্তু গ্রাসনালীর মধ্য দিয়ে যাবার সময় এই প্রতিবর্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। (2) **পাকস্থলী-লালাগ্রন্থি প্রতিবর্ত** (gastro-salivary reflex) : খাদ্যবস্তুর পাকস্থলীতে প্রবেশের পর অথবা পাকস্থলীজাত উদ্দীপনা থেকে এই প্রতিবর্ত সক্রিয় হয়। (3) **বিশেষ প্রতিবর্ত** : গর্ভাবস্থায় লালাক্ষরণ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। সম্ভবত জরায়ুর প্রসারণজাত উদ্দীপনা থেকে এজাতীয় প্রতিবর্তের উদ্ভব ঘটে।

লালাক্ষরণের সময় আণুবীক্ষণিক পরিবর্তন : লালাগ্রন্থির সক্রিয় অবস্থায় বিভিন্ন আণুবীক্ষণিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থিকোষের স্থিতাবস্থায় যে সব **জাইমোজেন কণা** (zymogen granules) দেখা যায়, গ্রন্থির সক্রিয় অবস্থায় তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। জাইমোজেনকণা চতুঃপার্শ্বস্থ সাইটোপ্লাজম থেকে জলীয় পদার্থ শোষণ করে এবং দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবণ এরপর গ্রন্থিস্থিত লিউমেনে (lumen) নিঃসৃত হয়। এধরনের নিঃসরণের ফলে সাইটোপ্লাজমের অভিস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে জল পুনরায় কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। জাইমোজেন কণার পুনঃসংশ্লেষণ সংঘটিত হয় এবং কোষ স্থিতাবস্থায় ফিরে আসে।

পাচকরস
Gastric Juice

বিশুদ্ধ পাচকরস বর্ণহীন, স্বচ্ছ, অম্লধর্মী তরলবিশেষ। পাকস্থলীর শ্লেষ্মান্তরীয় গ্রন্থি এই হজমীরসের ক্ষরণ ঘটায়। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থিকোষ বিভিন্ন উপাদান ক্ষরণ করে থাকে, পাচকরস তাই একটি মিশ্র তরলপদার্থ। HCl-এর উপস্থিতির দরুণ এই হজমীরস অম্লধর্মী হয়। অক্সিন্টিক বা অম্লক্ষরা কোষ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণ ঘটায়। চিপ সেল বা প্রধান কোষ প্রধানত হজমীরসের এনজাইমের জন্য দায়ী। অন্যান্য গ্রন্থিকোষ শ্লেষ্মাজাতীয় পদার্থের ক্ষরণের জন্য দায়ী। এছাড়া, পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশ থেকে ক্ষরিত পাচকরসের পরিপাক-ক্ষমতা ও অম্লত্ব ভিন্ন হয়। যেমন, ফান্ডাস ও বডির পাচকরস আম্লিক এবং এনজাইম ও ক্লোরাইডের উপস্থিতি তাতে বেশী থাকে। অপরপক্ষে পাইলোরাস ক্ষারীয় রস ক্ষরণ করে এবং তাতে মিউকাস-জাতীয় পদার্থ সবচেয়ে বেশী থাকে; এনজাইম ও ক্লোরাইড কম থাকে।

1. **উপাদান** (Composition) : প্রতিদিন 2-3 লিটার পাচক রস ক্ষরিত হয়। আহার্যগ্রহণের সময় পাচকরসের ক্ষরণ সবচেয়ে বেশী হয় এবং প্রত্যেক বার প্রায় 500-1000 মিলিলিটার পাচকরসের ক্ষরণ ঘটে। পাচকরসে প্রায় 0·4-0·5% হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মুক্তভাবে থাকে। মোট অ্যাসিডের পরিমাণ 0·46-0·6 শতাংশ, কারণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের একাংশ প্রোটিনের সংগে আবদ্ধ থাকে। এছাড়া ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রভৃতিও পাচকরসে দেখা যায়। বিশুদ্ধ পাচকরসের *p*H 0·9 থেকে 1·5; তবে পাকস্থলীতে খাদ্যের

উপস্থিতির দরুন HCl-এর তীব্রতা হ্রাস পায় এবং তখন *p*H 1·5 থেকে 2·5 এর মত দেখা যায়। পাচকরসের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·006-1·009। 2নং তালিকায় পাচকরসের উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে। পাচকরসে প্রায় 99·45 শতাংশ জল এবং বাকী 0·55 শতাংশ কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে জৈব ও অজৈব পদার্থের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। জৈবপদার্থের মধ্যে যেসব এন্‌জাইমের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে রেনিন মানুষের পাকস্থলীতে পাওয়া যায় না।

2নং তালিকা : পাচকরসের উপাদান।

জল	90 45	
কঠিন পদার্থ	0·55	
কঠিন পদার্থ :	মিউসিন	গ্যাসট্রিন
	পেপসিন	সেরোটোনিন
	জিলাটিনেজ	লাইপোপ্রোটিন
(a) **জৈব পদার্থ**	গ্যাসট্রিসিন	(ইন্‌ট্রিন্‌সিক ফ্যাকটর)
(0·4 শতাংশ)	ক্যাথেপ্‌সিন	পাকস্থলীর লাইপেজ
	প্যারাপেপসিন I, II	(ট্রাইবিউটারেজ)
	ইউরিয়েজ	রেনিন (মানুষে অনুপস্থিত)
	লাইসোজাইম	ল্যাকটিক্ অ্যাসিড
	কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ	
(b) **অজৈব পদার্থ**	NaCl	ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট
(0·15 শতাংশ)	KCl	ম্যাগ্‌নেসিয়াম ফসফেট
	$CaCl_2$	বাইকার্বনেট
	HCl	

লাইপেজ সম্ভবত পাকস্থলীর কোন গ্রন্থিকোষ ক্ষরণ করে না, ডিওডিনামের উদ্‌গীরণ পদার্থের সংগে পাকস্থলীতে পৌঁছায়। ভিটামিন B_{12}-এর বিশোষণে সহায়ক স্বাশ্রয়ী উপাদান (intrinsic factor) একটি লাইপোপ্রোটিন এবং মানুষের অক্সিন্‌টিক সেল (oxyntic cell) বা অম্লঃক্ষরা কোষ তার ক্ষরণ ঘটায়। এছাড়া বাহসংকোচক পদার্থ সেরোটোনিন আরুজেনটাফিন কোষের দ্বারা ক্ষরিত

হয়। পাইলোরাসস্থিত কোষ গ্যাসট্রিনের ক্ষরণ ঘটায়। স্বাভাবিক অবস্থায় সামান্য পরিমাণে লাইসোজাইম পাচকরসে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তার উৎস এখনও অজ্ঞাত। সামান্য পরিমাণে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ সম্ভবত বিচ্ছিন্ন উপরিতলীয় আবরণীকোষ থেকে জারকরসে প্রবেশ করে।

পাচকরসে এছাড়া ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রতি মিলি-লিটারে 100,000টি ব্যাকটেরিয়া এই রসে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রধান বি. কোলাই (B. Coli), স্টাফাইলোকোকাস (staphylococcus), স্ট্রেপটো-কোক্কাস (streptococcus hemolyticus) ইত্যাদি প্রধান। পাকস্থলীতে পিত্তরসের উদ্‌গীরণ ও লালারস ব্যাকটেরিয়ার প্রধান উৎস।

2. **পাচকরসের কার্যাবলী** (Functions of gastric juice): পাচকরস যেসব কার্য সম্পন্ন করে, তার মধ্যে প্রধান: (1) **প্রোটিনের পরিপাক:** হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে পেপসিন প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে এবং পেপটোনে রূপান্তরিত করে। জিলাটিনেজ শুধুমাত্র জিলাটিনের উপর ক্রিয়া করতে পারে এবং এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে ইহা পেপসিনের চেয়ে প্রায় 400 গুণ অধিক সক্রিয়। অন্যান্য এনজাইমও (ক্যাথেপসিন, গ্যাসট্রিসিন, প্যারাপেপসিন প্রভৃতি) প্রোটিনের পরিপাকে সহায়তা করে এবং pH 3তে তাদের সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশী দেখা গেছে। (2) **স্নেহপদার্থের পরিপাক:** স্নেহপদার্থের পরিপাকে পাকস্থলীয় লাই-পেজের (ট্রাইবিউটাবেজ) গুরুত্ব যদিও খুব কম তথাপি pH 4·5 এ এর সক্রিয়তা সর্বাধিক দেখা যায় এবং ইহা সামান্য পরিমাণে, দুধ, মাখন ও ডিমের কুসুমস্থিত স্নেহপদার্থের পরিপাক করতে পারে। (3) **আর্দ্র বিশ্লেষণ:** HCl সব রকম খাদ্যবস্তুকে সামান্য পরিমাণে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করতে পারে। এছাড়া সুক্রোজকে সামান্য পরিমাণে গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজে রূপান্তরিত করতে পারে। (4) **প্রতিরক্ষা:** হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গিলে ফেলা ব্যাকটেরিয়া, বিজাতীয় পদার্থ প্রভৃতিকে বিনষ্ট করে এবং বীজবারক (antiseptic) হিসাবে কাজ করে। (5) **সুরক্ষা:** মিউসিন HCl এর হাত থেকে পাকস্থলীয় প্রাচীরকে সুরক্ষা করে। (6) **ভিটামিনের বিশোষণ:** একটি লাইপো-প্রোটিন (intrinsic factor) ভিটামিন B_{12} এর বিশোষণে সহায়তা করে এবং এভাবে লোহিতকণিকার বৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। (7) **পাকস্থলীয় ক্ষরণের উদ্দীপনা:** পেপটাইড হরমোন গ্যাসট্রিন পাকস্থলীয়

পাচকরসের ক্ষরণে উদ্দীপনা দান করে। (8) **অম্লক্ষারের সাম্য :** হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরণের সময় রক্তে ক্ষারীয় অবস্থার উদ্ভব হয়। (9) **রেচনক্রিয়া :** গুরুধাতু, প্রতিবিষ, অ্যালকালোয়েড প্রভৃতি পাচকরসের মাধ্যমে রেচিত হয়।

3. **পাচকরসের ক্ষরণপদ্ধতি :** (Mechanism of gastric secretion) **:** পাকস্থলীতে অবস্থানকারী বিভিন্ন গ্রন্থির মিশ্র ক্ষরণ একত্রে অম্লধর্মী এবং পাইলোরাস বা প্রণালীস্কন্ধের ক্ষরণ ক্ষারধর্মী।

পাচকরসের ক্ষরণপদ্ধতির অনুশীলন ও পরীক্ষা প্রধানত কুকুর ইত্যাদি প্রাণীর উপর সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে আকস্মিক দুর্ঘটনার দ্বারা সৃষ্ট ভগন্দর (fistula) থেকে সংগৃহীত পাচকরসের অনুশীলন করে মানুষের পাচকরসের ক্ষরণপদ্ধতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব পরীক্ষা ও অনুশীলন থেকে জানা গেছে পাচকরসের ক্ষরণ তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। এই পর্যায় তিনটি হল **:** (a) **স্নায়ুজ দশা** (nervous phase), (b) **পাকস্থলীয় দশা** (gastric phase) এবং (c) **আন্ত্রিক দশা** (intestinal phase)। শেষোক্ত দুটো পর্যায় রাসায়নিক উদ্দীপনাপ্রসূত। তবে তিনটি পর্যায়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে উদ্দীপিত করে।

(a) **স্নায়ুজ দশা :** কুকুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে এই দশার যথার্থ অনুশীলন সম্ভব হয়েছে। কুকুরের গ্রাসনালীকে দ্বিধাবিভক্ত করে (যাতে
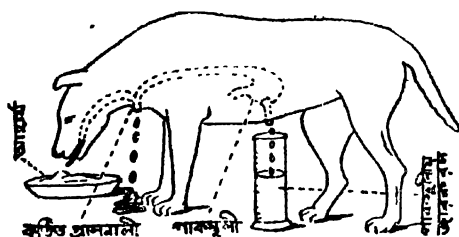
6-21 নং চিত্র **:** নকলভোজন ও প্যাভলোভ থলির দ্বারা পাচকরসের সংগ্রহ।

খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণের পরই দেহের বাইরে নির্গত হতে পারে—**নকলভোজন** বা sham feeding) এবং পাকস্থলীতে **প্যাভলোভ থলি** (pavlov's pouch) প্রস্তুত করে (যাতে পাচকরস সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়) এজাতীয়

পরীক্ষার গোড়াপত্তন করা হয় (6-21 নং চিত্র)। দেখা গেছে, গলাধঃকৃত খাদ্যবস্তু কর্তিত গ্রাসনালীর মধ্য দিয়ে দেহ থেকে নির্গত হয়ে যাবার পর 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে পাচকরসের ক্ষরণ ঘটে। তবে ভেগাস স্নায়ুকে কেটে ফেললে এজাতীয় ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। এ থেকে স্পষ্টই পাচকরস ক্ষরণের সংগে স্নায়ুজ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া ভেগাসস্নায়ু ও স্বতন্ত্রস্নায়ুতে পৃথক পৃথকভাবে উদ্দীপনা প্রয়োগ করে যথাক্রমে অম্ল ও ক্ষারকীয় পাচকরসের ক্ষরণ লক্ষ্য করা গেছে। অম্ল পাচকরসে HCl, পেপ্‌সিন ও শ্লেষ্মার আধিক্য দেখা যায়। ক্ষারকীয় পাচকরসে ক্লোরাইড ও পেপ্‌সিন কম থাকে, তবে শ্লেষ্মা যথেষ্ট পরিমাণ থাকে। কখনও কখনও ভেগাসস্নায়ুর উদ্দীপনা পাচকরস ক্ষরণে বাধা সৃষ্টি করে বা বন্ধ করে দেয়। ভেগাসস্নায়ুতে 3 ধরনের স্নায়ুতন্তুর উপস্থিতিই এর প্রধান কারণ। যথা: (1) বাহ-প্রসারক স্নায়ুতন্তু (vasodilator fibers), (2) প্রতিরোধক স্নায়ুতন্তু (inhibitory fibers) এবং (3) ক্ষরণনিয়ামক স্নায়ু (secretomotor fibers)। অপরপক্ষে স্বতন্ত্র স্নায়ু দুধরনের স্নায়ুতন্তু নিয়ে গঠিত। যথা: (1) বাহসংকোচক স্নায়ু (vasoconstrictor fibers) এবং (2) ক্ষরণনিয়ামক স্নায়ু (secretomotor fibers)। স্বতন্ত্রস্নায়ুর উদ্দীপনায় প্রণালীস্কন্ধস্থিত শ্লেষ্মাঝিল্লির সংকোচন ও প্রণালীগ্রন্থির ক্ষরণ লক্ষ্য করা যায়।

স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুকেন্দ্র হিসাবে হাইপোথালামাস পাচকরস ক্ষরণে অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষামূলকভাবে হাইপোথালামাসকে বিনষ্ট করে পাকস্থলীতে রক্তক্ষরণ, পাকস্থলীর ক্ষয়, এমন কি পাকস্থলীতে ছিদ্রাবলীও লক্ষ্য করা গেছে।

এজাতীয় পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, পাচকরসের ক্ষরণ প্রধানত দুটো প্রতিবর্তের নিয়ন্ত্রাধীন: (1) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (conditioned reflex) এবং (2) অনপেক্ষ প্রতিবর্ত (unconditioned reflex)। খাদ্যবস্তুর দর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে সক্রিয় করে তোলে এবং পাচকরসের ক্ষরণ ঘটায়। অপরপক্ষে খাদ্যবস্তুর চর্বন, গলাধঃকরণ ইত্যাদি থেকে অনপেক্ষ প্রতিবর্তের উদ্ভব হয় এবং ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে পাচকরসের ক্ষরণ ঘটায়।

পাচকরসের এই প্রারম্ভিক পর্যায়ের ক্ষরণ উদ্দীপনার তীব্রতার সংগে যেমন সমানুপাতিক হয়, তেমনি এর উপাদান নির্দিষ্ট থাকে, অর্থাৎ ইহা অধিক পেপ্‌সিন, HCl ও শ্লেষ্মাযুক্ত হয়।

(b) **পাকস্থলীয় দশা ঃ** ইহা একটি রাসায়নিক দশা। খাদ্যবস্তুর পাকস্থলীতে প্রবেশের প্রায় আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পরে এই দশার শুরু হয়। এই বিলম্বের প্রধান কারণ, প্রণালীস্কন্ধের শ্লেষ্মাঝিল্লি প্রোটিনের পরিপাকলব্ধ কিছুসংখ্যক পদার্থ থেকে **গ্যাসট্রিন** নামক যে রাসায়নিক পদার্থটি উৎপন্ন করে তা রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে এবং পশ্চাৎদিকে প্রবাহিত হয়ে পাকস্থলীয় শ্লেষ্মা-ঝিল্লিস্থ গ্রন্থিসমূহে পৌঁছয় এবং পাচকরসক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়। পাচকরস ছাড়াও ইহা পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয়রস-ক্ষরণে উদ্দীপক হিসাবে কার্য করে।

বিভিন্নপ্রকারের খাদ্যবস্তু এই দশার পাচকরস-ক্ষরণকে প্রভাবিত করে। যেমন ঃ (1) **প্রোটিনজাতীয় খাদ্য ঃ** মাংস, ডিম ইত্যাদি পাচকরস-ক্ষরণের পরিমাণকে যেমন বৃদ্ধি করে, তেমনি তা, HCl উৎপাদনেরও বৃদ্ধি ঘটায়। (2) **স্নেহদ্রব্য ঃ** স্নেহদ্রব্য পাচকরস ক্ষরণে বাধাদান করে। **এনটারোগ্যাসট্রোন** (enterogastrone) নামক একটি আন্ত্রিক হরমোনের নিঃসরণই এর প্রধান কারণ। এই পদার্থটি পাকস্থলীর সঞ্চালন ও তার পাচকরস ক্ষরণে বাধাদান করে। (3) **পাউরুটিজাতীয় খাদ্য ঃ** সহজেই এজাতীয় খাদ্য পাচকরস-ক্ষরণে উদ্দীপনা দান করে। (4) **চা, কফি, ফলের রস, গরম মসলা, আচার** ইত্যাদি পাচকরস-ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। (5) সোডা-ওয়াটার, কোকাকোলা ইত্যাদি পানীয় গ্যাসের দ্বারা পাকস্থলীর প্রসারণ ঘটালে পাচকরস-ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়।

(c) **আন্ত্রিক দশা ঃ** খাদ্যবস্তু পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রের গ্রহণীতে প্রবেশ করলে পুনরায় পাকস্থলীয় রসের ক্ষরণ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। **আন্ত্রিক গ্যাসট্রিন** নামক রাসায়নিক পদার্থের উদ্দীপনাহেতু পাকস্থলীর এ জাতীয় ক্ষরণ সংঘটিত হয়। এই দশাকে তাই রাসায়নিক দশা হিসাবে অভিহিত করা হয়।

4. **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণপদ্ধতি** (Mechanism of HCl secretion)

পরীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় (1) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাকস্থলীর ফান্ডাস ও বডীস্থিত **অক্সিনটিক কোষ** বা **অম্লক্ষরা কোষের** দ্বারা ক্ষরিত হয়। HCl কোষের সাইটোপ্লাজমে উৎপন্ন হয় না, কারণ অ্যাসিড ক্ষরণের সময় কোষসাইটোপ্লাজম ক্ষারধর্মী হয়। অ্যাসিড গ্রন্থিস্থিত ক্যানালিকুলাস

(canaliculi) বা গ্রন্থিনালিকায় প্রথমে আবির্ভূত হয়। (2) অম্লক্ষরা কোষ সব সময় একই গাঢ়ত্বে অ্যাসিড (0·17N) ক্ষরণ করে। (3) HCl-এর ক্ষরণের সংগে জৈবশক্তি ব্যয়ের সম্পর্ক বর্তমান। দেখা গেছে, এক গ্রামঅণু HCl এর উৎপাদনে প্রায় 10,000 গ্রাম ক্যালোরি জৈবশক্তি ব্যয়িত হয়। সম্ভবত গ্লুকোজের জারনক্রিয়া থেকে এই জৈবশক্তি উৎপন্ন হয়। (4) প্রতিটি হাইড্রোজেন আয়নের জন্য একটি করে বাইকার্বনেট আয়ন উৎপন্ন হয় যা প্রথমে বহিরকোষীয় তরলে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে রক্তে পৌঁছয়। এই ব্যবস্থার জন্য CO_2-এর সরবরাহ সব সময় প্রয়োজন। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের
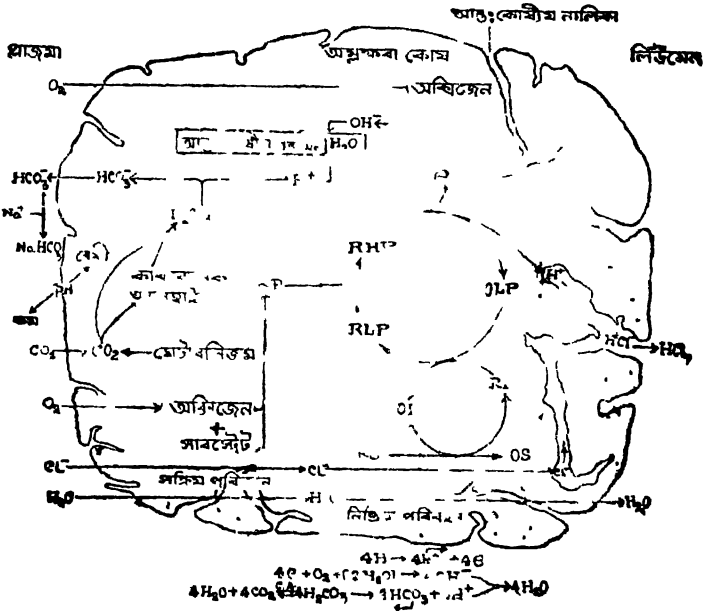
6-22নং চিত্র : অম্লক্ষরা কোষে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণের পদ্ধতি। RLP – বিজারিত নিম্নশক্তিসম্পন্ন পদার্থ, RHP – বিজারিত উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ, OLP – জারিত নিম্নশক্তিসম্পন্ন পদার্থ, RI – বিজারিত অন্তর্বর্তী পদার্থ, OI – জারিত পদার্থ OS, RS – জারিত ও বিজারিত সাবস্ট্রেট।

ক্ষরণ মন্থর হলে অম্লক্ষরা কোষের বিপাকক্রিয়া থেকেই প্রয়োজনীয় CO_2 পাওয়া যেতে পারে। তবে ক্ষরণের হার অধিক হলে রক্তসংবহন থেকে তা গৃহীত হয়। বিক্রিয়ার পদ্ধতি যাই হোক না কেন, H^+ আয়নের অপসারণে OH^- আয়নের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, ফলে তাকে প্রশমিত না করলে

যেভাবে ক্ষারকত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে, তা ক্ষরণশীল কোষকে বিনষ্ট করে দিতে পারে। CO_2-এই অন্তঃকোষীয় প্রশমনের জন্য প্রয়োজন হয় এবং HCl-এর ক্ষরণের সময় সমসংখ্যক বাইকার্বনেট উৎপন্ন হয়। রক্তে বাইকার্বনেটের প্রবেশের ফলে পরিপাকের সময় মূত্র তাই ক্ষারধর্মী হয়ে পড়ে। (5) অম্লক্ষরা কোষে এনজাইম্ কার্বনিক অ্যানহাইড্রোজের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। ইহা একাধারে যেমন কার্বনিক অ্যাসিড উৎপাদনে সহায়তা করে, তেমনি OH^- আয়নের প্রশমনেও অংশগ্রহণ করে (6) ড্যাভির (Davie) মতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণের সংগে দুটো প্রক্রিয়া জড়িত : (a) ডেহাইড্রোজেনেজের দ্বারা পরিবাহিত (tansported) বিপাকীয় হাইড্রোজেন অণু ও H_2O সাইটোক্রোম সংস্থার দ্বারা জারিত হয়ে H^+ উৎপন্ন করে এবং ইলেক্ট্রন O_2 এবং H_2O-এর সংগে বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রথমে OH আয়ন উৎপন্ন করে এবং পরিশেষে CO_2-এর সংগে বিক্রিয়া ঘটিয়ে HCO_3^- উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়া আবহমণ্ডলীয় O_2 থেকে সাইটোক্রোম সংস্থার মাধ্যমে যে জারণ-বিজারণ শক্তির উদ্ভব হয় তাকে কাজে লাগায়। (b) নিম্নমাত্রার জারণ-বিজারণধর্মী বিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন ফসফেট বণ্ড-এনার্জি জলের আয়ন থেকে উৎপন্ন H^+ আয়নকে একটি ইলেক্ট্রন চক্রীয় প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীভূত করে। ইলেকট্রন চক্র H^+ আয়নকে বিজারিত করে কোভেলেণ্ট (covalent) হাইড্রোজেন অণুতে রূপান্তরিত করে। উৎপন্ন হাইড্রোজেন অণু বাহকসংস্থার (carrier system) দ্বারা বাহিত হয় এবং যুগল ফস্‌ফরাস সংযুক্তির (couple phophorylation) ফলে জারিত হয়ে অধিক সংখ্যক H^+ আয়নে পরিণত হয়। ড্যাভির মতে অক্সালোঅ্যাসিটেট এবং সাইটোক্রম b অথবা ফিউমারেট-সাক্‌সিনেট এবং সাইটোক্রোম c সম্ভবত হাইড্রোজেন বাহক ও ইলেকট্রন পরিবহনসংস্থা হিসাবে যথাক্রমে ক্রিয়া করে।

ড্যাভেনপোর্টের (Davenport) ধারণা, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণ একটি চক্রাকার জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়াবিশেষ। কোষমধ্যস্থ বাহক অণু উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফসফেটের সংগে যুক্ত হয় এবং তার মধ্যে নিহিত শক্তি তীব্রতার নতি-মাত্রার বিরুদ্ধে উৎপন্ন প্রোটনের (হাইড্রোজেন আয়ন) পরিবহনে ব্যয়িত হয়। বাহকপদার্থ এরপর সাবস্ট্রেটের দ্বারা বিজারিত হয় এবং পুনরায় জারণ-বিজারণ চক্রে প্রবেশ করে। তাছাড়া একটি প্রোটোন যখনই উৎপন্ন হবে তখনই একটি ইলেকট্রনকে অক্সিজেনের গ্রহণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়। CO_2-কে ব্যবহার

করে অন্তঃকোষীয় প্রশমন কার্যকারী করতে হবে এবং কোষের pHকে নিম্নাভিমুখী রাখতে হবে।

H^+-আয়ন যখন ক্যানালিকুলাসে প্রবেশ করে, তখন একই সংগে Cl^- আয়ন রক্ত থেকে সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে এক স্থানে পৌঁছায়। ক্ষরণের পূর্বমুহূর্তে তারা HCl উৎপন্ন করে এবং লিউমেনে নিঃসৃত হয়।

অগ্ন্যাশয় রস
Pancreatic juice

1. উপাদান (Composition) : প্রধান অগ্ন্যাশয়নালীতে ক্যানুলা (cannula) প্রবেশ করিয়ে অগ্ন্যাশয় রসকে সংগ্রহ ও তার অনুশীলন করা

3নং তালিকা : অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান।

জল	98·42 শতাংশ	
কঠিন পদার্থ	1·58 শতাংশ	
কঠিন পদার্থ		
(a) জৈব পদার্থ	অ্যামাইলেজ	ট্রিপ্সিনোজেন
	ম্যালটেজ	কাইমোট্রিপ্সিনোজেন
	সুক্রেজ	কার্বোক্সিপেপটিডেজ A, B
	ল্যাকটেজ	অ্যামাইনোপেপটিডেজ
	কোলেস্টারোল-এস্টারেজ	ফসফোলাইপেজ
	লাইপেজ	নিউক্লিয়েজ
	লেসিথিনেজ	অ্যালবুমিন
	ইলাস্টেজ	গ্লোবিউলিন
	কোলাজেনেজ	
(b) অজৈব পদার্থ	Na^+	Cl^-
	K^+	$SO_4^{=}$
	Ca^{++}	$HPO_4^{=}$
	Mg^{++}	HCO_3^-
	Zn^{++}	

সম্ভবপর হয়। দেখা গেছে, মানুষের অগ্ন্যাশয় থেকে প্রতিদিন 1200 থেকে 1500 **লিটার** অগ্ন্যাশয় রস **ক্ষরিত হয়। বর্ণহীন এই তরল ক্ষারধর্মী** (pH 8-8·3)। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·010 থেকে 1·030-এর মধ্যে থাকে। জারকরসের অভিস্রবণচাপ প্লাজমার অভিস্রবণচাপের সমান। 3নং তালিকায় অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান সন্নিবেশিত হল।

2. **অগ্ন্যাশয় রসের কার্যাবলী** (Functions of pancreatic juice) : অগ্ন্যাশয় রসের প্রধান কার্য দু'টি : (1) পরিপাকক্রিয়া এবং (2) প্রশমনক্রিয়া।

(1) **পরিপাকক্রিয়া :** অগ্ন্যাশয় রসে অবস্থিত এনজাইমসমূহ কার্বোহাইড্রেট, স্নেহদ্রব্য ও প্রোটিনের পরিপাকে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে।

(2) **প্রশমনক্রিয়া :** অগ্ন্যাশয় রস ক্ষারকীয় হওয়ার ফলে ইহা সমআয়তন পাচকরসকে প্রশমিত করতে পারে।

3. **অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণ পদ্ধতি** (Mechanism of secretion of pancreatic juice) : বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে, অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণ দুভাবে বা দুটো দশায় সম্পন্ন হয়। প্রথম দশাকে **স্নায়বিক দশা** (nervous phase) এবং দ্বিতীয় দশাকে **রাসায়নিক দশা** (chemical phase) হিসাবে অভিহিত করা হয়।

(a) **স্নায়বিক দশা :** খাদ্যগ্রহণের 1 থেকে 2 মিনিট পরে এই দশা শুরু হয়। ভেগাস স্নায়ুকে ব্যবচ্ছেদ করলে অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। এর থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণ প্রতিবর্তের অধীন। প্রতিবর্তকে সক্রিয়কারী প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা প্রধানত দুটো উৎস থেকে আসে : (1) মুখাভ্যন্তর : খাদ্যবস্তুর চর্বনের সময় মুখাভ্যন্তর থেকে এজাতীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। (2) পাকস্থলী : খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে পৌঁছলে এজাতীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় (গ্যাসট্রো-প্যানক্রিয়েটিক প্রতিবর্ত)। আবার অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণের জন্য প্রয়োজনীয় এই প্রতিবর্ত সম্পূর্ণভাবে **অনপেক্ষ** (unconditioned) হয়।

স্নায়ুতন্ত্রের উদ্দীপনা থেকে অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণের পরিমাণ কম হলেও তাতে এনজাইমের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

(b) **রাসায়নিক দশা :** পাকস্থলীর খাদ্যবস্তু গ্রহণীতে প্রবেশের পরই রাসায়নিক দশা শুরু হয় এবং অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ক্ষরণের উদ্দীপনা (রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে) গ্রহণী থেকে রক্তের মাধ্যমে

অগ্ন্যাশয়ে পৌঁছায়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্রহণীর শ্লেষ্মাস্তরের উপর ক্রিয়া করে, সিক্রেটিন (secretin) নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে যা রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে অগ্ন্যাশয়ে পৌঁছায় এবং গ্রন্থিকোষকে অধিক পরিমাণ রসক্ষরণে উদ্দীপিত করে। সিক্রেটিনের দুটো প্রধান অংশ রয়েছে : একাংশ, যা প্রকৃত সিক্রেটিন (true secretin) নামে অভিহিত, শুধুমাত্র জল, ক্ষারক এবং লবণ ক্ষরণের জন্য দায়ী। অপরাংশ, প্যান্‌ক্রিওজাইমিন (pancreozymin) নামে পরিচিত। ইহা প্রধানত এন্‌জাইম ক্ষরণের জন্য দায়ী।

আন্ত্রিক রস

Succus Entericus

উপাদান (composition) : অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত রসের সংগে মিশে থাকে

4নং তালিকা : আন্ত্রিকরসের উপাদান।

জল	98·5 শতাংশ	
কঠিন পদার্থ	1·5 শতাংশ	
কঠিন পদার্থ :	সক্রিয়কারক :	আর্‌জিনেজ
	এন্‌টারোপেপ্‌টিডেজ	অ্যামাইনেজ
	এন্‌জাইম :	সুক্রেজ
	ডাইপেপ্‌টিডেজ	আইসো-ম্যাল্‌টেজ
(a) **জৈব পদার্থ** : (0·7 শতাংশ)	নিউক্লিয়েজ	ল্যাক্‌টেজ
	নিউক্লিওটিডেজ	লাইপেজ
	নিউক্লিওসিডেজ	আর্‌জিনেজ
	ডেক্সট্রিনেজ	ফসফাটেজ
		মিউসিন
(b) **অজৈব পদার্থ** : (0·8 শতাংশ)	সোডিয়াম	ম্যাগ্‌নেশিয়াম
	পটাসিয়াম	বাইকার্বনেট
	ক্যাল্‌সিয়াম	ফস্‌ফেট
		ক্লোরাইড

বলে আন্ত্রিক রস বিশুদ্ধভাবে পাওয়া খুবই কষ্টকর। তবু এই তরলের একটা গড়পড়তা হিসাব দেওয়া সম্ভবপর। আন্ত্রিক রস অম্ল-ক্ষারধর্মী (pH 6·3—8·6)। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·01 এবং প্রতি 24 ঘণ্টায় গড়ে 1 থেকে 2 লিটার আন্ত্রিক রস ক্ষরিত হয়। 4নং তালিকায় আন্ত্রিকরসের উপাদান সন্নিবেশিত হল।

তালিকাবদ্ধ সব কটি এনজাইম প্রকৃতপক্ষে আন্ত্রিকরসে থাকে না। তাদের কিছুসংখ্যক আবরণীকলাকোষে অবস্থান করে। অ্যামাইলেজ এবং এন্টারোপেপ্টিডেজ সর্বাধিক দ্রবণীয় বলে তাদের আন্ত্রিক রসে দেখতে পাওয়া যায়। ম্যাল্টেজ্ সুক্রেজ, লাইপেজ, পেপটিডেজ প্রভৃতিকে প্রধানত আন্ত্রিক আবরণীকলায় এবং আন্ত্রিকরসের বিচ্ছিন্ন কোষে দেখতে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র শ্লেষ্মাঝিল্লির নির্যাসে নিউক্লিয়েজ, প্রোটিয়েজ, আরজিনেজ, ফসফাটেজ প্রভৃতি এনজাইমকে দেখা যায়।

2. **আন্ত্রিক রসের কার্যাবলী** (Functions of succus entericus) : অন্ত্রিকরস যে সব কার্যাবলী সম্পন্ন করে তার মধ্যে প্রধান (1) **সুরক্ষা :** মিউসিনের উপস্থিতির দরুণ ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃস্থ উপরিতল ক্ষতিকারক খাদ্যবস্তু বা পদার্থ থেকে সুরক্ষিত থাকে। হঠাৎ ডিওডিনামে পৌঁছে যাওয়া HCl-এর হাত থেকে এভাবে ডিওডিনাম রক্ষা পায়। (2) **সক্রিয়করণ :** এন্টারোপেপ্টিডেজের উপস্থিতি নিষ্ক্রিয় ট্রিপ্সিনোজেনকে সক্রিয় ট্রিপ্সিনে পরিণত করে। (3) **আর্দ্র-বিশ্লেষণ :** প্রচুর পরিমাণে জলের উপস্থিতি খাদ্যের আর্দ্রবিশ্লেষণে সহায়তা করে। এছাড়া খাদ্যকণার পরিবহন, বিশোষণ ছাড়াও দ্রাবক হিসাবে ইহা সহায়তা করে। (4) **পরিপাক :** ইহা প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের পরিপাকের অন্তীম পর্যায়কে সম্পূর্ণ করে। (5) **বিশোষণ :** ইহা পরিবহন মাধ্যম হিসাবে খাদ্যকণার রক্তে বিশোষণে সহায়তা করে। (6) **জলসাম্য :** জলের বিশোষণের মাধ্যমে ইহা জলসাম্য বজায় রাখে, তবে কলেরা, গ্যাসট্রো-এন্টারাইটিস প্রভৃতি রোগে জল ও লবণের নিষ্ক্রমণে এই সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয়।

3. **আন্ত্রিক রসের ক্ষরণপদ্ধতি** (Mechanism of secretion of succus entericus) : আন্ত্রিক রসের ক্ষরণপদ্ধতিকে তিন ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় : (i) যান্ত্রিক পদ্ধতি, (ii) রাসায়নিক পদ্ধতি এবং (iii) স্নায়ুজ পদ্ধতি।

স্বাভাবিক অবস্থায় ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যবস্তুর উপস্থিতি যান্ত্রিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই উদ্দীপনা মিজ্‌নারের স্নায়ুজালক মারফৎ প্রতিবর্তের মাধ্যমে রসের ক্ষরণ ঘটায়।

দ্বিতীয়ত, পরিপাকলব্ধ পদার্থ, বিশেষ করে প্রোটিনজাতীয় খাদ্যবস্তু, আন্ত্রিক রসের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। স্নায়ুজ সংযোগ বিনষ্ট করলেও এর একই ফল পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, ভেগাসস্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রয়োগ করে আন্ত্রিক রসের অধিক ক্ষরণ লক্ষ্য করা যায়। অপরপক্ষে স্বতন্ত্র স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসের ক্ষরণ হ্রাস পেতে দেখা গেছে। এছাড়া অ্যাসিটাইলকোলিন (acetylcholine) বা পাইলোক্যার্‌পিন (pilocarpine) দেহে প্রবেশ করিয়ে আন্ত্রিকরসের ক্ষরণ বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। এ থেকে আন্ত্রিকরস ক্ষরণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

পিত্তরস
Bile

যকৃৎ পিত্তরসের উৎপাদন ও রেচন করে। যকৃতে পিত্তরসের উৎপাদন ধারাবাহিক হলেও, শুধুমাত্র খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার পরই তা গ্রহণীতে প্রবেশ করে। যকৃতে উৎপন্ন হবার পর এই তরল পদার্থটি বাম ও দক্ষিণ যকৃৎ-নালীর মাধ্যমে **সাধারণ যকৃৎ-নালীতে** (common hepatic duct) প্রবেশ করে। এই নালী **পিত্তাশয়ের** (gall bladder) পিত্তনালীর (cystic duct) সংগে যুক্ত হয়ে **সাধারণ পিত্তনালী** (common bile duct) গঠন করে, যা ভ্যাটারের নালীস্ফীতির মাধ্যমে গ্রহণীতে প্রবেশ করে। পিত্তাশয়ে পিত্তরস সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে।

1. **পিত্তরসের উপাদান** (Composition of bile): যকৃৎ পিত্তরস কিছুটা ক্ষারধর্মী (pH 8-8·6), সান্দ্র (viscous), তিক্ত স্বাদযুক্ত, উজ্জ্বল, হরিদ্রাভ তরলপদার্থ। যকৃতের প্যারেন্‌কাইমা কোষ (parenchymal cell) প্রতি 24 ঘণ্টায় গড়ে 500-1000 মিলিলিটার পিত্তরস উৎপন্ন করে। পিত্তাশয়ের

5নং তালিকা : পিত্তরসের উপাদান

জল কঠিন পদার্থ	89—98 শতাংশ 2—11 শতাংশ	
কঠিন পদার্থ : **(a) অজৈব পদার্থ** (0·7—0 8 শতাংশ)	Na^+ K^+ Ca^{++} $NaHCO_3$	 ক্লোরাইড ফসফেট ক্যার্‌বোনেট
(b) জৈব পদার্থ (1·3—10·2 শতাংশ)	**পিত্তলবণ :** সোডিয়াম টরোকোলেট সোডিয়াম গ্লাইকো-কোলেট **পিত্তরঞ্জক কণা :** বিলির্‌বিন বিলিভার্‌ডিন	**অন্যান্য পদার্থ :** কোলেস্‌টারোল লেসিথিন স্নেহ অম্ল মিউসিন নিউক্লিওপ্রোটিন শ্লেষ্মা ইত্যাদি

পিত্তরস তুলনামূলকভাবে অধিকতর গাঢ় হয়। পিত্তরসের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·010-1·011 (পিত্তাশয়ে, 1·026—1·040)। মানুষের পিত্তরসের উপাদান 5নং তালিকায় সন্নিবেশিত হল।

2. **পিত্তরসের কার্যাবলী** (Functions of bile) : পিত্তরস জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। ক্ষারকীয় ফস্‌ফাটেজ (alkaline phosphatase) নামক এন্‌জাইম না থাকলেও পরিপাকরস হিসাবে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পিত্তরসের প্রধান প্রধান কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখিত হল :

(1) **পরিপাক** (Digestion) : পিত্তরসে পিত্তলবণের উপস্থিতির জন্য ইহা স্নেহদ্রব্যের পরিপাকক্রিয়ায় বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। পৃষ্ঠটান হ্রাস করে পিত্তরস স্নেহদ্রব্যের অবদ্রব সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এভাবে সৃষ্ট সূক্ষ্ম স্নেহবিন্দুর উপরিতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়, ফলে এন্‌জাইম **লাইপেজ** সহজেই তাদের উপর ক্রিয়া করে স্নেহপদার্থের পরিপাক বৃদ্ধি করে। এছাড়া পিত্তরস উত্তম দ্রাবক হিসাবে ক্রিয়া করে। পিত্তলবণে কোলিকঅ্যাসিড (cholic

acid) মূলকের উপস্থিতির জন্য ইহা কোন কোন লাইপেজ এন্জাইমের নির্দিষ্ট সক্রিয়কারক হিসাবে কার্য করে। (2) **বিশোষণ** (Absorption) ঃ পিত্তরস স্নেহদ্রব্যের বিশোষণে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। অদ্রবণীয় স্নেহঅম্ল, কোলেস্টারোল, ক্যালসিয়াম প্রভৃতিকে দ্রবণীয় করে বিশোষণযোগ্য করে তোলে। এছাড়া স্নেহদ্রবণীয় ভিটামিন এবং উপভিটামিন ক্যারোটিন, লোহা ইত্যাদির বিশোষণকার্যেও ইহা অংশগ্রহণ করে। (3) **রেচন** (Excretion) ঃ পিত্তরসের মাধ্যমে পিত্ত রঞ্জককণা, কোলেসটারোল, লেসিথিন, কোন কোন গুরুধাতু, প্রতিবিষ, ব্যাক্টেরিয়া প্রভৃতি নির্গত হয়। (4) **রেচনক্রিয়া** (Laxative action) ঃ পিত্তলবণ ক্রমসংকোচনে উদ্দীপনা যোগায়। সরাসরি মলাশয়ে প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে, সেই অংশের ক্রমসংকোচন বৃদ্ধি পায়। (5) পিত্তরসের **মিউসিন** বাফার ও পিচ্ছিলকারী পদার্থ হিসাবে কার্য করে। (6) পিত্তরসে **অধিক ক্ষারক পদার্থের** উপস্থিতির জন্য ইহা গ্রহণীর pH-এর মাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে (HCl-কে প্রশমিত করে)। (7) **পিত্তাশয়সংকোচক পদার্থ** (Cholagogue) ঃ পিত্তরস পিত্তাশয়ের সংকোচক পদার্থ হিসাবে কার্য করে। পিত্তলবণ সবচেয়ে শক্তিশালী পিত্তাশয় সংকোচক পদার্থ। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে বিশোষিত হয়ে ইহা যকৃতে প্রবেশ করে এবং পিত্তরসক্ষরণের উদ্দীপনা যোগায়। গ্লাইকোকোলেটের চেয়ে টরোকোলেট এ ব্যাপারে অধিক ক্ষমতা-সম্পন্ন।

3. **পিত্তরসের ক্ষরণপদ্ধতি** (Mechanism of secretion of bile) ঃ পিত্তরস-ক্ষরণের সংগে স্নায়ুতন্ত্রের কোন সংস্রব নেই। এই ক্ষরণ বিশুদ্ধভাবে রাসায়নিক উদ্দীপনাজাত। যে সব রাসায়নিক পদার্থ পিত্তরসক্ষরণের উদ্দীপনা যোগায়, তাদের মধ্যে প্রধান (a) **খাদ্যবস্তু** এবং (b) **পিত্তলবণ**।

প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ পিত্তরসক্ষরণে উদ্দীপনা যোগায়। তবে কীভাবে এই দুটো পদার্থ কার্য করে, তার সঠিক পদ্ধতি এখনও অজ্ঞাত। পিত্তলবণ সবচেয়ে শক্তিশালী উদ্দীপক পদার্থ হিসাবে ক্রিয়া করে। গ্লাইকোকোলিক অ্যাসিডের চেয়ে টারোকোলিক অ্যাসিড এ ব্যাপারে অধিক শক্তিসম্পন্ন। পিত্তলবণ ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে বিশোষিত হয়ে যকৃতে প্রবেশ করে এবং পুনরায় ক্ষরিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **অন্ত্র-যকৃৎ সংবহন** (entero-hepatic circulation) বলা হয়।

4. পিত্তরসের সঞ্চয়পদ্ধতি (Mechanism of storage of bile) : পিত্তরস প্রধানত পিত্তাশয়ে সঞ্চিত হয়। সাধারণ পিত্তনালীতে (common bile duct) পিত্তরসের চাপ যখন 70 মিলিলিটার জলচাপের সমান হয়, তখনই পিত্তরস পিত্তাশয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে। বিশেষ ক্ষমতাবলে পিত্তাশয় জল ও সামান্য পরিমাণ অজৈব লবণকে শোষণ করতে পারে, ফলে পিত্তরসের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং তা প্রায় 10 গুণ অধিক গাঢ় হয়। পিত্তাশয় গড়ে প্রায় 50 মিলিলিটার পিত্তরসকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। তুলনামূলকভাবে ইহা পিত্তনালীর 500 মিলিলিটারের সমান।

5. পিত্তরসের রেচনপদ্ধতি (Mechanism of excretion of bile) : পিত্তরসের রেচন দুটো জিনিসের ওপর নির্ভর করে : (a) **পিত্তরসের চাপবৃদ্ধি** এবং (b) **ওডির পেশীবলয়ের (sphincter of Oddi) প্রসারণ।** পিত্তাশয়ের সংকোচন তথা পিত্তরসক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে পিত্তরসের চাপ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্নপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ (স্নেহদ্রব্য প্রোটিনজাত খাদ্য, ম্যাগ্নেসিয়াম সাল্ফেট, ক্যালোমেল (calomel), গ্রহণীর শ্লেষ্মাস্তর থেকে উৎপন্ন কোলেসিসটোকাইনিন (cholecystokinin) ইত্যাদি) পিত্তাশয়ের সংকোচনে উদ্দীপক পদার্থ হিসাবে কার্য করে। তাছাড়া ভেগাসস্নায়ুর উদ্দীপনা থেকেও পিত্তাশয় সংকুচিত হয়। একই কারণসমূহ ওডির পেশীবলয়ের প্রসারণ ঘটায়। ফলে পিত্তরস গ্রহণীতে নিঃসৃত হয়।

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায়, শুধুমাত্র পরিপাক ও বিশোষণের সময়ই পিত্তরস নিঃসৃত হয়।

পিত্তলবণ
BILE SALTS

মানুষের পিত্তরসে দুটো পিত্তলবণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় : (1) সোডিয়াম টরোকোলেট এবং (2) সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট। এই পিত্তলবণ দুটি মানুষের পিত্তরসে প্রায় সমান সমান অনুপাতে অবস্থান করে। সোডিয়ামের সংগে টরোকোলিক অ্যাসিড ও গ্লাইকোকোলিক

অ্যাসিডের সমন্বয়ে এরা উৎপন্ন হয়। টরোকোলিক অ্যাসিড ও গ্লাইকোকোলিক অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠন নিম্নরূপ ঃ

$$\begin{array}{c} O \\ \| \\ \overset{CH_3}{|}\ \ CH-CH_2-CH_2-CO-NH-CH_2-S-OH \\ \| \\ O \end{array}$$

HO

HO OH টরোকোলিক অ্যাসিড

$$\overset{CH_2}{|}\ \ CH-CH_2-CH_2-CO-NH-CH_2-COOH$$

HO

HO OH গ্লাইকোকোলিক অ্যাসিড
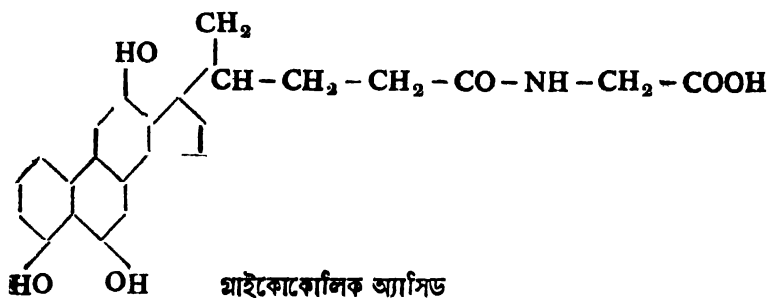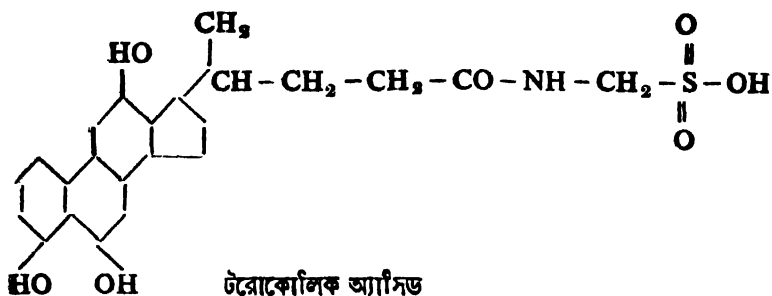
এই পিত্তঅম্লদ্বটির প্রধান উপাদান কোলিক অ্যাসিড, গ্লাইসিন এবং টরিন। মানুষের পিত্তরসে কোলিক অ্যাসিড ছাড়াও ডি-অক্সিকোলিক অ্যাসিড, কেনো-ডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড এবং লিথোকোলিক অ্যাসিডের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের পিত্তরসে এরা মুক্ত অ্যাসিড হিসাবেও থাকতে পারে।

গ্লাইসিন একটি সরল অ্যামাইনো অ্যাসিড। এটি অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড নয় বলে প্রাণীদেহে সংশ্লেষিত হয়। টরিন সালফারযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড সিস্টেইন থেকে উৎপন্ন হয়।

1. **পিত্তলবণের সংশ্লেষণ** (Synthesis of Bile Salts) ঃ পিত্তলবণ যকৃতে সংশ্লেষিত হয়। পিত্তনালীকে বেধে দিলে রক্তে পিত্তলবণের আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু কেটে বাদ দিলে রক্তে পিত্তলবণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। আবার কোন কারণে যকৃতের কার্যাবলী ব্যাহত হলে পিত্তলবণের উৎপাদন 50% হ্রাস পায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় পিত্তলবণ যকৃতে উৎপন্ন হয়।

গ্লাইসিন ও টরিনের সংগে কোলিক অ্যাসিড সংযুক্ত হয়ে যকৃতকোষে গ্লাইকোকোলিক অ্যাসিড ও টরোকোলিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। কোলিক

অ্যাসিড সংশ্লেষিত হয় কোলেস্টারোল থেকে। দেখা গেছে দেহের মোট কোলেস্টারোলের প্রায় 80-90% এভাবে পিত্তঅম্লে (bile acids) রূপান্তরিত হয়। নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এই রূপান্তর সংঘটিত হয় :
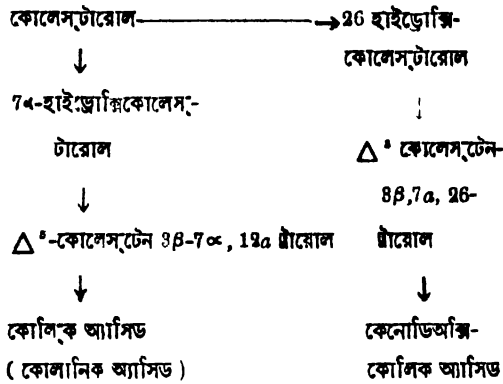
কোলিক অ্যাসিড গ্লাইসিনের সংগে যুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট উৎপন্ন করে :

1. কোলিক অ্যাসিড + CoA + ATP → কোলীল কো-এ + AMP + PPi।
2. কোলীল কো-এ + গ্লাইসিন → গ্লাইকোকোলিক অ্যাসিড + CoA।
3. গ্লাইকোকোলিক অ্যাসিড + Na^+ → সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট।

একইভাবে কোলিক অ্যাসিড টরিনের সংগে যুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সোডিয়াম টরোকোলেটের সংশ্লেষণ ঘটায় :

1. কোলিক অ্যাসিড + CoA + ATP → কোলীল কো এ + AMP + PPi।
2. কোলীল কো-এ + টরিন → টরোকোলিক অ্যাসিড + CoA।
3. টরোকোলিক অ্যাসিড + Na^+ → সোডিয়াম টরোকোলেট।

2. **পিত্তলবণের সংবহন ও পরিণতি** (Circulation and fate of bile salts) : দেখা গেছে ক্ষুদ্রান্ত্রে নিঃসৃত পিত্তলবণের প্রায় 80-90% পুনরায় পোর্টাল রক্তে বিশোষিত হয় এবং যকৃতের মাধ্যমে পিত্তরসে পুনরায় রেচিত হয়। পিত্তলবণের এজাতীয় চক্রাকার আবর্তনকে **অন্ত্র-যকৃৎ সংবহন** (enterohepatic circulation) নামে অভিহিত করা হয় (6-23 নং চিত্র)। দেখা গেছে, প্রতি চক্রাকার আবর্তনে মাত্র 10-20% পিত্তলবণ মলের সংগে নির্গত হয়। তার মানে যকৃতে প্রকৃত পক্ষে এই বিনষ্ট পিত্তলবণটুকুই স্বাভাবিক অবস্থায় সংশ্লেষিত হয়।

পিত্তলবণ যে যকৃতের মাধ্যমে চক্রাকারে আবর্তিত হয়, তার প্রমাণ মেলে পিত্তলবণকে মুখে খেতে দিয়ে ও সাধারণ পিত্তনালী থেকে ক্যানুলার সাহায্যে
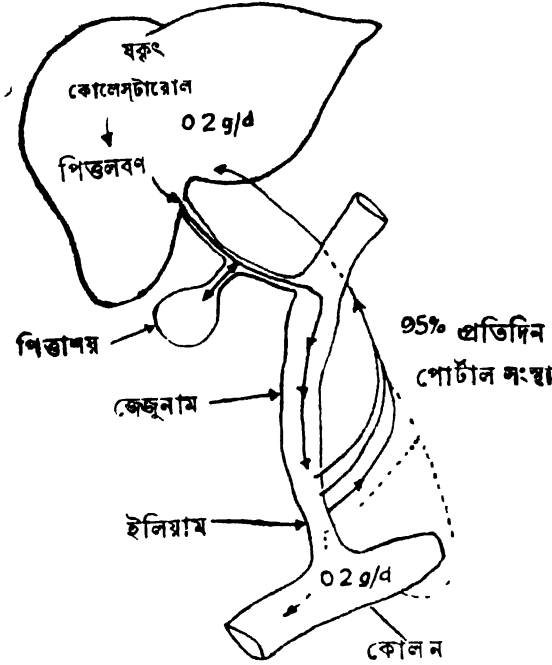
6-2' নং চিত্র : অন্ত্র যকৃৎ সংবহন।

পিত্তরসকে সংগ্রহ করে ও তার সনাক্তকরণ করে। মুখে খেতে দেবার প্রায় ঘণ্টা ছয়েক পরে পিত্তলবণকে পিত্তরসে সনাক্ত করা গেছে।

ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে পোর্টাল রক্তে পিত্তলবণের পুনরায় বিশোষণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ফ্যাটি অ্যাসিড এবং কোন কোন স্নেহদ্রবণীয় ভিটামিনের বিশোষণ পিত্তলবণের পুনঃবিশোষণের সংগে ওতোপ্রোতভাবে জীড়ত। পিত্তলবণের সংগে ফ্যাটি অ্যাসিডের সংযুক্তিকে কোলেইক অ্যাসিড (choleic acid) বলা হয় যা জলে দ্রবণীয় এবং সহজভাবে বিশোষণযোগ্য পিত্তলবণের অনুপস্থিতিতে ভিটামিন K এবং কোলেস্টারোল খুব সামান্য পরিমাণেই বিশোষিত হতে পারে।

3. **পিত্তলবণের কার্যাবলী** (Functions of bile salts) : পিত্তলবণের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ। (a) পিত্তরসে পিত্তলবণ অদ্রবণীয় কোলেসটারোলকে দ্রবীভূত অবস্থায় রাখে। স্বাভাবিক অবস্থায় পিত্তরসের কোলেস্টারোল ও পিত্তলবণের অনুপাত 1:20 থেকে 1:30 মধ্যে সীমিত থাকে।

এই অনুপাত যখন 1:13 এ নেমে আসে তখনই কোলেসটারোল অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং পিত্তপাথর (gallstone) উৎপাদনের জন্য দায়ী হয়। পিত্তথলীর সংক্রমণ প্রধানত পিত্তপাথর উৎপাদনে সহায়ক। (b) পিত্তলবণ ক্ষুদ্রান্ত্রে স্নেহজাতীয় পদার্থের পৃষ্ঠটান হ্রাস করে অবদ্রব সৃষ্টি করে এবং এভাবে উপরিতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করে এনজাইমের দ্বারা স্নেহপদার্থের পরিপাক বৃদ্ধি করে। এছাড়া পিত্তলবণ লাইপেজ এনজাইমের সক্রিয়তাও বৃদ্ধি করে। (c) পিত্তরস ফ্যাট, ভিটামিন (A, D, E, K), প্রোভিটামিন ক্যারোটিন, লোহা, ক্যালসিয়াম প্রভৃতির বিশোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (d) পিত্তলবণ ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র এই উভয়ের ক্রমোসংকোচন বৃদ্ধি করে এবং এভাবে রেচক দ্রব্য (laxative) হিসাবে কাজ করে। (e) পিত্তলবণ পিত্তরসের ক্ষরণে বিশেষ উদ্দীপনা প্রদান করে।

পৌষ্টিকনালীর বিচলন

MOVEMENTS OF ALIMENTARY CANAL

পৌষ্টিকনালীর প্রাচীরগাত্রে পেশীর উপস্থিতির দরুণ পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্নপ্রকার বিচলন লক্ষ্য করা যায়। পৌষ্টিকনালীর এসব বিচলন একাধারে যেমন খাদ্যের অগ্রগমন, খাদ্যের সংগে পরিপাকরসের সংমিশ্রণ ও মলত্যাগে সহায়তা করে, তেমনি পৌষ্টিকনালীর প্রাচীরগাত্রে রক্তসংবহনের বৃদ্ধি ঘটিয়ে ক্ষরণ ও খাদ্যের বিশোষণ বৃদ্ধি করে।

1. **গলাধঃকরণ (Swallowing):** গলাধঃকরণ খাদ্যবস্তুকে মুখগহ্বর থেকে গ্রাসনালীর মধ্য দিয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে। গলাধঃকরণ একটি প্রতিবর্ত প্রক্রিয়া, যার কেন্দ্র গুরুমস্তিষ্কের নিয়ামক কেন্দ্রে অবস্থিত, তবে ইহা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রবর্তন করা যায়।

গলাধঃকরণকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়: (a) মুখগহ্বরীয় (oral), (b) গলবিলগত (pharyngeal) এবং (c) গ্রাসনালীগত (oesophageal)।

(a) **মুখগহ্বরীয় গলাধঃকরণ:** মুখগহ্বরের মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তুকে গলবিলে পৌঁছে দেওয়ার পর্যায়কে মুখগহ্বরীয় গলাধঃকরণ বলা হয়। এই পর্যায় ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রাধীন। জিহ্বার মাইলোহাইওয়েড (mylohyoid), স্টাইলোগ্লোসাস (styloglossus) এবং হাইপোগ্লোসাস (hypoglossus) পেশীর ঊর্ধ্বমুখী ও পশ্চাদ্মুখী চলনের ফলে জিহ্বার উপরিস্থিত খাদ্য গলবিলে নিক্ষিপ্ত হয়।

(b) গলবিলগত গলাধঃকরণ : এই পর্যায়ে খাদ্যবস্তু গলবিল থেকে গ্রাসনালীতে গিয়ে পৌঁছায়। এই পর্যায়ে গলাধঃকরণ প্রতিবর্তের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। গলবিল ও পশ্চাদ্‌গলবিল প্রাচীরের সংস্পর্শে এসে খাদ্য এই প্রতিবর্তের প্রবর্তন ঘটায় যা গ্লসোফ্যারিংজিয়েল স্নায়ুর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে এই প্রতিবর্তকে সম্পূর্ণ করে। কোমল তালু (soft palate) ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হয়, ফলে, নাসাগলবিল বন্ধ হয়। হাইওয়েড অস্থিসমেত স্বরযন্ত্র ঊর্ধ্ব ও অগ্রমুখে এগিয়ে যায়। এভাবে শ্বাসক্রিয়া ও বাক্‌শক্তি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। সুপারিওর ফ্যারিন্‌জিয়েল কন্সট্রিক্টর পেশীর সংকোচনে গলবিলের ক্রমসংকোচন (peristalsis) শুরু হয় যা দ্রুত নিম্নদিকে খাদ্যকে ঠেলে নিয়ে যায়। এই সময় ক্রাইকোফ্যারিন্‌জিয়াস (cricopharyngeus পেশীর শ্লথীভবনে (relaxation) গ্রাসনালী উন্মুক্ত হয় এবং খাদ্য গ্রাসনালীতে প্রবেশ করে। গলবিল এরপরই পুনরায় উন্মুক্ত হয়।

(c) গ্রাসনালীগত গলাধঃকরণ : এই পর্যায়ে খাদ্যবস্তু গ্রাসনালীর ঊর্ধ্বাংশ থেকে নিম্নপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছয়। খাদ্যবস্তু গ্রাসনালীতে প্রবেশ করার সংগে সংগে গ্রাসনালীর ক্রমোসংকোচন পরিলক্ষিত হয়, যা খাদ্যবস্তুকে নিম্নদিকে ঠেলে গ্রাসনালীর শেষপ্রান্তে নিয়ে যায়। গ্রাসনালীর শেষপ্রান্তে অবস্থিত কার্ডিয়াক স্ফিংক্‌টার প্রসারিত হয় এবং খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

গ্রাসনালীতে তিন ধরনের ক্রমোসংকোচন লক্ষ্য করা যায় : (a) প্রাথমিক ক্রমোসংকোচন : খাদ্য গলাধঃকরণ ব্যতিরেকেও ইহা প্রতি ঢোক গেলার সময় গ্রাসনালীতে পরিলক্ষিত হয়। (b) গৌণ ক্রমোসংকোচন : প্রথম প্রকারের ক্রমোসংকোচন যদি খাদ্যকে সামনে এগিয়ে না নিয়ে যেতে পারে, তখনই শেষোক্ত ক্রমোসংকোচন গ্রাসনালীতে দেখা যায়। ইহা খাদ্যবস্তুকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। (c) তৃতীয় পর্যায়ের ক্রমোসংকোচন : ভেগাস স্নায়ুকে ব্যবচ্ছেদ করলে গ্রাসনালীর ঊর্ধ্বপ্রান্তের ক্রমোসংকোচন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় (গ্রাস নালীর এই অংশ প্রধানত ঐচ্ছিক পেশীর দ্বারা গঠিত)। কিছু সময় পরে গ্রাসনালীর নিম্নপ্রান্তে (যা অনৈচ্ছিক পেশীর দ্বারা গঠিত) দুর্বল ক্রমোসংকোচন দেখা যায়। এ ধরনের ক্রমোসংকোচন তৃতীয় পর্যায়ের ক্রমোসংকোচন নামে পরিচিত।

2. পাকস্থলীয় বিচলন (Movements of stomach) : পাকস্থলীয় বিচলন পেশীজাত (myogenic) বলে স্বীকার করা হয়। শূন্যগর্ভ পাকস্থলীতে দুরকম বিচলন লক্ষ্য করা যায়। (a) **ক্ষুধাজাত বিচলন** এবং (b) **টানযুক্ত**

ছান্দস বিচলন। ক্ষুধাজাত বিচলন ক্ষুধার অনুভূতি উদ্রেকের সংগে জড়িত। সমস্ত পাকস্থলী পর্যায়ক্রমে সংকুচিত হয় এবং সংকোচন 30 সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। টানযুক্ত ছান্দস বিচলনে পাকস্থলীর পেশীটান সমতালে (মিনিটে প্রায় 3 বার) পরিবর্তিত হয়।

খাদ্যগ্রহণের পর পাকস্থলীর দুই অংশে দুটো পৃথকধর্মী বিচলন দেখা যায়। খাদ্যবস্তুর সংগে ব্যারিয়াম সালফেট (barium sulphate) মিশিয়ে এবং এক্সরে-এর সাহায্যে অনুশীলন ক'রে (ব্যারিয়াম সালফেট এক্স-রেতে অনচ্ছ) এ ধরনের বিচলনকে সঠিকভাবে জানা গেছে। ফান্ডাস ও বডিতে বিচলন খানিকটা শ্লথগতিসম্পন্ন এবং টানযুক্ত। ক্রমোসংকোচন এই অংশে অনুপস্থিত। একটা নির্দিষ্টচাপ বজায় রেখে এই অংশ পাইলোরাসে খাদ্য পরিবহনে সহায়তা করে।

পাইলোরাসে যে বিচলন পরিলক্ষিত হয় তার প্রকৃতি অনেকটা শ্লথগতি ক্রমসংকোচনের মত। সংকোচনতরংগ হিসাবেও এই বিচলনকে আখ্যা দেওয়া চলে। পাকস্থলীর কৌণিক-অবস্থান (incisura angularis) থেকে এই তরংগের সৃষ্টি হয়। তরংগ যত নিম্নদিকে অগ্রসর হয়, তত তাদের তীব্রতা ও গভীরতা বৃদ্ধি পায়। মিনিটে 3 থেকে 4টি তরংগ এভাবে উৎপন্ন হয়। জারকরস ক্ষরণের সংগে সংগে এজাতীয় বিচলন বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষরণের চরম মুহূর্তে সর্বাধিক তীব্র হয় (6-24 নং চিত্র)।
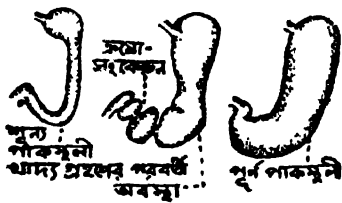
6-24 নং চিত্র : পাকস্থলীর বিচলন।

স্বতন্ত্র স্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে বা অ্যাড্রেন্যালিনকে দেহে প্রবেশ করালে পাকস্থলীর বিচলন বাধা পায় এবং পেশীবলয় সংকুচিত হয়।

অপরপক্ষে ভেগাস স্নায়ুর উদ্দীপনা থেকে পাকস্থলীর বিচলন উদ্দীপিত হয় এবং পেশীবলয় প্রসারিত হয়। পিটুইট্রিন (pituitrin), ইনসুলিন (insulin) অধিক-অম্ল ইত্যাদি পাকস্থলীর বিচলনকে বৃদ্ধি করে। এনটারোগ্যাসট্রন পাকস্থলীর বিচলনকে হ্রাস করে।

3. বমন (Vomitting) : পাকস্থলীস্থিত পদার্থকে মুখের মধ্যে দিয়ে জোর করে বহিষ্কার করার নাম বমন। মধ্যচ্ছদা ও উদরপেশীর সংকোচনে উদরাভ্যন্তরে যে চাপের সৃষ্টি হয়, তার দ্বারাই এই কার্য সম্পন্ন হয়। বমনের

সময় ফেকাশে ভাব, স্বেদক্ষরণ, বমি বমি ভাব, লালারস-ক্ষরণ এবং পাকস্থলী, গ্রাসনালী ও গলীমুখ পেশীবলয়ের প্রসারণ ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে প্রকাশ পায়।

বমন একটি প্রতিবর্ত-পদ্ধতি। মস্তিষ্কের মেডালায় বমনকেন্দ্রের অবস্থান। এই কেন্দ্রকে বিভিন্ন প্রকার ওষুধ (apomorphine ইত্যাদি), প্রতিবিষ (uremia ইত্যাদি), করোটিমধ্যস্থ চাপবৃদ্ধি (মস্তিষ্কের টিউমার, ঝিল্লিপ্রদাহ শ্বাসরোধ ইত্যাদি জনিত) প্রভৃতির সাহায্যে সরাসরি উদ্দীপিত করা সম্ভব। সাধারণভাবে প্রতিবর্তের উদ্দীপনা গলা সুড়সুড়ি, পাকস্থলীয় উদ্দীপনা, জরায়ু হৃৎপিণ্ড, ক্ষুদ্রান্ত্র এবং অন্যান্য আন্তরযন্ত্র থেকে উৎপন্ন হয়। বহির্মুখী স্নায়ু-উদ্দীপনা ভেগাস-স্নায়ুর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

4. **ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলন** (Movements of small intestine) : ক্ষুদ্রান্ত্রে বিচলন স্নায়ুজ (neurogenic), পেশীজাত (myogenic) এবং নিষ্ক্রিয় (passive)। একে 4 ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় : (a) ক্রমোসংকোচন (peristalsis), (b) বিপরীত ক্রমোসংকোচন (antiperistalsis), (c) খণ্ডীভবন (segmentation) এবং (d) দোলনগতি (pendular movement)।

(a) **ক্রমসংকোচন :** এজাতীয় বিচলন তরংগাকারে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশ থেকে শেষাংশের দিকে ধাবিত হয়। **বেইলিজ** (Bayliss) এবং **স্টারলিং** (Starling) অনুশীলন করে দেখেছেন, ক্ষুদ্রান্ত্রের কোন একটা বিন্দুতে উদ্দীপনার প্রয়োগস্থান সংকুচিত হয় এবং তার নিম্নাংশ প্রসারিত হয়। এর থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, ক্রমোসংকোচন এক ধরনের প্রতিবর্তক্রিয়া, যা স্থানীয় স্নায়ুজালকের উপর নির্ভরশীল। ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যবস্তুর উপস্থিতি এই ধরনের বিচলনের উদ্দীপনা হিসাবে কার্য করে। ক্রমোসংকোচন তরংগাকারে নীচের দিকে অগ্রসর হয় বলে ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থানকারী খাদ্যবস্তু ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখে ঘূর্ণাবর্ত সহকারে নীচের দিকে অগ্রসর হয়।

ক্রমোসংকোচন দুধরনের হয় : (1) মন্থর গতি ক্রমোসংকোচন এবং (2) দ্রুতগতি ক্রমোসংকোচন। মন্থর গতি ক্রমোসংকোচনের গতিবেগ মিনিটে 1 থেকে 2 সেন্টিমিটার এবং দ্রুতগতি ক্রমোসংকোচনের গতিবেগ মিনিটে 2 থেকে 25 সেন্টিমিটার। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে শেষোক্ত বিচলনই প্রকৃত ক্রমোসংকোচন।

ক্রমোসংকোচনের কার্যাবলী : ক্রমোসংকোচনের প্রধান কার্য, (1) খাদ্যবস্তুকে ক্ষুদ্রান্ত্রের নিম্নপ্রান্তের দিকে ঠেলে দেওয়া, (2) হজমীরসের সংগে খাদ্যবস্তুর

সংমিশ্রণ ঘটানো, (3) খাদ্যবস্তুর বিশোষণে সহায়তা করা এবং (4) ঐ অঞ্চলের রক্ত ও লসিকাপ্রবাহ বৃদ্ধি করা।

(b) **বিপরীত ক্রমোসংকোচন :** এজাতীয় বিচলনের প্রকৃতি ক্রমোসংকোচনের মতোই। পার্থক্য শুধু এর গতিমুখের। অর্থাৎ এধরনের বিচলন ক্ষুদ্রান্ত্রের পশ্চাদ্‌অংশ থেকে মুখের দিকে অগ্রসর হয়। বিপরীত ক্রমোসংকোচন শুধুমাত্র গ্রহণীর দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশে পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষাংশে এজাতীয় বিচলন দেখা যায়।

কার্যাবলী : নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্রে এজাতীয় বিচলন ক্ষুদ্রান্ত্রস্থিত পদার্থকে বৃহদন্ত্রে দ্রুত প্রবেশে বাধাদান করে। গ্রহণীতে বিপরীত ক্রমোসংকোচনের প্রধান কার্য খাদ্যবস্তুর সংমিশ্রণে অংশগ্রহণ করা এবং গ্রহণীস্থিত খাদ্যবস্তুকে পাকস্থলীতে উদ্‌গীরণ করা।

(c) **খণ্ডীভবন :** ক্ষুদ্রান্ত্রের সবচেয়ে মৌলিক বিচলন এই খণ্ডীভবন। এধরনের বিচলনের সংগে যেমন স্নায়ুর কোন সংযোগ পরিলক্ষিত হয় না, তেমনি ইহা সম্পূর্ণভাবে পেশীজাত।

এজাতীয় বিচলনে ক্ষুদ্রান্ত্রের সর্বাধিক প্রসারিত অংশের সংকোচন এবং ঠিক তার পরবর্তী অংশের প্রসারণ হয়। পূর্ববর্তী সংকোচন থেকে উৎপন্ন দুটো পার্শ্ব-খণ্ডাংশ সংযুক্ত হয়ে একটি পূর্ণ-খণ্ড উৎপন্ন করে। এই পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে।

মনুষ্যেতর প্রাণীতে এ জাতীয় বিচলনের হার মিনিটে 20 থেকে 30। মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে এই বিচলন কিছুটা কম। খণ্ডীভবন পাকস্থলীর দূরত্বের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। গ্রহণীতে এই হার যেখানে মিনিটে 17, ক্ষুদ্রান্ত্রে তা 12।

কার্যাবলী : খণ্ডীভবনের প্রধান কার্য, (1) হজমীরসের সংগে খাদ্যবস্তুর সংমিশ্রণ ঘটানো, (2) খাদ্যবস্তুকে শ্লেষ্মাঝিল্লির সংস্পর্শে নিয়ে আসা এবং তাদের বিশোষণে সহায়তা করা এবং (3) অন্ত্রনালীর প্রাচীরগাত্রে রক্তসংবহন ও লসিকাসংবহন বৃদ্ধি করা।

(d) **দোলনগতি :** দোলনগতি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রতিটি ভাঁজ বা লুপে দেখা যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তুর বেগে অগ্রসর হবার ফলে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রতিটি লুপ পাশাপাশি দোল খেতে থাকে। এই ধরনের বিচলন এক প্রকার পরোক্ষ প্রক্রিয়া। এর প্রধান কার্য হল উদর গহ্বরের সীমিত স্থানে ক্ষুদ্রান্ত্রের কুণ্ডলীকে

বিন্যস্ত করে রাখা। অবশ্য কারো কারো মতে এ জাতীয় বিচলন শুধুমাত্র উন্মুক্ত উদরে দেখা দেয়।

5. **ভিলাসের বিচলন** (Movement of villi) **:** ক্ষুদ্রান্ত্রীয় ভিলাস-সমূহ খাদ্যের পরিপাকলব্ধ পদার্থের বিশোষণের জন্য প্রধানত দায়ী। ক্ষুদ্রান্ত্র যখন খাদ্যশূন্য অবস্থায় থাকে তখন তারা চেটাল অবস্থায় পড়ে থাকে, কিন্তু পরিপাকের সময় সক্রিয় হয়ে উঠে। এদের মধ্যে দুধরনের বিচলন লক্ষ্য করা যায় : (a) পর্যায়ক্রমিক সম্প্রসারণ ও হ্রস্বীভবন এবং (b) পাশাপাশি বিচলন। সক্রিয় ভিলাসের বিচলন 4 ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় : (i) স্নায়ুর দ্বারা ; স্বতন্ত্র স্নায়ুতে উদ্দীপনা দিলে ভিলাসের বিচলন বৃদ্ধি পায় ; (ii) হরমোনের দ্বারা ; ভিলিকিনিন (villikinin) নামক একটি হরমোন নিঃক্ষরিত হয় যা ক্ষুদ্রান্ত্রের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে ; (iii) রাসায়নিক উদ্দীপনার দ্বারা ; কিছুসংখ্যক খাদ্যের পরিপাকলব্ধ পদার্থ, অ্যামাইনোঅ্যাসিড, প্রভৃতি ভিলাসের বিচলন বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে এবং (iv) যান্ত্রিক উত্তেজনা ; ক্ষুদ্রান্ত্রীয় খাদ্যবস্তুব অকুস্থলীর স্নায়ুজালকের উপর ক্রিয়া করে ভিলাসের বিচলন বৃদ্ধি করে।

6. **বৃহদন্ত্রের বিচলন** (Movement of large intestine) **:** বৃহদন্ত্রে দুটো পৃথক ধরনের বিচলন লক্ষ্য করা যায় : (a) **অকুস্থলীয় বিচলন :** (localised movement) এবং (b) **সম্মুখগতি বিচলন** (propulsive movement)

(a) **অকুস্থলীয় বিচলন :** অকুস্থলীয় বিচলনকে আবার 4 ভাগে ভাগ করা যায়। (1) **খণ্ডীভবন :** এই ধরনের বিচলন ক্ষুদ্রান্ত্রের খণ্ডীভবনের মত। (2) **স্ফীতিসংকোচন** (haustral contraction) **:** বৃহদন্ত্রের টেনিয়া কোলির অন্তর্বর্তী স্থানে এজাতীয় সংকোচন পরিলক্ষিত হয়। (3) **মন্থন সংকোচন** (Kneading)। পর্যায়ক্রমিক বিস্তৃত অংশের সংকোচন এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের প্রসারণ এজাতীয় সংকোচনের বিশেষত্ব। (4) **ক্রমোসংকোচন ও বিপরীত ক্রমোসংকোচন :** ক্ষুদ্রান্ত্রের মত বৃহদন্ত্রের এজাতীয় সংকোচন প্রধানত উর্ধ্বগ ও তির্যক কোলনে দেখা যায় এবং জলের বিশোষণে এরা বিশেষ-ভাবে সহায়তা করে।

(b) **সম্মুখগতি বিচলন :** এ জাতীয় বিচলন আন্ত্রিক পদার্থকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এজাতীয় বিচলনকে 2 ভাগে বিভক্ত করা যায় : (i) **ক্রমোসংকোচন :** এজাতীয় বিচলনের প্রকৃতি ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্রমোসংকোচনের

মত, পার্থক্য শুধু কম্পনাংকের। নিম্নগ কোলনে ক্রমোসংকোচনের সংকোচনকাল অধিকতর বেশী, (2) **সংহত ক্রমোসংকোচন** (mass peristalsis) একই সংগে বৃহদন্ত্রের বৃহত্তর অংশের সম্মুখমুখী সংকোচনকে সংহত ক্রমোসংকোচন বলা হয়। ইহা একটি প্রতিবর্তধর্মী সংকোচন। পাকস্থলী খাদ্যের দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠলে এই প্রতিবর্ত সক্রিয় হয়ে উঠে। এই প্রতিবর্তকে তাই 'গ্যাসট্রোকোলিক প্রতিবর্ত' নামে অভিহিত করা হয়।

7. **মলত্যাগ** (Defecation) : মলাশয় শূন্য থাকে। হঠাৎ আদ্র' মল মলাশয়ে প্রবেশ করে তাকে প্রসারিত করে মলত্যাগের অনুভূতি জাগায়। কখনও কখনও খাদ্যগ্রহণের পরমুহূর্তেই মলত্যাগের ইচ্ছা জাগে। খাদ্যকত্ব পাকস্থলীতে প্রবেশের ফলে পাকস্থলী-মলাশয় প্রতিবর্ত (gastro-colic reflex) সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অনুভূতি জাগায়। স্বেচ্ছায় এই প্রবণতাকে রোধ করা সম্ভবপর।

মল

FAECES

গৃহীত খাদ্যের যে অংশ পরিপাকের মাধ্যমে রক্তের মধ্যে বিশোষিত হতে পাবে না, সেই অংশ এবং অন্ত্রের অন্তঃক্ষরণ, বিচ্ছিন্ন আবরণীকোষ, ব্যাক্টেরিয়া প্রভৃতির সমন্বয়ে **মল** গঠিত। মলের পরিমাণ মানুষভেদে যেমন বিভিন্ন হতে পারে, তেমনি গৃহীত খাদ্যের প্রকৃতির উপরও ইহা নির্ভরশীল। অধিক পরিমাণে সেলুলোজের উপস্থিতি যেমন মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, তেমনি আটাজাতীয় খাদ্যও মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

1. **উপাদান** (Composition) : মল হলদে, দুর্গন্ধযুক্ত, ক্ষারধর্মী রেচন পদার্থ। বিলিরুবিন থেকে উৎপন্ন স্টারকোবিলিনের উপস্থিতির দরুণ মলের বর্ণ হলদে হয়। মলের দুর্গন্ধ যেসব পদার্থ ও গ্যাসের উপস্থিতির জন্য দায়ী তাদের মধ্যে প্রধান : ইনডোল (indole), স্ক্যাটোল (skatole) এবং H_2S। মলের pH, 7·0-7·5। মলের পরিমাণ ও উপাদান নিম্নরূপ :

(a) **পরিমাণ :** গড়ে 75-170 গ্রাম।

(b) **কঠিন পদার্থ :** 25-30% (এর মধ্যে খনিজ পদার্থ প্রায় 15%, ইথার দ্রবণীয় স্নেহপদার্থ 15% এবং নাইট্রোজেন 5%)। 6-7% স্নেহপদার্থ ও প্রায় 10% প্রোটিন মলের সংগে দেহ থেকে নির্গত হয়।

(c) **জল :** 70-75।

খনিজ পদার্থের মধ্যে প্রধান : ক্যাল্সিয়াম, ফসফরাস, লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম। **স্নেহজাতীয় পদার্থ :** ফ্যাটি অ্যাসিড, নিউট্রাল ফ্যাট, লেসিথিন, কোলিক অ্যাসিড এবং কপ্রোস্টারোল। **এনজাইম (সামান্য পরিমাণে) :** অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন, নিউক্লিয়েজ, লাইপেজ, সুক্রেজ, লাইসোজাইম ইত্যাদি এবং তার সংগে সামান্য শ্লেষ্মা। **অন্যান্য :** স্টারকোবিলিন, ইনডোল্, স্ক্যাটোল, H_2S, সেলুলোজ, মৃত ব্যাক্টেরিয়া, আবরণীকোষ ইত্যাদি।

2. **অন্ত্রস্থিত গ্যাস :** ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রে যেসব গ্যাসের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, তার একাংশ গলাধঃকরণ থেকে এবং বাকী ব্যাক্টেরিয়া ইত্যাদির পরিপাক থেকে আসে। ক্ষুদ্র বা বৃহদন্ত্রে যেসব গ্যাসের উপস্থিত দেখা যায় তার মধ্যে প্রধান : (a) CO (প্রায় 7·5%), (b) O_2 (3·0%), (c) নাইট্রোজেন এবং (d) মিথেন, হাইড্রোজেন, H_2S ইত্যাদি (প্রায় 9·5%)। শেষোক্ত গ্যাস বৃহদন্ত্রে ব্যাক্টেরীয় পরিপাক থেকে উৎপন্ন হয়। প্রায় 350-500 মিলিলিটার গ্যাস বাত কর্মের মাধ্যমে অন্ত্র থেকে নির্গত হয়।

খাদ্যবস্তুর পরিপাক

DIGESTION OF FOODSTUFFS

প্রতিদিন আমরা যে সব খাদ্যবস্তু গ্রহণ করি তা, যেমন জটিল তেমনি বৃহৎ আণবিক ওজনসম্পন্ন। এসব জটিল খাদ্যবস্তুকে পৌষ্টিক তন্ত্রস্থিত এন্জাইমের সাহায্যে ক্ষুদ্রতম এককে বিশ্লিষ্ট করে দেহোপযোগী ও বিশোষণযোগ্য করে তোলার নাম **পরিপাক**। পরিপাকের জন্য অপরিহার্য এন্জাইমসমূহ লালারস, পাচক রস, অগ্ন্যাশয় রস এবং আন্ত্রিক রস—এই চারটি হজমী রসে অবস্থিত। পিত্তরসও এই কার্যে অংশগ্রহণ করে, তবে তার মধ্যে কোন এন্জাইম নেই। পরিপাক সঠিকভাবে সংঘটিত হলে তবেই খাদ্যবস্তু রক্তসংবহনে বিশোষিত হতে পারে।

কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক

Digestion Of Carbohydrates

খাদ্যতালিকায় কার্বোহাইড্রেটজাতীয় যে সব খাদ্যবস্তু স্থান পায়, তার মধ্যে প্রধান শ্বেতসারজাতীয় যৌগশর্করা (ভাত, আলু, রুটি ইত্যাদি), ল্যাক্টোজ, সুক্রোজ প্রভৃতি দ্বিশর্করা এবং গ্লুকোজ, ফ্রাক্টোজ ইত্যাদি একক শর্করা।

6নং তালিকা ঃ কার্বোহাইড্রেটের পরিপাককারী এন্‌জাইম।

এন্‌জাইম	সাবস্ট্রেট্	বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ
লালাগ্রন্থি ঃ		
লালাস্রাবী অ্যামাইলেজ	শ্বেতসার	α-সীমিত ডেক্সট্রিন ম্যাল্‌টোট্রায়োজ ম্যাল্‌টোজ
ম্যাল্‌টেজ	ম্যাল্‌টোজ	গ্লুকোজ
পাকস্থলী ঃ		
HCl	সুক্রোজ	গ্লুকোজ, ফ্রাক্‌টোজ
অগ্ন্যাশয় ঃ		
অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ	শ্বেতসার ডেক্সট্রিন	α-সীমিত ডেক্সট্রিন ম্যাল্‌টো-ট্রায়োজ ম্যাল্‌টোজ
ম্যাল্‌টেজ	ম্যাল্‌টোজ, ম্যাল্‌টো-ট্রায়োজ	গ্লুকোজ
ক্ষুদ্রান্ত্র ঃ		
সুক্রেজ	সুক্রোজ	গ্লুকোজ, ফ্রাক্‌টোজ
ম্যাল্‌টেজ	ম্যাল্‌টোজ, ম্যালটো-ট্রায়োজ	গ্লুকোজ
ল্যাকটেজ	ল্যাক্‌টোজ	গ্লুকোজ, গ্যালাক্‌টোজ
1 ঃ 6 গ্লুকোসিডেজ	1 ঃ 6 গ্লুকোসাইড	গ্লুকোজ
α-সীমিত ডেক্সট্রিনেজ	α-সীমিত ডেক্সট্রিন	গ্লুকোজ

একক শর্করার পরিপাকের প্রশ্ন অবান্তর। তাই কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্যবস্তুর পরিপাক বলতে বোঝায় দ্বিশর্করা ও যৌগশর্করার পরিপাক। যৌগশর্করার পরিপাক প্রধানত লালারসে শুরু হয় এবং আন্ত্রিকরসে গিয়ে সমাপ্ত হয়। দ্বিশর্করার পরিপাক প্রধানত আন্ত্রিকরসেই সম্পন্ন হয়। কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক পদ্ধতি সংক্ষেপে 6নং তালিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

লালারস (Saliva) ঃ লালারসে কার্বোহাইড্রেটের আদ্র বিশ্লেষণকারী দুটো এনজাইমের উপস্থিতি লক্ষণীয়। (i) **লালাস্রাবী অ্যামাইলেজ** (salivary amylase) বা টায়ালিন (ptyalin) এবং (ii) সামান্য পরিমাণ **ম্যালটেজ** (maltase)।

লালাস্রাবী ∝-অ্যামাইলেজ শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যকণাকে (আলু, ভাত ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন করে ম্যালটোজে আদ্রবিশ্লিষ্ট করে এবং ∝-সীমিত ডেক্সট্রিন 4∝-সংযোগকে (গড়ে ৪টি গ্লুকোজ সম্পন্ন একক) ম্যালটো-ট্রায়োজে রূপান্তরিত করে। এই পরিপাক মুখাভ্যন্তরে শুরু হলেও প্রধানত পাকস্থলীতেই সংঘটিত হয়। এনজাইম টায়ালিন সামান্য অম্ল-মাধ্যমে (pH 6·7) সর্বাপেক্ষা সক্রিয় হলেও প্রশমিত বা সামান্য ক্ষারকীয় মাধ্যমেও সক্রিয় থাকে। তীব্র অম্লের সংস্পর্শে এর সক্রিয়তা বিনষ্ট নয়। তাই পাকস্থলীতে অধিক HCl ক্ষরণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত (প্রায় 30-40 মিনিট) এই এনজাইম সক্রিয় থাকে। **বারগেইম** (Bergeim) দেখেছেন, পাকস্থলীতে সেদ্ধ আলুর 76 শতাংশ ম্যালটোজে রূপান্তরিত হয়। সেদ্ধ শ্বেতসারের উপর এই এনজাইম ধাপে ধাপে ক্রিয়া করে। ভাতের উপর অ্যামাইলেজের ক্রিয়া নিম্নরূপ ঃ
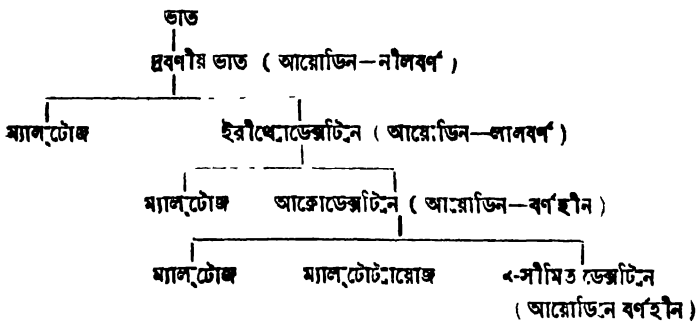
অ্যামাইলেজ শুধুমাত্র ∝-1, 4 বণ্ডকে বিশ্লিষ্ট করতে পারে, ∝-1, 6 কে পারে না এবং এভাবে প্রধানত কেন্দ্রদেশীয় বণ্ডকেই বিশ্লিষ্ট করতে পারে।

সামান্য পরিমাণ ম্যালটোজ এনজাইম দ্বিশর্করা ম্যালটোজের উপর ক্রিয়া করে তাদের গ্লুকোজ-অণুতে বিশ্লিষ্ট করতে পারে।

2. **পাচক রস** (Gastric juice) **ঃ** পাচকরসে কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্যের আদ্র বিশ্লেষণকারী কোন এনজাইম নেই, তবে HCl সুক্রোজকে কিছুটা আদ্রবিশ্লিষ্ট করতে পারে।

3 **অগ্ন্যাশয় রস** (Pancreatic juice) : লালারসের মত অগ্ন্যাশয় রসেও দুটো এনজাইম রয়েছে। যথা : (1) অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ এবং (2) কিছুটা ম্যালটেজ।

অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ অবশিষ্ট শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যবস্তু এবং ডেক্সট্রিনকে সম্পূর্ণভাবে দ্বিশর্করা ম্যালটোজে রূপান্তরিত করে। সেদ্ধ বা অসেদ্ধ এই দুধরনের শ্বেতসারের উপরই ইহা ক্রিয়া করতে পারে। লালাস্রাবী অ্যামাইলেজের চেয়ে এই অ্যামাইলেজের সক্রিয়তা অধিকতর দ্রুত। ক্লোরাইড আয়নের উপস্থিতিতে এই এনজাইম সক্রিয়তা লাভ করে। সামান্য আম্লিক বা প্রশমিত মাধ্যমে (pH 6·7-7·0) ইহা সর্বাধিক সক্রিয় হলেও মৃদু ক্ষারকীয় মাধ্যমেও ইহা ক্রিয়াশীল। এর সক্রিয়তায় ক্লোরাইডজাতীয় লবণের উপস্থিতি আবশ্যক হয়।

ম্যালটেজ একইভাবে ম্যালটোজকে দুটো গ্লুকোজ-অণুতে রূপান্তরিত করে।

4. **আন্ত্রিক রস** (Succus entericus) : আন্ত্রিকরসে খুব সামান্য পরিমাণ অ্যামাইলেজ ছাড়াও কার্বোহাইড্রেটের বিশ্লিষ্টকারী যে তিনটি প্রধান এনজাইমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তা হল, ম্যালটেজ, সুক্রেজ ল্যাকটেজ, α-সীমিত ডেক্সট্রিনেজ এবং α-1,6 গ্লুকোসিডেজ। এই এনজাইম যথাক্রমে ম্যালটোজ, সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, α-সীমিত ডেক্সট্রিন ও α-1,6 গ্লুকোসাইডের উপর ক্রিয়া করে তাদের একক শর্করায় রূপান্তরিত করে।

এভাবে পরিপাকের উপযোগী সব কার্বোহাইড্রেটই পরিশেষে একক শর্করায় রূপান্তরিত হয় এবং অন্ত্র থেকে রক্তে বিশোষিত হয়।

স্নেহদ্রব্যের পরিপাক
Digestion of Fats

যে সব স্নেহদ্রব্য খাদ্য তালিকায় স্থান পায় তাদের মধ্যে প্রধান প্রশমিত স্নেহ দ্রব্য (তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি), কোলেস্টারোল, ফস্ফোলিপিড, ফ্যাটিঅ্যাসিড এবং গ্লিসারিন। এদের মধ্যে ফ্যাটিঅ্যাসিড, গ্লিসারিন এবং মুক্ত কোলেসটা-রোলের পরিপাকের প্রশ্ন আসে না। অন্যদের পরিপাক পাকস্থলীয় জারকরসে শুরু হয় এবং আন্ত্রিক জারকরসে প্রায় 40% ফ্যাট ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়। লালারসে স্নেহদ্রব্যের বিশ্লেষণকারী কোন এনজাইম নেই (7নং তালিকা)।

7নং তালিকা ঃ স্নেহদ্রব্যের পরিপাককারী এন্‌জাইম।

এন্‌জাইম	সাবস্ট্রেট	বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ
পাকস্থলী ঃ		
লাইপেজ (ট্রাইবিউটারেজ)	প্রশমিত স্নেহদ্রব্য (দুধ মাখন ও ডিমের কুসুমস্থিত)	মনোগ্লিসারাইড, ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল
অগ্ন্যাশয় ঃ		
অগ্ন্যাশয়স্রাবী লাইপেজ	স্নেহদ্রব্যের মধ্যে এস্টার বন্ড	ফ্যাটিঅ্যাসিড মনো-গ্লিসারাইড, গ্লিসারল
ফসফোলাইপেজ	লেসিথিন কেফালিন	ফ্যাটিঅ্যাসিড ও লাইসোলেসিথিন। ফ্যাটিঅ্যাসিড ও লাইসোকেফালিন
কোলেস্টারোল এস্টারেজ	কোলেস্টারোল এস্টার	ফ্যাটিঅ্যাসিড মুক্ত কোলেস্টারোল
যকৃৎ ও পিত্ত ঃ		
পিত্তলবণ ও ক্ষারক	স্নেহদ্রব্য এবং আম্লিক পাকমণ্ডকে প্রশমিত করে	স্নেহদ্রব্যপিত্তলবণ যোগ সূক্ষ্ম প্রশমিত স্নেহদ্রব্যের অবদ্রব
ক্ষুদ্রান্ত্র ঃ		
আন্ত্রিক লাইপেজ	স্নেহদ্রব্য	ফ্যাটিঅ্যাসিড, গ্লিসারল,
লেসিথিনেজ	লেসিথিন	গ্লিসারল, ফ্যাটিঅ্যাসিড, ফসফোরিক অ্যাসিড, কোলিন

1. **পাচকরস :** পাচকরসে একমাত্র এন্‌জাইম পাকস্থলীয় লাইপেজ (ট্রাইবিউটারেজ) নামে পরিচিত। এর গুরুত্ব তেমন নেই। ইহা দুধ ও মাখনস্থিত স্নেহদ্রব্যের উপর ক্রিয়া করে মনোগ্লিসারাইড, গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন করে। বয়স্কদের চেয়ে শিশুদের হজমীরসে এই এন্‌জাইমের উপস্থিতি বেশী। ইহা pH 4 5 এ সর্বাধিক সক্রিয়। pH 2তে ইহা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ইহা অবদ্রবিত স্নেহদ্রব্যের অর্থাৎ দুধ ও ডিমের কুসুমস্থিত স্নেহদ্রব্যের উপর সর্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল।

2. **অগ্ন্যাশয়রস :** অগ্ন্যাশয়রসে অবস্থানকারী প্রধান এন্‌জাইম অগ্ন্যাশয়স্রাবী লাইপেজ নামে পরিচিত। কারও কারও মতে দুধরনের অগ্ন্যাশয়স্রাবী লাইপেজ সম্ভবপর। একটি হ্রস্বতর ফ্যাটিঅ্যাসিডের (lower fatty acid) গ্লিসারল-এস্টারের উপর ক্রিয়াশীল হলে, অপরটি দীর্ঘতর
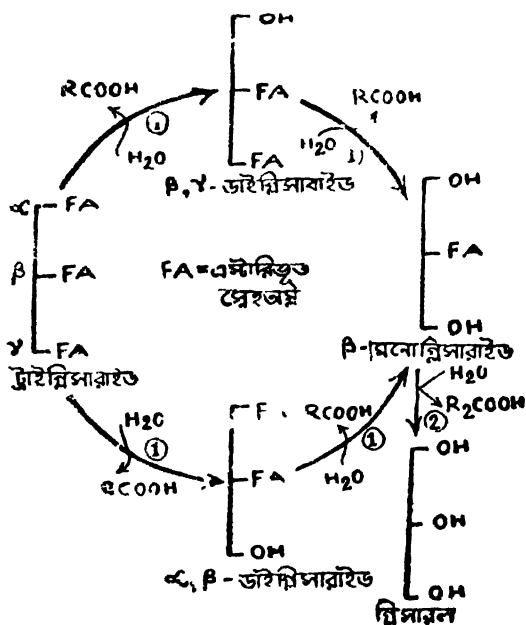
6-25 নং চিত্র : ট্রাইগ্লিসারাইডের উপর লাইপেজের বিক্রিয়াক্রম।

ফ্যাটিঅ্যাসিডের (higher fatty acid) গ্লিসারল-এস্টারের উপর ক্রিয়া করে। এই এন্‌জাইম ট্রাইগ্লিসারাইডের উপর যেভাবে ক্রিয়া করে তার সম্ভাব্য নির্দেশিকা 6-25নং চিত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে। (1) এবং (2) স্থানে যে এন্‌জাইম বিক্রিয়া পরিচালনা করে, সম্ভবত তারা আলাদা। RCOOH

দীর্ঘতর বা দীর্ঘযোজকসম্পন্ন ফ্যাটিঅ্যাসিডের (যেমন প্যাল্‌মিটিক, ওলিক ইত্যাদি) প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অগ্ন্যাশয়স্রাবী লাইপেজ সামান্য ক্ষারীয় মাধ্যমে (pH_8) অধিক সক্রিয় হলেও প্রশমিত বা কিছু আম্লিক মাধ্যমেও ক্রিয়াক্ষম। পিত্তলবণ, ডিওডিনামের বিচলন, ডিওডিনামনিঃসৃত এন্‌টারোগ্যাসট্রোন (enterogastrone, যা পাকস্থলীয় বিচলন মন্দীভূত করে পাকস্থলীস্থ পাকমণ্ডকের নির্গমনকে বিলম্বিত করে), আর্‌জিনিন, হিস্‌টিডিন প্রভৃতি অ্যামাইনোঅ্যাসিড এই এন্‌জাইমের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। স্নেহদ্রব্য পিত্তরস ক্ষরণে ও নির্গমনে সহায়তা করে এবং এভাবে নিজের পরিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

3. **পিত্তরস :** পিত্তরসে স্নেহদ্রব্যের বিশ্লেষণকারী কোন এন্‌জাইম উপস্থিত না থাকলেও, পিত্তলবণ ও ক্ষারক পাকস্থলী থেকে নির্গত আম্লিক পাকমণ্ডকে প্রশমিত করে এবং স্নেহদ্রব্যের সূক্ষ্ম অবদ্রব সৃষ্টিতে সহায়তা করে। ফলে লাইপেজ এন্‌জাইম স্নেহদ্রব্যের উপর সহজেই ক্রিয়া করতে পারে।

4. **আন্ত্রিকরস :** ক্ষুদ্রান্ত্রে অপর একটি লাইপেজের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও সেটি তত্‌তোধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় অগ্ন্যাশয়স্রাবী লাইপেজই স্নেহদ্রব্যের পরিপাক সম্পূর্ণ করতে সমর্থ। তবে সামান্য পরিমাণে স্নেহদ্রব্যকে আন্ত্রিক লাইপেজ বিশ্লিষ্ট করে। ফস্‌ফোলিপিড একইভাবে ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল, ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড এবং কোলিনে বিশ্লিষ্ট হয়। এভাবে স্নেহদ্রব্যের পরিপাক শেষ হয় এবং এরপর তারা অন্ত্র থেকে বিশোষিত হয়।

প্রোটিনের পরিপাক
Digestion of Protein

খাদ্যের একটি প্রয়োজনীয় অংশ প্রোটিন। খাদ্য তালিকায় যে সব প্রোটিনের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে প্রধান অ্যাল্‌বুমিন ও গ্লোবিউলিন। এছাড়াও যে সব প্রোটিনকে সাধারণত গ্রহণ করা হয়, তাদের মধ্যে রয়েছে দুগ্ধস্থিত ক্যাসি-নোজেন (caseinogen), নিউক্লিওপ্রোটিন, কোলাজেন এবং জিলাটিন ইত্যাদি। এদের পরিপাকের ফলে প্রোটিন-একক অ্যামাইনোঅ্যাসিড উৎপন্ন হয়। প্রোটিনের পরিপাক পাকস্থলীয় জারকরসে শুরু হয়ে আন্ত্রিক রসে শেষ হয়। 8নং তালিকায় প্রোটিনপরিপাককারী এন্‌জাইমের উল্লেখ করা হয়েছে।

1. **পাচক রস :** পাকস্থলীয় জারকরসে প্রোটিনবিশ্লিষ্টকারী প্রধান

৪নং তালিকা : প্রোটিনের পরিপাককারী এন্‌জাইম।

এন্‌জাইম	সাব্‌স্ট্রেট	বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ
পাকস্থলী :		
পেপ্‌সিন	প্রোটিন	প্রোটিওস, পেপ্‌টোন,
জিলাটিনেজ	জিলাটিন	জিলাটিন পেপ্‌টোন
অগ্ন্যাশয় :		
(a) এন্‌ডোপেপ্‌টিডেজ :		
ট্রিপ্‌সিন	প্রোটিন, প্রোটিওস, পেপ্‌টোন।	পলিপেপ্‌টাইড ডাইপেপ্‌টাইড।
কাইমোট্রিপ্‌সিন	প্রোটিন, প্রোটিওস, পেপ্‌টোন	পলিপেপ্‌টাইড, ডাই-পেপ্‌টাইড দুধের তঞ্চন।
(b) এক্সোপেপ্‌টিডেজ :		
অ্যামাইনোপেপ্‌টিডেজ	মুক্ত অ্যামাইনোমূলকযুক্ত পলিপেপ্‌টাইড	হ্রস্বতর পেপ্‌টাইড মুক্ত অ্যামাইনোঅ্যাসিড
কার্বোক্সিপেপ্‌টিডেজ	মুক্ত কার্বোক্সিলমূলকযুক্ত পলিপেপ্‌টাইড।	হ্রস্বতর পেপ্‌টাইডযুক্ত, মুক্ত অ্যামাইনোঅ্যাসিড
ট্রাইপেপ্‌টিডেজ	ট্রাইপেপ্‌টাইড	অ্যামাইনো অ্যাসিড ডাই পেপ্‌টাইড
ডাইপেপ্‌টিডেজ	ডাইপেপ্‌টাইড	অ্যামাইনোঅ্যাসিড
(c) রাইবোনিউক্লিয়েজ ও ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিয়েজ	নিউক্লিক অ্যাসিড	নিউক্লিওটাইড
(d) কোলাজেনেজ	কোলাজেন	পেপ্‌টোন
(e) ইলাস্‌টেজ	ইলাস্‌টিন	পেপ্‌টোন
অন্ত্রান্ত্র :		
(a) ইরেপ্‌সিন :		
অ্যামাইনোপেপটিডেজ	মুক্ত অ্যামাইনোমূলকযুক্ত পলিপেপ্‌টাইড	হ্রস্বতর পেপ্‌টাইড, অ্যামাইনোঅ্যাসিড
ডাইপেপ্‌টিডেজ	ডাইপেপ্‌টাইড	অ্যামাইনো অ্যাসিড
(b) পলিনিউক্লিওটিডেজ	নিউক্লিক অ্যাসিড	নিউক্লিওটাইড
	পিউরিন বা পিরাইমিডিন	পিউরিন বা পিরাইমিডিন
(c) নিউক্লিওসিডেজ	নিউক্লিওসাইড	বেস, পেন্‌টোজ ফস্‌ফেট

এন্‌জাইমের নাম পেপ্‌সিন। রোমন্থনকারী প্রাণীর পাচকরসে দুগ্ধ-প্রোটিনের (caseinogen) বিভাজনকারী এন্‌জাইম রেনিনের উপস্থিতি লক্ষ্য

করা যায়ঃ মানুষের পাকস্থলীয় রসে ইহা অনুপস্থিত। এছাড়া জিলাটিনেজ নামক প্রোটিন বিশ্লিষ্টকারী এনজাইমও এই রসে পাওয়া যায়।

ট্রিপ্‌সিন ও কাইমোট্রিপ্‌সিনের মত পেপ্‌সিন নিষ্ক্রিয় থাকে, HCl-এর সংস্পর্শে এসে ইহা সক্রিয় হয় (৪নং তালিকা)। অধিক অম্ল-মাধ্যমে (pH_2) এর সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। প্রশমিত বা ক্ষারীয় মাধ্যমে ইহা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

পেপ্‌সিন একটি এন্‌ডোপেপ্‌টিডেজ। ইহা অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো-অ্যাসিডের (aromatic aminoacid) অ্যামোইনোমূলক এবং ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিডের কার্বক্সিল-মূলকের মধ্যবর্তী প্রোটিনবন্ডকে আক্রমণ ক'রে এবং প্রোটিনের বিশ্লেষণ ঘটায়। প্রোটিনকে ইহা পেপ্‌টোনে, নিউক্লিওপ্রোটিনকে নিউক্লিনে (unclein) এবং মিউসিনকে গ্লুকোস্যামিনে (glucosamine) রূপান্তরিত করে। নিম্নে এর বিভিন্ন পর্যায়ক্রম দেখানো হল ঃ

1. অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিনজাতীয় প্রোটিন→অম্লধর্মী মেটাপ্রোটিন →প্রধান প্রোটিওস→অপ্রধান প্রোটিওস→পেপ্‌টোন।

2. নিউক্লিওপ্রোটিন→নিউক্লিন

3. মিউসিন→গ্লুকোস্যামিন

পাকস্থলীর শ্লেষ্মাঝিল্লিতে অবস্থানকারী পেপ্‌সিনবিরোধক পদার্থ (antipepsin) জীবন্ত শ্লেষ্মাঝিল্লির উপর এই এনজাইমের ক্রিয়ায় বাধাদান করে।

2. **অগ্ন্যাশয় রস ঃ** অগ্ন্যাশয় রসে প্রোটিনের বিশ্লিষ্টকারী যে সব এনজাইমের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, ৫নং তালিকায় তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। পেপ্‌সিনের মত **ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপ্‌সিন** প্রথমে নিষ্ক্রিয় থাকে। তাদের নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে যথাক্রমে ট্রিপ্‌সিনোজেন ও কাইমো-ট্রিপ্‌সিনোজেন নামে অবিহিত করা হয়। আন্ত্রিক রসে অবস্থানকারী এন্টারোকাইনেজ এনজাইমের সংস্পর্শে এসে ট্রিপ্‌সিনোজেন সক্রিয়-এনজাইম ট্রিপ্‌সিনে রূপান্তরিত হয়। ট্রিপ্‌সিন আবার কাইমোট্রিপ্‌সিনোজেনকে সক্রিয় এনজাইম কাইমোট্রিপ্‌সিনে রূপান্তরিত করে (৭নং তালিকা)। এই দুটো এনজাইমকে এন্‌ডোপেপ্‌টিডেজ বলা হয়, কারণ পেপ্‌সিনের মতই এরা প্রোটিনের নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রস্থ প্রোটিনবন্ডের আদ্রবিশ্লেষণের জন্য দায়ী।

9নং তালিকা

নিষ্ক্রিয় এন্‌জাইম —→ সক্রিয় এনজাইম	পছন্দসই প্রোটিনযোজক (6-46নং চিত্র)
A. এন্‌ডোপেপ্‌টিডেজ :	
পেপ্‌সিনোজেন ---HCl, পেপ্‌সিন---→ পেপ্‌সিন	(1) অ্যারোম্যাটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইনো মূলক ও কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের কার্বক্সিল মূলকের মধ্যবর্তী প্রোটিন খণ্ড।
ট্রিপ্‌সিনোজেন ——এন্‌টারোকাইনেজ, ট্রিপ্‌সিন——→ ট্রিপ্‌সিন	(2) আর্‌জিনিন বা লাইসিনের কার্বক্সিল মূলক
কাইমোট্রিপ্‌সিনোজেন ——ট্রিপ্‌সিন——→ কাইমোট্রিপ্‌সিন	( ) অ্যারোম্যাটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বক্সিল মূলক (পেপ্‌সিনের বিপরীত দিকে)
B. এক্সোপেপ্‌টিডেজ :	
অ্যামাইনোপেপ্‌টিডেজ (Mn, Mg, Zn,)	মুক্ত অ্যামাইনো মূলক সম্পন্ন প্রান্তস্থ অ্যামাইনো অ্যাসিড
কার্বক্সিপেপ্‌টিডেজ (Zn)	মুক্ত কার্বক্সিল মূলক সম্পন্ন প্রান্তস্থ অ্যামাইনো অ্যাসিড
ট্রাইপেপ্‌টিডেজ	ট্রাইপেপ্‌টাইড
ডাইপেপ্‌টিডেজ	ডাইপেপ্‌টাইড

ট্রিপ্‌সিন আরজিনিন ও লাইসিনের কার্বক্সিল-মূলকের উপর ক্রিয়া করে। কাইমোট্রিপ্‌সিন অ্যারোম্যাটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের (টাইরোসিন ও ফেনাইলঅ্যালানিন) কার্বক্সিল-মূলকের ওপর ক্রিয়া করে তাদের ট্রাইপেপ্‌টাইড ও ডাইপেপ্‌টাইডে রূপান্তরিত করে। তাছাড়া ইহা দুধের তঞ্চনে সহায়তা করে এবং রেনিনের মত দুগ্ধপ্রোটিনের ওপর ক্রিয়া করে। ট্রিপ্‌সিন নিউক্লিনকে নিউক্লিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে। নিউক্লিয়েজ নিউক্লিক অ্যাসিডকে নিউক্লিওটাইডে রূপান্তরিত করে।

উপরিউক্ত এন্‌জাইম ছাড়া অগ্ন্যাশয় রসের বাকী এন্‌জাইমসমূহকে এক্সোপেপ্‌টিডেজ নামে অভিহিত করা হয়। কারণ এরা প্রান্তস্থ মুক্তমূলক

সম্পন্ন অ্যামাইনোঅ্যাসিডের উপর ক্রিয়া করে তাদের অ্যামাইনোঅ্যাসিডে রূপান্তরিত করে। যে সব নির্দিষ্ট প্রোটিন বন্ডের উপর তারা ক্রিয়া করে, 6-26নং চিত্রে তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হল।

3. **আন্ত্রিক রস :** আন্ত্রিক রসে অবস্থানকারী এনজাইমের উল্লেখ 8নং তালিকায় করা হয়েছে। ইরেপসিন একটি মিশ্র এনজাইম। অ্যামাইনো-পেপ্টিডেজ এবং ডাইপেপ্টিডেজ ছাড়াও এতে অন্যান্য এনজাইমও রয়েছে। এই এনজাইমগুলো পরিপাকলব্ধ প্রোটিনের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের ওপর ক্রিয়া করে তাদের অ্যামাইনোঅ্যাসিডে রূপান্তরিত করে। এছাড়া পলিনিউ-ক্লিওটিডেজ নিউক্লিক অ্যাসিডকে নিউক্লিওটাইডে এবং নিউক্লিওসিডেজ এনজাইম

6-26 নং চিত্র

পিউরিন বা পিরাইমিডিন নিউক্লিওসাইডকে পিউরিন (বা পিরাইমিডিন) বেস ও পেন্টোজ ফসফেটে রূপান্তরিত করে।

খাদ্যবস্তুর বিশোষণ

ABSORPTION OF FOODSTUFFS

পরিপাকলব্ধ খাদ্যকণা যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে, তাকে **বিশোষণ** বলা হয়। বিশোষণ প্রধানত কিছুসংখ্যক ভৌত পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। যেমন ব্যাপন, অভিস্রবণচাপ, জলচাপ, পৃষ্ঠলগ্নতা, সক্রিয় পরিবহন

ইত্যাদি। এছাড়া তড়িৎ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াও বিশোষণের সংগে কিছুটা জড়িত।

বিশোষণ প্রধানত ক্ষুদ্রান্ত্রে সুসম্পন্ন হয়। অবশ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশ ক্ষরণ পদ্ধতির সংগে জড়িত। শেষাংশই মূলত বিশোষণের জন্য দায়ী। ভিলাসকে ক্ষুদ্রান্ত্রের **বিশোষণ-একক** হিসাবে অভিহিত করা হয়। এদের মধ্য দিয়েই পরিপাকলব্ধ খাদ্যবস্তু তথা ভিটামিন, ধাতু, জল ইত্যাদি ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে বিশোষিত হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে (10 বর্গমিটার ক্ষেত্রতলে) প্রায় 50 লক্ষ ভিলাস বর্তমান।

পাকস্থলীতে ভিলাসের অনুপস্থিতির জন্য সেখানে বিশোষণ প্রায় অনুপস্থিত। তবে সামান্য পরিমাণে জল, লবণজল, অ্যালকোহল, গ্লুকোজ, দ্রবণীয় কোন কোন ওষুধ পাকস্থলীর আবরণীকলার মাধ্যমে বিশোষিত হয়। বৃহদন্ত্রে শুধুমাত্র জলের বিশোষণ হয়। তবে সামান্য পরিমাণে গ্লুকোজ, লবণজল, অ্যালকোহল ও কোন কোন ওষুধ এই অংশ থেকে বিশোষিত হতে পারে।

কার্বোহাইড্রেটের বিশোষণ

Absorption of carbohydrates

কার্বোহাইড্রেট প্রধানত **একক শর্করা** হিসাবে ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে পোর্টাল-তন্ত্রে বিশোষিত হয়। একক শর্করা খুব সামান্য পরিমাণে লসিকা-প্রবাহেও প্রবেশ করে।

একক শর্করার মধ্যে গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজের বিশোষণ সবচেয়ে দ্রুত সম্পন্ন হয়। গ্লুকোজের বিশোষণকে 100% ধরলে তুলনামূলকভাবে গ্যালাক্টোজ, লেভুলোজ, (levulose), ম্যানোজ, জাইলোজ প্রভৃতি যথাক্রমে 115, 44, 30 এবং 30 শতাংশ হারে বিশোষিত হয়। অন্যান্য শর্করা আরও মন্থরগতিতে বিশোষিত হয়। গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজের দ্রুত বিশোষণের প্রধান কারণ তাদের **পছন্দসই বিশোষণ** (selective absorption)। ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লিস্থ কোষে অবস্থানকারী **কাইনেজ** এনজাইম এদের অতি দ্রুত ফসফরাস-যুক্ত করে এবং এদের বিশোষণকে ত্বরান্বিত করে তোলে। অপরপক্ষে ম্যানোজ, পেন্টোজ ইত্যাদি একক শর্করা ফসফরাস-যুক্ত হতে পারে না। তাদের তাই ব্যাপন প্রভৃতি ভৌত পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হয়। এদের বিশোষণ তাই মন্থর গতিসম্পন্ন।

ভৌত পদ্ধতি ব্যতিরেকে অপর যে সব কারণ কার্বোহাইড্রেটের বিশোষণের উপর প্রভাববিস্তার করে, তার মধ্যে প্রধান : (a) আবরণীকলাকোষস্থিত ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড ও ফস্‌ফাটেজ এন্‌জাইমের উপস্থিতি, (b) পরিপাকলব্ধ একক শর্করার পরিমাণ, (c) সোডিয়াম লবণ, (d) ভিটামিন (থায়ামিন, পিরাইডোক্সিন, প্যান্‌টোথেনিক অ্যাসিড ইত্যাদি) এবং (e) অ্যাড্‌রেন্যালের বহিঃস্তর ও সম্মুখ পিটুইটারী—যারা ফস্‌ফরাসসংযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্নেহদ্রব্যের বিশোষণ
Absorption of Fats

স্নেহদ্রব্যের বিশোষণ একটি জটিল পদ্ধতি। পদ্ধতি জটিল বলেই এর মূল্যায়নে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। যে সব মতবাদ স্নেহদ্রব্যের বিশোষণের সংগে সম্পর্কযুক্ত তাদের মধ্যে প্রধান : (a) লাইপোলাইটিক প্রকল্প (lipolytic hypothesis), (b) ফ্রেজারের বিভাজন-প্রকল্প (partition theory of frazer) এবং (c) আধুনিক মতবাদ। প্রকল্প বা মতবাদ যাই হোক না কেন, স্নেহদ্রব্যের বিশোষণ ডিওডিনাম ও জেজ্‌নামে অধিকতর দ্রুত সংঘটিত হয়, তথাপি স্নেহদ্রব্যের সর্বাধিক বিশোষণ হয় নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্রে।

1. **লাইপোলাইটিক প্রকল্প :** সবচেয়ে পুরানো এই মতবাদের বক্তব্য হল, লাইপেজ এন্‌জাইমের উপস্থিতিতে স্নেহদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ফ্যাটিঅ্যাসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত হয় এবং আন্ত্রিক ভিলাসের ঝিল্লিকোষের মাধ্যমে পৃথক পৃথকভাবে বিশোষিত হয়। পিত্তলবণের উপস্থিতিতে অদ্রবণীয় ফ্যাটিঅ্যাসিড দ্রবণীয় বাইলঅ্যাসিড-ফ্যাটিঅ্যাসিড যৌগ উৎপন্ন করে। এ ছাড়াও পিত্তলবণ আবরণীকোষের পৃষ্ঠটান হ্রাস করে তাদের ঝিল্লিভেদ্যতা বৃদ্ধি করে; ফলে বিশোষণের দ্রুত সংঘটন সহজতর হয়।

দ্রবীভূত বাইলঅ্যাসিড-ফ্যাটিঅ্যাসিড ভিলাসের ঝিল্লিকোষে প্রবেশ করে এবং বিশ্লিষ্ট হয়। পিত্তলবণ পুনরায় ঝিল্লিকোষের উক্ত উপরিতলে ফিরে আসে এবং নূতন ফ্যাটিঅ্যাসিডের সংগে দ্রবণীয় যৌগ উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। এদিকে ঝিল্লিকোষের অভ্যন্তরে ফ্যাটিঅ্যাসিড গ্লিসারলের সংগে যুক্ত হয়ে ট্রাইগ্লিসারাইড উৎপন্ন করে। ট্রাইগ্লিসারাইডের এই পুনর্সংশ্লেষণে ফস্‌ফরাসযুক্তি অত্যাবশ্যক। এরপরই ইহা লসিকাপ্রবাহে প্রবেশ

করে। লসিকাপ্রবাহে ট্রাইগ্লিসারাইডের উপস্থিতিতে লসিকা শ্বেতরসে (chyle) রূপান্তর লাভ করে। অতি সামান্য পরিমাণ স্নেহদ্রব্য পোর্টাল শিরার মাধ্যমেও বিশোষিত হয়।

2. ফ্রেজারের বিভাজন প্রকল্প : পুরানো মতবাদের সংগে ফ্রেজারের প্রকল্প একটি নূতন সংযোজন। এই মতবাদের বক্তব্য হল স্নেহদ্রব্যের একাংশের বিশোষণে যেমন স্নেহদ্রব্যের সামগ্রিক ভাঙ্গন প্রয়োজন হয় না, তেমনি অপরাংশের পরিপাকলব্ধ পদার্থ ফ্যাটিঅ্যাসিড ও গ্লিসারল সংশ্লেষণ ছাড়াই সরাসরি পোর্টাল শিরার মাধ্যমে বিশোষিত হয় এবং যকৃতে প্রবেশ করে। প্রথমাংশের বিশোষণের প্রাকশর্ত হিসাবে তাদের অবদ্রব্য সৃষ্টি আবশ্যিক। এই অবদ্রবীকরণে পিত্তলবণ, সোপ এবং মনো বা ডাইগ্লিসারাইড বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করে। এভাবে অদ্রবীভূত ট্রাইগ্লিসারাইড লসিকাপ্রবাহে প্রবেশ করে। তবে প্রায় 0·05 মিউ ব্যাসসম্পন্ন স্নেহকণা কিভাবে ঝিল্লিকোষ থেকে ভিলাসের কেন্দ্রস্থ ল্যাক্টিয়েলে (lacteals) প্রবেশ করে তার সঠিক ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি। ভিলাসের সক্রিয় সংকোচনে শ্বেতরস ল্যাক্টিয়েল থেকে প্রধান লসিকাপ্রবাহে প্রবেশ করে। সেখান থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলনে ইহা সিস্টারনা কাইলিতে (cisterna) প্রবেশ করে। এরপর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ফলে উদর ও বক্ষের অভ্যন্তরে যে চাপপার্থক্যের সৃষ্টি হয় তার সাহায্যে ইহা বক্ষলসিকানালীতে প্রবেশ করে। শ্বেতরস এভাবে সাবক্লেভিয়ান শিরায় পৌঁছয়।

অপরঅংশ ফ্যাটিঅ্যাসিড বাইলসল্ট যৌগ উৎপন্ন করে এবং যকৃৎশিরায় প্রবেশ করে।

3. আধুনিক ধারণা (Modern concept) : খাদ্যে গৃহীত উদ্ভিদ্‌জাত বা প্রাণীজাত স্নেহপদার্থ ট্রাইগ্লিসারাইডের সমন্বয়ে গঠিত। গ্লিসারলের সংগে তিনটি সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত ফ্যাটিঅ্যাসিড যুক্ত হয়ে ট্রাইগ্লিসারাইড গঠন করে। এসব ফ্যাটিঅ্যাসিড দীর্ঘ চেনসম্পন্ন। দুধে 3-10% স্বল্পদৈর্ঘ্যের ফ্যাটি অ্যাসিডসম্পন্ন ট্রাইগ্লিসারাইড পাওয়া যায়।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী (i) প্রায় 40% ট্রাইগ্লিসারাইড পরিপাকের মাধ্যমে ফ্যাটিঅ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়, (ii) 3-10% ট্রাইগ্লিসারাইড পরিপাক ব্যতিরেকেই বিশোষিত হয় এবং (iii) বাকী প্রায় 50-57% আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হয় প্রধানত β-মনোগ্লিসারাইড হিসাবে।

পৌষ্টিকনালীতে পিত্তলবণের (bile salt) পরিমাণ একটি সংকট মিসেল গাঢ়ত্বে (critical micellar concentration) পৌঁছলে পিত্তলবণ, β-মনোগ্লিসারাইডের সংগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পঞ্জীভূত হয়ে অদ্রবীভূত যেসব স্নেহবিন্দু (fat droplets) গঠন করে তাদের মিসেল (micells) বলা হয়। সংযুক্ত পিত্তলবণের (conjugated bile salts) পরিমাণ সংকট তীব্রতার বেশী হলেও লাইপেজ এনজাইমের দ্বারা মনোগ্লিসারাইড যখনই বিশ্লিষ্ট হয় তখনই এধরনের মিসেল গঠন করে। গঠিত হবার সংগে সংগেই ইহা ফ্যাটিঅ্যাসিড, কোলেসটারোল এবং স্নেহদ্রবণীয় ভিটামিনকে তার মধ্যে দ্রবীভূত করে। ট্রাইগ্লিসারাইড মিসেলে দ্রবীভূত হয় না, এরা জল ও কোষঝিল্লিতে তুলনামূলকভাবে অধিকতর দ্রবীভূত হয় বলে সরাসরি আবরণীকোষে বিশোষিত হতে পারে।

পৌষ্টিকনালী থেকে ফ্যাটের বিশোষণ দুভাবে সম্পন্ন হয়ঃ (a) পোর্টাল শিরার মাধ্যমে এবং (b) ভিলাসের কেন্দ্রস্থ লসিকানালী বা ল্যাক্টিয়েলের মাধ্যমে।

(a) **পোর্টাল শিরার মাধ্যমে ফ্যাটের বিশোষণ ঃ** গ্লিসারল ও অধিকাংশ স্বল্পদৈর্ঘ্যের ফ্যাটিঅ্যাসিড (C_3-C_{14}) পোর্টাল শিরার মাধ্যমে বিশোষিত হয় এবং যকৃতে পৌঁছায়। গ্লিসারল নলীপথ (lumen) থেকে শ্লেষ্মান্তরীয় আবরণী কোষে ব্যাপনক্রিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং অংশত জারিত হয়ে CO_2 উৎপন্ন করে, অংশত ট্রাইগ্লিসারাইড সংশ্লেষণে অংশ গ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট অংশ ভিলাসের রক্তজালিকায় প্রবেশ করে এবং পরিশেষে পোর্টাল শিরায় পৌঁছায়। অপরপক্ষে মিসেলে দ্রবীভূত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ফ্যাটিঅ্যাসিড কোষঝিল্লির মাধ্যমে আবরণীকোষে প্রবেশ করে এবং ভিলাসের রক্তজালিকায় বিশোষিত হয়।

(b) **লসিকানালীর মাধ্যমে ফ্যাটের বিশোষণ ঃ** ফ্যাট-বিশোষণের প্রধান বিশোষণপথ ভিলাসের কেন্দ্রীয় লসিকানালী বা ল্যাক্টিয়েল। (1) দীর্ঘচেন ফ্যাটিঅ্যাসিড, মনোগ্লিসারাইড এবং ডাইগ্লিসারাইড আবরণীকোষে ট্রাইগ্লিসারাইডে রূপান্তরিত হয়ে কাইলোমাইক্রোন হিসাবে ল্যাক্টিয়েলে প্রবেশ করে, (2) প্রায় 3-10% ট্রাইগ্লিসারাইড কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই ক্ষুদ্রান্ত্রের লিউমেন থেকে আবরণীকোষে প্রবেশ করে এবং ল্যাক্টিয়েলে বিশোষিত হয়। (3) কিছুসংখ্যক দীর্ঘচেন ফ্যাটিঅ্যাসিড আবরণীকোষে ফসফোলিপিডে রূপান্তরিত হয় এবং

সেভাবেই ল্যাক্‌টিয়েলে প্রবেশ করে। (4) কোলেস্‌টারোলের একাংশ (30%) স্বাধীনভাবে কাইলোমাইক্রোনের সংগে এবং অপর অংশ (70%) কোলেস্‌টারোল এস্‌টার হিসাবে ল্যাক্‌টিয়েলে বিশোষিত হয়; (5) কিছুসংখ্যক ফ্যাটিঅ্যাসিড সরাসরি ল্যাক্‌টিয়েলে প্রবেশ করে।

6·27 নং চিত্র : স্নেহদ্রব্যের বিশোষণ।
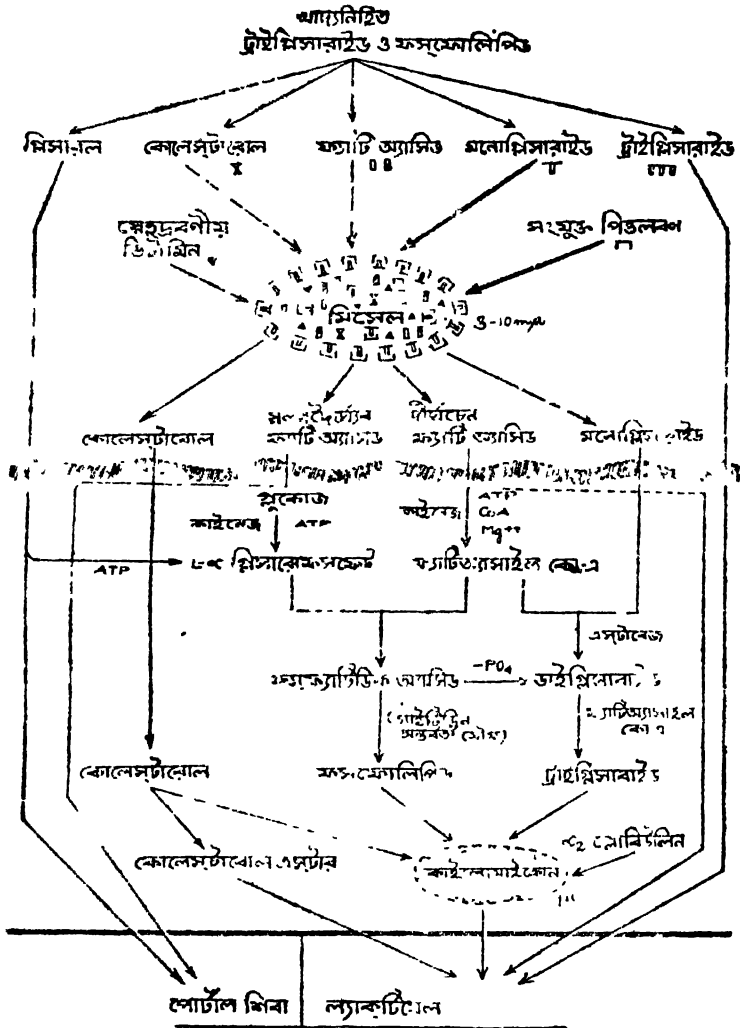
মিসেলে দ্রবীভূত লিপিড-অণু প্রধানত ডিওডিনাম ও জেজুনামের আবরণী-কোষের লাইপোপ্রোটিন কোষঝিল্লির মধ্য দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষাভ্যন্তরে

প্রবেশ করে। মিসেলস্থিত পিত্তলবণ যেহেতু কোষঝিল্লিতে দ্রবণীয় নয় (তাদের আধানের জন্য) সেহেতু ইহা ইলিয়ামের শেষাংশ থেকে সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে কোষে প্রবেশ করে। মিসেল থেকে লিপিড অণুর বিশোষণ তাদের দ্রবণক্ষমতার (solubility) উপর নির্ভরশীল। মনোগ্লিসারাইড অধিকতর দ্রবণীয় বলে, ইহা সবচেয়ে আগে প্রবেশ করে। তারপর দীর্ঘচেন ফ্যাটিঅ্যাসিড, কোলেস্টারোল এবং স্বল্প বা নাতিদীর্ঘ ফ্যাটিঅ্যাসিড অন্ত্র থেকে আবরণীকোষে বিশোষিত হয়। ট্রাইগ্লিসারাইড মিসেলদশার মধ্য দিয়ে না গিয়ে (দ্রবণীয় নয় বলে) পিনোসাইটোসিস ও সম্ভবত ফেনেস্ট্রার (fenestra) মাধ্যমে (ফেনেস্ট্রার ফাঁক আবরণীকোষের অবিচ্ছিন্ন ভিত্তিঝিল্লির দ্বারা উৎপন্ন হয়) আবরণীকোষে প্রবেশ করে। লাইসোলেসিথিনও সরাসরি আবরণীকোষে প্রবেশ করতে পারে।

আবরণীকোষে প্রবেশ করার পর কোষের অন্তঃকোষজালক মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটিঅ্যাসিডকে গ্রহণ করে এবং দ্রুত ট্রাইগ্লিসারাইড বা ফস্ফোলিপিডে রূপান্তর ঘটায় (6-27 নং চিত্র)। অন্তঃকোষীয় জালকের মাইক্রোসোমে সংশ্লিষ্ট এনজাইম পাওয়া যায়। সমগ্র অন্তঃকোষজালক স্নেহকণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। ফ্যাট এরপর ধীরে ধীরে কোষের নিউক্লিয়াসের উপর দিয়ে এগিয়ে যায় (বিশেষত ভিলাসের শীর্ষদেশীয় কোষে)। এই ফ্যাটকে ঘিরে প্রোটিন ও ফস্ফোলিপিডের একটি আস্তরণ গড়ে উঠে এবং এভাবে প্রায় 1μ ব্যাসসম্পন্ন যে লাইপোপ্রোটিন কণা গঠিত হয়, তাকে কাইলোমাইক্রোন (chylomicron) বলা হয়। কাইলোমাইক্রোনের আস্তরণ বা মেমব্রেন তাই সামান্য পরিমাণ প্রোটিন, মুক্ত কোলেস্টারোল এবং ফস্ফোলিপিডের এককস্তরে বিন্যস্ত সম্পৃক্ত ট্রাইগ্লিসারাইডের সমন্বয়ে গঠিত। কাইলোমাইক্রোন কলাস্থান (intestinal space) এবং লসিকানালীর মধ্যে অবস্থিত উন্মুক্ত প্রণালীর (channel) মাধ্যমে লাক্টিয়েলে প্রবেশ করে।

খাদ্যগ্রহণের পর লসিকাতে নিম্নলিখিত ফ্যাটের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়ঃ

ট্রাইগ্লিসারাইড	··· 82%
ফস্ফোলিপিড	10%
কোলেস্টারোল এস্টার	2%
মুক্ত ফ্যাটিঅ্যাসিড	6%

প্রোটিনের বিশোষণ
Absorption of Protein

প্রোটিন প্রধানত পোর্টালতন্ত্রের মাধ্যমে বিশোষিত হয়। অবশ্য অতিসামান্য অংশ লসিকাপ্রবাহেও প্রবেশ করে। সাধারণত অ্যামাইনোঅ্যাসিড হিসাবে প্রোটিনের বিশোষণ সংঘটিত হয়। অ্যামাইনোঅ্যাসিডের বিশোষণ একটি সক্রিয় ও পছন্দসই পদ্ধতি। কারণ দেখা গেছে, এল-অ্যামাইনোঅ্যাসিড যত দ্রুত বিশোষিত হয় এবং পোর্টাল রক্তে উপস্থিত হয়, ডি-অ্যামাইনোঅ্যাসিড সেভাবে পারে না। ভিটামিন B_6 এবং Mg^{++} আয়ন কোন না কোনভাবে আন্ত্রিক ঝিল্লিকোষে অ্যামাইনোঅ্যাসিডের তীব্রতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

অ্যামাইনোঅ্যাসিড ছাড়া কিছু প্রোটিনজাতীয় পদার্থ যেমন প্রোটিওস, পেপটোন, পলিপেপটাইড এবং কিছুকিছু সিরাম প্রোটিন ও ডিমের শ্বেতাংশও সামান্য পরিমাণে বিশোষিত হতে পারে। এভাবে সামান্য বিজাতীয় প্রোটিনও রক্তে প্রবেশ করে এবং অ্যান্টিবডি-উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগায়।

প্রশ্নাবলী

1. পৌষ্টিকতন্ত্রের শারীরস্থান সম্বন্ধে আলোচনা কর।
2. লালারসের উপাদান ও কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। (C. U. '68)
3. লালাগ্রন্থির আণুবীক্ষণিক গঠন ও লালারস ক্ষরণের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।
4. পাকস্থলীর আণুবীক্ষণিক গঠনের বর্ণনা দাও। পাচকরসের উপাদান ও পাচকরস ক্ষরণে যে সব কারণসমূহ প্রভাব বিস্তার করে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা কর।
5. চিত্রসহ যকৃতের আণুবীক্ষণিক গঠনের বর্ণনা দাও। সংক্ষেপে যকৃতের কার্যাবলীর আলোচনা কর। (C. U. H. 81)
6. অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। (C. U. 86)
7. পাচকরসের উপাদান ও কার্যাবলী বিবৃত কর। (C. U. 67. 72)
8. পাচকরসের জৈব এবং অজৈব উপাদান কি কি? পেপটিক ও অক্সিণ্টিক কোষ থেকে যে প্রধান উপাদান নিঃসৃত হয় তাদের নাম কর। পাচকরসের কার্যাবলী বর্ণনা কর। গ্যাসট্রিন কাকে বলে? (C. U. 81)
9. পাচকরসের ক্ষরণপদ্ধতি এবং তার দ্বারা পরিপাকের পদ্ধতির বর্ণনা কর। (C. U. H. '73)
10. কী ভাবে স্নায়বিক ও হরমোনগত কারণসমূহ পাচকরসের বিভিন্ন দশায় ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে তার আলোচনা কর। পাচকরসের মুক্ত ও সংযুক্ত অম্লত্ব বলতে কি বোঝায়? (C. U. H. '81)

11. পরিচ্ছন্ন চিত্রসহ ক্ষুদ্রান্ত্রের যে কোন অংশের আণুবীক্ষণিক গঠনের বর্ণনা দাও। ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলন কী কী? (C. U. 60)

12. পরিচ্ছন্ন চিত্রসহ মানুষের পাকস্থলীর পাইলোরিক অংশের আণুবীক্ষণিক গঠনের বর্ণনা দাও। পাকস্থলীর পাচকরসের উপাদানসমূহের নাম কর এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C. U. 78)

13. স্নেহদ্রব্য বিশোষণের উল্লেখসহ ভিলাসের একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন কর।

14. একটি পরিচ্ছন্ন চিত্রসহ তোমার দেহস্থিত যকৃতের অবস্থান নির্দেশ কর এবং তার আণুবীক্ষণিক গঠনের চিত্র অংকন কর। পিত্তরসের উৎপাদন ও কার্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত কর। (C. U. 77)

15. ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলনের প্রকৃতি ও কার্যাবলী আলোচনা কর। (C. U. 65, 85)

16. বৃহদন্ত্রের গঠন ও কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। (C. U. 62)

17. অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

18. পিত্তলবণের উপাদান কি কি? পিত্তরসের কার্যাবলী বিবৃত কর। আন্ত্র-যকৃৎ সংবহন সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C. U. 66, 83)

19. পিত্তলবণ কোনগুলো? তাদের উৎস, ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিবহণ ও কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। (C. U. 75)

20. পৌষ্টিকনালীতে কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক কীভাবে সম্পন্ন হয় বিবৃত কর। (C. U. 65)

21. পৌষ্টিকতন্ত্রে স্নেহদ্রব্যের পরিপাক ও বিশোষণ কীভাবে সম্পন্ন হয় আলোচনা কর। (C. U. 64, 67, 71, 75)

22. কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের বিশোষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। (C. U. 86)

23. (a) পাচকরসের ক্ষরণপদ্ধতির অনুশীলনে কে পুরোধা বিজ্ঞানী ছিলেন? তাঁর পরীক্ষাসমূহের বর্ণনা দাও। (b) পাচকরসের ক্ষরণের রাসায়নিক দশা আলোচনা কর। (c) প্রোটিন পরিপাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিভাবে সাহায্য করে? (C. U. 84)

24. পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রোটিনের পরিপাক সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C. U. 63, 85)

25. মানুষের বিভিন্ন হজমরসে প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইমের নাম কর। এদের উৎসস্থল এবং নির্দিষ্ট সক্রিয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C. U. H. 77)

26. আমাদের দেহে কোথায় কোথায় নিম্নলিখিত বিচলনগুলি সংঘটিত হয়: (a) ক্ষুৎ-সংকোচন, (b) ক্রমসংকোচন। (c) সংহত ক্রমসংকোচন। (d) সিলিয়ার চলন। (C. U. 81)

27. পৌষ্টিকনালীতে দুধের পরিপাকের পদ্ধতি বর্ণনা কর। (C. U. H. 73)

28. ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ চেন ফ্যাটি অ্যাসিডের বিশোষণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C. U. H. 77)

29. টীকা লিখ :

(a) প্যাপিলা, (b) পাকস্থলীর বিচলন, (c) আন্ত্রিক রসের উপাদান, (d) আন্ত্রিক রসের ক্ষরণপদ্ধতি, (e) অগ্ন্যাশয়ের গঠন, (f) পিত্তলবণ (61, 69, 77), (g) বমন, (h) জাইমোজেন (O. U. H. 76), (i) কাইলোমাইক্রোন, (j) টায়ালিন (64), (k) লাইপেজ, (l) পিত্তলবণ, (m) ট্রিপ্সিন, (n) পেপ্সিন (o) কাইমোট্রিপ্সিন, (p) ইরেপ্সিন, (q) সেরোটনিন, (r) গবলেট কোষ (s) আর্জেন্টাফিন কোষ, (t) পেয়ার প্যাচ, (u) প্যানেথ কোষ।

30. পার্থক্য লিখ :

(a) পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের বিশেষ কলাস্থানিক পার্থক্য (86), (b) পেপটিক ও অক্সিনটিক কোষের নিঃসৃত প্রধান উপাদানসমূহ (86)।

সাত

বিপাকক্রিয়া

METABOLISM
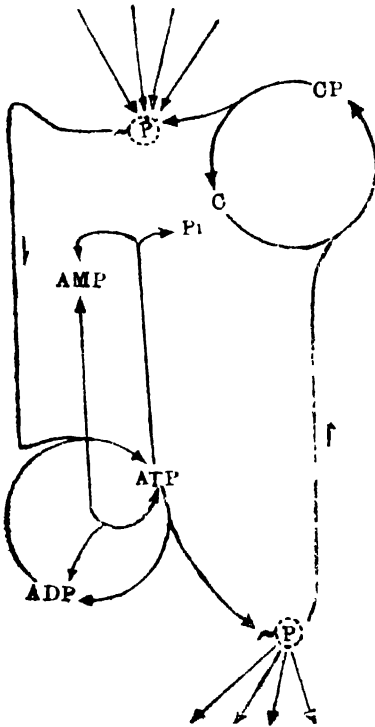
পৌষ্টিকতন্ত্র থেকে বিশোষণের পর খাদ্যকণা রক্তসংবহনে প্রবেশ করে। রক্তসংবহনে পরিবহনের সময় এসব খাদ্যকণাকে দেহের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগস্থিত কলাকোষ গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় কার্যে তাদের ব্যবহার করে। ব্যবহারের সময় খাদ্যকণার মধ্যে যে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় বা তাদের মধ্যে যেসব সংশ্লেষণ বা অবক্ষয়ধর্মী রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। তাকে **বিপাকক্রিয়া** (metabolism) নামে অভিহিত করা হয়। বিপাক এক্ষেত্রে **কলাকোষীয়** বিপাক (cellular metabolisom) বা **অন্তর্বর্তী বিপাকের** (intermediary metabolism) সমার্থক। কোষের সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকনড্রিয়াতেই প্রধানত অধিকাংশ বিপাকক্রিয়াসংঘটিত হয়।

1. **বিপাকের শ্রেণীবিভাগ** (Types of Metabolism) : প্রাণীদেহে বিপাকক্রিয়া দ্ভাবে সম্পন্ন হয় : **অ্যানাবলিজম** (anabolism) বা **উপচিতি** এবং (d) **ক্যাটাবলিজম** (catabolism) বা **অপচিতি**। রক্ত থেকে সংগৃহীত খাদ্যকণাকে ব্যবহার করে দেহের কলাকোষ যখন ন্তন ন্তন জৈবপদার্থের সংশ্লেষণ ঘটায় তখন তাকে **অ্যানাবলিজম** বা **উপচিতি** বলা হয়। অপরপক্ষে, কলাকোষের মধ্যে খাদ্যঅণ্ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যখন ভেংগে যায় তখন সেই প্রক্রিয়াকে **ক্যাটাবলিজম** বা **অপচিতি** বলা হয়। অপচিতির মাধ্যমে খাদ্যকণা থেকে দেহে জৈবশক্তি উৎপন্ন হয়।

2. **বিপাকের সংক্ষিপ্তসার** (Summary of metabolism) : কোষের অভ্যন্তরে কার্বোহাইড্রেট এককশর্করা হিসাবে, প্রোটিন অ্যামাইনোঅ্যাসিড হিসাবে এবং ফ্যাট ফ্যাটিঅ্যাসিড ও গ্লিসারল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পৌষ্টিকতন্ত্র থেকে কার্বোহাইড্রেট হেক্সোজ শর্করা হিসাবে (প্রধানত গ্লুকোজ হিসাবে) রক্তে বিশোষিত হয়। কিছু পরিমাণ ফ্রাক্টোজ ও গ্যালাক্টোজও বিশোষিত হয়, তবে যকৃৎ তাদের গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে। প্রোটিন প্রায় 20টি অ্যামাইনো-অ্যাসিড হিসাবে রক্তে বিশোষিত হয়। ফ্যাট প্রধানত ট্রাইগ্লিসারাইড হিসাবে লসিকাবাহের মাধ্যমে রক্তে প্রবেশ করে। এসব খাদ্যসম্ভার রক্তসংবহন থেকে কলারসের মাধ্যমে কোষে প্রবেশ করে। এই খাদ্যঅণ্ থেকে কলাকোষ যে সব পদার্থের সংশ্লেষণ ঘটায় তার সংক্ষিপ্তসার 1নং তালিকায় প্রদত্ত হয়েছে। দেহের যে সব প্রধান অংগপ্রত্যংগ এদের গ্রহণ করে এবং যে সব জৈবপদার্থ উৎপাদন করে, তার সংক্ষিপ্তসার তালিকার দ্বিতীয় পর্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। যকৃৎ এদের মধ্যে সবচেয়ে গ্রুত্বপূর্ণ অংগ। একক শর্করা থেকে এটি যেমন গ্লাইকোজেন উৎপন্ন করে, তেমনি অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে দেহের প্রয়োজনীয় প্রোটিন, এন্জাইম, অ্যান্টিবডি, পিত্তরস প্রভৃতির সংশ্লেষণ ঘটায়। তাছাড়া, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট বা স্নেহদ্রব্য দেহের মধ্যে যেভাবে পরস্পর রূপান্তরিত হয়, তালিকার তৃতীয় পর্যায়ে তা দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রেও যকৃৎ বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে, অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট থেকে ফ্যাট, ফ্যাট থেকে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন থেকে ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতির সংশ্লেষণ যকৃতেই সংঘটিত হয়। তাছাড়া কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট পরস্পর সংযুক্ত হয়ে মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন করে (চতুর্থ পর্যায়)। এসবই অ্যানাবলিজমের দৃষ্টান্ত।

1নং তালিকা : প্রাণীদেহে পদার্থের সংশ্লেষণ (অ্যানাবলিজম)।

পর্যায়	রাসায়নিক পরিবর্তন
1	কার্বোহাইড্রেট → হেক্সোজ; প্রোটিন → 20 অ্যামাইনো অ্যাসিড; ফ্যাট → গ্লিসারল : ফ্যাট অ্যাসিড
২	হেক্সোজ → যকৃৎ, পেশী → গ্লাইকোজেন; হেক্সোজ → মাতৃস্তন; অ্যামাইনো অ্যাসিড → মাতৃস্তন → ল্যাকটোজ, দুগ্ধ প্রোটিন (কেসিন); অ্যামাইনো অ্যাসিড → অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি → হরমোন; অ্যামাইনো অ্যাসিড → যকৃৎ → প্লাজমাপ্রোটিন, অ্যান্টিবডি, এনজাইম পিত্তঅম্ল ইত্যাদি; টাইরোসিন — ত্বক কেশ — মেলানিন; ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল → অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি → স্টেরোয়েড হরমোন; ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল → স্নেহদ্রব্য; ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল → মাতৃস্তন → দুগ্ধ স্নেহদ্রব্য
৩	গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, একক শর্করা, ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল → কার্বোহাইড্রেট; শর্করা → ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া; ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, ফ্যাটি অ্যাসিড → প্রোটিন; প্রোটিন → শর্করা; স্নেহঅম্ল গ্লিসারল; শর্করা → অ্যাসিটাইল কো-এ; শর্করা, স্নেহঅম্ল গ্লিসারল, অ্যাসিটাইল কো-এ → স্নেহদ্রব্য
4	কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন → গ্লাইকোপ্রোটিন; প্রশমিত ফ্যাটি অ্যাসিড, লিপিড → প্রোটিওলিপিড, লাইপোপ্রোটিন; লিপিড, শর্করা → গ্লাইকোলিপিড, সালফোলিপিড ইত্যাদি

2নং তালিকা ঃ প্রাণীদেহে পদার্থের ক্যাটাবলিজমের বিভিন্ন ধাপ।

পর্যায়	রাসায়নিক পরিবর্তন
1	কার্বোহাইড্রেট ↓ হেক্সোজ; প্রোটিন ↓ 20 অ্যামাইনো অ্যাসিড; স্নেহদ্রব্য ↓ গ্লিসারল ঃ ফ্যাটি অ্যাসিড
২	হেক্সোজ, গ্লিসারল, কিছুসংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড (অ্যালানিন, সেরিন, সিস্টেইন) ↓ পাইরুভিক অ্যাসিড; পাইরুভিক অ্যাসিড, কিছুসংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড (টাইরোসিন, ফেনাইল এলানিন লিউসিন), ফ্যাটিঅ্যাসিড ↓ অ্যাসিটাইল-কো এনজাইম A কিছুসংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড (প্রোলিন, হিস্টিডিন, আর্জিনিন গ্লুটামিক অ্যাসিড) ↓ আলফা কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড কিছুসংখ্যক অ্যামাইনো-অ্যাসিড (টাইরোসিন, ফেনাইল-এলানিন আস্পারটিক অ্যাসিড) ↓ অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড
৩	অ্যাসিটাইল কো-এ, আল্ফা-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড, অক্সালোঅ্যাসেটিক অ্যাসিড ↓ TCA চক্র

অপরপক্ষে খাদ্যকণার ক্যাটাবলিজ্‌ম বা পর্যায়ক্রমিক অবক্ষয়ে কিভাবে একক-শর্করা, অ্যামাইনোঅ্যাসিড, ফ্যাটিঅ্যাসিড ও গ্লিসারল জারিত হয়ে সক্রিয় অ্যাসিটেট (অ্যাসিটাইল কো-এ) উৎপন্ন করে এবং TCA-চক্রে প্রবেশ করে, 2নং তালিকায় তা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই পথে খাদ্যবস্তু জারিত হয়ে জৈবশক্তি উৎপন্ন করে। অসংখ্য এনজাইম এসব রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংগে জড়িত। দ্বিতীয় পর্যায়ে কিছু পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হলেও সর্বাধিক জৈবশক্তি উৎপন্ন হয় তৃতীয় পর্যায় থেকে। প্রায় 65 শতাংশ জৈবশক্তি এই পর্যায় থেকে উৎপন্ন হয়। তাপগতিবিদ্যার দিক দিয়ে এই সামগ্রিক পদ্ধতির দক্ষতা (efficiency) 60-70 শতাংশ এবং প্রধানত ইহা TCA-চক্র ও বায়বীয় পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। জৈবশক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

কার্বোহাইড্রেটের বিপাক

CARBOHYDRATE METABOLISM

প্রাণীদেহে কার্বোহাইড্রেটের বিপাক বলতে প্রধানত গ্লুকোজ ও গ্লুকোজের সংগে সম্পর্কযুক্ত পদার্থের বিপাককেই বোঝায়। রক্তের শর্করা ও কলারসের শর্করাও গ্লুকোজ। একক শর্করা ফ্রাকটোজ ও গ্যালাকটোজ ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে যকৃতে পৌঁছে পরিশেষে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মান্তরের কোষও ফ্রাকটোজকে গ্লুকোজে পরিণত করতে পারে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীতে কার্বোহাইড্রেটের বিপাককে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যায় (7-2 নং চিত্র):

1. **গ্লাইকোলাইসিস** (Glycolysis): যে পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন পাইরুভিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় এবং তার সংগে ATP-এরও উৎপাদন ঘটে তাকে **গ্লাইকোলাইসিস** বলা হয়। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড মাইটোকনড্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে। অপরপক্ষে অক্সিজেন সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে সক্রিয় পেশীতে পাইরুভিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।

2. **গ্লাইকোজেনেসিস** (Glycogenesis): যে পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয় তাকে **গ্লাইকোজেনেসিস** বলা হয়।

3. **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** (Glycogenolysis): যে পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লাইকোজেন ভেংগে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে তাকে **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** বলা হয়।

4. **গ্লুকোনিওজেনেসিস** (Gluconeogenesis): কার্বোহাইড্রেট নয় এমন পদার্থ থেকে গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেনের উৎপাদনকে **গ্লুকোনিওজেনেসিস** বলা হয়। প্রধানত ল্যাকটিক অ্যাসিড, গ্লিসারল ও গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড এই পদ্ধতিতে গ্লুকোজে পরিণত হয়।

5. **পাইরুভিক অ্যাসিডের অ্যাসিটাইল কো-এতে জারণ** (Oxidation of pyruvic acid to acetyl CoA) ঃ সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে প্রবেশের পূর্বে পাইরুভিক অ্যাসিডকে অ্যাসিটাইল কো-এতে রূপান্তরিত হতে হয়। সাইট্রিক
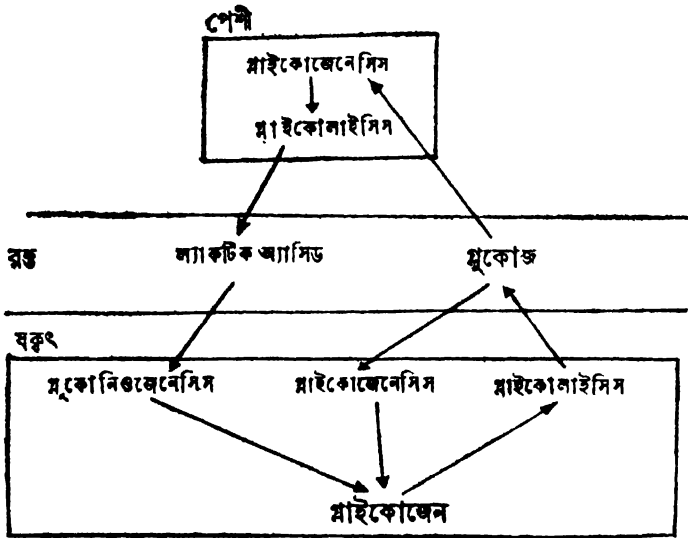
7-2নং চিত্র ঃ কার্বোহাইড্রেটের বিপাকের সম্পর্ক।

অ্যাসিড চক্র কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিনের জারণের সর্বশেষ সাধারণ বিক্রিয়াপথ হিসাবে পরিগণিত।

6. **পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়াপথ** (Pentose Phosphate Pathway) ঃ গ্লুকোজের জারণের বিকল্প পথ হিসাবে এই বিক্রিয়াপথ কাজ করে। হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট বা ফসফোগ্লুকোনেট অক্সিডেটিভ পথ হিসাবেও এটি পরিচিত।

রক্তশর্করা
Blood Sugar

রক্তশর্করা বলতে রক্তের গ্লুকোজকে বোঝায়। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ একটি নির্ধারিত মাত্রায় নির্দিষ্ট থাকে। খাদ্যগ্রহণের 12 ঘণ্টা পরে এই পরিমাণ প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে 80-100 মিলিগ্রাম এবং খাদ্যগ্রহণের পরে 100-130 মিলিগ্রামের মত হয়। ধমনী রক্ত থেকে শিরারক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ সাধারণত

কিছুটা কম থাকে। প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে গ্লুকোজের ধমনীশিরা পার্থক্য প্রায় 1·5-8 মিলিগ্রাম। ধমনী থেকে শিরাভিমুখী রক্তসংবহনের সময় দেহের কলাকোষ কিছু পরিমাণ রক্তশর্করাকে অনবরত গ্রহণ করে থাকে, ফলে এই পার্থক্য প্রায় সব সময় বজায় থাকে।

গ্লুকোজ সহিষ্ণুতার পরীক্ষা (Glucose tolerance test)

স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় গ্লুকোজ যেভাবে রক্তপ্রবাহে অবস্থান করে তাকে **গতিময় সাম্যাবস্থা** (dynamic equilibrium) নামে অভিহিত করা হয়। বহিঃস্থ উৎস থেকে অধিক পরিমাণ গ্লুকোজকে রক্তে প্রবেশ করিয়ে এই সাম্যাবস্থার সাময়িক বিপর্যয় ঘটালে, দেহ যে ক্ষমতাবলে এই সাম্যাবস্থাকে ফিরিয়ে আনে তাকে **গ্লুকোজ সহিষ্ণুতা** (glucose tolerance) বলা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্লুকোজ বা গ্লুকোজের দ্রবণকে দেহে প্রবেশ করালে সাময়িকভাবে রক্তে যে অধিক গ্লুকোজজনিত অবস্থা বা হাইপারগ্লাইসেমিয়ার উদ্ভব হয়, তার বিস্তৃতি ও স্থিতিকালের পরিমাপ করে গ্লুকোজসহিষ্ণুতার পরীক্ষা করা হয়।

প্রায় 8 ঘণ্টা অনশনরত একজন লোকের শিরাস্থিত রক্তকে শিরিঞ্জের সাহায্যে টেনে এনে তার রক্তগ্লুকোজের মাত্রা নির্ধারিত করা হয়। এরপর প্রায় 200 মিলিলিটার জলের সংগে 50 গ্রাম গ্লুকোজকে মিশিয়ে তাকে খেতে দেওয়া হয়। খেতে দেওয়ার 30 মিনিট পর ঘণ্টা দুই ধরে সিরিঞ্জের সাহায্যে শিরাস্থিত রক্তের কয়েকটি নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং তাদের গ্লুকোজের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই নির্ধারিত গ্লুকোজের পরিমাণ ও সময়কে পরস্পরের বিপরীতে প্রতিস্থাপন করে গ্লুকোজসহিষ্ণুতার লেখচিত্র পাওয়া যায় (7-3নং চিত্র)। সুস্থ এবং মধুমেহরোগাক্রান্ত লোকের ক্ষেত্রে এই লেখচিত্রের আকৃতি ভিন্ন হয়।
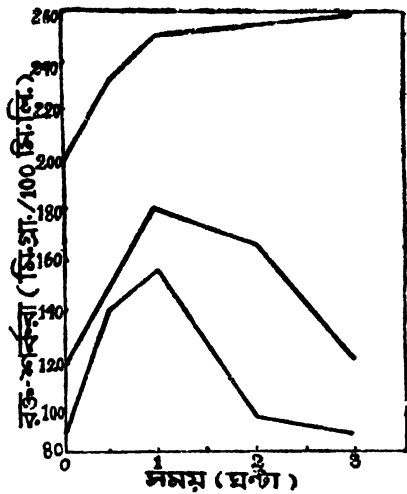
7-3 নং চিত্র : গ্লুকোজ সহিষ্ণুতার তিনটি রেখচিত্র। সর্বনিম্ন : সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ; মধ্য : মৃদু মধুমেহজাত অবস্থায় ; সর্বঊর্ধ্ব : দুঃসহ মধুমেহে অবস্থায়।

1. **সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা :** সুস্থ ও স্বাভাবিক দেহে গ্লুকোজের মাত্রা প্রথম 3-4 মিনিটের মধ্যে সাময়িকভাবে প্রায় 150 মিলিগ্রামে (প্রতি 100 মিলিলিটারে) পৌঁছয়, তবে দ্বিতীয় ঘণ্টার শেষেই স্থিতাবস্থায় ফিরে আসে। এই পরীক্ষা চলাকালে স্বাভাবিক মানুষের মূত্রে গ্লুকোজ নির্গত হয় না।

2. **মৃদু মধুমেহ** (Mild diabetes) **:** মৃদু মধুমেহে রক্তশর্করার পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে 100 মিলিগ্রামের ওপরে থাকে। এরকম রোগীর ক্ষেত্রে গ্লুকোজ-সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করলে দেখা যায় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় 180 মিলিগ্রামে (প্রতি 100 মিলিমিটারে) পৌঁছয় এবং স্বকীয় স্থিতাবস্থায় ফিরে আসতে 3 ঘণ্টা বা তারও বেশী সময় নেয়। রোগীর মূত্রে রক্তশর্করার নির্গমন ঘটে।

3. **দুঃসহ মধুমেহ** (Severe diabetes) **:** দুঃসহ মধুমেহে রক্তশর্করার মাত্রা সাধারণভাবে অনেক বেশী থাকে; এজাতীয় রোগীর ক্ষেত্রে গ্লুকোজ-সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, রক্তগ্লুকোজের পরিমাণ 2 ঘণ্টার পরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূত্রে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ নির্গত হয়।

রক্তশর্করার নিয়ন্ত্রণ
Regulation of Blood Sugar

রক্তসংবহনে রক্তশর্করার নিয়ন্ত্রণ একটি অত্যাবশ্যকীয় শারীরবৃত্তীয় ঘটনা। এই নিয়ন্ত্রণ যাতে রক্তশর্করার গতিময় সাম্যাবস্থার সীমিত গণ্ডির মধ্যে সুষ্ঠুভাবে দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে তার জন্য একটি শক্তিশালী শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া
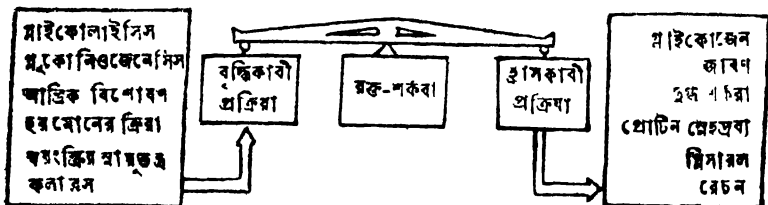
7-4 নং চিত্র : রক্ত শর্করার সাম্যাবস্থার নিয়ন্ত্রণের সংগে সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়াসমূহ।

সুনিশ্চিতভাবে সক্রিয় রয়েছে। এই শক্তিশালী সক্রিয় জৈবিক প্রক্রিয়া হরমোন সক্রিয়তার সংগে নিবিড়ভাবে জড়িত। হরমোন যেসব অংগপ্রত্যংগের উপর-ক্রিয়া করে রক্তশর্করার নিয়ন্ত্রণ ঘটায় তারা হল : যকৃৎ, পেশী, পৌষ্টিকতন্ত্র,

বৃক্ক, ত্বক, কলাকোষ, মাতৃস্তন ইত্যাদির সংগে জড়িত। অংগ-প্রত্যংগ ও উপাদান-সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল (7-4 নং চিত্রে)।

কমবেশী প্রায় সবকটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিই রক্তশর্করার নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে। ইনস্থুলিন, গ্লুকাগোন, থাইরোক্সিন, STH, TSH, ACTH, এপিনেফরিন্ ইত্যাদি হরমোন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

1. **ইনসুলিন :** স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তশর্করার সঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ইন্স্থুলিনের সংগে অ্যাড্রেন্যাল ও সম্মুখস্থ পিটুইটারীজাত হরমোনের প্রয়োজন হয় ; ইন্স্থুলিনের সম্পূর্ণ অভাবে দেহে কার্বোহাইড্রেটের ব্যবহার একেবারে বন্ধ না হয়ে গেলেও প্রাণীর পক্ষে অপরিহার্য। ইন্স্থুলিন প্রধানত শর্করার জারণ, গ্লাইকোজেনের সংশ্লেষণ এবং শর্করা থেকে স্নেহদ্রব্যের উৎপাদনে সহায়তা করে। (a) **কোষঝিল্লির মধ্য দিয়ে গ্লুকোজের পরিবহন :** ইন্স্থুলিন কোন কোন কোষঝিল্লির মধ্য দিয়ে গ্লুকোজের পরিবহন সহজতর করে তুলে এবং কোষবাহঃস্থ তরলের মধ্য থেকে গ্লুকোজকে এবং অন্যান্য শর্করাকে আন্তর-কোষীয় তরলে এন্‌জাইমের ক্রিয়াস্থানে নিয়ে আসে, অর্থাৎ ইন্‌স্থুলিন কোষের পরিবহন ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করে। মধুমেহরোগে (ইন্‌স্থুলিনের পূর্ণ অভাবে) মাংসপেশী ও চর্বিকোষের ঝিল্লির মধ্য দিয়ে গ্লুকোজ ও অন্যান্য শর্করার গতি মন্থর হয়ে ওঠে। দেহে ইন্‌সুলিন প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে কোষবহিঃস্থ তরল থেকে শর্করা অতি দ্রুত কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং গ্লুকোজ 6 ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। স্নায়ুকোষ ও লোহিতকণিকায় শর্করা পরিবহনে ইন্‌সুলিন কোন প্রভাব বিস্তার করে না। (b) **এন্‌জাইমের উপর ক্রিয়া :** কারো কারো মতে ইন্‌সুলিন এন্‌জাইম হেক্সোকাইনেজের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে এবং গ্লুকোজ 6-ফসফেটের রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করে। একটা ব্যাপারে সবাই একমত যে ইন্‌সুলিন আন্তরকোষীয় এন্‌জাইমসংস্থায় প্রভাব বিস্তার করে বিপাকীয় পরিবর্তন আনয়ন করে। এই কার্য সম্পন্ন করার জন্য হরমোনকে এন্‌জাইমসংস্থার সংগে কোন না কোনভাবে আবদ্ধ হতে হয়। একটি সুস্থ ইঁদুরের মধ্যচ্ছদাকে তেজস্ক্রিয় ইনসুলিনের দ্রবণে ডুবিয়ে দেখা গেছে, হরমোন 10 সেকেণ্ডের মধ্যে পেশীকোষে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়, বারবার প্রক্ষালনেও তাকে পৃথক করা সম্ভবপর নয়। চর্বিকলায় ও দুগ্ধবতী মাতৃস্তনে (ইঁদুরের) একইভাবে ইন্‌সুলিনকে আবদ্ধ হয়ে থাকতে দেখা গেছে। এছাড়া তেজস্ক্রিয় ইন্‌সুলিন যকৃৎকোষের মাইটোকনড্রিয়া ও মাইক্রোজোমেও আবদ্ধ হয়ে থাকে। এর থেকে প্রমাণিত হয়

ইন্সুলিন এন্‌জাইমের সংগে আবদ্ধ হয়ে এন্‌জাইমের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। (c) **শর্করার জারণ বৃদ্ধি :** ইন্সুলিন কোষের জারণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং প্রোটিন ও স্নেহপদার্থের ব্যবহার সীমিত করে। তেজস্ক্রিয় গ্লুকোজ দেহে প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে, ইন্সুলিন গ্লুকোজের জারণক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে। এছাড়া অন্তরিত জীবন্ত কলাকোষ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, তাদের শুধুমাত্র গ্লুকোজের দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলে খুব কম পরিমাণে শর্করাকেই তারা জারিত করতে পারে ; একই দ্রবণে ইন্সুলিন মিশ্রিত করলে জীবন্ত কলাকোষ গ্লুকোজের জারণ বৃদ্ধি করে। (d) **গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ :**
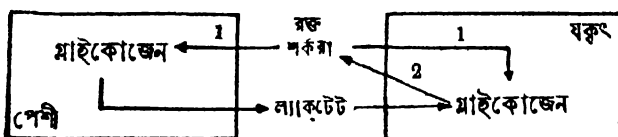
7-5নং চিত্র : যকৃৎ ও পেশীতে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণে ইনসুলিনের ভূমিকা।
1—ইনসুলিন উদ্দীপিত করে। 2—গ্লুকাগোন বৃদ্ধি করে।

ইন্সুলিন পেশী ও যকৃতে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ বৃদ্ধি করে এবং তাদের সঞ্চয়ে সহায়তা করে। মধুমেহরোগে যকৃতস্থ গ্লাইকোজেনের পরিমাণ যেমন হ্রাস পায়, তেমনি গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণও হ্রাস পায়। পেশীতেও একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। দেহে ইন্সুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি করলে যকৃৎ ও পেশীর গ্লাইকোজেন সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় (7-5 নং চিত্র)। (e) **শর্করা থেকে স্নেহদ্রব্যের সংশ্লেষণ :** ইন্সুলিন রক্তশর্করা থেকে স্নেহপদার্থের সংশ্লেষণকে সহজতর ও ত্বরান্বিত করে তুলে। মধুমেহরোগে ইনসুলিন প্রয়োগ করে দেখা গেছে, গ্লুকোজের স্নেহদ্রব্যে রূপান্তর বৃদ্ধি পায়। আইসোটোপ বা সমস্থানিকের ব্যবহার করে দেখা গেছে সুপুষ্ট ইঁদুরে গৃহীত কার্বোহাইড্রেটের 3 শতাংশ গ্লাইকোজেনে এবং 30 শতাংশ স্নেহদ্রব্যে রূপান্তরিত হয়। (f) **গ্লুকোজ সহিষ্ণুতার বৃদ্ধি :** কিছুদিন ধরে কোন লোককে অধিক পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট খেতে দিলে তার গ্লুকোজ সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। গ্লুকোজ সহিষ্ণুতার রেখচিত্র নির্ণয় করে দেখা গেছে স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তশর্করার মাত্রা যতটুকু বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, ততটুকু পায় না। গ্লুকোজ-সহিষ্ণুতার বৃদ্ধির প্রধান কারণ দ্বীপগ্রন্থির অধিকমাত্রায় ইন্সুলিন ক্ষরণ।

2. **গ্লুকাগোন :** গ্লুকাগোন ইন্সুলিনের বিপরীতধর্মী কার্য সম্পন্ন করে। ইন্সুলিন যেখানে রক্তশর্করার তীব্রতা হ্রাস করতে সচেষ্ট, গ্লুকাগোন সেখানে

রক্তশর্করার তীব্রতা বৃদ্ধি করে। গ্লুকাগোন ও অ্যাড্রেন্যালিনের কার্য অনেকটা একই ধরনের, তবে প্রথম হরমোন একটিমাত্র বিশেষ দেহাংগের (যকৃৎ) উপর প্রভাব বিস্তার করে, অপরপক্ষে অ্যাড্রেন্যালিন একাধিক অংগ ও তন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

কার্বোহাইড্রেটের বিপাক: গ্লুকাগোনের প্রধান কাজ হল যকৃতস্থ গ্লাইকোজেনকে বিশ্লিষ্ট করে রক্তগ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি করা; ফলে যকৃতের গ্লাইকোজেন সঞ্চয় হ্রাস পায় ও রক্তশর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তবে রক্ত-শর্করার মাত্রাবৃদ্ধি, তীব্রতা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে গ্লুকাগোনের পরিমাণের উপর। পেশী-গ্লাইকোজেনের উপর গ্লুকাগোনের কোন প্রভাব নেই।

গ্লুকাগোন যকৃতস্থ নিষ্ক্রিয় ফস্‌ফোরীলেজ এন্‌জাইমকে সক্রিয় ফসফোরীলেজে রূপান্তরিত করে যকৃৎগ্লাইকোজেনকে বিশ্লিষ্ট করে, কিন্তু পেশীফস্‌ফোরীলেজ

গ্লুকাগোন
(এপিনেফ্রিন,
ADH
TSH
ACTH)
↓
অ্যাডেনীল সাইক্লেজ
ATP ——→ সাইক্লিক AMP
Mg^{++}

নিষ্ক্রিয় কাইনেজ ↓ সক্রিয় কাইনেজ

ফস্‌ফোরীলেজ b (নিষ্ক্রিয়) ——→ ফস্‌ফোরীলেজ a (সক্রিয়)

গ্লাইকোজেন → গ্লুকোজ 1-P → গ্লুকোজ

7-6 নং চিত্র: গ্লাইকোজেনোলাইসিসে গ্লুকাগোনের ভূমিকা।

এন্‌জাইমের উপর তার কোন প্রভাব নেই। অ্যাড্রেন্যালের মজ্জান্তর নিঃসৃত হরমোন (অ্যাড্রেন্যালিন) অবশ্য উভয়স্থানের ফস্‌ফোরীলেজ এন্‌জাইমকেই সক্রিয় করে তুলতে পারে। এই দুটি এন্‌জাইম **অ্যাডেনীল সাইক্লেজ** এন্‌জাইমকে সক্রিয় করে, যা Mg^{++} আয়নের সহায়তায় ATP থেকে সাইক্লিক AMP এর উৎপাদন বৃদ্ধি করে। সাইক্লিক AMP এরপর নিষ্ক্রিয় **কাইনেজ** এন্‌জাইমকে সক্রিয় এনজাইমে পরিবর্তিত করে। সক্রিয় কাইনেজ এনজাইম এরপর নিষ্ক্রিয় ফস্‌ফোরীলেজ এনজাইমকে সক্রিয় ফস্‌ফোরীলেজে রূপান্তরিত করে।

গ্লুকাগোন ইঁদুরের যকৃৎস্থিত গ্লাইকোজেনকেও বিশ্লিষ্ট করতে পারে, তবে চর্বিকোষের গ্লাইকোজেনকে নয়। এছাড়া গ্লুকাগোন প্রান্তীয় কলাকোষে গ্লুকোজের ব্যবহার ত্বরান্বিত করে।

3. **থাইরোক্সিন :** থাইরোয়েড হরমোন অন্ত্র থেকে গ্লুকোজের বিশোষণ ত্বরান্বিত করে, কলাকোষের শর্করার ব্যবহার বৃদ্ধি করে, যকৃৎ-গ্লাইকোজেনের ক্ষয় বৃদ্ধি করে এবং গ্লুকোজ সহিষ্ণুতা হ্রাস করে।

থাইরোয়েড হরমোনকে দেহে প্রবেশ করালে কোষমধ্যস্থ কিছুসংখ্যক এনজাইমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, ফলে কোষের বিপাকক্রিয়ারও বৃদ্ধি ঘটে।

4. STH : রক্ত শর্করার নিয়ন্ত্রণে এই হরমোন নানাভাবে অংশগ্রহণ করে। মানুষে এই হরমোন মধুমেহ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। অধিক পরিমাণ হরমোনের দেহপ্রবেশে রক্তশর্করার বৃদ্ধি ঘটে এবং মূত্রে শর্করা নির্গত হয়। রক্তে অধিক শর্করার উপস্থিতিতে অগ্ন্যাশয়ের বিটাকোষ অধিকমাত্রায় ইনসুলিন ক্ষরণ করে এবং পরে নিঃশোষিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পিটুইটারী-অপসৃত প্রাণীতে রক্তশর্করার মাত্রা দ্রুত হ্রাস পায়। হোসে (Houssay) দেখেছেন, অগ্ন্যাশয় অপসৃত প্রাণীর পিটুইটারী অপসারণে রক্তস্থিত অতিরিক্ত শর্করা, মূত্রে নির্গত শর্করা এবং উৎপন্ন কিটোনবডি অদৃশ্য হয়। এজাতীয় প্রাণীকে **হোসেপ্রাণী** (Houssay animal) বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, STH (এবং ACTH) নিওগ্লুকোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ অকার্বোহাইড্রেট পদার্থ থেকে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদনে উদ্দীপনা দান করে। তৃতীয়ত, এই হরমোন (এবং ACTH) দেহকোষে গ্লুকোজের জারণক্রিয়া হ্রাস করে এবং ইনসুলিনবিরোধক পদার্থ হিসাবে কাজ করে। STH সরাসরি কোষের জৈবক্রিয়ায় প্রভাববিস্তার করে, অপরপক্ষে ACTH অ্যাড্রেন্যালের বহিঃস্তরের মাধ্যমে এই পরিবর্তন আনয়ন করে। অস্থিপেশী ও হৃৎপেশীতে গ্লাইকোজেন বৃদ্ধি পায়।

5. TSH : এই হরমোন থাইরোয়েডের উপর প্রভাব বিস্তার করে পরোক্ষভাবে রক্তশর্করার নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে।

6. ACTH : ACTH অ্যাড্রেন্যালের বহিঃস্তর নিঃসৃত গ্লুকোকর্টিকয়েড (glucocorticoids) হরমোনের ক্ষরণে প্রভাববিস্তার করে অর্থাৎ এদের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় এবং পরোক্ষভাবে কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে অংশগ্রহণ করে।

7. **গ্লুকোকর্টিকোয়েড :** গ্লুকোকর্টিকোয়েড গ্লুকোনিওজেনেসিস পদ্ধতির বৃদ্ধি ঘটায়, তবে কিভাবে করে এখনও তা সুস্পষ্ট নয়। এ সম্বন্ধে তিনটি মতবাদের উল্লেখ করা যায় : (1) করটিসোল বহিঃকোষীয় তরল থেকে যকৃৎ-কোষে অ্যামাইনোঅ্যাসিডের পরিবহন বৃদ্ধি করে। এভাবে অ্যামাইনোঅ্যাসিডকে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করতে যকৃৎকোষের কাজ সহজতর হয়। (2) যকৃৎকোষে গ্লুকোকরটিকোয়েডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেখা গেছে, কোষে অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে গ্লুকোজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় এনজাইমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং একই সংগে mRNA-এর সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটে। এর থেকে ধারণা করা হয়, গ্লুকোকর্টিকোরেড যকৃৎকোষের নিউক্লিয়াসস্থিত নির্দিষ্ট অণুসমূহে উদ্দীপনা দান করে নির্দিষ্ট mRNA-এর সংশ্লেষণ বৃদ্ধি করে, যারা রাইবোসোমীয় প্রোটিন এনজাইমের উৎপাদন করে। (3) দেখা গেছে, কোর্টিসোল যকৃৎ বহির্ভূত কোষ থেকে অ্যামাইনোঅ্যাসিডের বহির্গমন বৃদ্ধি করে। গ্লুকোকর্টিকোয়েড DNA-নির্ভর RNA পলিম্যারেজ এনজাইমকে বাধা দেয়, যার ফলে প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় mRNA উৎপন্ন হতে পারে না।

এছাড়া গ্লুকোকর্টিকোয়েড কোষে গ্লুকোজের ব্যবহার এবং ভেদ্যতা-দুই-ই হ্রাস করে।

8. **অ্যাড্রেন্যালিন :** অ্যাড্রেন্যালিন কার্বোহাইড্রেটের বিপাকক্রিয়ায় বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে রক্তশর্করার মাত্রাবৃদ্ধি ঘটায়। অ্যাড্রেন্যালিনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে রক্তশর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। মানসিক উত্তেজনা, আঘাত, পেশীসঞ্চালন ও ইথার, মরফিন, প্রভৃতি অবেদনিকের ব্যবহার যেমন অ্যাড্রেন্যালিনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে, তেমনি রক্ত শর্করারও মাত্রা বৃদ্ধি করে।

অ্যাড্রেন্যালিন প্রধানত যকৃৎগ্লাইকোজেন ও পেশীগ্লাইকোজেন থেকে (কোরিচক্রের মাধ্যমে) রক্তশর্করা উৎপন্ন করে।

এছাড়া অ্যাড্রেন্যালিন পরোক্ষভাবে সম্মুখস্থ পিটুইটারীতে প্রভাব বিস্তার করে ACTH এর ক্ষরণ ঘটায়, যা অ্যাড্রেন্যালের বহিঃস্তরীয় গ্রন্থি থেকে স্টেরোয়েড হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। এভাবে ক্ষরিত 11-অক্সিকোরটি-কোয়েড হরমোন প্রোটিন থেকে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন তরান্বিত করে এবং রক্তশর্করার বৃদ্ধি ঘটায়। অতএব অ্যাড্রেন্যালিন তিনভাবে রক্তশর্করার বৃদ্ধি

ঘটায় : (a) যকৃৎগ্লাইকোজেনের বিশ্লিষ্টকরণের মাধ্যমে, (b) পেশীগ্লাইকোজেনকে ল্যাক্টিক অ্যাসিডে দ্রুত রূপান্তরিত করে, যার থেকে যকৃতে নতুন করে গ্লাইকোজেন উৎপন্ন হয় এবং (c) পরোক্ষভাবে পিটুইটারীকে প্রভাবিত করে
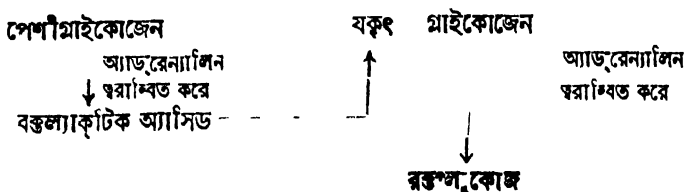
7-7 নং চিত্র : পেশী ও যকৃৎ গ্লাইকোজেনের উপর অ্যাড্রেন্যালিনের প্রভাব।

ACTH এর ক্ষরণ বৃদ্ধি করে যা অ্যাড্রেন্যালের বহিঃস্তরীয় গ্রন্থি থেকে কোর্টিকোয়েড হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে, ফলে অকার্বোহাইড্রেটের সংশ্লেষণ বৃদ্ধি পায়।

অ্যাড্রেন্যালিন প্রধানত পেশী ও যকৃতস্থ নিষ্ক্রিয় ফস্ফোরীলেজ এন্জাইমকে সক্রিয় ফস্ফোরীলেজ এন্জাইমে পরিণত করে গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ-1-ফস্ফেট ও গ্লুকোজ-6 ফস্ফেটের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এন্জাইম ফস্ফাটেজের দ্বারা গ্লুকোজ-6-ফস্ফেট গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় ফলে রক্ত-গ্লুকোজের মাত্রাধিক্য ঘটে ; তবে ফস্ফাটেজ এন্জাইম পেশীতে অনুপস্থিত বলে সেখানে ল্যাক্টিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং রক্তে নিঃসৃত হয়।

এছাড়া অ্যাড্রেন্যালিন কলাকোষীয় জারণ বৃদ্ধি করে, ফলে মৌলবিপাকীয় হার প্রায় 20 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। চর্বিকোষ থেকে এই হরমোন ফ্যাটি অ্যাসিডের মুক্তি ঘটায়। এই হরমোন প্রধানত প্রশমিত স্নেহদ্রব্যের বিশ্লিষ্টকরণে অংশগ্রহণ করে।

নরঅ্যাড্রেন্যালিনের সক্রিয়তাও অনেকটা অ্যাড্রেন্যালিনের মত।

9. **অন্যান্য হরমোন :** অন্যান্য কিছু হরমোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রক্তশর্করার নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করে থাকে। পশ্চাৎপিটুইটারীজাত হরমোন ভেসোপ্রেসিনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে শর্করা-সহিষ্ণুতা হ্রাস পায়, যকৃৎ-গ্লাইকোজেন অধিক পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হয়, রক্তশর্করার বৃদ্ধি ঘটে এবং মূত্রে শর্করা রেচন বৃদ্ধি পায়। অক্সিটোসিনও অধিকমাত্রায় রক্তশর্করার বৃদ্ধি ঘটায়, বিশেষ করে কুকুরের ক্ষেত্রে। এছাড়া পুং হরমোন টেস্টোস্টারোন, পিনিয়েল হরমোন মেলাটোনিন ইত্যাদি রক্তশর্করার নিয়ন্ত্রণে হয়ত কিছুটা অংশগ্রহণ করে।

রক্তশর্করার অস্বাভাবিক অবস্থা
Abnormal Conditions of Blood Sugar

রক্তপ্রবাহে শর্করার গতিময় সাম্যাবস্থা যখন বিপর্যস্ত হয় তখনই রক্তশর্করার পরিমাণ অস্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছয়। রক্তশর্করা দুটো অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে: (1) **অধিক-শর্করাজনিত অবস্থা** বা **হাইপার্‌-গ্লাইসেমিয়া** এবং (2) **স্বল্পশর্করাজনিত অবস্থা** বা **হাইপোগ্লাইসেমিয়া**।

1. **হাইপারগ্লাইসেমিয়া** (Hyperglycemia): রক্তে গ্লুকোজ বা রক্তশর্করার পরিমাণ প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে 120 মিলিগ্রামের উপর বৃদ্ধি পেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে হাইপারগ্লাইসেমিয়া বলা হয়। এরকম অবস্থায় যখন বৃক্কের গ্লুকোজ পুনর্বিশোষণের ক্ষমতা (180 গ্রাম/100 মিলিলিটার) অতিক্রান্ত হয়, রক্তশর্করা তখন প্রস্রাবের সংগে নির্গত হতে থাকে (গ্লুকোসুরিয়া)। দেহে ইন্‌সুলিনের অভাব দেখা দিলে অথবা ইন্‌সুলিনের ক্ষরণ হ্রাস পেলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এছাড়া সম্মুখ পিটুইটারী, অ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থির বহিঃস্তর প্রভৃতির সক্রিয়তাবৃদ্ধি তথা যকৃৎ কর্তৃক গ্লুকোজের ব্যবহার সীমিত অথচ নিষ্ক্রমণ বৃদ্ধি পেলে হাইপার্‌গ্লাইসেমিয়া দেখা দেয়।

(a) **মধুমেহ** (Diabetes mellitus): রক্তশর্করার যে অবস্থায় হাইপারগ্লাইসেমিয়া ও গ্লুকোসুরিয়া দেখা দেয়, তাকে সম্মিলিতভাবে মধুমেহ বলা চলে। অগ্ন্যাশয়স্থিত ল্যাংগার্‌হ্যান্‌স-আইলেটের (islets of Langer-hans) বিটা-কোষের ক্ষতিসাধন বা স্বল্পসক্রিয়তা থেকে দেহে ইন্‌সুলিনের অভাব দেখা দেয়। ইন্‌সুলিন-বিরোধী পদার্থে প্রতিবন্ধকতা হ্রাস পেলে এই অবস্থার আরো অবনতি ঘটে।

মধুমেহ রোগে আর যে সব অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয় তার মধ্যে প্রধান: কিটোসিস, অ্যাসিডোসিস, সংজ্ঞালোপ, দৈহিক ওজনহ্রাস, পলিউরিয়া এবং পলিডিপসিয়া (অতি তৃষ্ণা)। ইন্‌সুলিন ইন্‌জেকশন দিলে অবস্থার উন্নতি ঘটে, অর্থাৎ রক্তশর্করা তার স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় ফিরে আসে, যকৃতে কিটোন্‌-পদার্থের উৎপাদন (কিটোসিস) বন্ধ হয় এবং রক্তের অম্লদশা (অ্যাসিডোসিস) তিরোহিত হয়।

(b) **গ্লুকোসুরিয়া** (Glucosuria): মূত্রে রক্তশর্করার উপস্থিতিকে গ্লুকোসুরিয়া বলা হয়। বেনেডিক্ট, ফেলিংগ প্রভৃতি বিজারণধর্মী পরীক্ষার সাহায্যে প্রস্রাবে গ্লুকোজের উপস্থিতি ধরা পড়ে। দুটো অবস্থায় গ্লুকোসুরিয়া

উদ্ভব হতে পারে ঃ (1) হাইপারগ্লাইসেমিয়া এবং (2) বৃক্কনালীর গ্লুকোজ পুনর্বিশোষণের ক্ষমতার হ্রাস।

হাইপারগ্লাইসেমিয়াজাত গ্লুকোসুরিয়া বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায়। যেমন, (1) অধিক শর্করাজাতীয় খাদ্যগ্রহণে কারো গ্লুকোসুরিয়া দেখা দেয় (পৌষ্টিক গ্লুকোসুরিয়া), (ii) যকৃদ্‌গামী স্বতন্ত্র-স্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে গ্লাইকোজেন অধিক পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হয় ও গ্লুকোসুরিয়া দেখা দেয় (স্নায়ুজ গ্লুকোসুরিয়া), (iii) স্নায়ুতন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি হলে গ্লুকোসুরিয়া দেখা দিতে পারে (পিকারের গ্লুকোসুরিয়া), (iv) অগ্ন্যাশয়ের বিটা-কোষের ইন্‌সুলিন-ক্ষরণে বিপর্যয় দেখা দিলে (মধুমেহ) বা থাইরোয়েড, অ্যাড্‌রেন্যাল গ্রন্থি, সম্মুখ পিটুইটারী প্রভৃতির সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে গ্লুকোসুরিয়া দেখা দেয় (অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিজাত গ্লুকোসুরিয়া)।

অপরপক্ষে বৃক্করোগ বা অন্যান্য কোন অবস্থায় বৃক্কসঞ্জাত গ্লুকোসুরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে।

2. **হাইপোগ্লাইসেমিয়া** (Hypoglycemia) ঃ রক্তে শর্করার স্বাভাবিক পরিমাণ (80 মিলিগ্রাম/100 মিলিলিটার) হ্রাস পেয়ে প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে 70 থেকে 50 মিলিগ্রামে নেমে এলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলা হয়। এই অবস্থায় হাইপোগ্লাইসেমিয়ার বিভিন্ন উপসর্গ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। স্নায়ুকোষ প্রথমে আক্রান্ত হয়, কারণ স্নায়ুকোষে খাদ্যবস্তু খুব কম পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। জৈব শক্তির উৎস হিসাবে তারা তাই রক্তশর্করার ওপর নির্ভর করে।

হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় যে সব উপসর্গ দেখা দেয় তার মধ্যে প্রধান ক্লান্তি, দৌর্বল্য, ক্ষুধার অনুভূতি, উৎকণ্ঠা ক্রোধপ্রবণতা, মাতলামো ইত্যাদি। এ ছাড়া কম্পন, বাহনিয়ামক বিপর্যয় অর্থাৎ চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠা, শীত-কাঁপুনি ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে মস্তিষ্কবিকৃতি, তন্দ্রালুতা, স্নায়বিক আক্ষেপ (convulsion), নিদ্রার অভাব ইত্যাদি দেখা যায়। গ্লুকোজের ইন্‌জেক্‌শনে এই অবস্থার উন্নতি ঘটে।

গ্লাইকোলাইসিস

Glycolysis

গ্লাইকোজ (glycos = শর্করা) ও লাইসিস (lysis = ভাংগা) এই দুটো গ্রীক শব্দ থেকে গ্লাইকোলাইসিসের উৎপত্তি। **গ্লাইকোলাইসিস হল এমন**

একটি বিক্রিয়ার পর্যায়ক্রম যার মাধ্যমে গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন-একক পাইরুভিক্ অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় এবং একই সংগে ATP এর উৎপাদন ঘটায়। বায়বীয় প্রাণীতে গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন থেকে শক্তি উৎপাদনকারী পদ্ধতির প্রারম্ভে আছে গ্লাইকোলাইসিস, এরপরই সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র ও ইলেকট্রোন পরিবহন চেনের অবস্থান। গ্লাইকোলাইসিস সাইটোসোলে (cytosol) এবং সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র মাইটোকনড্রিয়াতে সংঘটিত হয় (7-8 নং চিত্র)। এই দুটো পদ্ধতি সম্মিলিত ভাবে গ্লুকোজ থেকে সর্বাধিক সংখ্যক ATP উৎপন্ন করতে পারে। বায়বীয় অবস্থায় পাইরুভিক অ্যাসিড মাইটোকনড্রিয়াতে প্রবেশ
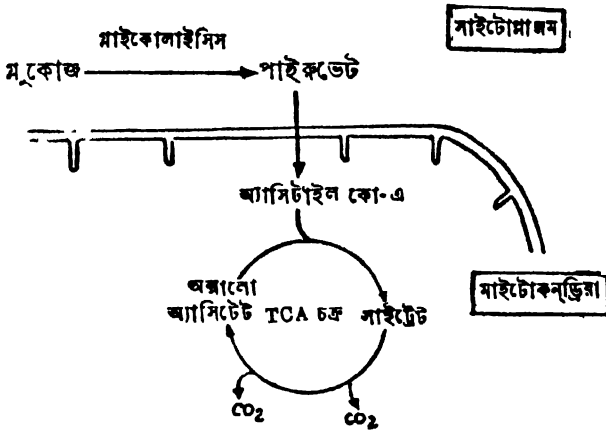
7-8 নং চিত্র : গ্লাইকোলাইসিস ও সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের সংঘটন স্থান।

করে এবং সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে। অক্সিজেনের উপস্থিতি যথেষ্ট কম হলে পাইরুভিক অ্যাসিড ক্রিয়ারত পেশীতে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। উপরিউক্ত দুটো পদ্ধতিই কার্বোহাইড্রেটের বিপাকের সার্বিক বা সনাতন (universal) পদ্ধতিরূপে স্বীকৃত।

গ্লাইকোলাইসিসের পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়াপথ সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কৃত হয় 1940 সালে। এই কাজে যে সব বৈজ্ঞানিকের অবদান সবচেয়ে বেশী তাদের মধ্যে প্রধান : গাসটাভ এম্বডেন (Gustav Embden), কার্ল নিউবার্গ (Carl Neuberg), জ্যাকোব পারনাস (Jacob Parnus), ওটো ওয়ারবুর্গ (Otto Warburg), গারটি কোরি (Gerty Cori) এবং কার্ল কোরি (Carl Cori)। গ্লাইকোলাইসিসকে কখনও কখনও এম্বডেনমেয়ার হোফ বিক্রিয়াপথ (Embden-Meyerhof pathway) বলা হয়।

1. **গ্লাইকোলাইসিসে বিক্রিয়ার ধরণ** (Kinds of reactions in glycolysis) : গ্লাইকোলাইসিসের 10টি বিক্রিয়া সাইটোসোলে সংঘটিত হয় এবং উৎপন্ন অন্তর্বর্তী পদার্থে 6টি বা 3টি কার্বন থাকে। ছটি কার্বন সম্পন্ন পদার্থ হল : গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজের লব্ধ পদার্থ। তিনটি কার্বন এককের মধ্যে প্রধান : ডাইহাইড্রোক্সিঅ্যাসিটোন, গ্লিসারালডেহাইড, গ্লিসারেট ও পাইরুভেটের লব্ধ পদার্থ (derivatives)। গ্লাইকোলাইসিসের এসব অন্তর্বর্তী পদার্থ ফসফরাস যুক্ত হয় এবং ফসফোরীল গ্রুপ এসব পদার্থে এস্টার বা অ্যানহাইড্রাইড (anhydride) যোজক হিসাবে অবস্থান করে।

গ্লাইকোলাইসিসে নিম্ন ধরনের বিক্রিয়া দেখা যায় :

(a) **ফসফোরীল স্থানান্তর** (Phosphoryl transfer) : ATP থেকে ফসফোরীল গ্রুপ অন্তর্বর্তী পদার্থে স্থানান্তরিত হয়।

(b) **ফসফোরীল** বদল (Phosphoryl shift) : পদার্থের একই অণুর অক্সিজেন থেকে অন্য অক্সিজেনে ফসফোরীল গ্রুপ বদল হয়।

(c) **অ্যাইসোমারাইজেশন** (Isomerization) : এক্ষেত্রে একটি কিটোজ একটি অ্যালডোজে বা একটি অ্যালডোজ একটি কিটোজে পরিণত হয়।

(d) **ডিহাইড্রেশন** (Dehydration) : এক অণু জল বিক্রিয়ার সময় নিষ্ক্রান্ত হয়।

(e) **অ্যালডোজ বিচ্ছেদ** (Aldose cleavage) : কার্বন-কার্বন বণ্ড ভেংগে যায়।

2. **এনজাইম ও বিক্রিয়াসমূহ** (Enzymes and Reactions) : গ্লাইকোলাইসিসের পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়াসমূহ নিম্নরূপ :

2(a). **গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ-6-ফসফেট উৎপাদন** (Formation of glucose-6-P from glucose) : প্রথম বিক্রিয়ায় গ্লুকোজ ATP-এর দ্বারা ফসফোরাসযুক্ত হয়ে গ্লুকোজ-6-ফসফেট উৎপন্ন করে। গ্লুকোজের 6-C এর হাইড্রোক্সিল গ্রুপে ATP থেকে ফসফোরীল গ্রুপের স্থানান্তর **হেক্সোকাইনেজ** (hexokinase) এনজাইমের দ্বারা পরিচালিত হয়।

$$\text{গ্লুকোজ} + ATP \xrightarrow{Mg^{++}} \text{গ্লুকোজ-6-ফসফেট} + ADP$$
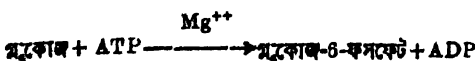
হেক্সোকাইনেজের সক্রিয়তার জন্য Mg^{++} বা Mn^{++} উপস্থিতি আবশ্যক। **গ্লুকোকাইনেজও** (glucokinase) এই বিক্রিয়াকে পরিচালিত করতে পারে। এই দুটো এনজাইমই আলাদা। হেক্সোকাইনেজ গ্লাইকোলাইসিসে অংশগ্রহণ করে। অপরপক্ষে গ্লুকোকাইনেজ গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন উৎপাদনের সংগে জড়িত।

এই বিক্রিয়াটি একমুখী। পশ্চাৎ-মুখী বিক্রিয়ায় পৃথক এনজাইম **গ্লুকোজ-6-ফসফাটেজ** অনুঘটনক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

2(b). **গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে ফ্রাকটোজ 6-ফসফেট** উৎপাদন (Formation of fructose 6-phosphate from glucose-6-phosphate) : গ্লাইকোলাইসিসের পরবর্তী ধাপে গ্লুকোজ-6-ফসফেট অ্যাইসোমারাইজেশনের দ্বারা ফ্রাকটোজ-6-ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অ্যালডোজ কিটোজে পরিণত হয়। **ফসফোগ্লুকোজ আইসোমারেজ** (Phosphoglucose isomerase) এই বিক্রিয়া পরিচালনা করে।

গ্লুকোজ 6-ফসফেট ⇌ ফ্রাকটোজ-6-ফসফেট
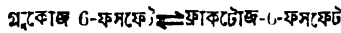
গ্লাইকোজেন থেকেও **ফসফোরিলেজ** ও **ফসফোগ্লুকোমিউটেজ** এনজাইমের দ্বারা গ্লাইকোজেন পর্যায়ক্রমে গ্লুকোজ-1-ফসফেট ও গ্লুকোজ-6-ফসফেটে রূপান্তরিত হয় এবং পরিশেষে ফ্রাকটোজ-6-ফসফেটে রূপান্তরিত হয়।

গ্লাইকোজেন ⇌ গ্লুকোজ 1-ফসফেট ⇌ গ্লুকোজ-6 ফসফেট ⇌ ফ্রাকটোজ-6 ফসফেট
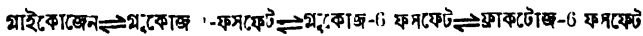
2(c). **ফ্রাকটোজ 6 ফসফেট থেকে ফ্রাকটোজ-1, 6-ডাইফসফেট উৎপাদন** (Formation of fructose 1, 6-diphosphate from glucose-6-Phosphate) : ফ্রাকটোজ-6-ফসফেট ATP এর দ্বারা পুনরায় ফসফরাসযুক্ত ফ্রাকটোজ হয়ে 1, 6-ডাইফসফেটে পরিণত হয়। **ফসফোফ্রুকটোকাইনেজ** নামক অ্যালোস্টারিক এনজাইমের দ্বারা এই বিক্রিয়া অনুঘটিত হয়। গ্লাইকোলাইসিসে এই বিক্রিয়াটিও একটি সীমিত বিক্রিয়াহারের ধাপ (rate limiting step) হিসাবে চিহ্নিত, কারণ এই ধাপের এনজাইমের সক্রিয়তা ATP এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ফ্রাকটোজ 6-ফসফেট + ATP → ফ্রাকটোজ 1, 6 ডাইফসফেট + ADP
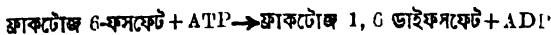
এই বিক্রিয়াটিও একমুখী। এনজাইম ফ্রাকটোজ 1, 6-ডাইফসফাটেজের দ্বারা বিক্রিয়াটি পশ্চাৎমুখে পরিচালিত হয়।

2(d). **গ্লিসারালডেহাইড 3 ফসফেটের উৎপাদন** (Formation of glyceraldehyde-3-Phosphate) : গ্লাইকোলাইসিসের এই ধাপে ফ্রাকটোজ 1, 6-ডাইফসফেট বিশ্লিষ্ট হয়ে গ্লিসারালডেহাইড 3-ফসফেট এবং ডাইহাইড্রোক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট উৎপন্ন করে। দুটিই তিনটি কার্বনসম্পন্ন পদার্থ। এনজাইম **ফ্রাকটোঅ্যালডোলেজ** এই বিক্রিয়া উভয়মুখে পরিচালনা করে।

গ্লিসারালডেহাইড 3-ফসফেট গ্লাইকোলাইসিসের প্রত্যক্ষ বিক্রিয়াপথে অবস্থান করে। কিন্তু ডাইহাইড্রোক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট সরাসরি বিক্রিয়াপথে অবস্থান করে না। তবে ডাইহাইড্রোক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট সহজেই গ্লিসারাল-ডেহাইড অ্যাসিটোন ফসফেটে রূপান্তরিত হতে পারে। উভয়েই আইসোমার। ডাইহাইডোক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট একটি কিটোজ এবং গ্লিসারালডেহাইড-3 ফসফেট একটি অ্যালডোজ। **ট্রায়োজ ফসফেট আইসোমারেজ** (triose phosphate isomerase) ফসফরাসযুক্ত তিনটি কার্বনসম্পন্ন এই দুটো পদার্থকে খুব দ্রুত রূপান্তরিত করতে পারে।

ফ্রাকটোজ 1, 6-ডাইফসফেট → গ্লিসারালডেহাইড 3-ফসফেট
⇅
→ ডাইহাইড্রোক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট
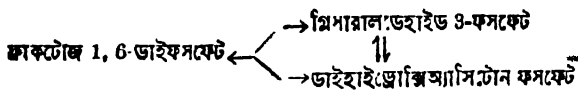
2(e). **গ্লিসারালডেহাইড 3-ফসফেট থেকে 1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারেটের উৎপাদন** (Formation of 1, 3-diphosphoglycerate from glyceraldehyde 3-phosphate) : এই ধাপে গ্লিসারালডেহাইড-3 ফসফেট জারিত হয়ে 1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারেট (1, 3-DPG) উৎপন্ন করে। **গ্লিসারালডেহাইড 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ** এই বিক্রিয়ার সংঘটনে এনজাইম হিসাবে কাজ করে। এনজাইমটির সক্রিয়তা NAD-নির্ভর।

গ্লিসারালডেহাইড 3-ফসফেট $+ NAD^{+} + P \rightleftharpoons$ 1, 3-DPG $+ NADH + H^{+}$
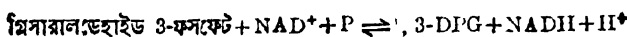
এই জারণবিজারণ বিক্রিয়ায় উচ্চশক্তিসম্পন্ন যোগ (1, 3-DPG) উৎপন্ন হয়। C_1-এর অ্যালডেহাইড গ্রুপ অ্যাসাইল ফসফেট (acyl phosphate) রূপান্তরিত হয় যা ফসফোরিক অ্যাসিড ও কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের একটি **মিশ্র অ্যানহাইড্রাইড** (mixed anhydride).

2 (f). 1, 3 ডাইফসফোগ্লিসারেট থেকে 3-ফসফোগ্লিসারেট উৎপাদন (Formation of 3-phosphoglycerate from 1, 3-diphosphoglycerate) : গ্লাইকোলাইসিসের পরবর্তী ধাপে 1, 3-DPG এ নিহিত উচ্চশক্তি-সম্পন্ন বণ্ড ATP উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। **ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ** (phosphoglycerate kinase) 1, 3-DPG এর অ্যাসাইল ফসফেট ফসফোরিল গ্রুপকে ADP-তে স্থানান্তরিত করে, ফলে ATP এবং 3-ফসফোগ্লিসারেট উৎপন্ন হয় :

$$1, 3\text{-DPG} + \text{ADP} \rightleftharpoons 3 \text{ ফসফোগ্লিসারেট} + \text{ATP}$$
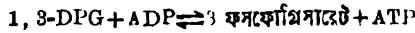
প্রতিটি গ্লুকোজ অণু থেকে যেহেতু দুটো ট্রায়োজ উৎপন্ন হয় সেহেতু এই ধাপে দুটো ATP অণু উৎপন্ন হয়।

2(g). 3-ফসফোগ্লিসারেট থেকে 2-ফসফোগ্লিসারেটের উৎপাদন (Formation of 2-phosphoglycerate from 3-phosphoglycerate) : উপরের বিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন 3-ফসফোগ্লিসারেট এরপর **ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ** (phosphoglycerate mutase) এনজাইমের উপস্থিতিতে 2-ফসফোগ্লিসারেটে রূপান্তরিত হয়। সম্ভবত 2, 3-বাইফসফোগ্লিসারেট এই বিক্রিয়ায় একটি অন্তর্বর্তী যৌগ হিসাবে উৎপন্ন হয় :

$$3\text{-ফসফোগ্লিসারেট} \rightleftharpoons 2\text{-ফসফোগ্লিসারেট}$$
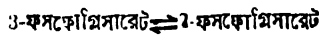
2(h). 2 ফসফোগ্লিসারেট থেকে ফসফোএনোল পাইরুভেট উৎপাদন (Formation of phosphoenol pyruvate from 2-phosphoglycerate) : এনজাইম **এনোলেজের** (enolase) উপস্থিতিতে 2 ফসফোগ্লিসারেটের নিরুদন বা ডিহাইড্রেশন হয়। ফলে এক অণু H_2O নির্গত হওয়ার পদার্থটি ফসফোএনোল পাইরুভেটে রূপান্তরিত হয় এবং C-2 এর ফসফেট উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বণ্ডে পরিণত হয়। এনোলেজের সক্রিয়তা Mg^{++} বা Mn^{++} আয়নের উপর নির্ভরশীল।

$$2\text{-ফসফোগ্লিসারেট} \rightleftharpoons \text{ফসফোএনোল পাইরুভেট} + H_2O$$
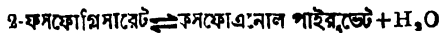
2 (i). ফসফোএনোলপাইরুভেট থেকে পাইরুভেট উৎপাদন (Formation of pyruvate from phosphoenol pyruvate) : এনজাইম **পাইরুভেট কাইনেজের** উপস্থিতিতে ফসফোএনোল পাইরুভেটের উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ফসফেট বণ্ড ADP-তে স্থানান্তরিত হয়। ফলে প্রতিটি গ্লুকোজের জারণ থেকে 2ATP উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়া থেকে অন্তর্বর্তী যোগ হিসাবে যে

এনোলপাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপান্তরিত হয়ে কিটোধর্মী পাইরুভেটে পরিণত হয়।

ফসফোএনোলপাইরুভেট + ADP ⇌ পাইরুভেট + ATP
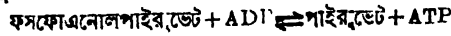
2 (j). **অবায়বীয় অবস্থায় পাইরুভেটের পরিণতি** (Fate of pyruvate in anaerobic condition) : পাইরুভেটের পরিণতি এরপর কি হবে তা নির্ভর করে কলাকোষের জারণ বিজারণ অবস্থার (redox state) উপর।
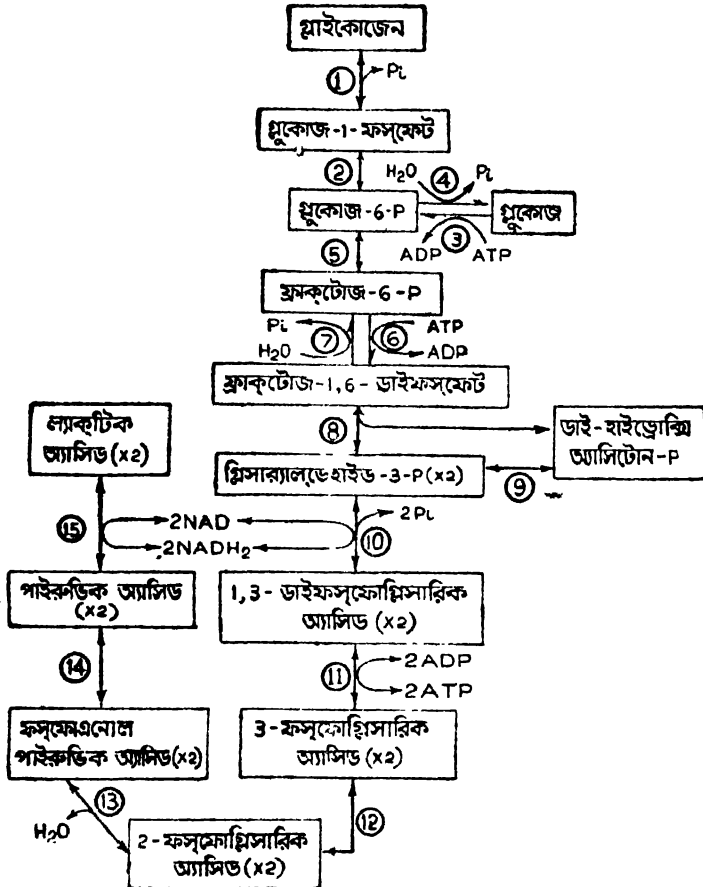
7-৫নং চিত্র : গ্লাইকোলাইসিস।

1-ফসফোরিলেজ, 2-ফসফোগ্লুকোমিউটেজ, 3-হেক্সোকাইনেজ, 4-গ্লুকোজ ফসফাটেজ, 5-ফসফোহেক্সোআইসোমারেজ, 6-ফসফোফ্রাকটোকাইনেজ, 7-ফ্রাকটোজ 1, 6 ডাই-ফসফাটেজ, 8-অ্যালডোলেজ, 9-ট্রায়োজ আইসোমারেজ, 10-গ্লিসারালডেহাইড 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ, 11-ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ, 12-ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ, 13-এনোলেজ, 14-পাইরুভেট কাইনেজ, 15-ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেজ।

অবায়বীয় অবস্থায় ইলেকট্রোন পরিবহন চেনের মাধ্যমে অক্সিজেনে হাইড্রাইড (H^-) স্থানান্তরের দ্বারা NADH কে পুনরায় জারিত করা সম্ভব হয় না, ফলে পাইরুভেট NADH দ্বারা বিজারিত হয়ে ল্যাকটেটে পরিণত হয়। **ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেজ** এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

$$\text{পাইরুভেট} + NADH + H^+ \rightleftharpoons \text{ল্যাকটেট} + NAD^+$$
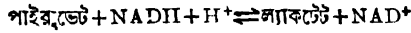
ল্যাকটেট উৎপাদনের মাধ্যমে NADH এর যে পুনর্জারণ (reoxidation) হয় তার ফলে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতেও গ্লাইকোলাসিস চলতে পারে। তবে লোহিতকণিকাতে অক্সিজেনের উপস্থিতিতেও ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, কারণ লোহিতকণিকায় মাইটোকনড্রিয়া নেই, তাই পাইরুভেটের বায়বীয় জারণের প্রয়োজনীয় এনজাইম থাকে না। স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিতকণিকার মোট শক্তি চাহিদার 90%ই আসে গ্লাইকোলাইসিস থেকে।

3. **গ্লাইকোলাইসিসের সীমিত বিক্রিয়াহারের ধাপ** (Rate limiting steps of glycolysis) **:** গ্লাইকোলাইসিসের অধিকাংশ বিক্রিয়াই বিপরীত মুখী। এদের মধ্যে তিনটি বিক্রিয়া শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় বিপরীত মুখী নয়, এসব অবস্থানে বিক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এদের তাই সীমিত বিক্রিয়াহারের ধাপ বলা হয়। এই তিনটি ধাপ হল :

(1) $\text{গ্লুকোজ} + ATP \xrightarrow{\text{হেক্সোকাইনেজ}} \text{গ্লুকোজ 6-ফসফেট} + ADP$

(2) $\text{ফ্রাকটোজ 6-ফসফেট} + ATP \xrightarrow{\text{ফসফোফ্রাকটোকাইনেজ}} \text{ফ্রাকটোজ 1, 6-ডাইফসফেট} + ADP$

(3) $\text{ফসফোএনোল পাইরুভেট} + ADP \xrightarrow{\text{পাইরুভেট কাইনেজ}} \text{পাইরুভেট} + ATP$
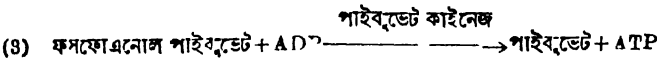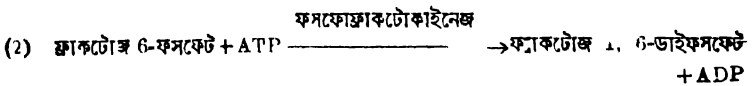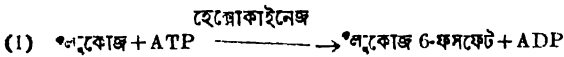
এদের মধ্যে ফসফোফ্রাকটোকাইনেজের সক্রিয়তাই প্রধানত গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াহারের নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী। এই অ্যালোস্টেরিক এনজাইমের সক্রিয়তা ADP ও AMP এর উপস্থিতিতে উদ্দীপিত হয় এবং ATP ও সাইট্রেটের উপস্থিতিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

4. **গ্লাইকোলাইসিসে শক্তির উৎপাদন** (Energy yield in glycolysis) **:** এম্বডেন মেয়ারহোফ পর্যায়ক্রমের বায়বীয় ও অবায়বীয় পদ্ধতিতে উৎপন্ন জৈবশক্তির (ATP) হিসাব 3নং তালিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে প্রতিটি NADH ইলেকট্রন পরিবহন চেনের মাধ্যমে 2টি করে ATP

উৎপন্ন করে কারণ গ্লিসারল 3 ফসফেটের মাধ্যমে এর ইলেকট্রন E-FAD এর দ্বারা CoQ স্থানে প্রবেশ করে। অন্য সব ATP সাবস্ট্রেট-পর্যায়ের জারণ থেকে উৎপন্ন হয়। একটি ATP থেকে প্রায় 10-12 Kcal শক্তি উৎপন্ন হয়।

3নং তালিকা : গ্লাইকোলাইসিসে উৎপন্ন জৈবশক্তির হিসাব।

বিক্রিয়ার অনুঘটনকারী এনজাইম	~P উৎপাদনের পদ্ধতি	ATP এর সংখ্যা			
		গ্লাইকোজেন একক		গ্লুকোজ	
		বায়বীয়	অবায়বীয়	বায়বীয়	অবায়বীয়
গ্লিসারাল্ডেহাইড 3-P ডেহাইড্রোজেনেজ	ইলেকট্রন-পরিবহন চেনের মাধ্যমে 2NADH-এর জারণ	4	×		×
3-ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ	সাবস্ট্রেট পর্যায়ে জারণ	2	2	2	2
পাইরুভেট কাইনেজ	সাবস্ট্রেট পর্যায়ে জারণ	2	2	2	2
	মোট সংখ্যা	8	4	8	4
হেক্সোকাইনেজ এবং/বা ফ্রাক্টোকাইনেজের অনুঘটিত বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত ATP এর সংখ্যা		1	1	2	2
	মোট লাভ	7	3	6	2
	ক্যালরিসম (ATP × 10000)	70000	30000	60000	20000

পাইরুভিক অ্যাসিডের অ্যাসিটাইল কো-এতে জারণ

Oxidation of Pyruvic Acid to Acetyl CoA

জারণধর্মী কার্বনডাইঅক্সাইডবিযুক্তির (oxidative decarboxylation) মাধ্যমে পাইরুভেট অ্যাসিটাইল কো-এতে রূপান্তরিত হয়। এই বিক্রিয়া মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে সংগঠিত হয় এবং গ্লাইকোলাইসিস ও সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে :

পাইরুভেট + CoA + NAD^+ → অ্যাসিটাইল কো-এ + CO_2 + NADH

একমুখী এই বিক্রিয়াটি **পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেজ কমপ্লেক্স** এনজাইমের দ্বারা অনুঘটিত হয়। এই বৃহদাকৃতি এনজাইমটি তিনধরণের এনজাইমের সমন্বয়ে গঠিত (4নং তালিকা)। বিক্রিয়াটিও বেশ জটিল। এই বিক্রিয়ায় 6টি কো-ফ্যাক্টরও প্রয়োজন হয় এবং বিক্রিয়াটি 4টি ধাপে সংঘটিত হয়। 6টি ফ্যাক্টর হল: CoA, NAD^+, Mg^{++}, TPP, FAD এবং লাইপোঅ্যামাইড (lipoamide)।

4 নং তালিকা : ই. কোলির পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেজ কমপ্লেক্স।

এনজাইম	চেনসংখ্যা	প্রোসথেটিক গ্রুপ	অনুঘটিত বিক্রিয়া
পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেজ কমপোনেন্ট (A)	24	TPP	পাইরুভেটের CO_2 বিযুক্তি
ডাইহাইড্রোলাইপোইল ট্রান্স-অ্যাসিটাইলেজ (B)	24	লাইপোঅ্যামাইড	C_2 এককের জারণ ও CoA-এর হস্তান্তর
ডাইহাইড্রোলাইপোইল ডিহাইড্রোজেনেজ (C)	12	FAD	লাইপোঅ্যামাইডের পুনর্জারণ

বিক্রিয়ার চারটি ধাপ নিম্নরূপ:

1. পাইরুভেট + TPP → হাইড্রক্সি ইথাইল TPP + CO_2
2. হাইড্রক্সি ইথাইল-TPP + লাইপোঅ্যামাইড → TPP (আয়নিত) + অ্যাসিটাইল-লাইপোঅ্যামাইড
3. অ্যাসিটাইল লাইপোঅ্যামাইড + HS – CoA → অ্যাসিটাইল কো-এ + ডাইহাইড্রো-লাইপোঅ্যামাইড
4. ডাইহাইড্রোলাইপোঅ্যামাইড + NAD^+ → লাইপোঅ্যামাইড + NADH + H^+

প্রথম বিক্রিয়ায় থায়ামিন পাইরোফসফেট (TPP) পাইরুভেটের সংগে যুক্ত হয়ে হাইড্রক্সিইথাইল-TPP ও CO_2 উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াকে তাই **ডিকার্বক্সিলেশন** (decarboxylation) বা কার্বনডাইঅক্সাইড বিযুক্তি নামে অভিহিত করা হয়। কমপ্লেক্স এনজাইমের **পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেজ কমপোনেন্ট** (A) (Pyruvate dehydrogenase Component) এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

দ্বিতীয় বিক্রিয়ায় TPP-তে যুক্ত হাইড্রক্সিইথাইল গ্রুপ অ্যাসিটাইল গ্রুপে জারিত হয় এবং তখনই লাইপোঅ্যামাইডে স্থানান্তরিত হয়, ফলে আয়নিত TPP (TPP কার্বানিয়ন) এবং অ্যাসিটাইললাইপো অ্যামাইড (acetyl lipoamide) উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি কমপ্লেক্স এনজাইমের **ডাইহাইড্রোলাইপোইল ট্রান্স-**

অ্যাসিটাইলেজ (dihydrolipoyl transacetylase) অংশের দ্বারা অনুঘটিত হয়।

বিক্রিয়ার তৃতীয় ধাপে অ্যাসিটাইললাইপোঅ্যামাইড থেকে অ্যাসিটাইল গ্রুপ কোএনজাইম A-তে (CoA) স্থানান্তরিত হয়, ফলে অ্যাসিটাইল কো-এ (acetyl CoA) উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াটি **ডাইহাইড্রোলাইপোইল ট্রান্স-অ্যাসিটাইলেজ** (dihydrolipoyl transacetylase) এনজাইমের দ্বারা পরিচালিত হয়। অ্যাসিটাইল গ্রুপ যখন CoA তে স্থানান্তরিত হয় তখন উচ্চশক্তিসম্পন্ন থায়োএস্টার (thioester) বণ্ড ডাইহাইড্রোলাইপোঅ্যামাইডে (dihydrolipoamide) থেকে যায়।

বিক্রিয়ার চতুর্থধাপে লাইপোঅ্যামাইডের জারিত অবস্থা পুনরায় ফিরে আসে। বিক্রিয়াটি কম্‌প্লেক্স এনজাইমের **ডাইহাইড্রোলাইপোইল ডিহাইড্রোজেনেজ** (dihydrolipoyl dehydrogenase) অংশের দ্বারা অনুঘটিত হয়। FAD এই এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসাবে কাজ করে এবং NAD^+ জারক (oxidant) পদার্থ হিসাবে এই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র
Citric Acid Cycle

বায়বীয় অবস্থায় গ্লাইকোলাইসিসের পর শক্তি-উৎপাদনের পরবর্তী ধাপ হল পাইরুভেটের অ্যাসিটাইল কো এ-তে রূপান্তর। সক্রিয় অ্যাসিটেট এরপর যেসব পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে CO_2-এ জারিত হয় তাকে **সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র** (citric acid cycle) বলা হয়। সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রকে **ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র** (tricarboxylic acid cycle) বা **ক্রেবস চক্র**ও (Krebs cycle) বলা হয়। সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র **অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও কার্বোহাইড্রেটের জারণের সর্বশেষ সাধারণ বিক্রিয়াপথ**। অধিকাংশ অণুই অ্যাসিটাইল কো-এর মাধ্যমে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে প্রবেশ করে। সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের বিক্রিয়াসমূহ মাইটোকনড্রিয়ায় সংঘটিত হয়।

একনজরে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র
An Overview of the Citric Acid cycle

7-10নং চিত্রে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের একটি পূর্ণাংগ নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। একটি 4-কার্বনযুক্ত যৌগপদার্থ (অক্সালোঅ্যাসিটেট) 2-কার্বনযুক্ত

অ্যাসিটাইল কো-এর সংগে যুক্ত হয়ে 6-কার্বনযুক্ত ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড (সাইট্রেট) উৎপন্ন করে। এরপর সাইট্রিক অ্যাসিডের একটি আইসোমার একই সংগে জারিত ও এবং CO_2-বিযুক্ত হয়। ফলে 5-কার্বনযুক্ত যৌগ (α-কিটো-গ্লুটারেট) উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত পদার্থটি পুনরায় জারিত ও CO_2-বিযুক্ত হয় এবং 4-কার্বনযুক্ত পদার্থ (সাকসিনেট) উৎপন্ন হয়। সাকসিনেট পুনরায় অক্সালেট উৎপন্ন করে। দুটো কার্বন পরমাণু অ্যাসিটাইল একক হিসাবে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে প্রবেশ করে এবং দুটো কার্বনপরমাণু CO_2 হিসাবে চক্র থেকে নির্গত হয়। যেহেতু অ্যাসিটাইলগ্রুপের চেয়ে CO_2 এর জারণ অধিকতর বেশী সেহেতু
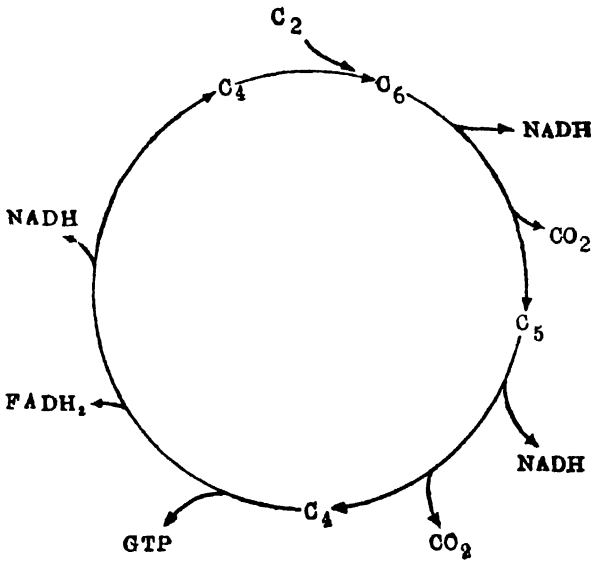
7-10 নং চিত্র : সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের একটি পূর্ণাংগ চিত্র

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে অবশ্যই কিছু জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া থাকতে হবে। কতুত এধরণের চারটি বিক্রিয়া রয়েছে। তিনটি হাইড্রাইড আয়ন (অতএব 6টি ইলেকট্রন) NAD^+ তে স্থানান্তরিত হয় অপরপক্ষে একজোড়া হাইড্রোজেন আয়ন (অতএব 2টো ইলেকট্রন) ফ্লেভিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইডে (FAD) স্থানান্তরিত হয়। এসব ইলেকট্রন পরিবাহক যখন ইলেকট্রন পরিবহন চেনে O_2-এর দ্বারা জারিত হয় তখন 11টি ATP উৎপন্ন করে। এছাড়া প্রতি সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে আরও একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বণ্ড (GTP এর মাধ্যমে) উৎপন্ন হয়।

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের বিক্রিয়াসমূহ
Reactions of Citric Acid Cycle

সাইট্রিক অ্যাসিডচক্রের বিক্রিয়াসমূহ সঠিক এনজাইমের উপস্থিতিতে নিম্নলিখিতভাবে সম্পন্ন হয় :

1. **সাইট্রেটের উৎপাদন** (Formation of citrate) : সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র শুরু হয় সাইট্রেট উৎপাদনের মাধ্যমে। চার-কার্বনসম্পন্ন অক্সালোঅ্যাসিটেট 2-কার্বন একক অ্যাসিটাল কো-এ ও H_2O এর সংগে বিক্রিয়া করে সাইট্রেট ও CoA উৎপন্ন করে।

$$\underset{\text{অক্সালো অ্যাসিটেট}}{\begin{array}{l} O{=}C-COO^- \\ \quad | \\ H_2C-COO^- \end{array}} + \underset{\text{অ্যাসিটাইল কো-এ}}{\begin{array}{c} O \\ \| \\ C-CH_3 \\ | \\ S-CoA \end{array}} + H_2O \rightarrow \underset{\text{সাইট্রেট}}{\begin{array}{c} CH_2-COO^- \\ | \\ HO-C-COO^- \\ | \\ CH_2-COO^- \end{array}} + HS-CoA + H^+$$
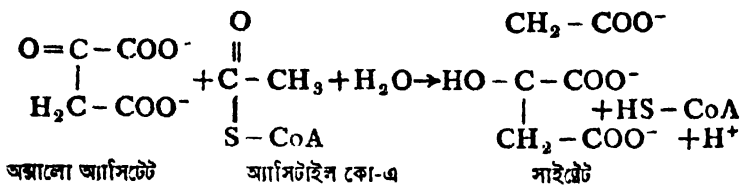
এনজাইম সাইট্রেট সিনথেটেজ (আগে কনডেন্সিং এনজাইম বলা হত) এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। বিক্রিয়াটি দুটো ধাপে সংঘটিত হয়। অক্সালোঅ্যাসিটেট প্রথমে অ্যাসিটাইল কো-এর সংগে মিলিত হয়ে সাইট্রিল কো-এ (citryl CoA) উৎপন্ন করে যা আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হয়ে সাইট্রেট ও CoA উৎপন্ন করে।

2. **সাইট্রেট থেকে আইসোসাইট্রেট উৎপাদন** (Formation of isocitrate from citrate) : সাইট্রেট এরপর আইসোমারাইজেশনের মাধ্যমে আইসোসাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে **ডিহাইড্রেশন** (dehydration) এবং এরপর হাইড্রেশন (hydration) এই দুটো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইসোমারাইজেশন সমাপ্ত হয়। এর ফলে H ও OH আয়ন পরস্পর স্থান পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়। এই উভয় ধাপকে **অ্যাকোনাইটেজ** (aconitase) এনজাইম পরিচালনা করে এবং সিজ-অ্যাকোনাইটেট (cis-aconitate) অন্তর্বর্তী যৌগ হিসাবে উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{সাইট্রেট}}{\begin{array}{c} COO^- \\ | \\ CH_2 \\ | \\ HO-C-COO^- \\ | \\ H-C-H \\ | \\ COO^- \end{array}} \underset{-H_2O}{\rightleftharpoons} \underset{\text{সিজ-অ্যাকোনাইটেট}}{\begin{array}{c} COO^- \\ | \\ CH_2 \\ | \\ C-COO^- \\ \| \\ H-C \\ | \\ COO^- \end{array}} \underset{+H_2O}{\rightleftharpoons} \underset{\text{আইসোসাইট্রেট}}{\begin{array}{c} COO^- \\ | \\ CH_2 \\ | \\ H-C-COO^- \\ | \\ H-C-OH \\ | \\ COO^- \end{array}}$$
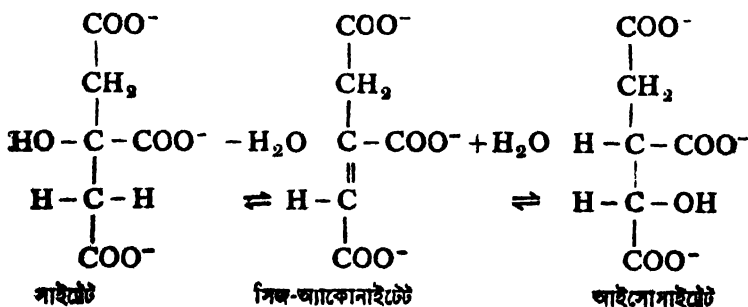
3. **আলফা-কিটোগ্লুটারেট উৎপাদন** (Formation of α-Keto-glutarate): আইসোসাইট্রেট এরপর জারিত ও CO_2-বিযুক্ত হয়ে α-কিটোগ্লুটারেট উৎপাদন করে। বিক্রিয়াটি আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজেনেজ (isocitrate dehydrogenase) এনজাইমের দ্বারা অনুঘটিত হয়।

আইসোসাইট্রেট + $NAD^+ \rightleftharpoons$ α-কিটোগ্লুটারেট + CO_2 + NADH
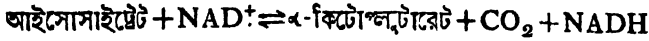
এই বিক্রিয়ার অন্তর্বর্তী যৌগ হিসাবে অক্সালোসাকসিনেট (oxalosuccinate), উৎপন্ন হয় যা দ্রুত CO_2 হারিয়ে α-কিটোগ্লুটারেটে রূপান্তরিত হয়।

$$
\begin{array}{c}
COO^- \\
| \\
CH_2 \\
| \\
H-C-COO^- \\
| \\
H-C-OH \\
| \\
COO^-
\end{array}
+ NAD^+ \rightarrow
\begin{array}{c}
COO^- \\
| \\
CH_2 \\
| \\
H-C-COO^- \\
| \\
C=O \\
| \\
COO^-
\end{array}
+ NADH^+ + H^+
$$

আইসোসাইট্রেট   অক্সালোসাকসিনেট

$$
\begin{array}{c}
COO^- \\
| \\
CH_2 \\
| \\
H-C-COO^- \\
| \\
C=O \\
| \\
COO^-
\end{array}
+ H \rightarrow
\begin{array}{c}
COO^- \\
| \\
CH_2 \\
| \\
H-C-H \\
| \\
C=O \\
| \\
COO^-
\end{array}
$$

অক্সালোসাকসিনেট   α-কিটোগ্লুটারেট
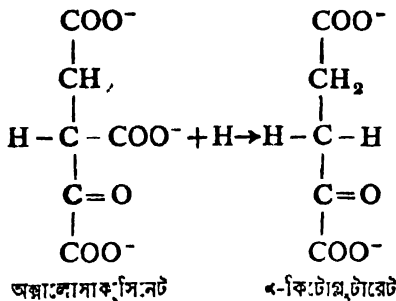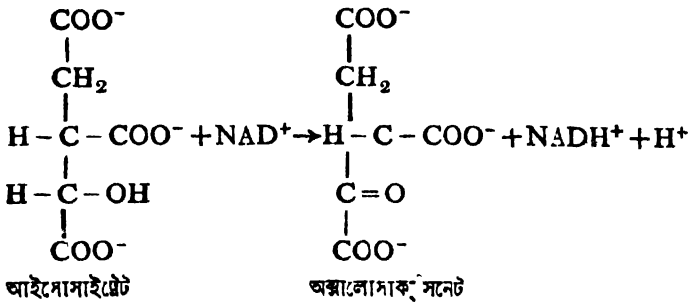
দুধরনের আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজেনেজ পাওয়া গেছে। একটি NAD^+-এর জন্য নির্দিষ্ট, অপরটি $NADP^+$ নির্ভর। মাইটোকনড্রিয়াতে অবস্থানকারী NAD^+-নির্ভর এনজাইমই সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অপরটিকে মাইটোকনড্রিয়া ও সাইটোপ্লাজম এই উভয় স্থানেই পাওয়া যায় এবং তার বিপাকীয় ভূমিকা আলাদা।

4. **সাকসিনিল কো এনজাইম উৎপাদন** (Formation of succinyl coenzyme): দ্বিতীয় বার জারণ ও CO_2-বিযুক্তির মাধ্যমে α-কিটোগ্লুটারেট সাকসিনিল কো-এতে রূপান্তরিত হয়।

α-কিটোগ্লুটারেট + NAD^+ + CoA $\rightleftharpoons$ সাকসিনিল কো এ + CO_2 + NADH

এই বিক্রিয়াটিও পাইরুভেটের মত তিনটি এনজাইমের সমন্বয়ে গঠিত একটি **কমপ্লেক্স** এনজাইমের দ্বারা অনুঘটিত হয়। সম্মিলিত এনজাইমের নাম **α-কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেজ কমপ্লেক্স**। পাইরুভেট যেভাবে অ্যাসিটাইল কো-এ-তে রূপান্তরিত হয়, ঠিক সেভাবেই এই বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রেও একই কো-ফ্যাক্টর ব্যবহৃত হয়: NAD^+, CoA, TPP, লাইপোঅ্যামাইড এবং FAD।

5. **সাক্সিনিল কো-এ থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বন্ড উৎপাদন** (Formation of high-energy phosphate bond from succinyl CoA): কো-এনজাইম A-র সাক্সিনিল থায়োএসটার একটি উচ্চ শক্তি-সম্পন্ন বন্ড। সাক্সিনিল কো-এ-র থায়োএস্টার বণ্ড বিযুক্তির সময় গুয়ানোসিন ডাইফসফেট (GDP) ফসফরাসযুক্ত হয়।

$$\text{সাক্সিনিল কো-এ} + Pi + GDP \rightleftharpoons \text{সাক্সিনেট} + GTP + CoA$$
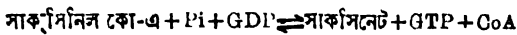
এই বিপরীতমুখী বিক্রিয়াটি **সাক্সিনিল কো-এ সিনথেটেজ** (succinyl CoA synthetase) এনজাইমের দ্বারা পরিচালিত হয়। উৎপন্ন GTP-র ফসফোরীল গ্রুপ সহজে ADP-তে স্থানান্তরিত হয়, ফলে ATP উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত বিক্রিয়াটি **নিউক্লিওটাইড ডাইফসফোকাইনেজ** (nucleotide diphosphokinase) দ্বারা অনুঘটিত হয়।

$$GTP + ADP \rightleftharpoons GDP + ATP.$$

এভাবে সাক্সিনিল কো-এ থেকে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফসফেট বণ্ড উৎপাদন **সাবস্ট্রেটস্তরীয় ফসফরাস সংযুক্তির** (substrate level phosphorylation) একটি উদাহরণ। সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে এটিই হল একমাত্র বিক্রিয়া যা সরাসরি উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফসফেট বণ্ড উৎপন্ন করে।

6. **সাক্সিনেটের জারণ থেকে অক্সালোঅ্যাসিটেটের পুনর্জনন** (Regeneration of oxalosuccinate by oxidation of succinate): সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের শেষ পর্যায় 4-কার্বনযুক্ত পদার্থের বিক্রিয়ার দ্বারা সংঘটিত হয়। তিনটি ধাপে সাক্সিনেট অক্সালোঅ্যাসিটেটে রূপান্তরিত হয়: জারণ, হাইড্রেশন ও দ্বিতীয় বার জারণ।

সাক্সিনেট ডিহাইড্রোজেনেজ (succinate dehydrogenase) এনজাইমের উপস্থিতিতে সাক্সিনিক অ্যাসিড জারিত হয়ে ফিউমারিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। FAD এক্ষেত্রে হাইড্রোজেন গ্রাহক হিসাবে কাজ করে। এই বিক্রিয়ায় মুক্ত শক্তির

পরিবর্তন (Free energy change) যথেষ্ট নয় বলে এক্ষেত্রে NAD^+ বিজারিত হতে পারে না।

$$\text{সাকসিনেট} + FAD \rightleftharpoons \text{ফিউমারেট} + FADH_2$$
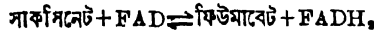
পরবর্তী ধাপে ফিউমারেটের হাইড্রেশন (hydration) বা জলসংযুক্তি থেকে ম্যালেট (malate) উৎপন্ন হয়। **ফিউমারেজ** (fumarase) এনজাইম এই বিক্রিয়া পরিচালনা করে।

$$\text{ফিউমারেট} + H_2O \rightarrow \text{ম্যালেট}$$
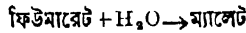
সবশেষে ম্যালেট জারিত হয়ে অক্সালোঅ্যাসিটেট উৎপন্ন করে। **ম্যালেট ডিহাইড্রোজেনেজ** (malate dehydrogenase) এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। NAD^+ এক্ষেত্রেও হাইড্রোজেন গ্রাহক হিসাবে কাজ করে।
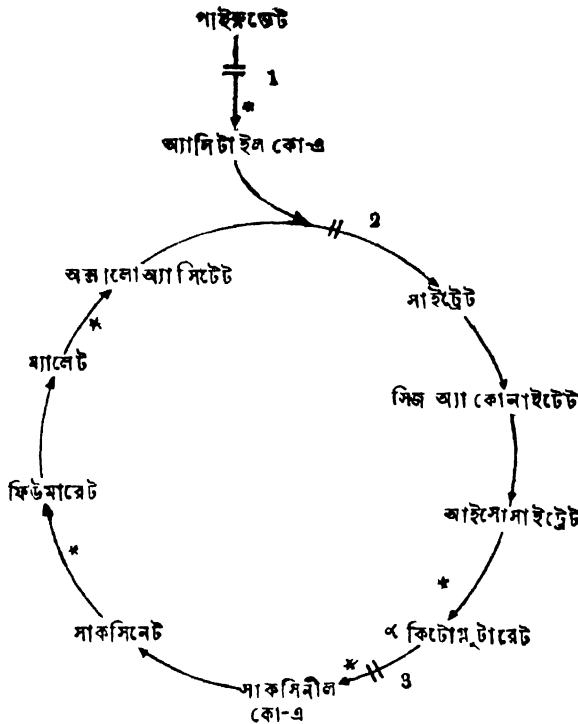
7-11 নং চিত্র : সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র। তারকাচিহ্নিত স্থানে NAD বা FAD ইলেকট্রোনগ্রাহক প্রয়োজন। 1-ATP, NADH ও অ্যাসিটাইল কো-এর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, 2-ATP এর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, 3-সাকসিনীল কো-এ ও NADH-এর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে উৎপন্ন NADH এবং $FADH_2$ ইলেকট্রোন পরিবহন চেনে জারিত হয়। এসব বাহক থেকে ইলেকট্রোন O_2-তে হস্তান্তরিত হলে ATP উৎপন্ন হয়। প্রতিটি NADH থেকে 3টি এবং প্রতিটি $FADH_2$ থেকে 2টি ATP সংশ্লেষিত হয়। সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে একটি ATP সরাসরি উৎপন্ন হয়। বাকী 11টি ATP উৎপন্ন হয় ইলেকট্রোন পরিবহন চেনে NADH ও $FADH_2$-এর জারণ থেকে।

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে এনজাইম রোধক

Enzyme Inhibitors of Citric Acid Cycle

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের এনজাইমের সক্রিয়তায় কিছুসংখ্যক রাসায়নিক পদার্থ বাধা সৃষ্টি করে। এদের **এনজাইম রোধক** (enzyme inhibitors) নামে অভিহিত করা হয়। 5নং তালিকায় ক্রেবসচক্রের এনজাইমসমূহের স্বাভাবিক কার্যে বাধাদানকারী কিছুসংখ্যক রোধকের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

5নং তালিকা ঃ এনজাইম রোধক (TCA চক্র)।

এনজাইম	রোধক
সাইট্রেট সিনথেটেজ	ডাই-নাইট্রোফেনোল
অ্যাকোনাইটেজ	ফ্লুওরোসাইট্রেট
আইসোসাইট্রেট ডেহাইড্রোজেনেজ	2-AMP, অ্যানেরোবায়োসিস (anaerobiosis), ডাইফিনাইল ক্লোরোআরসিন
আইসোসাইট্রেট ডেহাইড্রোজেনেজ	পাইরোফসফেট
সাক্সিনিল কো এ সিনথেটেজ	আরসেনাইট
সাক্সিনেট ডেহাইড্রোজেনেজ	ম্যালোনেট ইথাইল আয়োডোঅ্যাসিটেট
ফিউমারেজ	থায়োসায়ানেট, আয়োডাইড
ম্যালেট ডেহাইড্রোজেনেজ	অক্সালোঅ্যাসিটেট,

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে শক্তি উৎপাদন
Energy Production in Citric Acid Cycle

একটি গ্লাইকোজেন-একক বা একটি গ্লুকোজ অণু সক্রিয় অ্যাসিটেট হিসাবে সাইট্রিক অ্যাসিডচক্রে প্রবেশ করার পূর্বে ও পরে বায়বীয় পদ্ধতিতে যত সংখ্যক ATP উৎপন্ন করে, তার হিসাব 6নং তালিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। সাইট্রিক-অ্যাসিড-চক্রের সংগে জড়িত এনজাইমসমূহ এবং ইলেকট্রন পরিবহন চেনের সাহায্যে মাইটোকন্ড্রিয়া প্রতিটি গ্লুকোজ অণু বা গ্লাইকোজেন-একক থেকে মোট 24টি ATP উৎপন্ন করে এবং সমগ্র বায়বীয় পদ্ধতির সাহায্যে গ্লুকোজ অণু থেকে 36-টি এবং গ্লাইকোজেন-একক থেকে 37-টি ATP উৎপন্ন হয়।

6নং তালিকা: বায়বীয় পদ্ধতিতে শক্তি-উৎপাদনের হিসাব।

বিক্রিয়ার অনুঘটনকারী এনজাইমসমূহ	~P উৎপাদনের পদ্ধতি	ATP এর সংখ্যা	
		গ্লাইকোজেন	গ্লুকোজ
গ্লাইকোলাইসিস	5নং তালিকা থেকে	7	6
সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র –			
পাইরুভেট ডেহাইড্রোজেনেজ	ইলেকট্রন পরিবহন চেনের মাধ্যমে 2NADH এর জারণ	6	6
আইসোসাইট্রেট ডেহাইড্রোজেনেজ	ইলেকট্রন পরিবহন চেনের মাধ্যমে 2NADH এর জারণ	6	6
α-কিটোগ্লুটারেট ডেহাইড্রোজেনেজ	ইলেকট্রন পরিবহন চেনের মাধ্যমে 2NADH এর জারণ	6	6
সাক্সিনিল কো-এ সিনথেটেজ	সাবস্ট্রেট পর্যায়ে জারণ	2	2
সাকসিনেট ডেহাইড্রোজেনেজ	ইলেকট্রন পরিবহন চেনের মাধ্যমে $2FADH_2$ এর জারণ	4	4
ম্যালেট ডেহাইড্রোজেনেজ	ইলেকট্রন পরিবহন চেনের মাধ্যমে 2NADH এর জারণ	6	6
	মোট লাভ	37	36

সাবস্ট্রেটস্তরীয় ফসফরাস সংযুক্তি
Substratelevel Phosphorylation

সাবস্ট্রেট বা যৌগক থেকে ফসফরাস গ্রুপের হস্তান্তরের মাধ্যমে **উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বন্ড** উৎপন্ন হওয়ার ঘটনাকে **সাবস্ট্রেটস্তরীয় ফসফরাস সংযুক্তি** (substrate-level phosphorylation) নামে অভিহিত হয়। অপরপক্ষে ইলেকট্রোন পরিবহন চেনে ফসফরাস সংযুক্তির ঘটনাকে **জারণধর্মী ফসফরাস**

সংযুক্তি (oxidative phosphorylation) বলা হয় কারণ এক্ষেত্রে ATP উৎপাদনের সময় একই সংগে NADH ও $FADH_2$ অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হয়।

গ্লাইকোলাইসিসে 2টি এবং সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে 1টি বিক্রিয়া সাবস্ট্রেট স্তরীয় ফসফরাস সংযুক্তির উদাহরণ। বিক্রিয়া তিনটি নিম্নরূপ :

1. **1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারেট থেকে 3-ফসফোগ্লিসারেটের উৎপাদন** (Formation of 3-Phosphoglycerate from 1, 3-diphosphoglycerate) : 1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারেটের অ্যাসাইল ফসফেট থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফোরিল গ্রুপ ADP তে স্থানান্তরিত হয়। বিক্রিয়াটি **ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজের** (phosphoglycerate) দ্বারা পরিচালিত হয়।

1,3-ডাইফসফোগ্লিসারেট + ADP ⇌ 3-ফসফোগ্লিসারেট + ATP.
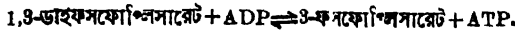
2. **ফসফোএনোল পাইরুভেট থেকে পাইরুভেট উৎপাদন** (Formation of pyruvate from phosphoenol pyruvate) : এনজাইম **পাইরুভেট কাইনেজের** (pyruvate kinase) উপস্থিতিতে ফসফোএনোল পাইরুভেটের উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বণ্ড ADP-তে স্থানান্তরিত হয়।

ফসফোএনোল পাইরুভেট + ADP → পাইরুভেট + ATP
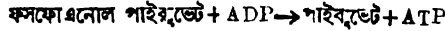
3. **সাক্সিনিল কো-এ থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বণ্ড উৎপাদন** (Formation of high-energy phosphate bond from succinyl CoA) : সাইট্রিক চক্রে এটিই হল একমাত্র বিক্রিয়া যা সরাসরি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বণ্ড উৎপন্ন করে। কো এনজাইম এ-এর (CoA) সাক্সিনিল থায়োএসটার একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন বণ্ড। সাক্সিনিল কো-এ এর থায়োএসটার বণ্ড বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় গুয়ানোসিন ডাইফসফেট (GDP) ফসফরাসযুক্ত হয়। বিক্রিয়াটি **সাক্সিনিল কো-এ সিনথেটেজের** দ্বারা অনুঘটিত হয়।

সাক্সিনিল কো-এ + Pi + GDP ⇌ সাক্সিনেট + GPT + CoA
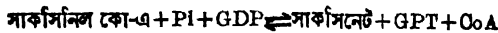
উৎপন্ন GTP-এর ফসফোরিল গ্রুপ সহজেই ADP-তে স্থানান্তরিত হয়, ফলে ATP উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত বিক্রিয়াটি **নিউক্লিওটাইড ডাইফসফোকাইনেজ** (nucleotide diphosphokinase) এনজাইমের দ্বারা পরিচালিত হয়।

GTP + ADP ⇌ GDP + ATP.

জারণধর্মী ফসফরাস সংযুক্তি
Oxidative phosphorylation

গ্লাইকোলাইসিস, সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণ থেকে

উৎপন্ন NADH এবং $FADH_2$ উচ্চশক্তিসম্পন্ন অণু হিসাবে পরিচিত, কারণ তাদের মধ্যে যে একজোড়া ইলেকট্রোন রয়েছে তা হস্তান্তরযোগ্য উচ্চ বিভবসম্পন্ন (high transfer potential)। যখন এসব ইলেকট্রোন অক্সিজেনে হস্তান্তরিত হয় তখন প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। নিঃসৃত এই শক্তিকে ATP উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। **জারণধর্মী ফসফরাস সংযুক্তি হল এমন একটি পদ্ধতি যেখানে পর্যায়ক্রমিক ইলেকট্রোন বাহকের দ্বারা NADH বা $FADH_2$ নিহিত ইলেকট্রোনকে অক্সিজেনে হস্তান্তরিত করে ATP উৎপাদন করা হয়।** বায়বীয় প্রাণীতে ATP উৎপাদনের এটিই হল প্রধান উৎস। জারণধর্মী ফসফরাস-সংযুক্তির কতকগুলো বিশেষত্ব নিম্নরূপ :

(a) মাইটোকনড্রিয়ার অন্তর্ঝিল্লিতে অবস্থিত শ্বসন সমাবেশের (respiratory assemblies) দ্বারা জারণধর্মী ফসফরাস সংযুক্তি সংগঠিত হয়। NADH ও FADH_ সরবরাহকারী সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র ও ফ্যাটি অ্যাসিড জারণের বিক্রিয়াসমূহ সন্নিহিত মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে সংঘটিত হয়।

(b) NADH এর জারণ থেকে 3ATP এবং $FADH_2$ এর জারণ থেকে 2ATP উৎপন্ন হয়। জারণ ও ফসফরাস সংযুক্তি একটি যুগ্ম পদ্ধতি (coupled process)।

(c) শ্বসন সমাবেশে সাইটোক্রোমজাতীয় অসংখ্য ইলেকট্রোন বাহকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এসব বাহকের মাধ্যমে NADH বা $FADH_2$ থেকে পর্যায়ক্রমিক ইলেকট্রোনের পরিবহন এসব বিক্রিয়ার মুক্ত শক্তিকে ভাগ করে দেয়, ফলে একাধিক ATP উৎপাদন সম্ভব হয়।

1. NADH ও $FADH_2$ থেকে ইলেকট্রোনের পরিবহন (Carriage of electrons from NADH and $FADH_2$) : বহুসংখ্যক ইলেকট্রোন বাহকের মাধ্যমে NADH থেকে ইলেকট্রোন অক্সিজেনে হস্তান্তরিত হয়। এসব ইলেকট্রোন বাহকের মধ্যে প্রধান : ফ্লেভিন হেমবিহীন আয়রণ যৌগ, কুইনোন এবং হেম (7-12 নং চিত্র)। এর মধ্যে কিছুসংখ্যক বাহক প্রোটিনের প্রোসথেটিক গ্রুপ। প্রথম বিক্রিয়াটি হল NADH এর জারণ। NADH **ডিহাইড্রোজেনেজ** (NADH dehydrogenase) ঐই বিক্রিয়া পরিচালনা করে। এনজাইমটি একটি ফ্লেভো-প্রোটিন যার মধ্যে **ফ্লেভিন মনোনিউক্লিওটাইড** (FMN) শক্তভাবে আবদ্ধ থাকে।

NADH থেকে দুটো ইলেকট্রোন FMN এ হস্তান্তরিত হয়, ফলে বিজারিত $FMNH_2$ উৎপন্ন হয়।

$$NADH + H^+ + FMN \rightarrow FMNH_2 + NAD^+$$
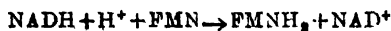
NADH ডেহাইড্রোজেনেজেও লোহা রয়েছে, সম্ভবত এই লোহা ইলেকট্রোন হস্তান্তরে অংশগ্রহণ করে। লোহা এক্ষেত্রে হেমগ্রুপের অংশ নয়। সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের সাক্‌সিনিক ডিহাইড্রোজেনেজের মত NAD ডিহাইড্রোজেনেজও একটি হেমবিহীন লৌহ প্রোটিন।
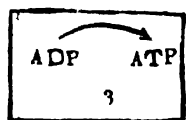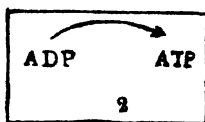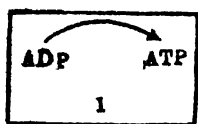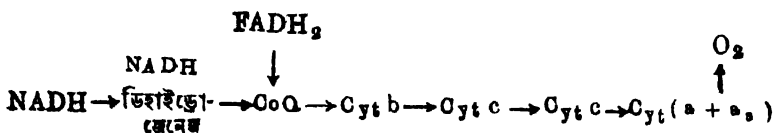
7-12নং চিত্র : শ্বসন সমাবেশে ইলেকট্রোন বাহকের পর্যায়ক্রম। তিনটি স্থানে ATP উৎপন্ন হয়। 1, 2 ও 3 এই তিনটি স্থানে ATP উৎপন্ন হয়।

এরপর ইলেকট্রোন $FMNH_2$ থেকে কো-এনজাইম Q-তে (CoQ) পরিবাহিত হয়। আইসোপ্রেনোয়েড (isoprenoid) কিংতৃতিসমেত কো-এনজাইম Q একটি কুইনোন (quinone লব্ধ পদার্থ। একে **ইউবিকুইনোনও** বলা হয়। CoQ-এ আইসোপ্রেন এককের সংখ্যা প্রাণীর প্রজাতির উপর নির্ভর করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে এই সংখ্যা 10। তাই একে CoQ_{10} হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কস্তুত CoQ ইলেকট্রোন পরিবহন চেনের ফ্লেভোপ্রোটিন ও সাইট্রোক্রোমের মধ্যে ইলেকট্রোনকে পরিবহন করে থাকে। সাইট্রিক অ্যাসিডচক্রে সাক্সিনেট থেকে ফিউমারেট উৎপাদনের সময় $FADH_2$ উৎপন্ন হয়। এরপর $FADH_2$-এর উচ্চবিভবসম্পন্ন ইলেক্ট্রোন পরিবহন চেনে প্রবেশের জন্য CoQ তে হস্তান্তরিত হয়। একইভাবে গ্লিসারল ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ ও ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ ডিহাইড্রোজেনেজ তাদের উচ্চবিভবসম্পন্ন ইলেকট্রোনকে CoQ তে হস্তান্তরিত করে। CoQ থেকে Q এর মধ্যবর্তী ইলেকট্রোন বাহকেরা প্রধানত সাইটোক্রোম। **সাইটোক্রোম হল এমন একটি ইলেকট্রোন পরিবহন প্রোটিন যার মধ্যে প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসাবে হেম থাকে।** সাইটোক্রোমের লৌহ বা আয়রণ পরমাণু ইলেকট্রোন

পরিবহনের সময় পর্যায়ক্রমে বিজারিত ফেরাস (+2) অবস্থা ও জারিত ফেরিক (+3) অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। **হেম গ্রুপ একটিমাত্র ইলেকট্রোন পরিবাহক।** অপরপক্ষে NADH, ফ্লেভোপ্রোটিন এবং CoQ দুটো ইলেকট্রোন পরিবাহক। ফলে এক অণু বিজারিত CoQ দুটো উচ্চবিভবসম্পন্ন ইলেকট্রোনকে দুটো সাইটোক্রোম অণু b-তে হস্তান্তরিত করে।

ইলেকট্রোন পরিবহন চেনে CoQ থেকে O_2 পর্যন্ত 5টি সাইটোক্রোম রয়েছে। তাদের রেডোক্স পোটেনশিয়েল (redox potential) বা জারণ-বিজারণ বিভব পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায়ঃ

$$CoQ \rightarrow Cyt\ b \rightarrow Cyt\ C_1 \rightarrow Cyt\ C \rightarrow Cyt\ (a+a_3) \rightarrow O_2$$
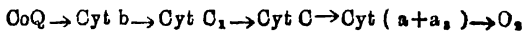
এসব সাইটোক্রোমের গঠন ও ধর্ম আলাদা। সাইটোক্রোম b, C_1 এবং C এর প্রোসথেটিক গ্রুপ আয়রণ প্রোটোপরফাইরিন IX, সাধারণভাবে যাকে **হেম** (heme) বলা হয়। মায়োগ্লোবিন ও হিমোগ্লোবিনে একই প্রোসথেটিক গ্রুপ রয়েছে। সাইটোক্রোম a ও a_3 এর পৃথক আয়রণ পরফাইরিন প্রোসথেটিক গ্রুপ রয়েছে। সাইটোক্রোম a ও a_3 শ্বসন চেনের সর্বশেষ সদস্য। এরা একত্রে জটিল আকারে অবস্থান করে, তখন এই জটিল বা কমপ্লেক্সকে **সাইটোক্রোম অক্সিডেজ** (cytochrome oxidase) বলা হয়। সাইটোক্রোম a থেকে সাইটোক্রোম a_3 তে ইলেকট্রোন পরিবাহিত হয়। সাইটোক্রোম a_3 তে তামা বা কপার আছে। O_2 তে ইলেকট্রোন পরিবহনের সময় কপার পর্যায়ক্রমে জারিত অবস্থা (+2) থেকে বিজারিত অবস্থায় (+1) রূপান্তরিত হয়। জল উৎপাদন একটি 4-ইলেক্ট্রোন পদ্ধতি, হেম গ্রুপ একটিমাত্র ইলেকট্রোনবাহক। কিভাবে 4টি ইলেক্ট্রন একটি O_2 অণুকে বিজারিত করতে কেন্দ্রীভূত হয় তা এখনও ভালভাবে জানা যায়নি।

$$O_2 + 4H + 4e^- \rightarrow 2H_2O$$
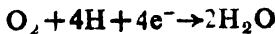
2. ATP **তিনটি স্থানে উৎপন্ন হয়** (ATP is generated at three sites): ইলেকট্রন যখন NADH থেকে ইলেকট্রন পরিবহণ চেনের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় তখন **তিনটি স্থানে** ATP উৎপন্ন হয় (7-12নং চিত্র)। **প্রথম স্থান**, NADH ও CoQ এর মধ্যে; **দ্বিতীয় স্থান**, সাইটোক্রোম b এবং সাইটোক্রোম c এর মধ্যে এবং **তৃতীয় স্থান** সাইটোক্রোম c ও O_2 এর মধ্যে। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে এই তিনটি স্থানের সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে। এসব পরীক্ষার মধ্যে প্রধান ঃ

(a) বিভিন্ন পদার্থের জারণ থেকে ATP-উৎপাদনের তুলনা (**Comparison of the ATP yield from the oxidation of several substrates**) **ঃ** NADH এর জারণ থেকে 3ATP উৎপন্ন হয়, অপরপক্ষে সাকসিনেটের জারণ থেকে 2ATP উৎপন্ন হয়। $FADH_2$ থেকে ইলেকট্রন CoQ স্থানে ইলেকট্রোন পরিবহন চেনে প্রবেশ করে। ফসফরাস সংযুক্তির প্রথম স্থানের চেয়ে এই স্থানটি নিম্ন শক্তিমাত্রায় (low energy level) অবস্থান করে। অ্যাসকোরবেট (ascorbate) নামক একটি কৃত্রিম পদার্থের জারণ থেকে একটি মাত্র ATP উৎপন্ন হয় কারণ এর ইলেকট্রোন সাইটোক্রোম c তে প্রবেশ করে। এই স্থানটির শক্তিমাত্রা ফসফরাস সংযুক্তির দ্বিতীয় স্থানের শক্তিমাত্রার চেয়ে কম। জারণধর্মী ফসফরাস সংযুক্তির সূচক হিসাবে প্রায়ই **P:O অনুপাত** (P:O ratio) ব্যবহার করা হয়। প্রতি অক্সিজেন পরমাণুর ব্যবহারের সময় যতসংখ্যক অজৈব ফসফেট অণু জৈব অবস্থায় প্রবেশ করে তাকে P:O অনুপাত বলা হয় (NADH, সাকসিনেট ও অ্যাসকোরবেটের জারণের P:O অনুপাত যথাক্রমে 3, 2 এবং 1)।
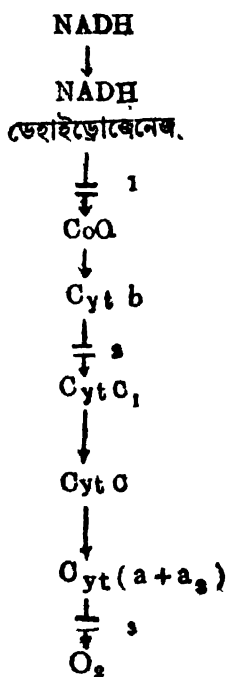
7-18 নং চিত্র : ইলেকট্রন পরিবহনের কিছুসংখ্যক রোধকের ক্রিয়াস্থান। 1-রোটেনোন ও অ্যামাইটাল এরা রুদ্ধ হয়। 2-অ্যান্টিমাইসিস প্রতিরোধ করে, 3- CN^-, N_3^-, এবং CO প্রতিরোধ করে।

(b) **ইলেকট্রন প্রবাহে নির্দিষ্ট বাধা** (**Specific inhibition of electron flow**) **ঃ** **রোটেনোন** (rotenone) নামক পদার্থটি NADH ডেহাইড্রোজেনেজ থেকে CoQ এ ইলেকট্রোন হস্তান্তরে সুনির্দিষ্ট বাধা আরোপ করে, ফলে প্রথম স্থানে ATP সংশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে এই পদার্থটি সাকসিনেটের জারণে বাধা আরোপ করে না কারণ সাকসিনেটের ইলেকট্রন বাধার পরবর্তী স্থানে CoQ-এ ইলেকট্রন পরিবহন চেনে প্রবেশ করে। **অ্যান্টিমাইসিন** A (antimycin A) সাইটোক্রোম b এবং c_1 এর মধ্যে ইলেকট্রন প্রবাহে বাধাদান করে, ফলে দ্বিতীয় স্থানে ATP উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই

বাধাকে এড়িয়ে যেতে পারে অ্যাসকোরবেট যা সরাসরি সাইটোক্রোম c কে বিজারিত করে। ইলেকট্রোন সাইটোক্রোম c থেকে O_2 তে প্রবাহিত হয় এবং পরিবহন স্থানের তৃতীয় স্থানে ATP উৎপাদন হয়। সবশেষে CN^-, N_3^- এবং CO-এর দ্বারা সাইটোক্রোম ($a+a_3$) থেকে O_2-এ ইলেকট্রন প্রবাহকে বন্ধ করে দেওয়া যায়। সায়ানাইড (CN^-) ও অ্যাজাইড (N_3^-) ফেরিক বাহকের সংগে বিক্রিয়া করে এবং CO ফেরাস বাহককে বাধা দেয়। যেহেতু ইলেক্ট্রন প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় সেহেতু তৃতীয় স্থানে ফসফরাসসংযুক্তি সংঘটিত হতে পারে না (7-13 নং চিত্র)।

(c) **তাপগতীবিদ্যাগত পরিমাপ** (Thermodynamic estimate) : ইলেকট্রোন প্রবাহের সময় মুক্ত শক্তির যে পরিবর্তন হয় (free energy change) তার পরিমাপ করে ATP-উৎপাদনের স্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়। NADH থেকে ইলেকট্রোন প্রবাহের সময় নির্দিষ্ট অবস্থায় যে মুক্ত শক্তির পরিবর্তন ($\Delta G^{\circ\prime}$) হয় তার পরিমাণ – 12 Kcal/mol ; সাইটোক্রোম b থেকে C_1-এ ইলেকট্রনের পরিবহনের সময় এই পরিবর্তন – 10 Kcal/mol এবং ($a+a_3$) থেকে O_2 তে ইলেকট্রোনের পরিবহনে এই পরিমাণ – 24 Kcal/mol। এই জারণ-বিজারণে যে বিভবপার্থক্য গড়ে ওঠে ATP উৎপাদনের পক্ষে তা যথেষ্ট।

3. **সাইটোপ্লাজমস্থিত NADH এর ইলেকট্রোন গ্লিসারল ফসফেট শাটলের মাধ্যমে মাইটোকনড্রিয়ায় প্রবেশ করে** (Electrons from cytoplasmic NAD enters mitochondria by the glycerol phosphate shuttle) : কোষনিহিত মাইটোকনড্রিয়া NADH এবং NAD^+ এর প্রতি অভেদ্য। প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে গ্লাইকোলাইসিসের দ্বারা সাইটোপ্লাজমে উৎপন্ন NADH কিভাবে ইলেকট্রোন চেনে জারিত হয় ? গ্লিসারালডেহাইড 3-ফসফেটের জারণ থেকে NADH উৎপন্ন হয়। গ্লাইকোলাইসিস চলার জন্য NAD^+ এর পুনর্জনন অবশ্যই প্রয়োজন। জানা গেছে NADH সরাসরি মাইটোকনড্রিয়ায় প্রবেশ করে না। NADH থেকে ইলেকট্রোন বাহকের মাধ্যমে মাইটোকনড্রিয়ায় প্রবেশ করে। এরকম একটি বাহক হল গ্লিসারল 3-ফসফেট। এই শাটলের প্রথম ধাপে (7-14 নং চিত্র) NADH এর ইলেকট্রন ডাইহাইড্রোক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেটে স্থানান্তরিত হয়। ফলে গ্লিসারল 3-ফসফেট উৎপন্ন হয়। সাইটোসোলে গ্লিসারল 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ এই বিক্রিয়া পরিচালিত করে। গ্লিসারল

3-ফসফেট মাইটোকনড্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং সেখানে ডিহাইড্রোজেনেজের প্রোসথেটিক গ্রুপ FAD এর দ্বারা পুনরায় জারিত হয়ে ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট উৎপন্ন করে। মাইটোকনড্রিয়াস্থিত FAD-যুক্ত গ্লিসারল
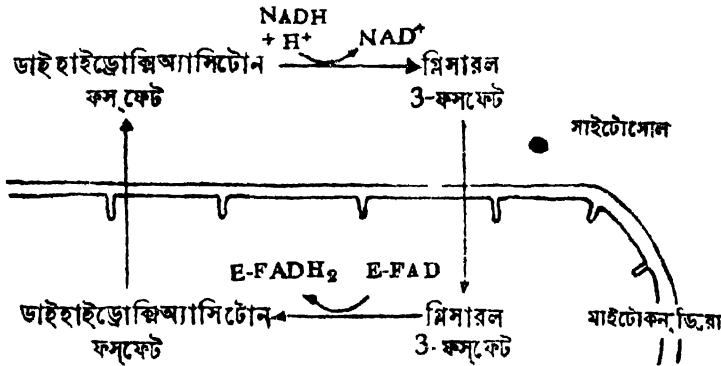
7-14 নং চিত্র : গ্লিসারল ফসফেট শাটল।

ডিহাইড্রোজেনেজ সাইটোসোলস্থিত NAD^+-যুক্ত গ্লিসারল ডিহাইড্রোজেনেজ থেকে আলাদা। মাইটোকনড্রিয়াতে উৎপন্ন ডাইহাইড্রোঅ্যাসিটোন ফসফেট মাইটোকনড্রিয়া থেকে সাইটোসোলে বেরিয়ে আসে এবং এভাবে শাটল সম্পূর্ণ হয়। সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$NADH + H^+ + E\text{-}FAD \longrightarrow NAD^+ + E\text{-}FADH$$
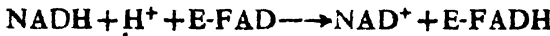
সাইটোপ্লাজম মাইটোকনড্রিয়া সাইটোপ্লাজম মাইটোকনড্রিয়া

বিজারিত ফ্লেভিন ($E\text{-}FADH_2$) ইলেকট্রোনকে এরপর ইলেকট্রোন পরিবহন চেনের CoQ স্তরে স্থানান্তরিত করে। **ফলে সাইটোপ্লাজমস্থিত NADH এর জারণ থেকে তিনটির বদলে দুটি ATP উৎপন্ন হয়।**

4. মাইটোকনড্রিয়াতে ADP এর প্রবেশ ATP-এর নিষ্ক্রমণের সংগে সম্পর্কযুক্ত (Entry of ADP into mitochorndria is related to the exit of ATP) : মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃস্থ ঝিল্লির মধ্য দিয়ে ATP এবং ADP স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতে পারে না। নির্দিষ্ট বাহকের মাধ্যমে এদের এই বাধা অতিক্রম করতে হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল ATP ও ADP এর যাতায়াত পরস্পরের সংগে সম্পর্কযুক্ত। **ADP শুধুমাত্র তখনই মাইটোকনড্রিয়াতে প্রবেশ করতে পারে যখন ATP বেরিয়ে আছে।** বিপরীত বক্তব্যটিও সত্য। ADP

ও ATP এর পরিবহন তাদের গাঢ়ত্বের নতিমাত্রার সংগে সম্পর্কযুক্ত। এতে শক্তিব্যয়ের কোন প্রয়োজন হয় না। সহায়ক ব্যাপনের (facilitated diffusion) এর মাধ্যমে এদের পরিবহন সংঘটিত হয়।

পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়াপথ
Pentosh Phosphate Pathway

গ্লাইকোলাইসিস, সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র এবং জারণধর্মী ফসফরাস-সংযুক্তি প্রাথমিকভাবে ATP উৎপাদনের সংগে সম্পর্কযুক্ত এবং এক্ষেত্রে গ্লুকোজকেই জ্বালানি (fuel) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জ্বালানি অণুর কিছুসংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু ও ইলেকট্রোন সংশ্লেষণের কাজেও ব্যবহৃত হয়। NADPH-কে প্রধানত একাজে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ প্রধানত এর বিজারক শক্তিকে একাজে ব্যবহার হয়। বিজারণধর্মী সংশ্লেষণে কাজে লাগানো হয়। NADPH-এর বিরাট অংশকে চর্বিকলা গ্রহণ করে এবং অ্যাসিটাইল কো এ থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণে ব্যবহার করে। NADPH ও NADH এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল, NADH ইলেকট্রোন পরিবহন চেনে জারিত হয়ে ATP উৎপাদন করে। অপরপক্ষে NADPH বিজারণধর্মী সংশ্লেষণে হাইড্রোজেন ও ইলেকট্রন দাতা (donor) হিসাবে কাজ করে।

1. **NADPH ও 5 কার্বন শর্করার উৎপাদন** (Formation of NADPH and 5-carbon sugars): পেনটোন ফসফেট বিক্রিয়াপথের মাধ্যমে গ্লুকোজ 6-ফসফেট জারিত হয়ে যখন রাইবোজ 5-ফসফেট উৎপন্ন করে তখন NADPH উৎপন্ন হয়। এই 5-কার্বন সম্পন্ন শর্করা ও তার লব্ধ পদার্থ ATP, CoA, NAD^+, FAD, RNA এবং DNA প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অণুর উপাদান হিসাবে প্রয়োজন।

গ্লুকোজ 6-ফসফেট $+ 2NADP^+ + H_2O \rightarrow$ রাইবোজ 5 ফসফেট $+ 2NADPH + 2H^+ + CO$
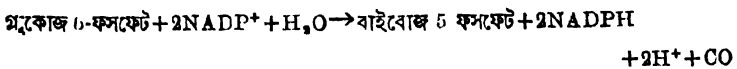
পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়াপথ এছাড়াও অজারণধর্মী বিক্রিয়ার (nonoxidative reaction) মাধ্যমে তিন, চার, পাঁচ, ছয় এবং সাত কার্বনযুক্ত শর্করার পরস্পর রূপান্তরে অংশ গ্রহণ করে। সমস্ত বিক্রিয়াসমূহ সাইটোসোলে সংঘটিত হয়।

পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়াপথকে কখনও কখনও পেনটোজ শান্ট (pentose shunt), **হেক্সোজ মনোফসফেট বিক্রিয়াপথ** (hexose monophosphate pathway), **ফসফোগ্লুকোনেট জারণধর্মী বিক্রিয়াপথ** (phosphogluconate oxidative pathway), **ওয়ারবার্গ ডিকেন্স বিক্রিয়াপথ** (Warburg Dickens pathway) প্রভৃতি নামে পরিচিত। অটো ওয়ারবার্গ (Otto Warburg) 1931 সালে এই বিক্রিয়াপথের প্রথম এনজাইম 'গ্লুকোজ 6-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ'-এর আবিষ্কার করেন। সম্পূর্ণ বিক্রিয়াপথটি এরপর ফ্রিজ লিপম্যান (Fritz Lipmann), ফ্রাংক ডিকেন্স (Frank Dickens), বার্নার্ড হরেকার (Bernard Horecker) এবং এফ্রেইম র‍্যাকার (Efraim Racker) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয়

2. **গ্লুকোজ 6 ফসফেটের রাইবুলোজ 5-ফসফেটে রূপান্তরের সময় দুটো NADPH উৎপন্ন হয়** (Two NADPH are generated in the conversion of glucose 6-phosphate to ribulose 5-phosphate) **:** গ্লুকোজ 6-ফসফেটের 1-কার্বনে হাইড্রোজেন বিযুক্তির মাধ্যমে পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়াপথ শুরু হয়। বিক্রিয়াটি **গ্লুকোজ 6-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ** এনজাইমের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এনজাইম সক্রিয়তা অত্যধিক $NADP^+$-নির্ভর। লব্ধ পদার্থ 6-ফসফোগ্লুকোনোল্যাকটোন।

পরবর্তী ধাপে নির্দিষ্ট **ল্যাকটোনেজ** (lactonase) এনজাইমের দ্বারা 6-ফসফোগ্লুকোনোল্যাকটোন আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হয়ে 6-ফসফোগ্লুকোনেট (6-phosphogluconate) উৎপন্ন করে। এই 6-কার্বন শর্করাটি এরপর জারণধর্মী কার্বনডাইঅক্সাইড-বিযুক্তির মাধ্যমে রাইবুলোজ 5-ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রেও $NADP^+$ ইলেকট্রোন-গ্রাহক হিসাবে কাজ করে। বিক্রিয়াটি **6 ফসফোগ্লুকোনেট ডিহাইড্রোজেনেজের** (6-phosphogluconate dehydrogenase) দ্বারা পরিচালিত হয়।

$$\text{গ্লুকোজ 6-ফসফেট} + NADP^+ \xrightarrow{1} \text{6-ফসফোগ্লুকোনোল্যাকটোন} + NADPH + H^+$$

$$\text{6-ফসফোগ্লুকোনোল্যাকটোন} + H_2O \xrightarrow{2} \text{6-ফসফোগ্লুকোনেট} + H^+$$

$$\text{6-ফসফোগ্লুকোনেট} + NADP^+ \xrightarrow{3} \text{রাইবুলোজ 5-ফসফেট} + NADPH + CO_2$$
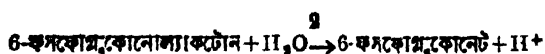
3. রাইবুলোজ 5-ফসফেট থেকে রাইবোজ 5-ফসফেটের উৎপাদন (Formation of ribose 5-phosphate from ribulose 5-phosphate) : রাইবুলোজ 5-ফসফেট এরূপর এনেডায়োল অন্তর্বর্তী যৌগের মাধ্যমে রাইবোজ 5-ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। বিক্রিয়াটি **ফসফোপেনটোজ আইসোমারেজ** (phosphopentose isomerase) এনজাইমের দ্বারা পরিচালিত হয়।

রাইবুলোজ 5-ফসফেট ⇌ এনেডায়োল ⇌ রাইবোজ 5 ফসফেট
অন্তর্বর্তী যৌগ
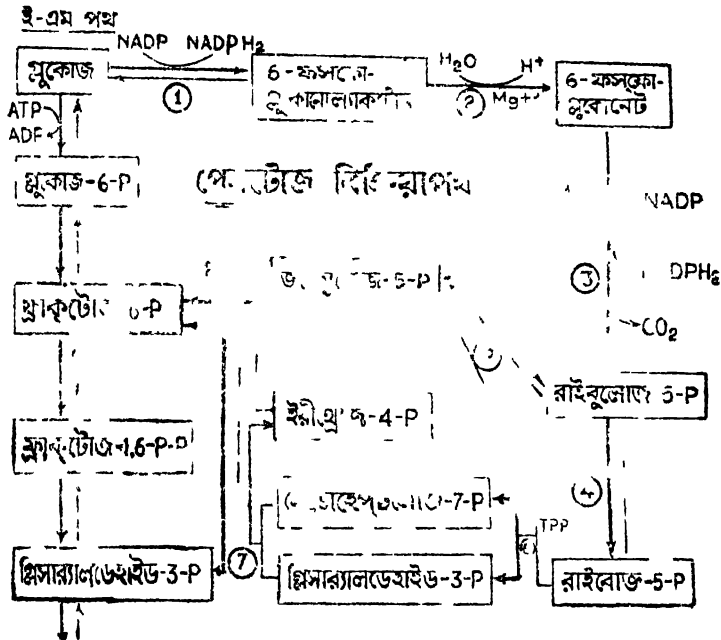
7-15 নং চিত্র : পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়াপথ। ই-এম = এমডেনমেয়ারহোফ বিক্রিয়াপথ।
TPP = থায়ামিন পাইরোফসফেট।

4. ট্রান্সকিটোলেজ ও ট্রান্সঅ্যালডোলেজ বিক্রিয়াসমূহ (Transketolase and transaldolase reactions) **:** ট্রান্সকিটোলেজ ও ট্রান্সঅ্যালডোলেজ এনজাইম নিম্নলিখিত তিনটি উভয়মুখী বিক্রিয়ার পরিচালনার মাধ্যমে পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়াপথ ও গ্লাইকোলাইসিসের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে :

$$C_5 + C_5 \xrightleftharpoons{\text{ট্রান্সকিটোলেজ}} C_3 + C_7$$

$$C_7 + C_3 \xrightleftharpoons{\text{ট্রান্সঅ্যালডোলেজ}} C_4 + C_6$$

$$C_5 + C_4 \xrightleftharpoons{\text{ট্রান্সকিটোলেজ}} C_3 + C_6$$
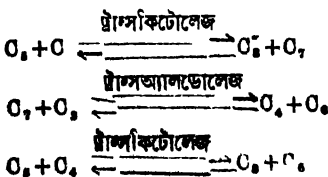
এই তিনটি বিক্রিয়ার যোগফল হল তিনটি পেনটোজ থেকে দুটো হেক্সোজ ও একটি ট্রায়োজ উৎপাদন।

এই তিনটি বিক্রিয়ার মধ্যে প্রথম বিক্রিয়াটি দুটো পেনটোজ থেকে গ্লিসার‍্যালডেহাইড 3-ফসফেট (glyceraldehyde 3-phosphate) ও সেডোহেপটুলোজ 7-ফসফেট (sedoheptulose 7-phosphate) উৎপাদনের মাধ্যমে পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়াপথ ও গ্লাইকোলাইসিসের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে।

জাইলুলোজ 5-ফসফেট + রাইবোজ 5-ফসফেট ⇌ (ট্রান্সকিটোলেজ) গ্লিসার‍্যালডেহাইড 3-ফসফেট + সেডোহেপটুলোজ 7-ফসফেট
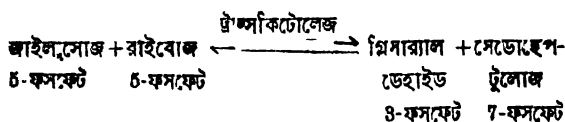
এক্ষেত্রে দুটো কার্বন এককের দাতা জাইলুলোজ 5-ফসফেট। পরবর্তী বিক্রিয়ায় গ্লিসারালডেহাইড 3-ফসফেট এবং সেডোহেপটুলোজ 7-ফসফেট পরস্পর বিক্রিয়া করে ফ্রাকটোজ 6-ফসফেট (fructose 6-phosphate) এবং ইরীথ্রোজ 4-ফসফেট উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি ট্রান্সকিটোলেজ (transketolase) এনজাইমের দ্বারা অনুঘটিত হয়।

সেডোহেপটুলোজ 7-ফসফেট + গ্লিসার‍্যালডেহাইড 3-ফসফেট ⇌ ইরীথ্রোজ 4-ফসফেট + ফ্রাকটোজ 6-ফসফেট
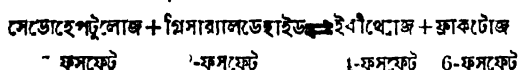
তৃতীয় বিক্রিয়ায় ট্রান্সকিটোলেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে ইরীথ্রোজ 4-ফসফেট এবং জাইলুলোজ 5-ফসফেটের বিক্রিয়া থেকে গ্লিসার‍্যালডেহাইড 3-ফসফেট ও ফ্রাকটোজ 6-ফসফেট উৎপন্ন হয়।

জাইলুলোজ 5-ফসফেট + ইরীথ্রোজ 4-ফসফেট ⇌ গ্লিসার‍্যালডেহাইড 3-ফসফেট + ফ্র্যাকটোজ 6-ফসফেট
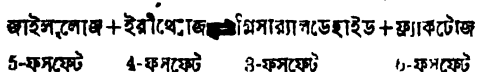
এই তিনটি বিক্রিয়ার যোগফল থেকে পাওয়া যায়ঃ

2 জাইলুলোজ 5-ফসফেট + রাইবোজ 5-ফসফেট ⇌ 2 ফ্রাকটোজ 6-ফসফেট + গ্লিসার‍্যালডেহাইড 3-ফসফেট
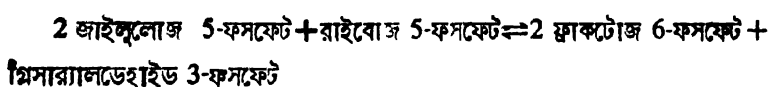
আবার যেহেতু ফসফোপেনটোজ আইসোমারেজ ও ফসফোপেনটোজ ইপিমারেজের পর্যায়ক্রমিক সক্রিয়তা থেকে রাইবোজ 5-ফসফেট জাইলুলোজ 5-ফসফেটে রূপান্তরিত হয়, সেহেতু রাইবোজ 5-ফসফেট নিয়ে যে বিক্রিয়া শুরু হয় তার ফলাফল নিম্নরূপঃ

3 রাইবোজ 5-ফসফেট ⇌ 2 ফ্রাকটোজ 6-ফসফেট + গ্লিসার‍্যালডেহাইড 3-ফসফেট।

অতএব দেখা যাচ্ছে বেশী পরিমাণে রাইবোজ 5-ফসফেট উৎপন্ন হলে তা পরিমাণগতভাবে গ্লাইকোলাইসিসের অন্তর্বর্তী যৌগে রূপান্তরিত হয়।

পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়াপথের মাধ্যমে গ্লুকোজ 6-ফসফেট সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2 ও NADPH উৎপন্ন করতে পারে। পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়াপথের মাধ্যমে যে রাইবোজ 5-ফসফেট উৎপন্ন হয় তা ট্রান্সকিটোলেজ, ট্রান্সঅ্যালডোলেজ প্রভৃতি এনজাইমের দ্বারা চক্রাকারে গ্লুকোজ 6-ফসফেটে পরিণত হয়। আরো দেখা গেছে, পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়া পথের মাধ্যমে C-1 কার্বনডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। কিন্তু গ্লাইকোলাইসিসে C-1 ও C-6 সমান সংখ্যায় CO_2-এ পরিণত হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে গ্লিসারাালডেহাইড 3-ফসফেট এবং ডাইহাইড্রোক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট দ্রুত পরস্পর রূপান্তরিত হতে পারে, ফলে সমসংখ্যক CO_2 C-1 ও C-6 থেকে তৈরী হয়।

গ্লাইকোজেনোলাইসিস

GLYCOGENOLYSIS

গ্লাইকোজেনের ভাংগন বা বিশ্লিষ্টভবনকে **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** বলা হয়। যকৃতে গ্লাইকোজেনোলাইসিস থেকে প্রধানত গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। অপরপক্ষে পেশীতে গ্লাইকোজেনোলাইসিস থেকে পাইরুভেট বা ল্যাকটেট উৎপন্ন হয়।

1. **গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ 1-ফসফেট উৎপাদন** (Formation of glucose-1-phosphate from glycogen) ঃ কার্ল কোরি (Carl Cori) ও গার্টি কোরির (Gerty Cori) আবিষ্কার থেকে গ্লাইকোজেন ভাংগনের বিক্রিয়াপথ জানা যায়। **গ্লাইকোজেন ফসফোরিলেজ** নামক এনজাইম গ্লাইকোজেন অণুর অবিজারণধর্মী প্রান্ত থেকে গ্লুকোজ একককে আলাদা করে দিতে সাহায্য করে। প্রান্তদেশীয় গ্লুকোজের C-1 এবং সন্নিহিত গ্লুকোজের C-4 এর মধ্যে যে **গ্লাইকোসিডিক সংযোগ** (glycosidic linkage থাকে তা ওরথো-ফসফেটের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়, বিশেষ করে C-1 কার্বন পরমাণু এবং গ্লাইকোসাইডিক অক্সিজেন পরমাণুর মধ্যবর্তী বণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়।

গ্লাইকোজেন + Pi ⇌ গ্লুকোজ 1-ফসফেট + গ্লাইকোজেন
(n-সংখ্যক)　　　　　　　　(n-1 সংখ্যক)
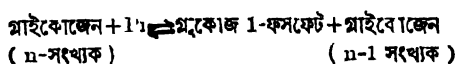
2. **গ্লাইকোজেনের ভাংগনে শাখাবিচ্ছেদক এনজাইম** (Debrancing enzyme for glycogen breakdown) ঃ ফসফোরিলেজ এনজাইম গ্লাইকোজেনের শুধুমাত্র α-1, 4 সংযোগকেই বিচ্ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু

α-1, 6-গ্লাইকোসিডিক বন্ডকে ভাংগতে পারে না। α-1, 6-গ্লাইকোসিডিক বন্ড গ্লাইকোজেনের শাখা গঠন করে থাকে। ফলে, ফসফোরিলেজ এনজাইম যখন α-1, 4 সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে শাখাসংযোগ বা α-1, 6-বন্ডের 4টি গ্লুকোজ এককের কাছে পৌঁছয় তখন গ্লুকোজ 1-ফসফেট উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় আরেকটি এনজাইম, α-1, 4→α-1,4 গ্লুকোন ট্রান্সফারেজ, তিনটি গ্লুকোজ সম্পন্ন শর্করা একককে অন্য শাখায় স্থানান্তরিত করে, ফলে α-1, 6 শাখা বেরিয়ে আসে। তখন α-1, 6-গ্লুকোসিডেজ (α-1, 6-glucosidase) নামক এনজাইম α-1, 6-গ্লাইকোসিডিক সংযোগকে বিচ্ছিন্ন করে (7·16 নং চিত্র) শেষোক্ত এনজাইমকে **শাখাবিচ্ছেদক এনজাইমও** (debranching enzyme) বলা হয়। এই তিনটি এনজাইমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গ্লুকোজ 1-ফসফেট উৎপন্ন হয়। ট্রান্সফারেজ এনজাইম ও শাখাবিচ্ছেদক এনজাইমের সক্রিয়তা যেহেতু পৃথক করা সম্ভব হয়নি সেহেতু ধারণা করা হয় দুটো এনজাইম একই এনজাইম থেকে উৎপন্ন হয় অথবা উভয় এনজাইমই পরস্পর সংযুক্ত থাকে।
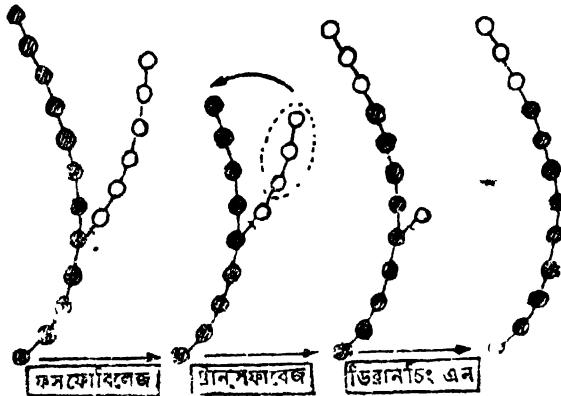
7-16 নং চিত্র : গ্লাইকোজেনোলাইসিসের ধাপ।

3. **ফসফোগ্লুকোমিউটেজের দ্বারা গ্লুকোজ 1-ফসফেট থেকে গ্লুকোজ 6-ফসফেটের উৎপাদন।** (Formation of glucose 6-phosphate from glucose 1-phosphate by phosphoglucomutase) : উৎপন্ন গ্লুকোজ 1-ফসফেট এরপর ফসফোগ্লুকোমিউটেজ এনজাইমের দ্বারা গ্লুকোজ 6-ফসফেটে পরিণত হয়। দ্রবণে সাম্যাবস্থায় 95% গ্লুকোজ 6-ফসফেট পাওয়া যায়। ফসফরাস যুক্ত সেরিন সক্রিয় এনজাইমের অনুঘটন স্থান (catalytic site)

হিসাবে কাজ করে। অনুঘটনের সময় এই ফসফোরিল গ্রুপ সম্ভবত গ্লুকোজ 1-ফসফেটের C-6 এর হাইড্রোক্সিল গ্রুপে স্থানান্তরিত হয়, ফলে গ্লুকোজ 1-6-ডাই ফসফেট উৎপন্ন হয়। এই অন্তর্বর্তী যৌগের C-1 ফসফরিল গ্রুপ সক্রিয় এনজাইমের সেরিনে স্থানান্তরিত হয় এবং গ্লুকোজ 6-ফসফেট উৎপন্ন হয়।

গ্লুকোজ 1 ফসফেট ⇌ গ্লুকোজ ⇌ গ্লুকোজ 6 ফসফেট
1, 6-ডাইফসফেট

4. যকৃতে গ্লুকোজ 6-ফসফাটেজ আছে কিন্তু পেশীতে অনুপস্থিত (Liver contains glucose 6 phosphatase, but absent from Muscle) : যকৃতের একটি বড় কাজ হল প্রধানত রক্ত শর্করার নিয়ন্ত্রণ করা, বিশেষত পেশী সঞ্চালন বা কায়িক ব্যায়ামের সময় এবং খাদ্যগ্রহণের অন্তর্বর্তী সময়ে। ফসফরাসযুক্ত গ্লুকোজ সাধারণত কোষের বাইরে নির্গত হতে পারে না। যকৃতে **গ্লুকোজ 6 ফসফাটেজ** (glucose 6-phosphatase) এনজাইম গ্লুকোজ 6-ফসফেটকে গ্লুকোজে পরিণত করে, ফলে তা কোষ থেকে নির্গত হতে পারে।

গ্লুকোজ 6-ফসফেট + H_2O → গ্লুকোজ + Pi
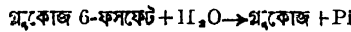
কিডনি ও ক্ষুদ্রান্ত্রেও গ্লুকোজ 6-ফসফাটেজ এনজাইমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু পেশী ও মস্তিষ্কে এই এনজাইমটি অনুপস্থিত। গ্লুকোজ 6-ফসফেট এভাবে পেশী ও মস্তিষ্কে থেকে যায় যেখানে বেশী পরিমাণে ATP উৎপন্ন হয়।

গ্লুকোনিওজেনেসিস

Gluconeogenesis

কার্বোহাইড্রেট নয় এমন পদার্থ থেকে গ্লুকোজ উৎপাদনের পদ্ধতিকে **গ্লুকোনিওজেনেসিস** বলা হয়। গ্লুকোনিওজেনেসিসের শুরু হয় প্রধানত পাইরুভেট থেকে এবং শেষ হয় গ্লুকোজ উৎপাদনের মাধ্যমে। পাইরুভেট ও অক্সালোঅ্যাসিটেট এই বিক্রিয়া পথের প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে। যেসব অকার্বোহাইড্রেট পদার্থ থেকে এই পদ্ধতিতে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে প্রধান **ল্যাকটেট** ও অধিকাংশ **অ্যামাইনোঅ্যাসিড**। প্রাণীদেহে ফ্যাটিঅ্যাসিড গ্লুকোজে পরিণত হতে পারে না।

গ্লুকোজ
↑ গ্লুকোনিওজেনেসিস
অক্সালোঅ্যাসিটেট ← কিছু সংখ্যক অ্যামাইনোঅ্যাসিড
↑
ল্যাকটেট → পাইরুভেট ← কিছুসংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড।
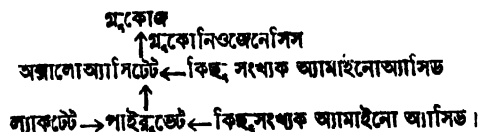
গ্লুকোনিওজেনেসিসের প্রধান সংঘটন স্থান যকৃৎ। কিডনির কর্টেক্স বা বহিঃস্তরেও গ্লুকোনিওজেনেসিস লক্ষ্য করা যায় তবে সেখানে এই পদ্ধতিতে যকৃতের এক-দশমাংশ গ্লুকোজ উৎপন্ন হতে পারে। মস্তিষ্ক, অস্থিপেশী ও হৃৎপেশীতে খুব যৎসামান্য গ্লুকোনিওজেনেসিস সংঘটিত হতে পারে।

1. গ্লুকোনিওজেনেসিস গ্লাইকোলাইসিসের বিপরীত প্রক্রিয়া নয় (Gluconeogenesis is not a reversal of glycolysis) : গ্লাইকোলাইসিসে গ্লুকোজ পাইরুভেটে রূপান্তরিত হয়। অপরপক্ষে গ্লুকোনিওজেনেসিসে পাইরুভেট গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। তবে গ্লুকোনিওজেনেসিস গ্লাইকোলাইসিসের বিপরীত প্রক্রিয়া নয়। গ্লাইকোলাইসিস একটি অত্যধিক তাপোৎপাদক পদ্ধতি (exergonic process) এবং এর প্রায় তিনটি বিক্রিয়া একমুখী (irreversible)। গ্লুকোনিওজেনেসিসে কিছু বিক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা এবং বিক্রিয়াপথও ভিন্ন। গ্লাইকোলাইসিসে যে তিনটি বিক্রিয়া একমুখী তা নিম্নরূপ :

$$\text{ফসফোএনোল পাইরুভেট} + ADP \xrightarrow{\text{পাইরুভেট কাইনেজ}} \text{পাইরুভেট} + ATP$$

$$\text{ফ্রাকটোজ 6-ফসফেট} + ATP \xrightarrow{\text{ফসফোফ্রাকটোকাইনেজ}} \text{ফ্রাকটোজ 1, 6-ডাইফসফেট} + ADP$$

$$\text{গ্লুকোজ} + ATP \xrightarrow{\text{হেক্সোকাইনেজ}} \text{গ্লুকোজ 6-ফসফেট} + ADP$$
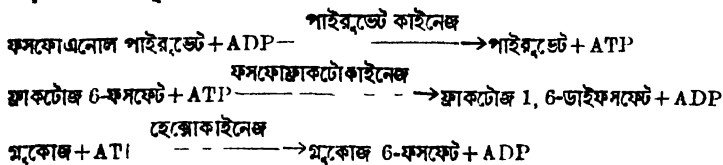
2. গ্লুকোনিওজেনেসিসের পৃথক বিক্রিয়াসমূহ (Distinctive Reactions of gluconeogenesis) : গ্লুকোনিওজেনেসিসে উপরিউক্ত একমুখী বিক্রিয়াসমূহ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নিম্নলিখিত ভাবে সম্পন্ন হয়।

2(a). পাইরুভেট অক্সালোঅ্যাসিটেটের মাধ্যমে ফসফোএনোল পাইরুভেটে রূপান্তরিত হয় (Phosphoenol pyruvate is formed from pyruvate via oxaloacetate) **:** পাইরুভেট প্রথমে ATP খরচের মাধ্যমে কার্বন-ডাইঅক্সাইডযুক্ত (carboxylated) হয়ে অক্সালোঅ্যাসিটেট উৎপন্ন করে। অক্সালোঅ্যাসিটেট এরপর CO_2 বিযুক্ত হয় এবং আরও একটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফসফেট বন্ড খরচের মাধ্যমে ফসফোএনোল পাইরুভেটে রূপান্তরিত হয় :

$$\text{পাইরুভেট} + CO_2 + ATP + H_2O \rightleftharpoons \text{অক্সালোঅ্যাসিটেট} + ADP + Pi + 2H^+$$

$$\text{অক্সালোঅ্যাসিটেট} + GTP \rightleftharpoons \text{ফসফোএনোল পাইরুভেট} + GDP + CO_2$$
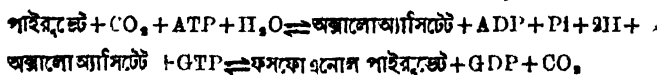
প্রথম বিক্রিয়াটি **পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ** (pyruvate carboxylase) এবং দ্বিতীয়টি **ফসফোএনোল পাইরুভেট কার্বোক্সিকাইনেজ** phosphoenol

pyruvate carboxykenase) এনজাইমের দ্বারা পরিচালিত হয়। সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ ঃ

পাইরুভেট + ATP + GTP + H_2O ⇌

ফসফোএনোল পাইরুভেট + ADP + GDP + Pi + 2H⁺
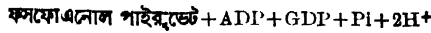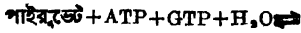
2(b). **ফ্রাকটোজ 1, 6-ডাইফসফেট থেকে ফ্রাকটোজ 6-ফসফেটের উৎপাদন** (Formation of fructose 6-phosphate from fructose 1, 6-diphosphate) ঃ কার্বন-1 পরমাণুর (C-1) ফসফেট এস্টারের আর্দ্রবিশ্লেষণ থেকে ফ্রাকটোজ 1, 6-ডাইফসফেট ফ্রাকটোজ 6-ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। ফ্রাকটোজ 1, 6-ডাই ফসফাটেজ (fructose 1, 6-diphosphatase) এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

ফ্রাকটোজ 1, 6-ডাইফসফেট + H_2O → ফ্রাকটোজ 6-ফসফেট + Pi
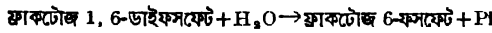
2 c). **গ্লুকোজ 6-ফসফেট থেকে গ্লুকোজের উৎপাদন** (Formation of glucose from glucose 6-phosphate) ঃ গ্লুকোজ 6-ফসফেটের আর্দ্রবিশ্লেষণ থেকে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। গ্লুকোজ 6-ফসফাটেজ (glucose 6-phosphatase) এনজাইম এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

গ্লুকোজ 6-ফসফেট + H_2O → গ্লুকোজ + Pi
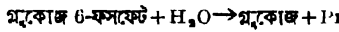
7 নং তালিকা ঃ গ্লাইকোলাইসিস ও গ্লুকোনিওজেনেসিসে এনজাইম পার্থক্য।

গ্লাইকোলাইসিস	গ্লুকোনিওজেনেসিস
হেক্সোকাইনেজ	গ্লুকোজ 6-ফসফাটেজ
ফসফোফ্রাকটোকাইনেজ	ফ্রাকটোজ 1, 6-ডাইফসফেট
পাইরুভেট কাইনেজ	পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ
	ফসফোএনোল পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ

2 d). **পাইরুভেট থেকে গ্লুকোজ উৎপাদনে ছটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বণ্ড ব্যয়িত হয়** (Six high energy phosphate bonds are spent in syrthesizing glucose from pyruvate) ঃ গ্লুকোনিওজেনেসিসে পাইরুভেট থেকে গ্লুকোজ উৎপাদনে 6টি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বণ্ড ব্যয়িত হয়। অপরপক্ষে গ্লুকোজ থেকে পাইরুভেট উৎপাদনে দুটো মাত্র ATP উৎপন্ন হয়। অতএব গ্লুকোনিওজেনেসিসে 4টি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বণ্ড বেশী খরচ হয় এবং তা প্রয়োজন হয় সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে শক্তিগত অসুবিধে থেকে (বিপরীত গ্লাইকো-

লাইসিস, $\Delta G^{0\prime} = +20$ kcal/mol) সুবিধাজনক অবস্থায় নিয়ে আসতে (গ্লুকোনিওজেনেসিস, $\Delta G^{0\prime} = -9$ kcal/mol)।

সমগ্র গ্লুকোনিওজেনেসিস বিক্রিয়াপথ নিম্নরূপ :

পাইরুভেট→অক্সালোঅ্যাসিটেট→ফসফোএনোলপাইরুভেট→2-ফসফোগ্লিসারেট →3-ফসফোগ্লিসারেট→1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারেট→গ্লিসার‍্যালডিহাইড 3-ফসফেট (⇌ডাইহাইড্রোক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট)।

গ্লিসার‍্যালডেহাইড 3-ফসফেট+ডাইহাইড্রোক্সি-অ্যাসিটোন ফসফেট→ ফ্রাকটোজ 1, 6 ডাইফসফেট→ফ্রাকটোজ 6-ফসফেট→গ্লুকোজ 6-ফসফেট→ গ্লুকোজ।

প্রথম বিক্রিয়ার এনজাইম পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ মাইটোকনড্রিয়ায় থাকে, অপরপক্ষে গ্লুকোনিওজেনেসিসের অপরাপর এনজাইমসমূহ সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। অক্সালোঅ্যাসিটেট মাইটোকনড্রিয়ার ঝিল্লির মধ্য দিয়ে ম্যালেট হিসাবে অতিক্রম করে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। NADH-যুক্ত ম্যালেট ডিহাইড্রোজেনেজের দ্বারা অক্সালোঅ্যাসিটেট মাইটোকনড্রিয়ার অভ্যন্তরে ম্যালেটে বিজারিত হয়। ম্যালেট মাইটোকনড্রিয়ার ঝিল্লির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে সাইটোপ্লাজমে পৌঁছে NAD^+-যুক্ত ম্যালেট ডিহাইড্রোজেনেজের দ্বারা পুনরায় জারিত হয়।

অন্যান্য এনজাইমের মধ্যে ফ্রাকটোজ 1, 6-ডাইফসফাটেজ ও গ্লুকোজ 6-ফসফাটেজ ছাড়া বাকী এনজাইমসমূহ গ্লাইকোলাইসিসের মত।

কোরি সাইকেল
Cori Cycle

সক্রিয় পেশীতে উৎপন্ন ল্যাকটিক অ্যাসিড গ্লুকোনিওজেনেসিসের প্রধান ব্যবহার্য উপাদান। সংকোচনশীল পেশীতে গ্লাইকোলাইসিসের মাধ্যমে যে হারে পাইরুভেট উৎপন্ন হয় সে হারে সেটি সাইট্রিক অ্যাসিডচক্রে জারিত হতে পারে না। অধিকন্তু সক্রিয় পেশীতে গ্লাইকোলাইসিসের মাধ্যমে যে হারে NADH উৎপন্ন হয় সে হারে শ্বসন চেনে (respiratory chain) তারও জারণ হয় না। আবার গ্লাইকোলাইসিস কতক্ষণ চলবে তা নির্ভর করবে NAD^+ এর সরবরাহের উপর, কারণ গ্লিসার‍্যালডিহাইডের জারণে NAD^+ অত্যাবশ্যক। ল্যাকটেট ডিহাইড্রো-জেনেজ এই অসুবিধে দূর করে, কারণ এই এনজাইমটি যখন পাইরুভেটকে বিজারিত

করে ল্যাকটেট উৎপন্ন করে তখন NADH জারিত হয়ে NAD^+ সরবরাহ বজায় রাখে।

$$
\begin{array}{ccc}
O \quad O^- & & O \quad O^- \\
\diagdown\!\!/ & & \diagdown\!\!/ \\
C & & C \\
| & & | \\
C{=}O + NADH + H^+ & \rightleftharpoons & H - C - OH + NAD^+ \\
| & & | \\
CH_3 & & CH_3
\end{array}
$$

পাইরুভেট ল্যাকটেট
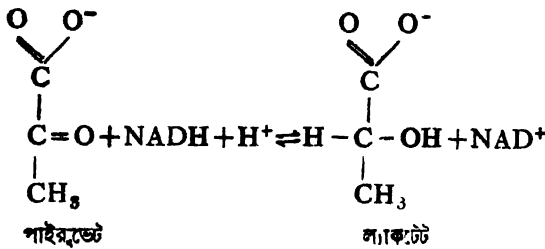
ল্যাকটেট বিপাকক্রিয়ার বন্ধপ্রান্তে অবস্থান করে। তাই বিপাকিত হবার আগে তাকে অবশ্যই পাইরুভেটে ফিরে যেতে হবে। পাইরুভেটের বিজারণ থেকে ল্যাকটেট উৎপাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল NADH-এর পুনরুৎপাদন যাতে সক্রিয় পেশীতে গ্লাইকোলাইসিস চালু থাকতে পারে। ল্যাকটেট উৎপাদন এভাবে সময় নেয় এবং বিপাকীয় বোঝার একাংশকে পেশী থেকে যকৃতে স্থানান্তরিত করে।

অধিকাংশ কোষের ঝিল্লিই ল্যাকটেট ও পাইরুভেটের প্রতি অত্যধিক ভেদ্য। উভয় পদার্থই সক্রিয় পেশী থেকে রক্তে নির্গত হয় এবং যকৃতে পরিবাহিত হয়। পাইরুভেটের চেয়ে ল্যাকটেটই বেশী পরিমাণে পরিবাহিত হয় কারণ সংকোচনশীল পেশীতে $NADH/NAD^+$ অনুপাত খুব বেশী। যকৃতে যে ল্যাকটেট প্রবেশ
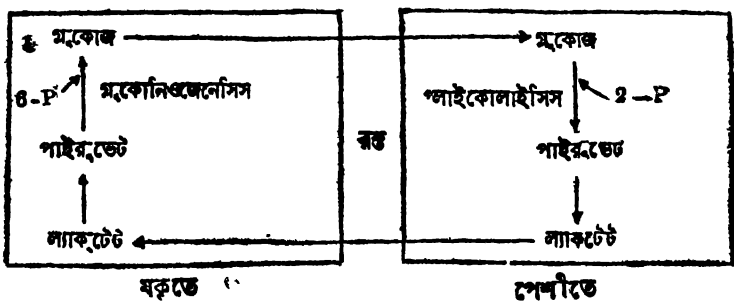
7-17নং চিত্র : কোরিচক্র। এই চক্রের মাধ্যমে সক্রিয় পেশীর বিপাকীয় বোঝার একাংশ পেশীতে স্থানান্তরিত হয়।

করে তা পুনরায় পাইরুভেটে জারিত হয়। যকৃতের সাইটোসোলে $NADH/NAD^+$ অনুপাত কম হওয়ায় এই বিক্রিয়ার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। পাইরুভেট এরপর যকৃতে গ্লুকোনিওজেনেসিসের মাধ্যমে গ্লুকোজে পরিণত হয়।

গ্লুকোজ এরপর রক্তে প্রবেশ করে এবং পেশী দ্বারা পুনরায় গৃহীত হয়। সুতরাং যকৃৎ সক্রিয় পেশীতে গ্লুকোজ সরবরাহ বজায় রাখে। পেশী তাকে ব্যবহার করে গ্লাইকোলাইসিসের মাধ্যমে ল্যাকটেটে পরিণত করে ও ATP উৎপাদন করে। ল্যাকটেট থেকে যকৃতে পুনরায় গ্লুকোজ সংশ্লেষিত হয়। এই ধরণের চক্রাকার পরিবর্তন **কোরিচক্র** (Cori cycle) নামে পরিচিত (7-17 নং চিত্র)।

গ্লাইকোজেনেসিস
Glycogenesis

দেহের কলাকোষে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন উৎপাদনের পদ্ধতিকে **গ্লাইকোজেনেসিস** বলা হয়। তবে গ্লাইকোজেনেসিস ও গ্লাইকোলাইসিস শুধুমাত্র পরস্পর বিপরীত মুখী বিক্রিয়ার পর্যায়ক্রম নয়। উভয় পদ্ধতিই সম্পূর্ণভাবে পৃথক বিপাকীয় বিক্রিয়াপথের মাধ্যমে পৃথক এনজাইম সংস্থার দ্বারা সম্পন্ন হয়।

দেহের প্রায় সব কলাকোষেই গ্লাইকোজেন উৎপন্ন হয়, তবে যকৃৎ ও পেশীতেই সর্বাধিক উৎপন্ন হয় 8নং তালিকা)। কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাবার গ্রহণ করার পর মানুষের যকৃতের গ্লাইকোজেনকে পরিমাপ করলে দেখা যায় যকৃৎ-ওজনের (1800 g) প্রায় 6% গ্লাইকোজেন থাকে। পেশীতে এই পরিমাণ 0·7%। খাদ্যগ্রহণের 12-18 ঘণ্টা পর যকৃতের গ্লাইকোজেন সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয়।

8 নং তালিকা : স্বাভাবিক বয়স্ক মানুষে (70kg) কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ।

যকৃৎ-গ্লাইকোজেন	6·0% – 108g*
পেশী গ্লাইকোজেন	0·7 = 245g†
কোষবাহিঃস্থ গ্লুকোজ	0·1 = 10g†
মোট : 363g × 4	= 1452 kcal

পেশীগ্লাইকোজেন খুব কম ক্ষেত্রেই পেশীর মোট ওজনের 1%এর বেশী হয়।

1975 সালে লুইস লেলোর (Luis Leloir) এবং তার সহকর্মীরা দেখালেন যে গ্লাইকোজেন একটি পৃথক বিক্রিয়াপথের মাধ্যমে সংশ্লেষিত হয়। গ্লুকোজ

*যকৃতের ওজন = 1800g, †পেশীর ওজন = 35 কে.জি, ‡মোট পরিমাণ 10 লিটার।

এককের দাতা (glycosyl donor) ইউরিডিন ডাইফসফেট গ্লুকোজ(UDP-glucose), গ্লুকোজ 1-ফসফেট নয়। তাই সংশ্লেষক বিক্রিয়াসমূহ গ্লাইকোজেন ভাংগনের বিক্রিয়াসমূহের বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া নয়।

সংশ্লেষণ : গ্লাইকোজেন n + UDP-গ্লুকোজ → গ্লাইকোজেন (n+1) + UDP

ভাংগন : গ্লাইকোজেন (n+1) + Pi → গ্লাইকোজেন n + গ্লুকোজ 1-ফসফেট

গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণের পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ :

1. **গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 1-ফসফেটের উৎপাদন** (Formation of glucose 1-phosphate from glucose) : গ্লুকোজ ATP এর দ্বারা ফসফরাসযুক্ত হয়ে গ্লুকোজ 6 ফসফেট উৎপন্ন করে। **হেক্সোকাইনেজ** এনজাইম এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। গ্লুকোজ 6-ফসফেট এরপর গ্লুকোজ 1-ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। বিক্রিয়াটি **ফসফোগ্লুকোমিউটেজ** (phosphogluco-mutase) এনজাইমের দ্বারা পরিচালিত হয়। এনজাইম নিজেই ফসফরাসযুক্ত হয় এবং ফসফো-গ্রুপ বিপরীতমুখী বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে যেখানে গ্লুকোজ 1, 6-ডাইফসফেট অন্তর্বর্তী যোগ হিসাবে উৎপন্ন হয়।

এনজাইম P + গ্লুকোজ 6 ফসফেট ⇌ এনজাইম + গ্লুকোজ 1, 6 ডাইফসফেট ⇌ এনজাইম-P + গ্লুকোজ 1-ফসফেট
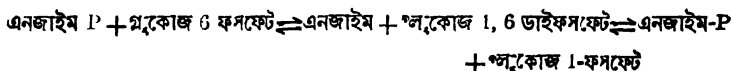
2. **UDP-গ্লুকোজ গ্লুকোজের একটি সক্রিয় অবস্থা** UDP-glucose an activated form of glucose) : গ্লুকোজের একটি সক্রিয় অবস্থা হল UDP-গ্লুকোজ। UDP-গ্লুকোজের গ্লুকোসিল ইউনিট বা গ্লুকোজ এককের C-1 কার্বন পরমাণু সক্রিয় হয় কারণ এর হাইড্রোক্সিল গ্রুপ UDP-এর ডাই-ফসফেটের সংগে এস্টারিত ভূত হয়ে থাকে।

গ্লুকোজ 1-ফসফেট ও ইউরিডিন ট্রাইফসফেটের বিক্রিয়া থেকে UDP-গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।

UDP-গ্লুকোজ পাইরোফসফোরীলেজ (UDP-glucose Pyrophospho-rylase) এনজাইম এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

গ্লুকোজ 1 ফসফেট + UTP ⇌ UDP-গ্লুকোজ + PPi
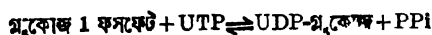
বিক্রিয়াটি সহজে উভয়মুখী। তবে পাইরোফসফেট দেহের মধ্যে অজৈব পাইরোফসফাটেজের দ্বারা দ্রুত অর্থোফসফেটে আদ্রবিশ্লিষ্ট হয়। এই

আর্দ্রবিশ্লেষণ একমুখী হওয়ার ফলে UDP-গ্লুকোজের সংশ্লেষণ সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

গ্লুকোজ 1-ফসফেট + UTP ⇌ UDP-গ্লুকোজ + PPi

$PPi + H_2O \rightarrow 2Pi$

গ্লুকোজ 1-ফসফেট + UTP + H_2O → UDP-গ্লুকোজ + 2Pi
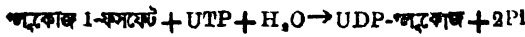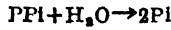
3 UDP-গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন চেনে গ্লুকোজের হস্তান্তর (Transfer of glucose from UDP-glucose to glycogen chain) : পূর্বস্থিত গ্লাইকোজেনের অবিজারণধর্মী প্রান্তে (non-reducing end) গ্লুকোজ-একক সংযুক্ত হয়। UDP-গ্লুকোজের সক্রিয় গ্লুকোজ একক গ্লাইকোজেনের C-4 এর হাইড্রোক্সিল গ্রুপে হস্তান্তরিত হয়ে ∝-1, 4-গ্লাইকোসিডিক বণ্ড গঠন করে। এভাবে পর্যায়ক্রমে ∝-1, 4-বণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং গ্লাইকোজেন দৈর্ঘ্যে সম্প্রসারিত হয়। এই বিক্রিয়াটি **গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ** (glycogen synthetase) এনজাইমের দ্বারা অনুঘটিত হয়। তবে পলিস্যাকারাইড চেনে পূর্ব থেকে চারের বেশী অবশেষ (residue) থাকলে তবেই একটি করে গ্লুকোজ একক এই এনজাইমের দ্বারা প্রান্তদেশে সংযুক্ত হতে পারে। অতএব গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণে একটি **প্রাইমার** (primer) দরকার।

UDP-গ্লুকোজ + গ্লাইকোজেন$_n$ → গ্লাইকোজেন$_{n+1}$ + UDP
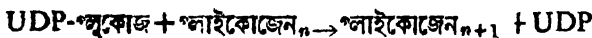
4. শাখাউৎপাদক এনজাইম ∝-1, 6-সংযোগ গঠন করে (A branching enzyme forms ∝-1,6-linkages) : গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ শুধুমাত্র ∝-1, 4 সংযোগ স্থাপনে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। আর একটি এনজাইম প্রয়োজন যা ∝-1, 6 সংযোগ স্থাপন করে গ্লাইকোজেনকে শাখাযুক্ত-পলিমারে (polymer) পরিণত করতে পারে। গ্লাইকোজেনের শাখাবৃদ্ধি তার দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া শাখাবৃদ্ধি পেলে গ্লাইকোজেনের অবিজারণ-ধর্মী প্রান্তের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এই প্রান্তগুলোই গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ ও ফসফোরীলেজের ক্রিয়াস্থান। সুতরাং গ্লাইকোজেনের শাখা বৃদ্ধি পেলে গ্লাই-কোজেন সংশ্লেষণ ও ভাংগন দুটোই বৃদ্ধি পায়।

গ্লাইকোজেন সিনথেটেজের প্রভাবে যখনই 6 থেকে 11টি গ্লুকোজ অণু গ্লাইকোজেন-শাখায় প্রবেশ করে তখনই দ্বিতীয় একটি এনজাইম **অ্যামাইলো 1, 4—1, 6 ট্রান্সগ্লুকোসিডেজ** গ্লাইকোজেনের উপর ক্রিয়া করে, 1, 4 শাখার একটি অংশকে (কমপক্ষে 5 একক সম্পন্ন) সন্নিহিত শাখায় স্থানান্তরিত করে;

এবং 1,6 বণ্ডের সংশ্লেষণ ঘটায় (7-18 নং চিত্র)। এই দুটো এনজাইমের সম্মিলিত সক্রিয়তায় গ্লাইকোজেন অণুর সংশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয়।
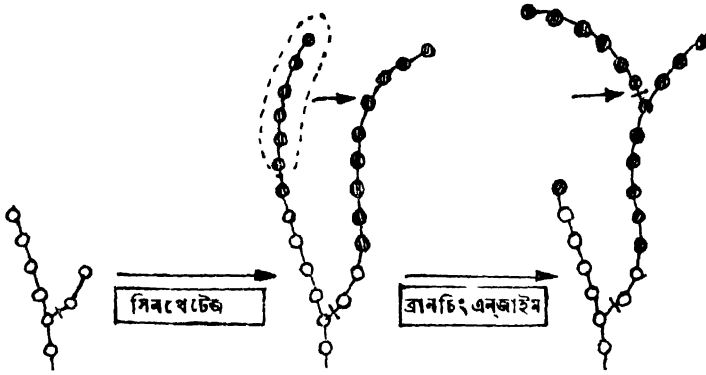
7-18 নং চিত্র : গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ।

5. **গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বণ্ড** (High energy phosphate bond in glycogen synthesis) : গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণের সময় প্রতিটি গ্লুকোজ অণু থেকে গ্লুকোজ 6-ফসফেট উৎপাদনে একটি ATP ব্যয়িত হয়। আর একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বণ্ড ব্যয়িত হয় গ্লুকোজ 6-ফসফেটকে গ্লাইকোজেনে সংযুক্ত করার সময়। UDP থেকে UTP এর পুনঃসংশ্লেষণে আর একটি ATP প্রয়োজন। শেষোক্ত বিক্রিয়াটির অনুঘটনে **নিউক্লিওসাইড ডাইফসফোকাইনেজ** (nucleoside diphosphokinase) অংশগ্রহণ করে। গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণের সম্পূর্ণ বিক্রিয়াক্রম নিম্নরূপ :

(1) গ্লুকোজ + ATP → গ্লুকোজ 6-ফসফেট + ADP

(2) গ্লুকোজ 6-ফসফেট → গ্লুকোজ 1-ফসফেট

(3) গ্লুকোজ 1-ফসফেট + UTP → UDP-গ্লুকোজ + PPi

(4) PPi + H_2O → 2Pi

(5) UDP-গ্লুকোজ + গ্লাইকোজেন$_n$ → গ্লাইকোজেন$_{n+1}$ + UDP

(6) UDP + ATP → UTP + UDP

যোগফল : গ্লুকোজ + 2 ATP + গ্লাইকোজেন$_n$ + H_2O → গ্লাইকোজেন$_{n+1}$ + 2ADP + 2Pi

অতএব একটি গ্লুকোজ অণুকে গ্লাইকোজেনে প্রবেশ করাতে দুটো ATP খরচ হয়।

6. **গ্লাইকোজেন সিনথেটেজের সক্রিয়তা** (Activity of glycogen synthetase) : পেশী ও যকৃতে গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুভাবে অবস্থান করে। সিনথেটেজ I সক্রিয় এবং সিনথেটেজ D নিষ্ক্রিয় বা কম নিষ্ক্রিয়। গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ ফসফরাস সংযুক্ত হলেই সিনথেটেজ

D-তে পরিণত হয় তখন তার সক্রিয়তা গ্লুকোজ 6-ফসফেটের উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। গ্লুকোজ 6-ফসফেটের পরিমাণ বা মাত্রা বেশী হলেই শুধু এটি সক্রিয়তা প্রদর্শন করতে পারে। অপরপক্ষে ফসফরাসবিযুক্ত সেনথেটেজের (সিনথেটেজ I) সক্রিয়তা গ্লুকোজ 6-ফসফেটের উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়।

পেশীতে সিনথেটেজ I নিম্নলিখিতভাবে হরমোনের প্রভাবে সিনথেটেজ Dতে পরিণত হয় (7-19 নং চিত্র) ঃ
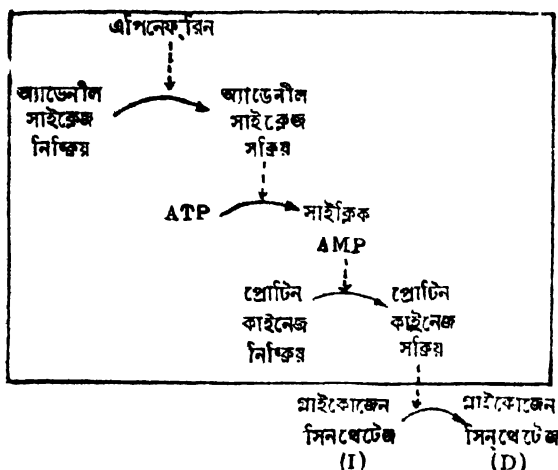
7-19 নং চিত্র ঃ গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণের নিয়ন্ত্রণ। প্রোটিনকাইনেজের সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গ্লাইকোজেন সিনথেটেজের সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রণ।

(1) এপিনেফরিন পেশীকোষের ঝিল্লিতে আবদ্ধ হয় এবং অ্যাডেনীল সাইক্লেজকে সক্রিয় করে।

(2) অ্যাডেনীল এরপর ATP থেকে সাইক্লিক AMP উৎপন্ন করে।

(3) সাইটোপ্লাজমে সাইক্লিক AMP-র বৃদ্ধিতে **প্রোটিন কাইনেজ** (protein kinase) সক্রিয়তা লাভ করে। সাইক্লিক AMP-র অনুপস্থিতিতে কাইনেজ এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অ্যালোস্টেরিক স্থানে cAMC আবদ্ধ হলে কাইনেজ এনজাইম উদ্দীপিত হয়।

(4) সাইক্লিক AMP-নির্ভর প্রোটিন কাইনেজ গ্লাইকোজেন সিনথেটেজে ফসফরাস সংযুক্তি ঘটায়, ফলে সিনথেটেজে I সিনথেটেজ Dতে পরিণত হয়।

সাইক্লিক AMP **ফসফোডাইএস্টারেজ** (phosphodiesterase) এনজাইমের দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এই বিশেষ সক্রিয়তার দরুনই সাইক্লিক AMP-র মাত্রা নিম্নমানে বজায় রাখা সম্ভব হয়। অপর একটি এনজাইম

গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ ফসফাটেজ (glycogen synthetase phosphatase) সিনথেটেজ Dকে ফসফরাস-বিযুক্তির মাধ্যমে সিনথেটেজ I তে রূপান্তরিত করতে পারে। গ্লাইকোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সিনথেটেজ ফসফাটেজের সক্রিয়তা ব্যাহত হয়, ফলে বিক্রিয়াও হ্রাস পায়।

গ্লাইকোজেনোসিস বা গ্লাইকোজেন সঞ্চয়জাত রোগ

Glycogenosis or Glycogen Storage Disease

গ্লাইকোজেনোসিস বা গ্লাইকোজেন সঞ্চয়জাত রোগের প্রথম বর্ণনা দেন এডগার ফন গিয়ার্কি (Edger von Gierke) 1929 সালে। এই রোগাক্রান্ত

9নং তালিকা : গ্লাইকোজেন সঞ্চয়জাত রোগ।

শ্রেণী বা টাইপ	ত্রুটিপূর্ণ এনজাইম	আক্রান্ত অংগ	আক্রান্ত অংগের গ্লাইকোজেন	ত্রুটিজাত পরিবর্তন
I ফন গিয়ার্কি'র রোগ	গ্লুকোজ ফসফাটেজ	যকৃৎ, কিডনি	পরিমাণ বৃদ্ধি স্বাভাবিক গঠন	যকৃতের অত্যধিক আয়তন বৃদ্ধি, তীব্র হাইপোগ্লাইসেমিয়া, কিটোসিস, হাইপারলাইপেমিয়া।
II পোম্পির রোগ	α-1, 4-গ্লুকোসিডেজ (লাইসোজোমগত)	সব অংগ	অত্যধিক পরিমাণ বৃদ্ধি, স্বাভাবিক গঠন।	হার্দ-শ্বসন বৈকল্যের জন্য মৃত্যু ঘটে, প্রধানত 2 বছরের আগে।
III কোরির রোগ	অ্যামাইনো-1, 6-গ্লুকোসিডেজ	পেশী, যকৃৎ	পরিমাণ বৃদ্ধি প্রান্তীয় শাখার হ্রাস	টাইপ I এর মত তবে খানিকটা মৃদু।
IV অ্যানডারসেনের রোগ	শাখা-উৎপাদক এনজাইম (α-1, 4$\rightarrow\alpha$-1, 6)	যকৃৎ, প্লীহা	পরিমাণ স্বাভাবিক, সুদীর্ঘ প্রান্তশাখা	যকৃতের ক্রমবর্ধমান সিরোসিস (cirrhosis) যকৃত বৈকল্য (failure) থেকে মৃত্যু, সাধারণত 2 বছরের পূর্বে।
V ম্যাক অ্যারডেলের রোগ	ফসফোরাইলেজ	পেশী	সামান্য বৃদ্ধি, স্বাভাবিক গঠন	শ্রমসাধ্য কাজ করতে পারে না, কারণ পেশী, ক্র্যাম্প (cramps) ধরে।
VI হারের রোগ	ফসফোরাইলেজ	যকৃৎ	পরিমাণ বৃদ্ধি	টাইপ I এর মত তবে মৃদুধর্মী।
VII	ফসফোফ্রাকটোকাইনেজ	পেশী	পরিমাণ বৃদ্ধি স্বাভাবিক গঠন	টাইপ V এর মত।
VIII	ফসফোরাইলেজ কাইনেজ	যকৃৎ	পরিমাণ বৃদ্ধি স্বাভাবিক গঠন	যকৃতের আয়তনের খানিকটা হাইপোগ্লাইসেমিয়া বৃদ্ধি।

রোগীর যকৃতের অত্যধিক স্ফীতির ফলে উদর অস্বাভাবিক ভাবে স্ফীত হয়ে ওঠে। খাদ্যগ্রহণের অন্তর্বর্তী সময়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া প্রকট হয়ে দেখা দেয়, গ্লুকাগোন বা এপিনেফ্রিন দেহে প্রবেশ করালে রক্তশর্করার কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এগুলো প্রধানত **বংশগত বিচ্যুতি** (inherited disorders)। এসব রোগের সংক্ষিপ্তসার 9নং তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এদের মধ্যে টাইপ I ও VII অটোজোমগত অপ্রধান (recessive) জিনের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। টাইপ VIII যৌনক্রোমোজোম সক্রান্ত।

ফন গিয়ার্কি রোগের এনজাইমগত ত্রুটির কথা প্রথম আবিষ্কার করেন **কোরিস** (Coris, 1952)। যকৃৎ এনজাইমের জন্মগত অনুপস্থিতির জন্যই যে এই রোগের কারণ তা প্রথম প্রমাণ হল।

শ্রেণী বা টাইপ : I (Von Gierke's disease), II (Pompe's disease), III (Cori's disease), IV (Andersen's disease), V (Mc Ardle's disease), VI (Her's disease), VII এবং VIII.

লিপিডের বিপাকক্রিয়া

METABOLISM OF LIPIDS

স্তন্যপায়ী প্রাণীতে বিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এমন লিপিডের মধ্যে প্রধান : ট্রাইগ্লিসারাইড, ফসফোলিপিড, স্টেরোয়েড এবং তাদের বিপাকলব্ধ পদার্থ। যেমন : দীর্ঘচেন ফ্যাটি অ্যাসিড (মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড), গ্লিসারল এবং কিটোন বডি।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল লিপিড ক্যালরি উৎপাদনকারী পদার্থের এক নিষ্ক্রিয় ভান্ডার হিসাবে দেহে অবস্থান করে। দেহে শক্তি-উৎপাদনকারী খাদ্যের অভাব হলেই লিপিড সে কাজে ব্যবহৃত হয়। এখন জানা গেছে দেহের ফ্যাট সচল অবস্থায় থাকে এবং অনবরত তা সঞ্চয় ভাণ্ডার থেকে যেমন হ্রাস পায় তেমনি প্রতিস্থাপিত হয়। কার্বোহাইড্রেটের একটি বিরাট অংশ শক্তি-উৎপাদনে ব্যবহৃত হবার পূর্বে ট্রাইগ্লিসারাইডে পরিণত হয়। ফলে, ট্রাইগ্লিসারাইডস্থিত ফ্যাটি অ্যাসিড অনেক কলাকোষে শক্তির প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করে। অবশ্য কোন কোন দেহাংগ কার্বোহাইড্রেটের চেয়ে ফ্যাটি অ্যাসিডকেই প্রধান শক্তি-উৎপাদনকারী পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করে।

1. **রক্তের ফ্যাট** (Fats of blood) : রক্তে যে ধরনের ফ্যাট দেখা যায়, তার মধ্যে প্রধান : (a) প্রশমিত ফ্যাট, (b) মুক্ত কোলেস্টারোল (c) কোলেস্টারোল এস্টার এবং (b) লেসিথিন ও সামান্য পরিমাণ ফস্ফোলিপিড।

2. **রক্তস্থিত ফ্যাটের কার্যাবলী** (Functions of blood lipids) : রক্তের ফ্যাটজাতীয় পদার্থ যে কার্য সম্পন্ন করে নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল : (I) ফুসফুসের মধ্য দিয়ে চলাকালে ফুসফুসীয় কলাকোষ কিছুটা ফ্যাটজাতীয় পদার্থকে গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করে। (ii) মাতৃস্তন সামান্য পরিমাণ স্নেহদ্রব্যকে গ্রহণ করে এবং দুগ্ধের স্নেহদ্রব্য হিসাবে তাদের রূপান্তরিত করে। (iii) কিছু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি রক্তের স্নেহজাতীয় পদার্থকে ব্যবহার করে স্টেরোয়েড হরমোন উৎপন্ন করে। (iv) দেহের কলাকোষ জৈব জারণের মাধ্যমে স্নেহদ্রব্য থেকে জৈবশক্তি উৎপন্ন করে। কার্বোহাইড্রেটের জারণ থেকে উৎপন্ন জৈবশক্তির দ্বিগুণের চেয়েও বেশী জৈবশক্তি ফ্যাটের জারণ থেকে উৎপন্ন হয়। (v) রক্তের অতিরিক্ত ফ্যাট দেহে সঞ্চিত ফ্যাট বা ডিপোফ্যাট হিসাবে জমা হয় এবং দেহের অতি প্রয়োজনীয় অংগপ্রত্যংগের যান্ত্রিক রক্ষক হিসাবে কার্য করে। (vi) প্রশমিত ফ্যাটের মধ্যে ফ্যাটদ্রবণীয় ভিটামিন A, D, E, এবং K সহজলভ্য হিসাবে অবস্থান করে। (vii) যকৃৎ রক্তের ফ্যাটকে গ্রহণ করে তার সাহায্যে কার্বোহাইড্রেটের সংশ্লেষণ ঘটাতে পারে। (viii) যকৃতে ফ্যাটিঅ্যাসিড ও অ্যামোনিয়ার সংযুক্তিতে প্রোটিন উৎপাদন সম্ভব। (ix) তাপের কুপরিবাহী হিসাবে ইহা দেহউষ্ণতার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। (x) ফ্যাটি অ্যাসিড ফসফোলিপিড ও গ্লাইকোলিপিড উৎপাদনের প্রধান উপাদান হিসাবে কাজ করে।

কিটোসিস
Ketosis

রক্তে অধিক পরিমাণ কিটোনপদার্থ (ketone body) সঞ্চিত হলে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তাকে **কিটোসিস** বলে। রক্তস্থিত কিটোন-পদার্থের বৃদ্ধির ফলে (**কিটোনেমিয়া**) প্রস্রাবের সংগে কিটোন পদার্থ নির্গত হয় (**কিটোনুরিয়া**) এবং নিঃশ্বাসে অ্যাসিটোনের গন্ধ পাওয়া যায়।

কিটোনপদার্থ বলতে **অ্যাসিটোন, অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং বিটা-হাইড্রোক্সিবিউটারিক অ্যাসিড** এই তিনটি পদার্থকে বুঝায়। ফ্যাটি অ্যাসিডের জৈব জারণের সময় কার্বোহাইড্রেটের অভাব দেখা দিলে কিটোন পদার্থের সৃষ্টি হয়। প্রধানত তিনটি কারণে দেহে কার্বোহাইড্রেটের অভাব দেখা দিতে পারে : (a) **অনশন,** (b) **মধুমেহ** এবং (c) **পরীক্ষাধীন প্রাণীতে সৃষ্ট কৃত্রিম মধুমেহ**। কার্বোহাইড্রেটের অভাবে দেহে বিশেষ দুটো পরিবর্তন সংঘটিত হয় : (1) দেহের প্রয়োজনীয় জৈবশক্তি প্রধানত স্নেহজাতীয় পদার্থের জারণ থেকে পাওয়া যায়। ফলে স্নেহদ্রব্য জারিত হয়ে অধিক পরিমাণে অ্যাসিটাইল কো-এ উৎপন্ন করে। (2) প্রয়োজনীয় পাইরুভিক অ্যাসিডের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্রেব্‌স চক্রের প্রয়োজনীয় অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হতে পারে না।
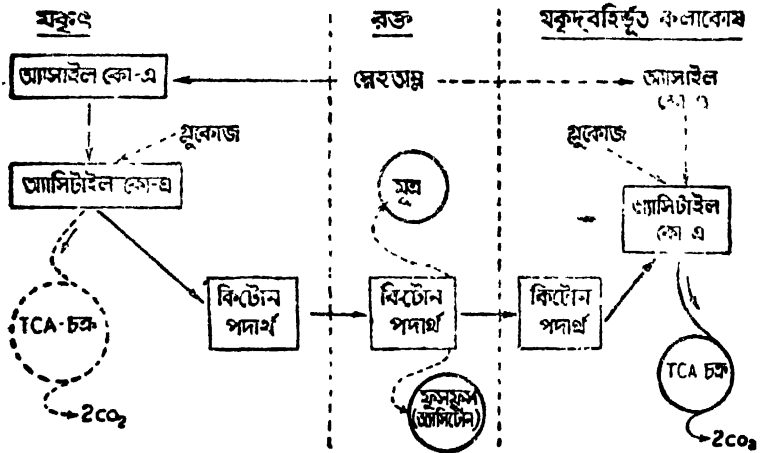
7-20 নং চিত্র : কিটোন পদার্থের উৎপাদন, জারণ ও রেচন।

এই পরিস্থিতিতে দুটো অ্যাসিটাইল কো-এ অণু যুক্ত হয়ে অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল কো-এ উৎপন্ন করে। এই পদার্থটি যকৃৎস্থিত এনজাইম **ডিঅ্যাসাইলেজের** (deacylase) দ্বারা আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হয়ে **অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড** উৎপাদন করে। উৎপন্ন পদার্থ থেকে এক অণু CO_2 নির্গত হলে **অ্যাসিটোন** এবং পদার্থটি বিজারিত হলে **বিটা-হাইড্রোক্সিবিউ-**

টিরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে **বিটা-হাইড্রোক্সিবিউটীরিক ডেহাইড্রোজেনেজ** এনজাইম এবং NAD অংশগ্রহণ করে।

দেহে এভাবে কিটোনপদার্থের উৎপাদনকে **কিটোজেনেসিস** নামে অভিহিত করা হয়। কিটোজেনেসিস প্রধানত যকৃতেই সম্পন্ন হয়। যকৃদ্ বহির্ভূত কলাকোষ উৎপন্ন কিটোনপদার্থের একাংশকে TCA-চক্রের মাধ্যমে জারিত করতে পারে। অবশিষ্টাংশ রক্তে জমা হয় এবং কিয়দংশ মূত্র ও ফুসফুসের মাধ্যমে নির্গত হয়। কিটোন পদার্থের উৎপাদন, জারণ ও রেচন 7-20নং চিত্রে উল্লেখিত হয়েছে।

কার্বোহাইড্রেটকে ব্যবহার করার মত উপযুক্ত অবস্থা দেহে বর্তমান থাকলে কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে বা দেহে প্রবেশ করিয়ে কিটোনপদার্থ উৎপাদন রোধ করা সম্ভবপর। কিটোনপদার্থ-উৎপাদনে বাধা দেয় বলে কার্বোহাইড্রেটকে কিটোনোৎপাদন-বিরোধী (anti-kitogenic) পদার্থ হিসাবে অভিহিত করা হয়। স্নেহজাতীয় পদার্থের গ্লিসারল-অংশ (10 শতাংশ) এবং প্রোটিনের 60 শতাংশ কিটোনোৎপাদন-বিরোধী পদার্থ হিসাবে ক্রিয়া করে।

স্নেহদ্রব্যের জৈব জারণ

Bio-oxidation of Fats

স্নেহদ্রব্যের জৈব জারণ প্রধানত যকৃৎকোষের মাইটোকন্ড্রিয়াতে সংঘটিত হয়। প্রশমিত স্নেহদ্রব্যের দুটো প্রধান অংশ হল **গ্লিসারল** এবং **ফ্যাটিঅ্যাসিড**। গ্লিসারল গ্লিসার‍্যাল্‌ডেহাইড-3 ফস্‌ফেটে রূপান্তরিত হয়ে কার্বোহাইড্রেটের মত সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়াতে জারিত হয়। অপরপক্ষে ফ্যাটিঅ্যাসিড বা স্নেহঅম্লের জারণ দুটো পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ঃ (1) **বিটা**-(β-oxidation) **জারণ** এবং (2) **ওমেগা-জারণ** (ω-oxidation)। ফ্যাটিঅ্যাসিডের কার্বক্সিল কার্বনের পরবর্তী কার্বনকে (কার্বন নং 2) α-কার্বন, 3নং কার্বনকে β-কার্বন এবং প্রান্তীয় মিথাইল কার্বনকে ω-কাবন বলা হয়। যেমনঃ

$$\overset{\omega}{CH_3}.\quad \overset{\gamma}{CH_2}.\quad \overset{\beta}{CH_2}.\quad \overset{\alpha}{CH_2}.\ COOH$$
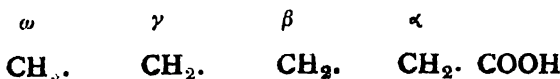
1. **বিটাজারণ** (β-oxidation): ফ্যাটিঅ্যাসিড বা স্নেহঅম্লের জৈব জারণের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান **বিটা-জারণ** (β-oxidation)।

এই মতবাদের উদ্গাতা নোপ (Knoop)। নোপের বক্তব্য : (a) ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণ বিটাস্থানে (—COOH মূলক থেকে তৃতীয় কার্বনে) সংঘটিত হয়, (b) বিটা-জারণের প্রতি পদক্ষেপে 2টি কার্বন-একক নির্গত হয় এবং স্নেহ-অম্লের 2টি কার্বন-অণু হ্রাস পায়. (c) অবশিষ্টাংশের প্রথম কার্বন (পূর্বের তৃতীয়) প্রথমে কিটো-অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং পরে সেখানে নূতন—COOH মূলক হয়, (d) এই পদার্থটি এরপর একইভাবে জারিত হয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত শেষোক্ত কার্বন দুটো অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে, (e) এভাবে প্রতিটি ফ্যাটিঅ্যাসিড অনেকগুলো 2-কার্বন একক (অ্যাসিটিক অ্যাসিড) এবং একটি অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে, (f) এই পদার্থগুলো এরপর জারিত হয়ে CO_2 এবং H_2O উৎপন্ন করে।

এই মতবাদের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটলেও বিটা-জারণের প্রতি ধাপে 2 কার্বন-একক উৎপন্ন হওয়ার ঘটনা স্বীকৃত হয়েছে। অধুনা ফ্যাটি অ্যাসিডের জৈব জারণে কো-এনজাইম-এ (CoA-SH) নামক পদার্থটির গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। 7-21নং চিত্রে ফ্যাটি অ্যাসিডের বিপাকের বিভিন্ন ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

1. (a) বিটাজারণের পর্যায়ক্রম : বিক্রিয়ার শুরুতে এনজাইম **থায়োকাইনেজ** (1) ফ্যাটি অ্যাসিড, কো এনজাইম-এ এবং ATP-এর মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে **সক্রিয় ফ্যাটি অ্যাসিড** (কো-এনজাইম এস্টার) উৎপন্ন করে। এই পদার্থটি **এসাইল ডিহাইড্রোজেনেজ** (2) ও FAD-এর দ্বারা জারিত হয়ে আলফা, বিটা-অসম্পৃক্ত ফ্যাটিঅ্যাসিড কো-এ উৎপন্ন করে। **এনোল হাইড্রেজ** (3) এই পদার্থের সংগে জলের সংযুক্তি ঘটিয়ে তাকে বিটা-হাইড্রোক্সি ফ্যাটিঅ্যাসিড কো-এ-তে পরিণত করে। 2-টি হাইড্রোজেন হারিয়ে পদার্থটি এরপর β-কিটো-ফ্যাটি-অ্যাসিড কো-এ-তে রূপান্তরিত হয়। এনজাইম **বিটা-হাইড্রোক্সি-এসাইল ডিহাইড্রোজেনেজ** (4) এবং NAD এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। পরিশেষে উৎপন্ন এই পদার্থটি বিটা স্থানে বিশ্লিষ্ট হয়ে 2-কার্বন একক (অ্যাসিটাইল কো-এনজাইম-এ) উৎপন্ন করে এবং অবশিষ্টাংশ পুনরায় একইভাবে **থায়োলেজ** (5) এনজাইমের উপস্থিতিতে জারিত হয়।

1. (b) বিটা জারণের অন্তিম ধাপ : অধিকাংশ প্রকৃতিজাত স্নেহদ্রব্য জোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এ জাতীয় স্নেহদ্রব্যের ফ্যাটি অ্যাসিড বা স্নেহঅম্ল বিটা-জারণের অন্তিম ধাপে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ হিসাবে 2টি অ্যাসিটাইল

কো-এ অণু উৎপন্ন করে। অপরপক্ষে বিজোড়সংখ্যক কার্বন পরমাণু সম্পন্ন স্নেহঅম্লের বিটা-জারণের অন্তিম ধাপে এক অণু অ্যাসিটাইল কো-এ এবং এক অণু প্রোপিওনিল কো-এ (propionyl CoA) উৎপন্ন হয়।
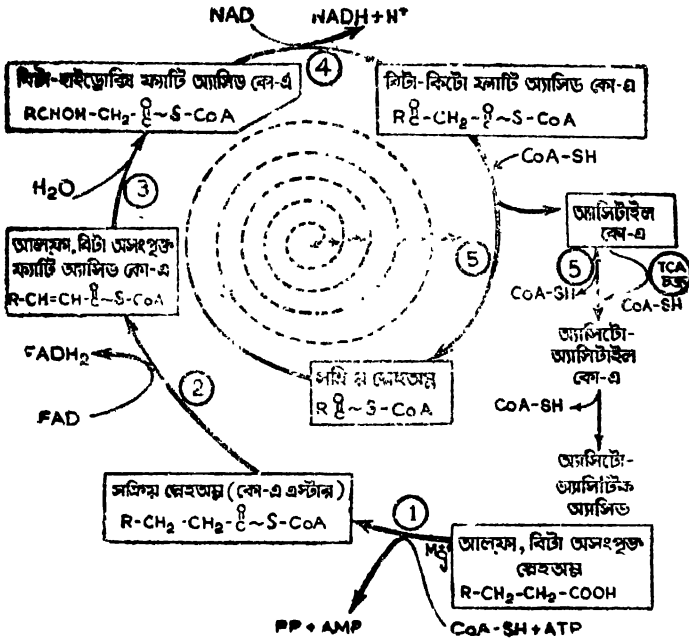
7-21 নং চিত্র : বিটাজারণ।

1. (c) **বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের পরিণতি :** বিটাজারণের ফলে উৎপন্ন সবকটি অ্যাসিটাইল কো-এ অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডের সংগে যুক্ত হয়ে সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং TCA চক্রের মাধ্যমে CO_2 এবং H_2O-এ জারিত হয়। অপরপক্ষে প্রপিওনিল কো-এ এন্‌জাইম **কার্বক্সিলেজ** (a) এবং **আইসোমারেজের** (b) সহযোগিতায় নিম্নলিখিত উপায়ে TCA-চক্রে প্রবেশ করে।

প্রপিওনিল কো-এ —(a)→ মিথাইল ম্যালোনিল কো-এ —(b)→ সাক্‌সিনিল কো-এ ↓

TCA চক্র ← সাকসিনিক অ্যাসিড
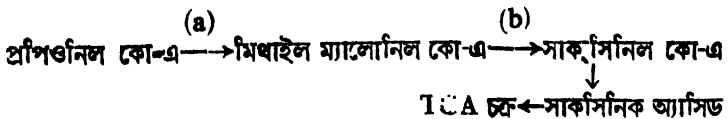
1. (d) **জৈব শক্তির উৎপাদন :** গ্লিসারলের সংগে যদিও প্রথমে ATP-এর সংযোগ অপরিহার্য তথাপি TCA-চক্রের মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ জারণ থেকে প্রায়

20ATP উৎপন্ন হয়। প্রাণীকোষের সহজলভ্য ফ্যাটি অ্যাসিড বা স্নেহঅম্ল যথাক্রমে 16 ও 18 কার্বনসম্পন্ন প্যাল্‌মিটিক ও স্টিয়ারিক অ্যাসিড। 16-কার্বন-সম্পন্ন প্যাল্‌মিটিক অ্যাসিডের বিটা-জারণ 7 বার সংঘটিত হয় এবং 7×5 =35ATP উৎপন্ন হয়। বিটাজারণ থেকে উৎপন্ন ৪টি অ্যাসিটাইল কো-এ অণু TCA-চক্রের মাধ্যমে 8×12=96ATP উৎপন্ন করে। অতএব প্যাল্‌মিটিক অ্যাসিডের সম্পূর্ণ জারণ থেকে 35+96=131 সংখ্যক ATP উৎপন্ন হয়। স্নেহ অম্লের জৈব জারণ শুরু হবার সময় একটি ATP ব্যয়িত হয়। অতএব, মোট 130টি ATP পাওয়া যায়।

2. ওমেগা জারণ (ω-oxidation): ভার্‌কেড (Verkade) দেখেছেন, প্রশমিত স্নেহদ্রব্যের সংগে 8-12টি কার্বনসম্পন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডকে খেতে দিলে মানুষ ও কুকুরের মূত্রে ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড নির্গত হয়। তার ধারণা অনুযায়ী এই সব ফ্যাটিঅ্যাসিড প্রান্তীয় মিথাইলস্থানে বা ওমেগাস্থানে জারিত হয়ে ওমেগাহাইড্রোক্সি ফ্যাটিঅ্যাসিড উৎপন্ন করে। এভাবে ফ্যাটিঅ্যাসিড ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। ক্যাপ্‌রোইক অ্যাসিড এ ভাবে 8, 6 এবং 4 কার্বন অণুসম্পন্ন ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। NADH, Fe^{++}, O_2 এবং প্রোটিন ভগ্নাংশের (যার কার্য অজ্ঞাত) উপস্থিতিতে এজাতীয় জারণ শুরু হয়। ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড একবার উৎপন্ন হলে পরবর্তী ধাপে ইহা ওমেগা প্রান্তীয় কার্বক্সিলের পববর্তী β-স্থানে পর্যায়ক্রমে বিটা-জারণের দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

$$CH_3(CH_2)_{10}COOH \xrightarrow{\omega\text{-জারণ}} COOH(CH_2)_{10}COOH$$

$$\downarrow \beta\text{-জারণ}$$

$$COOH(CH_2)_8COOH$$

$$\downarrow \beta\text{-জারণ}$$

$$COOH(CH_2)_6COOH$$

$$\downarrow \beta\text{-জারণ}$$

$$COOH(CH_2)COOH \leftarrow COOH(CH_2)_4COOH$$

(সাকসিনিক অ্যাসিড)　　সাইট্রিক অ্যাসিড

↓

TCA চক্র
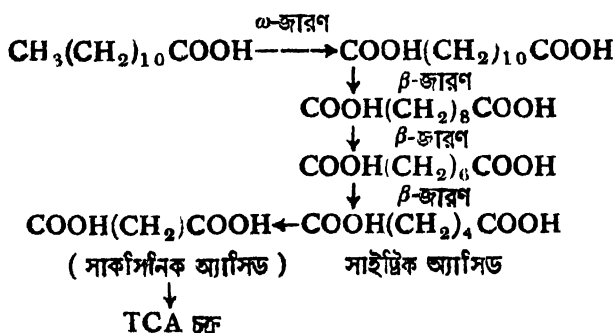
ওমেগা-জারণের প্রয়োজনীয় এন্‌জাইম যকৃৎ ও ব্যাক্‌টেরিয়াতে পাওয়া যায়।

ফ্যাটি অ্যাসিডের সংশ্লেষণ

Biosynthesis of Fatty Acids

ফ্যাটি অ্যাসিডের সংশ্লেষণ জারণ পদ্ধতির বিপরীত বিক্রিয়াপথের মাধ্যমে সংঘটিত হয় না। সংশ্লেষণ ও ভাংগন সম্পূর্ণ পৃথক বিক্রিয়াপথের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণের কিছুসংখ্যক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

(a) সংশ্লেষণ সাইটোসোলে সংঘটিত হয়, অপরপক্ষে জারণ মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে সম্পন্ন হয়।

(b) ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণের অন্তর্বর্তী যৌগসমূহ **অ্যাসাইল বাহক প্রোটিনের** (acyl carrier protein or ACP) সালফহাইড্রিল গ্রুপের (-SH) সংগে যুক্ত হয়। অপরপক্ষে, ফ্যাটি অ্যাসিড জারণের অন্তর্বর্তী যৌগসমূহ কো-এনজাইম-এ (CA)-এর সংগে যুক্ত থাকে।

(c) মানুষ সমেত উচ্চতর প্রাণীতে ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণের সংগে যুক্ত এনজাইম **মাল্টিএনজাইম কমপ্লেক্স** (multienzyme complex) বা বহুএনজাইম জটিল হিসাবে সংগঠিত। বহুএনজাইমের এই সংগঠন ফ্যাটি অ্যাসিড **সিনথেটেজ** (fatty acid synthetase) নামে পরিচিত। অপরপক্ষে, জারণের এনজাইমসমূহ এভাবে সংগঠিত অবস্থায় থাকে না।

(d) অ্যাসিটাইল কো-এ থেকে উৎপন্ন দুটো কার্বন-এককের পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে ফ্যাটি অ্যাসিড চেনের বৃদ্ধি ঘটে। দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির একক হিসাবে ম্যালোনীল-ACP সক্রিয় দাতা হিসাবে কাজ করে।

(e) ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণে বিজারক পদার্থ হিসাবে NADPH কাজ করে।

(f) পালমিটেট (C_{16}) উৎপন্ন হবার পর ফ্যাটি অ্যাসিড সিন্‌থেটেজ জটিলের দ্বারা দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি থেমে যায়। চেনের পরবর্তী দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি এবং ডাবল বণ্ডের অন্তর্ভুক্তি অন্য এনজাইমের দ্বারা সংঘটিত হয়।

ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণের বিক্রিয়াক্রম

Sequential reactions of fatty acid synthesis

1. **ম্যালোনীল কো-এ উৎপাদন** (Formation of malonyl Co-A) : ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণ শুরু হয় অ্যাসিটাইল কো এ থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড সংযুক্তির দ্বারা ম্যালোনীল কো-এ উৎপাদনের মাধ্যমে। ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণে বাইকার্বনেটের উপস্থিতি অপরিহার্য। বিক্রিয়াটি একমুখী।

$$\text{অ্যাসিটাইল কো-এ} + ATP + HCO_3^- \rightarrow \text{ম্যালোনীল কো-এ} + ADP + Pi + H^+$$
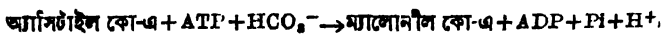
এনজাইম অ্যাসিটাইল কো-এ কার্বোক্সিলেজ (acetyl CoA Carboxylase) এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। বায়োটিন (biotin) এই এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসাবে কাজ করে।

অ্যাসিটাইল কোএ-এর কার্বন-ডাইঅক্সাইড সংযুক্তি দুটো ধাপে সংঘটিত হয়। প্রথমে, ATP খরচের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী যৌগ কার্বোক্সিবায়োটিন উৎপন্ন হয়। সক্রিয় CO_2 গ্রুপ এই অন্তর্বর্তী যৌগ থেকে এরপর অ্যাসিটাইল কো-এতে স্থানান্তরিত হয়। ফলে ম্যালোনীল কো-এ উৎপন্ন হয়।

বায়োটিন-এনজাইম + ATP + HCO_3^- ⇌ CO_2 ~ বায়োটিন-এনজাইম + ADP + Pi

CO_2 ~ বায়োটিন-এনজাইম + অ্যাসিটাইল কো-এ → ম্যালোনীল কো-এ + বায়োটিন-এনজাইম
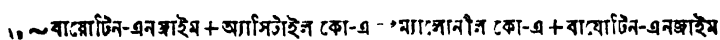
2. ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণে দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি চক্র (The elongation cycle in fatty acid synthesis) : অ্যাসিটাইল কো-এ, ম্যালোনীল কো এবং NADPH থেকে সম্পৃক্ত দীর্ঘচেন সম্পন্ন ফ্যাটি উৎপাদনে যে এনজাইম সংস্থা কাজ করে তাকে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেটেজ (fatty acid synthetase) বলা হয়। উচ্চতর প্রাণীতে এটি একটি মালটিএনজাইম কমপ্লেক্স বা বহুএনজাইম জটিল।

অ্যাসিটাইল-ACP এবং ম্যালোনীল কোএ-ACP এই দুটো পদার্থের উৎপাদনের মাধ্যমে ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি পর্যায় শুরু হয়। অ্যাসিটাইল ট্রান্সঅ্যাসাইলেজ (acetyl transacylase) এবং ম্যালোনীল ট্রান্সঅ্যাসাইলেজ (malonyl transacylase) এই বিক্রিয়া দুটো পরিচালনা করে।

অ্যাসিটাইল কো-এ + ACP ⇌ অ্যাসিটাইল-ACP + CoA

ম্যালোনীল কো-এ + ACP ⇌ ম্যালোনীল-ACP + CoA
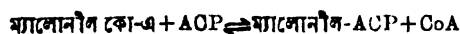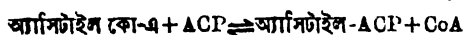
এই দুটো পদার্থ এরপর বিক্রিয়া করে অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-ACP উৎপাদন করে। অ্যাসাইল-ম্যালোনীল-ACP কনডেন্সিং এনজাইম এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

অ্যাসিটাইল-ACP + ম্যালোনীল-ACP → অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-ACP + ACP + CO_2
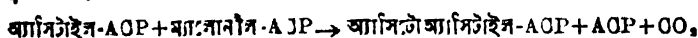
এভাবে দু-কার্বন একক ও তিন-কার্বন এককের সংযুক্তিতে চারকার্বন একক পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং CO_2 অণু মুক্ত হয়। পরবর্তী ধাপে অ্যাসিটো-অ্যাসিটাইল-ACP-এর C-3তে অবস্থানকারী কিটোগ্রুপ মিথিলিন গ্রুপে রূপান্তরিত হয়। ফলে প্রথমে অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-ACP D-3-হাইড্রোক্সি-বিউটিরীল-ACP-তে বিজারিত হয়। NADPH বিজারক পদার্থ হিসাবে কাজ,

করে যা পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়াপথ থেকে আসে। **β-কিটোঅ্যাসাইল-ACP-রিডাকটেজ** (β-Ketoacyl-ACP reductase) এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-ACP + NADPH + $H^+ \rightleftharpoons$
D-3-হাইড্রোক্সিবিউটিরীল-ACP + $NADP^+$
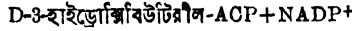
পরবর্তী পর্যায়ে D-3-হাইড্রোক্সিবিউটিরীল-ACP থেকে এক অণু H_2O বিযুক্ত হলে ক্রোটোনীল-ACP উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি **3-হাইড্রো-অ্যাসাইল-ACP-ডিহাইড্রাটেজ** (3-hydroacyl-ACP-dehydratase) পরিচালনা করে। পরবর্তী ধাপে ক্রোটোনীল-ACP বিউটিরীল-ACP-তে বিজারিত হয়। NADPH পুনরায় বিজারক পদার্থ হিসাবে কাজ করে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে **এনোইল-ACP রিডাকটেজ** (enoyl-ACP reductase) কাজ করে।

D-3-হাইড্রোক্সিবিউটিরীল-ACP $\rightleftharpoons$ ক্রোটোনীল-ACP + H_2O
ক্রোটোনীল-ACP + NADPH + H^+ → বিউটিরীল-ACP + $NADP^+$
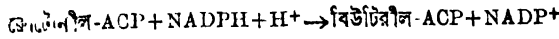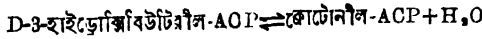
উপরের এই বিক্রিয়াসমূহ দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির প্রথম আবর্তন সম্পূর্ণ করে। ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিউটিরীল-ACP পুনরায় ম্যালোনীল-ACP এর সংগে যুক্ত হয়ে C_6-β-কিটোঅ্যাসাইল-ACP উৎপন্ন করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার পর্যায়ক্রম প্রথম ক্ষেত্রের পর্যায়ক্রমের মতই। তৃতীয় পর্যায়ে একই ভাবে আর একটি ম্যালোনীল-ACP তার সংগে যুক্ত হয় এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের চেনের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি ঘটায়। এই দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির আবর্তন ততক্ষণই চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত C_{16}-অ্যাসাইল-ACP উৎপন্ন হয়। এই পদার্থটি এরপর আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হয়ে পালমিটেট ও ACPতে পরিণত হয়।

3. **ফ্যাটিঅ্যাসিড সংশ্লেষণের বিক্রিয়ার হিসাব** (Stoichiometry of fatty acid synthesis) : পালমিটেট সংশ্লেষণের বিক্রিয়ার সম্পর্ক নিম্নরূপ :

অ্যাসিটাইল কো-এ + 7-ম্যালোনীল কো-এ + 14NADPH + $7H^+$
→ পালমিটেট + $7CO_2$ + $14NADP^+$ + 8 CoA + $6H_2O$
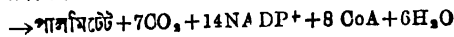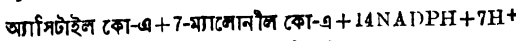
উপরের বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত ম্যালোনীল কো-এ নিম্নলিখিত সমীকরণ থেকে পাওয়া যায় :

7-অ্যাসিটাইল কো-এ + $7CO_2$ + 7ATP → 7-ম্যালোনীল কো-এ + 7ADP + 7Pi + $7H^+$
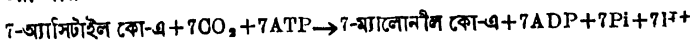
অতএব পালমিটেট সংশ্লেষণের সর্বমোট বিক্রিয়া নিম্নরূপ :

8-অ্যাসিটাইল কো-এ + 7ATP + 14NADPH → পালমিটেট + $14NADP^+$ + 8CoA + $6H_2O$ + 7ADP + 7Pi
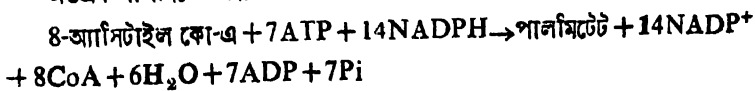
স্নেহদ্রব্যের জৈব সংশ্লেষণ

Bio-synthesis of Fats

দেহের অভ্যন্তরে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন থেকে স্নেহদ্রব্যের সংশ্লেষণ সম্ভবপর (1নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। তবে অধিকতর অসম্পৃক্ত ও অপরিহার্য ফ্যাটিঅ্যাসিড সংশ্লেষণ দেহের অভ্যন্তরে সম্ভবপর নয়।

1. **কার্বোহাইড্রেট থেকে স্নেহদ্রব্যের সংশ্লেষণ :** মানুষের দেহে কার্বোহাইড্রেট থেকে স্নেহদ্রব্য সংশ্লেষিত হতে পারে। দেহে মেদবাহুল্যের এটি একটি প্রধান কারণ। কার্বোহাইড্রেট থেকে স্নেহদ্রব্য সংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় এনজাইম প্রধানত যকৃৎ, বৃক্ক, মাতৃস্তন, অ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থি, চর্বিকলা এবং অন্যান্য কলাকোষে দেখতে পাওয়া যায়।

কার্বোহাইড্রেট প্রথমে গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিতে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ উৎপন্ন করে। বায়োটিনযুক্ত এনজাইম **অ্যাসিটাইল কো-এ কার্বক্সিলেজ,** CO_2, ATP এবং Mg^{++} আয়নের উপস্থিতিতে ইহা **ম্যালোনিল কো-এ** নামক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এরপর ম্যালোনীল কো-এ উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে **প্যালমিটেট** উৎপন্ন করে। পালমিটেটের 1 থেকে 14 সংখ্যক কার্বন পরমাণু ম্যালোনীল কো-এ থেকে পাওয়া যায়। 15 এবং 16 কার্বন পরমাণু আসে অ্যাসিটাইল কো-এ থেকে। এভাবে উৎপন্ন প্যালমিটিক অ্যাসিড অন্যান্য এনজাইমের দ্বারা অংশত সম্পর্কযুক্ত ফ্যাটিঅ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়।

প্যালমিটেট এরপর এনজাইম **থায়োকাইনেজের** উপস্থিতিতে কো-এনজাইমের সংগে বিক্রিয়া করে প্যালমিটাইল কো-এ যৌগ উৎপন্ন করে। এই উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থটি উৎপন্ন হতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা আসে ATP থেকে। এই ফ্যাটিঅ্যাসাইল কো-এ যৌগ গ্লিসারোফস্ফেটের সংগে যুক্ত হয়ে ফসফাটিডিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এনজাইম **ফস্ফাটেজ** এই পদার্থ থেকে ফস্ফরাসের বিযুক্তি ঘটিয়ে 1, 2-ডাইগ্লিসারাইড উৎপন্ন করে। এই পদার্থের সংগে আর এক অণু ফ্যাটিঅ্যাসিড কো-এ যৌগ যুক্ত হয়ে **ট্রাইগ্লিসারাইড** বা **স্নেহদ্রব্য** উৎপন্ন করে।

2. **প্রোটিন থেকে স্নেহদ্রব্যের সংশ্লেষণ :** প্রোটিন থেকে যেসব শর্করা সংশ্লেষিত হয় তার একাংশ স্নেহদ্রব্যে রূপান্তরিত হতে পারে। সমস্থানিক বা আইসোটোপের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে এই সম্ভাবনার স্বীকৃতিলাভ সম্ভবপর হয়েছে। এ ব্যাপারে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের কোন সদস্য সক্রিয়ভাবে জড়িত।

3. **ফসফোলিপিডের সংশ্লেষণ** (Synthesis of phospholipids) : সংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া গেলে মানুষের যকৃৎ ফসফোলিপিডের সংশ্লেষণ ঘটাতে পারে। তাছাড়া ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে স্নেহপদার্থের বিশোষণের সময় ক্ষুদ্রান্ত্রস্থিত আবরণীকোষ নিজস্ব সাইটোপ্লাজমে লিপিডের সংশ্লেষণ ঘটাতে পারে। লেসিথিন, কেফালিন এবং স্ফিংগোমায়েলিনের সংশ্লেষণ সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হল।

লেসিথিন
Lecithin

লেসিথিন সংশ্লেষণের প্রথম পর্যায়ে কোলিন (choline) এনজাইম **কোলিন কাইনেজের** উপস্থিতিতে ATP-এর সংগে যুক্ত হয়ে ফসফোরীল কোলিন উৎপন্ন করে। ফসফোরীল কোলিন এরপর সাইটিডিন ট্রাইফসফেটের (CTP) সংগে যুক্ত হয়ে সাইটিডিন ডাইফসফেট (CDP) কোলিন উৎপন্ন করে এবং অজৈব পাইরোফসফেট নির্গত হয়। **ফসফোরীল কোলিন সাইটিডিল ট্রান্সফারেজ** (PCCT) এনজাইম এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। পরবর্তী পর্যায়ে ডাইগ্লিসারাইড CDP-কোলিনের সংগে যুক্ত হয়ে লেসিথিন বা ফসফাটিডিল কোলিন (phosphatidyl choline) উৎপন্ন করে এবং সাইটিডিন মনোফসফেট (CMP) নির্গত হয়। নির্গত CMP পুনরায় ATP-এর সহায়তায় CTP-এ রূপান্তরিত হয়।

1. কোলিন + ATP $\xrightarrow{\text{কোলিন কাইনেজ}}$ ফসফোরীল কোলিন + ADP
2. ফসফোরীল কোলিন + CTP $\xrightarrow{\text{ট্রান্সফারেজ}}$ CDP-কোলিন + PPi
3. CDP-কোলিন + D-1, 2-ডাইগ্লিসারাইড $\xrightarrow[Mg^{++} \text{ বা } Mn^{++}]{\text{গ্লিসারাইড ট্রান্সফারেজ}}$ লেসিথিন + CMP

যকৃৎ, ক্ষুদ্রান্ত্র এবং চর্বিকোষ গ্লিসারল থেকে ডাইগ্লিসারাইড উৎপন্ন করে। ডাইগ্লিসারাইডের সংশ্লেষণের পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ :

1. গ্লিসারল + ATP $\xrightarrow{\text{গ্লিসারল কাইনেজ}}$ L-α-গ্লিসারোফসফেট + ADP
2. L-α – গ্লিসারোফসফেট + অ্যাসিটাইল কো-এ $\xrightarrow{\text{এনজাইম}}$ ফসফাটিডিক অ্যাসিড
3. ফসফাটিডিক অ্যাসিড $\xrightarrow{\text{ফসফাটেজ}}$ D-1, 2 ডাই-গ্লিসারাইড

কেফালিন
Cephalin

কেফালিন সংশ্লেষণের পর্যায়ক্রম লেসিথিনের মত। সেরিন কেফালিনে সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। এই পদার্থটি গ্লাইসিন অথবা খাদ্য থেকে আসে।

1. সেরিন $\xrightarrow[-CO_2]{\text{ডিকারবোক্সিলেজ}}$ ইথানোলামিন
2. ইথানোলামিন $\xrightarrow[\text{কাইনেজ}]{ATP}$ ফসফোইথানোলামিন + ADP
3. ফসফোইথানোলামিন + CTP $\xrightarrow{\text{ট্রান্সফারেজ}}$ CDP-ইথানোলামিন + PPi
4. CDP-ইথানোলামিন + D-1, 2-গ্লিসারাইড $\xrightarrow[Mg^{++} \text{ বা } Mn^{++}]{\text{গ্লিসারাইড ট্রান্সফারেজ}}$ কেফালিন + CMP

স্ফিংগোমায়েলিন
Sphingomyelin

স্ফিংগোমায়েলিন ফ্যাটি অ্যাসিড, ফসফোরিক অ্যাসিড, কোলিন এবং স্ফিংগোসিনের সমন্বয়ে গঠিত। স্ফিংগোমায়েলিনের সংশ্লে—— —সংক্ষিপ্ত পর্যায়-ক্রম নিম্নরূপ :

1. পালমিটাইল কো-এ + NADPH + H^+ $\xrightarrow{\text{এনজাইম}}$ পালমিটাইল অ্যালডেহাইড + NADP + CoASH
2. পালমিটাইল অ্যালডেহাইড + সেরিন $\xrightarrow[\text{পিরাইডোক্সাল ফসফেট}]{Mn^{++}, \text{ এনজাইম}}$ CO_2 + ডাই-হাইড্রো স্ফিংগোসিন
3. ডাই-হাইড্রোস্ফিংগোসিন + FAD ⟶ স্ফিংগোসিন + FADH + H^+
4. স্ফিংগোসিন + CDP-কোলিন ⟶ স্ফিংগোসিন ফসফোরীল কোলিন + CMP
5. স্ফিংগোসিন ফসফোরীল কোলিন + অ্যাসিটাইল কো এ $\xrightarrow{\text{এনজাইম}}$ স্ফিংগোমায়েলিন + CoASH

কোলেসটারোলের সংশ্লেষণ
SYNTHESIS OF CHOLESTEROL

দেহাস্থিত কোলেস্টারোলের প্রধান অংশ আসে (প্রতিদিন প্রায় 1 গ্রাম) সংশ্লেষণের মাধ্যমে এবং বাকীটা সরবরাহ করে খাদ্য (প্রতিদিন 0·3 গ্রাম হিসাবে)। তেমনি দুটো প্রধান রেচনপথের মাধ্যমে কোলেস্টারোল দেহ থেকে

নির্গত হয়ঃ (1) বাইল-অ্যাসিড বা পিত্তঅম্লে রূপান্তরের মাধ্যমে এবং (2) প্রশমিত স্টেরোল হিসাবে মলের মাধ্যমে।

দেহে কোলেস্টেরোলের সংশ্লেষণ অ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে শুরু হয় এবং নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে শেষ হয়ঃ

অ্যাসিটিক অ্যাসিড
CoASH
Mg^{++}
ATP
↓ সিনথেটেজ
অ্যাসিটাইল কো-এ + AMP + PPi
\+
অ্যাসিটাইল কো-এ
⇅ থায়োলেজ
অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল কো-এ + CoASH
\+
অ্যাসিটাইল কো-এ
⇅ H_2O
⇅ সিনথেটেজ
β-হাইড্রোক্সি β-মিথাইল গ্লুটারিল কো-এ + CoASH
| $2NADPH + 2H^+$
↓ রিডাকটেজ
মেভালোনিক অ্যাসিড + 2NAD + CoASH
| ATP
| Mg^{++}
↓ কাইনেজ
5-ফসফোমেভালোনিক অ্যাসিড + ADP
| ATP
| Mg^{++}
↓ কাইনেজ
5-ডাইফসফোমেভালোনিক অ্যাসিড + ADP
| ATP
| Mg^{++}
↓ কাইনেজ
3-ফসফো-5-ডাইফসফোমেভালোনিক অ্যাসিড
↓ ডিকারবোক্সিলেজ
আইসোপেনটেনীল পাইরোফসফেট + CO_2 + P^1
↓ আইসোমারেজ
3, 3-ডাইমিথাইল পাইরোফসফেট
\+
আইসোপেনটেনীল-পাইরোফসফেট
↓ সিনথেটেজ
জেরানীল পাইরোফসফেট + PPi
\+

আইসোপেন্‌টেনীল পাইরোফস্‌ফেট
↓ সিন্‌থেটেজ
ফার্‌নেসীল পাইরোফস্‌ফেট + PPI
+
ফার্‌নেসীল পাইরোফস্‌ফেট
| NADPH + H^+
| Mn^{++}
| Mg^{++}
↓ সিন্‌থেটেজ
স্কুয়ালিন + NADP + 2PPI
↓ অক্সিডোসাইক্লেজ
লেনোস্টারোল
↓
কোলেস্‌টারোল

প্রৌঢ় বয়সে বা বার্ধক্যে বিনষ্ট ধমনী প্রাচীরে কোলেস্‌টারোলের সঞ্চয় থেকে অ্যাথেরোস্কেরোসিস (atherosclerosis) রোগের প্রকাশ ঘটে, যা মস্তিষ্কের থ্রম্‌বোসিস, মায়োকার্‌ডিয়েল ইনফ্রাকশন ইত্যাদির জন্য দায়ী।

প্রোটিনের বিপাক

METABOLISM OF PROTEIN

পরিপাকের পর প্রোটিন প্রধানত অ্যামাইনোঅ্যাসিডে পরিণত হয় এবং পোর্টালতন্ত্রের মাধ্যমে যকৃতে পৌঁছয়। যকৃৎ স্বকীয় কার্যে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামাইনোঅ্যাসিডকে গ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট অংশকে রক্তে নিক্ষেপ করে। যকৃৎ ও কলারস থেকে নির্গত এসব অ্যামাইনোঅ্যাসিডকে নিয়ে রক্তের **অ্যামাইনোঅ্যাসিড-ভাণ্ডার** (aminoacid pool) গড়ে ওঠে। এই ভাণ্ডারের অ্যামাইনোঅ্যাসিড যেমন অনবরত দেহের বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয় তেমনি অনবরত প্রতিস্থাপিত হয়। অর্থাৎ রক্তের অ্যামাইনোঅ্যাসিড একটি নির্দিষ্ট 'গতিসাম্যে' অবস্থান করে।

রক্ত-অ্যামাইনোঅ্যাসিডের পরিণতি ও কার্যাবলী

Fate and Functions of Blood Amino acids

সমস্থানিক বা আইসোটোপ লেবেল করে রক্ত-অ্যামাইনোঅ্যাসিডের পরিণতি ও কার্যাবলীর সঠিক অনুশীলন সম্ভবপর হয়েছে এসব পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হল (7-22 নং চিত্র) : (i) **প্লাজমাপ্রোটিনের সংশ্লেষণ :** যকৃৎ রক্ত-অ্যামাইনোঅ্যাসিডের সাহায্যে অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন,

প্রথ্রম্বিন, থ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন ইত্যাদি প্লাজমাপ্রোটিনের সংশ্লেষণ ঘটায়। (ii) **প্রোটোপ্লাজমের সংশ্লেষণ:** প্রোটোপ্লাজমীয় প্রোটিনউৎপাদন রক্ত-অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকেই সম্পন্ন হয়। (iii) **এনজাইম সংশ্লেষণ:** এনজাইমের প্রকৃতি প্রোটিন। কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রধানত অ্যামাইনোঅ্যাসিডের দ্বারা এরা সংশ্লেষিত হয়। (iv) **হরমোনের সংশ্লেষণ:** রক্ত-অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হরমোনের সংশ্লেষণ ঘটায়। (v) **পিত্তঅম্লের সংশ্লেষণ:** যকৃৎ অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্লাইসিন ও টরিন (taurine) থেকে টরোকোলিক ও গ্লাইকোকোলিক পিত্তঅম্ল দুটো সংশ্লেষিত করে। (vi) **দুগ্ধপ্রোটিনের সংশ্লেষণ:** পয়স্বিনী মায়ের মাতৃস্তন রক্ত অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে দুগ্ধপ্রোটিন (কেসিন, casien) সংশ্লেষণ করে। (vii) **মেলানিন সংশ্লেষণ:** ত্বক, কেশ, অক্ষিপটের পশ্চাদ্‌বর্তী কোরয়েড ইত্যাদির বর্ণের জন্য দায়ী মেলানিনকণা টাইরোসিন নামক অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয়। (viii) **দেহের বৃদ্ধি ও সুরক্ষা:** দেহের বৃদ্ধি ও সুরক্ষার কার্যে ব্যবহৃত কিছু সংখ্যক অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড দেহে সংশ্লেষিত হতে পারে না। রক্ত-অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকেই দেহের কলাকোষ তাদের গ্রহণ করে। (ix) **জীর্ণসংস্কার:** বিপাকের
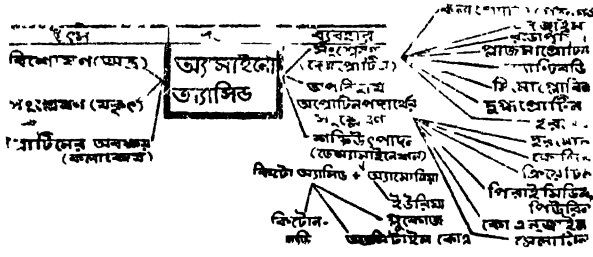
7-22 নং চিত্র: রক্ত:অ্যামাইনো অ্যাসিডের ব্যবহার।

সময় কলাকোষস্থ প্রোটিন বিনষ্ট হলে তাদের সংস্কার ও ক্ষতিপূরণে রক্তের অ্যামাইনোঅ্যাসিড অংশগ্রহণ করে। (x) **অ্যান্টিবডির সংশ্লেষণ:** গামা-গ্লোবিউলিনজাতীয় প্লাজমাপ্রোটিন রক্ত-অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকেই উৎপন্ন হয়। (xi) **রডোপসিন-উৎপাদন:** অক্ষিপটের রডগ্রাহককোষে 'রডোপসিন' নামক যে রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, তার উৎপাদনের সময় ভিটামিন A-এর সংগে **ওপসিন** নামক প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। এই প্রোটিনও রক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয়। (xii) **অন্যান্য পদার্থের সংশ্লেষণ:** অ্যামাইনো অ্যাসিড

আরজিনিন যেমন ইউরিয়ার সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে, তেমনি অন্যান্য রক্ত-অ্যামাইনোঅ্যাসিড কলাকোষের জৈব জারণে অংশগ্রহণকারী সাইটোক্রোম, গ্লুটাথায়োন প্রভৃতির উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। (xiii) **প্রোটিনের সঞ্চয়ঃ** দেহবৃদ্ধির সময়ে প্রোটিন দেহে সঞ্চিত হয়। শিশু, কিশোর, ব্যায়ামবীর, গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রোটিনের সঞ্চয় ঘটে।

প্রোটিনের অপচিতি

Catabolism of Protein

প্রোটিনের ক্যাটাবলিজম প্রধানত যকৃতে সংঘটিত হয়। বৃক্ক প্রভৃতির অন্যান্য কলাকোষেও এই প্রক্রিয়া সামান্য পরিমাণে সম্পন্ন হতে পারে। জরুরীকালীন অবস্থা বা অনশনের সময় কোষের প্রোটোপ্লাজমীয় প্রোটিন এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। **ডিঅ্যামাইনেশন** বা **ট্রান্সঅ্যামাইনেশনের** মাধ্যমে প্রোটিনের নাইট্রোজেনবিহীন অংশ প্রধানত পাইরুভেট বা অ্যাসিটেটে রূপান্তরিত হয়। দেখা গেছে, অনপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড পাইরুভেট উৎপন্ন করে। **গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন উৎপাদনকারী অ্যামাইনোঅ্যাসিড** এবং অধিকাংশ অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড অ্যাসিটেট উৎপন্ন করে (10 তালিকা)। গ্লুকোজ বা গ্লাই-কোজেন উৎপাদনকারী অ্যামাইনোঅ্যাসিড (glucogenic aminoacid) দেহে কার্বহাইড্রেট উৎপন্ন করে। অপরপক্ষে কিটোন-পদার্থ উৎপাদনকারী অ্যামাইনো-অ্যাসিড (ketogenic amino-acid) স্নেহদ্রব্যের বিপাকে অংশগ্রহণ করে। ডিঅ্যামাইনেশনের ফলে অধিকাংশ অ্যামাইনো-অ্যাসিড অ্যাসিটাইল কো-এ নামক পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং ক্রেবস-চক্রে প্রবেশ করে। ডিঅ্যামাইনেশন ও ট্রান্স-অ্যামাইনেশনের মাধ্যমে গ্লুটামিক ও অ্যাসপারটিক অ্যাসিড আলফাকিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং ক্রেব্‌স চক্রে প্রবেশ করে। যেসব অ্যামাইনোঅ্যাসিড গ্লুটামিক অ্যাসিডে রূপান্তরলাভ করে (অ্যারজিনিন, প্রোলাইন, হাইড্রোক্সিপ্রোলাইন, হিস্টিডিন এবং ওরনিথিন) তারাও আলফা-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে ক্রেব্‌স চক্রে প্রবেশ করে।

1. অ্যামাইনো-অপসারণ বা ডিঅ্যামাইনেশন (Deamination): অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে অ্যামাইনোমূলকের ($-NH_2$) অপসারণ পদ্ধতিকে **ডিঅ্যামাইনেশন** বলা হয়। যকৃৎস্থিত এনজাইম **ডিঅ্যামাইনেজ** একার্যে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া অক্সিডেজ, ক্যাটালেজ, ডেহাইড্রোজ-

10নং তালিকা : গ্লুকোজেনিক ও কিটোজেনিক অ্যামাইনোঅ্যাসিড।

গ্লুকোজেনিক		কিটোজেনিক	গ্লুকোজেনিক ও কিটোজেনিক
অ্যালানিন	হাইড্রোক্সি-	লিউসিন	আইসোলিউসিন
আর্জিনিন	প্রোলাইন		লাইসিন
অ্যাসপারটেট	প্রোলাইন		ফেনাইল অ্যালানিন
সিস্টেইন	মিথিওনিন		টাইরোসিন
গ্লুটামেট	সেরিন		ট্রিপ্টোফ্যান
গ্লাইসিন	ভ্যালিন		
হিস্টিডিন	থ্রিওনিন		

(হাইড্রোক্সি অ্যামাইনোঅ্যাসিড), হিস্টিডেজ (হিসটিডিন) প্রভৃতি এই পদ্ধতির সংগে জড়িত।

ডিঅ্যামাইনেশনে দুটো জিনিস উৎপন্ন হয়: (a) **অ্যামোনিয়া** এবং (b) **নাইট্রোজেনবিহীন পদার্থ**। শেষোক্ত পদার্থের বিপাক উপরে উল্লিখিত হয়েছে। মধুমেহে 60 শতাংশ প্রোটিন এই পদ্ধতিতে কার্বোহাইড্রেটে পরিণত হয় এবং 40 শতাংশ কিটোন-পদার্থ উৎপন্ন করে। এই অংশ থেকে স্নেহদ্রব্যও উৎপন্ন হতে পারে।

অপরপক্ষে অ্যামোনিয়ার প্রধান অংশ ইউরিয়া উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় (ইউরিয়া-উৎপাদনে দ্রষ্টব্য)। সামান্য অংশ অ্যামোনিয়াম লবণ (ফসফেট, সালফেট, ইউরেট ইত্যাদি), ক্রিয়েটিন, পিউরিন, পিরাইমিডিন, ইউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

2. **ট্রান্সঅ্যামাইনেশন** (Transamination): কোন একটি অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে অপর একটি কিটোঅ্যাসিডে অ্যামাইনো-মূলকের
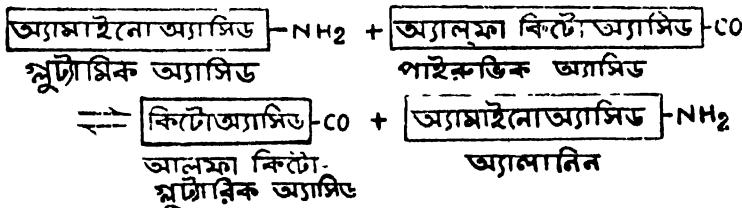
7-28 নং চিত্র : ট্রান্সঅ্যামাইনেশন পদ্ধতি।

হস্তান্তরকে ট্রান্সঅ্যামাইনেশন বলা হয়। ট্রান্সঅ্যামাইনেজ এনজাইম এই পদ্ধতিকে পরিচালিত করে। এই পদ্ধতিতে একটি অ্যামাইনোঅ্যাসিড বিশিষ্ট

হয়ে যেমন কিটো-অ্যাসিড উৎপন্ন করে, তেমনি একই সংগে কিটো-অ্যাসিড থেকে নূতন অ্যামাইনোঅ্যাসিডের জন্ম হয়ঃ

3. **ট্রান্সমিথাইলেশন** ঃ কোন একটি অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে মিথাইল-মূলকের ($-CH_3$) অন্য একটি পদার্থে হস্তান্তরকে ট্রান্সমিথাইলেশন বলা হয়। এনজাইম ট্রান্সমিথাইলেজ এই রূপান্তরে অংশগ্রহণ করে। যেমন, মিথিওনিনের $-CH_3$ মূলক গুয়ানিডো-অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সংগে যুক্ত হয়ে ক্রিয়েটিন উৎপন্ন করে, তেমনি মিথিওনিনের $-CH_2$ মূলক ইথানোলামিন (ethanolamine)-এর সংগে যুক্ত হয়ে কোলিন উৎপন্ন করে।

ইউরিয়া-সংশ্লেষণ

Urea Synthesis

দেহে ডিঅ্যামাইনেশন পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। এসব অ্যামোনিয়া রক্তে জমা হতে থাকলে বিষক্রিয়াজনিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। সুস্থ ও স্বাভাবিক দেহ অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াকে ইউরিয়াতে রূপান্তরিত করে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। সাধারণভাবে প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে 0·1 – 0·2 মিলিগ্রাম অ্যামোনিয়া-নাইট্রোজেন রয়েছে।

রাসায়নিকভাবে এক অণু CO_2 এবং দুই অণু NH_3 সংযুক্ত হয়ে ইউরিয়া উৎপন্ন করে ঃ

$$CO_2 + 2NH_3 = CO(NH_2)_2 + H_2O$$
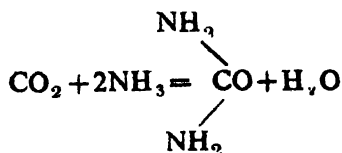
জীবন্ত প্রাণীকোষে ইউরিয়া-সংশ্লেষণ খুব সহজ নয়। 7-24 নং চিত্রে ক্রেবস-ওর্নিথিন চক্রের উল্লেখ করা হয়েছে। এই চক্র অনুযায়ী ওর্নিথিন অণুর সংগে এক অণু অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে প্রথমে সাইট্রুলিন (citruline) উৎপন্ন করে। সাইট্রুলিন অন্য আর এক অণু অ্যামোনিয়ার সংগে যুক্ত হয়ে আরজিনিন উৎপন্ন করে। আরজিনিন বিশ্লিষ্ট হয়ে ইউরিয়া উৎপন্ন করে এবং ওর্নিথিন মুক্ত হয়। ওর্নিথিন একইভাবে আবার অ্যামোনিয়ার সংগে সংযুক্ত হয়।

অধুনা ক্রেবস্-ওর্নিথিন-চক্রের আরও বিস্তৃতি ঘটেছে। সমগ্র সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে 5টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় ঃ

1. **কার্বামিল ফস্ফেটের সংশ্লেষণ :** N-অ্যাসিটাইল গ্লুটামিক অ্যাসিড ও APT-এর উপস্থিতিতে CO_2 সক্রিয় কার্বনডাই অক্সাইডে পরিণত হয়। সক্রিয় CO_2 এরপর অ্যামোনিয়ার সংগে যুক্ত হয়ে **কার্বামিল ফস্ফেট** (carbamyl phosphate) উৎপন্ন করে। **কার্বামিল ফসফেট সিন্থেটেজ** এনজাইম এই বিক্রিয়ার অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। মানুষসমেত সব **ইউরিয়ারেচক** প্রাণীর (ureotelic animal) যকৃতের মাইটোকন্ড্রিয়াতে এই এনজাইম পাওয়া যায়।
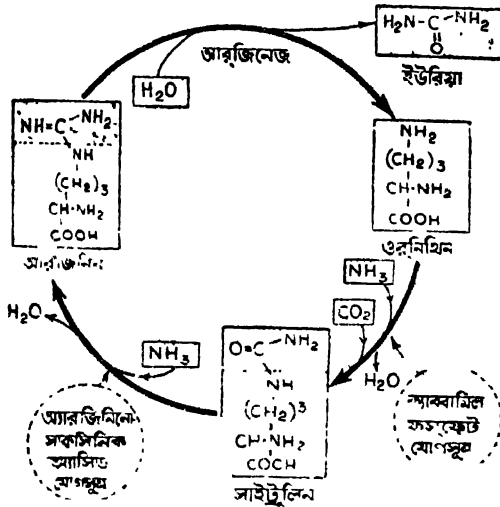
7-24 নং চিত্র : ইউরিয়া সংশ্লেষণ।

এই বিক্রিয়ার সময় যে দুটো ATP বিশ্লিষ্ট হয় তারা কার্বামিল ফস্ফেটের দুটো কো-ভেলেণ্ট বণ্ডের সংশ্লেষণে চালকবল (driving force) হিসাবে কাজ করে। এই দুটো কো-ভেলেণ্ট বণ্ডের নাম আমাইড বণ্ড (amide bond) এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিড-ফস্ফোরিক অ্যাসিড আনহাইড্রাইড বণ্ড। এছাড়া Mg^{++} আয়নও এই বিক্রিয়ায় প্রয়োজন হয়।

2. **সাইট্রুলিনের সংশ্লেষণ** (Synthesis of citruline) **:** L-**ওরনীথিন ট্রান্সকার্বামিলেজ** এন্জাইম ও অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে কারবামিল ফস্ফেট ওরনীথিনের সংগে বিক্রিয়া করে সাইট্রুলিন উৎপন্ন করে এবং অজৈব ফসফেট নির্গত হয়। এই এনজাইমকেও যকৃতের মাইটোকনড্রিয়াতে পাওয়া যায়।

3. **আর্জিনিনো সাক্সিনিক অ্যাসিডের সংশ্লেষণ** (Synthesis of argininosuccinic acid) : সাইট্রুলিন এরপর, ATP, Mg^{++} আয়ন ও অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিডের সংগে বিক্রিয়া করে আর্জিনিনোসাক্সিনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিডের অ্যামাইনোগ্রুপের সংগে সাইট্রুলিন ও অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিড পরস্পর সংযুক্ত হয়। **সংযুক্তকারী এন্জাইম** (condensing enzyme) এই বিক্রিয়াকে পরিচালিত করে।

4. **আর্জিনিনোসাক্সিনিক অ্যাসিড থেকে আর্জিনিন ও ফিউমারিক অ্যাসিডের উৎপাদন** (Cleavage of argininosuccinic acid to arginine and fumeric acid) : আর্জিনিনোসাক্সিনিক অ্যাসিড এরপর **আর্জিনিনোসাক্সিনেজ** এন্জাইমের দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে আর্জিনিন ও ফিউমারিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। আর্জিনিনোসাক্সিনেজ এনজাইম স্তন্যপায়ী প্রাণীর যকৃৎ ও বৃক্কে পাওয়া যায়। উৎপন্ন ফিউমারিক অ্যাসিড TCA চক্রের মাধ্যমে প্রথমে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডে এবং পরে অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।
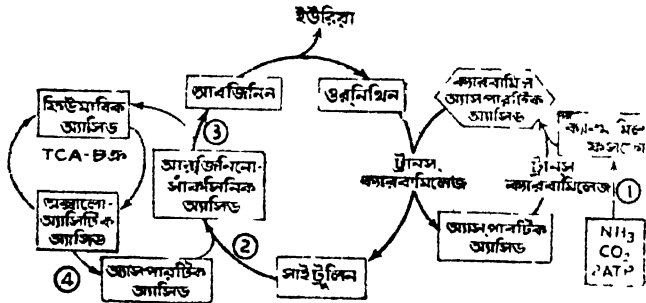
7-25 নং চিত্র : ক্রেব্স-ওর্নিথিন চক্রের সংগে কার্বামিল ফস্ফেট আর্জিনিনোসাক্সিনিক অ্যাসিডের যোগসূত্র। 1—ক্যার্বামিল ফস্ফেট সিন্থেটেজ ও Mg^{++} ; 2—সংযুক্তকারী এনজাইম, Mg^{++} ও 3—আর্জিনিনোসাক্সিনেজ ; ট্রান্সঅ্যামাইনেজ ও NH_3 ।

5. **আর্জিনিন থেকে ইউরিয়া ও ওর্নিথিন উৎপাদন** (Cleavage of arginine to ornithine and urea) : এই বিক্রিয়া ইউরিয়া সংশ্লেষণ সম্পূর্ণ করে এবং ওর্নিথিন পুনঃসংশ্লেষিত হয়। আর্জিনিনের গুয়ানিডিনো (guanidino) গ্রুপের আর্দ্রবিশ্লেষণে যকৃৎস্থিত আর্জিনেজ এন্জাইম অংশগ্রহণ করে। Co^{++} বা Mn^{++} আয়ন আর্জিনেজকে সক্রিয়করণে অংশগ্রহণ করে। এই এনজাইমকে যকৃৎ ছাড়াও সামান্য পরিমাণে বৃক্ক, মস্তিষ্ক, মাতৃস্তন, শুক্রাশয়

এবং স্কে পাওয়া যায়, ওর্‌নিথিন ও লাইসিন এই এনজাইমের প্রতিযোগী প্রতিরোধক (competitive inhibitors) হিসাবে কাজ করে।

কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিনের বিপাকক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক

(Interrelationship between Carbohydrates, Fats and Proteins)

কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিনের বিপাকক্রিয়া এবং তাদের পারস্পরিক রূপান্তরের মিলনবিন্দু হিসাবে TCA-চক্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই তিনপ্রকার পদার্থের বিক্রিয়ার সর্বশেষ ও সাধারণ বিক্রিয়াপথ হিসাবে ইহা চিহ্নিত। TCA চক্রের মাধ্যমে এই তিনটি খাদ্যবস্তু যেমন জারিত হয়ে CO_2, H O ও ATP উৎপন্ন করতে পারে, তেমনি বিপরীতমুখী বিক্রিয়ায় প্রোটিন থেকে কার্বোহাইড্রেট, কার্বোহাইড্রেট থেকে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট থেকে ফ্যাট, ফ্যাট থেকে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন থেকে ফ্যাট এবং ফ্যাট থেকে প্রোটিন উৎপন্ন হতে পারে (1, এবং 2নং তালিকা)। TCA চক্রের মাধ্যমে এই তিনটি খাদ্যবস্তু দেহের প্রায় 65 শতাংশ জৈবশক্তি উৎপন্ন করতে পারে। তাপগতিবিদ্যার দিক দিয়ে যার দক্ষতা প্রায় 60-70 শতাংশ।

1. **প্রোটিন থেকে কার্বোহাইড্রেট :** (Carbohydrate from Proteins) : 20টি অ্যামাইনোঅ্যাসিডের অধিকাংশ অ্যামাইনোঅ্যাসিডই ডি-অ্যামাইনেশন ও ট্রান্স-অ্যামাইনেশনের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে TCA-চক্রের সম্পর্কযুক্ত অ্যাসিডের উৎপাদন ঘটাতে পারে এবং পরিশেষে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত হতে পারে। এরপর তারা সম্পূর্ণভাবে জারিত হতে পারে অথবা পাইরুভেটে রূপান্তরিত হয়ে গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন উৎপন্ন করতে পারে। এভাবে 13টি গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনোঅ্যাসিড কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে, একটি ফ্যাট এবং 5টি কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট (গ্লুকোজেনিক ও কিটোজেনিক) উৎপাদন করে থাকে (10নং তালিকা)। মধুমেহে 60% প্রোটিন এভাবে কার্বোহাইড্রেটে পরিণত হয় এবং 40% কিটোন বাড উৎপন্ন করে।

জানা গেছে অ্যাসপারটিক অ্যাসিড ও আসপারাজিন অক্সালোঅ্যাসিটিক উৎপন্ন করে এবং এভাবে TCA-চক্রে প্রবেশ করে (7-26 নং চিত্র)। গ্লুটামিক

অ্যাসিড, গ্লুটামিন, প্রোলাইন, হাইড্রোক্সি প্রোলাইন, আর্জিনিন ও হিসটিডিন α-কিটোগ্লুটারেট উৎপাদন করে। অ্যালানিন, সিসটেইন, সিসটাইন, গ্লাইসিন, থ্রিওনিন এবং সেরিন পাইরুভেটে পরিণত হয়। পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল

৭-২৩ নং চিত্র : কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিনের বিপাকক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক।

কো-এ উৎপন্ন হয়। কিছুসংখ্যক অ্যামাইনোঅ্যাসিড সরাসরি অ্যাসিটাইল কো-এ উৎপন্ন করে। যেমন, ফেনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন, ট্রিপটোফ্যান, লাইসিন ও লিউসিন। এর মধ্যে লিউসিন কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। মিথিওনিন, আইসোলিউসিন ও ভ্যালিন সাকসিনীল কো-এতে রূপান্তরিত হয় এবং এভাবে TCA-চক্রে প্রবেশ করে।

2. **কার্বোহাইড্রেট থেকে প্রোটিন** (Protein from Carbohydrate) : অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড (essential aminoacids) ছাড়া বাকী সব অনপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড (nonessential aminoacid) দেহে উৎপন্ন হতে পারে। কার্বোহাইড্রেট থেকে পাইরুভেট ও অ্যাসিটাইল কো-এর মাধ্যমে TCA চক্রের যেসব অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তারা অ্যামোনিয়ার সংগে সংযুক্ত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হতে পারে। যেমন, α-কিটোগ্লুটারেট থেকে গ্লুটামিক অ্যাসিড, প্রোলাইন; পাইরুভেট থেকে অ্যালানিন, অক্সালোঅ্যাসিটেট থেকে অ্যাসপারটিক অ্যাসিড এভাবে উৎপন্ন হয়। পাইরুভেট থেকে ট্রান্স-অ্যামাইনেশনের দ্বারাও গ্লাইসিন উৎপন্ন হতে পারে।

ব্যাক্টেরিয়াস্থিত বিভিন্ন এনজাইম অ্যামাইনেশন্ ও ট্রান্সঅ্যামাইনেশনের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট থেকে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডও উৎপন্ন করতে পারে।

3. **কার্বোহাইড্রেট থেকে ফ্যাট** (Fat from carbohydrate) : কার্বোহাইড্রেট থেকে গ্লিসারিল ও ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন হতে পারে এবং এদের সংযুক্তির মাধ্যমে ফ্যাটের সংশ্লেষণ ঘটতে পারে। ইনসুলিন এই রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু সম্মুখ পিটুইটারীর হরমোন এই রূপান্তরকে হ্রাস করে। ফসফোগ্লিসারাল্যালডেহাইডের মাধ্যমে গ্লিসারলও কার্বোহাইড্রেট থেকে উৎপন্ন হতে পারে। গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড এরপর ট্রাইগ্লিসারাইড উৎপন্ন করে।

গ্লিসার‍্যালডেহাইড-'P'
↓ ↓
গ্লিসারল অ্যাসিটাইল কো-এ
↓ ↓
গ্লিসারোফসফেট + অ্যাসাইল কো-এ → ফ্যাট বা ট্রাইগ্লিসারাইড

4. **ফ্যাট থেকে কার্বোহাইড্রেট** (Carbohydrate from fat) : গ্লিসারল গ্লিসার‍্যালডেহাইড 3P-এ রূপান্তরের মাধ্যমে এবং ফ্যাটি অ্যাসিড / জারণ ও গ্লাইকোলাইসিসের বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ বা গ্লাই কোজেনে রূপান্তরিত হয়। এভাবে প্রতি 100 গ্রাম ফ্যাট থেকে প্রায় 12 গ্রাম রক্তগ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। অনশনরত প্রাণীতে এই পরিমাণ আরো বেশী।

5. প্রোটিন থেকে ফ্যাট (Fat from Protein) : কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড লিউসিন, β-হাইড্রোক্সি-β-মিথাইল গ্লুটারিল কো-এর মাধ্যমে শুধুমাত্র কিটোন বডিই উৎপন্ন করে না, মেভালোনিক অ্যাসিড ও কোলেস্টারোলও উৎপন্ন করে। এছাড়া আইসোলিউসিন, লাইসিন, ফেনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন ও ট্রিপটোফ্যান দেহে ফ্যাটের সংশ্লেষণ ঘটাতে পারে।

নিউক্লিওপ্রোটিন

NUCLEOPROTEIN

নিউক্লিক অ্যাসিডের সংগে সরল প্রোটিনের (প্রধানত হিস্টোন ও প্রোটামিন) সংযুক্তিতে **নিউক্লিওপ্রোটিন** উৎপন্ন হয় (7-27নং চিত্র)। RNA এবং DNA নামক নিউক্লিক অ্যাসিড দুটো 4 প্রকার মনোনিউক্লিওটাইডে অবস্থান করে। প্রতিটি
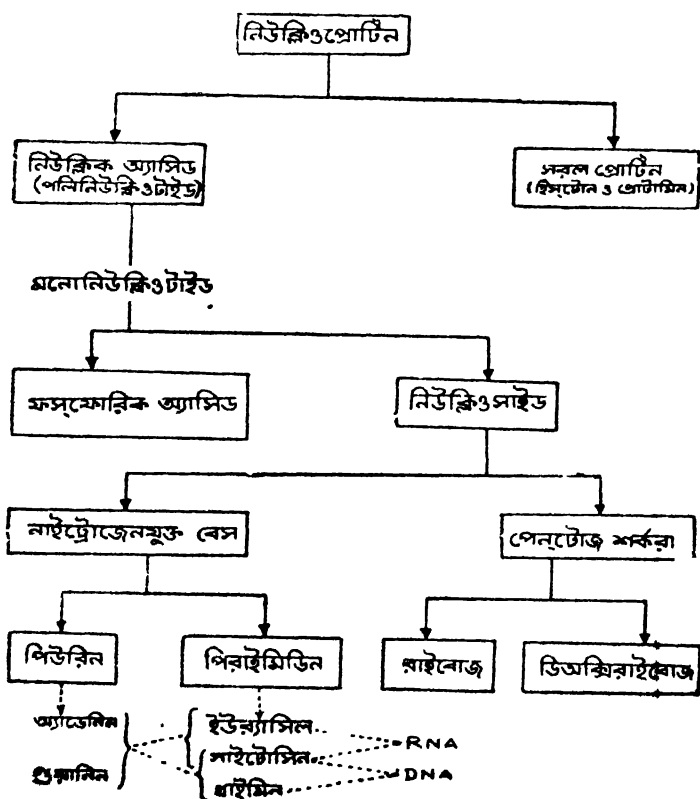
7-27 নং চিত্র : নিউক্লিওপ্রোটিনের উপাদান।

মনোনিউক্লিওটাইডের আর্দ্রবিশ্লেষণে ফস্ফোরিক অ্যাসিড ও নিউক্লিওসাইড পাওয়া যায়। নিউক্লিওসাইড পিউরিন ও পিরাইমিডিন বেস এবং পেন্টোজ শর্করার সমন্বয়ে গঠিত। রাইবোজ শর্করা RNA এবং ডিঅক্সিরাইবোজ DNA-তে পাওয়া যায়। পিউরিন বেস অ্যাডেনিন ও গুয়ানিন নিয়ে গঠিত। এই দুটো পদার্থই RNA এবং DNA-তে বর্তমান। অপরপক্ষে ইউরাসিল, সাইটোসিন এবং থাইমিনের সমন্বয়ে পিরাইমিডিন গঠিত। ইউরাসিল ও সাইটোসিন RNA এবং সাইটোসিন ও থাইমিন DNA-তে পরিলক্ষিত হয়।

1. **নিউক্লিক অ্যাসিড :** DNA (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড) প্রধানত প্রাণীকোষের ক্রোমোজোমে এবং RNA (রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড) প্রধানত নিউক্লিওলাস ও সাইটোপ্লাজমে (বিশেষত রাইবোসোমে) দেখতে পাওয়া যায়। নিউক্লিওলাসে RNA-এর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। কোষস্থ RNA এনজাইমের দ্বারা প্রতিনিয়ত বিনষ্ট হয়। অপরপক্ষে কোষের DNA কমবেশী স্থিতিশীল। এই দুটো অ্যাসিডের রাসায়নিক পার্থক্য উপরে উল্লেখিত হয়েছে।

DNA-এর মধ্যে নিউক্লিওটাইডের বিন্যাস ও তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় **ওয়াট্সোন ক্রিকের** (Watson Crick) DNA-এর মডেল বা নক্শা থেকে। মডেলে এক-জোড়া চেন বা শৃঙ্খল কুণ্ডলীকৃত-ভাবে ঘূর্ণায়মান সিঁড়ির মত বিন্যস্ত থাকে (7-28নং চিত্র)। শৃঙ্খল-যোজক পর্যায়ক্রমিক সুগার ফস্ফেট-এককের দ্বারা গঠিত। এই এককগুলো 3'-5' ফস্ফেট **ডি-এস্টারযোজকের** (diester bridge) দ্বারা যুক্ত থাকে। শৃঙ্খল দুটো আড়াআড়িভাবে হাইড্রোজেনযোজকের দ্বারা যুক্ত থাকে।
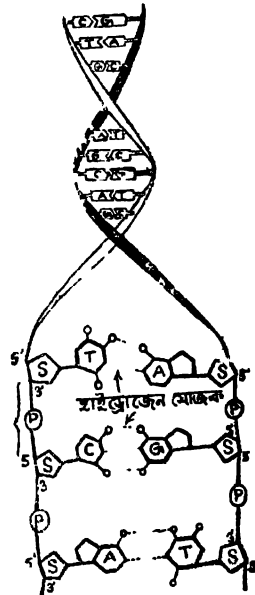
7-28 নং চিত্র : DNA-এর মডেল।
A অ্যাডেনিন, T-থাইমিন, C-সাইটোসিন, G-গুয়ানিন, P-ফস্ফেট, S-পেন্টোজ শর্করা।

হাইড্রোজেনযোজক নিউক্লিওটাইডযুগলের সন্নিহিত বেসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মধ্যে গড়ে ওঠে। অবশ্য নির্দিষ্ট বেস-যুগলের মধ্যেই এজাতীয় সংযোগ স্থাপিত হয়। থাইমিন সবসময়ে অ্যাডেনিন এবং সাইটোসিন সবসময়ে গুয়ানিনের সংগে যুক্ত হয় (7-28নং চিত্র)। এর সংগে আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হল প্রত্যেক জোড়ার অণুগুলো পরস্পর বিপরীত দিকে বিন্যস্ত থাকে
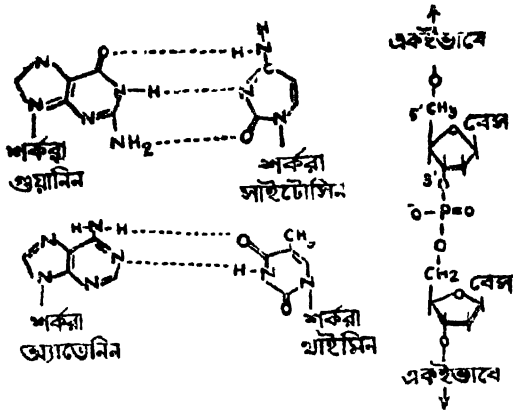
7-29 নং চিত্র : বামপাশে, গুয়ানিন ও সাইটোসিন এবং অ্যাডেনিন ও থাইমিনের মধ্যে হাইড্রোজেনযোজক, ডানপাশে 3′, 5′ ফসফেট ডি-এস্টার যোজক।

(7-29নং চিত্র)। অর্থাৎ 4-টি নিউক্লিওটাইডকে অসংখ্য পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করা যায়। বিভিন্ন প্রকার DNA-এর অস্তিত্ব এর জন্যই সম্ভবপর।

2. **মডেলের প্রামাণ্য তথ্য :** ওয়াট্‌সোন ক্রিকের মডেল প্রধানত ভৌত ও রাসায়নিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, (1) পিউরিন বেসের যোগফল পিরাইমিডিন বেসের যোগফলের সমান হয়, (2) অ্যাডেনিনের সংখ্যা থাইমিনের সমান হয়, (3) সাইটোসিন গুয়ানিনের সমান হয়, (4) তবে অ্যাডেনিন ও থাইমিনের যোগফল কখনও গুওয়ানিন ও সাইটোসিনের যোগফলের সমান হয় না। এছাড়া (5) রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে হাইড্রোজেন-যোজকের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং (6) এক্স-রে বিচ্ছুরণ (X-ray diffraction) অনুশীলনের দ্বারা নিয়মিত ও একরূপ (uniform) আণবিক গঠনের প্রমাণ পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়। তাঁদের এই ঐতিহাসিক আবিষ্কারের জন্য ওয়াট্‌সোন, ক্রিক এবং উইল্‌কিন্স 1962 খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

11 নং তালিকা ঃ নিউক্লিওপ্রোটিনের পরিপাক।

এন্‌জাইম	সাব্‌স্ট্রেট	বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ
পাকস্থলী ঃ পেপ্‌সিন HCl	নিওক্লিওপ্রোটিন	নিউক্লিন, প্রোটিন (→হিস্‌টোন, প্রোটামিন)
অগ্ন্যাশয় ঃ ট্রিপ্‌সিন	নিউক্লিন	নিউক্লিক অ্যাসিড প্রোটিন (→হিস্‌টোন ও প্রোটামিন)
অগ্ন্যাশয় ও ক্ষুদ্রান্ত্র ঃ রাইবোনিউক্লিয়েজ ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ	রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড	পলিনিউক্লিওটাইড
ক্ষুদ্রান্ত্র ঃ ফস্‌ফোডাই-এস্টারেজ	পলিনিউক্লিওটাইড	পিউরিন নিউক্লিওটাইড পিরাইমিডিন নিউক্লিওটাইড
নিউক্লিওটিডেজ	পিউরিন ও পিরাই-মিডিন নিওক্লিও-টাইড	পিউরিন ও পিরাইমিডিন নিউক্লিওসাইড, PO4
নিউক্লিওসিডেজ	পিউরিন ও পিরাইমিডিন নিউক্লিওসাইড	পিউরিন ও পিরাইমিডিন বেস, পেনটোজ ফসফেট
ক্ষুদ্রান্ত্রের আবরণী কোষের মধ্যে ঃ জান্‌থিন অক্সিডেজ	পিউরিন বেস	জান্‌থিন, ইউরিক অ্যাসিড

3. নিউক্লিওপ্রোটিনের পরিপাক ও বিশোষণ (Digestion and absorption of nucleoproteins) : অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিকরসে অবস্থানকারী এন্‌জাইমসমূহ নিউক্লিওপ্রোটিনের পরিপাকের জন্য দায়ী। পাকস্থলীয় জারকরসে অবস্থানকারী এন্‌জাইম **পেপ্‌সিন** নিউক্লিওপ্রোটিনকে নিউক্লিনে (nuclein) রূপান্তরিত করে। অগ্ন্যাশয় জারকরসের এন্‌জাইম **ট্রিপ্‌সিন** নিউক্লিনকে নিউক্লিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে। **নিউক্লিয়েজ** এন্‌জাইম নিউক্লিক অ্যাসিডকে নিউক্লিও-টাইডে পরিণত করে (11নং তালিকা)। এছাড়া **পলিনিউক্লিওটিডেজ** নিউক্লিক অ্যাসিডকে নিউক্লিওটাইডে এবং **নিউক্লিওসিডেজ** পিউরিন বা পিরাইমিডিন নিউক্লিওসাইডকে পিউরিন (বা পিরাইমিডিন) বেস ও পেন্‌টোজ ফস্‌ফেটে রূপান্তরিত করে।

নিউক্লিওপ্রোটিনের পরিপাক থেকে উৎপন্ন প্রোটিন অ্যামাইনোঅ্যাসিডে
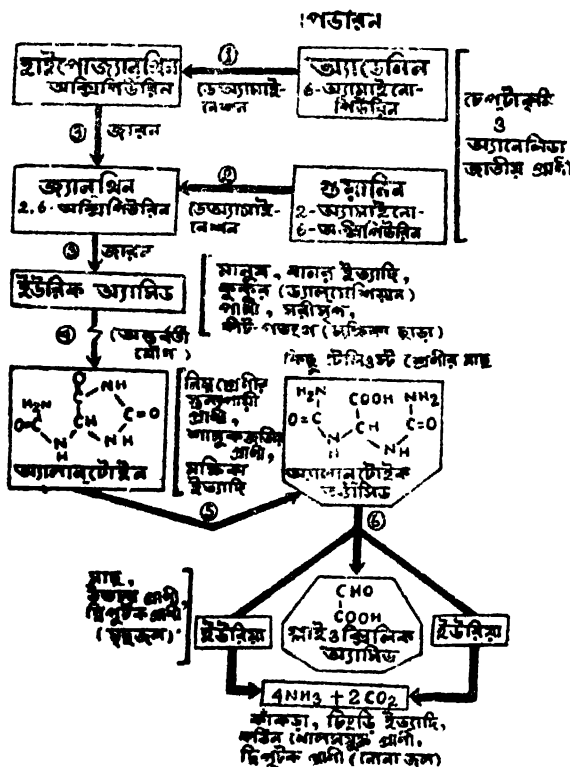
7-30 নং চিত্র : বিভিন্ন প্রাণীতে পিউরিনের বিপাকক্রিয়ার পর্যায়ক্রম।

(প্রধানত হিস্‌টোন ও প্রোটামিনে) পরিণত হয় এবং অন্যান্য অ্যামাইনো-

অ্যাসিডের মতই বিশোষিত হয়। ফস্‌ফেট সহজভাবেই ব্যাপন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মান্তরীয় আবরণীকোষে বিশোষিত হয়। পেনটোজ-ফসফেট আবরণীকোষে বিশোষিত হয় এবং কোষের বিপাকক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু পিরাইমিডিন নিউক্লিওটাইড সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে এবং পিউরিন নিউক্লিওটাইড ব্যাপনক্রিয়ায় আবরণীকোষে প্রবেশ করে। ধারণা করা হয়, পিরাইমিডিন নিউক্লিওসাইড আর পরিপাকের মধ্য দিয়ে না গিয়ে সে ভাবেই ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে বিশোষিত হয়। পিরাইমিডিন বেস পিরাইমিডিন পরিবহন-ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশোষিত হয়। জ্যানথিন ও ইউরিক অ্যাসিড ব্যাপন বা সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে বিশোষিত হয়।

4. **নিউক্লিওপ্রোটিনের বিপাক** (Metabolism of nucleoprotein) : নিউক্লিওপ্রোটিনের 4টি অংশের বিপাক 4 ভাবে সম্পন্ন হয়। **প্রোটিন অংশ** অন্যান্য দেহ-প্রোটিনের মত ডিঅ্যামাইনেশন ট্রান্‌সঅ্যামাইশনের মাধ্যমে রূপান্তর লাভ করে বা অন্যান্য প্রোটিন-সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। **শর্করা অংশের** (রাইবোজ বা ডিঅক্সিরাইবোজ) পরিণতি অস্পষ্ট। সম্ভবত এরা জারিত হয়ে CO_2 এবং H_2O উৎপন্ন করে। ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড ফস্‌ফেট-বিপাকের মত দেহে ব্যবহৃত হয়। পিরাইমিডিন বেসের (ইউরাসিল, সাইটোসিন ও থাইমিন) পূর্ণ ক্যাটাবলিজমে CO_2, H_2O এবং NH_3 উৎপন্ন হয়। পিউরিনের ক্যাটাবলিজম বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন। চেপ্টা কৃমি, অ্যানেলিডজাতীয় প্রাণী (annelids—কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি) ইত্যাদিতে পিউরিন অপরিবর্তিত অবস্থায় রেচিত হয়। পাখী 70—80% নাইট্রোজেন **ইউরিক অ্যাসিড** হিসাবে রেচন করে। পায়রার যকৃতে এন্‌জাইম জ্যান্‌থিন অক্সিডেজ (xanthine oxidase) অনুপস্থিত বলে পিউরিনকে তারা হাইপো-জ্যান্‌থিনে রূপান্তরিত করতে পারে। অবশ্য পায়রার বৃক্ক এই পদার্থকে ইউরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করতে পারে। বিভিন্ন প্রাণীতে পিউরিন ক্যাটাবলিজমের সংক্ষিপ্তসার 7-30নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। পিউরিন অণু যথাক্রমে **অ্যাডেনেজ** (adenase) ও **গুয়ানেজ** (guanase) এন্‌জাইমের (1, 2) দ্বারা অ্যামাইনোমুক্ত ও জারিত হয়ে **হাইপোজান্‌থিন** (অক্সিপিউরিন) উৎপন্ন করে। **জান্‌থিন অক্সিডেজ** (3) এই পদার্থকে জারিত করে **জান্‌থিনে** রূপান্তরিত করে। জান্‌থিন **ইউরিকেজ** (4) এন্‌জাইমের দ্বারা দুবার বিক্রিয়া করে ও জারিত হয়ে **অ্যালান্‌টোইন** উৎপন্ন করে। **অ্যালান্‌টোইনেজ**

(5) এই পদার্থকে অ্যালানটোইক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে এবং এভাবে দুটো বলয় উন্মুক্ত হয়। অ্যালানটোইকেজ (6) এনজাইমের উপস্থিতিতে অ্যালানটোইক গ্লাইওক্সিলিক অ্যাসিড ও 2 অণু ইউরিয়া উৎপন্ন করে। ইউরিয়া পরিশেষে ইউরিয়েজের দ্বারা NH_3 ও CO_2তে পরিণত হয়।

নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ

Nitrogenous Waste Products

প্রাণীদেহে বিপাকক্রিয়া থেকে নানা প্রকার বর্জ্যপদার্থ উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়া এরকম একটি বিপাকলব্ধ পদার্থ যাকে বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেহ থেকে নির্গত করে। অ্যামোনিয়া ছাড়াও বিভিন্ন প্রাণীতে আরও নানাপ্রকার নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ উৎপন্ন হয়। এসব পদার্থের মধ্যে প্রধান: ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, পিউরিনের বিপাকলব্ধ অন্যান্য পদার্থ, হিপ্পুরিক অ্যাসিড, ওর্নিথুরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন-ক্রিয়েটিনিন, ট্রাইমিথাইলামিন ইত্যাদি। পিউরিনের বিপাক থেকে বিভিন্ন প্রাণীতে যে বিভিন্ন প্রকার বর্জ্যপদার্থ উৎপন্ন হয় তার উল্লেখ এর আগে করা হয়েছে। অন্যান্য বর্জ্যপদার্থ সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

1. **অ্যামোনিয়া** (Ammonia): মুক্ত অ্যামোনিয়ার বিষক্রিয়া প্রাণীতে অপরিসীম। তাই জীবন্তকোষ বা তাদের চারিপাশের তরল মাধ্যমে কখনও এটি সঞ্চিত হয় না। খুব দ্রুত এটি কোষঝিল্লির মধ্য দিয়ে ব্যাপনপ্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে পারে। এই ধর্মের জন্যই হয়ত অ্যামোনিয়ার বিষক্রিয়া এত বেশী।

মানুষের প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে 0·1 – 0·2 মিলিগ্রাম অ্যামোনিয়া থাকে। ইউরিয়েজ (urease) নামক এনজাইমকে (যে ইউরিয়া থেকে অ্যামোনিয়া মুক্ত করতে পারে) পাখী, র‍্যাবিট প্রভৃতি প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে এসব প্রাণী অ্যামোনিয়ার বিষক্রিয়ায় মারা যায়।

অ্যামোনিয়াকে দেহ থেকে দ্রুত নিঃসৃত করতে হলে জলের উপস্থিতির প্রাচুর্য দরকার। জলজ সামুদ্রিক বা অসামুদ্রিক প্রাণীর ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যায়। সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা যেহেতু সম-অভিস্রবণ চাপসম্পন্ন নোনা জলে বাস করে; সেহেতু শুধু ব্যাপনক্রিয়ার মাধ্যমেই অ্যামোনিয়াকে দেহ থেকে নিঃসৃত করা যায়। মিঠে জলের প্রাণীরা যেহেতু কম অভিস্রবণ চাপসম্পন্ন দ্রবণে

(লবণ্সারক দ্রবণে) বাস করে সেহেতু চাপপার্থক্যের জন্য তাদের দেহে অনবরত জল প্রবেশ করে এবং সেই জলকে প্রাণী অনবরত পাম্প করে বের করে দেয়। এভাবে তারা অ্যামোনিয়াকে দেহ থেকে নিঃসৃত করে। যেসব প্রাণী অ্যামোনিয়াকে প্রধান বর্জ্যপদার্থ হিসাবে দেহ থেকে নির্গত করে তাদের **অ্যামোনিয়া-রেচক** (ammoniotelic) প্রাণী বলা হয়।

মানুষ অ্যামোনিয়াকে ইউরিয়াতে পরিণত করে এবং সেভাবেই নিঃসৃত করে।

2. **ইউরিয়া** (Urea) : মানুষের যকৃতে যেভাবে ইউরিয়া উৎপন্ন হয় তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। অ্যামোনিয়ার দুটো অণু এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের একটি অণু সংযুক্ত হয়ে যকৃতে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। যে সব প্রাণী ইউরিয়াকে প্রধান বর্জ্যপদার্থ হিসাবে দেহ থেকে নিঃসৃত করে তাদের **ইউরিয়া-রেচক** (ureotelic) প্রাণী বলা হয়। কোন কোন প্রাণীতে ইউরিয়া পিউরিন বিপাকের উপজাত (by-product) হিসাবে উৎপন্ন হয়।

3. **ইউরিক অ্যাসিড** (Uric Acid) : ইউরিক অ্যাসিড অতিমাত্রায় অদ্রবণীয়, তাই সহজেই কোন অতিসম্পৃক্ত দ্রবণ বা কোলয়েড দ্রবণ থেকে একে অধঃক্ষিপ্ত করা যায়। অ্যামোনিয়ার নির্বিষকরণের (detoxification) সময় প্রাণীতে ইহা উৎপন্ন হয়। ইউরিক অ্যাসিডই একমাত্র নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য-পদার্থ যা কঠিনপদার্থ হিসাবে প্রাণী দেহ থেকে নির্গত হয়, ফলে দেহ থেকে এই পদার্থটির রেচনের সময় জল বেরিয়ে যায় না। যেসব প্রাণী ইউরিক অ্যাসিডকে প্রধান বর্জ্যপদার্থ হিসাবে রেচন করে, তাদের **ইউরিক অ্যাসিড-রেচক** (uricotelic) প্রাণী বলা হয়। শামুক, পতংগ, পাখী, এক ধরনের সরীসৃপ ইত্যাদি এর উদাহরণ। পিউরিনের বিপাকলব্ধ পদার্থ হিসাবেও ইউরিক অ্যাসিডকে পাওয়া যায়। পাখীর যকৃৎ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে জানা গেছে, এরা দেহের 70-80 শতাংশ নাইট্রোজেনকে ইউরিক অ্যাসিড হিসাবে রেচন করে। আরো জানা গেছে মুরগী ও হংসী অ্যামোনিয়া থেকেই প্রধানত ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। অপরপক্ষে পায়রা প্রথমে যকৃতে হাইপোজানথিন (hypoxanthine) উৎপন্ন করে যা পরে বৃক্কে গিয়ে ইউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। দেখা গেছে পায়রার যকৃতে জানথিন অক্সিডেজ (xanthine oxidase) এনজাইম অনুপস্থিত।

4. **অন্যান্য নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ** (other nitrogenous waste products) :

(a) **মুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড** (Free aminoacids) : কোন কোন অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে দেহ থেকে নির্গত নাইট্রোজেনের প্রায় 15 শতাংশ আসে মুক্ত অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে। ক্রোমাটোগ্রাফির কলাকৌশল ও অন্যান্য পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে বয়স্ক মানুষেও প্রতিদিন এক গ্রামের বেশী অ্যামাইনো-অ্যাসিড দেহ থেকে নিঃসৃত হয় (সামগ্রিকভাবে নাইট্রোজেন রেচনের প্রায় 1.2 শতাংশ)। অবশ্য এখনও প্রশ্ন থেকে গেছে, দেহ থেকে অ্যামাইনোঅ্যাসিডের রেচনকে সত্যিকারের বর্জপদার্থের রেচন হিসাবে গণ্য করা যায় কিনা। ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য দেখা গেছে প্রায় সব প্রাণীতেই কিছু না কিছু অ্যামাইনোঅ্যাসিড দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

(b) **অ্যামাইনোঅ্যাসিড সংযুক্তপদার্থ** (Aminoacid conjugate) : নানাপ্রকার নির্বিষকরণ প্রক্রিয়ায় অ্যামাইনোঅ্যাসিড সংযুক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় যা নাইট্রোজেন রেচনের একটি বিশেষ অংশ। যেমন, বেনজোইক অ্যাসিড (benxoic acid) একটি বিষাক্ত পদার্থ। স্নেহদ্রব্যের বিপাকের সময় এটি সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাছাড়া খাদ্যেও সামান্য পরিমাণে থেকে যায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এই পদার্থটি গ্লাইসিনের সংগে যুক্ত হয়ে হিপ্পুরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

$$C_6H_5\text{—}\overset{O}{\overset{\|}{C}}\text{-OH} + \underset{COOH}{\overset{NH_2}{CH}} \longrightarrow C_6H_5\text{—}\overset{O}{\overset{\|}{C}}\text{—NH—}\underset{COOH}{CH_2} + H_2O$$

বেনজোইক অ্যাসিড গ্লাইসিন হিপ্পুরিক অ্যাসিড
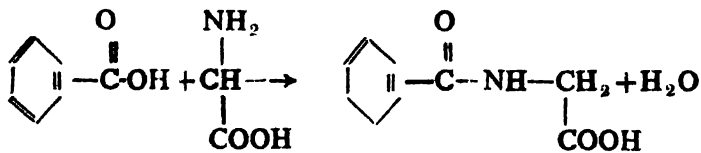
পাখীতে বেনজোইক অ্যাসিড ওরনিথিনের সংগে যুক্ত হয়ে ওরনিথুরিক অ্যাসিড (ornithuric acid) উৎপন্ন করে।

এই উভয়প্রকার সংশ্লেষণে ATP এর প্রয়োজন হয়। সিস্টেইনও এজাতীয় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। উদাহরণ, ব্রমোবেনজিন (bromobenzene) উৎপাদন।

(c) **ক্রিয়েটিন ও ক্রিয়েটিনিন** (Creatine and Creatinine) : বিভিন্ন-শ্রেণীর মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে এই দুটো পদার্থকে মূত্রে পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীতে ক্রিয়েটিন শক্তির রূপান্তরে ও পেশীসংকোচনে অংশ গ্রহণ করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে এই পদার্থটি তার অ্যানহাইড্রাস অবস্থা ক্রিয়েটিনিন হিসাবে মূত্রে নির্গত হয়।

(d) **ট্রাইমিথাইলামিন** (Trimethylamine) : এই পদার্থটি এবং তার অক্সাইড বিভিন্ন প্রাণীতে তাদের রেচিত নাইট্রোজেনের প্রায় 25% (বিশেষত elasmobranchs ও marine teleosts এর ক্ষেত্রে)। আগের ধারণা ছিল সামুদ্রিক মাছের ক্ষেত্রে এই পদার্থটি অ্যামোনিয়ার নির্বিষকরণে উৎপন্ন হয় এবং দেহের মধ্যেই থেকে যায়, যাতে রক্তে অভিস্রবণ-চাপ সমুদ্রের নোনাজলের চাপের সমান হয়। ফ্রুটোন (Fruton), সিমন্ড (Simmond) প্রভৃতির গবেষণা থেকে জানা গেছে এই ধারণা ভুল।

প্রোটিনের জৈবসংশ্লেষণ

BIOSYNTHESIS OF PROTEIN

কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রোটিনের জৈব সংশ্লেষণ সংঘটিত হয়। সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত **অ্যামাইনোঅ্যাসিড** প্রোটিন-সংশ্লেষণের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সংশ্লেষণে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তা ATP হিসাবে কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহদ্রব্যের জৈব জারণ থেকে পাওয়া যায়। কোন একটি প্রোটিনের জৈব সংশ্লেষণের নির্দেশ আসে কোষনিউক্লিয়াসের জীনস্থিত DNA থেকে। এই নির্দেশ মত প্রোটিনের সংশ্লেষণে যেসব পদার্থ সরাসরি অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে প্রধান : (1) **রাইবোজোম গুটিকা**, (2) **সংকেতবাহী আর এন এ** বা mRNA, (3) **ট্রান্সফার আর. এন. এ.** বা tRNA এবং (4) **অ্যামাইনো-অ্যাসিড ও এনজাইমসমূহ**।

1. **রাইবোজোম** (Ribosomes) : প্রোটিন-সংশ্লেষণের যথার্থ স্থান রাইবোজোম। এদের উপরিতলে প্রোটিনের সংশ্লেষণ সম্পন্ন হয়। এরা কোষ-সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে।

রাইবোজোম নিওক্লিওপ্রোটিন বিশেষ (নিউক্লিকঅ্যাসিড+প্রোটিন -রাইবোজোমে অবস্থানকারী নিউক্লিক অ্যাসিডকে rRNA (ribosomal RNA বলা হয়। রাইবোজোমে প্রোটিন ও rRNA-এর ভাগাভাগি প্রায় সমান সমান।

রাইবোজোম বিশেষ দুটো অংশের সমন্বয়ে গঠিত। এই অংশ দুটো 50S* এবং 30S নামে পরিচিত। অর্থাৎ এই সংখ্যা দুটো এই অংশের থিতান ধ্রুবক (sedimentation constant)। 50S এবং 30S থিতান ধ্রুবকসম্পন্ন দুটো অংশের সমন্বয়ে 70S থিতান ধ্রুবকসম্পন্ন সম্পূর্ণ রাইবোজোম
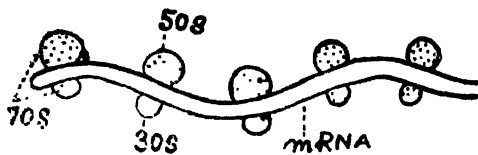
7-31নং চিত্র : RNA এর ফিতের আবদ্ধ পলিজোম।

গঠিত হয়। দেখা গেছে রাইবোজোমের 50S অংশে প্রায় 13 প্রকার প্রোটিন এবং 30S অংশে 11 প্রকার প্রোটিন রয়েছে। এই দুটো অংশে rRNA-এর প্রকৃতিও ভিন্ন হয়। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, এধরনের 3 থেকে 56 সংখ্যক 70S থিতান ধ্রুবকসম্পন্ন রাইবোজোমের গায়ে একটিমাত্র প্রোটিনের জৈব সংশ্লেষণ সমাপ্ত হয়। এই রাইবোজোমসমূহ একটিমাত্র সংকেতবাহী আর. এন. এ.-এর ফিতেয় আবদ্ধ থাকে (7-31 নং চিত্র) এবং প্রোটিনসংশ্লেষণের সময়ে mRNA-এর ফিতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে গড়িয়ে যায়। কারো কারো মতে mRNA নিজেই রাইবোজোম গুটিকার উপর দিয়ে টেপের (tape) মত গড়িয়ে যায়। mRNA-এর ফিতেয় আবদ্ধ রাইবোজোমের এই সমষ্টিকে **পলিজোম** (polysome) বা **পলিরাইবোজোম** বলা হয়। রেটিকুলোসাইট বা অপরিণত লোহিতকণিকাতে যে পলিজোম দেখা যায় তা 5টি রাইবোজোমের সমন্বয়ে গঠিত। ইহা হিমোগ্লোবিনের সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। পেশীতন্তুতে 56টি রাইবোসোম সম্পন্ন পলিজোম মায়োসিস প্রোটিনের সংশ্লেষণ ঘটায়।

2. **সংকেতবাহী আর. এন. এ (mRNA) :** সংকেতবাহী আর. এন. এ. নিউক্লিয়াসস্থিত ডি. এন. এ. থেকে উৎপন্ন হবার পর নিউক্লিয়াস থেকে

*S = স্ভেডবার্গ একক (Svedberg unit) = 1×10^{-13}

সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং রাইবোজোমের সংগে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট প্রোটিনের সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। কোন একটি প্রোটিনে কতসংখ্যক ও কোন্ কোন্

C U C লিউসিনের কোডন
U C U সেরিনের কোডন
U G U সিসটেইনের কোডন
G U G ভ্যালিনের কোডন
A C A থ্রিওনিনের কোডন
C A C হিসটিডিনের কোডন
A G A আরজিনিনের কোডন
G A G গ্লুটামিক অ্যাসিডের কোডন
mRNA
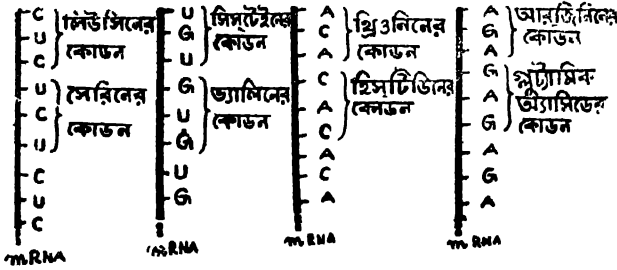
7-32 নং চিত্র : mRNA তে বিভিন্ন অ্যামাইনোঅ্যাসিডের কোডন।

অ্যামাইনোঅ্যাসিড থাকবে এবং এই অ্যামাইনোঅ্যাসিডগুলো প্রোটিন-চেনে পর পর কীভাবে বিন্যস্ত হবে, তার সুস্পষ্ট ইংগিত নিহিত থাকে এসব সংকেতবাহী আর. এন. এ. অণুর মধ্যে। 4টি বর্ণমালা (A.U.G.C)[2] দ্বারা mRNA-তে লিপিবদ্ধ এই ইংগিত বা নির্দেশককে প্রোটিনসংশ্লেষণের **বংশসংকেত** (genetic code) নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি অ্যামাইনোঅ্যাসিডের জন্য এই 4টি বর্ণমালার তিনটি বর্ণকে নিয়ে 3 অক্ষরের যে বংশসংকেত গঠিত হয় তাকে **কোডন** (codon) বলা হয় (7-32 নং চিত্র)।

নিউক্লিয়াসের জীনস্থিত DNA-এর দুটো পেঁচাল শৃংখলের যেকোন একটির
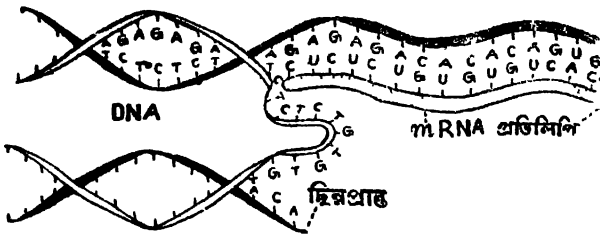
7-33নং চিত্র : mRNA এর সংশ্লেষণ।

4-টি বেস বা বর্ণমালার (A, T, C, G)[3] পরিপূরক বর্ণের প্রতিলিপি গ্রহণ করে নির্দিষ্ট mRNA সংশ্লেষিত হয় (7-33নং চিত্র)। mRNA সংশ্লেষণের সময়

---

2. A-অ্যাডেনিন (adenine), U-ইউরাসিল (uracil), G-গুয়ানিন (guanine) C-সাইটোসিন (cytosine), T-থাইমিন (thymine)।

3. DNAতে A-এর পরিপূরক T, C এর G। mRNA সংশ্লেষণে T-এর স্থানে U ব্যবহৃত হয়।

DNA-এর নির্দিষ্ট অংশের একটিমাত্র শৃঙ্খল বিছিন্ন হয় এবং এই বিচ্ছিন্ন অংশের প্রতিলিপি গ্রহণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট mRNA সংশ্লেষিত হয়। সংশ্লেষণক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে গেলে বিচ্ছিন্ন অংশ পুনরায় সংযুক্ত হয়ে যায়। mRNA-এর সংশ্লেষণে ATP, CTP, UTP, Mg^{++} আয়ন এবং এনজাইম RNA পলিম্যারেজ অংশগ্রহণ করে।

(C) **ট্রানফার আর. এন. এ (tRNA) :** ট্রানফার আর. এন. এ. বা
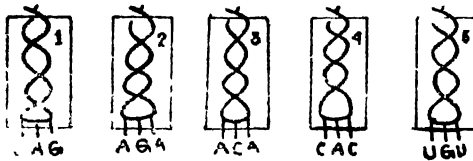
7-74নং চিত্র : 1, 2, 3, 4 এবং 5 যথাক্রমে লিউসিন, সেরিন, সিস্টেইন, ভ্যালিন ও থ্রিওনিনের পরিপূরক কোডনযুক্ত tRNA

tRNA সাইটোপ্লাজমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। এরা নির্দিষ্ট অ্যামাইনো-অ্যাসিডকে পরিবহন করে প্রোটিনের সংশ্লেষণস্থানে (পলিরাইবোজোম) নিয়ে যায়। 2টি অ্যামাইনোঅ্যাসিডের প্রত্যেকটির জন্য অন্ততপক্ষে একটি করে নির্দিষ্ট tRNA থাকে। কোন অ্যামাইনোঅ্যাসিডের একাধিক কোডন, সম্ভবপর হলে তাকে বহনযোগ্য একাধিক tRNA থাকাও সম্ভবপর।

প্রতিটি tRNA এমনভাবে ভাঁজ হয়ে থাকে, যার বিশেষ তিনটি নিউক্লিওটাইড mRNA-এর প্রতিটি কোডনের পরিপূরক কোডন (কোডন UUU হলে, পরিপূরক-কোডন AAA হবে) হিসাবে কার্য করে। tRNA এর এই পরিপূরক-কোডনকে **অ্যান্টিকোডন** (anticodon) বলা হয় (7-34 নং চিত্র)। অতএব প্রোটিনচেনের নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট অ্যামাইনোঅ্যাসিডের স্থানান্তরক্রিয়া প্রধানত mRNA-এর কোডনে tRNA-এর অ্যান্টিকোডনের সংযুক্তির উপর নির্ভরশীল।

সংশ্লেষণ-পদ্ধতি (Mechanism of synthesis) **:** প্রোটিনসংশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায়কে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় : (1) tRNA-এর সংগে অ্যামাইনোঅ্যাসিডের সংযুক্তি, (2) প্রোটিনচেনের প্রবর্তন, (3) প্রোটিন-চেনে পরবর্তী অ্যামাইনোঅ্যাসিডের অন্তর্ভুক্তি এবং (4) প্রোটিনচেনের অবসান।

(1) tRNA-এর সংগে অ্যামাইনোঅ্যাসিডের সংযুক্তি : এনজাইম ও ATP-এর উপস্থিতিতে অ্যামাইনোঅ্যাসিড tRNA এর সংগে যুক্ত হয়ে

12 নং তালিকা : 20টি অ্যামাইনোঅ্যাসিডের কোডন।

অ্যামাইনোঅ্যাসিড	RNA-তে অ্যাম্যাইনো-অ্যাসিডের কোডন	
1. অ্যালানিন	CCG	UCG
2. আর্‌জিনিন	CGC	AGA
3. আস্‌পারাজিন	ACA	AUA
4. আস্‌পার্‌টিক অ্যাসিড	GUA	
5. সিস্‌টেইন	UUG	
6. গ্লুটামিক অ্যাসিড	GAA	
7. গ্লুটামিন	ACA	AGA
8. গ্লাইসিন	UGG	AGG
9. হিস্‌টিডিন	ACC	
10. আইসোলিউসিন	UAU	UAA
11. লিউসিন	UUG	UUC
12. লাইসিন	AAA	AAG
13. মিথিওনিন	UGA	
14. ফেনাইল অ্যালানিন	UUU	CUU
15. প্রোলাইন	CCC	CCU
16. সেরিন	UCU	UCC
17. থ্রিওনিন	CAC	CAA
18. ট্রিপ্‌টোফ্যান	CGU	
19. টাইরোসিন	AUU	
20. ভ্যালিন	UGU	

অ্যামাইনোঅ্যাসাইল tRNA যৌগ উৎপন্ন করে ; প্রথমে এন্‌জাইম অ্যামাইনো-অ্যাসাইল সিন্‌থেটেজ (aminoacyl synthetase) ও ATP অ্যামাইনো-অ্যাসিডের সংগে যুক্ত হয়ে অ্যামাইনোঅ্যাসাইল এ. এম. পি. এনজাইম যৌগ উৎপন্ন করে। এ যৌগ এরপর tRNA-এর সংগে যুক্ত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসাইল tRNA উৎপন্ন করে।

অ্যামাইনোঅ্যাসিড + ATP + এন্‌জাইম

———→ অ্যামাইনোঅ্যাসাইল-AMP-E + Pi

tRNA

———→ অ্যামাইনোঅ্যাসাইল-tRNA + AMP + এন্‌জাইম

(2) **প্রোটিনচেনের প্রবর্তন** (Initiation of peptide chain) **:** অ্যামাইনোঅ্যাসাইল tRNA, mRNA-এর প্রারম্ভবিন্দুতে অবস্থানকারী 50S রাইবোজোমের সংগে সংযুক্ত হয় এবং প্রোটিনচেনের প্রবর্তন ঘটায় (7-35 নং চিত্র)।

(3) **প্রোটিনচেনে পরবর্তী অ্যামাইনোঅ্যাসিডের অন্তর্ভুক্তি** (Incorporation of subsequent aminoacids to protein-chain) **:** পরবর্তী অ্যামাইনোঅ্যাসিড-পরিবহনকারী rRNA বা অ্যামাইনোঅ্যাসাইল-tRNA রাইবোজোমের 30S অংশের সংগে যুক্ত হয়। এরপরই ইহা 50S অংশে স্থানান্তরিত হয় এবং প্রোটিনচেনের বৃদ্ধি ঘটায়। এভাবে প্রতিটি অ্যামাইনো-অ্যাসাইল tRNA সামনের দিকে অগ্রসরমান রাইবোজোমের 30S অংশে যুক্ত হয় এবং এরপরই 50S অংশের সংগে যুক্ত mRNA-এর কোডনে স্থানান্তরিত হয়। এভাবে প্রোটিনচেনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। প্রোটিনচেন বরাবর অগ্রসরমান রাইবোজোমের ভৌত গতির প্রয়োজনীয় শক্তি GTP থেকে আসে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। প্রতিটি অ্যামাইনোঅ্যাসিডের প্রোটিনচেনে প্রবেশের সময় একটি করে GTP ব্যয়িত হয়।
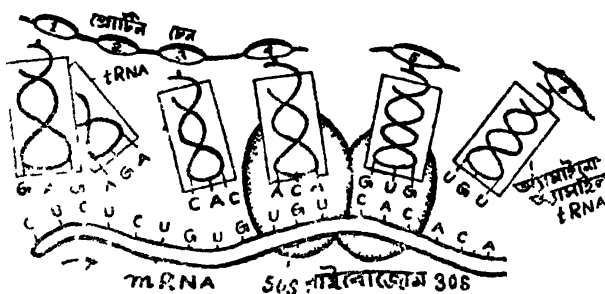
7-35 নং চিত্র : 1. লিউসিন, 2. সেরিন, 3. ভ্যালিন, 4. সিসটেইন, 5. থ্রিওনিন।

(4) **প্রোটিনচেনের অবসান** (Termination of peptide chain) **:** পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় UAA, UAG এবং UGA কোডনত্রয় প্রোটিনচেনের অবসান ঘটায়। এরপর আর কোন প্রোটিনযোজকের সৃষ্টি হয় না। তবে কীভাবে এই কোডনত্রয় প্রোটিনচেনের অবসান ঘটায় এবং পলিপেপটাইড বা নব সৃষ্ট প্রোটিনকে মুক্ত করে, তা' এখনও অজ্ঞাত। এভাবে একটি নির্দিষ্ট প্রোটিনের সংশ্লেষণপর্ব সমাপ্ত হয়।

ক্রিয়েটিন ও ক্রিয়েটিনিন

Creatine and creatinine

ক্রিয়েটিন ও ক্রিয়েটিনিন পদার্থদ্বয় পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ক্রিয়েটিন মিথাইলযুক্ত অ্যাসিড (মিথাইল গুয়ানিডো অ্যাসিটিক অ্যাসিড) এবং ক্রিয়েটিনিন তার নিরুদক (anhydride)।
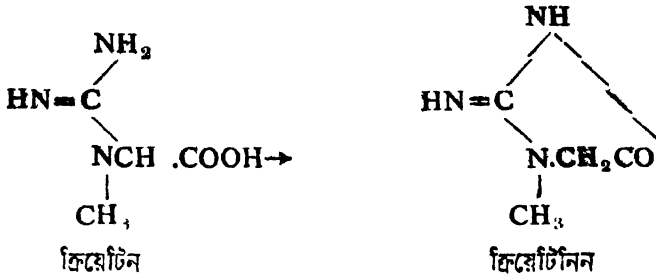
দ্রবীভূত অবস্থায় পদার্থ দুটি পরস্পর রূপান্তরিত হতে পারে। অম্ল মাধ্যম যেমন ক্রিয়েটিনিন উৎপাদনের সহায়ক, তেমনি ক্ষারীয় মাধ্যম ক্রিয়েটিনিন উৎপাদনের সহায়ক। দেহে ক্রিয়েটিনিন কখনও ক্রিয়েটিনে রূপান্তরিত হতে পারে না, তবে বিপরীত রূপান্তর সম্ভবপর।

(a) **ক্রিয়েটিন** (Creatine): ক্রিয়েটিনের প্রাচুর্য পেশীতে সবচেয়ে বেশী। মস্তিষ্ক, শুক্রাশয়, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রভৃতি স্থানে একে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। অস্থিপেশী বা ঐচ্ছিক পেশীতে এর পরিমাণ প্রায় 0'5 শতাংশ। হৃৎপেশীতে এর প্রায় অর্ধেক পরিমাণ ক্রিয়েটিন দেখা যায়। পেশীতে ইহা প্রধানত ক্রিয়েটিন ফসফেট হিসাবে অবস্থান করে। রক্তে প্রধানত লোহিতকণিকাতেই ক্রিয়েটিন দেখতে পাওয়া যায়। প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে এর পরিমাণ পায় 10 মিলিগ্রাম।

1. **উৎস: গ্লাইসিন, আরজিনিন ও মিথিওনিন:** এই তিনটি অ্যামাইনোঅ্যাসিড ক্রিয়েটিনের প্রধান উৎস। ক্রিয়েটিনের মিথাইল গ্রুপকে ($—CH_3$) ট্রানস্‌মিথাইলেশন পদ্ধতিতে মিথিওনিন থেকে পাওয়া যায়।

2 **সংশ্লেষণ:** ক্রিয়েটিন প্রধানত পেশীতেই সংশ্লেষিত হতে পারে। যকৃৎও ক্রিয়েটিন উৎপাদন করতে পারে। প্রথমে অ্যামাইনোঅ্যাসিড গ্লাইসিন আরজিনিনের অ্যামাইনগ্রুপের ($^-CNH.NH_2$) সংগে যুক্ত হয়ে গুয়ানিডো-

অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই পদার্থটি **সক্রিয় মিথিওনিন** থেকে প্রাপ্ত **মিথাইল** গ্রুপের সংগে সংযুক্ত হয়ে **মিথাইলগুয়ানিডোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড** বা ক্রিয়েটিন উৎপন্ন করে। এনজাইম গুয়ানিডোঅ্যাসিটিক মিথাইল ট্রান্সফারেজ মিথাইল গ্রুপের হস্তান্তরে অংশগ্রহণ করে।

3. **পরিণতি ও কার্যাবলী :** ক্রিয়েটিন প্রধানত ক্রিয়েটিন ফসফেটে পরিবর্তিত হয়ে পেশীসঞ্চালনে সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত ক্রিয়েটিন থেকে ক্রিয়েটিনিন উৎপন্ন হয়। কোষের অন্যান্য কার্যেও ইহা অংশগ্রহণ করে।

4. **রেচন :** সুস্থ ও স্বাভাবিক বয়স্ক লোকের মূত্রের সংগে ক্রিয়েটিন নির্গত হয় না। তবে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত শিশু ও কিশোরের মূত্রে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অপরিণত পেশীর ক্রিয়েটিন সঞ্চয় করার ক্ষমতা যেমন কম তেমনি ক্রিয়েটিন থেকে ক্রিয়েটিনিন-উৎপাদনের ক্ষমতাও কম। এছাড়া স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় অত্যধিক প্রোটিনজাত খাদ্যবস্তুর গ্রহণে এবং দেহজ প্রোটিনের অধিক ক্যাটাবলিজমের ফলে (মধুমেহ, জ্বর, থাইরোয়েড গ্রন্থির অতিসক্রিয়তা ইত্যাদি) মূত্রে ক্রিয়েটিন নির্গত হয়।

(b) **ক্রিয়েটিনিন :** ক্রিয়েটিন থেকে এক অণু জল অপসারণ করলে ক্রিয়েটিনিন উৎপন্ন হয়। এ জাতীয় রূপান্তরে কোন এনজাইম-অনুঘটনের প্রয়োজন হয় না। প্রধানত পেশীতেই এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পদার্থটি বর্জ্যদ্রব্য হিসাবেই দেহে উৎপন্ন হয়, কারণ বাহির থেকে দেহে প্রবেশ করানোর সংগে সংগে এর প্রায় 80 শতাংশ মূত্রে নির্গত হয়। 24 ঘণ্টায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকে যথাক্রমে 1·2—2·0 এবং 0·8—1·5 মিলিগ্রাম ক্রিয়েটিনিন নির্গত হয়। রক্তে সাধারণভাবে এর পরিমাণ প্রতি 100 মিলিলিটারে প্রায় 0·7-2·0 মিলিগ্রাম।

প্রশ্নাবলী

1. মানুষের রক্তে শর্করার স্বাভাবিক মাত্রা কি রকম? রক্তশর্করার নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিজাত কারণসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। (C. U. '64)

2. মানুষের দেহে রক্তশর্করার নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি বিবৃত কর। গ্লুকোজ সহিষ্ণুতার পরীক্ষার গুরুত্ব কোথায়? (C. U. '66, '76)

3. গ্লাইকোলাইসিস কী? গ্লাইকোলাইসিসের ধাপগুলো বর্ণনা কর (C. U. 82)

4. গ্লাইকোলাইসিসের সীমিতহার বিক্রিয়াসমূহের নাম কর। এই সীমিতহার বিক্রিয়াসমূহের সংগে সম্পর্কযুক্ত এনজাইম ও তাদের প্রতিরোধকের (যদি থাকে) বর্ণনা দাও।
(C. U. H. '76)

5. ক্রেব্স-চক্রের মাধ্যমে পাইরুভিক অ্যাসিডের সবাত বিপাকক্রিয়ার বর্ণনা দাও। বিক্রিয়াপথের সীমিত-হার ধাপগুলোর উল্লেখ কর। এক অণু পাইরুভিক অ্যাসিডের সবাত জারণ থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বন্ড উৎপাদনের বর্ণনা দাও। (C. U. H. '81)

6. এনজাইমের উল্লেখসহ ক্রেব্স-চক্রের বর্ণনা দাও। বায়বীয় গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেব্সচক্রের মাধ্যমে এক অণু গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন-একক থেকে কত সংখ্যক ATP উৎপন্ন হয় ?

7. পেনটোজ ফস্ফেট বিক্রিয়াপথের বর্ণনা দাও।

8. জাইলোলোজ-5-ফস্ফেট কাকে বলে ? কো-এনজাইম ও কো-ফ্যাক্টর সমেত এর প্রত্যক্ষ উৎপাদন ও অন্তর্ধানের জন্য দায়ী এনজাইমসমূহের বর্ণনা দাও। (C. U. H. '76)

9. আমাদের খাদ্যে স্নেহদ্রব্য প্রয়োজন কেন ? দেহে স্নেহদ্রব্যের বিপাক কীভাবে সম্পন্ন হয় লিখ।
(C. U. '65)

10. 16-টি কার্বনসম্পন্ন একটি ফ্যাটি অ্যাসিডের β-জারণ পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপগুলি বর্ণনা কর।
(C. U. 84, 86)

11. অপরিহার্য স্নেহঅম্ল কাকে বলে ? তাদের যে কোন দুটির নাম কর। স্নেহ অম্লের বিটাজারণের ধাপগুলি বর্ণনা কর।
(C. U. '81)

12. যেসব ধাপে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফসফেট বন্ড উৎপন্ন হয় তার উল্লেখসহ স্নেহঅম্লের β-জারণের বর্ণনা কর। β-জারণ থেকে উৎপন্ন অ্যাসিটাইল কো-এর প্রধান পরিণতি বিষয়ে আলোকপাত কর।
(C. U. H. '81)

13. কিটোসিস কাকে বলে ? কিটোসিসের কারণ কী ? দেহে কীভাবে কিটোন পদার্থ উৎপন্ন হয়।
(C. U. '81)

14. আমাদের দেহে ফ্যাটি-অ্যাসিড কীভাবে জারিত হয় আলোচনা কর। (C. U. '70)

15. মানুষের দেহে এক অণু শর্করা কিভাবে এক অণু স্নেহদ্রব্যে রূপান্তরিত হয় লিখ।

16. বিটা-হাইড্রোক্সি-বিটা মিথাইল গ্লুটারিল কো-এ কাকে বলে ? কিভাবে ইহা উৎপন্ন হয় এবং কিভাবে আমাদের দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বল।
(C. U. H. '76)

17. ডি-অ্যামাইনেশন ও ট্রান্স-অ্যামাইনেশন সম্বন্ধে যা জান লিখ। প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও। অ্যামাইনো অ্যাসিড ভাণ্ডার বলতে কি বুঝায় ?
(C. U. 85)

18. দেহে অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্যাবলী বর্ণনা কর। সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রকে TCA চক্র বলা হয় কেন ?
(C. U. '51)

19. দেহে ইউরিয়া সংশ্লেষণের পদ্ধতি বর্ণনা কর। (C. U. '62 '71 83)

20. কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট ও প্রোটিনের বিপাকক্রিয়ার সেতু হিসাবে TCA-চক্র কাজ করে, চিত্রসহ তার ব্যাখ্যা কর।
(C. U. H. '73,)

21. দেহে প্রোটিনের জৈব সংশ্লেষণ কীভাবে সম্পন্ন হয় বিবৃত কর।

22. ক্রিয়েটিন ও ক্রিয়েটিনিন সম্বন্ধে যা জান লিখ।

২৯. টীকা লিখঃ

(a) রক্তশর্করা ('62), (b) গ্লুকোজ-সহিষ্ণুতার পরীক্ষা, (c) মধুমেহ, (d) হাইপোগ্লাইসেমিয়া, (e) গ্লাইকোজেন-সংশ্লেষণ, (f) গ্লাইকোলাইসিস ('66), (g) পাইরুভিক অ্যাসিডের বিপাক, (h) কিটোসিস ('68), (i) কিটোনপদার্থ ('69, '75 84), (j) ATP ('71, '75), (k) ওমেগা-জারণ (l) ডিঅ্যামাইনেশন, (m) ট্রান্স-অ্যামাইনেশন, (n) রাইবোজোম, (o) সংকেতবাহী আর. এন এ. (p) কোডন ও অ্যান্টিকোডন, (q) ক্রিয়েটিন, (r) নিওগ্লুকোজেনেসিস ('79), (s) গ্লুটাথায়োন (C.U. '81), (t) হাইড্রোক্সিপ্রোটিন, (u) সক্রিয়তার জন্য FAD ও TPP প্রয়োজন এরূপ উৎসেচকগুলোর নাম লিখ ('83), (v) DNA এর নাইট্রোজেনযুক্ত বেসগুলোর নাম কর ('84), (w) কোরি-চক্র ('84), (x) ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিডচক্র কাকে বলে? এই চক্রের ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিডগুলোর নাম কর ('83), (y) DNA ও RNA এর মধ্যে প্রভেদ ('82), (z) গ্লাইকোজেনেসিস ও গ্লুকোনিওজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য ('82)।

আট

পুষ্টি ও খাদ্যব্যবস্থা

NUTRITION AND DIETETICS
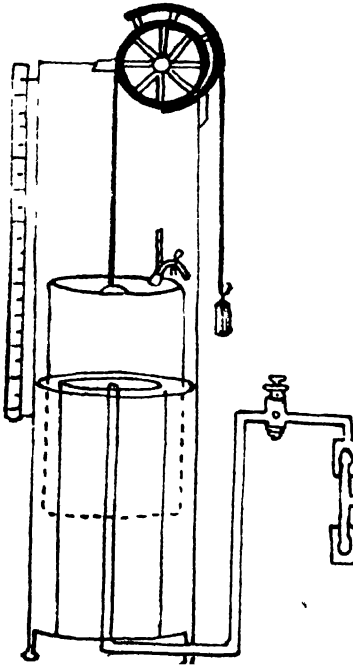
প্রাণীদেহের পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদান আসে খাদ্য থেকে। খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ভিটামিন ও খনিজ ধাতু পাওয়া যায়। প্রথম তিনটি খাদ্য উপাদান দেহের ক্যালরিচাহিদার যোগান দেয়, দেহবৃদ্ধি করে এবং কলাকোষের গঠনমূলক কাজ বা মেরামতির কাজ সুসম্পন্ন করে। ভিটামিন, খনিজ ধাতু এবং জল দেহের রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে কাজ করে। যেমন, দেহে জৈবশক্তির সঠিক ব্যবহার এবং হরমোন তথা এনজাইম প্রভৃতি প্রোটিনের সংশ্লেষণ ইত্যাদি। খনিজ ধাতু এছাড়াও কলাকোষের কাঠামোতে প্রবেশ করে এবং দ্রবীভূত অবস্থায় অম্ল-ক্ষারের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে অংশগ্রহণ করে।

গৃহীত খাদ্য ও বাতাসের অক্সিজেনের মধ্যে প্রধানত সমন্বয় সাধন করে প্রাণীদেহ শারীরবৃত্তীয় কাজের প্রয়োজনীয় জৈবশক্তি উৎপন্ন করে। খাদ্যবস্তুর সুপ্তশক্তি বা স্থিতিশক্তি এভাবে প্রাণীদেহের ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরিত শক্তির প্রধান অংশ তাপে পরিণত হয়। এক অর্থে এটি বিনষ্ট শক্তি, উষ্ণশোণিত প্রাণীতে দেহউষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে এটি সাহায্য করে। বাকী অংশ দেহের নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কার্য সম্পন্ন করে; (1) যান্ত্রিক কার্যঃ প্রাণীদেহের বিভিন্ন দেহাংশের চলাফেরা, হৃৎপিণ্ডের সংকোচনপ্রসারণ ইত্যাদি। (2) রাসায়নিক সংশ্লেষণঃ গ্লাইকোজেন, প্রোটিন প্রভৃতির সংশ্লেষণ; (3) তড়িদ্‌বিষয়ক কার্যঃ দেহের কোন অংশে তড়িদ্‌বিভব উৎপন্ন করা ইত্যাদি; (4) ক্ষরণঃ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ ইত্যাদি কার্য; (5) বিশোষণঃ খাদ্যবস্তুর বিশোষণ ইত্যাদি (6) তাপ ও উষ্ণতাঃ জৈবশক্তির যে অংশ তাপে রূপান্তরিত হয়, তা প্রধানত দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে ব্যয়িত হয়; (7) রক্তস্থিত অধিক অভিস্রবণ চাপের বিরুদ্ধে মূত্রউৎপাদন ইত্যাদি এবং (8) অন্যান্য জৈব কার্যঃ কলাকোষের প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণের সংগে জড়িত কার্যাবলী প্রভৃতি।

কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থ জৈবশক্তি উৎপাদনের প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরিপাক, পরিবর্তন ও পরিবহনের মাধ্যমে এসব খাদ্যবস্তু কলাকোষে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া ও পরিবর্তনের দ্বারা জারিত হয়ে জৈবশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। হ্যানস ক্রেবস (Hans Krebs) খাদ্যবস্তুর জারণ থেকে জৈব শক্তি উৎপাদনের তিনটি ধাপের বর্ণনা করেছেন। **প্রথম ধাপে,** খাদ্যের বৃহদাকার অণু ভেংগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত হয়। প্রোটিন আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হয়ে তার উপাদান 20টি অ্যামাইনোঅ্যাসিডে পরিণত হয়, পলিস্যাকারাইড আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হয়ে গ্লুকোজের মত সরল শর্করায় রূপান্তরিত হয় এবং ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই ধাপে ব্যবহার্য কোন শক্তি উৎপন্ন হয় না। **দ্বিতীয় ধাপে,** এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্য অণু আরো ভেংগে যায় এবং কিছু সংখ্যক এমন ক্ষুদ্র অণু উৎপন্ন করে যারা বিপাকক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতরণ করে। বস্তুত, আগের ধাপে উৎপন্ন প্রায় প্রতিটি পদার্থ **অ্যাসিটাইল কো-এতে** (acetyl CoA) রূপান্তরিত হয় (8-2 নং চিত্র)। **তৃতীয় ধাপে,** সাইট্রিক অ্যাসিডচক্র এবং

অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন (oxidative phosphorylation) বা জারণধর্মী ফসফরাস সংযুক্তি যা খাদ্য অণুর সর্বশেষ সাধারণ বিক্রিয়াপথ। অ্যাসিটাইল কো-এ অ্যাসিটাইল এককককে এই চক্রে নিয়ে আসে এবং সম্পূর্ণভাবে CO_2-এ জারিত করে। প্রতিটি অ্যাসিটাইল গ্রুপের জারণের সময় 4 জোড়া ইলেকট্রন NAD^+ ও FAD তে স্থানান্তরিত হয়। শেষোক্ত বিজারিত বাহক থেকে ইলেকট্রন যখন O_2-তে বাহিত হয় তখন ATP উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত প্রক্রিয়া অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন নামে পরিচিত। অধিকাংশ ATP ই এই তৃতীয় ধাপে উৎপন্ন হয়।
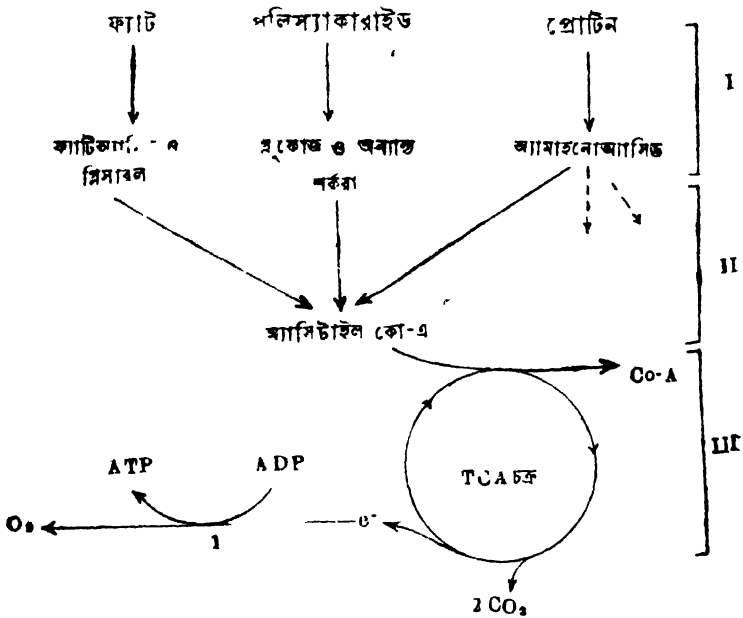
৮-2 নং চিত্র : খাদ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের ধাপ।
III-অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন।

দেখা গেছে, প্রতিগ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন প্রাণীদেহে জারিত হয়ে যথাক্রমে 4·1, 9 3 এবং 4·1 কিলোক্যালরি[1] জৈবশক্তি সরবরাহ করে

---

1. **কিলোক্যালরি ও গ্রামক্যালরি :** এক কিলোগ্রাম জলের এক ডিগ্রী উষ্ণতা বৃদ্ধিতে (14 5° থেকে 15·5° C) যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে কিলোক্যালরি (Kcal, Kgcal) বা বৃহৎ ক্যালরি (Cal) বলা হয়।

একইভাবে এক গ্রাম জলের এক ডিগ্রি উষ্ণতা বৃদ্ধিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে গ্রামক্যালরি বা ক্ষুদ্র ক্যালরি (cal) বলা হয়।

(1 নং তালিকা)। খাদ্যবস্তুর এই ক্যালরিগত মূল্যমান সরাসরি **বম্ ক্যালরি-মিটার** যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায় অথবা পরোক্ষ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র জারণক্রিয়ায় ব্যবহৃত অক্সিজেনের পরিমাপ করে নির্ণয় করা যায়।

1 নং তালিকা : খাদ্যবস্তুর ক্যালরিগত মূল্যমান।

	কিলোক্যালরি/গ্রাম	
	বম্ ক্যালরিমিটার	প্রাণীদেহে
কার্বোহাইড্রেট	4·1	4·1
স্নেহদ্রব্য	9·1	9·3
প্রোটিন	4·5	4·1

বিপাকলব্ধ শক্তি প্রাণীদেহে প্রধানত উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেটবন্ড (~P) হিসাবে প্রধানত অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) ও ক্রিয়েটিন ফসফেট (CP) নামক দুটো জৈব পদার্থে অবস্থান করে।

মৌলবিপাক

BASAL METABOLISM

প্রাণীদেহে সম্ভাব্য ন্যূনতম বিপাকক্রিয়াকে **মৌলবিপাক** বলা হয়। মৌলবিপাক জীবনধারণের ন্যূনতম শক্তি অর্থাৎ শুধুমাত্র হৃৎপিন্ড ও শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনীয় পেশীসঞ্চালন, দৈহিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। স্বাচ্ছন্দ্য চাপ, উষ্ণতা ও আর্দ্রতার মধ্যে পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক স্থিতাবস্থায় কোন ব্যক্তির যতটুকু শক্তির প্রয়োজন হয় ততটুকুই তার মৌলবিপাকের পরিমাণ। পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক স্থিতাবস্থা বলতে শায়িত অথচ জাগ্রত অবস্থায় অন্ততপক্ষে আধ ঘন্টা ধরে কোন ব্যক্তির দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিশ্রামকে বুঝায়।

1. **মৌলবিপাকীয় হার বা বি. এম. আর** (Basal metabolic rate or B. M. R.) : মৌলবিপাকের হারকে বি. এম. আর. বা মৌলবিপাকীয় হার বলা হয়। অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় প্রতি বর্গমিটার দেহতলের যে ন্যূনতম শক্তি ব্যয়িত হয় তাকে বি. এম. আর. বলা হয়। বি. এম. আর. দেহতলের ক্ষেত্র-ফলের সংগে সমানুপাতিক। 25 থেকে 50 বৎসর বয়স্ক লোকের গড় বি. এম. আর প্রতি ঘন্টায় প্রতি বর্গমিটার দেহতলে 40 থেকে 37 কিলোক্যালরি। বয়স্ক

স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ আরও একটু কম (36 থেকে 34 কিলোক্যালরি)। মৌলবিপাকীয় হার লক্ষ্য করে কোন ব্যক্তিবিশেষের (1) পর্যাপ্ত ক্যালরিযুক্ত খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করা যেমন সহজতর হয়, তেমনি তার (2) রোগনির্ণয় (থাইরোয়েডের অতি বা লঘুক্রিয়া ইত্যাদি) তথা (3) ওষুধ ও বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা সহজসাধ্য হয়।

2. **মৌলবিপাকীয় হারের নির্ণয়** (Methods of determination of B.M.R.) ঃ দুটো পদ্ধতিতে মৌলবিপাকীয় হার নির্ণয় করা যায়। এই দুটো পদ্ধতির নাম ঃ (a) **প্রত্যক্ষ ক্যালরিমিতি** এবং (b) **পরোক্ষ ক্যালরিমিতি**। বি. এম. আর. নির্ণয়ের পূর্বে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, তার মধ্যে প্রধান ঃ (i) রোগী বা ব্যক্তিবিশেষের খাদ্যব্যবস্থা ঃ পরীক্ষার 12 ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত রোগী বা ব্যক্তিকে মুখে কোন খাদ্যগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না, (ii) পরীক্ষার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে থেকে তার পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হয়, (iii) পরীক্ষা চলাকালে তাকে শায়িত অথচ (iv) জাগ্রত অবস্থায় রাখতে হয়, (v) কক্ষ উষ্ণতা 20°-25° সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতে হয়।

(a) **প্রত্যক্ষ ক্যালরিমিতি ঃ** এই পদ্ধতিতে রোগী বা ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নির্মিত একটি তাপ-প্রতিরোধক কক্ষ বা ক্যালরিমিটারে[2] প্রবেশ করানো হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে তার দেহ থেকে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধতি নির্ভুল হলেও অধিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন-সাপেক্ষ বলে এর ব্যবহার সীমিত।

(b) **পরোক্ষ ক্যালরিমিতি ঃ** পরোক্ষ পদ্ধতিতে দুপ্রকার যন্ত্রের ব্যবহার করা হয় ঃ (a) বদ্ধবেষ্টন (closed circuit) ও (b) মুক্তবেষ্টন (open-circuit) যন্ত্র। বদ্ধবেষ্টন পদ্ধতিতে রোগী বা ব্যক্তিকে আবদ্ধ বায়ুতে শ্বাসপ্রশ্বাস চালনা করতে দেওয়া হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া থেকে উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইডকে সোডালাইমের সাহায্যে শোষণ করে ওজন করা হয়। আবদ্ধ বায়ুর গৃহীত অক্সিজেনকে পুনরায় পরিমাপ করে পূরণ করাহয়। মুক্তবেষ্টন পদ্ধতিতে রোগী বা ব্যক্তিকে কক্ষবায়ুতে শ্বাসগ্রহণ এবং কোন এক বিশেষ পাত্রে শ্বাসত্যাগ করতে দেওয়াহয়। এরপর সম্পূর্ণ নিঃশ্বাস বায়ুর পরিমাণ নির্ণয় করে নমুনাবিশ্লেষণের মাধ্যমে তার অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইডের শতকরা হার নির্ণয় করা হয়।

2. অ্যাটওয়াটার-বেনেডিকট শ্বসন ক্যালরিমিটার (Atwater Benedict respiration calorimeter)।

বেনেডিক্ট-রথযন্ত্র (Benedict-Roth-apparatus) : এই যন্ত্রের সাহায্যে বদ্ধবেষ্টন-পদ্ধতিতে রোগীর বি. এম. আর. নির্ণয় করা হয়। যন্ত্রটি জলে নিলম্বিত একটি অক্সিজেনপূর্ণ পাত্র নিয়ে গঠিত (8-3 নং চিত্র)। অক্সিজেন-পূর্ণ পাত্রটির শীর্ষদেশ একটি দড়ির সাহায্যে একটি পুলির ওপর দিয়ে লিপি-লিভারের (Writing-lever) সংগে যুক্ত থাকে, যা ঘূর্ণায়মান ড্রামে পাত্রটির অক্সিজেনের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে। অক্সিজেনপূর্ণ পাত্রটির সংগে যথোপযুক্ত রাবার নলের সংযুক্তি ঘটিয়ে মুখখন্ডকের (mouth piece) মাধ্যমে রোগীকে শ্বাসগ্রহণ করতে দেওয়া হয়। ক্লিপের সাহায্যে তার নাসারন্ধ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। রোগীর নিঃশ্বাসবায়ু সোডালাইমপূর্ণ পাত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, ফলে নিঃশ্বাসবায়ুর কার্বনডাইঅক্সাইড বিশোষিত হয় এবং অবশিষ্ট বায়ু একটি কপাটিকার মাধ্যমে অক্সিজেনপূর্ণ পাত্রে প্রবেশ করে। রোগী একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে তা সরাসরি ঘূর্ণায়মান ড্রামে লিপিবদ্ধ হয়। এভাবে শুধুমাত্র অক্সিজেনের পরিমাপ করে এবং আর. কিউ 0.8 ধরে নিয়ে (যেহেতু রোগী 12 ঘণ্টা অনশন করে এবং যেহেতু কার্বনডাইঅক্সাডের পরিমাণ নির্ণয়ের কোন ব্যবস্থা থাকে না), নির্দিষ্ট অক্সিজেনে তাপসম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। আর. কিউ. 0·8 হলে প্রতি লিটার অক্সিজেনের তাপসম 4·875 কিলো-
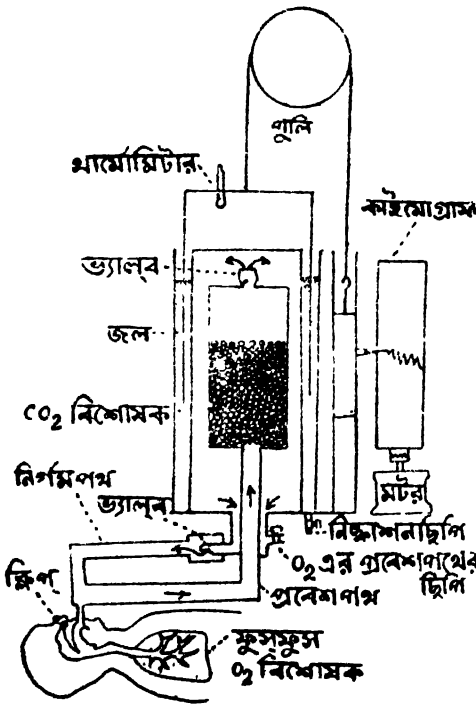
8-3 নং চিত্র : বেনেডিক্ট-রথ যন্ত্র।

ক্যালরির সমান হয় (2নং তালিকা)। এই সংখ্যাকে রোগী কর্তৃক গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণ (লিটারে) দ্বারা গুণ করলে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে

অক্সিজেনের মোট শক্তির পরিমাণ পাওয়া যায়। প্রতি ঘণ্টায় প্রতি বর্গমিটার দেহতলে এই শক্তি রূপান্তরিত হলে বি. এম. আর. পাওয়া যায়।

উদাহরণ ঃ পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক স্থিতাবস্থায় একজন পুরুষ 6 মিনিট ধরে যে অক্সিজেন গ্রহণ করে, একটি বেনেডিক্ট-রথ যন্ত্রের সাহায্যে তার পরিমাণ নির্ণীত হয়েছে 1·5 লিটার। 30 বৎসর বয়স্ক এই পুরুষের দৈহিক ওজন 70 কেজি এবং দৈর্ঘ্য 155 সেন্টিমিটার হলে তার বি. এম. আর কত হবে? (আর. কিউ. 0·8)।

2 নং তালিকা ঃ প্রতিলিটার O_2 থেকে উৎপন্ন শক্তি ও R. Q. এর সম্পর্ক

আর. কিউ.	উৎপন্ন শক্তি (কিলোক্যালরি)
0·71	4·795
0·75	4·829
0·80	4·875
0·85	4·921
0·90	4·967
0·95	5·012
1·00	5·058

উত্তর ঃ গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণ 1·5 লিটার।

অক্সিজেন গ্রহণের মোট সময় = 6 মিনিট

পুরুষটির দেহতলের ক্ষেত্রফল = 1·69 বর্গমিটার

(ডু-বোয়েজের নরমোগ্রাম থেকে)

1 লিটার অক্সিজেন = 4·875 কিলোক্যালরি

∴ 1·5 লিটার অক্সিজেন = $4·875 \times 1·5 = 7·3125$ কিলোক্যালরি

পুরুষটি 6 মিনিটে যে অক্সিজেন গ্রহণ করেছে তার ক্যালরিমূল্য 7·3125 কিলোক্যালরি।

সুতরাং 60 মিনিট বা 1 ঘণ্টায় সে $\frac{7·3125}{6} \times 60$ বা 73·125 কিলোক্যালরি শক্তি ব্যয় করে।

অতএব, তার বি. এম. আর = $\frac{73·125}{1·62} = 38·58$ কিলোক্যালরি।

ডগ্‌লাস ব্যাগ্‌ (Douglas bag) **:** ডগ্‌লোস ব্যাগ পদ্ধতি একটি মুক্তবেষ্টন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষাধীন ব্যক্তি মুক্তবায়ুতে শ্বাসগ্রহণ এবং ডগ্‌লাস ব্যাগে শ্বাসত্যাগ করে (৪-4নং চিত্র)। পরীক্ষাধীন ব্যক্তির নাসারন্ধ্র ক্লিপদ্বারা আবদ্ধ থাকে। মুখখণ্ডকের সাহায্যে সে কক্ষবায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ এবং নিঃশ্বাসবায়ুর কার্বনডাইঅক্সাইড ডগ্‌লাস ব্যাগে ত্যাগ করে। ডগ্‌লাস ব্যাগের ধারণ ক্ষমতা 100 বা 200 লিটার হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গৃহীত নিঃশ্বাসবায়ুকে এরপর গ্যাসোমিটারের সাহায্যে নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা হয়। এই গ্যাসের একটি নমুনা গ্রহণ করে **হ্যালডেন** (Haldane) যন্ত্রের সাহায্যে তার অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এরপর আর. কিউ. নির্ণয় করে সাধারণ গণনার মাধ্যমে বি. এম. আর. নির্ণয় করা হয়।

৪-4 নং চিত্র **:** ডগলাস ব্যাগ পদ্ধতি।

3. **মৌলবিপাকীয় হারের পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণসমূহ** (Factors affecting B.M.R.) **:** যে সব কারণসমূহ মৌলবিপাকীয় হারের পরিবর্তনের জন্য দায়ী তাদের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া হল।

(a) **বয়স :** বয়স্ক লোকের চেয়ে শিশুদের বি. এম. আর. অধিক হয়। বয়সবৃদ্ধির সংগে ইহা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। ওজনের তুলনায় দেহতলের ক্ষেত্রফল শিশুদের ক্ষেত্রে অধিক বলে তাদের বি. এম. আর.ও বেশী। অবশ্য নবজাতক বা অকালজাত শিশুর বি. এম. আর. অনেক কম হয়।

(b) **লিঙ্গভেদ :** পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের বি. এম. আর. কিছুটা কম।

(c) **আবহাওয়া :** ক্র্যামার ও লাস্‌কের (Cramer and Lusk) মতে আবহাওয়া বি. এম. আর.-এর ওপর কোন প্রভাববিস্তার করতে পারে না।

অন্যান্যদের মতে উষ্ণমণ্ডলীয় আবহাওয়ার চেয়ে অধিকতর শীতপ্রধান অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বি. এম. আর. বেশী হয়।

(d) **জাতিগত বৈষম্য:** বিভিন্ন জাতির মানুষের বি. এম. আর. তুলনা করে তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। এস্কিমোদের বি. এম. আর. তুলনামূলকভাবে বেশী (স্বাভাবিকের চেয়ে 33 শতাংশ বেশী), পাশ্চাত্য লোকের চেয়ে চীনাদের বি. এম. আর. কিছুটা কম।

(e) **পুষ্টি:** দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টিতে বি. এম. আর. হ্রাস পায়।

(f) **দেহতলের ক্ষেত্রফল:** দেহতলের ক্ষেত্রফলের সংগে বি. এম. আর. সমানুপাতিক। দেহতলের ক্ষেত্রফল অধিক হলে তাপক্ষয় হয়, ফলে বি. এম. আর. বেশী হয়।

(g) **অভ্যাস:** যারা কায়িক শ্রম করে বা নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করে, তাদের বি. এম. আর. অন্যদের তুলনায় কিছুটা বেশী হয়।

(h) **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি:** সম্মুখস্থ পিটুইটারী, থাইরোয়েড, অ্যাডরেন্যাল প্রভৃতি হরমোন বি. এম. আর. বৃদ্ধি করে।

(i) **দৈহিক উষ্ণতা:** প্রতি ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বি. এম. আর. প্রায় 12 শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

(j) **গর্ভাবস্থা:** গর্ভাবস্থার মাস ছয়েক পর থেকে বি. এম. আর. বৃদ্ধি পেতে থাকে। গর্ভস্থ ভ্রূণের বিপাক ও মায়ের বিপাক এই দুয়ের সমন্বয়ই এই বৃদ্ধির কারণ।

(k) **পারদচাপ:** বায়ুচাপ অর্ধেক বা তারও বেশী হ্রাস পেলে (পর্বতারোহণ ইত্যাদিতে) বি. এম. আর. বৃদ্ধি পায়।

(l) **অন্যান্য কারণ:** নানাপ্রকার ওষুধ (বেনজেড্রিন-benzedrin ক্যাফেইন, caffeine ইত্যাদি) যেমন, বি. এম. আর. বৃদ্ধি করে, তেমনি চেতনানাশক পদার্থ বি. এম. আর. হ্রাস করে।

শ্বসন অনুপাত বা আর. কিউ.

Respiratory Quotient

জারণক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড ও ব্যবহৃত অক্সিজেনের অনুপাত বা ভাগফলকে আর. কিউ. বলা হয়। অর্থাৎ $\frac{CO_2}{O_2}$ = আর. কিউ.। কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেন একই হারে বৃদ্ধি পেলে আর. কিউ.-এর কোন পরিবর্তন হয় না, তবে শুধুমাত্র কার্বনডাইঅক্সাইড অথবা অক্সিজেনের হ্রাস

বৃদ্ধিতে আর. কিউ.-এর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। মিশ্র খাদ্যগ্রহণ করলে সুস্থদেহে আর. কিউ.-এর মান সাধারণত 0·85 হয়।

1. **কার্বোহাইড্রেট** (Carbohydrate) ঃ একটি গ্লুকোজের অণু সম্পূর্ণভাবে জারিত হলে 6 অণু অক্সিজেন ব্যবহৃত হয় এবং 6 অণু কার্বন-ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়, অর্থাৎ $C_6H_{12}O_6+6O_2 \rightarrow 6CO_2+6H_2O$

অতএব, কার্বোহাইড্রেটের আর. কিউ. $\frac{CO_2}{O_2}=\frac{6}{6}=1$

2. **স্নেহদ্রব্য** (Fat) ঃ স্নেহদ্রব্যের আর. কিউ. কিছুটা কম হয়, কারণ স্নেহদ্রব্যের জারণে বাহির থেকে অধিক অক্সিজেনের সরবরাহ প্রয়োজন হয়। একটি ট্রাইস্টেয়ারিনের (tristearin) জারণ থেকে স্নেহদ্রব্যের আর. কিউ. নির্ণয় করা যায়। যথা ঃ

$$2C_{57}H_{110}O_6+163O_2 \rightarrow 114CO_2+110HO$$
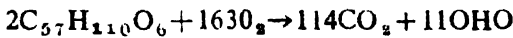
সুতরাং স্নেহদ্রব্য আর. কিউ $\frac{CO_2}{O_2}=\frac{114}{163}=0{\cdot}70$

3. **প্রোটিন** (Protein) ঃ প্রোটিনের জারণক্রিয়া সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়, কারণ তাদের গঠন জানা নেই। পরোক্ষ পদ্ধতিতে প্রোটিনের আর কিউ. 0·8 নির্ণীত হয়েছে।

4. **মিশ্রখাদ্য** (Mixed food) ঃ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহদ্রব্যের মিশ্রখাদ্যের আর. কিউ. স্বাভাবিকভাবে 0·85। খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে আর. কিউ. বৃদ্ধি পায় এবং 1-এর কাছাকাছি আসে। মধুমেহ প্রভৃতি রোগে কার্বোহাইড্রেটের ব্যবহার সীমিত হয়ে পড়লে ইহা হ্রাস পায়।

পেশীসঞ্চালনে আর. কিউ. অপরিবর্তিত থাকে, তবে ভারী পেশীসঞ্চালনে কিছুটা বৃদ্ধি পায়, কারণ পেশীসঞ্চালনে অধিক ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড উৎপন্ন হওয়ায় অ্যাসিডোসিস (acidosis) অবস্থার সৃষ্টি হয়। অ্যাসিডোসিসে শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং অধিক কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গত হয়। অ্যালক্যালোসিসে (alkalosis) এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। দেহে কার্বোহাইড্রেট থেকে স্নেহপদার্থের সংশ্লেষণ হলে আর. কিউ. বৃদ্ধি পায়। দৈহিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে আর. কিউ. বৃদ্ধি পেতে পারে।

ডগলাস ব্যাগ টিসোট স্পাইরোমিটারের (Tissot spirometer) সাহায্যে **অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইডের** পরিমাপ করে কোন ব্যক্তিবিশেষের আর,

কিউ. নির্ণয় করা হয়। আর. কিউ. (i) বি. এন. আর. নির্ণয়ে সহায়তা করে, (ii) দেহে কী জাতীয় খাদ্য জারিত হচ্ছে বা সংশ্লেষিত হচ্ছে তার নির্দেশ দেয়, (iii) খাদ্যতালিকায় খাদ্যবস্তুর অনুপাত নির্ণয়ে সহায়তা করে এবং (iv) নানাপ্রকার রোগনির্ণয়েও সহায়তা করে (যেমন, অ্যাসিডোসিস বা অ্যাল্-ক্যালোসিস ইত্যাদি)।

খাদ্যবস্তুর আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়া
Specific Dynamic Action of Food or SDA

অনেককে বলতে শোনা যায় মাংস খেলে শরীর গরম হয়ে ওঠে! কথাটা সত্যি। শুধু মাংস (প্রোটিন) নয়, কার্বোহাইড্রেট বা স্নেহজাতীয় খাদ্যগ্রহণের পরও দেহের বিপাকক্রিয়ার বৃদ্ধি ঘটে এবং তাপ-উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। প্রোটিনের ক্ষেত্রে ইহা সর্বাধিক। খাদ্যগ্রহণের ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এই তাপ-উৎপাদন শুরু হয় এবং তৃতীয় ঘণ্টায় এর পরিমাণ সর্বাধিক হয়, যা বেশ কয়েক ঘণ্টা বজায় থাকে। খাদ্যগ্রহণের পর খাদ্যের এজাতীয় উদ্দীপকধর্মী ক্রিয়ার ফলে মৌলবিপাকের উর্ধ্বে যে তাপ দেহে উৎপন্ন হয়, তাকে খাদ্যবস্তুর **আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়া** (SDA) বলা হয়। প্রোটিনের আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়া মৌল-বিপাকের প্রায় 30 শতাংশ। কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহজাতীয় আহার্যের ক্ষেত্রে ইহা যথাক্রমে 6 শতাংশ ও 4 শতাংশ। মিশ্র আহার্যের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ 10 শতাংশ।

আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়া দেহের কোন কাজে আসে না। একে বর্জ্য তাপ (waste heat) বলা চলে। অবশ্য ঠান্ডা আবহাওয়ায় প্রোটিনের আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়া দৈহিক উষ্ণতা ব্যয় রাখতে অংশগ্রহণ করে। 13°C দৈহিক উষ্ণতার উর্ধ্বে ইহা স্পষ্টতর হয়, তার নীচে ইহা অস্পষ্ট। অপুষ্টি ও অনশনরত অবস্থায় খাদ্যগ্রহণের পর আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়া সমধিক বৃদ্ধি পায়।

প্রোটিনের আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়া যকৃতে সংঘটিত হয়। কারণ যকৃতের অপসারণে ইহা ব্যাহত হয়। খাদ্যবস্তুর আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়ার কারণ সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয়, প্রোটিনের আপেক্ষিক উদ্দীপন-ক্রিয়া অ্যামাইনোঅ্যাসিডের ডিঅ্যামাইনেশন-পদ্ধতি ও ইউরিয়া উৎপাদনের সংগে জড়িত। কার্বোহাইড্রেটের আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়া গ্লুকোজের গ্লাইকোজেন রূপান্তরের সংগে জড়িত। স্নেহদ্রব্যের আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়া কলারসে স্নেহদ্রব্যের আধিক্য ও তাদের দ্রুত জৈব জারণের সংগে জড়িত (লাস্কের 'আধিক্য মতবাদ')।

মানুষের ক্যালরিশক্তির চাহিদা
The Calorie Requirement of Man

মানুষের ক্যালরিচাহিদা তার দেহ সক্রিয়তার সংগে জড়িত। মানুষের দেহ যাতে তার নিজের কলাকোষকে ক্যালরিশক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য পুষ্টির শারীরবৃত্তীয় মূলনীতি এমন হওয়া দরকার যাতে কোন লোকের 24 ঘন্টার জন্য গৃহীত খাদ্যবস্তু থেকে প্রাপ্ত ক্যালরিশক্তি এই সময়ের মধ্যে ব্যয়িত শক্তির সমান হয়। খাদ্যশক্তি দেহের তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করে। যথা :

(1) মৌলবিপাকের প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে, অর্থাৎ হৃৎপিন্ড, শ্বাসকার্য, দেহউষ্ণতা, পেশীটান প্রভৃতির জন্য অপরিহার্য শক্তির যোগান দেয়। কোন লোকের মৌলবিপাকীয় হার ও দেহতলের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে প্রতিঘন্টায় প্রতি বর্গমিটার দেহতলে 40 কিলোক্যালরি এবং 1·8 বর্গমিটার হলে, তার মৌলবিপাকের ক্যালরিচাহিদা প্রতি ঘন্টায় $40 \times 1·8$ বা 72 কিলোক্যালরি, অথবা প্রতিদিনে 72×24 বা 1728 কিলোক্যালরি হয়। এর সংগে **আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়ার 10 শতাংশ** বরাদ্দ যুক্ত হলে লোকটির জীবনধারণের ক্যালরিচাহিদা প্রতিদিনে দাঁড়ায় $1728 + 172$ বা 1900 কিলোক্যালরি।

3 নং তালিকা : বিভিন্ন কাজে মৌলবিপাকের অতিরিক্ত ক্যালরির চাহিদা[2]।

কাজের নমুনা	ক্যালরিচাহিদা (কিলোক্যালরি/কেজি/ঘন্টা)
ওঠা, বসা ইত্যাদি	1·7
ক্ষৌরকর্ম, স্নান, কাপড়-চোপড় পরা ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজ	3·0
ক্রিকেট ইত্যাদি খেলাধুলা	4·0
হাঁটা (ঘন্টায় 3 মাইল)	4·0
বসে বসে কাজ করা	1·7
হালকা ধরনের কাজ	2·5
অধিক শ্রমসাধ্য কাজ	5·0

1. **দেহতলের ক্ষেত্রফল :** দেহতলের ওজন (W) ও উচ্চতা (H) জানা থাকলে ডুবোয়েজের নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে বর্গমিটারে দেহতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায় :

$$S = W^{0·425} \times H^{0·725} \times 0.007184$$

2. আই. সি. এম. আর., 35 নং বিশেষ বিবরণী, 1960 থেকে গৃহীত।

(2) প্রতিদিনকার অতি সাধারণ কাজের জন্য অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করে, অর্থাৎ ওঠা, বসা, ক্ষৌরকর্ম, স্নান, কাপড়চোপড় পরা ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজের জন্য অতিরিক্ত ক্যালরিশক্তি যোগান দেয়। 3 নং তালিকায় বিভিন্ন কাজে মৌলবিপাকের অতিরিক্ত যে ক্যালরিশক্তির প্রয়োজন হয় তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(3) প্রতিদিনকার এই সাধারণ কাজ ছাড়া পেশীগত কাজ এবং শ্রমসাধ্য কাজে ব্যয়িত শক্তি সরবরাহ করে। ক্যালরিচাহিদা শ্রমসাধ্য কাজের সংগে সমানুপাতিক। ভারী পেশীসঞ্চালন বা অধিক শ্রমসাধ্য কাজে প্রতিঘণ্টায় প্রতি কিলোগ্রাম দেহওজনে প্রায় 5 কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়। হালকা ধরনের কাজ বা পেশীসঞ্চালনে একইভাবে 2·5 কিলোক্যালরির প্রয়োজন হয়।

অতএব একজন মানুষের একদিনের মোট ক্যালরিচাহিদা এই তিনভাবে ব্যয়িত ক্যালরিচাহিদার সমষ্টির সমান। স্ত্রীলোকের ক্যালরিচাহিদা পুরুষের চেয়ে খানিকটা কম হয়, কারণ তাদের বি. এম. আর. পুরুষের চেয়ে কম এবং পেশীসঞ্চালনে তারা তুলনামূলকভাবে শক্তি ব্যয় করে। তবে গর্ভাবস্থার দ্বিতীয়ার্ধে এবং স্তন্যদানকালে তাদের ক্যালরিচাহিদা স্বাভাবিকের চেয়ে যথাক্রমে 20 শতাংশ এবং 30 শতাংশ বেশী হয়। বালকবালিকা ও শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের দৈহিক-ওজনের তুলনায় ক্যালরিচাহিদা বেশী হয়। এর প্রধান কারণ : (a) তাদের বি. এম. আর. বয়স্কদের চেয়ে উল্লেখযোগ্য বেশী হয়, (b) তারা বয়স্কদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তি পেশীসঞ্চালনে ব্যয় করে এবং (c) তাদের খাদ্যের একাংশ দেহগঠনে ব্যবহৃত হয়।

ক্যালরিচাহিদার হিসাব
Calculation of Calorie Needs

ক্যালরিচাহিদার হিসাবের জন্য প্রাথমিক যে সব তথ্য প্রয়োজন, তাদের মধ্যে প্রধান : (i) দেহের ওজন, (ii) দেহতলের ক্ষেত্রফল, (iii) গড় বি. এম. আর. এবং (vi) পেশীগত ও শ্রমসাধ্য কাজের প্রকৃতি। যদি কোন একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈহিক ওজন 60 কেজি, দেহতলের ক্ষেত্রফল 1·8 বর্গমিটার, গড় মৌলবিপাকীয় হার ঘণ্টায় প্রতি বর্গমিটারে 40 কিলোক্যালরি, পেশা বসে বসে লেখাপড়ার বা হিসাব রাখার কাজ হয় এবং প্রতিদিন যদি সে একঘণ্টা

করে ঘণ্টায় 3 মাইল ভ্রমণ করে, তবে তার কালরিচাহিদা নিম্নলিখিত উপায়ে হিসাব করা যাবে (4 নং তালিকা)।

4নং তালিকা : ক্যালরি চাহিদার হিসাব (একদিনের)।

বয়স	30 বৎসর
ওজন	60 কেজি
দেহতলের ক্ষেত্রফল	1·8 বর্গমিটার
মৌলবিপাকীয় হার (গড়)	40 কি. ক্যা/বর্গমিটার/ঘণ্টায়
পেশাগত কাজ	বসে বসে লেখাপড়া বা হিসাব রাখা
শ্রমসাধ্য কাজ	প্রতিদিন ঘণ্টায় 3 মাইল ভ্রমণ

হিসাব :

A. **দৈনন্দিন কার্য :**

(a) ক্ষৌরকর্ম, স্নান, কাপোড়চোপড় পরা ইত্যাদি (1 ঘণ্টা)
ঘণ্টায় প্রতি কেজি. দৈহিক ওজনে 3 0 কি. ক্যা.
হিসাবে (3·0×60×1) 180 কিলোক্যালরি

(b) ওঠা ও বসা (6 ঘণ্টা)
ঘণ্টায় প্রতি কেজি দৈহিক ওজনে 1·7 কি. ক্যা.
হিসাবে (1 7×60×6) . =612 ,,

(c) শ্রমসাধ্য কার্য (1 ঘণ্টা)
ঘণ্টায় প্রতি কেজি দৈহিক ওজনে 4 0 কি. ক্যা.
হিসাবে (40×60×1) ... =240 ,,

B. **পেশাগত কার্য :** (8 ঘণ্টা)
ঘণ্টায় প্রতি কেজি দৈহিক ওজনে 1 7 কি. ক্যা.
হিসাবে (1 7×60×8) ... =816 ,,

C. **নিদ্রা** (মৌলবিপাকীয় হার, 8 ঘণ্টা)
(40×1·8×8) ... =576 ,,

মোট ক্যালরি A+B+C =2424

খাদ্যের উপাদান

COMPOSITION OF FOODS

কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন, খনিজপদার্থ ও জল আহার্য সামগ্রীর প্রধান উপাদান। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে এদের অনুপাত বিভিন্ন। উপাদানের উপরই খাদ্যের পুষ্টিমূল্য নির্ভর করে। অতএব খাদ্যবস্তুর উপাদানের মূল্যায়ন পুষ্টিবিজ্ঞানের অপরিহার্য অংগ।

দুগ্ধ
Milk

দুধ একটি চমকপ্রদ প্রকৃতিজাত পুষ্টিকর আহার্য। স্তন্যপায়ী প্রাণী দুধ দিয়েই জীবন শুরু করে। কিন্তু ইহা এমনই একটি অতুলনীয় পুষ্টিমানযুক্ত সম্পূর্ণ আহার্য, যা সব বয়সের লোকেরই গ্রহণযোগ্য, কারণ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের এমন সুন্দর সমাবেশ আর কোন খাদ্যে পাওয়া সম্ভবপর নয়। দুধে লোহা, তামা ও ভিটামিন সি ও ডি-এর কিছুটা অভাব দেখা যায়।

প্রসবের পরই দিন তিনেক ধরে মাতৃস্তনে যে দুগ্ধক্ষরণ করে তা ঘন ও হলদে বর্ণের হয়। এই দুগ্ধে প্রোটিন ও লবণের প্রাচুর্য্য যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি তার মধ্যে এক ধরনের বৃহৎ দানাদার কোষ দেখতে পাওয়া যায় যাদের কোলোসট্রাম কোষ (colostrum cell) বলা হয়। এই দুধকে **কোলোসট্রাম** বলা হয়। এক মাসের মধ্যে ইহা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক দুধে পরিণত হয়।

1. **উপাদান** (Composition) : দুধের বিভিন্ন উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখিত হল।

প্রোটিন : দুধে দুধরনের প্রোটিনের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, তাদের **প্রধান প্রোটিন ও অপ্রধানপ্রোটিন** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করা চলে। প্রধান-প্রোটিনের মধ্যে **ক্যাসিন** (casein), **আল্‌ফা-ল্যাকট্যালবুমিন** (α-lactalbumin) ও **বিটা-ল্যাক্‌টোগ্লোবিউলিন**, (β-lactoglobulin) উল্লেখযোগ্য। অপ্রধানপ্রোটিনের মধ্যে **ইমিউনোগ্লোবিন, লোহিত-প্রোটিন**, পেপ্‌টোন ও দুগ্ধস্থ **এন্‌জাইমসমূহ** প্রধান।

দুগ্ধস্থ এন্‌জাইম (পেরোক্সিডেজ, জ্যানথিন অক্সিডেজ, লাইপেজ, প্রোটিয়েজ ইত্যাদি) নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। মাতৃস্তনেই এদের থাকার কথা। অপ্রত্যাশিত ভাবে দুধে ক্ষরিত হয়।

ল্যাক্‌টোগ্লোবিউলিন ও ল্যাক্‌ট্যাল্‌বুমিনকে ঘোলের প্রোটিন (whey protein) বলা হয়। ঘোলে 50-60 শতাংশ ল্যাক্‌টোগ্লোবিউলিন থাকে।

(b) **কার্বোহাইড্রেট :** দুধে যে দ্বি-শর্করা রয়েছে তাকে **ল্যাক্‌টোজ** বলা হয়। দুধের মিষ্টি স্বাদের জন্য ল্যাক্‌টোজই দায়ী। ল্যাক্‌টোজের মিষ্টত্ব খাদ্য চিনির 1/5 অংশ। দুধে আল্‌ফা ও বিটা এই দু'প্রকার ল্যাক্‌টোজের সন্ধান পাওয়া যায়। মাতৃস্তন রক্তশর্করা থেকে ল্যাক্‌টোজের সংশ্লেষণ ঘটায়।

(c) **স্নেহদ্রব্য :** দুধের স্নেহদ্রব্যের মধ্যে প্রধান ট্রাইগ্লিসারাইড (98—99%), ফস্‌ফোলিপিড (0·2—1·0%) এবং স্টেরোল (0·25—0·40%)। কিছুটা ফ্যাটি অ্যাসিড (ওলেইক, প্যালমিটিক, মিরিস্‌টিক, স্টিয়ারিক ইত্যাদি) পাওয়া যায়। দুধের স্নেহপদার্থ গোলাকার স্নেহবুদ্‌বুদ্‌ হিসাবে অবস্থান করে (8-5 নং চিত্র)। এক একটি বুদ্‌বুদের আকৃতি 2·5 মিউ হয়। বুদ্‌বুদ্‌কে ঘিরে 0 02 মিউ পুরু ফস্‌ফোলিপিড-প্রোটিনের একটি ঝিল্লি দেখা যায়, যা জলে অবদ্রব সৃষ্টির জন্য দায়ী। দুগ্ধ সিরামে সামান্য পরিমাণে ফস্‌ফোলিপিড, স্টেরোল ও মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড দেখতে পাওয়া যায়। দুধের শুভ্রতার জন্য অংশত স্নেহদ্রব্যের অবদ্রব ও অংশত ক্যাল্‌সিয়াম ক্যাসিনেট দায়ী। দুধের স্নেহদ্রব্যের সংগে ভিটামিন এ, ডি, ই, কে এবং তামা, লোহা, এন্‌জাইম প্রভৃতি যুক্ত থাকে।
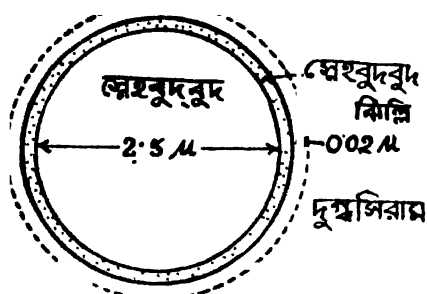
8-5 নং চিত্র : দুধের স্নেহবুদবুদ।

(d) **ভিটামিন :** দুধে প্রায় সবরকম ভিটামিনই রয়েছে। ভিটামিন এ এবং রাইবোফ্লেভিনের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশী। ভিটামিন সি, ডি, থায়ামিন, প্যান্‌টোথেনিক অ্যাসিড এবং নিয়াসিন কিছুটা কম পরিমাণে রয়েছে।

(e) **খনিজপদার্থ :** দুধে গড়পড়তা 0·7 শতাংশ দুগ্ধভস্ম (ash) রয়েছে। উহাকে সতর্কতার সংগে বিশ্লেষণ করলে যে সব খনিজ পদার্থের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে প্রধান ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম,

5 নং তালিকা ঃ মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধের তুলনা।

মাতৃদুগ্ধ			গোদুগ্ধ		
উপাদান		পরিমাণ	উপাদান		পরিমাণ
জল	...	88 গ্রাম	জল	...	87·7 গ্রাম
প্রোটিন	...	1·1 ,,	প্রোটিন	...	3·2 ,,
কার্বোহাইড্রেট	...	7·5 ,,	কার্বোহাইড্রেট	...	4 4 ,,
স্নেহদ্রব্য	...	3·4 ,,	স্নেহদ্রব্য	...	4·1 ,,
ক্যাল্‌সিয়াম	...	28 মিগ্রা.	ক্যাল্‌সিয়াম	..	120 মিগ্রা
লোহা	...	0·1 ,,	লোহা	...	0·2 ,,
ভিটামিন-এ	...	137 আই ইউ.	ভিটামিন-এ	...	184 আই. ইউ.
ভিটামিন সি	...	3 মিগ্রা.	ভিটামিন সি	...	2 মিগ্রা.

6নং তালিকা ঃ মোষ ও ছাগ দুগ্ধের উপাদান।

মোষদুগ্ধ			ছাগদুগ্ধ		
উপাদান		পরিমাণ	উপাদান		পরিমাণ
জল	..	81 গ্রাম	জল	...	87 গ্রাম
প্রোটিন	...	4·8 ,,	প্রোটিন	.	3 3 ,,
কার্বোহাইড্রেট	...	5 2 ,,	কার্বোহাইড্রেট	...	4 6 ,,
স্নেহদ্রব্য	...	8·8 ,,	স্নেহদ্রব্য	...	4·5 ,.
ক্যাল্‌সিয়াম	..	210 মিগ্রা	ক্যালসিয়াম	...	170 মিগ্রা.
লোহা	...	0·2 ,.	লোহা	...	0·3 ,.
ভিটামিন এ	..	160 আই ইউ.	ভিটামিন এ	...	182 আই. ইউ.
ভিটামিন সি	...	1 মিগ্রা.	ভিটামিন সি	...	1 মিগ্রা.

ম্যাগ্‌নেসিয়াম এবং ক্লোরিন। দুধে তামা ও লোহার পরিমাণ যথেষ্ট কম থাকে।

2. **প্রাণীদুগ্ধ ও মাতৃদুগ্ধের তুলনা** (Comparison between animal and human milk) ঃ সাধারণভাবে পরিণত মাতৃদুগ্ধ ও অন্যান্য

প্রাণীদুগ্ধের উপাদান ও ধর্ম প্রায় একই রকম। তবে বিস্তৃতভাবে তুলনা করতে গেলে তাদের উপাদানের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গরু, মোষ ও ছাগদুগ্ধে প্রোটিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী (মাতৃদুগ্ধের দ্বিগুণেরও বেশী) দেখা যায়। এদের মধ্যে আবার মোষের দুধে প্রোটিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। প্রোটিন ক্যাসিনের আধিক্যের জন্যই এই পরিমাণগত তারতম্য ঘটে থাকে। অপরপক্ষে মাতৃদুগ্ধে অধিক পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট দেখা যায়। স্নেহ-পদার্থ মোষের দুধে সর্বাপেক্ষা বেশী, মাতৃদুগ্ধে সবচেয়ে কম। ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য খনিজ পদার্থও মাতৃদুগ্ধে সর্বাপেক্ষা কম পরিমাণে রয়েছে। ভিটামিন সি, ডি, নিকোটিনিক অ্যাসিড ছাড়া অন্যান্য ভিটামিন তুলনামূলকভাবে মাতৃদুগ্ধে কম থাকে। আহার্যে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দুগ্ধ-উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়। তেমনি খাদ্যে স্নেহপদার্থের বৃদ্ধি ঘটালে দুধের স্নেহদ্রব্য বৃদ্ধি করা যায়, তবে আহার্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে দুধের পরিমাণ ও পুষ্টিমান হ্রাস পায়।

3. **দুগ্ধজাত পদার্থ** (Milk products) : দুগ্ধ থেকে জাত বিভিন্ন পদার্থ এবং তাদের উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

(a) **শুকনো বা গুঁড়ো দুধ** (Dry milk) : স্প্রে-ড্রায়িং বা রোলার ড্রায়িং পদ্ধতির মাধ্যমে দুধকে নিরুদক করে গুঁড়ো দুধ উৎপন্ন করা হয়। গুঁড়ো দুধে প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের পুষ্টিমান বেশী থাকে। তবে এতে ভিটামিন এ এবং ডি-এর অভাব দেখা যায়। বেশীদিন এই দুধকে সঞ্চয় করে রাখা যায় না, জারিত হয়ে ইহা বিনষ্ট হয়।

(b) **ঘন দুধ** (Condensed milk) : জলকে অংশত বিতাড়িত করে ঘন দুধ উৎপন্ন করা হয়। টিনের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে এবং দুধকে নির্বীজিত করা হয় অথবা যাতে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে না পারে তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা (40%) মেশানো হয়। এই দুধের পুষ্টিমানও বেশী।

(c) **ননী বা সর** (Cream) : যান্ত্রিক উপায়ে অথবা শুধুমাত্র দুধের ওপরে ভাসতে দিয়ে ননী বা সরকে সংগ্রহ করা হয়। ননী বা সরে 40-50% স্নেহদ্রব্য থাকে। যান্ত্রিক উপায়ে দুধের সবটুকু স্নেহদ্রব্যকে এভাবে পৃথক করার নাম ননীতোলা (skimming)। ননী স্নেহদ্রবণীয় ভিটামিনের প্রধান উৎস, বিশেষভাবে ভিটামিন-এ-এর।

(d) **মাখন** (Butter) : ননী বা সরকে মন্থনদণ্ডের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করলে স্নেহকণাগুলো একত্রিত হয়ে যে কঠিন পদার্থ উৎপন্ন করে তাকে মাখন বলা হয়। ননীর মতই মাখনে স্নেহদ্রবণীয় ভিটামিনের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রীষ্মকালে দুগ্ধজাত মাখনে ভিটামিন এ এবং ডি এর পরিমাণ বেশী থাকে।

(e) **মাখনতোলা দুধ** (Butter milk) : মাখনতোলা দুধে প্রোটিন, ল্যাকটোজ ও অজৈব লবণের প্রাচুর্য থাকে।

(f) **পনির** (Cheese) : ভিনিগার (Vinegar) মিশিয়ে বা অন্য কোন ভাবে দুধের প্রোটিনকে জমাট বাঁধিয়ে পনির উৎপন্ন করা হয়। জমাট বাঁধা প্রোটিন থেকে পাওয়া কিছু পরিমাণ স্নেহদ্রব্যকে নিংড়ে নিয়ে ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাবে পূর্ণ[illegible]প্ত হতে দেওয়া হয়। পনিরের আস্বাদ নির্ভর করে ব্যাকটেরিয়া কী ধরনের হবে তার ওপর।

পনিরে প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য, ক্যাল্সিয়াম ইত্যাদি খনিজ পদার্থের প্রাচুর্য থাকায় তার পরিমাণ খুব বেশী।

(g) **দই** (Curd) : দুধে অ্যাসিড-সংযোগ করলে বা ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা দুগ্ধশর্করাকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তরলাভ করলে দুগ্ধ-প্রোটিন অদ্রবণীয় (লবণ-উৎপাদন) হয়ে পড়ে এবং দই উৎপাদন করে। গোদুগ্ধজাত দই-এ 32 শতাংশ প্রোটিন, 4% স্নেহদ্রব্য, 149 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে।

(h) **ঘোল** (Whey) : পেপ্সিন, রেনিন প্রভৃতি এন্জাইমের সংস্পর্শে দুগ্ধপ্রোটিন ক্যাল্সিয়াম ক্যাসিনেটে রূপান্তরিত হয়। এই অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম লবণকে পৃথক করে নিলে যে তরল পদার্থটি পড়ে থাকে তাকে ঘোল বলা হয়। ঘোলে ল্যাক্টোগ্লোবিউলিন ও ল্যাক্ট্যালবুমিন থাকে।

(i) **কৃত্রিম মাখন** (Margarine) : মাখনের মত এর রাসায়নিক উপাদান হলেও ইহা দুধ থেকে উৎপন্ন হয় না। অসম্পৃক্ত তৈলজাতীয় পদার্থকে হাইড্রোজেনযুক্ত করে এই কঠিন পদার্থটি উৎপাদন করা হয়। এভাবে উৎপন্ন মাখনে কোন ভিটামিন থাকে না। পরে অবশ্য [illegible] মধ্যে ভিটামিন এ এবং ডি মেশানো হয়।

4. গোদুগ্ধের মাতৃদুগ্ধান্তরিতকরণ (Humanization of cow's milk) : গোদুগ্ধকে অধিকতর শিশু উপযোগী করে তোলার জন্য তার

উপাদানের পরিবর্তন সাধন করে অনেকটা মাতৃদুগ্ধের মত করা হয়। গোদুগ্ধে যেহেতু দ্বিগুণের বেশী প্রোটিন থাকে, তাই তাতে প্রায় অর্ধেকেরও বেশী জল মিশিয়ে, সঠিক পরিমাণে ননী, ল্যাকটোজ ইত্যাদি মেশানো হয়। এভাবে উৎপন্ন দুগ্ধ তবু মাতৃদুগ্ধের চেয়ে কিছুটা আলাদা থেকে যায়, কারণ তরলীকরণে ক্যাসিন ও ল্যাকট্যালবুমিনের অনুপাত পরিবর্তিত হয় না।

ডিম

Egg

ডিমে প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজপদার্থ অধিক পরিমাণে রয়েছে। 100 গ্রাম ডিমে (খোলস ছাড়া দু'টো ডিম প্রায় 100 গ্রামের মত হয়) বিভিন্ন আহার্য উপাদানের যে পরিমাণ রয়েছে 7নং তালিকায় তা' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একটা ডিমে (মুরগী) 66·5 গ্রাম প্রোটিন, 6·65 গ্রাম স্নেহদ্রব্য, 30 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, 100 মিলিগ্রাম ফসফরাস, 1·1 গ্রাম লোহা, 1100 আই. ইউ. ভিটামিন এ রয়েছে।

মাংস

Meat

মাংস প্রধানত অস্থিপেশী নিয়েই গঠিত। মাংসে প্রোটিনের পরিমাণই সবচেয়ে বেশী থাকে। মোরগের মাংসে পরিপাকযোগ্য প্রোটিনের পরিমাণ 25·9 শতাংশ। মেষ ও গরুর মাংসে এই পরিমাণ যথাক্রমে 18·5 গ্রাম ও 22 6 গ্রাম শতাংশ! মেটে বা যকৃতে ভিটামিন এ, লোহা ও ফসফরাসের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় (7নং তালিকা)।

মাছ

Fish

মাছও প্রধানত প্রোটিনের সরবরাহ করে। তাজা মাছে (শুকনো নয়) গড়ে 15-23 গ্রাম শতাংশ পরিপাকযোগ্য প্রোটিন পাওয়া যায়। তাজা মাছের চেয়ে অস্থি সমেত শুকনো মাছে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী থাকে (প্রতি 100 গ্রামে 500—600 মিলিগ্রাম)।

শস্যজাতীয় খাদ্য, ফল, শাকসব্জী ইত্যাদি: চাল, আটা, গম প্রভৃতি শস্যজাতীয় খাদ্য, বিভিন্নপ্রকারের ফল, শাকসব্জী ইত্যাদি কিছুসংখ্যক আহার্যের উপাদান 7 নং তালিকায় উল্লিখিত হয়েছে।

7 নং তালিকা ঃ কিছুসংখ্যক সাধারণ ভারতীয় খাবারের উপাদান (প্রতি 100 গ্রাম গ্রহণযোগ্য খাদ্যের মধ্যে)।

আহার্য সামগ্রী	কার্বোহাইড্রেট (g)	শক্তি (KCal)	প্রোটিন (g)	স্নেহদ্রব্য (g)	ক্যালসিয়াম (mg)	ফসফরাস (mg)	লোহা (mg)	কারোটিন (μg)	থায়ামিন (mg)	রাইবোফ্লেভিন (mg)	নিয়াসিন (mg)	ভিটামিন C (mg)
মাছ ও মাংস জাতীয় খাদ্য												
ইলিশ মাছ	2 9	273	21 8	19 4	180	280	2 1	—	—	—	2 8	24
রুই	4 4	97	16 6	1 4	650	175	1 0	—	0 05	0·7	0 7	22
কৈ	4 4	156	14 8	8 8	410	390	1 4	—	—	—	2·8	32
মাগুর	4 2	86	15 0	1 0	210	290	0·7	—	—	—	0 5	11
চিংড়ি	0 0	90	20 5	0·9	16	279	—	—	—	—	—	—
ছাগলের মাংস	—	118	21 4	3 6	12	193	—	—	—	—	—	—
মোরগের মাংস	—	109	25 9	0 6	25	245	—	—	—	0 14	—	—
গরুর মাংস	—	114	22 ·	2 6	10	190	0 8	0 0	0 15	0·04	6 4	2
ডিম (মোরগ)	—	173	13 3	13 3	60	220	2 1	600	0 10	0 40	0 1	0
ডিম (হাঁস)	0 8	181	13·5	13 7	70	260	3 0	510	0 12	0·26	0·2	—
শস্য দানা												
চাল ঢেঁকিছাটা	76 7	346	7 5	1 3	10	190	3·2	2	0·21	0·16	3·9	0

চাল মিলে (ছাটা)	78·	345	6·8	0·5	10	160	3·1	0	0·06	0·06	1·9	0
গম (সম্পূর্ণ)	69 4	341	12·1	1·7	48	355	11·5	29	0·49	0·29	4 0	0
আটা	78 9	348	11·0	0·9	23	121	2 5	25	0·12	0·07	2 4	0
ভুট্টা	66·2	342	11·1	3 9	10	348	2·0	90	0 42	0·10	1·8	0
ডাল জাতীয় খাদ্য।												
ডাল (বেঙ্গল গ্রাম)	59 8	372	20·8	5 6	56	331	9·1	129	0·43	0·18	2·4	1
ডাল (গ্রিন গ্রাম)	59 9	348	24·5	1 2	75	405	8 5	49	0 72	0·15	2·4	0
মসুর ডাল	59 0	343	25 1	0 7	69	293	4 8	270	0·45	0·20	2·6	0
মটরশুঁটি শুকনো)	56 5	315	19 7	1 1	75	298	5·1	39	0 47	0·19	3·4	0
সয়াবিন	20 9	432	43·2	9 5	240	690	11·5	426	0·73	0·39	3·2	—
মূলজাতীয় খাদ্য												
আলু	22 6	97	1·6	1 0	10	40	0·7	24	0·1	0·01	1·2	17
মিষ্টি আলু	28·3	120	1·2	0·3	46	50	0 8	6	0·08	0·04	0·7	24
গাজর	10·6	48	0·9	0·2	80	530	2·2	1890	0·04	0·02	0·6	3
বীট	8 8	43	1·7	0 1	18	55	1·0	0	0·04	0·09	0·4	10
লাল মূলা	6·8	32	0·6	0·3	50	20	0·5	3	0 06	0·02	0·4	17
সাদা মূলা	3·4	17	0 7	0 1	35	22	0·4	3	0·06	0 02	0·5	15
পেঁয়াজ (বড়)	11 1	50	1 2	0·1	47	50	0·7	0	0·08	0·01	0·4	11

শাকসব্জী												
শাক (স্পিনাক)	2·9	26	2·0	0·7	73	21	10·9	5580	0·08	0·26	0·5	28
মুলো শাক	2·4	28	3·8	0·4	265	59	3·6	5295	0·18	0·46	0·8	81
লাল নটে	6·1	45	4·0	0·5	397	83	25·5	5520	0·03	0·30	1·2	99
ধনে শাক	6·3	44	3·3	0·6	184	71	18·5	6918	0·05	0·06	0·8	135
বাঁধা কপি	4·6	27	1·8	0·1	39	44	0·8	1200	0·06	0·09	0·4	124
ফুলকপি	4·0	30	2.6	0·4	33	57	1·5	30	0·04	0·10	1·0	56
বেগুন	4 0	24	1·4	0·3	18	47	0·9	74	0·04	0·11	0·9	12
লাউ	2·5	12	0·2	0·1	20	10	0·7	0	0·03	0·01	0·2	0
কুমড়া	4·8	25	1·4	0·1	10	30	0·7	50	0·06	0·04	0·5	2
শসা	·0	30	2·6	0·4	33	57	1·5	30	0 04	0·10	1·0	56
সীম	4·5	26	1·7	0·1	50	28	1·7	132	0·08	6·06	0 3	24
বরবটি	8·4	35	1·9	0·2	66	56	1·5	52	0·07	0·10	0·6	13
কাঁচা পেঁপে	5·7	27	0·7	0·2	28	40	0·9	0	0·01	0·01	0·1	12
টমাটো	3·6	20	0·9	0·2	48	20	0 4	351	0·12	0·06	0·4	27
বাদাম ও তৈল জাতীয় শস্য												
নারিকেল (শুকনো)	184	662	6·8	62·3	40	210	2·7	0	0·08	0·01	3·0	7

সরষে দানা	23·8	541	20·0	39·7	490	700	17·9	162	0·65	0·26	4·0	0
সূর্যমুখী দানা	17·9	620	19·8	52·1	280	670	5·0	0	0·86	0·20	4·5	1
চীনা বাদাম	26·1	567	25·3	40·1	90	350	2·8	37	0·90	0·13	19·9	0
ফল												
আপেল	13·4	59	0·2	0·5	10	14	1·0	0	—	—	0	1
কলা (পাকা)	27·2	116	1·2	0·3	17	36	0·9	78	0·05	0·08	0·5	7
জাম (কাল)	13·8	64	1·1	0·5	24	25	1·3	0	0·08	0·08	0·3	7
আঙুর	16·5	71	0·5	0·3	20	30	0·5	0	—	—	0	7
পেয়ারা	11·2	51	0·9	0·3	10	28	1·4	0	0·03	0·03	6.4	212
লেবু	11·1	57	1·0	0·9	70	10	2·3	0	0·02	0·01	0.1	39
আম (পাকা)	16·9	74	0.6	·04	14	16	1·3	2743	0·08	0·09	0·9	16
তরমুজ	3·3	16	0·2	0·2	11	12	7·9	0	0·02	0·04	0·1	1
কমলালেবু	10·9	48	0·7	0·2	26	20	0.3	1104	—	—	—	30
পেঁপে (পাকা)	7·2	32	0·6	0·1	17	13	0·5	666	0·04	0·25	0·2	57
আনারস	10·8	46	0·4	0·1	20	9	1·2	18	0·20	0·12	0·1	39

ভিটামিন
VITAMINS

1. **ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ :** ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ একপ্রকার শক্তিশালী জৈব পদার্থ, যা প্রাণীদেহের স্বাভাবিক ও সঠিক শারীরবৃত্তীয় কার্যের পক্ষে অপরিহার্য উপাদানবিশেষ। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে যেমন এরা অতি সামান্য পরিমাণে থাকে, তেমনি এদের বাহির থেকে প্রাণীদেহে সরবরাহ করতে হয়; কারণ প্রাণীদেহ সাধারণত তাদের সংশ্লেষণ করতে পারেন না। শুধুমাত্র ভিটামিন D, C, A এবং কিছু কিছু B ভিটামিন দেহের অভ্যন্তরে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। প্রতিদিন অতি সামান্য পরিমাণ ভিটামিনই প্রাণীদেহে প্রয়োজন হয়। দেখা গেছে দেহের বিপাকক্রিয়ার সংগে ভিটামিনের চাহিদা অনেকটা সমানুপাতিক। বাড়ন্ত শিশু, স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থা বা স্তন্যদানকাল বা ভারী পেশীসঞ্চালনজনিত কার্য প্রভৃতি অবস্থায় বিপাকক্রিয়া যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই ভিটামিনের চাহিদাও সমানুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

অধুনা অধিকাংশ ভিটামিনকেই কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করা সম্ভবপর।

1. **ভিটামিনের শ্রেনীবিন্যাস** (Classifications of Vitamins) : ভিটামিনকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : (A) স্নেহ দ্রবণীয় ভিটামিন (fat soluble vitamin) এবং (B) জলে দ্রবণীয় ভিটামিন (water soluble vitamins)।

স্নেহ-দ্রবণীয় ভিটামিন
Fat Soluble Vitamins

এ জাতীয় ভিটামিন জলে দ্রবণীয় নয়, শুধুমাত্র স্নেহদ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। এরা তাপসহ, তৈল জাতীয় পদার্থ। সাধারণত রন্ধনকার্যের সময় এরা বিনষ্ট হয় না। ভিটামিন A,D,K এবং E এই শ্রেণীতে পড়ে।

ভিটামিন A
Vitamin A

1, **রাসায়নিক গঠন** (Chemical structure) : A_1 এবং A_2 এই দু'ধরনের ভিটামিন A পাওয়া যায়। একটিমাত্র দ্বিবন্ধ (double bond) ছাড়া এদের গঠন ও কার্য একই রকম। বিটা-ক্যারোটিন (β-carotene) নামক পদার্থ থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লিতে এবং দুটো ভিটামিন সংশ্লেষিত হয়। এনজাইম ক্যারোটিনেজ (carotenase) এই সংশ্লেষণে সহায়তা করে। প্রতিটি বিটা-ক্যারোটিন থেকে দুটো ভিটামিন উৎপন্ন হয়। (8-6 নং চিত্র)

2. **উৎস :** (Source) : প্রাণী ও উদ্ভিদ এই উভয় উৎস থেকেই ভিটামিন A পাওয়া যায়। প্রাণীজ উৎস হ'ল : দুধ, মাখন, ডিম, মাছ, কড্‌ফিস

$-(CH=CH-C=CH)_2-CH=CH-(CH=C-CH=CH)_2-$

2 অণু ভিটামিন A_1

$H-C(=O)-(CH=C-CH=CH)_2-$
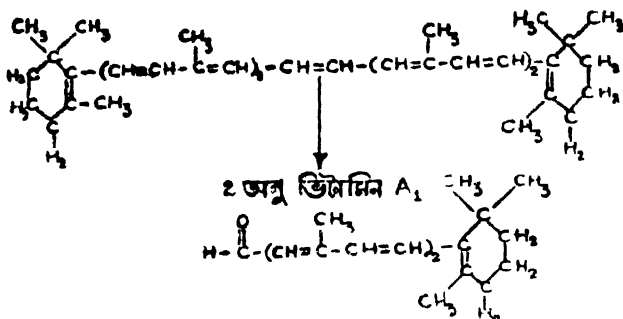
৪-6 নং চিত্র : বিটা-ক্যারোটিন

(সামুদ্রিক মাছ) ও হ্যালিব্যাটের (সামুদ্রিক মাছ) যকৃৎ ইত্যাদি। শাকসব্জীজাত উৎস হ'ল : গাজর, শাক, হলুদ ফল, আম, টমাটো ইত্যাদি।

3. **কার্যাবলী** (Functions) : ভিটামিন A দেহের যেসব কার্য সম্পাদন করে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো প্রধান : ইহা দেহবৃদ্ধিতে অংশ গ্রহণ করে। (2) রাত্রির আবছা অন্ধকারে রডোপ্‌সিন (rhodopsin) নামক রাসায়নিক পদার্থের সহযোগী হিসাবে দৃষ্টিশক্তিতে সহায়তা করে ; (3) জিহ্বা, গলবিল শ্বাসনালী, লালাগ্রন্থি প্রভৃতির আচ্ছাদনী কলার স্বাভাবিক সক্রিয়তা বজায় রাখে ; (4) সংক্রমণে বাধা দেয়, (5) স্নায়ুকোষের পুষ্টি ও কার্যক্ষমতা বজায় রাখে, (6) অস্থির স্বাভাবিক আকৃতি ও বৃদ্ধির কাজে অস্থিকোষের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং (7) কার্বোহাইড্রেটের সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

4. **অভাবজনিত লক্ষণ** (Deficiency signs) : ভিটামিন A-এর অভাবজনিতলক্ষণগুলি নিম্নে আলোচিত হল। (a) **দেহবৃদ্ধি :** ভিটামিন A-এর অভাবে দেহবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। (b) **চোখের রোগ :** ভিটামিন A-এর অভাবে মানুষ **রাতকানা** হয়। রাত্রি-অন্ধত্বের (nyctalopia) কারণ, ভিটামিনের অভাবে চোখের অক্ষিপটে অবস্থানকারী রড্‌গ্রাহককোষের (rod receptors) **রডোপ্‌সিন চক্র** (rhodopsin cycle) ব্যাহত হয় (৪-7 নং চিত্র)। রডোপ্‌সিন চক্রের ক্রিয়া ব্যাহত হলে দৃষ্টিশক্তিও ব্যাহত হয়। এছাড়া অক্ষিবলয় **রক্তবর্ণ ধারণ** করে, **শুষ্ক হয়** এবং **উজ্জ্বলতা হারিয়ে** ফেলে (xeronh-

thalmia)। কর্নিয়া বিনষ্ট হয় এবং চোখে হানি (keratomalacia) পড়ে (8-8 নং চিত্র)। চোখের অশ্রু গ্রন্থি (lacrimal gland) বিনষ্ট হয়।
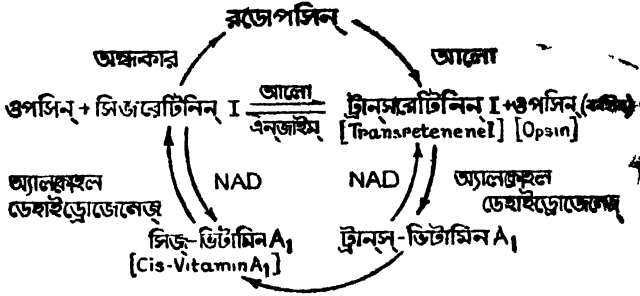
8-7 নং চিত্র : রডোপ্‌সিন চক্র।

(c) **আবরণীকলার পরিবর্তন :** মানুষের দেহচর্ম পুরু, শুষ্ক ও খসখসে হয়। সেবাসিয়াস গ্রন্থি ও স্বেদগ্রন্থি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং লোমকূপ কেরাটিন স্তূপের

8-8 নং চিত্র : ভিটামিন A এর অভাবে বানরের ডান চোখের কর্নিয়ার ক্ষতি।

দ্বারা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে ত্বক ব্যাঙের ত্বকের মতো গুটিযুক্ত ও কর্কশ হয় (8-9 নং চিত্র)। **পৌষ্টিকনালীর** আবরণীকলা ও গ্রন্থি বিনষ্ট হয়। **বৃক্ক ও মূত্রনালীর** আবরণীকলা নষ্ট হয়ে পড়ে এবং **বৃক্কীয় পাথর** (renal stone) সৃষ্টি হয়। ক্ষারীয় অবস্থা (alkalinuria)ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেটের অধঃক্ষেপ পড়ে এই পাথর (urinary calculli) সৃষ্টি হয়। **শ্বাসনালীর** আবরণীকলা স্তরীভূত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (d) **সংক্রমণ ব্যাধি :** আবরণীকলা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে ঐ সব অঞ্চলের সংক্রমণে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সহজেই তারা সংক্রামিত হয়। (e) **স্নায়ুতন্ত্র :** স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষয়বিকৃতি

পরিলক্ষিত হয়। (f) অস্থি: করোটি ও মেরুদণ্ডের কোন্ কোন্ অংশে অস্থির অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটে। স্নায়ুতন্ত্রের অংশ এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
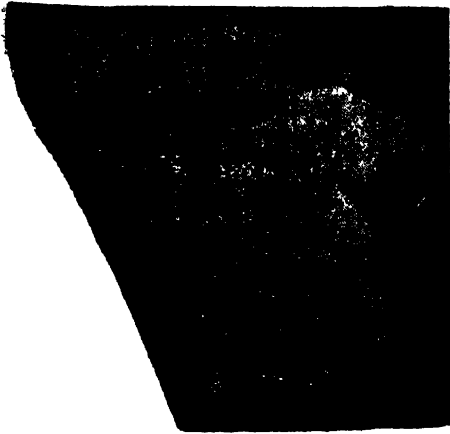
8-9 নং চিত্র: ভিটামিন A এর অভাবে মানুষের ত্বক ব্যাঙের ত্বকের মত কর্কশ ও গুটিযুক্ত হয়।

(g) **প্রজনন-ক্ষমতা:** নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে প্রজনন ত্রুটিপূর্ণ হয়।

5. **দৈহিক চাহিদা** (Daily requirements): বাড়ন্ত শিশু, বয়ঃ-সন্ধিকাল, গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে 6000 থেকে 8000 আই. ইউ. (I. U—International unit) ভিটামিন প্রয়োজন। বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ 5000 আই. ইউ (I. U.)। এক আই. ইউ.= 0·6μ বিশুদ্ধ বিটা ক্যারোটিনের সক্রিয়তা বা 0·344μ ভিটামিন A অ্যাসিটেট।

6. **অধিক ভিটামিনজাত অপক্রিয়া** (Hypervitaminosis): প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিটামিন A গ্রহণ করলে যেসব অপক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান: (1) মাথাধরা, (2) বমি বমি ভাব, (3) তন্দ্রাচ্ছন্নতা, (4) দৈহিক ওজন হ্রাস, (5) চুলপড়া, (6) ত্বকের ক্ষয় বা কৃশতা প্রাপ্তি, (7) চোখের ক্ষত, (8) রক্তক্ষরণ, (9) প্লাজমাস্থিত প্রথ্রম্বিনের (Prothrombin) হ্রাস-প্রাপ্তি, (10) যৌনগ্রন্থির স্বল্পক্রিয়া, (11) অস্থির ক্যালসিয়াম ক্ষয়হেতু ভঙ্গুর-দশা প্রাপ্তি ইত্যাদি।

ভিটামিন D
Vitamin D

1. **রাসায়নিক গঠন** (Chemistry): ভিটামিন D 'রিকেট' (ricket) প্রতিরোধকারী জৈব পদার্থবিশেষ। প্রায় 6 প্রকারের ভিটামিন D-এর সন্ধান

পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ভিটামিন D_2 বা ক্যালসিফেরোল (calciferol)
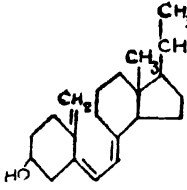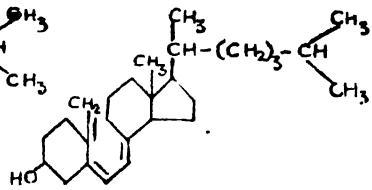
ভিটামিন D_2 ভিটামিন D_3

এবং D_3 বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। D_3 সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ভিটামিন।

সবকয়টি ভিটামিনই স্টেরোল পদার্থ। আরগোস্টেরোল (ergosterol) ও প্রাণীজ 7-ডেহাইড্রোকোলেসটারোলকে (7-dehydrocholesterol) অতিবেগনী রশ্মির (ultraviolet) দ্বারা উদ্দীপ্ত করলে যথাক্রমে ভিটামিন D_2 এবং D_3 পাওয়া যায়।

2. **উৎস** (Sources) ঃ D ভিটামিনের প্রধান উৎস মাছের যকৃতজাত তেল। এ ব্যাপারে কড ও হ্যালিবাট নামক সামুদ্রিক মাছের নাম উল্লেখ করা যায়। অধুনা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন D উৎপাদন করা হয় এবং শিশুখাদ্যে ব্যবহৃত হয়।

3. **কার্যাবলী** (Functions) ঃ ভিটামিন D-এর প্রধান কার্য হল, (a) ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের শোষণকে সহজতর করা, (b) সরাসরি অস্থিকোষের উপর ক্রিয়া করে অস্থিগঠনে অংশগ্রহণ করা, দাঁতের বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং (d) কলাস্থিত ফসফোলিপিড থেকে ফসফোরিক অ্যাসিডের নিষ্কাষণ ঘটিয়ে ক্যালসিয়ামের সংযুক্তিতে সহায়তা করা।
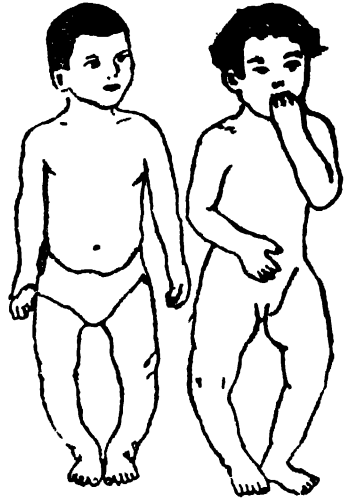
8-10 নং চিত্র ঃ রিকেট।

4 **অভাবজনিত লক্ষণ** (Deficiency signs) ঃ ভিটামিন D-এর অভাবে মলের সংগে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফেট নির্গত হয়। প্লাজমায় ক্যালসিয়ামের মাত্রা হ্রাস পায়। ফলে শিশুদের ক্ষেত্রে

রিকেট (rickets) এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে **ওস্‌টিওম্যালাসিয়া** (osteomalacia) পরিলক্ষিত হয়। রিকেটে অস্থি কোমল থাকে, ফলে দেহভারে দীর্ঘাস্থি বেঁকে যায় (8 10 নং চিত্র)। ত্রুটিপূর্ণ অস্থি-স্থাপনার জন্য কদাকার বক্ষপিঞ্জর, কদাকার শ্রোণীচক্র, মেরুদণ্ডের বক্রতা এবং পার্শ্বদেশীয় অস্থির নম্রতা পরিলক্ষিত হয়। রিকেট সাধারণত 6 থেকে 18 মাসের শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। ওস্‌টিও-ম্যালাসিয়া প্রধানত স্ত্রীলোকদের গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে দেখা যায়।

5. **দৈনিক চাহিদা** (Daily requirements) : নবজাত শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে দৈনিক 400 আই. ইউ. ভিটামিন D প্রয়োজন : ইহা এক আই ইউ D = 0·025 μ আরগোক্যালসিফেরোলের (ergocalciferol) জৈবিক ক্রিয়ার সমান।

6. **অধিক ভিটামিনজাত অপক্রিয়া** (Hypervitaminosis) : অধিক পরিমাণ ভিটামিন D গ্রহণ করা অনেকটা বিষক্রিয়াব সামিল। দৈহিক ওজন হ্রাসের সংগে মাথাধরা, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি দেখা যায়। রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড, ধমনী ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম জমা হতে থাকে।

ভিটামিন K

Vitamin K

1. **রাসায়নিক গঠন** (Chemistry) : ভিটামিন K রক্তক্ষরণ প্রতিরোধকারী ভিটামিন হিসাবে পরিচিত। একাধিক K ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া যায়। K_1 তৈলজাতীয় পদার্থ এবং K_2 হলদে কেলাসিত কঠিন পদার্থ।

$$CH_2.CH{=}C(CH_3).(CH_2)_3.CH(CH_3).(CH_2)_3.CH(CH_3)(CH_2)_3.CH(CH_3).CH_3$$
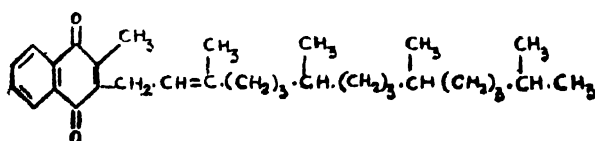
ভিটামিন K_1 8-11 নং চিত্র ভিটামিন K_3
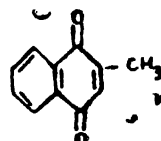
ন্যাপথোকুইনোন (napthoquinone) থেকে ভিটামিন K উৎপন্ন হয়। সবুজ উদ্ভিদ এবং ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন K-এর সংশ্লেষণ ঘটায়। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট ভিটামিন K_3 (2-methyl-1 : 4 napthoquinone) প্রকৃতিজাত ভিটামিন K_1 থেকে প্রায় 3 গুণ শক্তিশালী।

2, **উৎস** (Sources) : ভিটামিন K-এর প্রধান উৎস শাকসব্জী, বিশেষ করে বাঁধাকপি, শাক, টমেটো, সয়াবিন ইত্যাদিতে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়েও ভিটামিন K-এর উৎপাদন করা হয়।

3. **কার্যাবলী** (Functions) : ভিটামিন K রক্তস্থিত প্রথ্রোমবিন ও ফ্যাক্টর VII-এর সঠিক মাত্রা বজায় রেখে রক্তের স্বাভাবিক তঞ্চনে সহায়তা করে। অন্ত্র থেকে ভিটামিন K-এর শোষণে পিত্তলবণ (bile-salt) প্রয়োজন। পাণ্ডুরোগ (jaundice) বা অন্য কোন যকৃৎরোগে পিত্তরস ক্ষরণে ত্রুটি দেখা দিলে K-ভিটামিনের বিশোষণ ব্যাহত হয় এবং রক্তক্ষরণ ঘটতে দেখা যায়।

4. **অভাবজনিত লক্ষণ** (Deficiency signs) : ভিটামিন K-এর অভাব দেখা দিলে তঞ্চন ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং রক্তক্ষরণ ঘটে।

5. **দৈনিক চাহিদা** (Daily requirements) : প্রতিদিন 5 মিলি-গ্রাম ভিটামিন K প্রয়োজন।

ভিটামিন E

Vitamin E

1. **রাসায়নিক গঠন** (Chemistry) : বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধকারী ভিটামিন হিসাবে ভিটামিন E পরিচিত। কৃত্রিম উপায়ে এই ভিটামিনের সংশ্লেষণ সম্ভবপর।

ভিটামিন E-এর অপর নাম টোকোফেরোল (tocopherol, tocos = child birth, pheros = to bear) নামে পরিচিত। ইহা একটি অসংপৃক্ত অ্যাল্কোহল

HO, CH_3, CH_3, CH_3, H_2, H_2, O, CH_3 — $(CH_2)_3$-$\overset{CH_3}{CH}$-$(CH_2)_3$-$\overset{CH_3}{CH}$-$(CH_2)_3$-CH(CH_3)(CH_3)
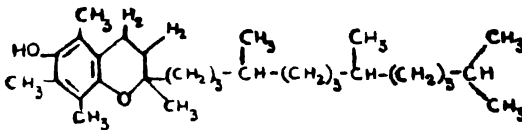
8-12 নং চিত্র : আল্ফা-টকোফেরোল।

বিশেষ। ভিটামিন তিন প্রকারের। এদের মধ্যে আল্ফা-টকোফেরোল (α-tocopherol) সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। অপর দুটির নাম বিটা-টকোফেরোল ও গামা-টকোফেরোল।

2. **উৎস** (Sources) : প্রাণীতে এই ভিটামিন খুব অল্প পরিমাণে রয়েছে। শুধুমাত্র যকৃতে সামান্য পরিমাণ ভিটামিন E পাওয়া যায়। শাকসব্জী

এই ভিটামিনের প্রধান উৎস। বিশেষ করে গম, সয়াবিন, শস্য ইত্যাদির তেলে এই ভিটামিনকে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

3. **কার্যাবলী** (Functions) : (a) স্বাভাবিক প্রজননক্রিয়ায় ভিটামিন E গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে ; (b) দেহের অপ্রয়োজনীয় জারণ-ক্রিয়ার বাধাদান করে ; (c) মাংসপেশীর স্বাভাবিক সক্রিয়তায় সহায়তা করে ; (d) গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে এবং (e) স্নায়ুতন্ত্র ও রক্তনালীর মধ্যে সমতা বজায় রাখে।

4. **অভাবজনিত লক্ষণ** (Deficiency sign) : ভিটামিন K-এর অভাবজনিত লক্ষণ প্রধানত বিভিন্ন মনুষ্যেতর প্রাণীদেহে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। যথা : (1) স্ত্রী-ইঁদুরের জরায়ুতে নিষিক্ত ডিম্বাণু স্থাপিত হলেও পরে ভ্রূণটি বিনষ্ট হয়ে যায়। যথাসময়ে ভিটামিন E-এর ব্যবহার এই অবস্থার পরিবর্তনসাধন করতে পারে ; (2) অধিক পরিমাণে ভিটামিন E-এর ব্যবহার প্রজনন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে না পারলেও বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে সহায়তা করে, (3) পুরুষ ইঁদুরের শুক্রাশয় কৃশ হয় এবং শুক্রাণু সৃষ্টি ব্যাহত হয়। ভিটামিনের পুনঃপ্রয়োগে এই দুটো ক্ষতির পুনরুদ্ধার সম্ভবপর নয় : (4) রক্তের লোহিতকণিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বানরের রক্তাল্পতা দেখা দেয়। শ্বেতকণিকা বিনষ্ট হতেও দেখা যায় ; (5) ভিটামিন E-এর সংগে সেলিনিয়ামের (Sc) অভাব হলে যকৃৎ-কোষের ক্ষয় (necrosis) দেখা যায় ; মাংসপেশীর বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং পেশীর পুষ্টিজনিত ক্ষয়বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে হৃৎপেশীর ক্ষয়বিকৃতি।

5. **দৈনিক চাহিদা** (Daily requirement) : প্রতিদিন 15 থেকে 20 মিলিগ্রাম ভিটামিন E-এর প্রয়োজন।

জলে দ্রবণীয় ভিটামিন
Water Soluble Vitamins

জলে দ্রবণীয় ভিটামিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন হ'ল **বি-কমপ্লেক্স** (B-complex)। বি'কমপ্লেক্স অনেকগুলো ভিটামিনের সমষ্টিবিশেষ। জলে দ্রবণীয় ভিটামিন তাপসহ ; রন্ধনকার্যে এরা সাধারণত নষ্ট হয় না। কোন কোন ভিটামিন অবশ্য অংশত বিনষ্ট হয়। আলোকসম্পাতে কিছু পরিমাণ ভিটামিন বিনষ্ট হয়। এরা সবাই সাধারণভাবে কেলাস পদার্থ। ভিটামিন C জলে দ্রবণীয় ভিটামিনের অন্তর্ভুক্ত।

ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ঃ বি-কম্‌প্লেক্স ভিটামিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ভিটামিন প্রধান ঃ

থায়ামিন (THIAMINE, গ্রীক—theion—সালফার, ইং—amine = অ্যামাইনো গ্রুপ) ঃ

1. **রাসায়নিক গঠন** (Chemistry) ঃ থায়ামিনকে ভিটামিন B_1 বলা হয়। পিরাইমিডিন নিউক্লিয়াস ও থায়াজোল রিং (thiazole ring)-এর সমন্বয়ে থায়ামিন গঠিত। এর মধ্যে সালফার ও অ্যামাইনো গ্রুপ রয়েছে।
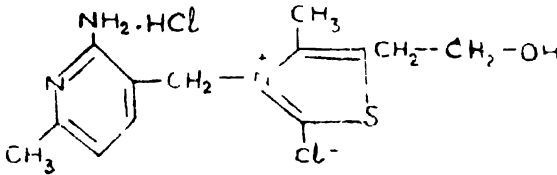
8-13 নং চিত্র ঃ থায়ামিন (কেলাসিত)।

2. **উৎস** (Sources) ঃ প্রাণী ও উদ্ভিদ এই উভয় উৎস থেকেই থায়ামিন পাওয়া যায়। প্রাণীজ থায়ামিনের পরিমাণ খুবই কম। ডিমের পীত অংশে সামান্য পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে। উদ্ভিদজাতীয় থায়ামিনের উৎস শস্যজাতীয় খাদ্য, ডাল, ঢেঁকিছাটা চাল, বাদাম, ইস্ট এবং সবুজ শাক্‌সব্জী। যথা ঃ বিট, শালগম, ফুলকপি, নাশপাতি, বরবটি, মটর ইত্যাদি। কৃত্রিম উপায়েও এই ভিটামিনের সংশ্লেষণ সম্ভবপর।

3. **কার্যাবলী** (Functions) ঃ (a) থায়ামিনের ফস্‌ফেট এস্টার (TPP) এনজাইম কার্‌বোক্সিলেজের কো-এন্‌জাইম হিসাবে কাজ করে (8 নং তালিকা)। এই এন্‌জাইম থায়ামিন ও Mg^{++} আয়নের সহযোগিতায় পাইরুভিক অ্যাসিড (pyruvic acid) থেকে CO_2 এর নিষ্ক্রমণ ঘটায়। (2) কার্বোহাইড্রেট, স্নেহদ্রব্য ও প্রোটিনের সংশ্লেষণের সংগে জড়িত এন্‌জাইম তাদের কার্যে সহায়তা করে।

4. **অভাবজনিত লক্ষণ** (Deficiency signs) : থায়ামিনের অভাবে **বেরিবেরি** (beriberi) রোগের আবির্ভাব ঘটে। বেরিবেরি 2 প্রকারের ঃ (1) শুষ্ক ও (2) আর্দ্র। শুষ্ক বেরিবেরিতে প্রান্তীয় স্নায়ু ও স্নায়ুরজ্জু বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর্দ্র বেরিবেরিতে হৃদ্‌যন্ত্রের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়; হৃৎযন্ত্রের অত্যাধিক রক্তসঞ্চয়জনিত বিকলদশার (congestive cardiac failure) লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, অর্থাৎ দ্রুত অথচ মৃদু হৃৎস্পন্দন, শ্বাসকষ্ট, পা

ফুলে ওঠা (edema) ইত্যাদি। ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড (lactic acid) জমে যাওয়ার ফলে হৃদযন্ত্রের প্রসারণ ঘটে।

8 নং তালিকা : কিছু সংখ্যক জলে দ্রবণীয় ভিটামিনের কো-এনজাইম।

ভিটামিন	কো-এনজাইম
থায়ামিন (B_1)	থায়ামিন পাইরোফসফেট (TPP)
রাইবোফ্লেভিন (B_2)	ফ্লেভিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (FAD) এবং ফ্লেভিন মনোনিউক্লিওটাইড (FMN)
নিকোটিনিক অ্যাসিড (নিয়াসিন)	নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (NAD)
পিরাইডোক্সিন, পিরাইডোক্সাল ও পিরাইডোক্সামিন (B_6)	পিরাইডোক্সাল ফসফেট (PP)
প্যানটোথেনিক অ্যাসিড	কো-এনজাইম A
বায়োটিন	কার্বোক্সিলেজের সংগে কোভেলেণ্ট বণ্ডের দ্বারা সংযুক্ত
ফলিক অ্যাসিড	টেট্রাহাইড্রোফলেট (FH_4)
কোবালামিন (B_{12})	কোবামাইড কো-এনজাইম

সাধারণভাবে আর্দ্র বেরিবেরিতে যে সব লক্ষণগুলো দেখা যায়, তা হ'ল (1) পা ইত্যাদি ফুলে ওঠা; (2) ক্ষুধামান্দ্য, পৌষ্টিক নালীর টান টান ভাবের (tension) হ্রাস ঘটা, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণ হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি, (3) রক্তে ল্যাক্‌টিক ও পাইরুভিক অ্যাসিডের আধিক্য, (4) প্রান্তীয় স্নায়ুপ্রদাহ (polyneuritis) এবং হাত-পায়ের দুর্বলতা ও অসংলগ্নতা (ataxia) ইত্যাদি; (5) স্নায়বিক দুর্বলতা (6) হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা ইত্যাদি।

5. **দৈনিক চাহিদা (Daily requirements) :** প্রতিদিন প্রায় 1·8 গ্রাম থায়ামিন প্রয়োজন। এই চাহিদা বিপাকক্রিয়ার সংগে সমানুপাতিক।

রাইবোফ্লেভিন
Riboflavin

1. **রাসায়নিক গঠন (Chemistry) :** ফ্লেভিনের সংগে রাইবোজ শর্করার (d-ribose) সংযোগে রাইবোফ্লেভিন গঠিত। জীবন্ত কোষে এই ভিটামিন

ফসফোরিক অ্যাসিড এবং নির্দিষ্ট প্রোটিনমূলকের সংগে যুক্ত থাকে। রাইবোফ্লেভিন আন্ত্রিক শ্লেষ্মাঝিল্লিতে ফসফরাসযুক্ত হয়।

2. **উৎস** (Sources)ঃ দুধ, ডিম, যকৃৎ, বৃক্ক, পেশী ইত্যাদি এবং সবরকম শস্য ও সবুজ শাকপাতা প্রভৃতিতে রাইবোফ্লেভিন পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়েও এই ভিটামিনের সংশ্লেষণ সম্ভবপর।

3. **কার্যাবলী** (Functions)ঃ রাইবোফ্লেভিন (a) দেহবৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয়, (b) প্রোটিনের বিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, (c) যে সব
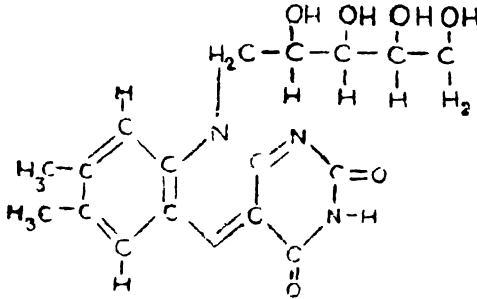
8-14 নং চিত্র ঃ রাইবোফ্লেভিন।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি কার্বোহাইড্রেটের বিপাকক্রিয়ায় জড়িত তাদের সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রণ করে, (d) কো-এনজাইম FMN হিসাবে মাইটোকনড্রিয়ার জারণবিজারণ পদ্ধতির সংগে জড়িত থাকে এবং হাইড্রোজেনবাহক হিসাবে কার্য করে, (e) কো-এনজাইম FAD হিসাবে বিভিন্ন এনজাইমের (xanthine oxidase, liver aldehyde oxidase etc.) সংগে যুক্ত থেকে কলাকোষের বিপাকক্রিয়ায় সহায়তা করে।

4. **অভাবজনিত লক্ষণ** (Deficiency signs)ঃ রাইবোফ্লেভিনের অভাবে স্নায়ুতন্ত্র, ত্বক, চোখ ইত্যাদি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এছাড়া ওষ্ঠের উভয়পার্শ্বে ফেটে যাওয়া ও ঘা হওয়া, কর্নিয়ায় অধিক পরিমাণে রক্তজালকের সৃষ্টি, চোখে ছানি পড়া, আলো অসহ্য ঠেকা (photophobia), ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হওয়া, চুল ওঠা, জিহ্বার প্রদাহ, মুখগহ্বরের কৌণিক শ্লেষ্মাঝিল্লির প্রদাহ (angular stamatitis) প্রভৃতি দেখা যায়।

5. **দৈনিক চাহিদা** (Daily requirements)ঃ প্রতিদিন 1·5 থেকে 1·8 মিলিগ্রাম রাইবোফ্লেভিনের প্রয়োজন।

নিকোটিনিক অ্যাসিড ও নিকোটিনিক অ্যাসিড অ্যামাইড

Nicotinic Acid and Nicotinic Acid Amide

1. **রাসায়নিক গঠন** (Chemistry) ঃ 'পেলাগ্রা' (pellagra) রোগের প্রতিরোধক এই ভিটামিন একটি সাদা কেলাস পদার্থ। কৃত্রিম উপায়েও এর সংশ্লেষণ সম্ভবপর। নিকোটিনিক অ্যাসিড দেহের অভ্যন্তরে নিকোটিনিক অ্যাসিডের অ্যামাইডে রূপান্তরিত হয় এবং সক্রিয়তা লাভ করে। দু'ধরনের এনজাইমের সংগে এই ভিটামিন সম্পর্কযুক্ত। কো-এনজাইম NAD এবং NADP হিসাবে ইহা এনজাইম ডিহাইড্রোজেনেজের (dehydrogenase) সংগে যুক্ত থাকে।

```
//\—COOH          //\—COHN₂
|   ||            |   ||
\\ /              \\ /
 N                 N
```
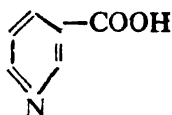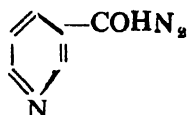
নিয়াসিন (নিকোটিনিক অ্যাসিড)   নিয়াসিনামাইড

2. **উৎস** (Sources) ঃ নানাপ্রকার শাকসব্জী, শস্য, ডাল, ইস্ট টমাটো, বরবটি মটর ইত্যাদি এবং মাছ, মাংস, দুধ, যকৃৎ ইত্যাদিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

3. **কার্যাবলী** (Functions) ঃ এই ভিটামিন (1) কলাকোষের বিপাকক্রিয়া ও জারণ ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, (2) কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহদ্রব্যের সংশ্লেষণে সহায়তা করে, (3) পেলাগ্রার প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে এবং (4) দেহবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে।

4. **অভাবজনিত লক্ষণ** (Deficiency sign) ঃ ত্বকে লালচে দাগ (erythema), ক্ষত, প্রদাহ, কাঠিন্য ও খস্‌খসে ভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া পেটের পীড়া, দুর্বলতা, মানসিক বিকলতা, মুখের ঘা ও রক্তিম ভাব, জিহ্বা ফুলে ওঠা ও লোহিত বর্ণ ধারণ করা ইত্যাদি লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। অত্যধিক ভিটামিনের অভাব হলে রোগী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

5. **দৈনিক চাহিদা** (daily requirements) ঃ বয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে 12 থেকে 18 মিলিগ্রাম এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে খানিকটা কম ভিটামিন প্রতিদিন প্রয়োজন হয়।

প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড বা ভিটামিন B_3
Pantothenic Acid

1. **রাসায়নিক গঠন ও কার্যাবলী ঃ** প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড পেপ্‌টাইডজাতীয় পদার্থ। কো-এনজাইম-A হিসাবে দেহে সক্রিয়। কার্বোহাইড্রেটের বিপাকক্রিয়া, ফ্যাটি অ্যাসিড ও কোলেসটারোলের সংশ্লেষণ ও বিপাকক্রিয়া ইত্যাদিতে ইহা সহায়তা করে।

1. **উৎস ঃ** প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড দুধ, মাংস, ডিমের পীতাংশ, যকৃৎ বৃক্ক প্রভৃতি এবং মিষ্টি আলু, মটর, গুড়, শুষ্ক ইস্ট ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। ইঁদুর, মুরগীর ছানা, শূকর ইত্যাদির জন্য ইহা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

2. **অভাবজনিত লক্ষণ ঃ** এই ভিটামিনের অভাবে মুরগীর ছানার যকৃৎ বৃহদাকার ধারণ করে, স্নায়ুরজ্জুর ক্ষয় সাধিত হয়, থাইমাস গ্রন্থি চুপসে যায় এবং ত্বকের প্রদাহ পরিলক্ষিত হয়। ইঁদুরের অ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থির ক্ষয় (necrosis) এবং অ্যান্টিবডি উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস পায।

3. **দৈনিক চাহিদা ঃ** 10 মিলিগ্রামের মত।

পিরাইডোক্সিন বা ভিটামিন B_6
Pyridoxine

1. **রাসায়নিক গঠন ঃ** এই ভিটামিন পিরাইডিন জাতীয় পদার্থ। পিরাইডোক্সিন, পিরাইডোক্সাল (pyridoxal) এবং পিরাইডোক্সামিনকে (pyridoxamine) একত্রে ভিটামিন B_6 বলা হয়। এরা সকলেই পিরাইডোক্সাল ফসফেট হিসাবে সক্রিয়।

$$\begin{array}{c} O{=}C{-}H \\ | \\ HO{-}\text{(ring)}{-}CH_2OH \\ N \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_2OH \\ | \\ OH{-}\text{(ring)}{-}CH_2OH \\ H_3C{-}\quad \\ N \end{array}$$
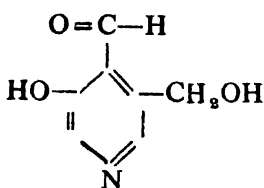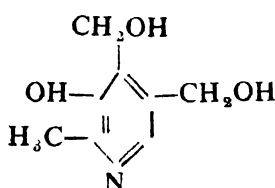
পিরাইডোক্সাল   পিরাইডোক্সিন

2. **উৎস ঃ** যকৃৎ, ডিম, মাংস, বৃক্ক ইত্যাদি এবং নানাপ্রকার শস্য, শাকপাতা, ইস্ট প্রভৃতিতে পিরাইডোক্সিন পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়েও এই ভিটামিনের সংশ্লেষণ সম্ভবপর।

3. **কার্যাবলী :** এই ভিটামিনটি নিম্নস্তরের প্রাণীদের পক্ষে অপরিহার্য। মানুষের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। সম্ভবত ইহা কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিনের বিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

4. **অভাবজনিত লক্ষণ :** ইঁদুর ও কুকুরের দেহবৃদ্ধি ও প্রজননক্ষমতা যেমন হ্রাস পেতে দেখা যায় তেমনি স্নায়বিক ক্ষয়, ক্রোধ-প্রবণতা, চাঞ্চল্য, নিম্নাংগে ব্যথা ইত্যাদি দেখা যায়।

(e) **দৈনিক চাহিদা :** শিশুর ক্ষেত্রে 0·3 মিলিগ্রাম এবং বয়স্কের ক্ষেত্রে 2 মিলিগ্রাম ভিটামিন প্রয়োজন।

ফলিক অ্যাসিড

Folic acid

1. **রাসায়নিক গঠন :** ফলিক অ্যাসিড আসলে টেরোইল-গ্লুটামিক অ্যাসিড (pteroyl glutamic acid)। টেরিডিন (pteridine), প্যারা-অ্যামাইনো-বেনজোয়িক অ্যাসিড (para amino benzoic acid) এবং গ্লুটামিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে এই ভিটামিন গঠিত।
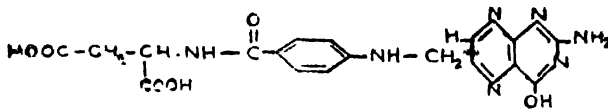
8-15 নং চিত্র : ফলিক অ্যাসিড।

2. **উৎস :** ইস্ট, যকৃৎ ও সয়াবিনে ফলিক অ্যাসিডের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশী। এছাড়া বরবটি, কাঁচা শাকপাতা, বৃক্ক ইত্যাদিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়েও এই ভিটামিনের সংশ্লেষণ সম্ভবপর।

3. **কার্যাবলী :** ফলিক অ্যাসিড (1) কোষ-নিউক্লিয়াসের DNA সংশ্লেষণে অপরিহার্য, (2) লোহিতকণিকার উৎপাদন ও বৃদ্ধিতে সহায়ক, (3) রক্তাল্পতার চিকিৎসাকার্যে ব্যবহৃত হয় এবং (4) বিজারিত অবস্থায় কো-এনজাইম হিসাবে কার্য করে।

4. **অভাবজনিত লক্ষণ :** মানুষের ক্ষেত্রে মেগ্যালোব্লাস্ট (megaloblast) রক্তাল্পতা দেখা দেয়। বানর ও ইঁদুরের দেহের বৃদ্ধি হ্রাস, রক্তাল্পতা, শ্বেতকণিকার সংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

5. **দৈনিক চাহিদা :** 50 মাইক্রোগ্রামের মত।

ভিটামিন B_{12} বা সায়ানোকোবালামিন
Cyanocobalamin

1. **রাসায়নিক গঠন :** ভিটামিন B_{12}-এ খনিজ পদার্থ কোবাল্ট (cobalt) দেখতে পাওয়া যায়। এর স্থূলসংকেত $C_{63}H_{90}O_{14}N_{14}PC_0$।

এর মধ্যে কোবাল্টের পরিমাণ প্রায় 4·5 শতাংশ। পাচকরসের স্বাশ্রয়ী উপাদান (intrinsic factor) ভিটামিন B_{12}-কে অন্ত্র থেকে বিশোষিত হতে সহায়তা করে। এই স্বাশ্রয়ী উপাদান গ্ল্যানডুলার গ্লাইকোপ্রোটিন (glandular glycoprotein) নামে পরিচিত। মানুষের পাকস্থলীস্থিতে প্যারাইটাল কোষ (parietal
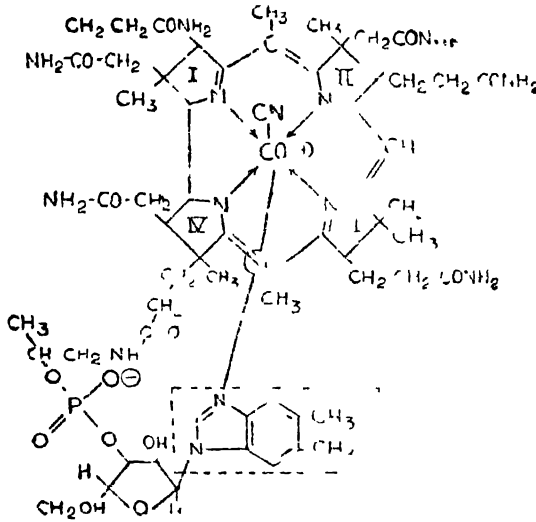
8-16 নং চিত্র : ভিটামিন B_{12}।

cell) এই উপাদানের সংশ্লেষণ ঘটায়। যকৃতে ইহা সঞ্চিত থাকে এবং সেখান থেকে সরাসরি অস্থিমজ্জায় পেঁছে লোহিতকণিকার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

2. **উৎস :** ভিটামিন B_{12}-কে শাক-সবজীতে পাওয়া যায় না। যকৃতে এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। এছাড়া ডিম, গরুর মাংস, বৃক্ক ইত্যাদিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। স্ট্রেপটোমাইসিন (streptomycin) উৎপাদনের সময় ভিটামিন B_{12}-কে উপজাত (by product) হিসাবে পাওয়া যায়।

3. **কার্যাবলী :** এই ভিটামিন (1) লোহিতকণিকার উৎপাদন ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, (2) অস্থিমজ্জায় প্রভাব বিস্তার করে শ্বেতকণিকা ও অণুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে, (3) রক্তে শর্করার সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে,

(4) কো-এনজাইম হিসাবে কার্য করে, (5) নিউক্লিক অ্যাসিডের সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে, (6) স্নায়ুতন্ত্রের কোন কোন অংশের ক্রিয়া তথা স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার ব্যাপারে সহায়তা করে এবং (7) কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহদ্রব্যের বিপাকক্রিয়ায় নানাভাবে অংশ গ্রহণ করে।

4. **অভাবজনিত লক্ষণ :** ভিটামিন B_{12}-এর অভাবে রক্তাল্পতা ও রক্ত শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইঁদুর, শূকর ইত্যাদি প্রাণীর দেহবৃদ্ধির হ্রাস এবং ক্রোধপ্রবণতার লক্ষণ দেখা দেয়।

5. **দৈনিক চাহিদা :** নির্ণীত হয়নি। তবে সম্ভবত অতি সামান্য পরিমাণ ভিটামিনই প্রয়োজন হয়। পার্নিসিয়াস (parnicious) রক্তাল্পতায় 45 মিলিগ্রাম ভিটামিনের ইনজেকশন সন্তোষজনক

বায়োটিন
Biotin

1. **রাসায়নিক গঠন :** বায়োটিন ভ্যালেরিক অ্যাসিড (valeric acid) থেকে উৎপন্ন হয়। থায়োফেন (thiophene এবং ইমিনোক্সোল (iminoxol) নামক দুটো পঞ্চভুজী বলয় (ring) এর মধ্যে এক সংগে মিশে আছে।
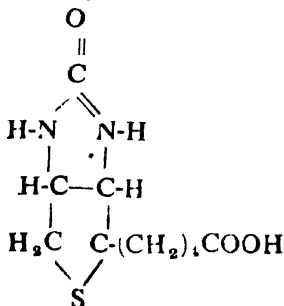
2. **উৎস :** বায়োটিন ইস্ট, বৃক্ক, যকৃৎ, ফুলকপি, মটরশুটি প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

3. **কার্যাবলী :** বায়োটিন কো-ফ্যাক্টর হিসাবে কার্য করে। এছাড়া ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও রাইবোফ্লেভিনের সংগে এর কার্যের যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। কুকুর ও ইঁদুরের চর্মে প্রদাহ (dermatitis) প্রতিরোধে ইহা সহায়ক।

4. **অভাবজনিত লক্ষণ :** বায়োটিনের অভাবে মানুষের দেহে এক বিশেষ ধরনের ত্বকপ্রদাহ এবং রক্তস্থিত কোলেস্টারোলের পরিমাণবৃদ্ধি ঘটে। থায়ামিনের অভাবে যেসব লক্ষণ দেখা যায়, তার অনেকগুলো বায়োটিনের অভাবেও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুকুর, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীতে ত্বকপ্রদাহ দেখা যায়।

5. **দৈনিক চাহিদা** ঃ প্রতিদিন 150 থেকে 400 মাইক্রোগ্রাম বায়োটিন প্রয়োজন।

ভিটামিন C বা অ্যাস্কোর্বিক অ্যাসিড
Ascorbic acid

1. **জৈব সংশ্লেষণ ও রাসায়নিক প্রস্তুতি** (Biosynthesis and chemistry) ঃ মানুষের দেহে এই ভিটামিনের সংশ্লেষণ সংঘটিত হয় না। তাই বাহির থেকে এর সরবরাহ করতে হয়। গিনিপিগ, বানর ইত্যাদি জাতীয় প্রাণী এবং পাখী ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদেহে ভিটামিন C-এর জৈবসংশ্লেষণ সম্ভবপর।

ভিটামিন C অতি সহজেই 100° ডিগ্রি সেলসিয়াস অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হয় : ফেরিসায়ানাইড (ferricyanide), সিল্ভার নাইট্রেট (silver nitrate) মিথিলিন ব্লু (methylene blue) প্রভৃতি সহজেই এই ভিটামিনকে বিজারিত করতে পারে। প্রাণীদেহে জারিত ভিটামিন C (dehydroascorbic acid) স্বাভাবিক ভিটামিনের মতই সক্রিয়।

ভিটামিন C (বিজারিত) — ডেহাইড্রো-অ্যাসকোর্বিক অ্যাসিড
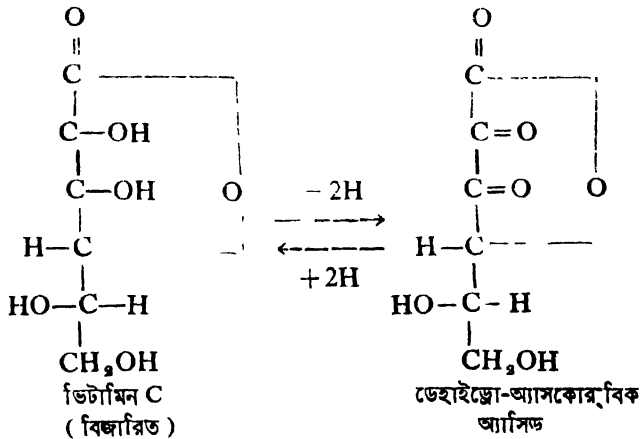
2. **উৎস** (Sources) ঃ ভিটামিন C আনারস, টমাটো, কমলালেবু, লেবু, পেঁপে প্রভৃতি ফল এবং বাঁধাকপি, কাঁচা লংকা, শাক, বরবটি ইত্যাদি শাক-সব্জীতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ছাড়া গরুর দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতিতেও সামান্য পরিমাণে রয়েছে। মানুষের রক্তের সিরামে 0·8 মিলিগ্রাম ভিটামিন দেখতে পাওয়া যায়। দেহে ইহা কখনও অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয় না। রন্ধনকার্যে ইহা বিনষ্ট হয়।

3. **কার্যাবলী** (Functions) : ভিটামিন C দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যের সংগে জড়িত। নিম্নে সংক্ষেপে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল : (1) ভিটামিন C কার্বোহাইড্রেটের বিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এর অভাবে অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিনের (insulin) উৎপাদন হ্রাস পেতে দেখা যায়। (2) ভিটামিন C সম্ভবত হাইড্রোজেন বাহক হিসাবে কলাকোষে জারণ-বিজারণ বিভবের (oxidation-reduction potential) নিয়ন্ত্রণ করে। (3) এ ছাড়া ফলিক অ্যাসিডকে (folic acid) ফলিনিক অ্যাসিডে (folinic acid) রূপান্তরিত হতে সহায়তা করে। (4) লোহিতকণিকার উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। (5 অস্থি, তরুণাস্থি, দাঁত, ত্বক এবং সংযোগরক্ষাকারী কলার (connective tissue) কোষমধ্যস্থ পদার্থের (intercellular substance) স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে ভিটামিন C সহায়তা করে। ইহা রক্তজালিকার অন্তস্থ আবরণী-কলার বনিয়াদ পদার্থের রক্ষাকার্যেও সহায়তা করে। (6) অস্থিস্থিত প্রোটিন ম্যাট্রিক্সের বিকাশ এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফেটের উপস্থাপনে ভিটামিন C সাহায্য করে। (7) ক্ষত নিরাময়ে এবং (8) ফাইব্রোব্লাস্ট (fibroblast), ওস্টিওব্লাস্ট (osteoblast) প্রভৃতি সংগঠক কোষের কার্যে ইহা সহায়তা করে।

4. **অভাবজনিত লক্ষণ** (Deficiency signs) : ভিটামিন C এর অভাবে 'স্কার্ভি' (scurvy) রোগ দেখা দেয়। স্কার্ভি রোগের লক্ষণ নিম্নরূপ : (1) অস্থি ও দাঁত কদাকার রূপ ধারণ করে। অস্থি-কোষ (osteoblast) নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাদের কিছুসংখ্যক আবার ফাইব্রোব্লাস্টে (fibroblast) রূপান্তরিত হয়। অস্থিলবণের যথাযথ উপস্থাপন (deposition) ব্যাহত হয় এবং দীর্ঘাস্থির ঘনত্ব হ্রাস পায়। দাঁতেও একই রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং মাড়ী স্পঞ্জী ও ছিদ্রযুক্ত হয় (8-17 নং চিত্র), (2) রক্তজালিকা ক্ষণভঙ্গুর হয়, অন্ত্র, বৃক্কে ও ত্বকের নিচে রক্তপাত ঘটে। মাড়ীর
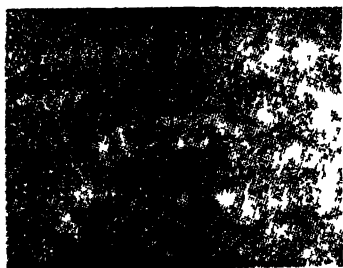
8-17 নং চিত্র : স্কার্ভি রোগে কদাকার দাঁত।

মাড়ীর প্রান্তসীমার শ্লেষ্মাঝিল্লি ক্ষয় পায় এবং তখন রক্তপাত হয়, (3) অস্থির ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়। (4) লোহিতকণিকার সংখ্যা হ্রাস পায় এবং রক্তাল্পতা দেখা দেয়। (5) রক্তের তঞ্চন-প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। (6) সংক্রমণের প্রতি সংবেদন-শীলতা বৃদ্ধি পায়। (7) ক্ষতের নিরাময় মন্দীভূত হয়। (8) নর-নারীর মধ্যে প্রজনন-ক্ষমতার বিপর্যয় দেখা দেয়। (9) ত্বকে ফুসকুড়ি (eruption) দেখা দেয় এবং (10) কার্বোহাইড্রেটের বিপাকক্রিয়া ব্যাহত হয়।

5. **দৈনিক চাহিদা** (Daily requirements) : সাধারণভাবে 30 মিলিগ্রাম ভিটামিন C প্রতিদিন প্রয়োজন, তবে গর্ভাবস্থা, স্তন্যদানকাল এবং বয়ঃসন্ধিকালে প্রায় 70 মিলিগ্রাম ভিটামিন প্রয়োজন হয়।

অ্যান্টি ভিটামিন

Anti-Vitamins

যেসব পদার্থ ভিটামিনের কার্যে বাধা দেয়, তাদের বিনষ্ট করে বা নিষ্ক্রিয় করে, সেসব পদার্থকে **অ্যান্টি ভিটামিন** বলা হয়। দেখা গেছে এদের রাসায়নিক গঠন অনেকটা ভিটামিনের মতই, কিন্তু তারা জৈবিকভাবে নিষ্ক্রিয়। যেমন, পাইরিথায়ামিন (pyrithiamine) অনেকটা থায়ামিনের পিরাইডিনের সদৃশ। কিন্তু তার কোন শারীরবৃত্তীয় সক্রিয়তা নেই। থায়ামিনের কাজে ইহা বাধাদান করে। তেমনি কাঁচা ডিমের শ্বেত অংশে অবস্থানকারী অ্যাভিডিন (avidin) ভিটামিন বায়োটিনের সংগে সংযুক্ত হয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে। থায়ামিনেজ (thiaminase) এনজাইম থায়ামিনকে বিনষ্ট করে। এমনি অসংখ্য অ্যান্টিভিটামিনের উদাহরণ দেওয়া যায়।

খনিজ পদার্থ

MINERALS

খনিজ পদার্থ দেহের শক্তি সরবরাহ করে না, তবু এরা জীবনের অপরিহার্য উপাদান। অজৈব লবণ গ্রহণ না করা খাদ্যগ্রহণ না করার চেয়েও মারাত্মক। দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটির অভাবে প্রাণী তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করে। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, সালফার, ফসফরাস, পটাসিয়াম, তামা, আয়োডিন, ক্লোরিন প্রভৃতি খনিজ পদার্থ দেহের পক্ষে অপরিহার্য। নিম্নে প্রধান কয়েকটি খনিজ পদার্থের বিপাক সংক্ষেপে আলোচিত হল।

লোহা বা আয়রণ
IRON

লোহার অভাবে দেহে রক্তাল্পতা দেখা দেয় (মাইক্রোসাইটিক ও হাইপো-ক্রোমিক)। লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ যেমন হ্রাস পায়, তেমনি লোহিতকণিকার আয়তন ও আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে (গড়ে হ্রাস পায়)। এছাড়া অস্থিমজ্জার নরমোব্লাস্ট কোষের বৃদ্ধি ঘটে এবং অপরিণত লোহিতকণিকা রক্তসংবহনে নির্গত হয়।

1. **উৎস ও চাহিদা ঃ** মাংস, যকৃৎ, ডিম প্রভৃতি প্রাণীজ খাদ্য এবং ফল, মটর, সবুজ শাকপাত, মুসুরডাল ইত্যাদি উদ্ভিদ্‌জাত খাদ্যে লোহা পাওয়া যায়। দুধে লোহা অনুপস্থিত।

প্রতিদিন কমপক্ষে 15 থেকে 20 মিলিগ্রাম লোহা দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয়। গর্ভবতী ও পয়স্বিনী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে লোহার চাহিদা আরো বেশী।

2. **বিশোষণ ঃ** কম বেশী সমগ্র ক্ষুদ্রান্ত্র থেকেই লোহা বিশোষিত হয়। তবে গ্রহণী ও মধ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের ঊর্ধ্বাংশে লোহার বিশোষণ সবচেয়ে বেশী। পোর্টালতন্ত্রের মাধ্যমেই লোহা রক্তে বিশোষিত হয়। তবে রক্ত থেকে ইহা তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়। লোহার বিশোষণ সমাপ্ত হতে 18 ঘন্টা সময় লাগে।

খাদ্যবস্তুতে লোহা ফেরিক (Fe^{++}+) অবস্থায় থাকলেও বিশোষণের পূর্বে এর কিয়দংশ ফেরাস আয়নে (Fe^{++}) পরিণত হয়। শেষোক্ত অবস্থায় লোহার বিশোষণ দ্রুততর হয়। কারো কারো মতে পাকস্থলীর HCl এবং পিত্তকণা (bile pigments) লোহার বিশোষণে সহায়তা করে। পাকস্থলীস্থ HCl খাদ্যবস্তু থেকে লোহার নিষ্কাষণ ও বিজারণে অংশগ্রহণ করে। ক্যাল্-সিয়াম ও ভিটামিন C লোহা-বিশোষণে সহায়তা করে। অপরপক্ষে অত্যধিক শ্লেষ্মা ও ক্ষারপদার্থের উপস্থিতি, পাকস্থলীর অম্লত্ব হ্রাস প্রভৃতি লোহার বিশোষণে বাধাদান করে।

3. **পরিবহন ঃ** রক্তে বিশোষিত হবার পর ফেরিক লোহা **ট্রান্স্‌ফারিন** নামক বিটা গ্লোবিউলিনের সংগে যুক্ত হয় এবং দেহের বিভিন্ন **কলাকোষে** পরিবাহিত হয়। প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে লোহার পরিমাণ 45-50 মিলি-গ্রাম। এর মধ্যে 92 থেকে 98 শতাংশ হিমোগ্লোবিনে দেখা যায়।

4. **সঞ্চয় :** লোহা প্রধানত যকৃৎ, অস্থিমজ্জা ও প্লীহায় সঞ্চিত থাকে। লোহিতকণিকার বিনাশ থেকে সাধারণভাবে যে লোহা নির্গত হয় তা প্রধানত এসব দেহাংগেই সঞ্চিত থাকে। এছাড়া অন্য যেসব স্থানে (9 নং তালিকা) লোহার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তা হল, (i) লোহিতকণিকার হিমোগ্লোবিন (ii) পেশীর মায়োগ্লোবিন, (iii) R-E কোষের ফেরিটিন এবং (iv) কোষমধ্যস্থ এন্‌জাইম সাইটোক্রোম ইত্যাদি। দেহে মোট লোহার পরিমাণ প্রায় 4 0-5·0 গ্রাম। এর মধ্যে ব্যবহার যোগ্য লোহা-সঞ্চয়ের পরিমাণ 1·1-1·5 গ্রাম।

9 নং তালিকা ঃ দেহে লোহার উপস্থিতি।

হিম যৌগ	লোহা (গ্রাম)	শতকরা
হিমোগ্লোবিন	3 0	60-70
মায়োগ্লোবিন	0·13	3-5
হিম এন্‌জাইম ঃ		
সাইটোক্রোম C	0 004	0·1
ক্যাটালেজ	0 004	0 1
ট্রান্‌সফারিন,	0 004	0·1
ফেরিটিন ইত্যাদি	0 4-0 8	1·5

5. **রেচন ঃ** লোহা দেহ থেকে খুব কম পরিমাণেই নির্গত হয়। মলমূত্র ও পিত্তরসের মাধ্যমে সামান্য পরিমাণ লোহা নির্গত হয়। বয়স্ক লোকের প্রস্রাবে গড়ে দৈনিক 0·2 মিলিগ্রাম লোহা নির্গত হয়।

6. **কার্যাবলী ঃ** লোহা দেহের অনেক শারীরবৃত্তীয় কার্যের সংগে জড়িত। নিম্নে সংক্ষেপে তাদের উল্লেখ করা হল ঃ (1) **অক্সিজেন পরিবহন ঃ** হিমোগ্লোবিনস্থিত লোহা রক্তপ্রবাহে অক্সিজেনের পরিবহনে সহায়তা করে। প্রতিগ্রাম লোহা প্রায় 1·34 মিলিলিটার অক্সিজেন পরিবহন করতে পারে। (2) **হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণ ঃ** লোহা হিমোগ্লোবিনের জৈব সংশ্লেষণে অপরিহার্য উপাদানবিশেষ। (3) **লোহিতকণিকার বৃদ্ধি ঃ** হিমোগ্লোবিনের জৈব সংশ্লেষণ ছাড়াও লোহিতকণিকার বৃদ্ধি ও পরিণতিতে অংশগ্রহণ করে।

(4) **কলাকোষের জারণ :** হিম এন্‌জাইম্‌ কোষের খাদ্যবস্তুর বিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। (5) **পেশীর অক্সিজেন সরবরাহ :** পেশীর লৌহযুক্ত প্রোটিন (মায়োগ্লোবিন) অক্সিজেনের সংগে যুক্ত হয়ে পেশীতে অক্সিজেন সঞ্চয় করে রাখে। (6) **স্নায়ুকোষের জারণ :** স্নায়ুকোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থানকারী **নিস্‌লকণা** লোহার সংগে যুক্ত থাকে এবং সম্ভবত স্নায়ুকোষের জৈব জারণে অংশগ্রহণ করে। (7) **নিউক্লিয়াসের জারণ :** কোষের নিউক্লিয়াসস্থিত ক্রোমাটিন পদার্থে লোহার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত ইহা নিউক্লিয়াসের জারণে সহায়তা করে।

ক্যাল্‌সিয়াম
CALCIUM

দেহে ক্যাল্‌সিয়ামের অভাবে রিকেট (শিশুদের ক্ষেত্রে), অস্টিওম্যালাসিয়া (বয়স্কদের ক্ষেত্রে), ধনুষ্টংকার প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্যারাথাইরোয়েড, অ্যাড্রেন্যালের বহিঃস্তর প্রভৃতির অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিজাত হরমোন এবং ভিটামিন D ক্যালসিয়ামের বিপাকক্রিয়াকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

1. **উৎস ও চাহিদা :** ডিম, দুধ, পনির (cheese), সবুজ শাক্‌সব্‌জী, খরজল ইত্যাদি ক্যাল্‌সিয়ামের প্রধান উৎস। মাছ মাংসেও সামান্য পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম পাওয়া যায়।

প্রতিদিন প্রায় 1-1·1 গ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। স্তন্যদানকালে এই চাহিদা দৈনিক 3 গ্রামের বেশী। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও শিশুদের ক্ষেত্রেও এই চাহিদা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী।

2. **বিশোষণ :** ক্ষুদ্রান্ত্রের ঊর্ধ্বাংশ থেকেই প্রধানত ক্যাল্‌সিয়াম বিশোষিত হয়। ক্যাল্‌সিয়ামের বিশোষণ কখনও সম্পূর্ণ হয় না, মাত্র 25 শতাংশ বিশোষিত হয়, অবশিষ্টাংশ বর্জিত হয়। বিশোষণের পূর্বে ক্যাল্‌সিয়ামকে দ্রবীভূত অজৈব ক্যাল্‌সিয়ামে পরিণত হতে হয় : অদ্রবণীয় ক্যাল্‌সিয়াম কখনও বিশোষিত হয় না। অধিক অম্লত্ব ক্যাল্‌সিয়াম বিশোষণের যথেষ্ট সহায়ক, কারণ অম্ল-মাধ্যমে ক্যাল্‌সিয়াম দ্রুত দ্রবীভূত হতে পারে। ক্ষারকীয় মাধ্যমে অদ্রবণীয় ক্যাল্‌সিয়াম লবণ উৎপন্ন হয় ফলে ক্যাল্‌সিয়ামের বিশোষণ ব্যাহত হয়।

পিত্তলবণ, ভিটামিন ডি, অধিক প্রোটিনজাত খাদ্য প্রভৃতি ক্যাল্‌সিয়ামের

বিশোষণ বৃদ্ধি করে। তবে খাদ্যে অধিক ফসফরাসের উপস্থিতিতে ক্যালসিয়ামের বিশোষণ ব্যাহত হয় (ক্যালসিয়াম ফসফেট উৎপাদনের জন্য)। এ ছাড়া বিভিন্ন উৎসজাত ক্যালসিয়াম বিভিন্ন হারে বিশোষিত হয়। যেমন, দুধের ক্যালসিয়াম দ্রুত বিশোষিত হয়, কিন্তু কোন কোন শাকসবজীজাত ক্যালসিয়াম কম পরিমাণে বিশোষিত হয়।

পোর্টালতন্ত্রের মাধ্যমেই ক্যালসিয়াম রক্তে প্রবেশকরে।

5. **পরিবহন :** রক্তপ্রবাহের মাধ্যমেই ক্যালসিয়াম পরিবাহিত হয়। ক্যালসিয়াম রক্তে দুভাবে অবস্থান করে : (1) ব্যাপনযোগ্য (diffusible) ও (2) ব্যাপনের অযোগ্য (nondiffusibe) হিসাবে। ব্যাপনযোগ্য ক্যালসিয়ামের একাংশ আয়নিত (প্রতি 100 মিলিলিটারে 4·8-6·3 মিলিগ্রাম হিসাবে) এবং অপর অংশ ফসফেট, বাইকার্বনেট, সাইট্রেট ইত্যাদি হিসাবে অবস্থান করে (প্রতি 100 মিলিলিটারে 0·23-0·5 মিলিগ্রাম)। 4·5 মিলিগ্রাম শতাংশ ক্যালসিয়াম প্রধানত অ্যালবুমিনের সংগে যুক্ত থাকে।

4. **সঞ্চয় :** দৈহিক ওজনের প্রায় 2 শতাংশ ক্যালসিযাম। এর মধ্যে 99 শতাংশ দ্বারা দেহাস্থি গঠিত। বাকী 1 শতাংশ পেশী, সিরাম, লোহিত-কণিকা, মস্তিষ্ক স্নায়ুরস প্রভৃতিতে ছড়িয়ে আছে (10 নং তালিকা)।

10 নং তালিকা : এক শতাংশ ক্যালসিয়ামের হিসাব।

দেহতরল বা কলাকোষ	মি গ্রা./100 মি. লি. বা 100 গ্রাম
সিরাম	9·6 – 11
মস্তিষ্কস্নায়ুরস	4·6—5
পেশী	70
স্নায়ু	15

4. **রেচন :** ক্যালসিয়াম প্রধানত মলমূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বর্জিত হয়। অবিশোষিত ক্যালসিয়ামের সবটুকুই মলের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। রক্তস্থিত ক্যালসিয়ামের একাংশও মলের মাধ্যমে নির্গত হয়। বিশোষিত ক্যালসিয়ামের প্রায় 150-200 মিলিগ্রাম প্রতিদিন মূত্রের সংগে নির্গত হয়।

6. **কার্যাবলী :** দেহের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে ক্যালসিয়াম যে সব কার্য সম্পাদন করে তা নিম্নরূপ : (1) দেহাস্থি ও দাঁতের প্রধান উপাদান

হিসাবে ক্যাল্‌সিয়াম কাজ করে, (2) রক্তের তঞ্চন-পদ্ধতির সংগে ইহা জড়িত, (3) পেশীসঞ্চালনের সংগে ইহা সম্পর্কযুক্ত, (5) ইহা স্নায়ুপেশীর উদ্দীপনা বজায় রাখে, (6) দুগ্ধ তঞ্চনে সহায়তা করে, (7) রক্তজালকের অন্তরাবরণীকলার ভেদ্যতা নিয়ন্ত্রণ করে (ক্যাল্‌সিয়ামের আধিক্য ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে এবং তার স্বল্পতা ভেদ্যতা হ্রাস ঘটায় এবং (8) বিভিন্ন এন্‌জাইমের (ডিহাইড্রোজেনেজ, লাইপেজ, ATP-এজ প্রভৃতি) সক্রিয়কারক হিসাবে কার্য করে।

ফসফরাস
PHOSPHORUS

ফসফরাসের অভাবে রিকেট ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ঘটে। ক্যালসিয়ামের মতই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি, ভিটামিন, তথা বৃক্ক ফস্‌ফরাসের বিপাকক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

1. **উৎস ও চাহিদা :** দুধ, পেশী, শাকসব্‌জী প্রভৃতি থেকে ফস্‌ফরাসকে অজৈব লবণ হিসাবে পাওয়া যায়। জৈব পদার্থ হিসাবে দুধের ফস্‌ফোপ্রোটিন, কোষনিউক্লিয়াসের নিউক্লিওপ্রোটিন, যকৃৎ, মস্তিষ্ক, ডিমের পীতাংশ ইত্যাদির ফস্‌ফোলিপিড এবং পেশীর ক্রিয়েটিন ফস্‌ফেট ও ATP-তে ফসফরাস পাওয়া যায়।

প্রতিদিন প্রায় এক গ্রাম ফস্‌ফরাস প্রয়োজন। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী স্ত্রীলোক তথা বাড়ন্ত শিশুর চাহিদা আরও একটু বেশী।

2. **বিশোষণ :** ফসফরাস ক্ষুদ্রান্ত্রের ঊর্ধ্বাংশ থেকে প্রধানত অজৈব ফসফেট হিসাবে বিশোষিত হয়। জৈব ফস্‌ফেট শোষণের পূর্বে অজৈব ফস্‌ফেটে রূপান্তরিত হয়। ক্যাল্‌সিয়ামের মত ফস্‌ফরাসের বিশোষণও অসম্পূর্ণ থাকে। মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ বিশোষিত হয়, বাকী এক-তৃতীয়াংশ মলের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। ক্যাল্‌সিয়াম, ক্ষুদ্রান্ত্রীয় অম্লতা, পিত্তলবণ ও স্নেহঅম্লের উপস্থিতি ফস্‌ফরাসের বিশোষণ বৃদ্ধি করে। তবে অধিক ক্যাল্‌সিয়াম, শস্যজাত ফাইটিক অ্যাসিড (phytic acid) বা ফাইটেট (Ca-Mg-phytate) প্রভৃতি ফস্‌ফরাসের বিশোষণে বাধা সৃষ্টি করে।

3. **পরিবহণ :** ফস্‌ফরাস রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। রক্তে ফস্‌ফরাস অজৈব ও জৈব ফস্‌ফেট হিসাবে অবস্থান করে। জৈব ফস্‌ফেটের একটা বিরাট অংশ লেসিথিন প্রভৃতি ফস্‌ফোলিপিড হিসাবে এবং ফস্‌ফরাসের এস্‌টার হিসাবে

লোহিতকণিকায় অবস্থান করে। রক্তে ক্যাল্‌সিয়াম ও অজৈব ফস্‌ফরাসের গড় অনুপাত 2 : 1। যে সব কারণ ক্যাল্‌সিয়ামের বৃদ্ধির জন্য দায়ী তারা ফস্‌ফরাসের হ্রাস ঘটায়। বিপরীতক্রমে ফস্‌ফরাসের বৃদ্ধিকারী কারণসমূহ রক্ত-ক্যাল্‌সিয়ামের হ্রাস ঘটায়। অর্থাৎ ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের গুণফল সবসময়ে সমান থাকে।

4. **সঞ্চয় :** দেহাস্থি, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতিতে ফস্‌ফরাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। জৈব ও অজৈব ফস্‌ফরাস হিসাবে প্রায় সবরকম কলাকোষেই এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রক্ত ও প্লাজমায় প্রায় সমান পরিমাণ ফস্‌ফরাস থাকে। বিভিন্ন কলাকোষে ফস্‌ফরাসের পরিমাণগত অবস্থা 11 নং তালিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। দেহের অভ্যন্তরে ফস্‌ফরাসের মোট ওজন দৈহিক ওজনের প্রায় 1·1 শতাংশ।

11নং তালিকা : কলাকোষে ফস্‌ফরাসের পরিমাণগত অবস্থা।

দেহতরল/কলাকোষ	মিলিগ্রাম/100 মি. লি. বা 100 গ্রাম
দেহাস্থি, দাঁত	2200
পেশী	360
	170-250
রক্ত	40
সিরাম : শিশু	4-7
বয়স্ক	3-4·5

5. **রেচন :** ফস্‌ফরাস প্রধানত মলমূত্রের মাধ্যমেই রেচিত হয়। মলের মাধ্যমে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং মূত্রের মাধ্যমে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ফস্‌ফরাস দেহ থেকে নির্গত হয়। অবিশোষিত ফস্‌ফরাসই মলের মাধ্যমে নির্গত হয়। মূত্রাস্থিত অজৈব ফস্‌ফরাস প্লাজমা তথা বৃক্ক দ্বারা আদ্রবিশ্লিষ্ট অজৈব ফস্‌ফরাসের যোগফলের সমান।

6. **কার্যাবলী :** ফস্‌ফরাস দেহের যে সব শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পন্ন করে নিম্নে তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল : (1) দেহাস্থি ও দাঁতের উপাদান হিসাবে ফস্‌ফরাস অপরিহার্য। (2) ক্রিয়েটিন ফস্‌ফেট এবং ATP ইত্যাদি যৌগ হিসাবে পেশীসংকোচনে অংশগ্রহণ করে, (3) কোষস্থিত নিউক্লিওপ্রোটিন ও

ফসফোলিপিডের উপাদান হিসাবে জৈবিক কার্যে সহায়তা করে। (4) স্নেহ-দ্রব্যের সংগে যুক্ত হতে তাদের বিশোষণ, পরিবহন ও বিপাকীয় কার্যে অংশগ্রহণ করে। (5) ফসফরাস-সংযুক্তির দ্বারা অন্ত্র থেকে শর্করার বিশোষণ, বৃক্ক থেকে পুনর্বিশোষণ এবং গ্লাইকোজেন ও গ্লুকোজের বিপাক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। (6) ফসফোলিপিডের (কেফালিন) উপাদান হিসাবে রক্তের তঞ্চনপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। (7) ভিটামিনের সংগে যুক্ত হয়ে কোএনজাইম হিসাবে বিপাকীয় কার্যে অংশগ্রহণ করে। (8) কলাকোষ, রক্ত ও মূত্রের H^+ আয়নের তীব্রতা নিয়ন্ত্রিত করতে সহায়তা করে। বাফার হিসাবে ইহা H^+ আয়নের তীব্রতা নিয়ন্ত্রিত করে।

সাল্‌ফার
Sulphur

1. **উৎস :** সালফারকে দেহে দুভাবে গ্রহণ করা হয় : (1) **অজৈব সালফার** হিসাবে এবং (2) **জৈব সালফার** হিসাবে। অজৈব সালফারের মধ্যে প্রধান সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সালফেট। জৈব সালফারের মধ্যে রয়েছে : (1) প্রোটিনসালফার—তরুণাস্থিপ্রোটিন (কনড্রোইটিন-সালফুরিক অ্যাসিড), মিউসিনপ্রোটিন (মিউকোইটিন-সাল-ফুরিক অ্যাসিড প্রভৃতি), (2) অ্যামাইনোঅ্যাসিডস্থিত সালফার (মিথিওনিন, সিসটাইন ইত্যাদি); (3) স্নায়ুকোষস্থিত সালফোলিপিড; (4) ভিটামিনস্থিত সালফার (থায়ামিন, বায়োটিন ইত্যাদি)।

2. **সঞ্চয় :** সালফার দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত থাকে। প্রধান প্রধান সঞ্চয়স্থান হল : (1) তরুণাস্থি, (2) চুল, নখ ইত্যাদি, (3) স্নায়ুকোষ, (4) লোহিতকণিকার হিমোগ্লোবিন, (5) ফসফাটেজ, লাইপেজ, রেনিন প্রভৃতি এনজাইম, (6) হরমোন ইনসুলিন, (7) হেপারিন, (8) মেলানিন-কণা, (9) মিউসিন (গ্লাইকোপ্রোটিন হিসাবে), (10) দেহকোষ (গ্লুটাথায়োন), (11) কো-এনজাইম-এ ইত্যাদি।

3. **বিপাক :** দেহে সালফারের বিপাকক্রিয়া দুভাবে সম্পন্ন হয়। খাদ্যের অজৈব সালফেট কখনও কলাপ্রোটিনের গঠনের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। অপরপক্ষে খাদ্যের জৈব সালফার কলাপ্রোটিনের গঠনের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যে সালফারযুক্ত অ্যামাইনোঅ্যাসিড দুধরনের কার্য সম্পন্ন

করে থাকে ঃ (1) কলাপ্রোটিনের গঠনের উপাদান হিসাবে যেমন এবা অংশগ্রহণ করে তেমনি বিভিন্ন ধরনের সাল্‌ফারজাত যৌগ উৎপন্ন করে, (ii) এজাতীয় অ্যামাইনোঅ্যাসিডের ক্যাটাবলিজমে যে সাল্‌ফার মুক্ত হয়, তা জারিত হয়ে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

4. **রেচন ঃ** নানাভাবে সাল্‌ফার দেহ থেকে নির্গত হয়। যেমন, (1) H_2S, মিউসিন ও রূপান্তরিত পিত্তলবণ হিসাবে ইহা মলের সংগে দেহ থেকে নির্গত হয়, (2) অজৈব সাল্‌ফেট এবং থায়োসায়ানেট (ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে) হিসাবে লালারসে নির্গত হয়, (3) মূত্রে অজৈব সাল্‌ফেট প্রশমিত সাল্‌ফার, ইথারিয়েল সাল্‌ফেট হিসাবে নির্গত হয়।

5, **কার্যাবলী ঃ** সাল্‌ফারের কার্যাবলীকে সাল্‌ফারযুক্ত যৌগপদার্থের কার্যাবলী হিসাবে বর্ণনা করা যায় ঃ ইহা (1) তরুণাস্থি, কেশ, নখ প্রভৃতির কাঠিন্যদানে সহায়তা করে, (2) দুধের তঞ্চনে (রেনিন এনজাইমের জন্য) অংশগ্রহণ করে, (3) রক্ততঞ্চনের বিরোধক হিসাবে (হেপারিনের জন্য) কাজ করে, (4) লাইপেজ, ফস্‌ফাটেজ প্রভৃতি এনজাইমের সক্রিয়মূলক (SH) হিসাবে রাসায়নিক কার্যে অংশগ্রহণ করে, (5) অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড মিথিওনিনের উপাদান হিসাবে অবস্থান করে, (6) পিত্তরসের টরোকোলিক অ্যাসিড সাল্‌ফারযুক্ত অ্যামাইনোঅ্যাসিড টরিন থেকে উৎপন্ন হয়, (7) সাল্‌ফার যুক্ত অ্যামাইনোঅ্যাসিড সিস্‌টাইন ব্রোমোবেন্‌জিনের (মার্‌ক্যাপ্‌টুরিক অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয়) নির্বিষণে ব্যবহৃত হয়, (8) অক্সিজেনের পরিবহন ও বিভিন্ন জৈব জারণে অংশগ্রহণ করে। হিমোগ্লোবিনের O_2 পরিবহনে, ইন্‌সুলিন, থায়ামিন, বায়োটিন, গ্লুটাথায়োন এবং কলাকোষের জৈব জারণে অংশগ্রহণ করে।

প্রোটিনের পুষ্টিমূল্য

Nutritional Value of Protein

প্রোটিনের পুষ্টিমূল্য প্রধানত দুটো জিনিসের ওপর নির্ভরশীল ঃ (1) প্রোটিনের লঘুপচ্যতা এবং (2) প্রোটিনের জৈবমূল্য।

1. **প্রোটিনের লঘুপচ্যতা** (Digestibility of Protein) ঃ কোন প্রোটিন খাদ্যের আহার্য নাইট্রোজেনের শতকরা যে অংশ দেহের মধ্যে বিশোষিত হয় তাকে সেই খাদ্য প্রোটিনের লঘুপচ্যতা বলা হয়। যেমন, কোন খাদ্য

প্রোটিনের 20 গ্রাম নাইট্রোজেনের 19 গ্রামই যদি দেহের মধ্যে বিশোষিত হয়, তবে তার লঘুপচ্যতা শতকরা ($\frac{19}{20}\times 100$) বা 95 ভাগ হবে।

দেখা গেছে, প্রাণীজাত প্রোটিনের লঘুপচ্যতা সবচেয়ে বেশী (90—100 শতাংশ, 12 নং তালিকা), এক্ষেত্রে 5 শতাংশ বা তার চেয়েও কম অংশ বিনষ্ট হয়। ফল, বাদাম প্রভৃতির মধ্যে যে প্রোটিন থাকে তাদের লঘুপচ্যতা কম হয়। অপরপক্ষে আলু, সীম, কড়াইশুঁটি, মটরশুঁটি প্রভৃতির মধ্যে যে প্রোটিন রয়েছে তাদের লঘুপচ্যতা বেশী হয় (80 শতাংশ)। গমের প্রোটিনের লঘুপচ্যতা প্রাণীজাত প্রোটিনের লঘুপচ্যতার সমতুল্য (90—100 শতাংশ)।

মাংসের লঘুপচ্যতা নির্ভর করে তার প্রোটিন তন্তুর কাঠিন্যের ওপর, অর্থাৎ যে সব প্রোটিনে অধিক পরিমাণে কোলাজেন ও ইলাস্টিন তন্তু বর্তমান থাকে, তাদের লঘুপচ্যতা খুব কম হয়। কোন কোন গরুর মাংসে প্রোটিন তন্তুর কাঠিন্য ও আধিক্য এত বেশী হয় যে তাদের পুষ্টিমূল্য সাদা ময়দার চেয়ে বেশী হয় না (52%)।

2. **প্রোটিনের জৈবমূল্য** (Biological Value of Protein) ঃ প্রোটিনের জৈবমূল্য নির্ভর করে তার মধ্যে কতটা **অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড** রয়েছে তার ওপর। যেসব প্রোটিন সবকটি অপরিহার্য অ্যামাইনো-অ্যাসিড সরবরাহ করতে পারে, তাদের **প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন** বলা হয়। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি এজাতীয় প্রোটিনের উদাহরণ। অপরপক্ষে যে সব প্রোটিন সবকটি অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড সরবরাহ করতে পারে না, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন বলা হয়। উদ্ভিজ্জাত প্রোটিন এই পর্যায়ে পড়ে।

প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনের জৈবমূল্য সবচেয়ে বেশী, কেননা তারা একাধারে প্রাণীর দেহবৃদ্ধি ও বয়স্কদের নাইট্রোজেন সাম্য ও দৈহিক ওজন বজায় রাখতে পারে। প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনকে তাই **সম্পূর্ণ প্রোটিন** বলা হয়। সম্পূর্ণ প্রোটিনের মধ্যে আবার দেহবৃদ্ধি ও নাইট্রোজেন সাম্য বজায় রাখার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রোটিন হল প্রকৃতিদত্ত প্রাণীজাত প্রোটিনসমূহ (12 নং তালিকা) যা ক্রমবর্ধমান শিশু ও ছেলেমেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে পুষ্টিকর। অপরপক্ষে যে সব প্রোটিন দেহবৃদ্ধি ও দেহের নাইট্রোজেন সাম্য বজায় রাখতে অপারগ তাদের **অসম্পূর্ণ প্রোটিন** বলা হয়। এক বা একাধিক অপরিহার্য অ্যামাইনো-অ্যাসিড এসব প্রোটিনে অনুপস্থিত থাকে।

নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে প্রোটিনের জৈবমূল্য নির্ণয় করা হয়।

$$\text{প্রোটিনের জৈবমূল্য} = \frac{\text{খাদ্যের অংগীভূত N}}{\text{খাদ্যের বিশোষিত N}} \times 100$$

উদাহরণস্বরূপ, একটা ডিমের প্রোটিনকে প্রতিদিন 30 মিলিগ্রাম প্রোটিন-নাইট্রোজেন হিসাবে খেতে দিলে, তার সবটুকুই যদি বিশোষিত হয় এবং মূত্রের সংগে একেবারেই নির্গত না হয়, তবে দেহের নাইট্রোজেন সাম্য 30 মিলিগ্রাম বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ডিমের জৈবমূল্য $\left(\frac{30}{30} \times 100\right)$ বা শতকরা 100। তেমনি মাংস প্রোটিনকে প্রতিদিন 132 মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন হিসাবে খেতে দিলে যদি তা সম্পূর্ণভাবে বিশোষিত হয় এবং নাইট্রোজেন-সাম্য 101 মিলিগ্রাম বৃদ্ধি পায়, তবে এক্ষেত্রে প্রোটিনের জৈবমূল্য দাঁড়াবে $\left(\frac{101}{130} \times 100\right)$ বা শতকরা 76 (প্রায়)। এই পদ্ধতির ব্যবহার করে কিছুসংখ্যক আহার্যসামগ্রীর যে জৈবমূল্য নির্ধারিত হয়েছে তা 12 নং তালিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

3, **অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিডের গুরুত্ব** (Importance of Essential Amino Acid): 20-টি অ্যামাইনোঅ্যাসিডের মধ্যে 8-টি অ্যামাইনোঅ্যাসিড মানুষের নাইট্রোজেন-সাম্য বজায় রাখতে পারে। তাদের দৈনিক চাহিদা ও সুপারিশকৃত চাহিদা 14 নং তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই 8-টি অ্যামাইনোঅ্যাসিড ছাড়া অপর যে 4টি অ্যামাইনোঅ্যাসিডকে (সিসটাইন, টাইরোসিন, আরজিনিন ও হিসটিডিন) অপরিহার্য অ্যামাইনো-অ্যাসিড হিসাবে গণ্য করা হয়, তাদের প্রধানত 4-টি অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে দেহের অভ্যন্তরে সংশ্লেষণ করা সম্ভবপর। যেমন সিটাইনকে মিথিওনিন সরবরাহ করতে পারে; টাইরোসিন ফেনাইল অ্যালানিন থেকে উৎপন্ন হতে পারে, আরজিনিন খুব সামান্য পরিমাণে দেহে সংশ্লেষিত হতে পারে (তবে তরুণ প্রাণীর খাদ্যে বাইরে থেকে সরবরাহ করতে হয়)।

প্রতিটি অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিডের অভাবে প্রাণীদেহে, বিশেষ করে ইঁদুরে যে উপসর্গ ও ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়, 14নং তালিকার ডানপাশে তা সন্নিবেশিত হয়েছে। ইঁদুরকে অসম্পূর্ণ প্রোটিন জেলাটিন (টাইরোসিন ও ট্রিপটোফ্যানের অভাব) খেতে দিয়ে দেখা গেছে, এই দুটো অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিডের অভাবে তার দেহবৃদ্ধি ও নাইট্রোজেনসাম্য ও দৈহিক

12 নং তালিকা : প্রোটিনের জৈবমূল্যের পর্যায়ক্রম।

ক্রম পর্যায়	প্রোটিন	উৎস	সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ	মন্তব্য
প্রথম	ল্যাকট্যালবুমিন	দুধ, পনির	সম্পূর্ণ	বৃদ্ধির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রোটিন : খাদ্যে এ জাতীয় প্রোটিনের 9-10% উপস্থিতি বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট।
	ওভোভাইটেলিন	মুরগীর ডিম	সম্পূর্ণ	
	ওভ্যালবুমিন	মুরগীর ডিম	সম্পূর্ণ	
দ্বিতীয়	অ্যালবুমিন, মায়োসিন	চর্বিহীন মাংস	সম্পূর্ণ	খাদ্যে অধিক পরিমাণে সরবরাহ করলে তবেই দেহবৃদ্ধি বজায় রাখে (18% উপস্থিতি)। 10%-12% নাইট্রোজেন সাম্য বজায় রাখে
	ক্যাসিন	দুধ	সম্পূর্ণ (সিস্টাইন স্বল্পতা)	
	গ্লুটেনিন	গম	সম্পূর্ণ	
	ওরাইজেনিন	চাল	সম্পূর্ণ	
	গ্লুটেলিন	ভুট্টা	সম্পূর্ণ	
	গ্লাইসিনিন	সয়াবিন	সম্পূর্ণ	
তৃতীয়	গ্লিয়াডিন	গম	অসম্পূর্ণ (লাইসিন অনুপস্থিত)	বৃদ্ধির অনুপযুক্ত, তবে নাইট্রোজেন সাম্য বজায় রাখতে সমর্থ
	লেগুমিন	মটর, মসুর মুগ, কলাই	অসম্পূর্ণ (সিসটাইন স্বল্পতা)	
	লেগুমেলিন	সয়াবিন	অসম্পূর্ণ	
	হোরডেইন	বার্লি	অসম্পূর্ণ	
চতুর্থ	জেইন	ভুট্টা	অসম্পূর্ণ (লাইসিন, ট্রিপটোফ্যান ঘাটতি, সামান্য সিসটাইন)	বৃদ্ধি বা নাইট্রোজেন-সাম্য বজায় রাখার অনুপযুক্ত
	জিলাটিন	জিলাটিন	অসম্পূর্ণ (ট্রিপটোফ্যান টাইরোসিন ঘাটতি, সামান্য সিসটাইন, অধিক লাইসিন)	

ওজন বজায় রাখা সম্ভবপর হয় না। **হোলড, রোজ** এবং তাদের সহকর্মীরা বয়স্ক মানুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিডের গুরুত্ব

13 নং তালিকা ঃ কিছুসংখ্যক প্রোটিনের জৈবমূল্য এবং লঘুপচ্যতা।

প্রোটিন	জৈবমূল্য	লঘুপচ্যতা
দুধ	85	100
ডিম	96	100
মাংস	76	96
গম	67	91
শস্য	60	95
সাদা ময়দা	52	10

লক্ষ্য করেছেন। দেখা গেছে, মিথিওনিন (সালফারযুক্ত অ্যামাইনোঅ্যাসিড) দেহের নাইট্রোজেন-সাম্য বজায় রাখে। লাইসিনযুক্ত খাদ্যগ্রহণে দেহের নাইট্রোজেন-সাম্য বজায় থাকে না (হিস্টিডিন ও আরজিনিনে থাকে)। ট্রিপটোফ্যানের অভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেহের নাইট্রোজেন-সাম্য হ্রাস পায়। তেমনি ভ্যালিন, থিওনিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, ফেনাইল-অ্যালানিন প্রভৃতি অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের অভাবে দেহের নাইট্রোজেনসাম্য বজায় রাখা সম্ভবপর নয়।

4, **অনপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিডের গুরুত্ব** (Importance of non-essential aminoacid) ঃ দেহের নাইট্রোজেন-সাম্য বজায় রাখতে 8টি অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড যথেষ্ট হলেও দেহে অনপরিহার্য অ্যামাইনো-অ্যাসিডের গুরুত্ব কম নয়। এরা অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে দেহে সংশ্লেষিত হয়। অতএব খাদ্যে এদের সরবরাহ কম হলে অপরিহার্য অ্যামাইনো-অ্যাসিডের চাহিদা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি সংশ্লেষণধর্মী বিক্রিয়া হ্রাস পায়।

5. **মিশ্রপ্রোটিনখাদ্য** (Mixed Protein Diet) **ঃ** কোন প্রোটিন জৈবমূল্য তার অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড-উপাদানের ওপর নির্ভর করে। খুব কম সংখ্যক দেশেই দেশের সবচেয়ে বৃহৎ অংশ বা জনসাধারণ অধিক পুষ্টিমূল্যসম্পন্ন প্রোটিনখাদ্য গ্রহণের সুযোগ পায়। 'সাধারণ মানুষ, প্রধানত চাল, গম, আলু,

14 নং তালিকা : মানুষের নাইট্রোজেনসাম্য বজায় রাখতে অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিডের দৈনিক চাহিদা এবং ইঁদুরে এদের অনুপস্থিতিজাত ত্রুটিবিচ্যুতি।

মনুষ			ইঁদুর (নির্দিষ্ট অ্যামাইনোঅ্যাসিড মুক্ত খাদ্যগ্রহণে উৎপন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি)	
অ্যামাইনো-অ্যাসিড (এল-শ্রেণীভুক্ত)	দৈনিক ন্যূনতম চাহিদা (গ্রাম)	দৈনিক সুপারিশকৃত চাহিদা (গ্রাম)	তরুণ ইঁদুর	বয়স্ক ইঁদুর
ট্রিপ্টোফ্যান (নিয়াসিনের উপস্থিতিতে পরিবর্তনযোগ্য	0 25	0·5	চোখের ছানি, ত্রুটিপূর্ণ দন্তোদ্গম, চুলপড়া, পাকস্থলীর আয়তনবৃদ্ধি	কর্নিয়ার রক্তজালিকার আধিক্য, লোম ওঠা শুক্রাশয়ের অবক্ষয় ইত্যাদি
ফেনাইল অ্যালানিন	1·10	2·2	? ?	? ?
লাইসিন	0·80	1·6	রক্তাল্পতা, সহসা মৃত্যু	রক্তাল্পতা, এস্ট্রাসিনবৃদ্ধি
থ্রিওনিন	0·50	1·0	শোথ	
ভ্যালিন	0 80	1·6	ত্রুটিপূর্ণ চলন	
মিথিওনিন	1·10	2·2	রক্তাল্পতা, রক্তপ্রোটিনের স্বল্পতা, লোম ওঠা, বৃক্কের রক্তক্ষরণ, যকৃৎ-কাঠিন্য, ফ্যাটি লিভার	রক্তাল্পতা, রক্তপ্রোটিনের স্বল্পতা, ফ্যাটি লিভার যকৃৎ-কাঠিন্য
লিউসিন	1·10	2·2	রক্তপ্রোটিনের স্বল্পতা	
আইসোলিউসিন	0·70	1 9	রক্তাল্পতা, রক্তপ্রোটিনের স্বল্পতা	

ভুট্টা, জোয়ার ডাল ইত্যাদির উপর জীবনধারণ করে। এদের কোনটিই দেহের সবকটি অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিডের যোগান দিতে পারে না। তবে মিশ্র খাদ্য হিসাবে এরা যে সব প্রোটিনের সরবরাহ করে সম্মিলিতভাবে তাদের পুষ্টিমূল্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। যেমন, ভুট্টা-প্রোটিন (ট্রিপ্‌ট্রোফ্যান ও লাইসিনের স্বল্পতা), শিম প্রোটিন (মিথিওনিন ও ট্রিপ্‌ট্রোফ্যানের স্বল্পতা) এবং তিল-প্রোটিনকে (লাইসিন ও ভ্যালিনের অভাব) যখন 40 : 30 : 30 : অনুপাতে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তখন তার পুষ্টিমূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

6. **প্রোটিনচাহিদার পরিমাপ** (Measurement of Protein Requirements) : নাইট্রোজেন-সাম্যের পরিমাপ করে দেহের ন্যূনতম প্রোটিন-চাহিদা নির্ণয় করা যায়। খাদ্যের গৃহীত নাইট্রোজেনের চেয়ে দেহ থেকে নির্গত নাইট্রোজেনের পরিমাণ, (a) বেশী হলে প্রাণী ঋণাত্মক নাইট্রোজেনসাম্যে, (b) কম হলে ধনাত্মক নাইট্রোজেনসাম্যে এবং (c) সমান হলে নাইট্রোজেনের সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে। কোন পরীক্ষাধীন প্রাণী বা মানুষকে প্রোটিনহীন
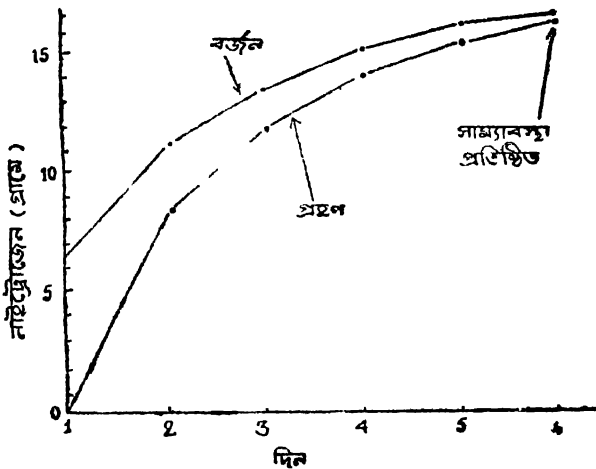
8-14 নং চিত্র : নাইট্রোজেন সাম্যের প্রতিষ্ঠা।

আহার্য গ্রহণ করতে দিলেও তার মলমূত্রে নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থের রেচন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় না, তবে যথেষ্ট পরিমাণে তা হ্রাস পায়। কুকুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, প্রোটিনহীন খাদ্যগ্রহণকালেও প্রতিদিন তার

দেহ থেকে প্রায় 6·5 গ্রাম নাইট্রোজেন৷ নির্গত হয় (8-18 নং চিত্র)। এক্ষেত্রে প্রাণী ঋণাত্মক নাইট্রোজেনসাম্যের সমপরিমাণ প্রোটিনখাদ্য ধীরে ধীরে সরবরাহ করলে প্রাণী পুনরায় নাইট্রোজেনের সাম্যাবস্থায় (প্রতিদিন 16·5 গ্রাম গ্রহণ ও রেচন) ফিরে আসে।

নাইট্রোজেনসাম্যকে নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় ঃ

$$N_B = N_I - (N_U + N_F)$$

যেখানে N_B = নাইট্রোজেনসাম্য, N_I = নাইট্রোজেন গ্রহণ, N_U = মূত্রে নির্গত নাইট্রোজেনের পরিমাণ এবং N_F = মলেব সংগে নির্গত নাইট্রোজেনের পরিমাণ।

সুষম খাদ্য
Balance Diet

যেসব খাদ্যবস্তু (a) দেহের ক্যালরিচাহিদার যোগান দিতে পারে, (b) কলাকোষের বৃদ্ধি ও গঠনমূলক কার্যকলাপ বজায় রাখতে পারে এবং (c) দেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তাকে **সুষম খাদ্য** (balance diet) বলা হয়। সুষম খাদ্যসামগ্রির যেসব উপাদান যথাযথ অনুপাতে স্থান পায় তাদের মধ্যে প্রধান ঃ (1) কার্বোহাইড্রেট, (2) প্রোটিন, (3) ফ্যাট, (4) ভিটামিন, (5) খনিজধাতু এবং (6) জল। খাদ্যে প্রথম তিনটি উপাদানই বেশী পরিমাণে থাকে এবং তারা দেহের ক্যালরি চাহিদা, দেহের বৃদ্ধি এবং কলাকোষেব গঠনমূলক কাজ বা মেরামতির সংগে যুক্ত। ভিটামিন, খনিজ ধাতু ও জল খাদ্যে দেহের চাহিদা অনুসারে কম পরিমাণে থাকে। শেষোক্ত খাদ্যউপাদান দেহের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সংগে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এছাড়া খনিজধাতু কলাকোষের কাঠামোতে প্রবেশ করে এবং দ্রবীভূত অবস্থায় অম্লক্ষারের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতেও সাহায্য করে।

প্রোটিনের চাহিদা
Protein Requirements

খাদ্যের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হল প্রোটিন। বিশেষত ক্রমবর্ধমান শিশুদেহে এর চাহিদা সবচেয়ে বেশী, কারণ প্রোটিন দেহকাঠামোর ভিত্তিস্বরূপ। দেহবৃদ্ধির সংগে জড়িত দেহের প্রোটিন প্রধানত খাদ্যপ্রোটিন থেকেই সংশ্লেষিত হয়। গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী স্ত্রীলোকের প্রোটিনচাহিদাও বেশী। বয়স্ক লোকের খাদ্যে প্রোটিনের প্রয়োজন দেখা দেয় প্রধানত 4টি কারণে ঃ (1)

দেহের নাইট্রোজেনসাম্য বজায় রাখা, (2) এনজাইম, হরমোন ও প্লাজমাপ্রোটিন প্রভৃতির সংশ্লেষণে প্রয়োজনীয় অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড সরবরাহ করা, (3) দেহের ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট কলাকোষের মেরামতি করা, (4) মারাত্মক রোগ ইত্যাদিতে স্বাস্থ্যহানিরপর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয় দেহপ্রোটিনের সংশ্লেষণ করা। এছাড়া দৈহিক যোগ্যতা ও রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগেও প্রোটিন গ্রহণের সম্পর্ক রয়েছে। ভারতের যেসব আদিবাসী খাদ্যে অধিক পরিমাণে প্রোটিন গ্রহণ করে সীমিত প্রোটিনগ্রহণকারী লোকের চেয়ে তারা অধিকতর সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর দেহগঠনের অধিকারী হয়।

দৈনিক চাহিদা : এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতভেদ দেখা দিলেও প্রতিদিন প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনে 1 গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন হয়। তবে দেহের নিরাপত্তার কারণে এই পরিমাণ আরো একটু বাড়ান হয় (70 কিলোগ্রাম লোকের জন্য 100 গ্রাম)। ক্রমবর্ধমান শিশুর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনে 3-4 গ্রাম, স্কুলের ছেলেমেয়ে, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে 2-3 গ্রাম হওয়া বাঞ্ছনীয়। খাদ্য-প্রোটিনের অর্ধাংশ প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন হওয়া চাই।

স্নেহদ্রব্যের চাহিদা
Fat Requirements

স্নেহদ্রব্য, ডি. ই. প্রভৃতি স্নেহদ্রবণীয় ভিটামিন, সুস্বাস্থ্যের উপযোগী কিছু সংখ্যক অপরিহার্য ফ্যাটিঅ্যাসিড (**লিনোলেইক, লিনোলেনিক, অ্যারাকিডোনিক**) সরবরাহ করে। গ্লিসারাইড খাদ্যের অপরিহার্য অংগ না হলেও, তারা খাদ্যের আস্বাদন বৃদ্ধি করে এবং দেহের মোট ক্যালরিচাহিদার 20-30 শতাংশ সরবরাহ করে। এছাড়া স্নেহজাতীয় খাদ্যের সুবিধে হল, ইহা অধিক সময় পর্যন্ত পৌষ্টিকনালীতে অবস্থান করে এবং পরিপাক ও বিশোষিত হতে কার্বোহাইড্রেটের চেয়ে অধিক সময় নেয়। অতএব অধিক কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্যগ্রহণে পাকস্থলী তাড়াতাড়ি খালি হয়, ক্ষিধে পায় এবং ক্লান্তি আসে। অধিক স্নেহদ্রব্যের গ্রহণে তুলনামূলকভাবে এসব পরিবর্তন কম হয়। পেশীসক্রিয়তায় জ্বালানি হিসাবে স্নেহদ্রব্যের যোগ্যতা কার্বহাইড্রেটের চেয়ে 10-12 শতাংশ কম।

শিশুখাদ্যে অধিক স্নেহদ্রব্যের সুপারিশ করা হয়েছে (ক্যালরিচাহিদার 30-35 শতাংশ)। বয়স্কদের খাদ্যে ক্যালরিচাহিদার 10-15 শতাংশ স্নেহদ্রব্য

থাকা উচিত। অবশ্য ক্যালরিশক্তির উৎস হিসাবে কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহদ্রব্য অনেকাংশে পরস্পরকে প্রতিস্থাপন করতে পারে।

কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা

Carbohydrate Requirements

প্রোটিন ও স্নেহদ্রব্যের সঠিক চাহিদা পূরণ হলে, দেহের অবশিষ্ট ক্যালরি-শক্তি কার্বোহাইড্রেট থেকে গ্রহণ করা হয়। খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। অবশ্য কার্বোহাইড্রেটের বাজারদর সবচেয়ে কম বলে খাদ্যে এর অনুপাত সবচেয়ে বেশী হয়। ভারত, বাংলাদেশ, চীন, পাকিস্থান প্রভৃতি দেশে ক্যালরিচাহিদার প্রায় 78 শতাংশ কার্বোহাইড্রেট থেকে আসে।

সুষমখাদ্যে প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য ও কার্বোহাইড্রেটের অনুপাত

Proportion of Carbohydrate, Fat and Protein in Balance Diet

একজন ভারতীয়ের সুষমখাদ্যে এই তিনটি প্রধান আহার্যসামগ্রীর গড় অনুপাত হওয়া উচিত নিম্নলিখিতভাবে :।

	গ্রাম	কিলোক্যালরি	মোট ক্যালরির শতাংশ
প্রোটিন	70	287	10
স্নেহদ্রব্য	70	651	23
কার্বোহাইড্রেট	65	1906	67

আহার্যসামগ্রীর নির্বাচন

Choice of Foodstuffs

সুষম খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের সঠিক অনুপাত নির্ণয়ের পর আহার্য-সামগ্রীকে নিম্নে 5 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, কারণ বিভিন্ন পরিবারের লোক-জনের বিভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যারা সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের খাদ্যে প্রোটিন ও প্রতিরোধকারী খাদ্যের প্রয়োজন বেশী, তাদের তাই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। যারা দৈহিক শ্রম করে, অর্থাৎ যারা শ্রমজীবি মানুষ তাদের ক্যালরিচাহিদা অধিক হয়; তাদের তাই চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর আহার্য বেশী প্রয়োজন হয়।

1. **প্রোটিন সরবরাহকারী খাদ্য:** প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন সরবরাহকারী খাদ্য হিসাবে দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য, ডিম, মাছ ও মাংসের নাম উল্লেখ করা চলে। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন যে সব খাদ্যবস্তুতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রধান ডাল, ছোলা, মটর, শিম, বাদাম, চীনাবাদাম, মাঠকলাই, তিল ইত্যাদি।

যারা শুধুমাত্র উদ্ভিদ-প্রোটিনের ওপর নির্ভর করে, তাদের একাধিক উদ্ভিদজাত প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত। তবে সামান্য পরিমাণে মাছ, ডিম, দুধ বা মাংস-প্রোটিনের উপস্থিতি উদ্ভিদ-প্রোটিনের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী হয়।

2. **প্রতিরোধকারী আহার্যসামগ্রী:** এজাতীয় আহার্যকে প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় স্থান দেওয়া উচিত, কারণ এরা ভিটামিন ও খনিজ **পদার্থ** সরবরাহ করে। এজাতীয় আহার্যকে তাই **প্রতিরোধকারী খাদ্য** (protective foodstuffs) বলা হয়।

(a) ভিটামিন সি-যুক্ত খাদ্য: আমড়া, পেয়ারা, কমলালেবু, আঙুর, আনারস, টম্যাটো, বাতাপি লেবু, কাজু বাদাম, কুল, বাঁধাকপি ও ফুলকপি।

(b) হলদে ফল ও শাকশব্জী: গাজর, কুমড়া, পেঁপে, আম ইত্যাদি।

(c) সবুজ শাকপাত: নটেশাক, স্পিন্যাক, মেথিপাতা, মুলোশাক, বাঁধাকপি ইত্যাদি।

3. **অন্যান্য শাকশব্জীজাত খাদ্য:** এজাতীয় খাদ্যও প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত, এদের পুষ্টি ও ক্যালরিমূল্য দুই-ই আছে। বেগুন, ঢেঁড়স, মটর, বরবটি, লাউ, শসা, পেঁয়াজ ইত্যাদি।

4. **ক্যালরি সরবরাহকারী আহার্য:** ক্যালরি ছাড়াও খাদ্যের প্রোটিনের অবশিষ্টাংশ এসব খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। চাল, গম, ভুট্টা, বাজরা, আলু, মিষ্টি আলু, খাম আলু ইত্যাদি।

5. **স্নেহদ্রব্য, গুড়, শর্করা ও মশলা ইত্যাদি:** এজাতীয় খাদ্যের পুষ্টিমূল্য খুব বেশী না হলেও এরা খাদ্যের আস্বাদন ও পরিতৃপ্তির সহায়ক। উদ্ভিজ্জ তৈল, বনস্পতি, ঘি, মাখন, চিনি, গুড়, মধু এবং নানাপ্রকার মশলা এজাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। ক্যালরিচাহিদার একাংশ এসব খাদ্য থেকে পাওয়া যায়।

খাদ্যতালিকার পরিকল্পনা
Planning of Diet Charts

খাদ্যতালিকার পরিকল্পনা করার পূর্বে ব্যক্তিবিশেষের সঠিক ইতিহাস জানা উচিত। অর্থাৎ ব্যক্তি শিশু, স্কুলের ছেলেমেয়ে, শ্রমজীবি, খেলোয়াড়, ব্যায়াম-

-বীর, রোগী, গর্ভবতী স্ত্রীলোক, অথবা স্তন্যদানকারী মা ইত্যাদি কি না ; কারণ বয়স, শ্রমের প্রকৃতি, নির্দিষ্ট রোগ (রক্তাল্পতা ইত্যাদি), স্ত্রীলোকের গর্ভকাল, স্তন্যদানকাল ইত্যাদির উপর খাদ্যতালিকার পরিকল্পনা নির্ভর করে।

ব্যক্তিবিশেষের সঠিক ইতিহাস জানার পর যে সব জিনিষের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং খাদ্যতালিকার পরিকল্পনামত তাদের নির্ধারণ করতে হবে, তাদের মধ্যে প্রধান : (1) ক্যালরিচাহিদার পরিমাপ, (2) প্রধান আহার্যসামগ্রী অর্থাৎ প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য ও কার্বোহাইড্রেটের অনুপাত নির্ণয়, (3) ভিটামিন ও খনিজ ধাতুর সঠিক উপস্থিতি, (4) আহার্যসামগ্রীর নির্বাচন, (5) প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন ও প্রতিরোধকারী খাদ্যবস্তুর সঠিক উপস্থিতি এবং (6) বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ আহার্যের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্তি।

1. **একজন বয়স্ক লোকের খাদ্যতালিকার পরিকল্পনা :**

প্রাথমিক তথ্য : বয়স—30 বৎসর, দৈহিক ওজন—60 কেজি, পেশাগত কাজ—বসে বসে লেখাপড়া বা হিসাব রাখা, শ্রমসাধ্য কাজ—প্রতিদিন ঘণ্টায় 3 মাইল ভ্রমণ।

(a) ক্যালরিচাহিদা (4 নং তালিকা দ্রষ্টব্য) = 2424 কিলোক্যালরি

(b) প্রোটিনের চাহিদা = 60 গ্রাম (246 কি. ক্যা)
স্নেহদ্রব্যের চাহিদা = 60 গ্রাম (558 কি. ক্যা.)
কার্বোহাইড্রেট = 405 গ্রাম (1660 কি. ক্যা.)
} 2424 কি. ক্যা.

(c) ভিটামিন ও খনিজ ধাতু :
ভিটামিন এ—3000 আই. ইউ., থায়ামিন—1·2 মি, গ্রা,
রাইবোফ্লেভিন—1·3 মি. গ্রা , ভিটামিন সি—50 মি. গ্রা.,
ক্যালসিয়াম—0·5 গ্রাম, লোহা —20 মি. গ্রা ,

(d) আহার্যসামগ্রীর নির্বাচন (প্রতিদিনের)

উপরিউক্ত চাহিদা তিনটি পূরণের জন্য খাদ্যতালিকায় যেসব খাদ্যসামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তার মধ্যে প্রধান : চাল (200 গ্রাম বা আটা (150 গ্রাম), ডাল (85 গ্রাম), সবুজ শাকপাত (110 গ্রাম), অন্যান্য শাকশবজী (100 গ্রাম), মাছ বা মাংস (80 গ্রাম), ডিম (একটা), ফল (80 গ্রাম), তেল, ঘি, মাখন, ইত্যাদি (30 গ্রাম), চিনি, গুড় ইত্যাদি (30 গ্রাম) ; টম্যাটো, লেবু ইত্যাদি।

এই খাদ্যতালিকায় প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন ও প্রতিরোধকারী আহার্যসামগ্রী **অন্তর্ভুক্ত** হয়েছে।

2. **একটি স্কুলের ছাত্রের খাদ্য :** 10 থেকে 15 বৎসর বয়স্ক ছেলে মেয়ের ক্যালরিচাহিদা প্রায় বয়স্ক লোকের মতই, তবে তাদের প্রোটিনের চাহিদা অনেক বেশী। প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের প্রায় 2·5 গ্রাম প্রোটিন তাদের খাদ্যতালিকায় প্রতিদিন অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। প্রতিরোধকারী খাদ্য ও প্রোটিন অধিক পরিমাণে থাকা প্রয়োজন।

খাদ্যতালিকার পরিকল্পনা ও আহার্যসামগ্রীর নির্বাচন পূর্বের মতই (প্রোটিন ছাড়া)।

3 **শিশুর খাদ্য :** 6 মাসের কম বয়স্ক শিশুর ক্যালরিচাহিদা প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনে প্রায় 120 কিলোক্যালরির সমান। 7 থেকে 12 মাসের শিশুর ক্ষেত্রে এই চাহিদা প্রতি কেজিতে 100 কিলোক্যালরি। দেহ-বৃদ্ধির জন্য এই বয়সে প্রোটিনের চাহিদা সবচেয়ে বেশী। শিশুর খাদ্যে প্রতিদিন প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনে 3·5 গ্রামের চেয়ে কম প্রোটিন কখনই থাকা উচিত নয়।

শিশুর খাদ্য প্রধানত দুধ হিসাবে সরবরাহ করা উচিত, কখনই পলিস্যাকারাইড কার্বোহাইড্রেটজাতীয় আহার্য না দেওয়া উচিত। ভিটামিন ডি ও অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজধাতু সঠিকভাবে সরবরাহ করা উচিত।

4. **গর্ভবতী স্ত্রীলোক বা স্তন্যদানকারী মায়ের খাদ্য :** গর্ভবতী স্ত্রীলোক বা স্তন্যদানকারী মায়ের ক্যালরিচাহিদা স্বাভাবিক চাহিদার চেয়ে 300 গ্রাম (গর্ভবতী) ও 700 গ্রাম (স্তন্যদানকারী) অধিক হওয়া প্রয়োজন। 45 কেজি ওজনসম্পন্ন স্ত্রীলোকের ক্যালোরিচাহিদা 1900 কিলোক্যালরি হলে গর্ভকাল ও স্তন্যদানকালে তাদের এই চাহিদা হবে যথাক্রমে 2200 এবং 2600 কিলোক্যালরি। এই সময়ে প্রোটিনের চাহিদাও বৃদ্ধি পায় (স্বাভাবিকের চেয়ে যথাক্রমে 10 এবং 20 গ্রাম বেশী)। অধিক পরিমাণে লোহা, ক্যালসিয়াম, নানাপ্রকার ভিটামিন খাদ্যতালিকায় সংযোজিত হওয়া উচিত।

অপুষ্টি
Malnutrition

ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রোটিন ও ক্যালরীর অভাব একটি জাতীয় সমস্যাবিশেষ।

অপুষ্টি দেশের অগ্রগতি ও বিকাশের বাধাস্বরূপ। কারণ, অপুষ্টি নিয়ে যে শিশু জন্ম নিল, সেই হবে একদিন দেশের নাগরিক, কিন্তু তার বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির বিকাশ হবে স্থায়ীভাবে বিপর্যস্ত। অনগ্রসর দরিদ্র দেশে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের অপুষ্টির ফলে ভ্রূণের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং গর্ভকালীন কম ওজনের যে শিশু জন্মগ্রহণ করে, রুগনো মায়েব স্তন থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ না পাওয়ায় তার অপুষ্টি আরো বৃদ্ধি পায়। ক্রমাগত এই অপুষ্টির প্রভাবে শিশুর মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশ স্থায়ীভাবে ব্যাহত হতে পারে।

প্রোটিনের অভাব থেকে শিশুদের শোথপ্রধান যে অপুষ্টি রোগ দেখা দেয় তাকে **কোয়াশিওরকর** (kowashiorkor) বলা হয়। শিশু বয়সের তুলনায় কম ওজনের হয়, ত্বক ও কেশ বিবর্ণ হয়ে ওঠে, ফেটে যায় এবং পোড়া দাগের মত দেখায়। পেশী শীর্ণ ও নিস্তেজ হয়ে ওঠে। খাবারের প্রতি অনিহা দেখা যায়। উদরাময় ও পেটের গোলমাল প্রায়ই লেগে থাকে।

প্রোটিন ও ক্যালারি এই দুয়ের অভাব দেখা দিলে **ম্যারাসমাস** (marasmus) অপুষ্টিরোগ দেখা দেয়। দেহ অতি শীর্ণ, অস্থিচর্মসার হয়ে ওঠে, স্ফীত হয়। এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশু প্রধানত এই অপুষ্টি শিকার হয়। ত্বক শীর্ণ ভাঁজসম্পন্ন ও অস্থিতিস্থাপক হয়ে ওঠে।

প্রোটিন ও ক্যালরির অভাবের সংগে খানজ ধাতু ও ভিটামিনের অভাব দেখা যায়। দেহের স্বাস্থ্য ও সংক্রমণব্যবস্থা ব্যাহত হয়। ফলে নানাপ্রকার সংক্রামক রোগ অধিক পরিমাণে আক্রমণ করে। হাম, ম্যালেরিয়া, উদরাময়, রক্তাল্পতা, রিকেট ইত্যাদি লক্ষণ দিখা দিতে পারে।

অনশনরত অবস্থায় বিপাকীয় পরিবর্তন

Metabolic Changes During Starvation

একই সংগে জল, লবণ ও খাদ্যের গ্রহণ না করাকে **পূর্ণ অনশন** বলা হয়। শুধুমাত্র জলের অভাবে প্রাণী সপ্তাহখানেক বেঁচে থাকতে পারে, লবণের অভাবে দুসপ্তাহ এবং খাদ্যাভাবে 3 থেকে 10 সপ্তাহ পর্যন্ত সে জীবিত থাকে। জীবিত থাকার মেয়াদ দেহের সঞ্চিত স্নেহপদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।

খাদ্য অনশনে দেহে নানাপ্রকার বিপাকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এজাতীয় পরিবর্তনের মধ্যে প্রধান : মৌল বিপাকীয় হার (basal metabolic

rate), দৈহিক উষ্ণতা, নাড়ীস্পন্দন এবং রক্তচাপ প্রভৃতি, এরা হ্রাস পায়, কিটোসিসের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং কিছু পরিমাণ লবণ ও জলকে ধরে রাখার ক্ষমতা জন্মে। মৃত্যুর আগে দৈহিক ওজন প্রায় 50 শতাংশ হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া দৈহিক উষ্ণতার হ্রাস ঘটে এবং অধিক নাইট্রোজেন রেচিত হয়। অনশনের প্রথম দিকে ক্ষুধার অনুভূতি থাকলেও পরে ধীরে ধীরে তার বিলোপ ঘটে এবং দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা দেখা দেয়।

অনশনকালে বিপাকীয় পরিবর্তন তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়। প্রথমাবস্থায় প্রাণী দেহের সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট (গ্লাইকোজেন) থেকে জৈবশক্তি উৎপন্ন করে। দ্বিতীয় পর্যায় সে তার দেহে সঞ্চিত স্নেহদ্রব্যকে ব্যবহার করে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রোটিনের ক্যাটাবলিজম শুরু হয় এবং নাইট্রোজেনবিহীন অংশ জারিত হয়ে জৈব শক্তি সরবরাহ করে, নাইট্রোজেনের রেচন বৃদ্ধি পায়। প্রথম পর্যায় দিন দুয়েক স্থায়ী হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থায়িত্ব প্রায় 2 সপ্তাহের উপর। এই সময়ে 80-90 শতাংশ শক্তি প্রধানত স্নেহদ্রব্যের জৈব জারণ থেকে উৎপন্ন হয়। বাকীটা আসে প্রোটিন থেকে। তৃতীয় পর্যায় প্রায় এক সপ্তাহ স্থিতিশীল হয় এবং ইহা প্রধানত প্রোটিনজাতীয় পদার্থের বিপাকের উপর নির্ভর করে।

1. **নাইট্রোজেন রেচন:** অনশনের প্রথম সপ্তাহে 6-10 গ্রাম নাইট্রোজেন দেহ থেকে নির্গত হয়। ইউরিয়ার রেচন প্রথম দিকে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও পরে তা হ্রাস পায়। অ্যামোনিয়া অধিক পরিমাণে রেচিত হয। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে নাইট্রোজেনের রেচন হ্রাস পায়। এই সময় দেহ নাইট্রোজেনকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। অনশনজনিত মৃত্যুর প্রায় আগের মুহূর্তে ইহা দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়।

2. **কার্বোহাইড্রেটের বিপাক:** অনশনের দিন দুয়েকের মধ্যে দেহে সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট নিঃশেষ হয়ে যায়। তবে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত রক্ত-শর্করা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় স্থিতিশীল থাকে। যকৃৎ প্রোটিন থেকে শর্করার সংশ্লেষণ (গ্লুকোনিওজেনেসিস) ঘটিয়ে রক্তের শর্করার মাত্রা বজায় রাখে।

3. **কিটোসিস:** কার্বোহাইড্রেটের সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে গেলে স্নেহদ্রব্যের বিপাক বৃদ্ধি পায় এবং বিটা-হাইড্রোক্সিবিউটিরিক অ্যাসিড এবং অ্যাসিটো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। সাকি (Succi) অনশনের শেষের দিকে

প্রায় 7-13 গ্রাম অ্যাসিটোন পদার্থ রেচন করতেন। অনশনরত স্ত্রীলোকের বেলায় এই পরিমাণ আরো বেশী হয়। **ফোলিন ও ডেনিস** (Folin and Denis) দেখেছেন অনশনের চতুর্থ দিনে স্ত্রীলোকের মূত্রে প্রায় 18 গ্রাম বিটা-হাইড্রোক্সিবিউটিরিক অ্যাসিড নির্গত হয়েছে।

4. **খনিজপদার্থের বিপাক :** অনশনের প্রথম দিকে ফসফরাস ও সাল্‌ফারের রেচন বৃদ্ধি পেলেও পরে তা হ্রাস পায়। অনশনের শেষের দিকে নাইট্রোজেন-ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন-সাল্‌ফারের অনুপাত যথক্রমে 5.3 : 1 এবং 1.4 : 1 দেখা যায়। ক্যালসিয়ামও অধিক পরিমাণে দেহ থেকে নির্গত হয়। অস্থিস্থিত ক্যাল্‌সিয়াম কার্বনেট হিসাবে (ক্যাল্‌সিয়াম ফসফেট হিসাবে নয়) দেহ থেকে বর্জিত হবার ফলেই এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ম্যাগ্‌নেসিয়ামের রেচন অনশনের প্রথম দিকে হ্রাস পায়। আহার্য হিসাবে খনিজ পদার্থের গ্রহণ সীমিত হয়ে পড়ার দরুণ এই পরিবর্তন আসে। শেষের দিকে রক্তে ও প্রস্রাবে পটাসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

কায়িকশ্রম, খাদ্যগ্রহণ ও দৈহিক ওজন

Physical Activity, Food Intake and Body weight

কায়িক শ্রমের প্রকৃতি খাদ্যগ্রহণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অস্বাভাবিক শক্তির ব্যয় হলে দেহের শক্তিভান্ডারে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে যেসব প্রাণীকে ছোট ছোট খাঁচায় রেখে তাদের নড়াচড়া বা কায়িক শ্রম করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয় তারা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ক্যালরি গ্রহণ করে, ফলে চর্বি সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলে। মূলত এভাবেই গবাদি পশু, শূকর, হাঁস প্রভৃতির দেহের চর্বি বৃদ্ধি করা হয়।

গবেষণাগারে খাদ্যগ্রহণ, দেহের ওজন ও কায়িক সক্রিয়তার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বয়স্ক ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর উপর পরীক্ষা চালান হয়। সীমাবদ্ধ কায়িকশ্রমে অভ্যস্ত খাঁচায় বসবাসকারী বয়স্ক ইঁদুরকে প্রতিদিন 20-30 মিনিট ধরে ট্রেডমিলে (treadmill) মাঝারি ধরণের ব্যায়াম করালে খাদ্যগ্রহণের অনুরূপ কোন বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না। বরং খাদ্যগ্রহণ লক্ষনীয়-ভাবে হ্রাস পায়, ফলে দৈহিক ওজনেরও হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। ব্যায়ামের সময়কে 1 ঘণ্টা থেকে 6 ঘণ্টার মধ্যে বৃদ্ধি করলে শক্তিব্যয়ের সংগে আনুপাতিক হারে খাদ্যগ্রহণও বৃদ্ধি পায় এবং দৈহিক ওজনও বজায় থাকে। ব্যায়ামের সময়কে

প্রতিদিন 6 ঘন্টার বেশী বৃদ্ধি করলে প্রাণীর দেহের ওজন হ্রাস পায়, খাদ্য গ্রহণ কমে যায় এবং চেহারা খারাপ হয়ে যায়। আবার অন্যভাবে দেখা গেছে যেসব ইঁদুর স্বেচ্ছায় বেশী খাবার গ্রহণ করে তাদের কায়িকশ্রম করার প্রবণতা হ্রাস পায়। কিন্তু মেদযুক্ত ইঁদুরকে কম ক্যালরিযুক্ত খাদ্যগ্রহণে সীমাবদ্ধ রাখলে তাদের স্বতস্ফূর্ত সক্রিয়তা দেহের ওজনহ্রাসের সংগে বৃদ্ধি পায়। অতএব দেখা যাচ্ছে সামান্য বা অত্যধিক শ্রমসাধ্য কাজের সংগে খাদ্যগ্রহণ সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়। মেয়ার (Mayer) অন্যান্য আরো পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন স্বাভাবিক দৈহিক ওজন দুভাবে বজায় রাখা যায়ঃ কায়িক শ্রমে নিষ্ক্রিয় থাকা কিন্তু প্রায়ই উপোস করা অথবা বিশেষভাবে কায়িক শ্রম করা এবং ইচ্ছে মত খাদ্যগহণ করা।

মেদবাহুল্য

Obesity

ক্যালরি গ্রহণের চেয়ে ক্যালরি ব্যয় কম হলে অতিরিক্ত শক্তি চর্বিকলা হিসাবে দেহে সঞ্চিত হয়। এই অবস্থাকে বেশ কিছুদিন চলতে দিলে ব্যক্তি-বিশেষে মেদবাহুল্য লক্ষনীয় ভাবে প্রকাশ প য়।

গ্রীন (Greene) 200-রও বেশী মেদবহুল বয়স্ক রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, হঠাৎ কায়িক সক্রিয়তা হ্রাসই মেদবৃদ্ধির প্রধান কারণ। মেয়ার ও তাব সহকর্মীরা ভারতেব কলকারখানায প্রভৃতিতে বিভিন্ন কায়িক শ্রমে নিয়োজিত শ্রমিকের উপর পরীক্ষা করেছেন। এদের মধ্যে দর্জি থেকে শুরু করে কেরানী ভারী মুটে বাহক প্রভৃতি আছে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আহার্য মোটামুটি এক এবং প্রতিটি গ্রুপের মধ্যে এবং গ্রুপগুলোর মধ্যে পার্থক্য খুব কম। এই অনুশীলন থেকে জানা গেছে বসে বসে যারা কাজ করে তারা ক্যালরি বেশী গ্রহণ করে ও মোটা হয়। হালকা কাজে নিয়োজিত শ্রমিকেরা তুলনামূলক ভাবে কম ক্যালরি গ্রহণ করে, ফলে তাদের দৈহিক ওজনও কম হয়। যেসব শ্রমিকেরা মাঝারি ভারী বা অতিভারী কাজে নিয়োজিত থাকে তারা বেশী ক্যালরি গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের দৈহিক ওজন অপরিবর্তিত থাকে। এই অনুশীলন থেকে বোঝা যায় যারা বসে বসে কাজ করে তারা দৈহিক চাহিদার চেয়ে বেশী ক্যালরি গ্রহণ করে। ফলে তাদের দেহ মেদবহুল হয়ে পড়ে। অধিকতর কায়িক নিষ্ক্রিয়তা যে মেদবাহুল্যের কারণ তা 160 টি মোটা বা মেদযুক্ত ছেলেমেয়েদের উপর পরীক্ষা করে ব্রুকও (Bruch) তার সপক্ষে প্রমাণ পেয়েছেন। অবসর সময়ে এসব ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি বা এজাতীয় খেলাধুলা কম করে। জানা গেছে, এসব ক্ষেত্রে ক্ষুধাকেন্দ্র তার শক্তিব্যয়ের স্তরকে সঠিক চাহিদার তুলনায় বেশ উপরে উন্নীত করে। অতএব মেদবাহুল্য কমানোর জন্য ছেলেমেয়েদের এমন কি বয়স্কদেরও নিয়মিত

কায়িক শ্রমের প্রয়োজন। কাজের তীব্রতার চেয়ে কাজের পরিমাণই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

কৃশতনু পাওয়ার খাদ্য

Slimming Diets

দেহকে কৃশকে করে তুলার জন্য বা মেদবৃদ্ধিকে হ্রাস করার জন্য বহুবিধ খাদ্যের কথা বলা আছে, তবে তাদের অধিকাংশই অশারীরবৃত্তীয় এবং দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক। খুব তাড়াহুড়ো করে দেহকে কৃশ করা যায় না। মেদবৃদ্ধিকে হ্রাস করাব জন্য যেসব প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয় তা কার্যকরী হতে এবং ফল পেতে প্রভূত সময়ের প্রয়োজন। খাদ্য বা আহার্য সামগ্রীকে খুব সতর্কতার সংগে পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রতিদিন খাদ্যতালিকা থেকে কয়েকশ ক্যালরি যাতে বাদপড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ চিনির বদলে কৃত্রিম মিষ্টিদ্রব্য ব্যবহার করা এবং সম্পূর্ণ দুধের বদলে সর তোলা দুধ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা। এছাড়া প্রতিদিন 2 কিলোমিটার ($1^1/_4$ মাইল) হিসাবে ভ্রমণ 100 কিলোক্যালরি খরচ বাড়িয়ে দেয়, এর ফলাফল হল প্রতিদিন 200 কিলোক্যালরির সমান ফ্যাটি টিসু বা চর্বিকলার হ্রাস। একমাস পরে দেখা যাবে দেহ আগের চেয়ে দেহ প্রায় 6000 কিলোক্যালরি কম সঞ্চয় করছে যা 1 কেজি চর্বিকলার সমান। একবছর পরে দৈহিক ওজন প্রায় 12 কেজি হ্রাস পাবে।

দেহকে কৃশ করার জন্য যেসব খাদ্য ব্যবহার করা হয় তাতে হঠাৎ দৈহিক ওজনের হ্রাস ঘটে, এরপর অবশ্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। দেহের হঠাৎ ওজনহ্রাসের কারণ সম্ভবত দেহ থেকে জলের হ্রাসপ্রাপ্তি, যা পরবর্তী সময়ে পুনরায় দেহ সংগ্রহ করে নিতে পারে। ক্যালরি কমিয়ে দেওয়ার দুএকদিনের মধ্যে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ক্যালরিচাহিদা মেটাবার জন্য সচল হয়ে ওঠে। যেহেতু প্রতিগ্রাম গ্লাইকোজেনের সঞ্চয়ের সংগে প্রায় 3 গ্রাম জল সঞ্চিত হয় সেহেতু গ্লাইকোজেনের ব্যবহারের সময় জলও মুক্ত হয় এবং দেহ থেকে নির্গত হয়, একে হঠাৎ দৈহিক ওজন হ্রাসের কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়। এই ঘটনাকেই মাত্র এতদিনে এত কেজি ওজন কমান ইত্যাদিজাতীয় প্রচারে ব্যবহার করা হয়। যথাযথভাবে খাবার গ্রহণ করতে দিলে গ্লাইকোজেন সঞ্চয় আবার দ্রুত ফিরে আসে এবং প্রয়োজনীয় জলও একই সংগে সঞ্চিত হয়।

দেহকে কৃশ করার জন্য যেসব খাদ্য ব্যবহার করা হয় তার থেকে কার্বোহাইড্রেটকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া ভুল, কারণ পেশী ও স্নায়ুর বিপাকক্রিয়ার কার্বোহাইড্রেট অত্যাবশ্যক বিশেষত যারা কায়িক শ্রম করে বা সক্রিয় থাকে।

ব্যায়ামবিদের খাদ্য
Athlets Diet

অ্যাথলীট বা ব্যায়ামবিদের তালিকায় খেলোয়াড়দেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় প্রধানত যারা প্রতিদিন পরিমিত শক্তি ব্যয় করে এবং বিশেষ করে যেসব খেলার সংগে স্বল্প স্থায়িত্বের উচ্চতর যান্ত্রিক বা কলাকৌশলের ঘটনা জড়িত। ইভেন্টের বা যেসব ভারী অ্যাথলীটিক শ্রমসাধ্য ব্যায়ামের স্থায়িত্ব 1 ঘণ্টারও কম তাদের সম্পাদনের জন্য দেহে সঞ্চিত জ্বালানিই (energy fuel) যথেষ্ট। এই অবস্থায় খাদ্য বা আহার্যবস্তুর গুরুত্ব কম। খাদ্যের পরিপাকের সময় যেহেতু পেশী থেকে পরিপাকতন্ত্রে রক্তের পুনর্বিন্যাস ঘটে সেহেতু খাদ্যগ্রহণের পরই ব্যায়াম করলে পরিপাকতন্ত্র ও পেশীর মধ্যে রক্তের বণ্টন বা রক্তসরবরাহ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। অতএব ভারি ভোজনের পরই শ্রমসাধ্য ব্যায়াম করা অনুচিত। নিয়মানুসারে ব্যায়াম শুরুর $2\frac{1}{2}$ ঘণ্টার পূর্বে খাওয়া উচিত নয়। আবার কোন ব্যায়ামের পূর্বে $2\frac{1}{2}$ ঘণ্টার পূর্বে যেসব খাবার নেওয়া উচিত তাও হালকা ধরনের হওয়া উচিত। আবার কোন কোন খাদ্য তার পক্ষে সহ্য হবে তাও ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে খাদ্যের উপাদান হিসাবে ঠিক করা উচিত। ব্যায়াম শুরু হওয়ার পূর্বে অত্যধিক পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ আদৌ উচিত নয় কারণ ক্রিসটেনসেন (Christensen) এবং হ্যানসেন (Hansen) দেখেছেন শ্রমসাধ্য পেশীক্রিয়া শুরু হওয়ার কয়েকঘণ্টা আগে প্রচুর পরিমাণে শর্করাজাতীয় খাদ্য খেতে দিলে কাজ করার ক্ষমতা ভয়ানকভাবে হ্রাস পায়।

যেসব ব্যায়াম বা শ্রমসাধ্য কাজে বহুসংখ্যক পেশীগ্রুপকে এক ঘণ্টা বা তারও বেশী সময় ধরে কাজ করতে হয় সেসব ক্ষেত্রে ব্যায়াম বা শ্রমসাধ্য কাজ শুরু করার অন্তত একদিন আগে প্রতিযোগীর বেশী পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করা উচিত যাতে তার গ্লাইকোজেন ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হতে পারে। নির্দিষ্ট সূচীবদ্ধ ব্যায়াম শুরু হওয়ার পূর্বে তার এমন কোন ভারিশ্রম করা উচিত নয় যাতে তার গ্লাইকোজেন সঞ্চয় ব্যাহত হয় বা হ্রাস পায়। অপরপক্ষে, অত্যধিক কার্বোহাইড্রেট খাদ্যও সবসময় খাওয়া উচিত নয়। কারণ এরফলে বিপাকীয় প্রক্রিয়াসমূহ মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডকে (FFA) জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার না করে অধিক কার্বোহাইড্রেটকে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। তবে কোন ব্যায়াম বা পেশীকার্যের স্থায়িত্ব খুব বেশী হলে উষ্ণীভবন বা ওয়ার্ম-আপের (warm-up) পূর্বে মাঝারি পরিমাণ শর্করাগ্রহণ সুবিধাজনক, বিশেষ করে লেবুর রস মেশানো গ্লুকোজের দ্রবণ।

খেলা বা ব্যায়াম শুরু হবার আগের দিন এবং যেদিন খেলা শুরু হচ্ছে সেদিন, এই দুটো দিন বাদ দিয়ে ব্যায়ামবিদ বা প্রতিযোগীদের নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। প্রতিযোগীর ক্যালরি খরচ বৃদ্ধির সংগে সংগে খাদ্যগ্রহণের প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে, ফলে সে বেশী খাদ্য গ্রহণ করবে। সুষম খাদ্য সরবরাহ করা হলে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ ধাতুর চাহিদা পূরণ হবে। দেখা গেছে, খাদ্যে প্রতিদিন 4 গ্রাম প্রোটিন কম খেতে দিলেও যেমন 10 দিন ব্যাপী কায়িক শ্রমসম্পাদনের ক্ষমতার কোন পরিবর্তন দেখা যায় না তেমনি প্রতিদিন 160 গ্রাম প্রোটিন খাদ্যে বৃদ্ধি করলেও শ্রমসম্পাদনের ক্ষমতার কোনরূপ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না। যেসব অবস্থায় বেশী প্রোটিন সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তা হল: পেশীর-ট্রেনীং বা পেশী গড়ে তুলার সময়, অসুস্থ অবস্থা থেকে নিরাময়ের সময় এবং দেহ বৃদ্ধির সময়। এছাড়া অন্য সময় দামীখাদ্য থেকে প্রোটিন সংগ্রহ করার কোন মানে হয় না। মাছ, মাংস ও দুধে প্রোটিন ও সব অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। ক্রীড়াবিদ বা ব্যায়ামবিদদের ক্ষেত্রেও প্রতিদিন প্রতিকেজি দৈহিক ওজনে 1 গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ভিটামিনের অভাব কর্মদক্ষতা বা শ্রম সম্পাদনের ক্ষমতা হ্রাস করে থাকে। তবে ভিটামিনের অভাব দেখা দিতে দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন হয়। তবে ভিটামিন সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলে অতিরিক্ত ভিটামিন খাদ্যে বৃদ্ধি করলে শ্রমক্ষমতার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। বেশী ভিটামিন গ্রহণ করলে শুধু মূত্রেই তার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কোন কার্যকর উদ্দেশ্য সাধন করে না।

প্রশ্নাবলী

1. মৌলবিপাকীয় হার বলতে কী বোঝায়? মানুষের মৌলবিপাকীয় হার নির্ণয়ে যে যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তার বর্ণনা দাও। মৌলবিপাকীয় হার কী কী কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়? (C. U. '66, '69, '76, 84, 86)

2. মৌলবিপাকীয় হার বলতে কি বোঝায়? মানুষে মৌলবিপাকীয় হার পরিমাপের সার্থকতা কোথায় আলোচনা কর এবং কি কি কারণের দ্বারা ইহা প্রভাবিত হয় তার উল্লেখ কর।

3. বেনেডিক্ট রথ যন্ত্রের সাহায্যে মৌলবিপাকীয় হার নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর। (C U. '81)

4. মানুষের ক্যালরিচাহিদার হিসাব কিভাবে করবে বুঝিয়ে দাও।

5. দুধের উপাদানসমূহের বর্ণনা দাও। গোদুগ্ধের মাতৃদুগ্ধান্তরিতকরণ বলতে কী বোঝায়? (C. U. '72, '81)

6. নিম্নলিখিত আহার্যসামগ্রীর উপাদান ও পুষ্টিমূল্য সম্বন্ধে আলোচনা কর:
(a) গো-দুগ্ধ, (b) গম ও চাল, (c) ডিম, (d) মাছ ও মাংস। (C. U. '67

7 নৈশদর্শন ও শিশুদের রিকেট প্রতিরোধের জন্য কোন্ কোন্ ভিটামিনের প্রয়োজন? দেহে এদের প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর উল্লেখ কর। (C. U. '74)

8. স্নেহদ্রবণীয় ভিটামিন কোন্গুলোকে বলা হয়। তাদের যে কোন একটির কার্যাবলী সংক্ষেপে বল। (C. U. H. '72)

9. জলে দ্রবণীয় ভিটামিন কোন্গুলোকে বলা হয়? দেহে থায়ামিন ও নিয়াসিনের প্রধান কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। (C. U. '73)

10. থায়ামিনের অভাবজনিত লক্ষণগুলো বর্ণনা কর। কোন্ কোন্ খাদ্যে থায়ামিনের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়? (C. U. H '02)

11. বিভিন্ন বি-ভিটামিনের উল্লেখ কর এবং ভিটামিন B_{12}-এর কার্যাবলী বিবৃত কর। (C' U. '70)

12. এমন একটি ভিটামিনের উল্লেখ করা যার মধ্যে খনিজ ধাতু রয়েছে। ভিটামিনটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

13. ভিটামিন কাকে বলে? মানুষে ভিটামিন C-এর উৎস, কার্যাবলী ও দৈনিক চাহিদার বর্ণনা দাও। (C. U. '95)

14. রিকেট প্রতিরোধকারী ভিটামিনের উৎস, রাসায়নিক প্রকৃতি এবং শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C U. H. '77)

15. সায়ানোকোবালামিনের প্রধান উৎস কি এবং কিভাবে এটি লোহিতকণিকার উৎপাদনে সাহায্য করে?

16. ভিটামিন সি ও ফসফরাসের উৎস ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। (C. U. '86)

17. (a) একজন ভারতীয় কলেজের ছাত্রীর বয়স 21 বৎসর, দেহের ওজন 45 কেজি, মৌল বিপাকীয় হার 31·6 কিলোক্যালরি / বর্গমিটার / ঘণ্টা এবং দেহতলের ক্ষেত্রফল 140 বর্গমিটার। তার দৈহিক ক্যালরিচাহিদা নির্ণয় কর।

(b) ভিটামিন A-এর কার্যাবলী আলোচনা কর।

(c) প্রোটিনের জৈব মূল্য বলতে কি বোঝায়? (C. U. 85)

18. দেহে লোহার বিশোষণ ও ব্যবহারের উপর প্রভাববিস্তারকারী কারণসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা কর। মানুষে লোহার অভাবজনিত লক্ষণাবলী কি কি? (C. U. 76)

19. দেহে লোহা কীভাবে বিশোষিত ও ব্যবহৃত হয় আলোচনা কর। (C. U. 76)

20. দেহে কিভাবে লোহা বিশোষিত, পরিবাহিত ও সঞ্চিত হয়? লোহার শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। (C. U. H. 81)

21. আহার্যসামগ্রীতে ক্যালসিয়াম ও লোহার সাধারণ উৎস কী? এদের অভাবে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তাদের সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C U. 65)

22. মানুষের রক্তে ক্যালসিয়ামের স্বাভাবিক মাত্রা কি রকম? দেহে এর ভূমিকার উল্লেখ কর। (C. U. 63)

23. দেহে ক্যালসিয়াম কীভাবে বিশোষিত ও ব্যবহৃত হয় আলোচনা কর। (C U. 68)

24. দেহে ফসফরাসের বিশোষণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে যা জান লিখ।

25 দুধে কোন অজৈব মৌলিক পদার্থের অভাব আছে? আমাদের খাদ্যে ফসফরাসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। (C U. 81)

26 অনশনরত অবস্থায় দেহে যে সব বিপাকীয় পরিবর্তন সম্পন্ন হয় তার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

27 হালকা ধরনের কায়িক শ্রমে নিয়োজিত একজন ভারতীয় বয়স্ক পুরুষের খাদ্যপরিকল্পনা কিভাবে করবে তার মূলনীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। এমন একটি খাদ্যতালিকার পরিকল্পনা কর যার মধ্যে প্রতিরোধকারী খাদ্যসামগ্রী স্থান পায়। (C U '66)

28. প্রোটিনের জৈবমূল্য বলতে কি বোঝায়? চাল, গম, মাছ ও দুধে গড়ে শতকরা কী পরিমাণ প্রোটিন থাকে, তার উল্লেখ কর। 12 বৎসর বয়স্ক একটি বাঙ্গালী বালকের সুষম খাদ্য তালিকার পরিকল্পনা কর। (C. U '75)

29 খাদ্যব্যবস্থার মূলনীতির উল্লেখসহ 8 ঘণ্টা কায়িক শ্রমে নিয়োজিত এমন একজন শ্রমিকের খাদ্য তালিকার পরিকল্পনা কর। (C U H. '76)

30. স্তন্যদানকারী বা ক্রমবর্ধমান শিশু এবং বয়স্ক শ্রমিকের প্রোটিন চাহিদা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C. U. H. '74)

31. টীকা লিখ:

(a) প্রোটিনের জৈবমূল্য ('70), (b) অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড ('63, '68, '70, 78), (c) দুধের উপাদান ('70), (d) মৌলবিপাক ('62), (e) আর. কিউ, (62, 68), (f) প্রাণীদেহে বস্তু ও শক্তির বিনিময়, (g) খাদ্যবস্তুর আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়া (81) (h) সুষম খাদ্য ('78), (i) আহার্য সামগ্রীর নির্বাচন, (j) অপুষ্টি ('83,) (k) একজন কলেজের ছাত্রের বা ছাত্রীর পুষ্টিচাহিদা ('76), (l) স্নেহদ্রবণীয় ভিটামিন ('63), (m) সায়ানোকোবালামিন ('65)।

32 সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

(a) 50 গ্রাম চালের ক্যালরিমূল্য নির্ণয় কর (চালে কার্বোহাইড্রেট 78 2 গ্রাম% ; প্রোটিন 6 8 গ্রাম % এবং ফ্যাট 0 5 গ্রাম%) (C. U. 86)

(b) এক ব্যক্তি কোন একদিন 150 গ্রাম চাল ও 25 গ্রাম মসুর ডাল খায়। তার সেদিনকার খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ নির্ধারণ কর (চাল ও মসুরডালে কার্বোহাইড্রেটের শতকরা পরিমাণ 78 2 গ্রাম ও 59 গ্রাম)। (C U. '85)

(c) পারনিসিয়াস রক্তাল্পতা রোধ করতে কোন ভিটামিনের প্রয়োজন। (C, U. '84)

(d) ডাল ও মাছে প্রোটিনের শতকরা পরিমাণ উল্লেখ কর। (C. U. '84)

(e) যে সব ভিটামিনের অভাবে বেরিবেরি, পেলাগ্রা ও স্কার্ভি ও রিকেট হয় তার নাম উল্লেখ কর। (C, U. '84)

নয়

মানুষের রক্ত

HUMAN BLOOD
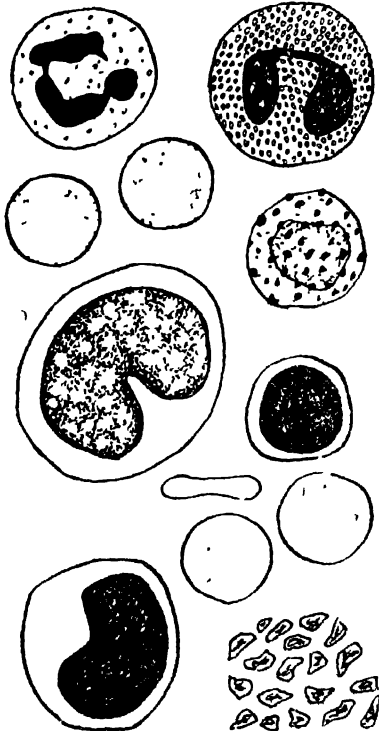
রক্তকে এক বিশেষ ধরনের সংযোগী কলা হিসাবে গণ্য করা হয়। এই কলার মুক্ত কোষসমষ্টি (রক্ত-কণিকা) আন্তরকোষীয় বিশেষ তরলে (প্লাজমায়) অবলম্বনে থাকে। প্রজননগত ও গঠনগত ভাবেও এটি সংযোগী কলার সংগে সম্পর্কযুক্ত। জালকাকৃতি সংযোগী কলায় রক্ত-কণিকা উৎপন্ন হয় এবং পরিণত অবস্থায় রক্তসংবহনে প্রবেশ করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীতে সব রক্তকোষই খাঁটি কোষ নয়। এদের তাই **সাকার উপাদান** বা **ফর্মড এলিমেণ্ট** (formed element) নামে অভিহিত করা হয়। সাকার উপাদান বলতে লোহিতকণিকা, শ্বেতকণিকা ও অণু-চক্রিকাকে বুঝায়।

রক্ত জটিলতর তরল হিসাবে রক্ত-

9-2নং চিত্র : মানুষের রক্তের অনুশীলনের বিভিন্ন পদ্ধতি।

নালীতে অবস্থান করে এবং হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা রক্তনালীর মধ্য দিয়ে সমগ্র দেহে ঘুরে বেড়ায় বা বিচরণ করে। বিচরণকালে দেহের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। অন্তর্জগতের অন্যতম পরিবহন মাধ্যম হিসাবে রক্ত একাধারে যেমন দেহের যাবতীয় কোষের প্রয়োজনীয় খাদ্য, অক্সিজেন, হরমোন, অ্যান্টিবডি প্রভৃতি সরবরাহ করে, তেমনি কোষনিঃসৃত বর্জ্যপদার্থ, কার্বনডাই অক্সাইড প্রভৃতিকে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত করতে সহায়তা করে। দেহে এর সর্বব্যাপী বিস্তৃতি ও অনন্য রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের জন্য রক্ত দেহের সবচেয়ে সক্ষম পরিবহন সংস্থা হিসাবে পরিগণিত।

1. **রক্তের ভৌত ধর্ম** (Phyical Properties of Blood) **:** রক্ত লাল, বিশেষত ধমনীর রক্ত। শিরার রক্ত নীলাভ। রক্তের লোহিতকণিকার স্ট্রোমাতে হিমোগ্লোবিন নামক লৌহগঠিত রঞ্জককণার উপস্থিতির জন্য রক্ত লাল হয়। শিরারক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। তাই শিরারক্ত নীলাভ। তাজা রক্তের একটি বিশেষ গন্ধ আছে। রক্তের স্বাদ নোনা (salty), বিশেষত সোডিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতির (0·9%) জন্য। রক্ত ক্ষারীয়, গড় P^H 7·4। আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·055 – 1·065 এবং আপেক্ষিক সান্দ্রতা 4 – 6।

2. **তঞ্চনরোধী পদার্থ** (Anticoagulants) **:** দেহের মধ্যে রক্ত তরল অবস্থায় থাকে। কিন্তু দেহ থেকে নির্গত হলেই তা জমাট বাঁধে বা তঞ্চিত হয়। তবে দেহের বাইরেও রক্তকে তরল অবস্থায় রাখা যায়। বিশেষ ধরনের কিছু সংখ্যক পদার্থকে রক্তের সংগে মিশিয়ে দিলে দেহের বাইরেও রক্ত তরল অবস্থায় থেকে যায়। যে সব পদার্থ রক্তকে দেহের বাইরেও তরল অবস্থায় রাখতে সাহায্য করে বা রক্তকে তঞ্চিত বা জমাট বাঁধতে বাধা দান করে তাদের **তঞ্চনরোধী পদার্থ** বা **অ্যান্টিকোয়াগুলাণ্ট** (anticoagulant) নামে অভিহিত করা হয়। হেপারিন (heparin) হিরুডিন (hirudin), সাইট্রেট (citrate), অক্সালেট (oxalate), ফ্লোরাইড (floride) প্রভৃতি তঞ্চনরোধী পদার্থের নাম এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে। হেপারিন ও হিরুডিন প্রাণীদেহে সংশ্লেষিত হয়। হেপারিন প্রায় অধিকাংশ প্রাণীর রক্ত ও অন্যান্য দেহতরলে ছড়িয়ে থাকে। হিরুডিন জেঁাকের কামড়ের সময় বেরিয়ে আসে, তাই জেঁাকে কামড়ালে রক্তক্ষরণ বন্ধ হতে চায় না। বাকীরা রাসায়নিক পদার্থ। এসব পদার্থ যেমন নির্বিষ (nontoxic) তেমনি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরা তঞ্চনক্রিয়ায় বাধাদান করে।

হেপারিন সালফার যুক্ত মিউকোপলিস্যাকারাইড পদার্থ, তীব্র অ্যাসিডধর্মী ও ইলেকট্রো-নিগেটিভ আধানযুক্ত। রক্ততঞ্চনের সময় এটি থ্রম্বিন (thrombin) ও ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিনের সংযুক্তিতে বাধাদান করে। এছাড়া ফ্যাকটর IX এর সক্রিয়তায় বাধাসৃষ্টি করে থ্রমবোপ্লাসটিন উৎপাদনে বাধা দেয়, ফলে রক্ত জমাট বাঁধে না।

রক্ত থেকে ক্যালসিয়ামকে (Ca^{++}) সরিয়ে নিতে পারলেও রক্তের তঞ্চনে বাধা সৃষ্টি হয়। সাইট্রেট, অক্সালেট প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ রক্তের ক্যালসিয়ামের সংগে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম লবণ উৎপন্ন করে, ফলে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। কোওমারিন (coumarin) লব্ধ পদার্থ, যেমন ডাইকুমারোল (dicumarol) প্রভৃতি ভিটামিন K এর সক্রিয়তায় বাধাদান করে। এই ভিটামিন যেহেতু যকৃতে প্রোথ্রম্বিন সমেত তঞ্চনের সংগে যুক্ত কিছু উপাদানের (ফ্যাক্টর VII, IX এবং X) সংশ্লেষণে বিশেষ প্রয়োজন সেহেতু এর নিষ্ক্রিয়তার ফলে রক্ততঞ্চন ব্যাহত হয়।

রক্ততঞ্চনে বাধাদান করতে হলে বিভিন্ন তঞ্চনরোধী পদার্থকে বিভিন্ন পরিমাণে রক্তের সংগে মেশাতে হয়। 1 নং তালিকায় এই পরিমাণের উল্লেখ করা হয়েছে।

1 নং তালিকা : 10 মিলিলিটার রক্তের তঞ্চন বন্ধ করতে যে পরিমাণ তঞ্চনরোধী পদার্থের প্রয়োজন হয়।

পদার্থ	পরিমাণ
সোডিয়াম সাইট্রেট	60 মিলিগ্রাম
সোডিয়াম অক্সালেট	16 মিলিগ্রাম
পটাসিয়াম অক্সালেট	8 মিলিগ্রাম
অ্যামোনিয়াম অক্সালেট	12 মিলিগ্রাম
সোডিয়াম অক্সালেট }	30 মিলিগ্রাম
সোডিয়াম ফ্লোরাইড }	10 মিলিগ্রাম
হেপারিন	1 মিলিগ্রাম

রক্তের উপাদান ও কার্যাবলী

Composition and Functions of Blood

1. **রক্তের উপাদান :** হেপারিনযুক্ত রক্তকে হিমাটোক্রিট (hematocrit) নামক একটি অংশাংকিত পরীক্ষানলে (উইনট্রোব টিউবে) রেখে একটি কেন্দ্রাতিগ যন্ত্রের (centrifugal machine) সাহায্যে 30 মিনিট ধরে মিনিটে

3000 বার (1500g এর সমতুল্য) আবর্তিত হতে দিলে রক্ত উপাদান দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে : (1) **প্লাজমা** (Plasma) এবং (2) **কোষ উপাদান** (Cellular elements)। রক্তের হলদে তরল অংশকে প্লাজমা বলা হয়। এর পরিমাণ প্রায় 55 শতাংশ (52-55%)। বিলিরুবিন, ক্যারোটিন ও জ্যানথোফাইলিন প্রভৃতি রঞ্জককণার উপস্থিতির জন্য প্লাজমার বর্ণ হলুদ হয়। প্লাজমার 91-92% জল এবং বাকী 8-9% কঠিন পদার্থে গঠিত। কঠিন পদার্থের মধ্যে জৈব ও অজৈব পদার্থের পরিমাণ যথাক্রমে 7·1-8·1% এবং 0·9%। প্লাজমার কঠিন পদার্থকে ব্যাপনযোগ্য (diffusible) এবং অব্যাপনযোগ্য (non-diffusible) এই দুটো অংশে বিভক্ত করা যায়।
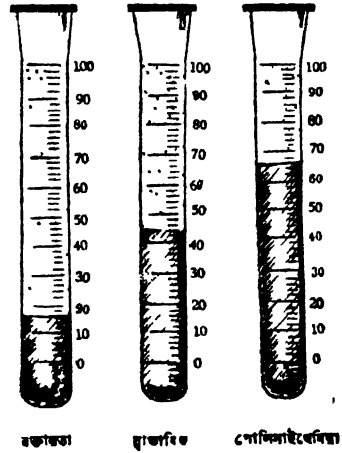
9-3 নং চিত্র : হিমাটোক্রিট টিউব।

কোষ উপাদানের পরিমাণ প্রায় 45 শতাংশ (45-48%) এবং এটি তিন ধরনের রক্তকোষের সমন্বয়ে গঠিত। এদের মধ্যে লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জকপদার্থের উপস্থিতির জন্য রক্তকে লাল দেখায়। রক্তের সার্বিক উপাদান নিম্নরূপ :

1. **কোষ উপাদান** (Cellular elements)

   পরিমাণ : 45 শতাংশ

   কোষাবলী :

   1. লোহিতকণিকা (পুরুষ : [illegible] $10^6/\mu l$)
   2. শ্বেতকণিকা (6000 μl
   3. অণুচক্রিকা (250,000/μl)

2. **প্লাজমা অংশ (Plasma fraction)**

   পরিমাণ : 55 শতাংশ

   A. অব্যাপনযোগ্য উপাদান :

   1. অ্যালবুমিন
   2. গ্লোবিউলিন
   3. ফাইব্রিনোজেন

4. প্রোথ্রোম্বিন, অ্যান্টিবডি, লিপিড, এনজাইম (অ্যামাইলেজ, কারবনিক অ্যানহাইড্রেজ, অ্যাসিড এবং অ্যাল্‌কালাইন ফসফাটেজ, লাইপেজ অ্যার্জিনেজ, অ্যালডোলেজ, ল্যাকটিক ডেহাইড্রোজেনেজ ইত্যাদি)

B. ব্যাপনযোগ্য উপাদান :

1. বিপাকলব্ধ পদার্থ : ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ক্রিয়েটিনিন, অ্যামোনিয়া, পিত্তলবণ, জ্যানথিন, হাইপোজ্যানথিন ইত্যাদি।
2. সংশ্লেষণধর্মী উপাদান : গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন ইত্যাদি।
3. তড়িৎবিশ্লেষ্য : Na^+, K^+. Ca^{++}, Mg^{++}, Cl^-. HCO_3^-, HPO_4 – H_3 –, PO_4 ইত্যাদি।
4. হরমোন, ভিটামিন ইত্যাদি।
5. রঞ্জক পদার্থ : বিলিরুবিন, ক্যারোটিন এবং জ্যানথোফাইলিন।

2নং তালিকা : মানুষের রক্তের কোষ-উপাদানের স্বাভাবিক মান।

উপাদান	কোষের গড়সংখ্যা (Cell/μl)	সীমা	শ্বেতকণিকার শতকরা হার
লোহিতকণিকা			
পুরুষ	5 × 10⁶	—	—
স্ত্রীলোক	4·5 × 10⁶	-	
শ্বেতকণিকা (মোট)	6,000—8,000	4,000—11,000	—
দানাদার শ্বেতকণিকা			
নিউট্রোফিল	5400	3,000—6,000	50 —70
ইওসিনোফিল	275	150—300	1—4
বেসোফিল	35	0—400	0 4
দানাহীন শ্বেতকণিকা			
লিম্ফোসাইট	2750	1,500—4,000	20—40
মনোসাইট	540	300—600	2—8
অণুচক্রিকা	250,000	200,000-500,000	—

2. **রক্তের কার্যাবলী (Functions of Blood) :** দেহের অভ্যন্তরে রক্ত প্রধানত নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে : (i) **শ্বাসকার্য :** অক্সিজেনকে ফুস্‌ফুস্ থেকে কলাকোষে এবং কিছু কার্বনডাই অক্সাইডকে কলাকোষ

থেকে ফুসফুসে পরিবহন করে। (ii) **পুষ্টি:** বিভিন্নপ্রকার খাদ্যবস্তুর অন্ত্র থেকে রক্তে বিশোষণের পর তাদেরে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে। (iii) **রেচনকার্য:** দেহ থেকে নির্গত করার উদ্দেশ্যে ফুসফুস, বৃক্ক, অন্ত্র, প্রভৃতিতে বিপাকীয় বর্জ্যপদার্থের পরিবহন করে। (iv) **অম্ল-ক্ষারের সাম্যাবস্থা:** ইহা অম্লক্ষারের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। (v) **দেহউষ্ণতার নিয়ন্ত্রণ:** দেহ-তাপের বিস্তৃতি ঘটিয়ে দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে। (vi) **জলসাম্য:** কলারস (tissue fluid) ও রক্তরস বা প্লাজমার মধ্যে বিনিময়সাধন করে জলসাম্য (water balance) বজায় রাখে। (vii) **পরিবহন:** হরমোন, ভিটামিন, বিপাকীয় পদার্থ ইত্যাদির পরিবহন এবং বিপাকক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করে (viii) **প্রতিরক্ষা** (defensive function): শ্বেতকণিকা ও অ্যাণ্টিবডির উপস্থিতির জন্য রক্ত সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করে। (ix) **তঞ্চন:** তঞ্চনধর্মের জন্য ইহা রক্তক্ষরণে বাধাদান করে (x) **রক্তচাপ:** রক্তের পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়ে ইহা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। (xi) রক্তের প্লাজমাপ্রোটিন নানাপ্রকার কার্য সম্পাদন করে।

রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব
Specific Gravity of Blood

আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে, একটি প্রমাণ পদার্থের ওজনের চেয়ে অপর একটি পদার্থের ওজন কতগুণ ভারী বা কম তাবেই বুঝায়। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব তাব রক্তকণিকা ও প্লাজমাপ্রোটিনেব ওপর নির্ভরশীল। 15°C সেলসিয়াসে (59°F) সমগ্র রক্তেব আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·055-1·060 এবং প্লাজমার আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·024-1·028। ভ্যানস্লাইকের মতে (1) সমগ্র রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·052-1·062, (2) প্লাজমার আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·022-1·025, (3) সিরামের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·028-1·032 এবং (4) রক্তকণিকার আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·095-1·101। পূর্ণগর্ভে ভ্রূণরক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্বাধিক হয় এবং মায়ের সর্বনিম্ন হয় (1·050)। লোহিতকণিকা বিনিষ্ট হবার ফলে জন্মের পরই নবজাতকের রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পায়।

1. **আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিবর্তন** (Variation of Specific Gravity): **যে সব কারণে রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে প্রধান:** **(1) দেহস্থিত জলের হ্রাসপ্রাপ্তি, অত্যধিক স্বেদক্ষরণ, অধিক পাতলা মলত্যাগ**

(কলেরা ইত্যাদি রোগে), অত্যধিক বমন (কলেরা, খাদ্যদূষণ ইত্যাদি) প্রভৃতিতে রক্তের জলীয় ভাগ হ্রাস পায়। (2) কলান্তরে জলের অনুপ্রবেশ : প্রদাহ, শল্যচিকিৎসা, পোড়া প্রভৃতি অবস্থায় রক্তস্থিত জলীয় তরল অধিক পরিমাণে কলান্তরে প্রবেশ করে। (3) অপর্যাপ্ত জলগ্রহণ। আবার যেসব কারণে আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পায় তার মধ্যে প্রধান : (1) অত্যধিক জলগ্রহণ, (2) প্লাজমাফেরেসিস (প্লাজমাপ্রোটিন সরিয়ে নেওয়া), (3) লবণজল, 5% গ্লুকোজ প্রভৃতির ইনজেকশন ইত্যাদি।

2. **নির্ধারণ পদ্ধতি** (Method of determination) : নির্দিষ্ট আপেক্ষিক গুরুত্বসম্পন্ন কিছুসংখ্যক পৃথক কপারসালফেট ($CuSO_4$) দ্রবণে এক ফোঁটা করে রক্তকে ফেলা হয়। যে দ্রবণে রক্তের ফোঁটা ভেসেও ওঠে না বা ডুবেও যায় না, রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব সেই দ্রবণের আপেক্ষিক গুরুত্বের সমান হয়। গ্লাইসিন ও পাতিত জল অথবা ক্লোরোফর্ম ও বেনজিনের পৃথক মিশ্রণের সাহায্যেও রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করা যায়।

রক্তের সান্দ্রতা
Viscosity of Blood

কোন তরল পদার্থের একটি স্তর ওপর একটি স্তরের ওপর দিয়ে চলার সময় যে বাধার সম্মুখীন হয়, তাকে **সান্দ্রতা** বলা হয়। রক্ত ও প্লাজমার সান্দ্রতা মুখ্যত রক্তকণিকা ও প্লাজমাপ্রোটিনের ওপর নির্ভরশীল। **ভিসকোমিটার** (viscometer) যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের সান্দ্রতা নির্ধারণ করা যায়। জল, প্লাজমা ও সমগ্র রক্তের আপেক্ষিক সান্দ্রতা যথাক্রমে 1, 3 এবং 5। অ্যাসিডোসিস্, হাইপারগ্লাইসেমিয়া, হাইপারক্যালসিমিয়া, লোহিতকণিকার সংখ্যাবৃদ্ধি, দেহের উষ্ণতা হ্রাস প্রভৃতি যেমন রক্তের সান্দ্রতা বৃদ্ধি করে, তেমনি দেহের উষ্ণতাবৃদ্ধি, রক্তাল্পতা প্রভৃতি অবস্থায় ইহা হ্রাস পায়।

লোহিতকণিকার থিতানের হার
Erythrocyte Sedimentation Rate

হেপারিন বা সাইট্রেটযুক্ত রক্তকে স্থির হয়ে থাকতে দিলে রক্তকণিকা স্বভাবে নীচের দিকে নেমে যায়। এই প্রক্রিয়াকে **রক্তকণিকার থিতান** (sedimentation) বলা হয়। লোহিতকণিকার থিতানের হার (ESR) প্রধানত

রক্তকণিকা ও অপ্রতিসম বৃহদণুর (বিশেষত ফাইব্রিনোজেন ও গামা-গ্লোবিউলিনের) গাঢ়ত্বের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। লোহিত-কণিকার উপরিতল স্বাভাবিকভাবে ঋণাত্মক তড়িৎ-আধানযুক্ত থাকে যা 'জেটা বিভব' (Zeta Potential) নামে পরিচিত। এই ঋণাত্মক আধান লোহিতকণিকাগুলোকে পরস্পর বিকর্ষণের মাধ্যমে পৃথকভাবে অবলম্বনে (suspension) রাখে। প্লাজমাস্থিত অপ্রতিসম বৃহদণু (asymmetric macromolecules) লোহিতকণিকার জেটা বিভবের বিকর্ষণশক্তিকে হ্রাস করে। তাই প্লাজমায় এজাতীয় বহুদণুর গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পেলে লোহিতকণিকা দ্রুত পুঞ্জীভূত হয় এবং নিচে থিতিয়ে পড়ে, অর্থাৎ লোহিতকণিকার থিতানোর হার এক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব, সান্দ্রতা ও রুলো গঠনের (rouleaux formation) ওপর ইহা নির্ভরশীল। রক্তে ফাইব্রিনোজেন, γ-গ্লোবিউলিন, কোলেসটারল ও অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ESR বৃদ্ধি পায়। আবার কার্বনডাইঅক্সাইড, অ্যালবুমিন, লেসিথিন ও নিউক্লিওপ্রোটিন রক্তে বৃদ্ধি পেলে ESR হ্রাস পায়।

1 **স্বাভাবিক হার** (Normal Rate): উইনট্রোব (Wintrobe) পদ্ধতিতে স্বাভাবিক ESR নিম্নরূপ: (1) পুরুষ: ঘণ্টায় 0·0—6·5 মি.মি., (2) নারী: ঘণ্টায় 0·0-15·0 মি. মি., (3) শিশু: ঘণ্টায় 0·0-5 মি. মি এবং (4) নবজাতকে ঘণ্টায় 0·0—2·0 মি. মি.। পুরুষ ও নারীতে গড় ESR যাথাক্রমে ঘণ্টায় 3 মি. মি. এবং 9·6 মি.মি।

ওয়েস্টারগ্রেন (Westergren) পদ্ধতিতে স্বাভাবিক ESR পুরুষে ঘণ্টায় 0·0-15·0 মি. মি. এবং নারীতে ঘণ্টায় 0·0-20·0 মি মি.।

2. **নির্ধারণ পদ্ধতি** (Method of Determination): উইনট্রোব পদ্ধতি বা ওয়েস্টারগ্রেন পদ্ধতিতে রক্তের ESR নির্ধারণ করা যায়।

(a) **উইনট্রোব পদ্ধতি** (Wintrobe method): উইনট্রোব টিউব 100 মিলিমিটার দীর্ঘ এবং 2·5 মিলিমিটার ছিদ্রযুক্ত একটি পরীক্ষা নলবিশেষ। এই পরীক্ষানলে রক্তকে শুষ্ক অ্যামোনিয়াম ও পটাসিয়াম অক্সালেটের মিশ্রণের (3·2 w/w) সংগে মিশিয়ে এক ঘণ্টা স্থির অবস্থায় রাখা হয় (9-4নং চিত্র)। পরীক্ষানলটিকে উল্লম্ব অবস্থায় একটি রবারের ক্যাপে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং এক ঘণ্টা পরে উপরের পৃথকীকৃত মিলিমিটার প্লাজমাকে রেকর্ড করা হয়।

(b) **ওয়েস্টারগ্রেন পদ্ধতি** (Westergren method): 300 মিলিমিটার

দীর্ঘ ও 2·45 মিলিমিটার ছিদ্রযুক্ত একটি পরীক্ষা নলে শিরারক্তকে 3·8% সাইট্রেট দ্রবণের সংগে মিশিয়ে (4ভাগ রক্ত+1ভাগ সাইট্রেট) এক ঘণ্টা স্থির
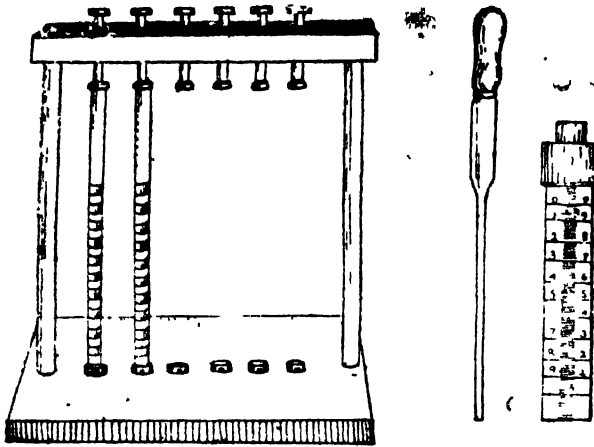
9-4 নং চিত্র : ওয়েস্টারগ্রেন ও উইনট্রোব টিউব।

হয়ে থাকতে দেওয়া হয়। তাপমাত্রা 22-27 C নির্দিষ্ট রাখা হয়।

3. **পরিবর্তন** (Variations) : যে সব শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় ESR এর বৃদ্ধি ঘটে, তার মধ্যে প্রধান : (1) পেশীসঞ্চালন, (2) রজঃস্রাব (menstruation), (3) গর্ভাবস্থা এবং (4) আহারের পর। গর্ভের 3 মাস পর থেকে প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত প্রসূতির রক্তের ESR ঘণ্টায় 33 মি. মি. দেখা যায়। যেসব অসুস্থ অবস্থায় ESR-এর বৃদ্ধি ঘটে, তার মধ্যে প্রধান প্রদাহজনিত উষ্ণতাবৃদ্ধি, আঘাত (trauma), যক্ষ্মারোগ, যকৃৎরোগ ইত্যাদি। পাণ্ডুরোগ, রক্তাল্পতা (sickle cell anemia), এলার্জি প্রভৃতি অবস্থায় ইহা হ্রাস পায়।

রক্তের পরিমাণ
Blood Volume

1. **স্বাভাবিক রক্তের পরিমাণ** (Normal Blood Volume) : রক্তের পরিমাণ বলতে প্রাণীদেহের সংবহনতন্ত্রের রক্ত ও অন্যান্য সঞ্চয়ভাণ্ডারের রক্তের মোট পরিমাণকে বুঝায়। **প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনে এই পরিমাণ গড়ে 85 মিলিলিটার** (78-97 মিলিলিটার); **ইহা মোট দৈহিক ওজনের 8 শতাংশ বা $\frac{1}{12}$ অংশ। দেহের প্রতি বর্গমিটারে রক্তের পরিমাণ গড়ে 3·3 লিটার**

(2·5-4)। প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনে প্লাজমার পরিমাণ 35 মিলিলিটার। ইহা দৈহিক ওজনের 5 শতাংশ বা 1/20 অংশ। 70 কেজি ওজনসম্পন্ন লোকের রক্তের পরিমাণ প্রায় 5·6 লিটার। বয়স্ক স্ত্রীলোকে এই পরিমাণ প্রায় 0·5 লিটার কম।

বয়স বৃদ্ধির সংগে রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের রক্তের পরিমাণ প্রতিবর্গমিটারে প্রায় 7·5 শতাংশ বেশী। তবে উভয়ক্ষেত্রে প্লাজমার পরিমাণ সমান। পুরুষের রক্তের পরিমাণ অধিক হওয়ার প্রধান কারণ, পুরুষের রক্তে অধিক সংখ্যক লোহিতকণিকাব উপস্থিতি। এছাড়া দেহের ওজন ও ক্ষেত্রফলের সংগেও রক্তের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়।

2. **রক্তের পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতি** (Methods for Determination of Blood Volume ঃ সরাসরি কোন প্রাণীকে হত্যা করে তার রক্তপরিমাণের প্রত্যক্ষ পরিমাপ সম্ভবপর। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বা চিকিৎসা শাস্ত্রে এর কোন মূল্য নেই। পরোক্ষ পদ্ধতিই সে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিম্নে এরকম দুটো পদ্ধতির কথা আলোচনা করা গেল। এই দুটো পদ্ধতির নাম ঃ (1) রঞ্জন পদ্ধতি (dye method) এবং (2) তেজস্ক্রিয় পদ্ধতি (radioactive method)।

(1) **রঞ্জনপদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে **ইভান ব্লু** (Evan's blue) বা T-1824 নামক রঞ্জক পদার্থের ব্যবহার করা হয়। এই রঞ্জক পদার্থের বৈশিষ্ট্য হল, এটি (a) নির্বিষ, (b) রক্তনালী থেকে অতি মন্থরগতিতে নির্গত হয়, (c) প্লাজমাপ্রোটিনের সংগে যুক্ত থেকে বেশ কিছুদিন রক্তসংবহনতন্ত্রে অবস্থান করে এবং (d আগ্রাসী কোষ এই পদার্থকে গ্রহণ করে না।

প্রথমত একটা টেস্টটিউবে খানিকটা হেপারিন নিয়ে একটি পরিষ্কার সিরিঞ্জের সাহায্যে 10 মিলিলিটার শিরা রক্তকে টেনে তার মধ্যে ঢালা হয়। কেন্দ্রাতিগ যন্ত্রের সাহায্যে প্লাজমা ও লোহিতকণিকাকে আলাদা করা যায়। 5 মিলিলিটার প্লাজমার সংগে 0 01 মিলিলিটার 5 শতাংশ ইভান ব্লু মেশানো হয় (1 ঃ 500 তরলীকৃত) এবং তার আলোক ঘনত্বের (optical density) পরিমাপ করা হয়। এই দ্রবণকে **প্রমাণ দ্রবণ** (standard solution) হিসাবে ধরা হয়। পরে 5 মিলি-লিটার 5 শতাংশ ইভান ব্লুকে প্রাণীর একটি নির্দিষ্ট শিরাতে প্রবেশ করানো হয়। প্রবেশ করানোর 10 মিনিট পরে দেহের বিপরীত পার্শ্বস্থ একই শিরা থেকে 10 মিলিলিটার রক্তকে বের করে আনা হয় এবং তাকে হেপারিনযুক্ত একটি

টেস্টটিউবে রাখা হয়। এই রক্তের রক্তকণিকার শতকরা হার (hematocrit) নির্ণয় করা হয়। আলোকঘনত্বের পরিমাপ করে নিম্নলিখিত উপায়ে রক্তের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ঃ

$$\text{প্লাজমা পরিমাণ (ml)} = \frac{\text{অনুপ্রবিষ্ট রঞ্জক পদার্থ (ml)} \times \text{প্রমাণের তরলীকরণ} \times \text{প্রমাণের ঘনত্ব}}{\text{অজ্ঞাত দ্রবণের ঘনত্ব}}$$

$$\text{রক্তের পরিমাণ (ml)} = \frac{\text{প্লাজমার পরিমাণ} \times 100}{100 - (0.96 \times \text{রক্তকণিকার শতকরা হার})}$$

(0·96 – রক্তকণিকায় নিহিত প্লাজমার জন্য সংশোধন গুণাংক।)

রক্তকণিকার পরিমাণ (ml) = রক্তের পরিমাণ—প্লাজমা পরিমাণ

যদি কোন লোকের রক্তকণিকা ও প্লাজমার অনুপাত $\frac{45}{55}$ এবং রঞ্জন পদ্ধতিতে নির্ণীত প্লাজমা পরিমাণ 2750 মিলিলিটার হয়, তবে তার রক্তের পরিমাপ ও রক্তকণিকার পরিমাণ নিম্নলিখিতভাবে নির্ণয় করা যায়। রক্তকণিকায় নিহিত প্লাজমার জন্য সংশোধন না করলে মোটামুটিভাবে রক্তের পরিমাণ দাঁড়াবে, $\frac{2750 \times 100}{55}$ বা 5000 মিলিলিটার। সেক্ষেত্রে রক্তকণিকার পরিমাণ হবে (5000-2750) বা 2250 মিলিলিটার।

রক্তকণিকায় নিহিত প্লাজমার জন্য সংশোধন করলে রক্তের সঠিক পরিমাণ দাঁড়াবে,

$$\text{রক্তের পরিমাণ} = \frac{2750 \times 100}{100 - (0.96 \times 45)}$$

$$= 4841{\cdot}55 \text{ মিলিলিটার}$$

এক্ষেত্রে, রক্তকণিকার পরিমাণ $= 4841{\cdot}55 - 2750{\cdot}00 = 2091{\cdot}55$ মিলি-লিটার।

(2) **তেজস্ক্রিয় পদ্ধতি ঃ** তেজস্ক্রিয় পদ্ধতি অনেকটা রঞ্জন পদ্ধতির অনুরূপ। কোন একটি রঞ্জক পদার্থের পরিবর্তে এই পদ্ধতিতে একটি **তেজস্ক্রিয় পদার্থের** ব্যবহার করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে **তেজস্ক্রিয় I^{131} সিরাম অ্যালবুমিন** পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে। রঞ্জন পদ্ধতির মত এখানেও 10 মিলিলিটার শিরারক্তে তেজস্ক্রিয় I^{131} মেশানো হয় এবং তার তেজস্ক্রিয়তা নির্ণয় করা হয়। এরপর একইভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ তরলীকৃত তেজস্ক্রিয় I^{131} প্রাণীর কোন নির্দিষ্ট শিরাতে অনুপ্রবেশ করানো হয় এবং

অনুপ্রবিষ্টের 10, 20 এবং 30 মিনিটের মাথায় বিপরীত পার্শ্বস্থ শিরা থেকে পরপর তিনটি নমুনা (sample) টেনে এনে তাদের লোহিতকণিকার হার নির্ণয় করা হয়। একই সংগে প্লাজমার তেজস্ক্রিয়ার পরিমাপ করা হয়। এই নমুনা তিনটির তেজস্ক্রিয়াকে সেমিলগ কাগজে প্রতিস্থাপন করে, লেখচিত্র থেকে শূন্য সময়ে আয়োডিনের তেজস্ক্রিয়া নির্ণয় করা হয়। এই তেজস্ক্রিয়া দেহে অনুপ্রবিষ্ট আয়োডিনের তেজস্ক্রিয়ার পরিমাপক। এক্ষেত্রেও,

$$\text{প্লাজমা পরিমাণ (ml)} = \frac{\text{প্রমাণের তেজস্ক্রিয়া} \times \text{অনুপ্রবিষ্ট তেজস্ক্রিয় তরলের পরিমাণ} \times \text{প্রমাণের তরলীকরণ}}{\text{শূন্য সময়ে প্লাজমার তেজস্ক্রিয়া}}$$

$$\text{রক্তের পরিমাণ (ml)} = \frac{\text{প্লাজমা পরিমাণ} \times 100}{100 - (0{\cdot}96 \times \text{রক্তকণিকার শতকরা হার})}$$

রক্তকণিকার পরিমাণ (ml) = রক্তের পরিমাণ—প্লাজমা পরিমাণ

3. **রক্তপরিমাণের নিয়ন্ত্রণ** (Regulation of Blood Volume): প্রাণীদেহে জলের গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে সাম্যাবস্থা বজায় রাখা এবং রক্তজালিকার মধ্য দিয়ে প্লাজমা ও কলাস্থানের (tissue space) মধ্য তরলের সামঞ্জস্য বিধান করা, এই দুটো পদ্ধতির ওপর প্রধানত রক্তের পরিমাণ নির্ভরশীল। যেসব কারণ এই দুটো পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, নিম্নে তাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল: (1) **তৃষ্ণা:** রক্তের পরিমাণ হ্রাস পেলে দেহে তৃষ্ণার অনুভূতি জাগ্রত হয়। তখন জল পান করে রক্ত-পরিমাণের এই ঘাটতি পূরণ কবা হয়। (2) **প্লাজমা ও কলাস্থানে তরলের নিয়ন্ত্রণ:** রক্ত চাপ, অভিস্রবণ চাপ, ব্যাপন, রক্তজালিকার ভেদ্যতা ইত্যাদি ভৌত কারণসমূহ প্লাজমা ও কলাস্থানে তরলের নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্তপরিমাণ বজায় রাখে। (3) **কলাস্থানের বিপুল ধারণক্ষমতা:** কলাস্থান বিপুল ধারণক্ষমতার অধিকারী বলে ইহা একটি তৎপর সঞ্চয়ভাণ্ডার হিসাবে কার্য করে। রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তরলপদার্থ সরাসরি কলাস্থানে প্রবেশ করে এবং হ্রাস পেলে প্লাজমাতে বেরিয়ে আসে। (4) **ভিটামিন:** কিছুসংখ্যক ভিটামিন (ভিটামিন সি ইত্যাদি) রক্তজালিকার ভেদ্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এভাবে রক্তপরিমাণের নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। (5) **হরমোন:** পশ্চাৎপিটুইটারী (posterior pituitary), প্যারাথাইরয়েড (parathyroid), অ্যাড্রেন্যালের বহিঃস্তর (adrenal cortex) ইত্যাদি থেকে ক্ষরিত হরমোনসমূহ রক্তপরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

এছাড়া যে কারণসমূহ রক্তপরিমাণের পরিবর্তনের জন্য দায়ী তারা হল, (6) পেশীসঞ্চালন : পেশীসঞ্চালনে সংবহনতন্ত্রের রক্তপরিমাণ বৃদ্ধি পায়, (7) উচ্চতা : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় অবস্থানকালে রক্তকণিকায় সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, (8) অক্সিজেনের অভাবজনিত অবস্থা : যে কোন অক্সিজেন অভাবে রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, (9) গর্ভাবস্থায় : গর্ভাবস্থায় রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রসবের পর তা হ্রাস পায়।

প্লাজমাপ্রোটিন
Plasma Protein

রক্তের জলীয় তরল অংশ প্লাজমা নামে পরিচিত। প্লাজমায় যেসব প্রোটিনের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় তাদের **প্লাজমাপ্রোটিন** বলা হয়। প্লাজমা তঞ্চিত হলে ফেঁকাশে হলুদবর্ণের যে তরল পদার্থ পৃথক হয়ে পড়ে তাকে **সিরাম** বলা হয়। তঞ্চন প্রক্রিয়ায় যেসব প্রোটিন অংশ গ্রহণ করে তাদের বাদ দিলে সিরাম পাওয়া যায়। অর্থাৎ ফাইব্রিনোজেন, প্রোথ্রম্বিন এবং অন্যান্য তঞ্চনপদার্থ (যেমন ফ্যাক্টর II, V, VIII ইত্যাদি) সিরামে থাকে না।

প্রতি ডেসিলিটার (dl) বা 100 মিলি লিটার (ml) প্লাজমায় প্রায় 7·44 গ্রাম (6·4 – 8·3%) প্লাজমাপ্রোটিন থাকে। আইসোটোপ (isotope) বা সমস্থানিকের ব্যবহার করে দেখা গেছে, প্লাজমাপ্রোটিন রক্তসংবহনে 14 দিনের বেশী থাকে না, অর্থাৎ তাদের কার্যকাল 14 দিন। এরপরই নূতন প্লাজমা প্রোটিন এসে তাদের স্থান দখল করে।

1. **প্লাজমাপ্রোটিনের শ্রেণীবিন্যাস** (Classification of Plasma Proteins) : প্লাজমাপ্রোটিনকে প্রধানত 4 ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। যথা,

(a) অ্যালবুমিন (albumin) ··· 4·8 g/dl (3 5—4·5 গ্রাম)

(b) গ্লোবিউলিন (globulin) ··· 2·3 g/dl (1·6-3·28)

- (1) α_1-গ্লোবিউলিন ··· 0·2—0·4 g/dl
- (2) α^2-গ্লোবিউলিন ··· 0·4—0·8 g/dl
- (3) β-গ্লোবিউলিন ··· 0·4—0·8 g/dl
- (4) γ-গ্লোবিউলিন ··· 0·6—1·2 g/dl

(c) ফাইব্রিনোজেন (fibrinogen) ··· 0·3 g/dl (0·2—0·48)

(d) প্রোথ্রম্বিন (prothrombin) ইত্যাদি 0·04 g/dl (0 02—0·048)

প্লাজমাতে অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিনের অনুপাত (A/G ratio)

সাধারণত 1·5 : 1·0। কারও মতে ইহা 4·8 : 2·3 অর্থাৎ প্রায় 2 : 1। পৃথকীকরণ পদ্ধতির ওপর এই অনুপাত নির্ভরশীল। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই অনুপাতের সামান্য পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন প্রাণীতে ইহা বিভিন্ন হয়, তবে একই জাতীয় প্রাণীতে সমান হয়। যকৃৎরোগে অ্যালবুমিন-উৎপাদন হ্রাস পেলে এই অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে, এমন কি বিপরীতও হতে পারে। সিরাম প্রোটিনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, আরজিনিন ও লাইসিনের অনুপাত সবসময় নির্দিষ্ট থাকে (20 : 18)।

ইলেকট্রফরেসিসের সাহায্যে গ্লোবিউলিন থেকে আরও যে সব প্রোটিন ভগ্নাংশকে পৃথক করা গেছে তার মধ্যে প্রধান : প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাসটিন, আইসোহিমাগ্লুটিনিন (isohemaglutinin), অ্যানজিওটেনসিনোজেন (angiotensinogen), ইমিউন গ্লোবিউলিন (Immune globulin) এবং সম্মুখ পিটুইটারীজাত হরমোন।

2. **প্লাজমাপ্রোটিনের উৎপত্তি** (Origin of Plasma Protein) : জন্মের পর প্লাজমাপ্রোটিনের প্রধান উৎস যকৃৎ। জানা গেছে যকৃৎকোষ প্রয়োজনীয় উপাদান থেকে এদের সংশ্লেষণ ঘটায়। অ্যালবুমিন, ফাইব্রিনোজেন এবং প্রোথ্রম্বিন একমাত্র যকৃৎ ছাড়া দেহের অন্য কোথাও উৎপন্ন হতে পারে না। গ্লোবিউলিন নামক প্লাজমাপ্রোটিনটি দেহের অন্যান্য অংশে উৎপন্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিনষ্ট রক্তকণিকা, সাধারণ দেহকোষ, লসিকাপিণ্ড (lymphoid nodules , R-E তন্ত্রের প্লাজমাকোষ ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ভ্রূণাবস্থায় আদিম প্লাজমা (primitive plasma) ও প্লাজমাপ্রোটিন প্রধানত **মেসেনকাইমাস্থিত** (mesenchyma) কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। মেসেনকাইমা কোষ দ্রবীভূত হয়ে বা ক্ষরণের মাধ্যমে প্লাজমাপ্রোটিন উৎপাদন করে।

3. **প্লাজমাপ্রোটিনের রাসায়নিক প্রকৃতি** (Chemical nature of plasma protein): প্লাজমাপ্রোটিনের তুলনামূলক আয়তন 9-5নং চিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাদের রাসায়নিক প্রকৃতি নিম্নরূপ :

(a) **অ্যালবুমিন :** পাতিত জলে দ্রবণীয় এই প্লাজমাপ্রোটিনের আণবিক ওজন প্রায় 69,000। সম্পৃক্ত অ্যামোনিয়াম সালফেটের দ্রবণের সাহায্যে এই প্রোটিনকে সম্পূর্ণভাবে অধঃক্ষিপ্ত করা সম্ভবপর। অ্যালবুমিন একক প্রোটিন নয়। একই জাতীয় প্রোটিনের মিশ্রণবিশেষ। P^H 4·64 অ্যালবুমিনের সমতড়িৎবিন্দু (isoelectric point)।

(b) **গ্লোবিউলিন :** পাতিত জলে অদ্রবণীয় এই প্লাজমা প্রোটিনের
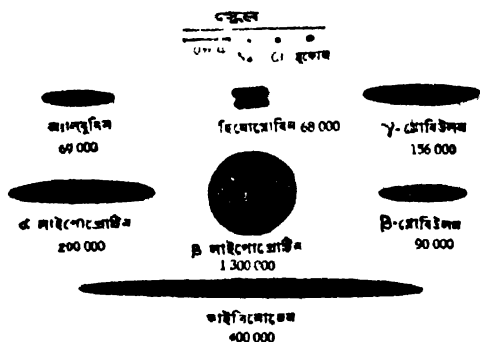
9-5নং **চিত্র :** বিভিন্ন প্রোটিনের তুলনামূলক আয়তন ও ওজন।

আণবিক ওজন 90,000 থেকে 1300,000 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ; লবণের দ্রবণে প্সোবিউলিন দ্রবণীয়। 70° সেল্সিয়াসে ইহা তঞ্চিত হয়।

প্সোবিউলিনও গ্লোবিউলিনজাতীয় প্রোটিনের মিশ্রণবিশেষ। ইলেক্-ট্রোফরেসিসের (electrophoresis) সাহায্যে এদের আলাদা করা সম্ভবপর ; কারণ তড়িৎক্ষেত্রে এদের গতি বিভিন্ন।

তিন প্রকারের গ্লোবিউলিন দেখা যায়। যথা : (1) α_1 এবং α_2 গ্লোবিউলিন : এদের আণবিক ওজন প্রায় 300,000 এবং সমতড়িৎবিন্দু P^H 5·06। (2) β-গ্লোবিউলিন : এর আণবিক ওজন প্রায় 90,000-1,300,000 এবং সমতড়িৎবিন্দু P^H 5·12। (3) γ-গ্লোবিউলিন : আণবিক ওজন 156,000 এবং সমতড়িৎবিন্দু P^H6। অ্যান্টিবডি (antibody) এজাতীয় প্রোটিনবিশেষ।

(c) **ফাইব্রিনোজেন :** পাতিত জলে অদ্রবণীয় ফাইব্রিনোজেন গ্লোবিউ-লিনজাতীয় প্রোটিনবিশেষ। এর আণবিক ওজন প্রায় 400,000 এবং সমতড়িৎবিন্দু P^H 5·8। অর্ধসম্পৃক্ত সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণে ফাইব্রিনোজেন অধঃক্ষিপ্ত হয়।

(d) **প্রোথ্রম্বিন :** প্লাজমাতে A এবং B এই দুপ্রকারের প্রোথ্রম্বিন দেখতে পাওয়া যায়। এই দুপ্রকারের প্রোটিনই ক্যাল্সিয়ামের যৌগহিসাবে প্লাজমাতে অবস্থান করে। প্রোথ্রম্বিনের সমতড়িৎবিন্দু P^H 5·8।

4. **প্লাজমাপ্রোটিনের ইলেক্ট্রোফরেসিসের নমুনা :** (Electrophoretic pattern of plasma protein) : অম্ল বা ক্ষারকীয় দ্রবণে অবস্থানকারী

প্রোটিন অণু তড়িৎক্ষেত্রে অ্যানোড (ধনাত্মক মেরু) বা ক্যাথোডের (ঋণাত্মক মেরু) দিকে বিচলন করে। তড়িৎক্ষেত্রে প্রোটিন অণুর এজাতীয় বিচলনকে **ইলেকট্রোফরেসিস** বলা হয়। প্লাজমাপ্রোটিন ক্ষারকীয় দ্রবণে ঋণাত্মক আয়নযুক্ত হয় এবং তড়িৎক্ষেত্রে অ্যানোড বা ধনাত্মক মেরুর দিকে গতিশীল হয়। প্লাজমাপ্রোটিনের আণবিক ওজন বিভিন্ন হওয়ায় তাদের উপরিস্থিত আয়নের পরিমাণও বিভিন্ন হয়, ফলে তড়িৎক্ষেত্রে তাদের গতিবেগও বিভিন্ন হয়।

প্লাজমাপ্রোটিনের এই ধর্মের উপর ভিত্তি করে টিসেলিয়াস (Tiselius) তাঁর ইলেকট্রোফরেসিস সেলে (electrophoresis cell) প্লাজমাপ্রোটিনের পৃথকীকরণের পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। যন্ত্রটি কাচের U-নলে গঠিত (9-6নং চিত্র)।
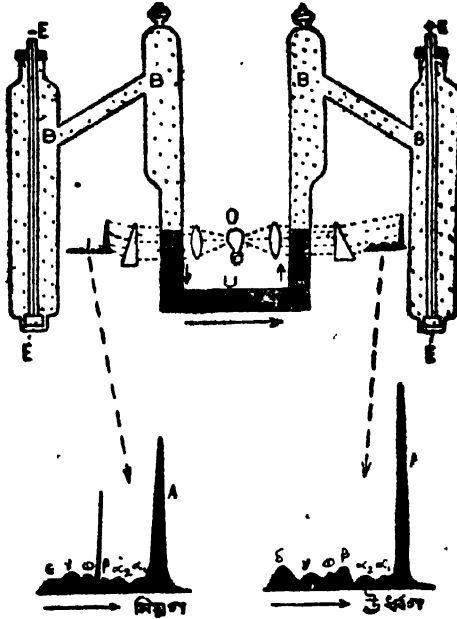
9-6নং চিত্র : টিসেলিয়াস্ ইলেকট্রোফরেসিস সেল। U = প্রোটিন দ্রবণে পূর্ণ নল, B = বাফার দ্রবণে পূর্ণ নল, E = তড়িৎদ্বার, O = গতিশীল স্তরকে লিপিবদ্ধকারী আলোর ব্যবস্থাপনা, → = প্লাজমাপ্রোটিনের গতিমুখ।
নিম্নে : প্লাজমাপ্রোটিনের ইলেকট্রোফরেসিসের নমুনা, A = অ্যালবুমিন; $\alpha_1, \alpha_2, \beta, \gamma$ বিভিন্নপ্রকার গ্লোবিউলিন, θ = ফাইব্রিনোজেন, δ, = স্তরগত ব্যতিক্রম।

U-নলের প্রতিটি শীর্ষবাহুর অর্ধেক প্লাজমাপ্রোটিনের দ্রবণে পূর্ণ করা হয়। তার ওপরে P^H 8·6 সম্পন্ন একটি বাফার দ্রবণ এমনভাবে ঢালা হয়, যাতে

টিউবটি সম্পূর্ণভাবে বাফারে পূর্ণ হয়। বাফার দ্রবণে নিমজ্জিত দুটো তড়িৎদ্বারকে এরপর বেটারীর সংগে সংযুক্ত করা হয়। তড়িৎক্ষেত্রে বিভিন্ন গতিবেগের জন্য প্লজমাপ্রোটিন ধনাত্মক মেরুর অভিমুখে কিছুসংখ্যক পর্যায়ক্রমিক সীমাবদ্ধ স্তরে (boundary) বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে এই সীমাবদ্ধ স্তরসমূহের ফটোগ্রাফ বা আলোক চিত্র গ্রহণ করে প্লাজমাপ্রোটিনের ইলেকট্রোফরেসিসের নমুনা বা প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। 9-6নং চিত্রে মানুষের প্লাজমাপ্রোটিনের যে প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায়, ইহা কিছুসংখ্যক নির্দিষ্ট আয়তন ও আকৃতিসম্পন্ন পর্যায়ক্রমিক শীর্ষাঙ্গলে (peak) গঠিত। তড়িৎক্ষেত্রে সিরাম অ্যালবুমিনের গতিবেগ সবচেয়ে বেশী, তাই তারা ইলেকট্রোফরেসিস সেলের উর্ধ্বগ বাহুতে মেরুর দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, অথবা নিম্নগ বাহুতে ধনাত্মক মেরুর অভিমুখে তাড়াতাড়ি নেমে আসে এবং A তরংগের সৃষ্টি করে। এর পরই পর্যায়ক্রমে গ্লোবিউলিনের α_1, α_2 এবং β অংশ প্রতিকৃতিতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপরই দেখা যায় ফাইব্রিনোজেনকে। প্রতিকৃতির শেষের দিকে গ্লোবিউলিনের γ অংশের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে বোঝা যায় গ্লোবিউলিনের এই অংশ সবচেয়ে মন্থর গতিতে ধনাত্মক মেরুর দিকে এগিয়ে যায়।

ইলেকট্রোফরেসিস প্রতিকৃতির শীর্ষাঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রফলের পরিমাপ করে প্লাজমাপ্রোটিনের বিভিন্ন অংশের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাণীতে এই প্রতিকৃতি বিভিন্ন হয়। আবার বিভিন্ন রোগে প্লাজমা-প্রোটিনের পরিমাণের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটলে ইলেকট্রোফরেসিসের সাহায্যে কোন প্লাজমাপ্রোটিনের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটেছে তার সনাক্ত করা যায়।

টিসেলিয়াসের পদ্ধতিকে আরও সহজতর করে পেপার ইলেকট্রোফরেসিস উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রাণরসায়ন অধ্যায়ে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ 3টি পেপার খণ্ডকে 9-7নং চিত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি (a) স্বাভাবিক মানুষের সিরামের (ফাইব্রিনোজেন তাই অনুপস্থিত), অপরটি (b) মায়েলোম্যাটোসিস (myelomatosis) রোগাক্রান্ত রোগীর এবং তৃতীয়টি (c) নেফ্রোসিস (nephrosis) রোগাক্রান্ত রোগীর। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রক্তের অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিন হ্রাস পায় এবং মায়েলোমা প্রোটিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় ক্ষেত্রে, অ্যালবুমিন হ্রাস পায়, তবে α_2 ও γ-গ্লোবিউলিন বৃদ্ধি পায়।

5. **প্লাজমাফেরেসিস** (Plasmapheresis) : স্বাভাবিক অবস্থায় খাদ্যের অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকেই যে প্লাজমাপ্রোটিন উৎপন্ন হয়, কুকুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে **হুইপল** (Whipple) তার প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর এই পরীক্ষা-পদ্ধতির নাম **প্লাজমাফেরেসিস**। প্লাজমাফেরেসিসের মূল নীতি হল : a) কিছু পরিমাণ রক্তকে প্রাণীদেহ থেকে নির্গত করা, (b) কেন্দ্রাতিগ যন্ত্রের দ্বারা নির্গত রক্তের রক্তকণিকা ও প্লাজমাকে পৃথক করা এবং (c) প্লাজমাকে ফেলে দিয়ে রক্তকণিকাকে 'রিংগার-লক' দ্রবণে (Ringer-Locke Solution) মিশিয়ে প্রাণী দেহে পুনরায় প্রবেশ করান। এই পদ্ধতিতে রক্তের হিমোগ্লোবিন অপরিবর্তিত থাকে। শুধু প্লাজমাপ্রোটিনের হ্রাস ঘটে প্রাণীকে নির্দিষ্ট উপাদানের খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং কয়েক সপ্তাহ ধরে এভাবে প্লাজমা-
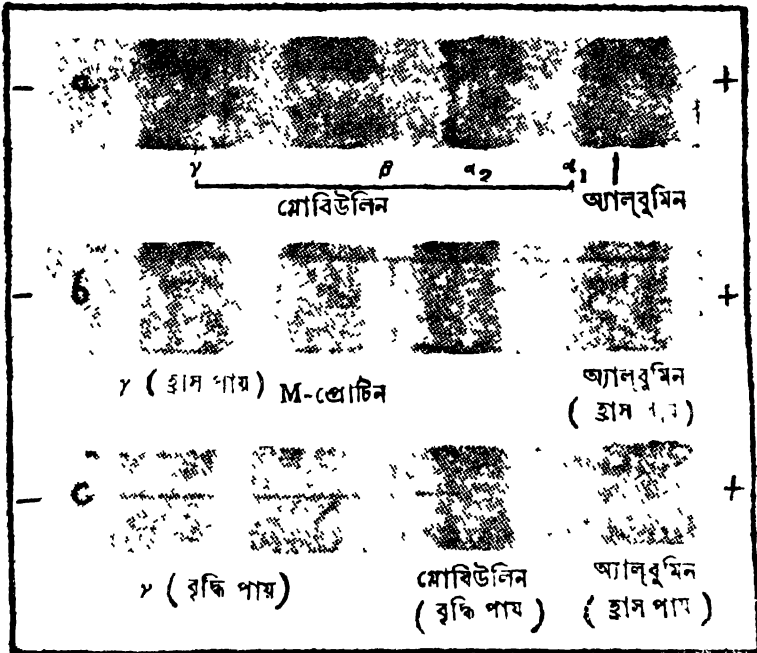
9-নং চিত্র : তিনজন লোকের সিরামের পেপার ইলেকট্রোফরেসিসের অনুলিপি : (a) সুস্থ লোকের, (b) মায়েলোম্যাটোসিস রোগাক্রান্ত লোকের এবং (c) নেফ্রোসিস রোগাক্রান্ত লোকের। M-প্রোটিন = মায়েলোমা প্রোটিন।

ফেরেসিসের মাধ্যমে প্লাজমাপ্রোটিনের হ্রাস ঘটান হয়। এভাবে প্লাজমাপ্রোটিনকে স্বাভাবিক 6 শতাংশ থেকে 4 শতাংশে নামিয়ে আনা হয় এবং সেভাবেই নির্দিষ্ট রাখা হয়। এরপর প্লাজমাফেরেসিসের পরিবর্তন না ঘটিয়ে নির্দিষ্ট উপাদানের

খাদ্যের সংগে প্রোটিনকে পরিপূরক হিসাবে খেতে দেওয়া হলে দেখা যাবে প্লাজমায় প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রক্তের পরিমাণ (blood volume) জানা থাকলে মোট কি পরিমাণ প্লাজমাপ্রোটিন সংশ্লেষিত হয়েছে তার নির্ধারণ করা যায়

এজাতীয় পরীক্ষা থেকে হুইপল দেখেছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় প্লাজমা প্রোটিন খাদ্যপ্রোটিন থেকেই উৎপন্ন হয়, তবে খাদ্যে প্রোটিন-ঘাটতি দেখা দিলে তা কলাকোষীর প্রোটিন থেকেই উৎপন্ন করতে পারে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক প্রতিদিন 15 গ্রাম প্লাজমাপ্রোটিন উৎপন্ন করতে পারে।

প্লাজমাপ্রোটিন উৎপাদনে খাদ্যপ্রোটিনের সক্ষমতা নির্ভর করে প্লাজমা-প্রোটিনের অ্যামাইনোঅ্যাসিডের সংগে তাদের অ্যামাইনোঅ্যাসিডের সাদৃশ্যের উপর। যেসব প্রোটিনের অ্যামাইনোঅ্যাসিড প্লাজমাপ্রোটিনের অ্যামাইনো-অ্যাসিডের সংগে অধিকতর সাদৃশ্যযুক্ত, তারা অধিক পরিমাণে প্লাজমাপ্রোটিন উৎপন্ন করতে পারে। 3নং তালিকা থেকে দেখা যায় 100 গ্রাম সিরাম প্রোটিন

3 নং তালিকা

গৃহীত খাদ্যপ্রোটিনের পরিমাণ	প্লাজাপ্রোটিন উৎপাদনের পরিমাণ
100 গ্রাম সিরাম প্রোটিন	38 গ্রাম
100 গ্রাম যকৃৎ বা বৃক্ক	20 গ্রাম
100 গ্রাম আলু	20 গ্রাম
100 গ্রাম মাংস (অস্থিপেশী)	18 গ্রাম
100 গ্রাম কেসিন	12 গ্রাম
100 গ্রাম জিলাটিন	5 গ্রাম

প্রাণীকে খেতে দিলে প্রাণী তার থেকে 38 গ্রাম প্লাজমাপ্রোটিন উৎপন্ন করতে পারে ; সে ক্ষেত্রে 100 গ্রাম মাংসপেশী খেতে দিলে সে মাত্র 18 গ্রাম প্লাজমা-প্রোটিন উৎপন্ন করতে পারে। আবার, যেহেতু অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিনে বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইনোঅ্যাসিডের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, সেহেতু কোন এক ধরনের প্রোটিন (যেমন পেশী ও আন্তরযন্ত্র) অ্যালবুমিন-উৎপাদনে যেমন সহায়ক তেমনি অন্য ধরনের প্রোটিন (যেমন, উদ্ভিদ ও শস্যজাত প্রোটিন) গ্লোবিউলিন উৎপাদনে সহায়ক।

দশটি অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিডের উপস্থিতিতে প্লাজমাপ্রোটিনের

সংশ্লেষণ সন্তোষজনক হয়। প্লাজমাপ্রোটিনের সংশ্লেষণে সিস্টাইন (cystine) মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সংক্রমণে প্রোটিন-সংশ্লেষণ হ্রাস পায়।

6. **প্লাজমাপ্রোটিনের পরিণতি** (Fate of Plasma Protein) প্লাজমা-প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হয়ে অ্যামাইনোঅ্যাসিড উৎপন্ন করে, যা ধীরে ধীরে প্লাজমা থেকে অদৃশ্য হয়। প্লাজমা প্রোটিনে N^{15}, S^{35}, H^2 প্রভৃতি আইসোটোপকে লেবেল করে দেখা গেছে প্লাজমা ও অন্যান্য কলাকোষস্থ প্রোটিনের মধ্যে দ্রুত আদান-প্রদান হয়। আদান-প্রদানের সময় এই সব প্রোটিন অ্যামাইনো-অ্যাসিডে বিশ্লিষ্ট হয় এবং যথাযথ স্থানে গিয়ে পুনরায় সংশ্লেষিত হয়। এই পরীক্ষায় আরও জানা গেছে 5% প্লাজমাপ্রোটিন ও 10% যকৃৎপ্রোটিন প্রতি দিন বিনষ্ট হয় এবং পুনঃসংশ্লেষিত হয়।

সিরাম অ্যালবুমিনে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ লেবেল করে জানা গেছে, অ্যালবুমিনের হাফ-লাইফ 7 দিন। সিরামে গ্লোবিউলিনের হাফ-লাইফ একই ভাবে 3 দিন।

7. **প্লাজমাপ্রোটিনের কার্যাবলী** (Functions of Plasma Protein) **:** দেহের যেসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যে প্লাজমাপ্রোটিন অংশগ্রহণ করে নিম্নে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে :

(1) **রক্তের কোলয়েড অভিস্রবণচাপ :** রক্তের কোলয়েড অভিস্রবণচাপ বজায় রাখার কার্যে প্লাজমাপ্রোটিন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্রবণে কোলয়েডকণার সংখ্যার ওপর অভিস্রবণচাপ নির্ভরশীল। অ্যালবু-মিনের আণবিক ওজন গ্লোবিউলিনের চেয়ে যেমন কম তেমনি তার অণুসংখ্যা প্রতি ডেসিলিটার (dl) বা 100 মিলিলিটার প্লাজমায় গ্লোবিউলিনের চেয়ে অনেক বেশী। অ্যালবুমিনের অভিস্রবণচাপ উৎপন্ন করার ক্ষমতা তাই সবচেয়ে বেশী। সাধারণত রক্তের অভিস্রবণচাপ 25 থেকে 30 মিলিমিটার পারদ-চাপের সমান। তার মধ্যে 80 শতাংশ অভিস্রবণচাপের জন্য অ্যালবুমিনই দায়ী।

(2) **রক্তের সান্দ্রতা ও রক্তচাপ :** প্লাজমাপ্রোটিন রক্তের সান্দ্রতা বজায় রাখে। বিশেষ করে অধিক আণবিক ওজনসম্পন্ন গ্লোবিউলিনের গুরুত্ব ঐ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী। রক্তের চাপ বজায় রাখতে সান্দ্রতা একটি অন্যতম কারণ হিসাবে পরিগণিত।

(3) **রক্তের তঞ্চন :** ফাইব্রিনোজেন ও প্রোথ্রম্বিন রক্তের তঞ্চনপদ্ধতিতে অপরিহার্য উপাদান হিসাবে কার্য করে।

(4) **বাফার :** রক্তের অম্লক্ষারের সমতা বজায় রাখতে প্লাজমাপ্রোটিন বাফার হিসাবে কাজ করে।

(5) **কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিবহন :** প্লাজমাপ্রোটিন কার্বামিনোযৌগ গঠন করে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিবহনে সহায়তা করে।

(6) **প্রোটিনের সঞ্চয় ভাণ্ডার :** প্লাজমাপ্রোটিন সঞ্চয়-ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে। দেহে প্রোটিনের অভাব দেখা দিলে অথবা অনশনকালীন অবস্থায় দেহকলা এই প্রোটিনের সদ্ব্যবহার করে।

(7) **অ্যান্টিবডি :** γ-গ্লোবিউলিন অ্যান্টিবডি হিসাবে কার্য করে এবং দেহের প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

(8) **লোহিতকণিকার থিতানের হার :** প্লাজমাপ্রোটিন, বিশেষ করে ফাইব্রিনোজেন লোহিতকণিকার থিতানের হারকে (erythrocyte sedimentation rate) নিয়ন্ত্রিত করে। কোন কারণে প্লাজমাতে ফাইব্রিনোজেন বৃদ্ধি পেলে লোহিতকণিকার থিতানের হার বৃদ্ধি পায়। ফাইব্রিনোজেন লোহিতকণিকাকে স্তূপাকারে বিন্যস্ত করে অর্থাৎ রুলো গঠনে সহায়তা করে। কোন কোন রোগে প্লাজমাপ্রোটিনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং প্লাজমাপ্রোটিনের এই পরিবর্তন যেহেতু লোহিতকণিকার থিতানের সংগে জড়িত সেহেতু থিতানের পরিমাপ করে এসব রোগ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

(9) **অন্যান্য পদার্থের পরিবহন :** প্লাজমাপ্রোটিন বস্তুস্থিত বিভিন্ন পদার্থের সংগে সংযুক্ত হয়ে রক্তপ্রবাহে তাদের পরিবহনে সহায়তা করে। এনজাইম, হরমোন, তামা, লোহা প্রভৃতি বিশেষভাবে গ্লোবিউলিনের সংগে যুক্ত হয়ে পরিবাহিত হয়।

(10) **ট্রেফোন (trephone) :** শ্বেতকণিকা প্লাজমাপ্রোটিন থেকে ট্রেফোন নামক একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন করে, যা কলাকোষের পুষ্টি জুগিয়ে থাকে।

8. **হাইপোপ্রোটিনেমিয়া (Hypoproteinemia) :** অনশনের সময়ও বহুক্ষণ প্লাজমাপ্রোটিনের মাত্রা বজায় থাকতে দেখা যায়, তবে দীর্ঘস্থায়ী অনশনের সময় বা স্প্রু (sprue) প্রভৃতি আন্ত্রিক রোগে যখন প্রোটিনের বিশোষণ ব্যাহত হয় তখনই প্লাজমাপ্রোটিনের মাত্রা হ্রাস পায়। এই অবস্থাকে **হাইপোপ্রোটিনেমিয়া** বলা হয়। যকৃৎরোগেও প্লাজমাপ্রোটিনের মাত্রা হ্রাস পায়।

এছাড়া নেফ্রোসিসে (nephrosis) বা বৃক্করোগে প্রচুর পরিমাণে অ্যালবুমিন মূত্রে নির্গত হবার **ফলেও এই** অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। রক্তে **প্লাজমা-প্রোটিনের** পরিমাণ হ্রাস পেলে রক্তের প্লাজমা অভিস্রবণচাপ হ্রাস পায়, ফলে শোথ বা ইডিমা (edema) দেখা দেয়। বিরল হলেও কোন কোন প্লাজমা-প্রোটিনের অংশ জন্মগতভাবে অনুপস্থিত থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ **অ্যাগামাগ্লোবিউলিনেমিয়া** (agammaglobulinemia) এবং **অ্যাফাইব্রিনো-জেনেমিয়ার** (afibrinogenemia) উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে রক্তসংবহনে অ্যাণ্টিবডির অনুপস্থির জন্য দেহের সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বিশেষভাবে হ্রাস পায়, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে রক্ততঞ্চন ত্রুটিপূর্ণ হয়।

হিমোস্টেসিস বা রক্ততঞ্চন
HEMOSTASIS OR BLOOD CLOTTING

কোন রক্তনালী কেটে গেলে বা বিনষ্ট হলে ক্ষতস্থান থেকে যে সব ঘটনার সূত্রপাত হয় এবং যার ফলে রক্ত জমাট বাঁধে তাকে **হিমোস্টেসিস** বা **রক্ততঞ্চন** বলা হয়। রক্ততঞ্চনের ফলে রক্তনালী বন্ধ হয় এবং দেহ থেকে আরও অধিক রক্তক্ষরণে বাধা দেয়। রক্ততঞ্চনের প্রারম্ভে রক্তনালীর সংকোচন ও অণুচক্রিকার দ্বারা ক্ষতস্থানে সাময়িক রক্তরোধী ছিপি বা **হিমোস্টেটিক প্লাগ** (hemostatic plug) গঠন লক্ষ্য করা যায়। এই প্লাগই এরপর নির্দিষ্ট **তঞ্চনপিণ্ডে** (clot) পরিণত হয়।

1. **অকুস্থলীয় নালীসংকোচন** (Local Vasoconstriction) **:** ক্ষতিগ্রস্ত উপধমনী বা ক্ষুদ্র ধমনীর সংকোচন এমনভাবে সংঘটিত হয় যা নালীর ছিদ্রপথকেও (lumen) বন্ধ করে দিতে পারে। সম্ভবত ক্ষতস্থানে এঁটে থাকা অণুচক্রিকা থেকে ক্ষরিত **সেরোটোনিন** (serotonin) ও অন্যান্য নালীসংকোচক (vasoconstrictor) পদার্থ রক্তনালীর এজাতীয় সংকোচনের জন্য দায়ী। তবে বৃহদাকৃতি ধমনী কেটে গেলে বা বিনষ্ট হলে এজাতীয় সংকোচন লক্ষ্য করা যায় না।

2. **সাময়িক রক্তরোধী ছিপি বা প্লাগ** (The temporary Hemostatic Plug **:** রক্তনালী যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন রক্তনালীর অন্তরাবরণীকলা ভেংগে যায় এবং তাদের নিম্নস্থ কোলাজেন তন্তু বেরিয়ে পড়ে। কোলাজেন তন্তু **অণুচক্রিকাকে আকর্ষণ করে।** অণুচক্রিকা কোলাজেনে এঁটে গিয়ে **সেরোটোনিন**

(serotonin) ও অ্যাডেনোসিন ডাইফসফেট (ADP) ক্ষরণ করে। শেষোক্ত পদার্থটি আরো অন্যান্য অণুচক্রিকাকে দ্রুত আকর্ষণ করে এবং এভাবে ক্ষতস্থানে অণুচক্রিকার পুঞ্জীভবনে শিথিল প্লাগ বা ছিপির সৃষ্টি হয়। ভগ্নপ্রাপ্ত লোহিতকণিকা এবং বিনষ্ট কলাকোষ থেকে নিঃসৃত ADP-ও অণুচক্রিকার এই প্রারম্ভিক পুঞ্জীভবনে সহায়তা করে থাকে। এই অস্থায়ী বা সাময়িক প্লাগ হেপারিন বা ডাইকুমারোল (dicumarol) জাতীয় তঞ্চনরোধী পদার্থের (anticoagulant) দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

তঞ্চন ও তঞ্চনপ্রক্রিয়া
Coagulation and Mechanism of Coagulation

তঞ্চন একটি ভৌতরাসায়নিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে ক্ষরিত রক্ত 2-8 মিনিটের মধ্যে অর্ধকঠিন জেলির আকারে রূপান্তরিত হয়।

তঞ্চনপ্রক্রিয়া রক্তস্থিত **প্লাজমারই একটি বিশেষ ধর্ম**। লোহিতকণিকা বা শ্বেতকণিকার সংগে তার কোন সম্পর্ক নেই। অণুচক্রিকা সক্রিয়ভাবে এই প্রক্রিয়ার সংগে জড়িত। প্লাজমা তঞ্চিত হয়ে অবদ্রবণীয় প্রোটিনতন্তু ফাইব্রিনের যে তন্তুজাল গঠন করে, লোহিতকণিকা ও শ্বেতকণিকা তারই মধ্যে আটকা পড়ে। জমাট রক্ত (clot) তাই লাল হয়। জমাট রক্তকে এভাবে কিছুসময় রেখে দিলে, তা সংকুচিত হয়ে আয়তনে হ্রাস পায় এবং তা থেকে যে ফেঁকাশে হলদে তরল পদার্থ নির্গত হয় তাকে **সিরাম** (serum) বলা হয়। সিরাম সাধারণত তঞ্চিত হয় না এবং দীর্ঘ সময় ধরে তরল হিসাবে থেকে যেতে পারে।

1. **তঞ্চনকাল** (Coagulation time) : দেহ থেকে নির্গত রক্ত তঞ্চিত হতে যে সময় নেয়, তাকে **তঞ্চনকাল** বলা হয়। সাধারণ তঞ্চনকাল 2-8 মিনিট (গড়ে 5 মিনিট)। **লী ও হোয়াইট** (Lee, White) দেখেছেন, কাচের নলে রক্তের তঞ্চনকাল প্রায় 6-17 মিনিট এবং সিলিকনযুক্ত নলে ইহা 19-50 মিনিট।

নিম্নলিখিত পদ্ধতির সাহায্যে তঞ্চনকালের পরিমাণ করা যায় :

(a) **কৈশিক নল পদ্ধতি** (Capillary tube method) : অ্যালকোহলের দ্বারা আঙ্গুলের ডগাকে নির্বীজিত করে, তাকে সূচিবিদ্ধ করা হয় এবং রক্তের প্রথম ফোটাকে মুছে ফেলে পরবর্তী রক্তকে একটি কাচের কৈশিক নলে প্রবেশ করান হয়। কৈশিক নল প্রায় 10—15 সেন্টিমিটার দীর্ঘ এবং 1 মিলিমিটার প্রশস্ত হয়। প্রবেশের পর প্রতি 15 সেকেন্ড অন্তর কৈশিক নলকে সযত্নে

দ্বিখণ্ডিত করা হয় এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণই চালান হয় যতক্ষণ না কোন একটি ভাংগা টুকরোতে সূক্ষ্ম ফাইব্রিনতন্তু দেখা যায়। আঙ্গুলের ডগায় রক্তনির্গমন এবং কৈশিকনলে ফাইব্রিন-উৎপাদন, এই দুয়ের অন্তর্বর্তী সময়কে তঞ্চনকাল বলা হয়। এই পদ্ধতিতে তঞ্চনকাল 2-5 মিনিট।

(b) **রাইটের তঞ্চনমাপক যন্ত্র** (Wright Coagulometer)ঃ এর মূলনীতি আগের পদ্ধতির মতই। পার্থক্য হল রক্তকে একটিমাত্র কৈশিক নলে না নিয়ে সদৃশ রন্ধ্রযুক্ত ডজনখানেক কৈশিক নলে নেওয়া হয় এবং তাদের উভয়প্রান্ত বন্ধ করে 37°C জলগাহে (water bath) ডুবিয়ে রাখা হয়। মিনিট চারেক বাদে প্রথম কৈশিক নলের (প্রথম যেটিতে রক্ত নেওয়া হয়েছিল) একপ্রান্ত ভেংগে রক্তকে জলে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরপর এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করা হয়। কৈশিক নলের ভেতর রক্ত তঞ্চিত হলে ইহা কীটের (worm) আকারে জলে নির্গত হয়।

2. **রক্তমোক্ষণকাল** (Bleeding time)ঃ প্রথম রক্তক্ষরণ সুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকে রক্তপাত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সময়কে **রক্তমোক্ষণকাল** বলা হয়। স্বাভাবিক রক্তমোক্ষণকাল 1-4 মিনিট। বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে রক্তমোক্ষণ-কাল নির্ণয় করা যায়ঃ

(a) **ডিউকের পদ্ধতি** (Duke method)ঃ এই পদ্ধতিতে অ্যালকোহল দিয়ে কানের লতি বা আঙ্গুলের ডগাকে পরিষ্কার করে, তাকে ফুটো করা হয়। ফলে রক্ত নির্গত হতে থাকে। প্রতি 15-30 সেকেন্ড অন্তর নির্গত রক্তকে ফিলটার পেপারের দ্বারা শুষে নেওয়া হয়। সূচিবিদ্ধ করার সময় থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সময়কে রক্তমোক্ষণকাল হিসাবে গণ্য করা হয়। এই পদ্ধতিতে রক্তমোক্ষণকাল $1\frac{1}{2}$—3 মিনিট।

(b) **আইভির পদ্ধতি** (Ivy's method)ঃ এই পদ্ধতিতে ঊর্ধ্ববাহুকে রক্তমাপক যন্ত্রের বাহুবন্ধে (pressure cup) জড়িয়ে 40 মিলিমিটার পারদ-চাপের সমান চাপবৃদ্ধি করা হয়। এরপর ঊর্ধ্ববাহুতে 2 মিলিমিটার গভীর একটি ফুটো করা হয়। শিরাকে প্রধানত এড়িয়ে যাওয়া হয়। 10 সেকেন্ড পরপর রক্তকে ফিলটার পেপারের সাহায্যে শুষে নেওয়া হয় এবং কখন রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় তা নজর করা হয়। রক্তমোক্ষণকাল এই পদ্ধতিতে 1-4 মিনিট।

3. **তঞ্চনের সময় আণুবীক্ষণিক পরিবর্তন** (Microscopic changes during coagulation) : পরাণুবীক্ষণ যন্ত্রে (ultramicroscope) তঞ্চন প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, রক্তে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার আবির্ভাব ঘটে, বিশেষ করে ভগ্নপ্রাপ্ত অণুচক্রিকার সন্নিহিত অঞ্চলে। এই দানাগুলো এর পর পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রথমে সূচের আকার এবং পরে দীর্ঘ তন্তু গঠন করে, যা সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত হয়। তন্তুগুলো একে অপরের উপরে আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত হয়ে তন্তুজাল রচনা করে। তন্তুজাল প্রোটিনতন্তু ফাইব্রিনে গঠিত। রক্তকণিকা এই তন্তুজালে আটকা পড়ে ও এভাবে তঞ্চিত হয়। জমাট রক্ত এরপরই ধীরে ধীরে সংকুচিত হয় এবং সিরাম নির্গত হয়।
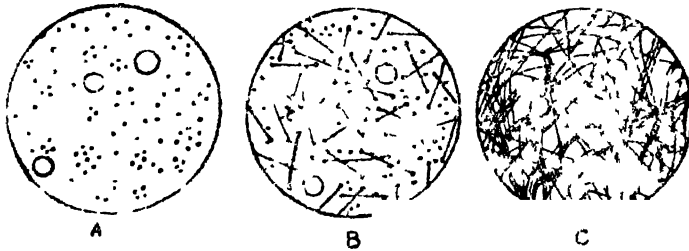
9-৬নং চিত্র : পরাণুবীক্ষণ যন্ত্রে তঞ্চনের পর্যায়ক্রম।

4. **তঞ্চনের সংগে সম্পর্কযুক্ত রাসায়নিক পরিবর্তনসমূহ** Chemical changes involved in coagulation) : তঞ্চনের সময় রক্তের দ্রবণীয় ফাইব্রিনোজেন অদ্রবণীয় ফাইব্রিনতন্তুতে রূপান্তরিত হয়। রক্তের দ্রবণীয় ফাইব্রিনোজেন একটি পলিমার (Polymer)। এনজাইম থ্রম্বিন এই পলিমারের উপর ক্রিয়া করে এবং তার 4টি আরজিনীল-গ্লাইসিন যোজক (arginyl-glycine bond) বা ফাইব্রিনোপেপটাইড যোজক (fibrinopeptide linkage) বিশ্লিষ্ট করে, ফলে ফাইব্রিনোজেন ক্ষুদ্র-অণু ফাইব্রিন মনোমারে (monomer) বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্ন ফাইব্রিন মনোমার এরপর **ডাই-সালফাইড যোজকের** (disulphide bond) দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অদ্রবণীয় ফাইব্রিনতন্তু গঠন করে। এই ফাইব্রিনতন্তু প্রথমে ঘন স্তূপাকারে অবস্থান করে। ফলে দানার মত দেখায়। এরপরেই ইহা সরল শীর্ণ সূচের আকৃতি-বিশিষ্ট তন্তুতে রূপান্তরিত হয়। এভাবে অদ্রবণীয় ফাইব্রিন পলিমার গঠিত

হয়। এই তন্তুসমূহ উপর্যুপরি ও আড়াআড়িভাবে বিস্তার লাভ করে এবং তন্তুজাল গঠন করে। রক্তকণিকা এরই মধ্যে আটকা পড়ে। জমাট রক্তকে ওভাবে কিছুক্ষণ রেখে দিলে ফাইব্রিন তন্তু প্রথমে বেঁকে যায়, এরপর কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়, ফলে রক্ত সংকুচিত হয়। এই প্রক্রিয়া অণুচক্রিকার সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। অণুচক্রিকা বৃদ্ধি পেলে ইহা বৃদ্ধি পায়, হ্রাস পেলে দীর্ঘায়িত হয়। আবার রক্তাপ্লতায় ইহা দ্রুততর হয় এবং পলিসাইথেমিয়ায় দীর্ঘায়িত হয়।

5. **তঞ্চনবিষয়ক ফ্যাক্টরসমূহ** (Coagulation factors) **:** প্রায় তেরটি ফ্যাক্টর তঞ্চনপদ্ধতির সংগে সম্পর্কযুক্ত। 1954 সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কমিটি এই তেরটি ফ্যাক্টরের যে আন্তর্জাতিক নামাকরণ ও তাদের সমার্থক শব্দের উল্লেখ করেছে 4নং তালিকায় তাদের সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ফ্যাক্টর VI এর কোন অস্তিত্ব নেই। এছাড়া XIV নামক একটি ফ্যাক্টরের অস্তিত্বের উল্লেখ করা হয়েছে, যা তঞ্চনপিণ্ডের সংকোচনে (clot-retraction) সম্ভবত অংশগ্রহণ করে।

ফ্যাক্টর I (ফাইব্রিনোজেন) : এই পদার্থটি তঞ্চনপদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করে এবং নিজে অদ্রবণীয় প্রোটিনতন্তু ফাইব্রিনে রূপান্তরিত হয়। ইহা গ্লোবিউলিনজাতীয় প্রোটিন। এর আণবিক ওজন প্রায় 330,000।

ফ্যাক্টর II (প্রোথ্রম্বিন **:** তঞ্চনের সময় এই পদার্থটি থ্রম্বিনে রূপান্তরিত হয়। প্লাজমাস্থিত এই প্রোটিন-পদার্থটি ভিটামিন K-এর সাহায্যে যকৃতে সংশ্লেষিত হয়। প্রতি 100 মিলিলিটার প্লাজমায় প্রায় 40 মিলিগ্রাম প্রোথ্রম্বিন থাকে।

ফ্যাক্টর III (থ্রম্বোপ্লাসটিন) **:** এই পদার্থটি দুটো উৎস থেকে উৎপন্ন হয়। প্রথম উৎস বিনষ্ট কলাকোষ (পরাশ্রয়ী) এবং দ্বিতীয় উৎস বিনষ্ট অণুচক্রিকা (স্বাশ্রয়ী)। কলাকোষজাত থ্রম্বোপ্লাসটিনকে মস্তিষ্ক, ফুসফুস, শুক্রাশয়, প্লাসেনটা, বিনষ্ট রক্তনালী ইত্যাদি থেকে নিষ্কাষণ করা সম্ভবপর। অপরদিকে প্লাজমাস্থিত অনেকগুলো ফ্যাক্টর পর পর বিক্রিয়া করে প্লাজমাজাত থ্রম্বোপ্লাসটিন উৎপন্ন করে। এই ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম, XII, XI, X, IX, VIII, এবং V ফ্যাক্টরসমূহ। ক্যালসিয়াম এবং থ্রম্বোপ্লাসটিন প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করে।

ফ্যাক্টর IV (ক্যালসিয়াম) **:** ক্যালসিয়াম আয়ন এক দিকে

4নং তালিকা

তঞ্চনের জন্য দায়ী ফ্যাক্টরসমূহ ও তাদের সমার্থক শব্দ

ফ্যাক্টরসমূহ	সমার্থক শব্দ
I	ফাইব্রিনোজেন।
II	প্রোথ্রম্বিন।
III	কলা-থ্রম্বোপ্লাস্টিন, পরাশ্রয়ী থ্রম্বোপ্লাস্টিন। প্লেটলেট ফ্যাক্টর,
IV	ক্যালসিয়াম।
V	ল্যাবাইল ফ্যাক্টর (labile factor), এসি-গ্লোবিউলিন (Ac-globulin) বা প্রো-অ্যাসিলারিন ইত্যাদি।
VI	গতিবর্ধক বা অ্যাসিলারিন (অস্তিত্ব নেই)।
VII	স্থিতিশীল উপাদান (stable factor), প্রো-কনভার্টিন (proconvertin), কো-থ্রম্বোপ্লাসটিন ইত্যাদি।
VIII	রক্তক্ষরণবিরোধী উপাদান (antihemophilic factor), রক্তক্ষরণ-বিরোধী গ্লোবিউলিন (antihemophilic globulin), থ্রম্বোপ্লাস্টিনোজেন ইত্যাদি।
IX	ক্রিস্টমাস ফ্যাক্টর (christmas factor), প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাসটিন উপাদান (plasma thromboplastin component) ইত্যাদি।
X	স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর (Stuart factor), প্রওয়ারের ফ্যাক্টর (Prower's factor) ইত্যাদি।
XI	প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন পূর্বিতা (plasma thromboplastin antecedent) বা সংক্ষেপে পি. টি. সি. (P. T. C.), অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর C।
XII	হ্যাগম্যান ফ্যাক্টর (Hageman factor), তলীয় উপাদান (surface factor), স্পর্শী ফ্যাক্টর (contact factor) ইত্যাদি।
XIII	ফাইব্রিনেজ (fibrinase), ল্যাকি লরান্ডের ফ্যাক্টর (Laki-Lorand factor), ফাইব্রিন স্থিতিকারী ফ্যাক্টর।
XIV	তঞ্চনসংকুচক উপাদান (clot retraction factor)

থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে, অপর দিকে প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে।

ফ্যাক্টর V (ল্যাবাইল ফ্যাক্টর) : প্লাজমায় অবস্থানকারী প্রোটিনজাতীয় এই পদার্থটি প্রোথ্রম্বিনের থ্রম্বিনে রূপান্তরকে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে।

ফ্যাক্টর VI (গতিবর্ধক) : এই উপাদানের কোন অস্তিত্ব নেই। তাই তার কোন ভূমিকা নেই।

ফ্যাক্টর VII (স্থায়ী ফ্যাক্টর) : প্লাজমায় অবস্থানকারী প্রোটিন-জাতীয় এই পদার্থটি প্রোথ্রম্বিনের সংগে সংযুক্ত থাকে এবং কলাজাত থ্রম্বোপ্লাস্টিনের উৎপাদন ত্বরান্বিত করে। রক্ততঞ্চনের সময় নিজে কনভারটিনে (convertin) রূপান্তরিত হয়।

ফ্যাক্টর VIII (রক্তক্ষরণবিরোধী ফ্যাক্টর) : প্লাজমায় অবস্থানকারী প্রোটিনজাতীয় এই পদার্থটি প্লাজমাজাত থ্রম্বোপ্লাস্টিন সৃষ্টিতে যেমন সহায়তা করে, তেমনি প্লাজমাজাত বা স্বাশ্রয়ী (intrinsic) প্রোথ্রম্বিনের রূপান্তরে সহযোগী হিসাবে কার্য করে। ফাইব্রিনোজেনের সংগে ইহা যুক্ত থাকে।

ফ্যাক্টর IX (ক্রিস্টমাস ফ্যাক্টর) : প্লাজমাজাত থ্রম্বোপ্লাসটিনের সৃষ্টিতে এই পদার্থটি সাহায্য করে।

ফ্যাক্টর X (স্টুয়ার্টের ফ্যাক্টর) : এই পদার্থটির রাসায়নিক ধর্ম অনেকটা ফ্যাক্টর VII-এর মতই। এর অনুপস্থিতিতে মৃদু রক্তক্ষরণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

ফ্যাক্টর XI প্রওয়ারের ফ্যাক্টর) : সক্রিয় হ্যাগম্যানের ফ্যাক্টর এই পদার্থটিকে সক্রিয় করে তোলে এবং ইহা থ্রম্বিন গঠনে সহায়তা করে। এর অভাবে রক্তক্ষরণের প্রবণতা দেখা যায়।

ফ্যাক্টর XII (হ্যাগম্যান ফ্যাক্টর) : প্রোটিনজাতীয় এই পদার্থটি অমসৃণ তলের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রোটিনবিশ্লেষকারী এনজাইম ক্যালিক্রেইনকে (kallikrein) সক্রিয় করে তোলে। এই এনজাইমটি প্লাজমাকিনিন (plasmakinins) নামক পদার্থে সৃষ্টি করে যা রক্তনালীর ভেদ্যতা ও সম্প্রসারণশীলতা বৃদ্ধি করে।

ফ্যাক্টর XIII (ফাইব্রিনেজ) : সক্রিয় ফাইব্রিনেজ ক্যালসিয়াম আয়নের সহযোগিতায় কোমল রক্তের তঞ্চনপিণ্ডকে অদ্রবণীয় কঠিন তন্তুতে রূপান্তরিত করে।

এ সব ফ্যাক্টর ছাড়া ফস্‌ফোলিপিড ও কেপালিন (kepalin) প্রোথ্রম্বিনেজ (prothrombinase) নামক এন্‌জাইমের উৎপত্তিতে সহায়তা করে। প্রোথ্রম্বিনের থ্রম্বিনে রূপান্তর ঘটাতে এই এন্‌জাইমটি বিশেষভাবে সহায়ক।

6. **রক্তের তঞ্চন পদ্ধতি** (Mechanism of Blood Coagulation):

(a) **মতবাদ ও ধারণা** (Theories and Concept): **ম্যালপিঘির** (Malpighi, 1966) সময় থেকে রক্তের তঞ্চনক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের আগ্রহ দেখা যায়। ম্যালপিঘি ও অন্যান্যেরা এ বিষয়ে যেসব পর্যবেক্ষণ করেন, **আলেকজাণ্ডার স্মিথ** (Alexander Schmidt সেগুলোর সংক্ষেপ করে তঞ্চন সম্বন্ধে তাঁর ধারণার উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, তঞ্চন একটি পর্যায়ক্রমিক রাসায়নিক বিক্রিয়াবিশেষ, এই বিক্রিয়ায় থ্রম্বিন নামক এন্‌জাইম রক্তের ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে রূপান্তরিত করে। তাঁর মতে প্রোথ্রম্বিন রক্তে সেভাবে থাকে না, তঞ্চনের সময় এটি তার পূর্বসূরী precursor) থেকে উৎপন্ন হয়। **মোরাউইজ** (Morawitz) এরপর রক্ততঞ্চনে Ca^{++} আয়নের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং রক্ততঞ্চনের মতবাদের ভিত্তি রচনা করেন। তার মতে রক্তের তঞ্চন দুটো পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।

(1) প্রোথ্রম্বিন ——(থ্রম্বোপ্লাস্টিন, Ca^{++})——→ থ্রম্বিন

(2) **ফাইব্রিনোজেন ——(থ্রম্বিন)——→ ফাইব্রিন**
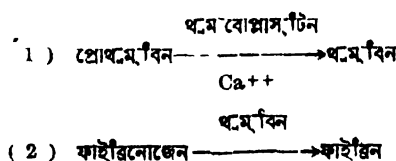
বর্তমান কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেসব বৈজ্ঞানিকেরা (Macfarlane, Biggs, Davie, Ratnoff) গবেষণা করেছেন, তাঁদের গবেষণার উপর ভিত্তি করে রক্ততঞ্চনের আধুনিক ধারণা (modern concept) গড়ে উঠেছে। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হল, রক্তের তঞ্চন একটি এন্‌জাইম সক্রিয় রাসায়নিক পর্যায়ক্রম, যার প্রতি পদক্ষেপে একটি নিষ্ক্রিয় এন্‌জাইম সক্রিয় এন্‌জাইমে রূপান্তরিত হয়। সক্রিয় এন্‌জাইম তার পরবর্তী নিষ্ক্রিয় এন্‌জাইমকে সক্রিয় এন্‌জাইমে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়া শেষ অবধি সংঘটিত হতে থাকে এবং **প্রথম ও শেষ পদক্ষেপ** ছাড়া প্রতিটি পদক্ষেপে Ca^{++} আয়নের প্রয়োজন হয়। ফ্যাক্টর V-এর (β-গ্লোবিউলিন) ক্ষেত্রে এই পর্যায়ক্রম প্রযোজ্য নয় এবং ফাই-ব্রিনোজেনও কোন এন্‌জাইম নয়। রক্তের প্লাজমাপ্রোটিন রক্তনালীর অন্তরাবরণী

(endothelium) ছাড়া কোন বিজাতীয় তলের সংস্পর্শে এলেই রক্তের তঞ্চন শুরু হয়। তলীয় স্পর্শ কোন এক অনুঘটন ক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টর XII-কে সক্রিয় ফ্যাক্টর বা সক্রিয় এনজাইম XIIA তে (A = সক্রিয়) রূপান্তরিত করে। এবপরই প্রতিটি নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টব এভাবে সক্রিয় ফ্যাক্টরে পরিণত হয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টর I (ফাইব্রিনোজেন) সক্রিয় ফ্যাক্টর IAতে (ফাইব্রিন মনোমার) রূপান্তরিত হয়। ফাইব্রিন মনোমার এরপর ফ্যাক্টর XIII এবং Ca^{++} আয়নের উপস্থিতিতে ফাইব্রিন পলিমারে (IB) পরিণত হয়।
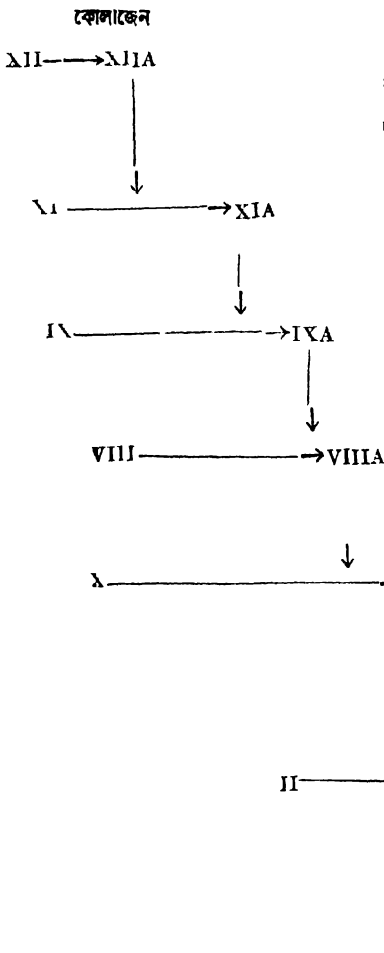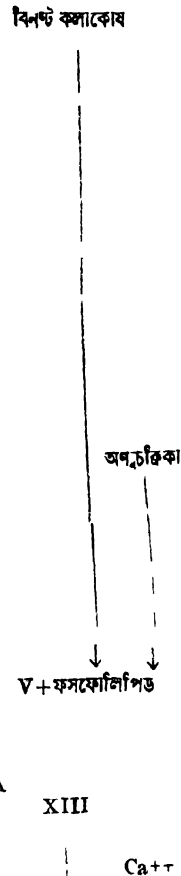
9-9 নং চিত্র ঃ ম্যাক্ফারলেনের ক্যাসকেড থিওরি।

→ = রূপান্তর,

এই পর্যায়ক্রমিক রূপান্তরকে ম্যাকফারলেন (Macfarlane) **ক্যাসকেড থিওরি** (Cascade theory) বা **জলপ্রপাত মতবাদ** নামে অভিহিত করেন, কারণ তাঁর মতে রক্তের তঞ্চন সর্বোচ্চ ফ্যাক্টর XII থেকে শুরু হয় এবং সর্বনিম্ন ফ্যাক্টর I এ গিয়ে শেষ হয়।

12টি ফ্যাক্টর (VI এর কোন অস্তিত্ব নেই) তঞ্চনপ্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। ম্যাকফারলেনের মত **ড্যাভি ও র‍্যাটনফও** তঞ্চনের ঘটনাকে পর্যায়ক্রমিক জলপ্রপাতের (water fall) সংগে তুলনা করেছেন। তাদের মতবাদ **ওয়াটারফল সীকুয়েন্স থিওরি** (waterfall sequence theory) বা **অনুক্রম জলপ্রপাত মতবাদ** নামে পরিচিত (9-9 নং চিত্র)।
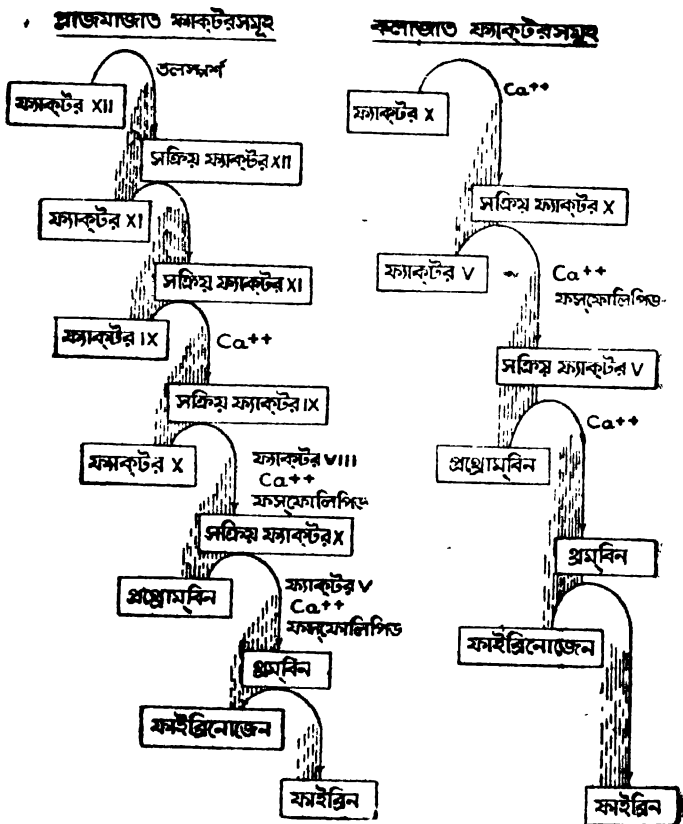
9-10 নং চিত্র : ড্যাভি ও র‍্যাটনোফের ওয়াটারফল সীকুয়েন্স থিওরি বা অনুক্রম জলপ্রপাত মতবাদ।

(b) **রক্তঞ্চনের মূলপ্রক্রিয়া** (Mechanism of Coagulation)

উপরিউক্ত মতবাদ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে রক্তের তঞ্চনপ্রক্রিয়াকে প্রধান তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় ঃ

(1) **প্রথম পর্যায়** (stage I) ঃ থ্রম্বোপ্লাসটিনের উৎপাদন। প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাসটিন উৎপন্ন হতে 4-5 মিনিট সময় লাগে, অপরপক্ষে কলাজাত থ্রম্বোপ্লাসটিন উৎপন্ন হতে 12-20 সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগে।

(2) **দ্বিতীয় পর্যায়** Stage II) ঃ থ্রম্বিন উৎপাদন। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে থ্রম্বিন উৎপন্ন হয়।

(3) **তৃতীয় পর্যায়** (Stage III) ঃ ফাইব্রিন উৎপাদন। ফাইব্রিনোজেন থেকে ফাইব্রিন উৎপন্ন হতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে।

উপর্যুক্ত পর্যায়ক্রমে প্লাজমাস্থিত একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান (ফ্যাক্টর X) দুটো বিক্রিয়াপথের মাধ্যমে পরিশেষে সক্রিয়তা লাভ করে এবং সরাসরি বা থ্রম্বোপ্লাসটিনের উপস্থিতিতে প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করে। এই দুটো বিক্রিয়াপথ হল ; 1) **স্বাশ্রয়ী বিক্রিয়াপথ** (intrinsic pathway) এবং (2) **পরাশ্রয়ী বিক্রিয়াপথ** (extrinsic pathway)। স্বাশ্রয়ী পদ্ধতিতে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সবকটি উপাদানই রক্তের প্লাজমা ও অনুচক্রিকা থেকে আসে, তবে পরাশ্রয়ী পদ্ধতিতে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী কিছু ফ্যাক্টর ; যেমন টিস্যু থ্রম্বোপ্লাসটিন বিনষ্ট কলাকোষ বা ভগ্নপ্রাপ্ত রক্তনালীর গাত্র থেকে নিঃসৃত হয়।

1. **প্রথম পর্যায়** (stage I) ঃ এই পর্যায়ে স্বাশ্রয়ী বিক্রিয়া শুরু হয় নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টর XII-এর সক্রিয়করণের মাধ্যমে। বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত রক্তনালীর অন্তরাবরণীর নিম্নদেশে অবস্থিত **কোলাজেন তন্তুর** (collagen fibers) সংস্পর্শে এলে এই নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টরটি সক্রিয় ফ্যাক্টর XII-এ রূপান্তরিত হয়। সক্রিয় XII ফ্যাক্টর এরপর ফ্যাক্টর XI কে সক্রিয় করে তুলে। শেষোক্ত সক্রিয় ফ্যাক্টর IX কে সক্রিয় করে। এরপর ফ্যাক্টর VIII এবং অনুচক্রিকার উপস্থিতিতে সক্রিয় IX ফ্যাক্টর X কে সক্রিয় করে তুলে। সক্রিয় ফ্যাক্টর X, ফ্যাক্টর V, Ca^{++} এবং অনুচক্রিকার উপস্থিতিতে এরপর **সক্রিয় থ্রম্বোপ্লাসটিন** উৎপন্ন হয়।

পরাশ্রয়ী বিক্রিয়ায় টিস্যু থ্রম্বোপ্লাসটিনের দ্বারা নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টর VII প্রথমে সক্রিয় ফ্যাক্টর VII-এ রূপান্তরিত হয়। সক্রিয় ফ্যাক্টর VII এরপর ফ্যাক্টর X-কে সক্রিয় করে তুলে। এরপর একইভাবে **থ্রম্বোপ্লাসটিন** সক্রিয়তা লাভ করে।

2. **দ্বিতীয় পর্যায় (Stage II) ঃ** স্বাভাবিক প্লাজমাতে প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন ও Ca^{++} এই তিনটি উপাদানই রয়েছে। থ্রম্বোপ্লাসটিনের
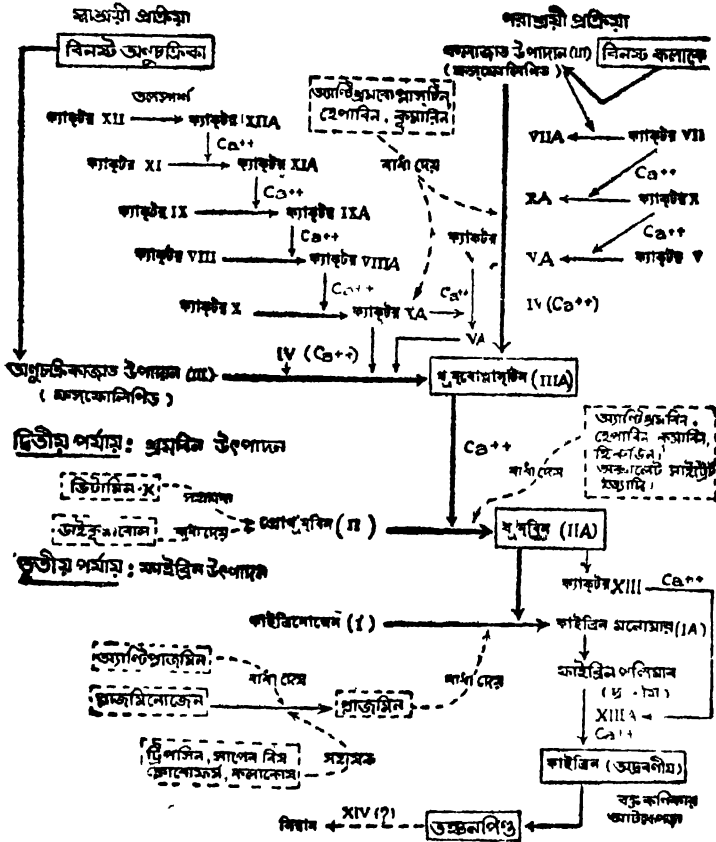
9-11 নং চিত্র ঃ তঞ্চনপ্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রম এবং তঞ্চনরোধী উপাদানের ক্রিয়াস্থান।

অনুপস্থিতিতে এরা তঞ্চনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কলাজাত থ্রম্বো-প্লাস্টিন সামগ্রিকভাবে লাইপোপ্রোটিন যৌগবিশেষ (lipoprotein complex)। তবে অনুচক্রিকাজাত থ্রম্বোপ্লাস্টিন প্রধানত লিপিডজাতীয় পদার্থ। উৎপন্ন সক্রিয় থ্রম্বোপ্লাস্টিন (IIIA) এনজাইমের মত ক্রিয়া করে এবং Ca^{++}

আয়নের উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় এনজাইম প্রোথ্রম্বিনকে (II) সক্রিয় এনজাইম থ্রম্বিনে (IIA) রূপান্তরিত করে :

$$\text{প্রোথ্রম্বিন} \xrightarrow[\text{Ca}^{++}]{\text{থ্রম্বোপ্লাস্টিন}} \text{থ্রম্বিন}$$
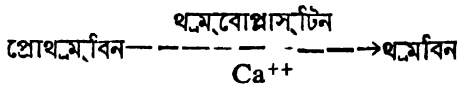
টিস্যু বা কলাজাত থ্রম্বোপ্লাস্টিন অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান। এটি মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করতে পারে। দেখা গেছে, সাইট্রেট বা অক্সালেট যুক্ত প্লাজমায় Ca^{++} মেশাবার পর, র‍্যাবিটের মস্তিষ্কের নির্যাস (brain extract) মিশ্রিত করলে মাত্র 12 সেকেণ্ডে রক্ত জমাট বাধে।

3. **তৃতীয় পর্যায়** (Stage III) : থ্রম্বিন উৎপন্ন হবার পর এটি ফাইব্রিনোজেনকে (ফ্যাক্টর I) ফাইব্রিনে (IA) পরিণত করে। থ্রম্বিন একটি গ্লাইকোপ্রোটিন। এটি প্লাজমার বিভিন্ন উপাদানের উপর ক্রিয়া করে নিজের উপাদানকে বৃদ্ধি করে।

ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে রূপান্তরের সময় এনজাইম থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেনের 4টি ফাইব্রিনো-পেপ্টাইড যোজক (আর্জিনীল-গ্লাইসিন বন্ড) বিচ্ছিন্ন করে এবং প্রথমে **ফাইব্রিন মনোমার** গঠন করে। ফাইব্রিন মনোমার পরস্পর সংযুক্ত হয়ে দ্রবণীয় **ফাইব্রিন পলিমার** গঠন করে।

থ্রম্বিন একই সংগে ফ্যাক্টর XIII কে Ca^{++} আয়নের উপস্থিতিতে সক্রিয় XIII ফ্যাক্টরে (XIIIA) পরিণত করে। XIIIA এরপর Ca^{++} আয়নের সহায়তায় দ্রবণীয় ফাইব্রিন পলিমারকে অদ্রবণীয় ফাইব্রিন পলিমারে পরিণত করে।

অদ্রবণীয় ফাইব্রিন তন্তু ফাইব্রিনের যে তন্তুজাল গঠন করে, রক্তকণিকা তার মধ্যে আটকা পড়ে **তঞ্চনপিণ্ড** (clot) সৃষ্টি করে।

7. **তঞ্চন সংকোচন** (Clot retraction) : তঞ্চনের প্রায় 20-24 ঘণ্টার মধ্যে জমাট বাধা রক্ত সংকুচিত হয় এবং তার প্রাথমিক আয়তনের অর্ধেকে রূপান্তরিত হয়। রক্তের XIV উপাদানটি ফাইব্রিন তন্তুকে পাক খাইয়ে দৈর্ঘ্য হ্রাস করে। ফলে রক্তের আয়তন হ্রাস পায়. এই উপাদানটিকে তাই **তঞ্চন সংকোচক পদার্থ** (Clot retraction factor) হিসাবে গণ্য করা হয়।

8. **প্রোথ্রম্বিন কাল** (Prothrombin time) : প্রোথ্রম্বিন থেকে ফাইব্রিন উৎপাদন হতে যে সময় লাগে, তাকে **প্রোথ্রম্বিন কাল** বলা হয়।

রক্তে প্রোথ্রম্বিনের তীব্রতা বা পরিমাণ কতটুকু তার আভাস পাওয়া যায় প্রোথ্রম্বিন কাল থেকে।

9-12নং চিত্রে প্রোথ্রম্বিনের পরিমাণের সংগে প্রোথ্রম্বিন কালের সম্পর্কে দেখানো হয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রোথ্রম্বিন কাল 12 সেকেণ্ড। কুইক পদ্ধতিতে (Quick one stage) 11-16 সেকেণ্ড।
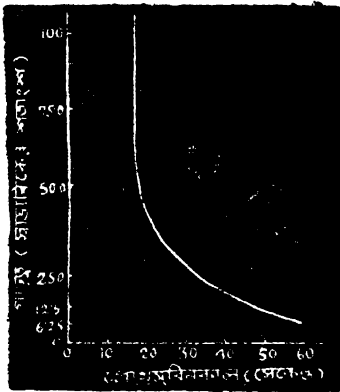
9-12 নং চিত্র : রক্তস্থিত প্রোথ্রম্বিনের গাঢ়ত্ব ও প্রোথ্রম্বিন কালের সম্পর্ক।

প্রোথ্রম্বিনকাল নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারণ করা যায় : একটি শিরা থেকে সিলিকনযুক্ত কাচের সিরিঞ্জের সাহায্যে 4·5 মিলিলিটার রক্তকে টেনে এনে সংগে সংগে অক্সালেটযুক্ত (0·1M সোডিয়াম অক্সালেট দ্রবণের 0·5 মি লি.) পরীক্ষানলে ঢালা হয় এবং একটি কেন্দ্রাতিগ যন্ত্রের সাহায্যে তাকে 15 মিনিট ধরে আবর্তন করান হয়। 0·1 মিলিলিটার প্লাজমাকে এরপর আলাদা করে একটি পরীক্ষানলে নেওয়া হয় এবং 37°C জলগাহে (water bath) ডুবিয়ে রাখা হয়। র‍্যাবিটের মস্তিষ্ক থেকে সদ্য নিষ্কাষিত 0·1 মিলিলিটার থ্রম্বোপ্লাসটিন পরীক্ষানলের প্লাজমার সংগে মেশান হয়। এরপরই 0·1 মিলিলিটার (0·025M) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ পরীক্ষানলে ঢালা হয় এবং স্টপ ওয়াচের (stop watch) সাহায্যে তঞ্চন সুরু হওয়া পর্যন্ত সময়কে রেকর্ড করা হয়। পরীক্ষা নলকে এদিক-ওদিক কাত করে রক্ত জমাট বেঁধেছে কিনা দেখতে হয়।

ফ্যাক্টর V, VII এবং X-এর অভাবে প্রোথ্রম্বিনকাল অত্যধিক দীর্ঘায়িত হয়। তাছাড়া রক্তে প্রোথ্রম্বিনের পরিমাণ 20 শতাংশ হ্রাস পেলে রক্তক্ষরণ ঘটতে পারে।

প্রথ্রোম্বিনের পরিমাণ : প্রথ্রোম্বিনকাল জানা থাকলে, নিম্নলিখিত সমীকরণের দ্বারা প্রথ্রোম্বিনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় :

$$\text{প্রোথ্রম্বিন (\%)} = \frac{k_1}{t-k_2} \times 100,$$

এখানে k_1 = প্রথম ধ্রুবক = 3·3, k_2 = দ্বিতীয় ধ্রুবক = 8·7 এবং t = প্রোথ্রম্বিনকাল।

প্রোথ্রম্বিনকাল 20 সেকেণ্ড হলে, প্রোথ্রম্বিনের পরিমাণ হবে;

$$\text{প্রোথ্রম্বিন} = \frac{3.3 \times 100}{20-8\cdot7} = 29\%$$

অর্থাৎ প্রোথ্রম্বিনের পরিমাণ এক্ষেত্রে স্বাভাবিকের 29 শতাংশ।

9. **তঞ্চনপ্রক্রিয়া যেসব অবস্থায় ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত হয়** (Conditions hastening or retarding coagulation): যেসব অবস্থায় তঞ্চনপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়, তারা নিম্নরূপ: (a) উষ্ণতা বৃদ্ধি, (b) জলেসিক্ত বা অমসৃণ তলের সংস্পর্শ, (c) কলানির্যাসের দ্রুত ইনজেকশন, (b) বিষধর সর্পের (R''ss ''s Viper) বিষের মিশ্রণ, (e) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সংমিশ্রণ, (f) থ্রম্বিনের সংমিশ্রণ, (g) থ্রম্বোপ্লাসটিনের সংমিশ্রণ, (h) ভিটামিন k-এর ইনজেকশন এবং (i) অ্যাড্রেন্যালিনের ইনজেকশন (যা রক্তনালীর সংকোচন ঘটিয়ে তঞ্চনপ্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে)।

যেসব কারণে তঞ্চনপ্রক্রিয়া মন্দীভূত হয়, তারা হল: (a) উষ্ণতার হ্রাস, (b) রক্তকে জলেসিক্ত তলের সংস্পর্শে আসতে না দেওয়া, (c) অধঃক্ষেপণ বা যৌগ গঠনের মাধ্যমে ক্যালসিয়ামের অপসারণ, (d) ফাইব্রিনোজেন অধঃক্ষেপণ, (e) রক্তের তরলীকরণ, (20 গুণ বা তারও বেশি), (f) চিকাগো ব্লু (chicago blue), ট্রিপ্যান (trypan) ব্লু প্রভৃতি বর্ণের সংমিশ্রণ, (g) হেপারিন, পেপটোন, হিরুডিন (জোঁক-নির্যাস), সিসটেইন ফেনিনডায়োন (phenindione), ডাইকোমারিন (dicoumarin) প্রভৃতির সংমিশ্রণ।

10. **তঞ্চনরোধী প্রক্রিয়া** (Anticlotting mechanism): তঞ্চনরোধী প্রক্রিয়া রক্তের তঞ্চনক্রিয়ায় যেমন বাধাদান করে, তেমনি তঞ্চিত রক্তকেও দ্রবীভূত করতে পারে। রক্তজালিকার মসৃণ আবরণীতল তঞ্চনে বাধা দান করে, কারণ রক্তের অনুচক্রিকা এই তলের সংস্পর্শে এসে বিনষ্ট হয় না। এছাড়াও তঞ্চনরোধী প্রক্রিয়াকে তঞ্চনের তিনটি স্তরে সক্রি. দেখা যায়: (a) থ্রম্বোপ্লাসটিন উৎপাদনে বাধাদান, (b) থ্রম্বিন উৎপাদনে বাধাদান এবং (c) ফাইব্রিন-উৎপাদনে বাধাদান।

থ্রম্বোপ্লাসটিন-উৎপাদনে যেসব উপাদান বাধাদান করে তাদের মধ্যে

প্রধান ঃ (1) সিলিকন, মোম, পলিস্টেরিন (polysterene) প্রভৃতি জলে আসক্ত তল, (2) বিনষ্ট কলাকোষ বা অনুচক্রিকা থেকে নির্গত নিষ্ক্রিয় থ্রম্বোপ্লাসটিনের সক্রিয়কারী ফ্যাক্টর বা ফ্যাক্টরসমূহের অভাব এবং (3) কোমারিন (coumarin) ও **হেপারিনজাতীয়** পদার্থ, যা উৎপন্ন থ্রম্বোপ্লাসটিনকে নিষ্ক্রিয় করে।

থ্রম্বিন-উৎপাদনে যেসব উপাদান বাধা দেয়, তাদেব মধ্যে প্রধান (a) থ্রম্বোপ্লাসটিন-উৎপাদন বিরোধী পদার্থসমূহ, (b) সাইট্রেট, অক্সালেট ইত্যাদি, (c) **ফাইব্রিনের থ্রম্বিন শোষণ ক্রিয়া** বা অ্যান্টিথ্রম্বিন ক্রিয়া (antithrombin), (d) কোমারিন, হিরুডিন ইত্যাদি।

ফাইব্রিন উৎপাদনের যেসব উপাদান বাধা দান করে তাদের মধ্যে প্রধান ঃ (a) **অ্যান্টিথ্রম্বোপ্লাসটিন,** (b) **অ্যান্টিথ্রম্বিন,** (c) **হেপারিন,** হিরুডিন এবং (d) **ফাইব্রিন বিশ্লিষ্টকারী সংস্থা** (fibrinolytic system)।

ফাইব্রিনবিশ্লিষ্টকারী সংস্থা উৎপন্ন ফাইব্রিনকে ভেংগে তরল করে দিতে পারে। ফলে রক্ত তঞ্চিত হয়ে থাকতে পাবে না। পেরিটোনিয়াম, প্লুরা, পেরিকারডিয়াম প্রভৃতি গহ্বরে যে রক্ত পাওয়া যায় তা তঞ্চিত হয় না। রজঃস্রাবে নির্গত রক্তও তরল থাকে। জানা গেছে **ফাইব্রিনোলাইসিন্** (fibrinolysin) **বা প্লাজমিন** (plasmin) নামক এনজাইম তার প্রাক্উপাদান (precursor) থেকে (profibrinolysin or plasminogen) ফাইব্রিনে শোষিত হযে সক্রিয়তা লাভ করে এবং ফাইব্রিনতন্তুকে ভেংগে দেয়। ফাইব্রিনেব অনুপস্থিতিতে এটি অন্যান্য প্রোটিনকেও হজম করতে পারে। ট্রিপসিন, ক্লোরোফর্ম, সাপের বিষ প্রভৃতি এর উৎপাদন বৃদ্ধি করে। আরজিনীল-গ্লাইসিন যোজকের উপর ক্রিয়া করে এটি ফাইব্রিনকে বিনষ্ট করে।

11. **তঞ্চনপ্রক্রিয়ার ত্রুটিসঞ্জাত রোগ** (Diseases due to defect in Clotting Mechanism) ঃ (a) **প্রোথ্রম্বিনের অভাব ঃ** রক্তে প্রোথ্রম্বিনের অভাবে প্রোথ্রম্বিন কাল দীর্ঘায়িত হয় এবং যখন তখন রক্তক্ষরণ ঘটে। ভিটামিন K-এর সহায়তায় যকৃতে এই পদার্থটির সংশ্লেষণ ঘটে। যকৃৎরোগে এবং দেহে ভিটামিন K-এর অভাবে প্রোথ্রম্বিন ঠিকভাবে সৃষ্ট না হলে এই রোগ দেখা দেয়। (b) **ফাইব্রিনোজেনের অভাব ঃ** রক্তে ফাইব্রিনোজেনের অভাবসঞ্জাত রোগের নাম **ফাইব্রিনোজেনোপেনিয়া** (fibrinogenopenia) বা **অ্যাফাইব্রিনোজেনিমিয়া** (afibrinogenemia)। এই রোগটি বংশগত এবং

বিরল। (c) **রক্তক্ষরণ-বিরোধক উপাদানের** (ফ্যাক্টর VIII) **অভাব :** এই পদার্থটির অভাবে **হিমোফিলিয়া** (hemophilia) রোগ দেখা দেয়। এই রোগে **তঞ্চন কাল** (coagulation time) অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘায়িত হয় এবং সামান্য আঘাতেও তীব্র রক্তক্ষরণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। হাঁটু ও কনুইয়ে রক্তস্ফীতি ঘটে। এই রোগটি সচরাচর পুরুষের মধ্যে দেখা গেলেও নারী দ্বারা সঞ্চালিত (transmitted) হয়। (d) এ ছাড়া ফ্যাক্টর V, VII এবং IX এর ঘাটতি দেখা দিলে হিমোফিলিয়া রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

12. **রক্তনালীর আভ্যন্তরীণ তঞ্চন বা থ্রম্বোসিস** (Thrombosis) **:** রক্তনালীর অভ্যন্তরে রক্তের জমাট বাধাকে থ্রম্বোসিস বলে। রক্তনালীর কোন অংশ আঘাত পেলে, রক্তপ্রবাহ মন্থর হয়ে পড়লে বা আর্টারিওস্ক্লেরোসিস হলে রক্তের অনুচক্রিকা সেখানে জড হয় এবং বিনষ্ট হয়। ফলে ফাইব্রিনতন্তুর সৃষ্টি হয় এবং রক্ত জমাট বাধে। হৃদ্‌যন্ত্রের করোনারী রক্তনালিকা (coronary vessels) এবং গুরুমস্তিষ্কের রক্তনালিকায় (cerebral vessels) এ রকম রক্তের জমাট বাধাকে যথাক্রমে **করোনারী থ্রম্বোসিস** (coronary thrombosis) এবং **সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস** (cerebral thrombosis) বলা হয়। শল্য-চিকিৎসার পর বড় বড় শিরার ভেতরেও এজাতীয় থ্রম্বোসিস হতে পারে। এছাড়া কোন ধমনীতে উৎপন্ন থ্রম্বাস (এমবোলি, Emboli) ধমনীর রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে অথবা থ্রম্বাসের টুকরোগুলো দূরবর্তী কোন অর্গানে (organ) পৌঁছে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পায়ের শিরায় উৎপন্ন থ্রম্বাসের টুকরো রক্তসংবহনের মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছে তার ধমনী বা শাখাধমনীকে বন্ধ করে দিতে পারে। এই ঘটনাকে **পালমোনারী এমবোলিজম** (pulmonary embolism) বলা হয়। এভাবে পায়ের রক্তনালীর থ্রম্বাস বা বাম নিলয়ে উৎপন্ন থ্রম্বাসের টুকরো **সেরিব্রাল এমবোলিজমের** (cerebral embolism) জন্য দায়ী।

রক্তদান
Blood Transfusion

দেহে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। কোন কারণে দেহের রক্তের পরিমাণ হ্রাস পেলে (যেমন, রক্তপাত আঘাত, শল্য-চিকিৎসা, কার্বনমনোক্সাইড ও কোল গ্যাসের দ্বারা রক্তের বিষাক্ত হয়ে পড়া

ইত্যাদি) বাইরে থেকে রক্ত বা অন্য কোন তরল পদার্থকে শিরার মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যাতে রক্তের পরিমাণ ও প্রয়োজনমত রক্তের অক্সিজেন পরিবহনের কাজটুকু বজায় থাকতে পারে। কোন রোগী বা মানুষের দেহে এভাবে কোন তরল পদার্থ বা রক্তকে প্রবেশ করানোর নাম **ট্রান্সফিউশান**। বিভিন্ন ধরনের পদার্থকে বহু বছর ধরেই একাজে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। যেমন ঃ শারীরবৃত্তীয় নুনের জল (physiological saline), উচ্চ আণবিক ওজন সম্পন্ন নানাপ্রকার পদার্থের দ্রবণ (ইজিংগ্লাস—isinglass, পলিভিনাইল পাইরোলিডোন—polyvinyl pyrrolidone, এবং ডেক্সট্রেন—dextran), রক্তপ্লাজমার বিভিন্ন অংশ, বিধৌত লোহিতকণিকা এবং সম্পূর্ণ রক্ত। নিম্ন আণবিক ওজন সম্পন্ন পদার্থ স্বল্প সময়ের জন্য রক্তের পরিমাণকে বজায় রাখতে পারে, কিন্তু এরপরই রক্তসংবহন থেকে সেগুলো বেরিয়ে যায়। তবে এদের বৈশিষ্ট্য হল এসব তরলকে যেমন দ্রুত প্রস্তুত করা যায় তেমনি সহজে জীবাণুমুক্ত করাও সম্ভবপর হ'য়। মানুষের তাজা ও সম্পূর্ণ রক্তই ট্রান্সফিউশানের পক্ষে একমাত্র আদর্শ তরল পদার্থ। এর প্রধান কারণ হল দেহে প্রবিষ্ট অধিকাংশ লোহিতকণিকাই বেশ কয়েক সপ্তাহ রক্তসংবহনে বেঁচে থাকতে পারে এবং স্বাভাবিক শ্বসনকার্য সম্পন্ন করতে পারে। এছাড়া প্লাজমাস্থিত অন্যান্য উপাদানও গ্রহীতার রক্তে প্রবেশ করে স্বাভাবিক কিছু কার্য সম্পাদন করতে পারে। তবে যে-কোন দাতার (donor রক্তকে অথবা 'ব্লাড ব্যাংকে' রক্ষিত রক্তকে যে কোন গ্রহীতার (recipient) দেহে সরাসরি প্রবেশ করানো যায় না। এর ফলে নানাপ্রকার বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ঃ (a) রক্তকণিকা পুঞ্জীভূত হয়ে পরে বিশ্লিষ্ট (hemolysis) হতে পারে, (b) পাণ্ডুরোগ বা জনডিসের (jaundice) প্রাদুর্ভাব ঘটে, (c) মূত্রের সংগে হিমোগ্লোবিন নির্গত হয়, (d) বৃক্কের স্বাভাবিক ক্রিয়া বিনষ্ট হয় ইত্যাদি। অসংগত রক্তদানে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে, কারণ অসংগত রক্তদানে বিপজ্জনক **হিমোলাইটিক ট্রান্সফিউশান রিয়েকশন** ঘটে। এক্ষেত্রে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, বিশ্লিষ্ট রক্তকণিকা থেকে নির্গত পদার্থ বৃক্কের রেচন-নালিকার ক্ষতিসাধন করে, অ্যানুরিয়া (anuria) দেখা দেয়, ফলে মৃত্যু আসে।

অসংগত রক্তদানের সময় গ্রহীতার দেহে যে প্লাজমা প্রবেশ করে তা গ্রহীতার

রক্তকোষকে সাধারণত পুঞ্জীভূত (agglutination) করে না, কারণ দাতার প্লাজমা গ্রহীতার দেহে প্রবেশ করে প্রচণ্ডভাবে লঘু হয়ে পড়ে।

রক্তের শ্রেণী

BLOOD GROUP

অসংগত রক্তদান থেকে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে, তাই কোন রোগীকে রক্তদানের পূর্বে সতর্কতার সংগে দাতা ও গ্রহীতা বা রোগীর রক্তের প্রকৃতি বা রক্তের শ্রেণী নির্ণয় করা আবশ্যক।

অন্যান্য বিভিন্ন কারণেও রক্তের শ্রেণী নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন: (1) রক্তরোগ নির্ণয়, (2) পিতৃত্ব-পরীক্ষা, (3) দোষী-নির্দোষ সাব্যস্ত (forensic medicine), (4) জাতিতত্ব বিষয়ক গবেষণা, (5) নৃতত্ত্ব-বিষয় এবং (6) অন্যান্য পরীক্ষা।

1. **অ্যাগ্লুটিনোজেন ও অ্যাগ্লুটিনিন** (Agglutinogen & Agglutinin): অসংগত রক্তদানে রক্তকণিকার জমাট বাধার জন্য রক্তস্থিত দুটো উপাদান (factor) বিশেষভাবে দায়ী: (a) **অ্যাগ্লুটিনোজেন** (agglutinogen), যা রক্তকণিকার মধ্যে অবস্থিত এবং (b) **অ্যাগ্লুটিনিন** (agglutinin), যা প্লাজমা বা সিরামে অবস্থিত।

A ও B প্রধানত এই দু' প্রকারের অ্যাগ্লুটিনোজেনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। কোন লোকের রক্তকণিকায় শুধুমাত্র A, শুধু B, একই সংগে AB অথবা একেবারে কোন অ্যাগ্লুটিনোজেন নাও থাকতে পারে। গর্ভস্থিত ভ্রূণের ষষ্ঠ সপ্তাহ থেকে রক্তকণিকায় এই পদার্থটির আবির্ভাব ঘটে এবং এর পর থেকেই এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জন্মের সময় ইহা এক-চতুর্থাংশে পৌঁছয়। অ্যাগ্লুটিনোজেন **মিউকোপলিস্যাকারাইড** (mucopolysaccharide) জাতীয় পদার্থ।

অ্যাগ্লুটিনিন α এবং β এই দুপ্রকারের রয়েছে। অ্যাগ্লুটিনোজেনের মতই এরা কোন লোকের প্লাজমা বা সিরামে শুধুমাত্র α, β বা $\alpha\beta$ হিসাবে থাকতে পারে, আবার একেবারে নাও থাকতে পারে। অ্যাগ্লুটিনিন প্রোটিন-জাতীয় পদার্থ।

2. **রক্তের শ্রেণীবিন্যাস (Grouping of Blood) :** রক্তকণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে মানুষের রক্তকে প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত করা চলে। যথা : A, B, AB এবং O শ্রেণী। এছাড়াও যেসব রক্তশ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রধান আর. এইচ ফ্যাক্টর (Rh-factor), M এবং N পদার্থ (factor)। A-শ্রেণীর রক্ত প্রায় 42% লোকে পাওয়া যায়। B শ্রেণীর রক্ত 9% লোকে এবং AB শ্রেণীর রক্ত 3% লোকে পাওয়া যায়। O শ্রেণীর রক্ত সবচেয়ে বেশী, প্রায় 46% লোকই O শ্রেণীর রক্তের অধিকারী।

A শ্রেণীকে আবার A_1 এবং A_2 এই দুভাগে বিভক্ত করা যায়। AB-কেও একই ভাবে A_1B এবং A_2B এই দুটো ভাগে বিভক্ত করা চলে। যে লোকের রক্তের শ্রেণী A, তার প্লাজমা বা সিরামে α-অ্যাগ্লুটিনিন অনুপস্থিত

5নং তালিকা : রক্তের শ্রেণীবিন্যাস অ্যাগ্লুটিনোজেন ও অ্যাগ্লুটিনিনের ভূমিকা।

রক্তের শ্রেণী	লোহিতকণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন	প্লাজমা বা সিরামস্থিত অ্যাগ্লুটিনিন
A	A	β
B	B	α
AB	A এবং B	α বা β-এর কোনটিই নয়
O	O (নেই)	α এবং β

থাকে। তেমনি তার শ্রেণী B হলে প্লাজমা বা সিরামে β অ্যাগ্লুটিনিন থাকবে না; AB হলে α বা β-র কোনটিই থাকবে না; O শ্রেণীর রক্তের প্লাজমা বা সিরামে α এবং β দুধরনের অ্যাগ্লুটিনিনই থাকা সম্ভবপর। তালিকায় তারই উল্লেখ করা হল।

3. **দাতা ও গ্রহীতার রক্তকোষ ও প্লাজমার মধ্যে বিক্রিয়া (Reaction between donor's corpuscles and recipient's plasma) :** রক্তদানকারীর লোহিতকণিকা এবং গ্রহীতা বা রোগীর প্লাজমা, এই দুয়ের মধ্যে যে ধরনের বিক্রিয়া সম্ভবপর 6নং তালিকায় তারই উল্লেখ করা হয়েছে।

6নং তালিকা ঃ দাতা ও গ্রহীতার রক্তকোষ ও প্লাজমার মধ্যে বিক্রিয়া।

দাতার লোহিতকণিকা	গ্রহীতার প্লাজমা (= রক্তশ্রেণী)			
	O(=AB)	α(=B)	β(A)	α β(O)
O		—	–	–
A	—	+	–	+
B	—	—	+	+
AB	—	+	+	+

+ = জমাট বাধে, − = জমাট বাধে না।

6নং তালিকা থেকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে O শ্রেণীর রক্তকে যে কোন রোগী বা গ্রহীতার দেহে বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করানো যায়, কারণ রোগী বা গ্রহীতার প্লাজমার সংস্পর্শে এই শ্রেণীর রক্তের রক্তকণিকা কখনও জমাট বাধে না। তবে দাতা নিজস্ব O শ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর রক্তকে সহ্য করতে পারে না। রক্তের O শ্রেণীকে তাই **অবাধ দাতার** (universal donor) পর্যায়ে ফেলা হয়। অপরপক্ষে AB শ্রেণীভুক্ত রক্তের অধিকারী লোক যে কোন শ্রেণীর রক্তকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু নিজস্ব শ্রেণী ছাড়া অন্য কাউকে রক্তদান করতে পারে না। AB-কে তাই **অবাধ গ্রহীতার** (universal recipient) পর্যায়ে ফেলা হয়। অবশ্য আর. এইচ. ফ্যাক্টর আবিষ্কারের পর 'অবাধ দাতা' ও 'অবাধ গ্রহীতা' এই শব্দদ্বয় আর সঠিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম রক্তদানের ক্ষেত্রেই তা সীমিত।
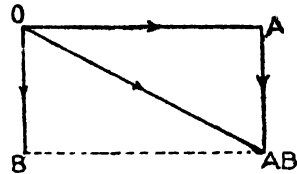
9-13নং চিত্র ঃ তীরচিহ্নের দিক দাতার রক্ত কোন গ্রহীতাকে দেওয়া যাবে তার পরিচায়ক।

A ও B শ্রেণীর রক্ত যথাক্রমে A, B অথবা AB শ্রেণীভুক্ত রক্তের অধিকারী লোকের দেহেই প্রবেশ করানো সম্ভবপর। 9-13নং চিত্রে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। কোন্ কোন্ গ্রহীতা বা রোগীকে রক্তদানকারী রক্তদান করতে পারবে তারই ইংগিত তীরচিহ্নের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে।

4. **রক্তের শ্রেণী নির্ণয়** (Determination of Blood Group) ঃ α ও β অ্যাগ্লুটিনিনসম্পন্ন শুধুমাত্র দুটো অ্যান্টিসিরামের (antisera) সাহায্যে রক্তের যে কোন শ্রেণীকে নির্ণয় করা সম্ভবপর। রক্তকে প্রথমে শারীরবৃত্তীয় লবণ

জলে (0·9 শতাংশ সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ) তরলীকৃত করে লোহিত-কণিকার 5% অবলম্ব তৈয়ারী করা হয়। এরই এক ফোটা স্লাইডের উপর রেখে তার সংগে এক ফোটা অ্যান্টিসিরাম-A বা α-অ্যাগ্লুটিনিনসম্পন্ন সিরাম মিশানো হয়। একই ভাবে আর এক ফোটা রক্তে β-অ্যাগ্লুটিনিনযুক্ত সিরাম (anti-B) মেশানো হয়। রক্তকণিকা শুধুমাত্র যদি অ্যান্টি-A এর সংস্পর্শে জমাট বাধে তবে তা A শ্রেণীর রক্ত হবে। তেমনি শুধুমাত্র অ্যান্টি-B এর সংস্পর্শে জমাট বাধলে তা B শ্রেণীর ; উভয় সিরামের সংগে জমাট বাধলে AB এবং দুয়ের কোনটির সংগে জমাট না বাধলে O শ্রেণীর রক্ত হবে।

9-14নং চিত্র : রক্তের শ্রেণী নির্ণয়।
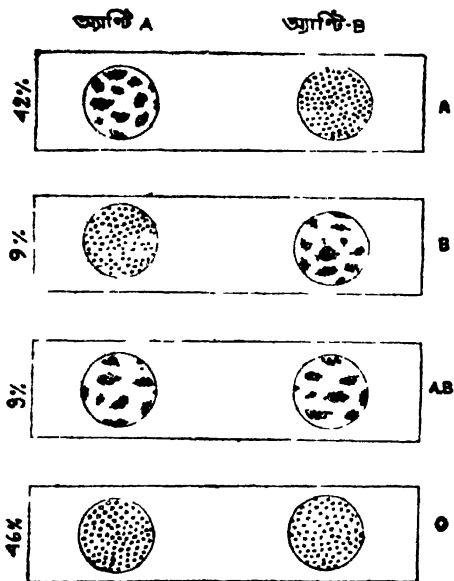
5. H-শ্রেণী (H group): প্রায় প্রত্যেক মানুষের লোহিত-কণিকায় H-পদার্থকে দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন সিরামে অ্যান্টি-H বা H-বিরোধী পদার্থও পরিলক্ষিত হয়। ABO শ্রেণীর মধ্যে O শ্রেণীর রক্তে H পদার্থ সবচেয়ে বেশী এবং AB-তে সবচেয়ে কম।

6. **Rh., M এবং N পদার্থ** (Rh, M and N factors) :

(a) **R-h-পদার্থ** : Rh পদার্থটি রেসাস (Rhesus) বানরের লোহিত-কণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেনবিশেষ। মানুষের লোহিতকণিকায় এর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে 1940 সালে। সাদা চামড়ার লোকেদের শতকরা প্রায় ৮5 জন এবং ভারতীয় ও শ্রীলংকার শতকরা 95 জনের লোহিতকণিকায় এই অ্যাগ্লুটিনোজেনটি বর্তমান। মানুষের প্লাজমাতে এর অনুরূপ কোন অ্যাগ্লুটিনিন নেই।

আধুনিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে Rh-পদার্থ গোটা ছয়েক অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টিবিশেষ। তিনটি জোড়ায় তাদের ভাগ করা চলে। যথা, C, c ; D, d ; এবং E, e। এর মধ্যে C, D এবং E-কে **মেনডেলীয় প্রধান** (Mendelian dominants) এবং c, d ও e-কে **অপ্রধান** (recessive) বলা

হয়। মানুষের লোহিতকণিকায় একত্রে তিনটি অ্যাগ্লুটিনোজেন থাকে। তবে প্রতি জোড়ার দুটি উপাদান কখনও একসংগে থাকে না। যেমন, CDE বা cDe একসংগে থাকতে পারে, কিন্তু CcD বা cDd, এরকম যোগাযোগ আদৌ সম্ভবপর নয়।

যেসব Rh-শ্রেণীতে শুধুমাত্র মেনডেলীয় প্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান তাদের **ধনাত্মক Rh (Rh^+)** বলা হয়। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh-এ D থাকতে বাধ্য। ঋণাত্মক rh-(Rh^-) শ্রেণীতে শুধুমাত্র অপ্রধান c, d এবং e-র উপস্থিতি লক্ষণীয়। ধনাত্মক Rh (দাতা) এবং ঋণাত্মক rh (গ্রহীতা), এই দুই-এর বিক্রিয়ার ফলে অসংগতি (incompatibility) পরিলক্ষিত হয়।
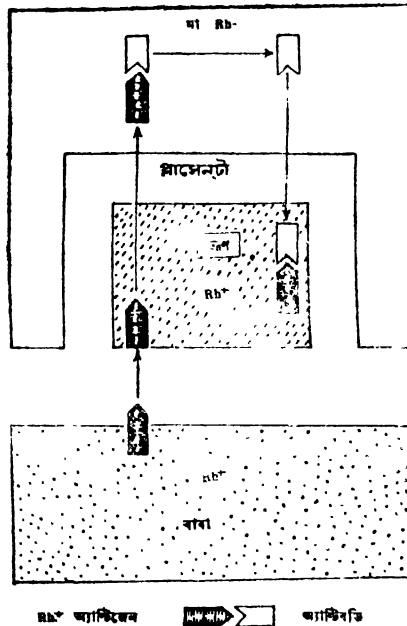
9-15নং চিত্র : ইরীথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস।

Rh-এর গুরুত্ব: ধনাত্মক Rh-কে কোন ঋণাত্মক rh সম্পন্ন রোগীর দেহে প্রবেশ করালে প্রায় 12 দিনের মাথায় রোগীর প্লাজমায় Rh-বিরোধী পদার্থ (Anti-Rh factor) বা অ্যান্টিবডির আবির্ভাব ঘটে। দ্বিতীয়বার পূর্বোক্ত রোগীর দেহে ধনাত্মক Rh-যুক্ত লোহিতকণিকার প্রবেশ ঘটালে

লোহিতকণিকাগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বাধে। রক্তদানের পূর্বে তাই Rh-পদার্থের সঠিক অস্তিত্ব খুঁজে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এছাড়া গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের রক্ত ধনাত্মক (Rh^{+}) এবং মাতৃরক্ত ঋণাত্মক rh-সম্পন্ন (Rh^{-}) হলে ভ্রূণস্থিত ধনাত্মক Rh-অ্যাগ্লুটিনোজেন মাতৃরক্তে প্রবেশ করে এবং ধনাত্মক Rh-বিরোধী (Anti-Rh factor) পদার্থ গঠন করে। এভাবে সৃষ্ট Rh-বিরোধী পদার্থ ভ্রূণের রক্তে প্রবেশ করে রক্তের লোহিতকণিকাকে বিনষ্ট করে (erythrobastosis foetalis), ভ্রূণও বিনষ্ট হয় এবং গর্ভপাত ঘটে। এই অবস্থায় শিশু যদি জীবিতও থাকে তবু তার দেহে প্রচণ্ড রক্তাল্পতা পরিলক্ষিত হয়। জন্মের পর তার দেহে পাণ্ডুরোগ দেখা দেয়।

Rh-পদার্থের নির্ণয় (Determination of Rh-factor) **:** রক্তের লোহিতকণিকাতে Rh পদার্থের উপস্থিতি নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা যায় (coomb's test) **:** র‍্যাবিটকে মানুষের লোহিতকণিকার বিরুদ্ধে সংক্রামিত করা হয়। সংক্রামিত র‍্যাবিটের সিরামকে একটি টেস্টটিউবে নেওয়া হয়। যে রক্তকে পরীক্ষা করা হবে, সেই রক্তের লোহিতকণিকার 20% অবলম্বন (suspension) তৈরী করা হয়। এই অবলম্বনের কয়েক ফোটা রক্তকে সিরামে মিশ্রিত করে, তাকে আধঘণ্টা 37°c জলগাহে ডুবিয়ে রাখা হয়। এই মিশ্রণকে এরপর 2 মিনিট ধরে সেন্ট্রিফিউজ করা হয় এবং অ্যাগ্লুটিনেশন বা পুঞ্জীভবন হয়েছে কিনা দেখা হয়। রক্তকণিকা পঞ্জীভূত হলে বুঝতে হবে, পরীক্ষাকৃত কোষ নির্দিষ্ট অ্যাগ্লুটিনোজেনের অধিকারী। ইরীথ্রোব্লাস্ট ফিটালিসে (erythroblast foetalis) সংবেদী কোষকে এভাবে নির্ণয় করা যায়।

(b) M ও N পদার্থ : M, N এবং MN, রক্তের এই তিনটি শ্রেণীর পৃথক সত্তা বজায় থাকলেও রক্তদানের ব্যাপারে এরা কোনপ্রকার বিপত্তি ঘটায় না। চিকিৎসাবিজ্ঞানে পিতৃত্ব-পরীক্ষায় এদের অবদান রয়েছে।

পিতৃত্ব পরীক্ষা (Paternity test) **:** প্রতিটি মানুষের মধ্যে দুপ্রকারের রক্তবীজ (blood gene) রয়েছে, যথা **:** M+M, N+N অথবা M+N। শিশুর রক্ত যদি M শ্রেণীর হয় তবে সে তার পিতামাতা থেকে অবশ্যই M+M রক্তবীজ পেয়েছে। শিশুর রক্ত N হলে পিতামাতা থেকে N+N এবং MN হলে পিতামাতা থেকে M+N শিশুতে পরিবাহিত হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে মায়ের অনুপূরক শ্রেণী (supplementary group) N হলে পিতার রক্তের

শ্রেণী অবশ্যই M হতে হবে। 7নং তালিকায় তারই উল্লেখ করা হল।

7নং **তালিকা ঃ** পিতা, মাতা ও জাতকের রক্তের শ্রেণী সম্পর্কে।

শিশুর রক্তের শ্রেণী	পিতামাতার প্রদত্ত শ্রেণী	মায়ের শ্রেণী	পিতৃরক্তে অনুপস্থিত শ্রেণী
N	N + N	নির্দিষ্ট নয়	M
M	M + M	"	N
MN	M + N	N	M
MN	N + M	M	N

অস্থিমজ্জা
BONE MARROW

অস্থিমজ্জা এক ধরনের কোমল কলা, যা দীর্ঘাস্থি ও হ্যাভারসিয়ান নালীর মজ্জাগহ্বর এবং স্পঞ্জাস্থির ট্রাবেকুলার (trabecula) অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করে। ইহা সূক্ষ্ম সংযোগরক্ষাকারী জালক কলার তন্তুজালে (messes) গঠিত। তন্তুজালে বিভিন্ন প্রকার কোষের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। অস্থিমজ্জাকে দু ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় ঃ (1) **লোহিত মজ্জা** (red marrow) এবং (2) **হলুদ মজ্জা** (yellow marrow)।

1. **লোহিত মজ্জা** (Red marrow) ঃ ভ্রূণগত এবং অপরিণত অস্থিতে শুধুমাত্র লোহিত মজ্জা দেখা যায়, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কে ইহা শুধুমাত্র কশেরুকা (vertebra), উরঃফলক (sternum), পঞ্জরাস্থি (ribs), করোটিকাস্থি (cranial bone), উর্বাস্থি (femur), প্রগণ্ডাস্থি (humerus) এবং শ্রোণীচক্রে দেখা যায়। প্রাপ্তবয়স্কে লোহিতকণিকা ও দানাদার শ্বেতকণিকার একমাত্র উৎস লোহিত মজ্জা। লোহিতমজ্জার জালক কোষ ও জালকতন্তুর যে কাঠামো বা স্ট্রোমা (stroma) দেখা যায়, তার মধ্যে মুক্ত কোষাবলীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। স্ট্রোমাতে বিভিন্ন প্রকার চর্বি কোষও দেখা যায়। লোহিতমজ্জায় যে সব ধমনী প্রবেশ করে, তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত হয়ে পরস্পর সংযোগী সাইনুসোয়েড (sinusoid) বা নালীস্ফীতির কৈশিকজাল গঠন করে। অন্য স্থানের রক্তজালিকার মত এরাও সূক্ষ্ম অন্তরাবরণী কলা বা এনডোথেলিয়ামের (endothelium) দ্বারা গঠিত। প্রসারিত হলে এরা বৃহদাকৃতি শিরার মত ধারণক্ষমতার অধিকারী হয়।

লোহিতমজ্জার মস্ত কোষাবলী অপরিণত ও ক্রমবর্ধনশীল লোহিতকণিকা ও দানাদার শ্বেতকণিকার বিভিন্ন পর্যায়ের কোষের সমন্বয়ে গঠিত। মজ্জাকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রয়োগকৌশলের দ্বারা বর্ণরঞ্জিত করলে বিভিন্ন পর্যায়ের রক্তকণিকার সনাক্তকরণ সহজতর হয় (9-16নং চিত্র) লোহিতকণিকার বৃদ্ধিপর্যায়ের যেসব কোষের সন্ধান অস্থিমজ্জায় পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে প্রধান হিমোসাইটোব্লাস্ট, প্রোইরীথ্রোব্লাস্ট, প্রারম্ভিক নরমোব্লাস্ট, মাধ্যমিক নরমোব্লাস্ট, পরবর্তী (late) নরমোব্লাস্ট, রেটিকুলোসাইট এবং পরিণত লোহিতকণিকা। দানাদার শ্বেতকণিকার বৃদ্ধিপর্যায়ের যেসব কোষাবলী লোহিতমজ্জায় দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে প্রধান: হিমোসাইটোব্লাস্ট,
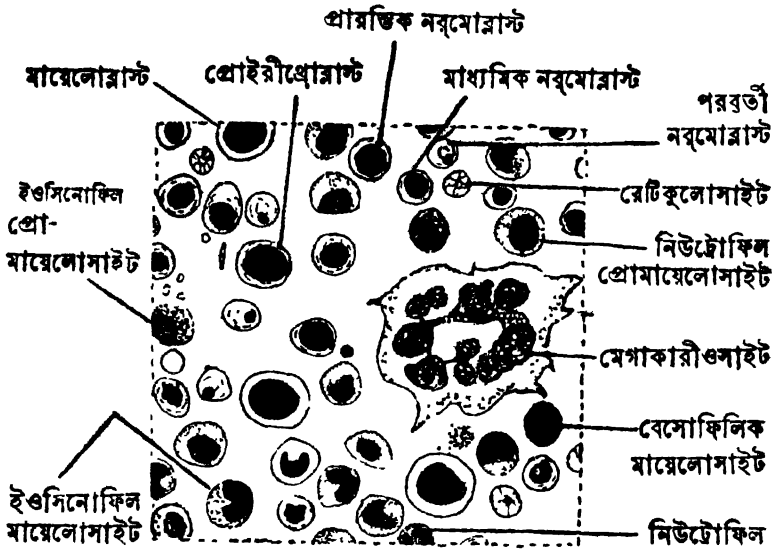
9-16নং চিত্র: লোহিতমজ্জার বৃদ্ধিকালীন অবস্থায় নানা পর্যায়ের রক্তকণিকা।

মায়েলোব্লাস্ট; (1) নিউট্রোফিলিক প্রোমায়েলোসাইট, নিউট্রোফিলিক মায়েলোসাইট, নিউট্রোফিলিক মেটামায়েলোসাইট এবং নিউট্রোফিল শ্বেতকণিকা; (2) ইওসিনোফিলিক প্রোমায়েলোসাইট, ইওসিনোফিলিক মায়েলোসাইট, ইওসিনোফিলিক মেটামায়েলোসাইট এবং ইওসিনোফিল শ্বেতকণিকা; (3) বেসোফিলিক প্রোমায়েলোসাইট, বেসোফিলিক মায়েলোসাইট, বেসোফিলিক মেটামায়েলোসাইট এবং বেসোফিল শ্বেতকণিকা। এছাড়া লিম্ফোব্লাস্ট, লিম্ফোসাইট, মনোব্লাস্ট, মনোসাইট এবং মেগাকারীওসাইট প্রভৃতি কোষের সমাবেশও লক্ষ্য করা যায়।

(a) **অনুশীলন পদ্ধতি** (Methods of study) : প্রধানত তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে অস্থিমজ্জাকে অনুশীলন করা যায় : (1) সজীব মজ্জার প্রলেপ টানা এবং জেনাস গ্রীন (Jenus green) বা নিউট্রাল রেড (neutral red) বর্ণ প্রয়োগে রঞ্জিত করা। প্রথমটি মাইটোকনড্রিয়াকে এবং দ্বিতীয়টি কোষের দানাকে বর্ণ যুক্ত করে। সজীব কোষ চলমান হলে, এ জাতীয় অনুশীলনে তাদের এই ধর্ম বজায় থাকে। (2) স্থায়ী মজ্জাপ্রলেপ বা মজ্জাচ্ছেদ বা রক্ত-প্রলেপে লিশম্যানের বর্ণ প্রয়োগ। এজাতীয় পদ্ধতির দ্বারা নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম ও সাইটোপ্লাজমীয় দানাদার পদার্থের অনুশীলন করা সহজতর হয়। (3) লোহিত-কণিকা উৎপাদনকারী সজীব কোষের সাইটোপ্লাজমে রেটিকুলামের (reticulum) উপস্থিতির অনুশীলন ক্রেসাইল ব্লু (cresyl blue) বর্ণের প্রয়োগের দ্বারা সহজ হয়।

(b) **মেগাকারীওসাইট** (Megakaryocytes) : মেগাকারীওসাইট হিমোসাইটোব্লাস্ট কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। 30—100μ ব্যাসসম্পন্ন (কারও কারও মতে 30—160μ) এই বিশাল কোষ থেকে অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়। প্রাপ্তবয়স্কে শুধুমাত্র মজ্জাতেই এদের দেখা যায় ; তবে ভ্রূণাবস্থায় যকৃৎ ও প্লীহাতেও এই কোষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মেগাকারীওসাইটের নিউক্লিয়াস বহুলতিযুক্ত, যা জটিলভাবে ও বিসদৃশভাবে বিন্যস্ত থাকে। হিমোসাইটোব্লাস্ট থেকে উৎপন্ন হবার সময়ে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ছাড়াই নিউক্লিয়াস পর পর বিভাজিত হয় এবং অ্যানাফেজ বা টেলোফেজে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যায়। এরপরই পুনরায় তারা সংযুক্ত হয়। ফলে দুপ্রস্থ (2N) ক্রোমো-সোমের স্থানে মেগাকারীওসাইটের নিউক্লিয়াসে 32N—64N ক্রমোসোমের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় (polyploid nucleus)।

অন্যান্য কোষের মত মেগাকারীওসাইটেও সবরকম উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গলজি বডিতে অসংখ্য সূক্ষ্ম কণা দেখা যায়। কোষের আকৃতি অনিয়তাকার এবং বহু ক্ষণপদসম্পন্ন। এসব ক্ষণপদের (pseudopodia) ভগ্ন খণ্ড থেকে অণুচক্রিকা জন্ম নেয়।

(c) **মেগাকারীওসাইটের ব্যাস নির্ণয়** (Measurement of the diameter of megakaryocyte) : একটি ওকুলার মাইক্রোমিটার (ocular micrometer) এবং একটি স্টেজ মাইক্রোমিটারের (stage micrometer) সাহায্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মেগাকারীওসাইটের ব্যাস নির্ণয় করা যায়। স্টেজ

মাইক্রোমিটার মাইক্রোস্কেল সমেত একটি কাচের স্লাইডবিশেষ। মাইক্রোস্কেল সমেত অভিনেত্র ওকুলার মাইক্রোমিটার হিসাবে পরিচিত।

প্রথমে, স্টেজ মাইক্রোমিটারের সাহায্যে ওকুলার মাইক্রোস্কেলের প্রতিটি বিভাগের মান নির্ণয় করা হয়। স্টেজ-মাইক্রোমিটারকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের স্টেজে বসিয়ে এবং ওকুলার মাইক্রোমিটারযুক্ত অভিনেত্রকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে লাগিয়ে প্রথমে দেখে নিতে হয়, স্টেজ মাইক্রোমিটারের কয়টি ভাগের সংগে ওকুলারের কত সংখ্যক ভাগ সমান হয়েছে। স্টেজ মাইক্রোমিটারের x সংখ্যক ভাগের সংগে ওকুলার মাইক্রোমিটারের y সংখ্যক ভাগ সমান হলে এবং স্টেজ মাইক্রোমিটারের প্রতিটি ভাগের মান 10μ হলে, ওকুলার মাইক্রোস্কেলের প্রতিটি বিভাগের মান হবে,

$$\text{ওকুলার মাইক্রোস্কেলের 1টি বিভাগ} = 10x/y$$

$$= 10 \times \frac{\text{স্টেজ } (x)}{\text{ওকুলার } (y)}$$

3 বাব স্টেজ মাইক্রোমিটারেব x এব সংগে ওকুলার মাইক্রোমিটাবের y কে সমান করে, ওকুলার মাইক্রোমিটারেব 1টি ভাগের গড় মান নির্ণয় করা হয়। যথা:

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	স্টেজ (x)	ওকুলার (y)	ওকুলার 1টি বিভাগ (10x/y)	গড় মান
1	[illegible]	20	2[illegible] μ	
2	[illegible]	[illegible]	2 4 μ	2 4[illegible] μ
3	10	40	2[illegible] μ	

অতএব, ওকুলার মাইক্রোস্কেলের প্রতিটি বিভাগের গড় মান এক্ষেত্রে $= 2{\cdot}46\mu$.

অতিবর্ধক (high power) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যদি দেখা যায় ওকুলার মাইক্রোস্কেলে 35টি বিভাগ মেগাকারীওসাইটকে সঠিকভাবে আবৃত করেছে, তাহলে এক্ষেত্রে মেগাকারীওসাইটের ব্যাসের মান হবে, $35 \times 2{\cdot}46 = 87{\cdot}1\mu$,

2. হলুদ মজ্জা (yellow marrow): হলুদ মজ্জা প্রধানত স্নেহ-

জাতীয় পদার্থ, জালক কলা ও রক্তনালীর সমন্বয়ে গঠিত। রক্তকণিকা এই মজ্জাতে উৎপন্ন হয় না। প্রাপ্তবয়স্কের যেসব অস্থিতে লোহিত মজ্জা অনুপস্থিত থাকে, সেসব স্থানে এদের দেখা যায়।

জন্ম থেকে 4 বৎসর পর্যন্ত সব অস্থিতেই লোহিত মজ্জার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। 7 বৎসর বয়সের পর থেকে লোহিত মজ্জার সক্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে এবং তা ফিকে লোহিতবর্ণ ধারণ করে। 10-14 বৎসর বয়সের মধ্যে দেহের দীর্ঘাস্থিসমূহের প্রান্তদেশে হলুদ মজ্জার আবির্ভাব ঘটে এবং তা উভয় দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রায় 20 বৎসর বয়সে শুধুমাত্র উর্বাস্থি এবং প্রগণ্ডাস্থি ছাড়া সব কটি দীর্ঘ অস্থিই হলদে মজ্জায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। 70 বৎসর বয়সে উরঃফলক (sternum) এবং পাঁজরের প্রায় অর্ধাংশ হলদে মজ্জায় পূর্ণ হয়।

3 **অস্থিমজ্জার কার্যাবলী** (Functions of Bone Marrow) :

অস্থিমজ্জার কার্যবলীর মধ্যে প্রধান ঃ

(a) লোহিতকণিকা ও হিমোগ্লোবিন উৎপাদন ;

(b) মেগাকারীওসাইট (megakaryocytes) থেকে অণুচক্রিকার সৃষ্টি ;

(c) সবরকম শ্বেতকণিকার বিশেষ করে দানাদার শ্বেতকণিকার) উৎপাদন ;

(d) লোহিতকণিকার বিনাশসাধনে অংশগ্রহণ ;

(e) R-E তন্ত্রের অন্তর্গত বলে মজ্জা দেহের প্রতিরক্ষা ও অস্থির পুনর্বিন্যাসে (ওসটিওক্লাস্ট-ক্রিয়া) অংশগ্রহণ করে ;

(f) ফেরিটিন ও হিমোসিডারিন হিসাবে লোহাকে সঞ্চয় করা এবং

(g) অস্থি-উৎপাদনে অংশগহণ করা (ওস্টিওব্লাস্ট, ওস্টিওসাইট, ওস্টিওক্লাসটের সাহায্যে)।

লোহিতকণিকা
ERYTHROCYTES

লোহিতকণিকা ক্রমবৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষভাবে রূপান্তরিত হয়ে অক্সিজেন পরিবহনের বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করে। তাই নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীতে তাদের নিউক্লিয়াস থাকলেও মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে (উট ছাড়া) তাদের নিউক্লিয়াস থাকে না এবং স্বাভাবিকভাবেই তা লোপ পায়। শুধু নিউক্লিয়াসই নয়, রক্তসংবহনে প্রবেশের আগে তাদের গলজি বডি, সেন্ট্রিওল

অন্তঃকোষ জালক, রাইবোসোম এবং অধিকাংশ মাইটোকন্ড্রিয়া বিলোপ পায়। এভাবে কোষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে শুধুমাত্র অক্সিজেন পরিবহনের উপাদান (element) হিসাবে তারা রক্তসংবহনে অবস্থান করে। লোহিতকণিকা তাই সঠিক অর্থে কোষ নয়, কোষসদৃশ উপাদান বিশেষ (formed element)। স্ট্রোমাতে হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির দরুণ রক্তপ্রলেপে তাদের ফেকাশে লাল বা ঈষৎ হলদে এবং খালিচোখে লাল দেখায়। লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিন সূর্যরশ্মির ক্ষুদ্রতর তরংগদৈর্ঘ্যের আলোকে (নীল ও সবুজ) অত্যধিক শোষণ করে বলে রক্তকে লাল দেখায়।

1. আকৃতি (Shape): লোহিতকণিকা গোলাকার, দ্বি-অবতল, নিউক্লিয়াসবিহীন চাকতি বিশেষ। সমতলে এদের প্রান্তরেখা তাই গোলাকার ও পুরু এবং কেন্দ্রদেশ আনত। প্রান্তদেশ বরাবর দেখলে তাদের ডাম্বেলের মত দেখায়। লোহিতকণিকা অত্যন্ত নমনীয় বা স্থিতিস্থাপক হয়, তাই সূক্ষ্ম রক্তজালিকার মধ্য দিয়ে অতিক্রমের সময় তাদের আকৃতি বিস্ময়করভাবে পরিবর্তিত হয় এবং সূক্ষ্ম রক্তজালিকা থেকে নির্গমের পর তারা স্ব-আকৃতিতে ফিরে আসে। লোহিতকণিকার এই আকৃতি তার কার্য সম্পাদন ও স্থায়িত্বের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কারণ (1) নিউক্লিয়াস না থাকার ফলে তারা যে পরিমাণ হিমোগ্লোবিন স্ট্রোমাতে ধরে রাখতে পারে, তার অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা অনেক বেশী; (2) দ্বি-অবতল আকৃতির জন্য তাদের তলীয় ক্ষেত্রফল অনেক বেশী হয় এবং অধিক গ্যাসের সংস্পর্শে তারা আসতে পারে, ফলে হিমোগ্লোবিনের সংগে

9-17নং চিত্র: পরমাণুবীক্ষণ যন্ত্রে লোহিতকণিকার আকৃতি।

অণুচক্রিকা

মনোসাইট

লিম্ফোসাইট

নিউট্রোফিল

বেসোফিল

ইওসিনোফিল
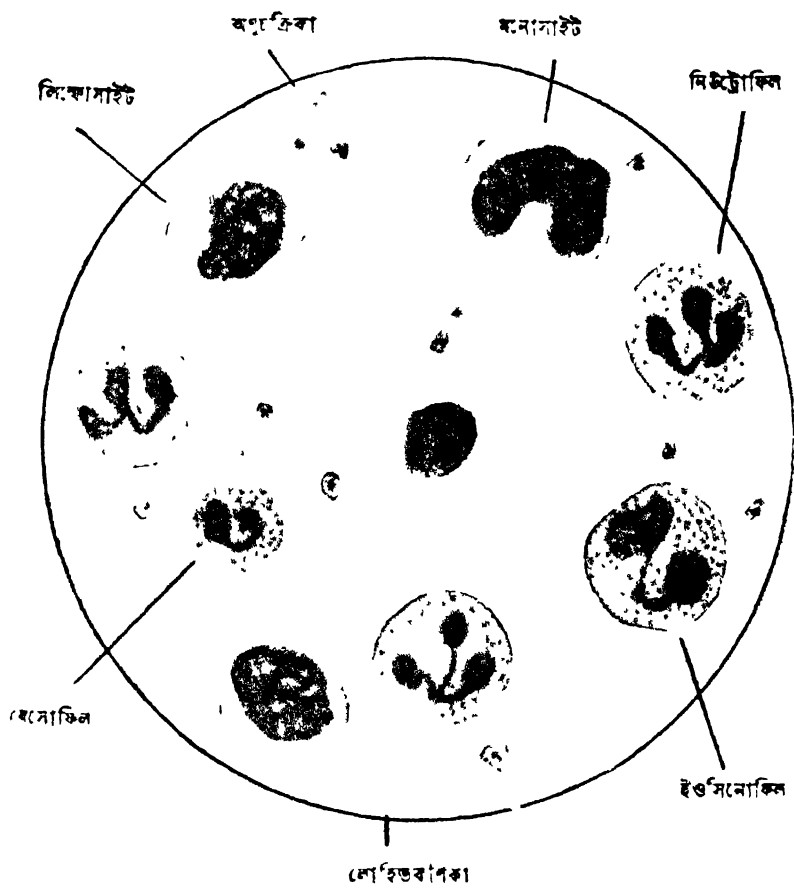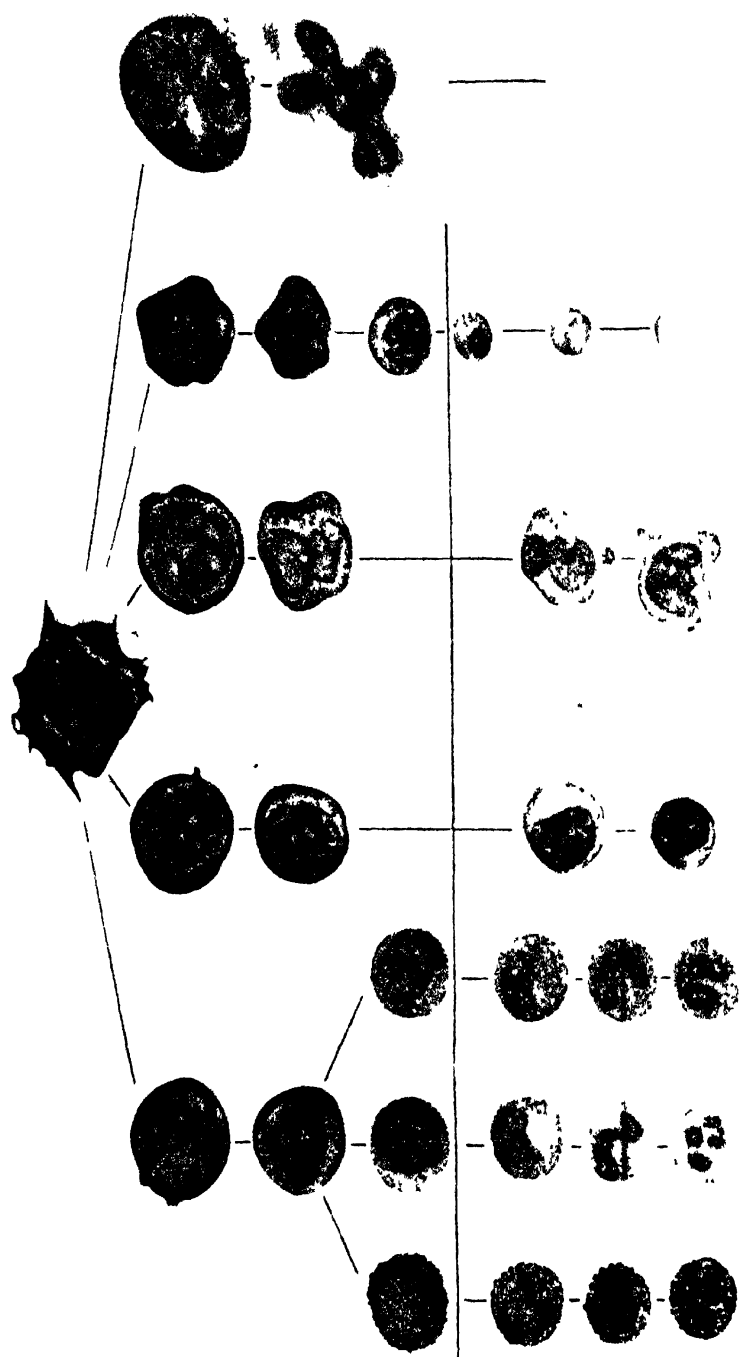
লোহিতকণিকা

গ্যাসের সংযুক্তি ও বিয়োজন দ্রুত সংঘটিত হতে পারে, (3) রক্ত কিছুটা লঘুসারক (hypotonic) হয়ে পড়লেও তারা ফেটে যায় না, পিংপং বলের মত গোল হয়ে ওঠে এবং নিজেদের টিঁকিয়ে রাখতে পারে এবং (4) সংকীর্ণ রক্ত-জালিকার মধ্য দিয়ে অতিক্রমের সময় তাদের আকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

2. **রুলো গঠন** (Rouleaux formation) : রুলো গঠন লোহিত-কণিকার অপর একটি ভৌত বিশেষত্ব। স্বকীয় অবতলে পরস্পর পৃষ্ঠলগ্ন হয়ে পয়সার স্তূপের মত পুঞ্জীভূত হবার প্রবণতা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এ জাতীয় পুঞ্জীভবনের প্রবণতাকে **রুলো গঠন** নামে অভিহিত করা হয়। রুলো গঠনের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি, তবে পৃষ্ঠটানই (surface tension) এই ঘটনার জন্য দায়ী বলে সবার ধারণা।

3. **আয়তন** (size) : রক্তপ্রলেপে স্বাভাবিক লোহিতকণিকার ব্যাস গড়ে 7·2μ (6·5μ – 8·8μ)। তাদের প্রান্তদেশ 3·2μ এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল 1μ পুরু। জীবন্ত লোহিতকণিকার ব্যাস কিছুটা বেশী (8·6μ)। তাছাড়া শিরা রক্তে তাদের আকৃতি ধমনীরক্তের চেয়ে খানিকটা বেশী। কারণ শিরারক্তে ক্লোরাইড শিফটের (Chloride Shift) জন্য লোহিতকণিকার অভ্যন্তরস্থ অভিস্রবণচাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে জল লোহিত-কণিকার ভেতরে প্রবেশ করে এবং তারা আয়তনে বেড়ে ওঠে।

2·2μ 7·2μ

9-18 নং চিত্র : লোহিতকণিকার গড় মাপ।

লোহিতকণিকার তলীয় ক্ষেত্রফল 120 বর্গμ এবং গড় আয়তন 87 ঘনμ। রক্ত-সংবহনে প্রতি ঘনমিলিমিটারে বা মাইক্রোলিটারে 5,000,000টি লোহিতকণিকা থাকলে, তাদের মোট ক্ষেত্রফল হবে 600 বর্গ মিলিমিটার। দেহে রক্তের পরিমাণ 5 লিটার হলে শ্বাসক্রিয়ার জন্য লোহিত কণিকার মোট যে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় তার পরিমাণ 3000 বর্গমিটার।

4. **সংখ্যা** (Number) : একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের রক্তে প্রতি ঘন-মিলিমিটার বা মাইক্রোলিটারে (μl) গড়ে 5 **মিলিয়ন** বা 50 **লক্ষ** লোহিতকণিকা থাকে। প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকের রক্তে গড়ে **4·5 মিলিয়ন** বা 45 **লক্ষ** লোহিত-কণিকা দেখা যায়। শিশুতে এই সংখ্যা 6-7 মিলিয়ন এবং ভ্রূণরক্তে প্রায় 7-8 মিলিয়ন। প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা 5 মিলিয়নের চেয়ে 25% হ্রাস পেলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। তেমনি প্রতি ঘনমিলিমিটারে

তাদের সংখ্যা 6·5 মিলিয়নের অধিক হলে এই অবস্থাকে **পলিসাইথেমিয়া** বলা হয়।

5. **গঠন** (tructure)**:** লোহিতকণিকা **কোষঝিল্লি** ও কোষকাঠামো বা **স্ট্রোমা** (stroma) নিয়ে গঠিত। কোষঝিল্লির গঠন ও উপাদান অন্যান্য কোষের কোষঝিল্লির মত। লোহিতকণিকার কোষঝিল্লির রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে, কোষঝিল্লি 35% লিপিড (লেসেথিন, কেফালিন ও কোলেসটারোল), 60% প্রোটিন এবং সামান্য পরিমাণ কার্বোহাইড্রেটের সমন্বয়ে গঠিত। ফস্‌ফোলিপিডের পরিমাণের সংগে লোহিতকণিকার উপরি-তলের ক্ষেত্রফলের সম্পর্ক স্থাপন করে দেখা গেছে, ফসফোলিপিড কোষঝিল্লিতে দুটো আবরণ সৃষ্টি করতে পারে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, কোষঝিল্লিতে দুটো ফসফোলিপিডের স্তর রয়েছে। এছাড়া ওস্‌মিয়াম টেট্রাক্লোরাইড বা পটাসিয়াম পারম্যানগানেট প্রয়োগ করে এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, ফস্‌ফোলিপিডের দ্বিস্তরের উভয়পার্শ্বে দুটো প্রোটিনের স্তর রয়েছে। এছাড়া কোষঝিল্লিতে রক্তের অ্যাগ্লুটিনোজেন যুক্ত থাকে।

হিমোলাইসিসের মাধ্যমে লোহিতকণিকার কোষকাঠামো বা স্ট্রোমা থেকে হিমোগ্লোবিনকে সরিয়ে দিলে তার যে উপাদান পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রধান 50% প্রোটিন এবং 13% লিপিড লেসিথিন ও কেফালিন)। স্ট্রোমার ওজন লোহিতকণিকার ওজনের প্রায় 5 শতাংশ।

6. **উপাদান** (Composition)**:** লোহিতকণিকার 60-70 ভাগই জল। বাকি 30-40 ভাগ কঠিন পদার্থে গঠিত। কঠিন পদার্থের মধ্যে আছে: (1) হিমোগ্লোবিন (প্রায় 2 শতাংশ), (2) প্রোটিওলিপিড 2 শতাংশ, (3) ইউরিয়া, (4) অ্যামাইনো অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন ইত্যাদি জৈব পদার্থ এবং (5) অজৈব পদার্থ (বিশেষভাবে পটাশিয়াম ফসফেট)। লিপিডের মধ্যে ফস্‌ফোলিপিড (60 শতাংশ), মুক্ত কোলেস্‌টারোল (30 শতাংশ) এবং ফ্যাট ও কোলেস্‌টারোল এস্‌টার (10 শতাংশ) প্রধান।
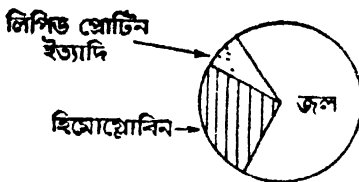
9-19 চিত্র: বলয়চিত্রে লোহিতকণিকার উপাদানের আনুপাতিক সম্পর্ক।

7. **জীবনকাল** (Life span) **:** রক্তসংবহনতন্ত্রে লোহিতকণিকা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে পরিশেষে বিনষ্ট হয়। আগেকার ধারণা ছিল সংবহনতন্ত্রে লোহিতকণিকা 3 থেকে 4 সপ্তাহ জীবিত থাকে। অধুনা প্রমাণিত হয়েছে প্রতিটি লোহিতকণিকার জীবনকাল গড়ে 120 দিন। একটি পরীক্ষার সাহায্যে লোহিতকণিকার গড় জীবনকাল নির্ণয় করা সম্ভবপর। O শ্রেণীর রক্তকে A শ্রেণীর রক্তসম্পন্ন লোকের দেহে প্রবেশ করিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তার দেহ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নমুনা রক্তের সংগে অ্যান্টি-A সিরাম ব্যবহার করে এবং এভাবে A শ্রেণীর লোহিতকণিকাকে বিনষ্ট করে, O কোষের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। দেখা গেছে প্রতিদিন প্রায় 0·৪ শতাংশ O শ্রেণীর রক্তকোষ বিনষ্ট হয় এবং 60 দিনে প্রায় 60 × 0·৪ শতাংশ বা অর্ধেক O রক্তকোষ লোপ পায়।

9-20নং চিত্র **:** রক্তশ্রেণীর দ্বারা লোহিত কণিকার জীবনকাল নির্ণয়।

বাকী অর্ধাংশকে 120 দিনের পর আর রক্তসংবহনতন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায় না (9-20নং চিত্র)। এ থেকে প্রমাণিত হয়, সংবহনতন্ত্রে প্রতিটি লোহিত কণিকার জীবনকাল প্রায় 120 দিন।

8. **লোহিতকণিকার কার্যাবলী** (Functions of R. B. C.) **:** লোহিতকণিকার প্রধান প্রধান কার্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল **:** (a) লোহিতকণিকা অক্সিজেন ও কার্বনডাই-অক্সাইড পরিবহণ করে এবং এভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসকার্যে সহায়তা করে। (b) রক্তের সান্দ্রতা রক্ষায় তারা অংশগ্রহণ করে। (c) নিজস্ব কোষঝিল্লির বিশেষ ভেদ্যক্ষমতা প্রয়োগ করে রক্তের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে। (d) কোষস্থিত হিমোগ্লোবিন ও বাইকার্বনেট বাফার অম্লক্ষারের (acid base) সাম্যতা বজায় রাখে। (e) বিনষ্ট লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন থেকে নানাপ্রকার রঞ্জক পদার্থ (pigment) পাওয়া যায়।

লোহিতকণিকার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি

Origin and Development of R. B. C.

রক্তের লোহিতকণিকা একটি নির্দিষ্ট হারে বিনষ্ট হয়, তাই তাদের উৎপাদনও সেভাবেই সংঘটিত হয়। অস্থিমজ্জার রক্তকণিকা-উৎপাদনকারী কোষ তাই সমগ্র জীবনব্যাপী বহুবিভাজন ও রূপান্তরের দ্বারা নিয়মিত রক্ত-কণিকার উৎপাদন করে থাকে।

1. **লোহিতকণিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ :** লোহিতকণিকা ও অন্যান্য রক্তকণিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। **একবাদী মতবাদের** (monophyletic theory) বক্তব্য হল, সবরকম রক্তকণিকা একটিমাত্র **স্টেম সেল** (stem cell) বা বনিয়াদ কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। অপর পক্ষে, **বহুবাদী মতবাদের** (polyphyletic theory) মতে, বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকার উৎস ভিন্ন ভিন্ন স্টেম বা বনিয়াদ কোষ। **দ্বিবাদী মতবাদ** (dualistic theory) আবার দুধরনের স্টেম সেল সম্বন্ধে মত পোষণ করে ; এদের একটি মায়েলোব্লাস্ট, যা লোহিতকণিকা ও দানাদার শ্বেতকণিকা উৎপন্ন করে ; অপরটি লিম্ফোব্লাস্ট—লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট যার থেকে উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত মতবাদ কখনও কখনও অন্যভাবেও ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ দুধরনের স্টেম সেলের একটি শুধুমাত্র লোহিতকণিকা এবং অপরটি শ্বেতকণিকা উৎপন্ন করে। বার্নস ও লুটিটের (Barnes & Loutit) অনুশীলন থেকে রক্তকণিকা-উৎপত্তির যে আধুনিক শারীরবৃত্তীয় ধারণা পাওয়া যায়, তার বক্তব্য হল : **প্লুরিপোটেন্ট আনকমিটেড স্টেম সেল** (pluripotent uncommitted stem cell) নামক আদিম কোষের প্রতিরূপ বিভাজন (replication) ও রূপান্তর থেকে প্রথমে **লাইন প্রোজেনিটর সেল** (line progenitor cell) বা **কৌলিক কোষ** উৎপন্ন হয়। প্রোজেনিটর সেলকে **কমিটেড স্টেম সেলও** (committed stem cell) বলা হয়। শেষোক্ত কোষের

বৈশিষ্ট্য হল : (a) তারা অত্যধিক বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং (b) পর্যায়ক্রমিক রূপান্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার রক্তকণিকা উৎপন্ন করতে পারে।

হিমোসাইটোব্লাস্টকে প্লুরিপোটেন্ট আনকমিটেট স্টেম সেল হিসাবে গণ্য করা হয়। হিমোসাইটোব্লাস্ট থেকে যেসব প্রোজেনিটর সেল বা কমিটেট সেল উৎপন্ন হয়, তাদের মধ্যে প্রধান : (1) **প্রোইরীথ্রোব্লাস্ট :** এই কোষের বহুবিভাজন ও রূপান্তরের মাধ্যমে লোহিতকণিকা উৎপন্ন হয়; (2) **মায়েলোব্লাস্ট :** এদের বহুবিভাজন ও রূপান্তর থেকে নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল ও বেসোফিল শ্বেতকণিকার উদ্ভব ঘটে। (3) **লিম্ফোব্লাস্ট :** এই কোষ থেকে লিম্ফোসাইট উৎপন্ন হয়; (4) **মনোব্লাস্ট :** এই কোষ থেকে রক্তের মনোসাইট উৎপন্ন হয় এবং (5) **মেগাকারীওসাইট :** মেগাকারীওসাইট থেকে অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়।

গিলমুরের (Gilmour) মতে প্লুরিপোটেন্ট আনকমিটেট স্টেম সেল হিমোসাইটোব্লাস্ট রক্তনালীর **বহিরুৎস** (extravascular origin) থেকে সক্রিয় অ্যামিবাগতি নিয়ে মজ্জার রক্ত সাইনাসে প্রবেশ করে এবং বহুবিভাজন ও রূপান্তরের মাধ্যমে প্রোজেনিটর সেল বা বনিয়াদ কোষে পরিণত হয়। বনিয়াদ কোষ থেকে পরিণত রক্তকণিকার নিয়মিত উৎপাদন আবার দুটি প্রধান অবস্থার উপর নির্ভর করে : (a) স্টেম সেল বা বনিয়াদ কোষের বহুবিভাজন ক্ষমতা এবং (b) স্টেম সেলের সংগে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মিতক্রিয়া।

(2) **উৎপত্তিস্থল** (Site of formation) : ভ্রূণাবস্থায় ভ্রূণের **ভ্যাসকুলোসা** (vasculosa) অঞ্চল থেকে লোহিতকণিকার উৎপত্তি হয়। প্রথমে এরা নিউক্লিয়াসযুক্ত থাকে। ভ্রূণজীবনের মধ্যাহ্নকালে প্রান্তীয় সংবহনতন্ত্র থেকে নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ অদৃশ্য হয়। এই সময় থেকে ভূমিষ্ঠের এক মাস পূর্ব পর্যন্ত লোহিতকণিকা উৎপাদনের একমাত্র স্থান **যকৃৎ** এবং **প্লীহা**। অস্থিমজ্জা এই সময় থেকে লোহিতকণিকা উৎপাদন করতে শুরু করে। জন্মেরপর লোহিতকণিকার প্রধান উৎপাদন-স্থান অস্থি মজ্জা। প্রাপ্তবয়স্কের উর্বাস্থি, প্রগণ্ডাস্থির ঊর্ধ্বাংশ; কশেরুকা, উরঃফলক, করোটিকাস্থি এবং শ্রোণীচক্রাস্থিত অস্থিমজ্জায় লোহিতকণিকা উৎপন্ন হয়।

(3) **বৃদ্ধির পর্যায়ক্রম** (Stages of development) **:** **প্লুরিপোটেন্ট 'হিমোসাইটোব্লাস্টে'র বহুবিভাজন** এবং রূপান্তর থেকে প্রোজেনিটর **সেল** প্রোইরীথ্রোব্লাস্ট কোষ উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত কোষের বহুবিভাজন ও রূপান্তর থেকে ধীরে ধীরে পরিণত লোহিতকণিকা উৎপন্ন হয়। রূপান্তরের তিনটি পর্যায়ক্রম হল **:** (i) **কোষাকৃতির ক্রমান্বয়ে হ্রাস প্রাপ্তি,** (ii) **হিমোগ্লোবিনসংযুক্তি এবং** (iii) **নিউক্লিয়াসের অবলুপ্তি।** ব্রিটিশ পরিভাষা অনুসারে লোহিতকণিকার বৃদ্ধির পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ **:** প্রোইরীথ্রোব্লাস্ট, প্রারম্ভিক নরমোব্লাস্ট (early normoblast), মাধ্যমিক নরমোব্লাস্ট, (intermediate normoblast), পরবর্তী নরমোব্লাস্ট, রেটিকুলোসাইট এবং পরিণত লোহিতকণিকা।

হিমোসাইটোব্লাস্ট

প্রোইরীথ্রোব্লাস্ট

প্রারম্ভিক নরমোব্লাস্ট

মাধ্যমিক নরমোব্লাস্ট

পরবর্তী নরমোব্লাস্ট

রেটিকুলোসাইট

পরিণত লোহিতকণিকা

9-21 নং চিত্র **:** লোহিতকণিকার বৃদ্ধির

আমেরিকান পরিভাষায় এদেরই নাম মেগালোব্লাস্ট, প্রারম্ভিক প্রোইরীথ্রোব্লাস্ট, পরবর্তী ইরীথ্রোব্লাস্ট, নরমোব্লাস্ট, রেটিকুলোসাইট এবং পরিণত লোহিতকণিকা। **হিমোসাইটোব্লাস্ট :** ইহা সর্বাধিক আদিম ও অপরিণত কোষ। ইহা **প্লুরিপোটেন্ট সেল** নামে পরিচিত। 18 থেকে 23μ ব্যাসবিশিষ্ট **এই কোষ গোল ও বৃহদাকারের নিউক্লিয়াসযুক্ত। এর পাতলা প্রান্তদেশ ক্ষারকাসক্ত (basophilic) সাইটোপ্লাজমযুক্ত। প্রতিরূপ বিভাজনের মাধ্যমে এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। অস্থিমজ্জায় এদের সংখ্যা সমগ্র মজ্জাকোষের 0·—১·0%। এরা রূপান্তরিত হয়ে প্রোইরীথ্রোব্লাস্ট উৎপাদন করে।**

প্রোইরীথ্রোব্লাস্ট (মেগালোব্লাস্ট) : 14 থেকে 19 μ ব্যাসবিশিষ্ট এই কোষের নিউক্লিয়াসও বৃহদাকার (12μ)। সূক্ষ্ম ক্রোমাটিনসূত্র এবং নিউক্লিওলাস সুস্পষ্ট। সাইটোপ্লাজম ক্ষারাসক্ত। সাইটোপ্লাজম গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে। এই কোষের বহুবিভাজন লক্ষ্য করা গেছে। এরা রূপান্তরিত হয়ে পরবর্তী পর্যায়ের কোষ উৎপন্ন করে।

প্রারম্ভিক নরমোব্লাস্ট (প্রারম্ভিক প্রোইরীথ্রোব্লাস্ট) : 11 থেকে 17μ ব্যাসবিশিষ্ট এই কোষগুলোর নিউক্লিয়াস আরও গাঢ়তর হয়। নিউক্লিওলাস অনুপস্থিত থাকে। এদের মধ্যে সক্রিয় কোষ বিভাজন লক্ষ্য করা যায়।

মাধ্যমিক নরমোব্লাস্ট (পরবর্তী ইরীথ্রোব্লাস্ট) **:** এরা 10 থেকে 14μ ব্যাস যুক্ত হয়। নিউক্লিয়াস অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ধাপে হিমোগ্লোবিনের আবির্ভাব ঘটে এবং সাইটোপ্রাজম বহুবর্ণযুক্ত (polychromatic) হয়। সক্রিয় মাইটোসিসও এই সময় এদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

পরবর্তী নরমোব্লাস্ট (নরমোব্লাস্ট) **:** কোষের আকৃতি এই ধাপে আরও হ্রাস পায় এবং পরিণত লোহিতকণিকার আকৃতির কাছাকাছি আসে। এদের ব্যাস 7-10μ হয়। নিউক্লিয়াস আরও নিবিড় হয়ে আসে এবং গাঢ় বর্ণ ধারণ করে। পরিশেষে নিউক্লিয়াসের অবলুপ্তি ঘটে। কারো মতে নিউক্লিয়াস সরাসরি সাইটোপ্লাজম থেকে নিক্ষিপ্ত হয়; কারো মতে টুকরো হয়ে ভেংগে যায়। নিউক্লিয়াসের অবলুপ্তির পর মাইটোসিস প্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়।

রেটিকুলোসাইট : এদের ব্যাস প্রায় 7μ। এই ধাপে সাইটোপ্লাজমে জালিকার আবির্ভাব ঘটে। সম্ভবত এই জালিকা প্রথম দিকের অপরিণত কোষের ক্ষারকধর্মী সাইটোপ্লাজমের ধ্বংসাবশেষ। রক্তসংবহনে এদের সংখ্যা প্রায় এক শতাংশ। নবজাতকে এই সংখ্যা শতকরা 30 থেকে 50 ভাগ। এই ধাপ থেকেই লোহিতকণিকা প্রান্তীয় সংবহনতন্ত্রে আবির্ভুত হয়।

পরিণত লোহিতকণিকা : ইহা রক্তস্থিত স্বাভাবিক লোহিতকণিকা।

প্রোইরীথ্রোব্লাস্ট থেকে রেটিকুলোসাইটে রূপান্তরিত হতে প্রায় 7 দিন সময় লাগে এবং রেটিকুলোসাইট থেকে পরিণত লোহিতকণিকার রূপান্তর ঘটতে সময় লাগে আরও 2 দিন।

4. **লোহিতকণিকার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য দায়ী কারণসমূহ (Factors affecting erythropoiesis) :** দেহের অভ্যন্তরে লোহিতকণিকা যেমন নিয়মিত উৎপন্ন হয় তেমনি একইভাবে ধ্বংস হয়। প্রতিদিন 15-20 মিলিলিটার লোহিতকণিকা উৎপন্ন হয়। লোহিতকণিকার এই উৎপাদন ও ধ্বংসের মধ্যে যাতে একটা সাম্যাবস্থা বজায় থাকে এবং শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য বিভিন্ন উপাদান লোহিতকণিকার উৎপাদন ও বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(a) **অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড (Essential aminoacids) :** অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন অংশের সংশ্লেষণের জন্য দায়ী। এদের অভাবে তাই হিমোগ্লোবিনের জৈব সংশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয় না। তাছাড়া লোহিতকণিকাস্থিত স্ট্রোমাপ্রোটিন (stroma protein) এবং নিউক্লিওপ্রোটিনের (nucleoprotein) উৎপাদনেও এজাতীয় অ্যামাইনো-অ্যাসিড অপরিহার্য। দেহে অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিডেব সরবরাহ ব্যাহত হলে লোহিতকণিকার উৎপাদন ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(b) **ভিটামিন (Vitamins) :** ভিটামিন B_{12}, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন C, রাইবোফ্লেভিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড, পিরাইডোক্সিন (B_6) এবং প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড প্রভৃতি ভিটামিন লোহিতকণিকার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির সংগে বিশেষভাবে জড়িত। প্রোইরীথ্রোব্লাস্ট থেকে প্রারম্ভিক নরমোব্লাস্ট উৎপাদনে ভিটামিন B_{12} এবং ফলিক অ্যাসিড বিশেষভাবে প্রয়োজন। ক্যাসলের (Castle) মতে ভিটামিন B_{12} (extrinsic factor), ফলিক অ্যাসিড এবং গ্যাসট্রিক মিউকোসাজাত ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর (intrinsic factor) বা স্বাশ্রয়ী উপাদান একত্রে যে ক্যাসল হিমোপোয়েটিক প্রিনসিপিল (hemopoetic principle) গঠন করে, প্রধানত সেটিই এই পর্যায়ের রূপান্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে। B_{12} এবং ফলিক অ্যাসিড DNA সংশ্লেষণে কো-এনজাইম হিসাবে কাজ করে। B_{12} সাইটোপ্লাজমীয় RNA সংশ্লেষণেও সহায়ক। ফলে B_{12} DNA সংশ্লেষণে ফলিক অ্যাসিডের চেয়ে প্রায় কয়েক হাজার গুণ শক্তিশালী (potent) উপাদান। কোষবিভাজনে DNA অপরিহার্য। তাই এই দুটো ভিটামিনের অভাবে DNA উৎপাদন হতে পারে না, ফলে প্রোইরীথ্রো-ব্লাসটের কোষবিভাজন ব্যাহত হয়।

B_{12} এর বিশোষণে ইন্‌ট্রিন্‌সিক ফ্যাক্টর বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই পদার্থটি একটি **গ্লাইকোপ্রোটিন** (glycoprotein, আণবিক ওজন 60,000) যা মানুষের ক্ষেত্রে পাকস্থলীর ফান্‌ডাস (fundus) এবং বডিস্থিত (body) প্রাচীরকোষ (parietal) থেকে (ইঁদুরে চিপ্‌সেল থেকে) উৎপন্ন হয়। এই গ্লাইকোপ্রোটিন ভিটামিন B_{12} এর সংগে যুক্ত হয়ে যে যৌগ (complex) গঠন করে, তা ইলিয়ামের (ileum) শেষাংশ থেকে ধীরে ধীরে রক্তে বিশোষিত হয়। ইলিয়ামের মিউকাস কোষে প্রথমে ইহা পৃষ্ঠলগ্ন হয় (adsorbed), তারপর ধীরে ধীরে রক্তে প্রবেশ করে এবং যকৃতে গিয়ে সঞ্চিত হয়।

ভিটামিন C ফলিক অ্যাসিডকে কোএনজাইম ফলিনিক অ্যাসিডে পরিণত হতে সাহায্য করে। ফলিক অ্যাসিড ফলিনিক অ্যাসিড হিসাবেই DNA সংশ্লেষণে সহায়তা করে। এছাড়া ইহা অন্ত্র থেকে লোহার (Fe) বিশোষণে সহায়তা করে, Fe^{+++} আয়নকে Fe^{++} আয়নে বিজারিত করে এই কাজে সহায়তা করে। এছাড়া ইহা যকৃতের ফেরিটিনস্থিত লোহাকে চলমান (mobilize) করে তুলে এবং অনুঘটক হিসাবে হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

পিরাইডোক্সিন কোএন্‌জাইম পিরাইডোক্সাল ফসফেট হিসাবে গ্লাইসিনের সংগে যুক্ত হয়ে δ-অ্যামাইনো লেভুলিনিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ করে এবং এভাবে হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণে সহায়তা করে। প্যান্‌টোথেনিক অ্যাসিড কোএন্‌জাইম A (CoA) হিসাবে সাক্‌সিনিক অ্যাসিডের সংগে যুক্ত হয়ে সক্রিয় সাক্‌সিনেট (succinyl CoA) উৎপন্ন করে যা হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণের উপাদান হিসাবে কাজ করে। রাইবোফ্লেভিন ও নিকোটিনিক অ্যাসিডের অভাবে অস্থিমজ্জার বিপাকক্রিয়া হ্রাস পায়। এরা হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণেও অংশ গ্রহণ করে।

উপরিউক্ত সব কয়টি ভিটামিনই প্রোইরীথ্রোব্লাস্ট থেকে পরিণত লোহিত-কণিকা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ের পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে সহায়তা করে।

(c) **খনিজ ধাতু (Minerals)** : লোহা (Fe^{++}), ক্যালসিয়াম (Ca^{++}), কপার (Cu^{++}), ম্যান্‌গ্যানিজ (Mn^{++}), কোবাল্ট (Co^{++}), নিকেল (Ni^{++}) ইত্যাদি খনিজ ধাতু লোহিতকণিকার ক্রমবর্ধনের প্রারম্ভিক নর্‌মোব্লাস্ট থেকে পরিণত লোহিতকণিকা উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে প্রয়োজন হয়।

(i) **লোহা** (Fe^{++}) : হিমোগ্লোবিনের হিম (hem) অংশের সংশ্লেষণের জন্য লোহা অপরিহার্য। প্রয়োজনীয় লোহার অভাব দেখা দিলে লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতা পরিলক্ষিত হয়।

(ii) **কপার, ম্যানগ্যানিজ ও নিকেল** (Cu^{++}, Mn^{++}, Ni^{++}) ঃ এই তিনটি ধাতু হিমোগ্লোবিনের সংশ্লেষণে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। এছাড়া এরা লোহার বিশোষণেও সহায়তা করে। Cu^{++} যকৃতে সঞ্চিত লোহাকে চলমান করে (বিজারণের মাধ্যমে)। Mn^{++} ডিকারবোক্সিলেজ এনজাইমকে সক্রিয় করে হিমোগ্লোবিনের সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

(iii) **ক্যালশিয়াম** (Ca^{++}) ঃ লোহার পরিপাক ও সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং এভাবে লোহিতকণিকার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে থাকে।

(iv) **কোবাল্ট** (Co^{++}) ঃ কোবাল্ট লোহার বিশোষণে, যকৃৎস্থ লোহাকে সচল করতে (mobilization) এবং ইরীথ্রোপোয়েটিন উৎপাদনে সহায়তা করে।

d) **পিত্তলবণ ও পিত্ত রঞ্জকপদার্থ** (Bile salts and bile pigments) ঃ পিত্তলবণ অন্ত্র থেকে খনিজ ধাতুর বিশোষণে সাহায্য করে। অতএব, লোহিতকণিকার উৎপত্তি ও বৃদ্ধিতে পিত্তলবণ পরোক্ষ উপাদান হিসাবে সক্রিয়। ক্লোরোফিল (chlorophyll) ও অন্যান্য পরফাইরিন (porphyrin) রঞ্জকপদার্থসমূহ কোন না কোনভাবে লোহিতকণিকার উৎপত্তি ও বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে। কারণ তাদের অনুপস্থিতিতে লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতা দেখা যায়।

(e) **অন্তঃক্ষরা** গ্রন্থি (Endocrine glands) ঃ থাইরয়েড ও অ্যাড্রেন্যালের বহিঃস্তর, অ্যানড্রোজেন, ACTH প্রভৃতি লোহিতকণিকার উৎপাদন ও বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে।

(i) থাইরয়েড ঃ অস্থিমজ্জার সঠিক বিপাকক্রিয়ার জন্য থাইরয়েড গ্রন্থি বিশেষভাবে দায়ী। থাইরয়েড হরমোনের (thyroxine অভাবে বা থাইরয়েডের কম সক্রিয়তায় (hypothyroidism) রক্তাল্পতা দেখা দেয় (বিশেষ করে হাইপোক্রোমিক ও ম্যাক্রোসাইটিক রক্তাল্পতা)।

(ii) অ্যাড্রেন্যালের বহিঃস্তর ঃ অ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থির এই অংশের ত্রুটি থেকে বা এই অংশের হরমোনের অভাব প্রায়ই রক্তাল্পতা দেখা দেয়। এই গ্রন্থি অস্থিমজ্জার ওপর সরাসরি ক্রিয়া না করলেও এর অভাবে সাধারণ বিপাকক্রিয়ার যেসব ত্রুটি দেখা দেয়, প্রধানত তারই প্রভাবে লোহিতকণিকার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(iii) **আনড্রোজেন :** আনড্রোজেন ও Co^{++} গ্লোমারুলাসের কোষকে সক্রিয় করে ইরীথ্রোপোয়েটিন উৎপাদনে সহায়তা করে।

(iv) **ACTH :** হাইপোক্সিয়াতে ACTH এর ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়, যা অ্যাড্রেন্যালের বহিঃস্তরের ওপর ক্রিয়া করে আনড্রোজেন ও কোরটিকয়েড হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

(f) **অক্সিজেনের অভাব ও ইরীথ্রোপোয়েটিন** (Hypoxia and erythropoetin) **:** দেহে অক্সিজেনের অভাব বা অক্সিজেন-স্বল্পতা কিছুদিন চলতে দিলে (যেমন পর্বত-উচ্চতায় বা রক্তাল্পতায়) লোহিতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অক্সিজেনের অভাবে **ইরীথ্রোপোয়েটিন** (erythrocyte-stimulating factor নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়, যা সরাসরি অস্থিমজ্জায় উদ্দীপনা দান করে এবং ইরীথ্রোপোয়েটিন সংবেদী স্টেম সেল বা প্রোইরীথ্রব্লাস্ট কোষের বহুবিভাজন বৃদ্ধি করে। এই পদার্থটি (একটি ...ইকে প্রোটিন হরমোন) রক্তসংবহনে থেকে ঋণাত্মক প্রক্রিয়ায় ইরীথ্রোপোয়েটিনকে নিয়ন্ত্রণ করে। হাইপোক্সিয়া হাইপোথালামাসের ওপর ক্রিয়া করে CRF এর ক্ষরণ বৃদ্ধি করে, যা পিটুইটারী থেকে ACTH ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। ACTH অ্যাড্রেন্যাল ও বৃক্কের ওপর ক্রিয়া করে কোরটিকয়েড ও আনড্রোজেন ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। আনড্রোজেন ও Co^{++} গ্লোমারুলাসের কোষের ওপর ক্রিয়া করে **রেনাল ইরীথ্রোপোয়েটিক ফ্যাক্টর** (REF) উৎপন্ন করে। এই পদার্থটি রক্তের গ্লোবিউলিনের সংগে যুক্ত হয়ে **ইরীথ্রোপোয়েটিন** উৎপন্ন করে এবং হিমোসাইটোব্লাস্টের উপর ক্রিয়া করে। ফলে লোহিতকণিকার উৎপাদন হার বৃদ্ধি পায়।

লোহিতকণিকা সম্বন্ধে অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বিষয়
Additional Information about R. B. C.

লোহিতকণিকার সংখ্যা গণনা করে (প্রতি ঘনমিলিমিটার বা মাইক্রোলিটারে (μl)) এবং হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে (গ্রাম/100 মিলিলিটারে বা ডেসিলিটারে (dl) রক্তের লোহিতকণিকার স্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। রক্তাল্পতায় তাদের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তার সঠিক মূল্যায়নে এর চেয়েও কিছু অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রয়োজন হয়। নিম্নে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হল :

বর্ণসূচক (Colour index)ঃ নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণসূচকের নির্ধারণ করা যায়ঃ

$$\text{বর্ণসূচক} = \frac{\text{হিমোগ্লোবিনের শতাংশ}}{\text{লোহিতকণিকার শতাংশ}}$$

8নং তালিকা ঃ মানুষের লোহিতকণিকার বৈশিষ্ট্য।

বৈশিষ্ট্য	সমীকরণ	পুরুষ	স্ত্রীলোক
হিমাটক্রিট (Hct) %	—	47	42
R.B.C. (মিলিয়ন/μl)		5·0	4·5
হিমোগ্লোবিন (g/dl)	—	16	14
M.C.V. (fl)	$= \frac{Hct \times 10}{RBC(10^6/\mu l)}$	87	87
M.C.H (Pg)	$= \frac{Hb \times 10}{RBC(10^6/\mu l)}$	29	20
M.C.H.C (g/dl)	$= \frac{Hb \times 100}{Hct}$	34	34

হিমোগ্লোবিনোমিটার ও হিমোসাইটোমিটারের সাহায্য প্রথমে যথাক্রমে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ও লোহিতকণিকার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। প্রতি ডেসিলিটার (dl) বা 100 মিলিলিটার রক্তের 14·5 গ্রাম হিমোগ্লোবিনকে 100% ধরা হয়। তেমনি প্রতি ঘনমিলিমিটার বা মাইক্রোলিটার (μl) রক্তের 5 মিলিয়ন লোহিতকণিকাকে 100% ধরা হয়। এরপর, প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির দ্বারা ভাগ করা হয়। স্বাভাবিক ভাগফল 1। স্বাভাবিক রক্তের বর্ণসূচক তাই 1।

বর্ণসূচকের দ্বারা প্রতিটি লোহিতকণিকায় তুলনামূলকভাবে কতটুকু হিমোগ্লোবিন আছে তার ধারণা পাওয়া যায়। যেমন হাইপোক্রোমিক রক্তাল্পতায় দেখা গেল, কোন রোগীর হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ 70% এবং লোহিতকণিকার সংখ্যা প্রতি মাইক্রোলিটার (μl) রক্তে 4 মিলিয়ন (=80%)। এক্ষেত্রে বর্ণসূচক = 70/80 বা 0·875। হাইপারক্রোমিক রক্তাল্পতায় তার বিপরীত পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

2. **পুঞ্জীভূত লোহিতকণিকার আপেক্ষিক আয়তন বা হিমাটক্রিট (Relative volume of packed red cell or hematocrit, Hct)ঃ** হেপারিন যুক্ত পরীক্ষানলের (হিমাটক্রিট) রক্তকে কেন্দ্রাতিগ যন্ত্রের সাহায্যে মিনিটে 3000 বার আবর্তন করালে, লোহিতকণিকা পরীক্ষানলের নীচে পুঞ্জীভূত হয়।

পুঞ্জীভূত লোহিতকণিকার আপেক্ষিক আয়তন এরপর পরীক্ষানলের অংশাংকন থেকে নির্ধারণ করা হয়। পুঞ্জীভূত লোহিতকণার আয়তন স্বাভাবিকভাবে 45-48% (গড় 45%)।

3. **লোহিতকণিকার গড় আয়তন** (Mean Corpuscular Volume, MCV) : প্রতি 1000 মিলিলিটার রক্তের পুঞ্জীভূত লোহিতকণিকার আয়তনকে (ml) প্রতি ঘনমিলিমিটার বা মাইক্রোলিটার (μl) রক্তের লোহিত-কণিকার সংখ্যার (মিলিয়নে) দ্বারা ভাগ করলে লোহিতকণিকার গড় আয়তন পাওয়া যায় :

$$MCV = \frac{\text{1000 মি. লি. রক্তের পুঞ্জীভূত লোহিতকণিকার আয়তন (ml)}}{\text{প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তে লোহিতকণিকার সংখ্যা (মিলিয়নে)}}$$

$$= \frac{Hct \times 10}{RBC(10^6/\mu l)}$$

$$= \frac{450}{5} \text{ (হিমাটক্রিট যেহেতু 45\%)}$$

$$= 90 \text{ ফেমটোলিটার (fl)}$$

MCV এর স্বাভাবিক সীমা 78-94 fl। যে সব লোহিতকণিকার গড় আয়তন এই স্বাভাবিক সীমার ভেতর পড়ে, তাদের **নরমোসাইট** (normocyte) বলা হয়। যাদের গড় আয়তন এর চেয়ে বেশী হয় (95-160 fl) তাদের **ম্যাক্রোসাইট** (macrocyte) এবং এর চেয়ে কম হলে **মাইক্রোসাইট** (microcyte) বলা হয়। ম্যাক্রোসাইটিক ও মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়ায় (রক্তাল্পতায়) এই দুই ধরনের কোষকে রক্তে দেখা যায়।

4. **লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিনের গড় পরিমাণ** (Mean Corpuscular Hemoglobin, MCH) : প্রতি 1000 মিলিলিটার রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণকে (গ্রামে) প্রতি ঘনমিলিমিটার বা মাইক্রোলিটার রক্তের লোহিতকণিকার সংখ্যার (মিলিয়নে) দ্বারা ভাগ করলে প্রতিটি লোহিত-কণিকায় হিমোগ্লোবিনের গড় পরিমাণ পাওয়া যায় :

$$MCH = \frac{\text{প্রতি 1000 মি. লি. রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ (গ্রামে)}}{\text{প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তে লোহিতকণিকার সংখ্যা (মিলিয়নে)}}$$

$$= \frac{Hb \times 10}{RBC(10^6 \times \mu l)}$$

$$= \frac{145}{৫} \text{ (রক্তের স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ যেহেতু } 14.5 g/dl)$$

$$= 29.0 pg \text{ (} 1 pg = \text{পিকোগ্রাম } = 19^{-12} \text{ গ্রাম)}$$

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিটি লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিনের গড় পরিমাণ $29.5 \pm 2.5 pg$। মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়াতে ইহা হ্রাস পায় এবং ম্যাক্রো-সাইটিকে বৃদ্ধি পায় (50pg পর্যন্ত)

5. **লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিনের গড় তীব্রতা** (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC) ঃ ইহা নিম্নলিখিতভাবে নির্ণয় করা যায়।

$$MCHC = \frac{\text{প্রতি ডেসিলিটার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ (gm)}}{\text{প্রতি 100 মি লি. রক্তে লোহিতকণিকার পঞ্জীভূত আয়তন}} \times 100$$

$$= \frac{Hb \times 100}{Hct}$$

$$= \frac{14 \cdot 5}{45} \times 100 g/dl$$

$$= 32 \cdot 2 g/dl$$

স্বাভাবিক মান 35 ± 3 g/dl

লোহিতকণিকার বিপাক

Metabolism of R. B. C.

পরিণত লোহিতকণিকাতে মাইটোকন্ড্রিয়া না থাকার দরুণ TCA চক্র চলতে পারে না। লোহিতকণিকা তাই দুটো পদ্ধতিতে শুধুমাত্র গ্লুকোজ থেকে জৈবশক্তি (ATP) উৎপন্ন করতে পারে ঃ a) এম্‌ব্‌ডেন্‌-মেয়ারহোফ বিক্রিয়াপথের দ্বারা (Embden-Meyerhof pathway) এবং (b) পেন্‌টোজ ফসফেট বিক্রিয়াপথের (pentose phosphate pathway মাধ্যমে। প্রথম পদ্ধতিতে 90% গ্লুকোজ এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে 10% গ্লুকোজের বিপাকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন জৈবশক্তি কোষের সক্রিয় পরিবহনে (Na-K পাম্প পরিচালনায়) এবং কোষের আকৃতি ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে ব্যয়িত হয়।

লোহিতকণিকার পরিণতি

Fate of R. B. C.

বার্ধক্যদশায় লোহিতকণিকার আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং তারা ক্ষণভঙ্গুর হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ লোহিতকণিকাকে **পয়কিলোসাইট** (poikilocytes) নামে অভিহিত করা হয়। এই বৃদ্ধ ক্ষণভঙ্গুর লোহিতকণিকা সামান্য চাপে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেংগে পড়ে। তাদের ভগ্ন অংশকে প্রধানত যকৃত ও প্লীহার R-E কোষ গ্রাস করে। অনেক বৃদ্ধ লোহিতকণিকাকে তারা সরাসরি গ্রাস করে এবং কোষ-সাইটোপ্লাজমে তাদের বিশ্লিষ্ট করে। হিমোগ্লোবিনের পরফাইরিন রিং ভেংগে 4টি পাইরোল গ্রুপ একটিমাত্র চেনে অবস্থান করে। এই **লব্ধ** পদার্থ **কোলেগ্লোবিন** (choleglobin) বা **ভারডোহিমোগ্লোবিন** (verdohemoglobin) নামে পরিচিত। পরবর্তী পর্যায়ে ইহা বিশ্লিষ্ট হয়ে **প্রোটিন** ও **হিম** (hem) উৎপন্ন করে। প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হয়ে অ্যামাইনোঅ্যাসিড উৎপন্ন করে। হিমের লোহঘটিত অংশ **ফেরিটিন** (ferritin) ও **হিমোসিডারিন** (hemosiderin) দেহে সঞ্চিত হয়। হিমের

বাকী অংশ **বিলিভার্ডিনে** (biliverdin) রূপান্তরিত হয়। বিলিভার্ডিন পরে বিজারিত হয়ে **বিলিরুবিন** (bilirubin) উৎপন্ন করে। শেষোক্ত পদার্থ দুটো প্লাজমাস্থিত α_1-গ্লোবিউলিনের সংগে যুক্ত হয়ে যকৃতে প্রবেশ করে। সেখানে α_1-গ্লোবিউলিন থেকে মুক্ত হয়ে **ইউরিডিন ডাইফসফেট গ্লুকুরোনেট** (uridine diphosphate glucuronate) নামক পদার্থের সংগে সংযুক্ত হয় এবং **মনোবিলিরুবিন** (monobilirubin) এবং **ডাইবিলিরুবিন গ্লুকুরোনাইড** (dibilirubin glucuronide) উৎপন্ন করে। **ইউরিডিন ডাইফসফেট** (uridine diphosphate) আলাদা হয়ে যায়। এই পদার্থগুলো এরপর পিত্তনালীর মাধ্যমে অন্ত্রের গ্রহণী বা ডুওডিনাম (duodenum) অংশে প্রবেশ করে এবং বৃহদন্ত্রস্থিত ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা **স্টার-কোবিলিনোজেন** (stercobilinogen) বা **ইউরোবিলিনোজেন** (urobilinogen)
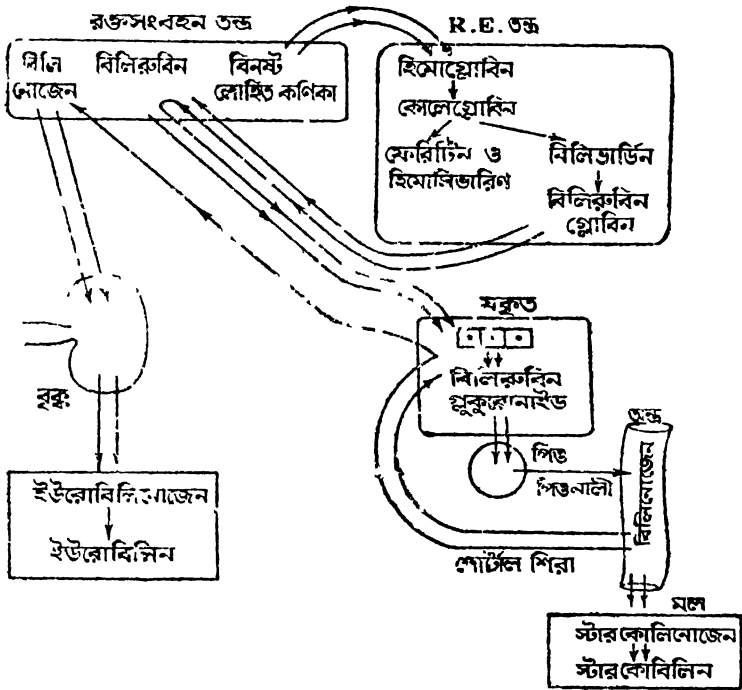
9-21-a নং চিত্র : লোহিতকণিকা ও হিমোগ্লোবিনের পরিণতি।

এবং **স্টারকোবিলিনে** (stercobilin) রূপান্তরিত হয়। মলের তামাটে বর্ণ এই দুটো পদার্থের উপস্থিতির জন্য দায়ী। অবশ্য কিছু পরিমাণ ইউরো-বিলিনোজেন পুনঃশোষিত হয়ে ইউরোবিলীন হিসাবে মূত্রের সংগে নির্গত হয়।

পলিসাইথেমিয়া
Polycythemia

লোহিতকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পেলে (6·5 মিলিয়নের বেশী) তাকে **পলিসাইথেমিয়া** বলা হয়। যে সব লোক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 15,000 ফুটেরও ঊর্ধ্বে বসবাস করে তাদের ক্ষেত্রে এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া যে অসুখে লোহিতকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী থাকে, তাকে **পলিসাইথেমিয়া ভেরা** (Polycythemia vera) বলা হয়। এক্ষেত্রে লোহিত-কণিকার সংখ্যা প্রতি ঘনমিলিমিটারে 11 মিলিয়ন পর্যন্ত এবং হিমাটক্রিট 70-75% হতে পারে

রক্তাল্পতা
Anemia

রক্তে লোহিতকণিকার সংখ্যা হ্রাস পেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে **রক্তাল্পতা** বলে। অত্যধিক রক্তক্ষরণে বা লোহিতকণিকা বর্ধিত হারে বিনষ্ট হলে (hemolysis) এই অবস্থার উদ্ভব ঘটে। এছাড়া লোহিতকণিকার বৃদ্ধির সংগে জড়িত উপাদানের অভাব দেখা দিলে বা অস্থিমজ্জার উৎপাদন ত্রুটিপূর্ণ হলে রক্তাল্পতা পরিলক্ষিত হয়। যেসব কারণের সংগে রক্তাল্পতা জড়িত নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

1. **লোহিতকণিকার বিনাশ বৃদ্ধি** (Increased destruction of R.B.C.)**:** ম্যালেরিয়া, সিফিলিস (syphilis) ইত্যাদি জাতীয় রোগে এ জাতীয় রক্তাল্পতা পরিলক্ষিত হয়। এই সব রোগে অধিক পরিমাণে অস্বাভাবিক ভঙ্গুর লোহিতকণিকার সৃষ্টি হয় এবং তারা দ্রুত বিনষ্ট হয়। অত্যধিক লোহিতকণিকার বিনাশে পিত্তপদার্থের (bilirubin) আধিক্য ঘটে এবং পাণ্ডুরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। **সিক্‌ল সেল অ্যানিমিয়া** (sickle cell anemia), **ফ্যামিলিয়েল হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া** (familial hemolytic anemia), **মেডিটেরানিয়াম অ্যানিমিয়া** (mediterranean anemia) ইত্যাদি এই জাতীয় রক্তাল্পতার উদাহরণ।

2. **রক্তপাত** (Blood loss)**:** অত্যধিক রক্তপাতে দেহে প্লাজমার অভাব পূরণ সম্ভব হলেও লোহিতকণিকার ক্ষতিপূরণ সম্ভবপর নয়। লোহিত-কণিকার সংগে লোহার ঘাটতি দেখা দেয়, যা পূরণযোগ্য নয়। ফলে রক্তাল্পতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এজাতীয় রক্তাল্পতাকে **নরমোসাইটিক** (normocytic) এবং **নরমোক্রমিক** (normochromic) রক্তাল্পতা বলা হয়। বাহির থেকে দেহে লোহার যোগান দিলে এ জাতীয় রক্তাল্পতা ধীরে ধীরে দূরীভূত হয়।

3 **লোহিতকণিকার ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন** (Defective formation of R.B-C.)**:** হিমোসাইটোব্লাস্ট থেকে লোহিতকণিকা উৎপাদনের পথে যেসব

ক্রমপর্যায় রয়েছে তাদের সাহায্যকারী পদার্থের (ভিটামিন B_{12}, ফলিক অ্যাসিড, ধাতু, পিত্তলবণ ইত্যাদি) অভাব দেখা দিলে অস্বাভাবিক বা ত্রুটিপূর্ণ লোহিতকণিকার সৃষ্টি হয় এবং রক্তাল্পতা দেখা দেয়। এজাতীয় রক্তাল্পতাকে **পারনিসিয়াস** (pernicius) বা **মেগালোব্লাস্টিক** (megaloblastic) রক্তাল্পতা বলা হয়।

4. **অস্থিমজ্জার ত্রুটি** (Defects in bone marrow): মজ্জার নিষ্ক্রিয়তা, এক্স-রে বা গামা-রে (γ-ray) এর তেজস্ক্রিয়া, মজ্জায় ক্যানসার, বৃক্করোগ, জৈব রাসায়নিক পদার্থ বা প্রতিবিষ প্রভৃতির বিক্রিয়া থেকে লোহিতকণিকার স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হয়। এজাতীয় রক্তাল্পতাকে **এপ্লাসটিক** (aplastic) রক্তাল্পতা বলে।

হিমোলাইসিস

Hemolysis

লোহিতকণিকা 0.9g% সোডিয়াম ক্লোরাইডের অভিস্রবণ চাপসম্পন্ন প্লাজমার সংগে অভিস্রবণসাম্যে অবস্থান করে। তাই সমসারক দ্রবণে লোহিত-কণিকাকে রাখলে তাদের কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। অতিসারক দ্রবণে রাখলে লোহিতকণিকা থেকে জল বেরিয়ে আসে এবং লোহিতকণিকা কুঞ্চিত হয়। অপরপক্ষে লঘুসারক দ্রবণে তাদের রাখলে লোহিতকণিকা ফেঁপে ফুলে উঠে এবং হিমোগ্লোবিন কোষ থেকে বেরিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়ার নাম **হিমোলাইসিস**। 0·42 শতাংশ লবণজলে অর্ধেক লোহিতকণিকা এভাবে বিচ্ছিন্ন (hemolysed) হয় এবং 0·25 শতাংশ লবণজলে তা সম্পূর্ণ হয়। শিরারক্তের লোহিতকণিকার ভঙ্গুরদশা ধমনী রক্তের চেয়ে বেশী। **জন্মগত স্ফেরোসাইটোসিস** (hereditary spherocytosis) রোগে লোহিতকণিকা প্লাজমাতে গোলাকার অবস্থায় থাকে, অতএব এদের লঘুসারক দ্রবণে (hypotonic solution) রাখলে তুলনামূলকভাবে দ্রুত ভেংগে যায়।

বিভিন্ন রকম ওষুধ ও জীবাণু সংক্রমণও লোহিতকণিকার হিমোলাইসিস ঘটাতে পারে। লোহিতকণিকায় গ্লুকোজ-6-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমের অভাব হলে এসব এজেন্ট লোহিতকণিকার হিমোলাইসিস আরো দ্রুত বাড়িয়ে দেয়। এই এনজাইমটি হেক্সোজ মনোফসফেট বিক্রিয়াপথে গ্লুকোজের জারণের প্রাথমিক ধাপের বিক্রিয়া শুরু করায়। এই বিক্রিয়াপথ থেকে উৎপন্ন NADPH কোন না কোনভাবে লোহিতকণিকার স্বাভাবিক ভঙ্গুরতা (fragility) বজায় রাখে। এই এনজাইমটি জন্মগত কারণে অনুপস্থিত হলে লোহিতকণিকার হিমোলাইসিস বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা উৎপন্ন করতে পারে। দেখা গেছে, এই এনজাইমের অভাবে শ্বেতকণিকারও ব্যাকটেরিয়াকে বিনষ্ট করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

রক্তের হিমোলাইসিস বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করা যায়। যথা: (a) অভিস্রবণ চাপের পরিবর্তন ঘটিয়ে: পাতিত জল বা লঘুসারক দ্রবণকে রক্তে মেশালে রক্ত-

কোষের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং তারা বিশ্লিষ্ট হয়। (b) স্নেহপদার্থের দ্রাবক (fat solvents) মিশিয়ে: ইথার, ক্লোরোফর্ম, বেনজিন ইত্যাদি রক্তে মেশালে লোহিতকণিকার কোষঝিল্লি বিনষ্ট হয় এবং রক্তকোষ বিশ্লিষ্ট হয়। (c) পৃষ্ঠটানের পরিবর্তন ঘটিয়ে: স্যাপোনিন (saponin) বা পিত্তলবণ মেশালে লোহিতকণিকার পৃষ্ঠটানের পরিবর্তন ঘটে এবং তারা বিশ্লিষ্ট হয়। (d) সাপের বিষ মিশিয়ে লোহিতকণিকার হিমোলাইসিস ঘটান যায়। (e) ব্যাকটেরিয়ার হিমোলাইসিন (hemolysin) পদার্থের মিশ্রণে লোহিতকণিকার হিমোলাইসিস ঘটে। (f) অসঙ্গত (incompatible) রক্তের মিশ্রণে লোহিতকণিকা প্রথমে পুঞ্জীভূত (agglutinate) হয় এবং পরে বিশ্লিষ্ট (hemolysed) হয়। (g) কুইনাইন (quinine), নাইট্রাইট (nitrites), ক্লোরেট (chlorates), ফেন্যাসেটিন (phenacetin) প্রভৃতি ঔষধের ব্যবহারে লোহিতকণিকার হিমোলাইসিস ঘটে। এ ছাড়া ভৌত বা যান্ত্রিক উপায়েও রক্তের হিমোলাইসিস ক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব।

হিমোগ্লোবিন
HEMOGLOBIN

হিমোগ্লোবিন রক্তের লোহিতকণিকাস্থিত লোহিত বঞ্জকপদার্থ। ইহা একটি ক্রমোপ্রোটিন বিশেষ। সরল প্রোটিন **গ্লোবিন** এবং লৌহঘটিত পদার্থ **হিমের** (hem) সমন্বয়ে ইহা গঠিত। হিমোগ্লোবিনের মধ্যে 96 শতাংশ গ্লোবিন এবং 4 শতাংশ হিম। লোহিতকণিকার স্ট্রোমা এবং কোষঝিল্লির লিপিডপদার্থে ইহা পৃষ্ঠলগ্ন (absorbed) হয়ে অবস্থান করে।

1. **রাসায়নিক প্রকৃতি** (Chemical Nature): হিম লৌহঘটিত **প্রটোপরফাইরিনের** একটি যৌগ। প্রটোপরফাইরিন (protopor-
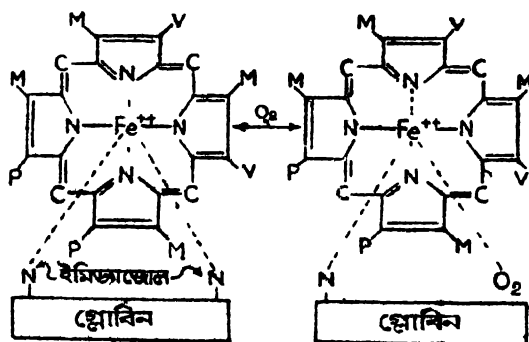
M = $-CH_3$ (মিথাইল)
V = $-CH=CH_2$ (ভিনাইল)
P = $-CH_2-CH_2-COOH$ (প্রোপিওনিক অ্যাসিড)

9-22নং চিত্র: হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক গঠন।

phyri.) 4টি **পাইরোল** (pyrrole) গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত। পাইরোল গ্রুপ 4টি **মিথিন** ($=CH-$) ব্রিজের দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। প্রতিটি পাইরোল গ্রুপে 2টি করে পার্শ্বচেন থাকে। এই পার্শ্বচেনদ্বয় মিথাইল (M), ভিনাইল (V) ; মিথাইল, ভিনাইল ; মিথাইল, প্রোপিওনিক অ্যাসিড (P) ; এবং প্রোপিওনিক অ্যাসিড, মিথাইল হিসাবে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত থাকে (9-22নং চিত্র)।

হিমোগ্লোবিনে শতকরা 0·34% লোহা থাকে। একজন বয়স্ক লোকের রক্তে মোট প্রায় 3 গ্রাম লোহা থাকে। হিমোগ্লোবিনে লোহা **ফেরাস** (Fe^{++}) আয়রন হিসাবে থাকে। ফেরাস আয়রন প্রতিটি পাইরোল গ্রুপের N-এর সংগে এবং গ্লোবিনের হিসটিডিনের (histidine) ইমিড্যাজোল নাইট্রোজেনের (N) সংগে সংযুক্ত হয়। ষষ্ট 'বণ্ড' (bond) অক্সিজেনের সংগে শিথিলভাবে মিলিত হতে পারে। ফেরাস আয়রন এভাবে 2টি **কোভেলেণ্ট** (covalent) এবং 4টি **কোওর্ডিনেট** বণ্ড (co-ordinate bond) গঠন করে।

সাধারণত হিমোগ্লোবিনস্থিত গ্লোবিন প্রোটিন 4টি পলিপেপটাইড চেনের সমন্বয়ে গঠিত। তার মধ্যে দুটো α-চেন এবং দুটো β-চেন। α-চেনে 141টি অ্যামাইনোঅ্যাসিড এবং β-চেনে 146টি অ্যামাইনোঅ্যাসিড আছে। প্রতিটি চেন একটি করে হিমের সংগে যুক্ত থাকে, ফলে একটি হিমোগ্লোবিন অণুতে 4টি লোহার পরমাণু থাকে। হিম সমেত প্রতিটি চেনের আণবিক ওজন 17,000। 4টি চেনের সমন্বয়ে গঠিত হিমোগ্লোবিনের ওজন তাই 68,000।

2. **প্রকারভেদ** (Varieties) : মানুষের স্বাভাবিক রক্তে দুধরনের হিমোগ্লোবিন পাওয়া যায় : (a) **বয়স্থ হিমোগ্লোবিন** (adult hemoglobin) এবং (b) **ভ্রূণজ হিমোগ্লোবিন** (fetal hemoglobin) : বয়স্থ হিমোগ্লোবিনকে A এবং A_2 এই দুভাগে ভাগ করা যায়। A শ্রেণীর হিমোগ্লোবিনে 2α-চেন এবং 2β-চেন থাকে এবং তাকে $\alpha_2^A\beta_2^A$ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। 98% লোকে এই হিমোগ্লোবিন থাকে। বাকী 2% হিমোগ্লোবিনকে A_2 হিমোগ্লোবিন বলা হয় এবং তাতে 2α-চেন এবং 2δ-চেন থাকে এবং তাকে $\alpha_2^A\delta_2^A$ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ভ্রূণজ হিমোগ্লোবিনকে F হিমোগ্লোবিন বলা হয় এবং তার মধ্যে 2α-চেন 2γ চেন থাকে, তাই তাকে $\alpha_2^A\gamma_2^B$ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

এই দুধরনের হিমোগ্লোবিনের মধ্যে যেসব পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তার

মধ্যে প্রধান : (1) ভ্রূণজ হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক ও বর্ণালীবিষয়ক ধর্ম আলাদা, (2) বয়স্থ হিমোগ্লোবিনের চেয়ে ভ্রূণজ হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন আসক্তি অনেক বেশী। তাছাড়া ইহা অতি সহজেই কার্বনডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করতে পারে। গ্লোবিন অংশের ভিন্ন প্রকৃতির জন্যই এই পার্থক্য দেখা যায়। পলিপেপটাইড চেনে অ্যামাইনোঅ্যাসিডের বিন্যাসের পার্থক্য থেকেই গ্লোবিনের
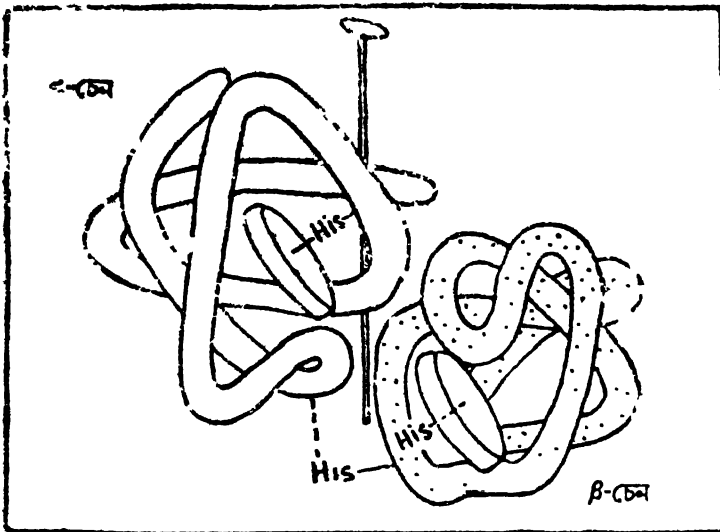
9-23 নং চিত্র :—হিমোগ্লোবিনের α এবং β-চেনে হিমের অবস্থা।

প্রকৃতি ভিন্ন হয়। (3) নিম্নচাপে ভ্রূণজ হিমোগ্লোবিন বয়স্ক হিমোগ্লোবিনের চেয়ে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। 20 মিলিমিটার রক্তচাপে ভ্রূণজ হিমোগ্লোবিন যেখানে 70 শতাংশ সম্পৃক্ত হয়, সেখানে বয়স্থ হিমোগ্লোবিন মাত্র 20 শতাংশ সম্পৃক্ত হয়।

এছাড়াও বিভিন্ন অসুস্থ অবস্থায় রক্তে **অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের** (abnormal) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এরকম একটি হিমোগ্লোবিনের নাম হিমোগ্লোবিন-S(HbS)। ইহা সিকল সেল অ্যানিমিয়াতে (sickle cell anemia) লোহিতকণিকায় পাওয়া যায়।

3. **স্বাভাবিক রক্তের হিমোগ্লোবিন** (Normal blood hemoglobin) : প্রতি ডেসিলিটার বা 100 মিলিলিটার রক্তের হিমোগ্লোবিনের গড় পরিমাণ 14·5 গ্রাম। পুরুষে এই পরিমাণ 14-18 গ্রাম/dl। স্ত্রীলোকে 12-15·0 গ্রাম/dl। নবজাতকে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী, প্রায় 23 গ্রাম/dl। জন্মের

2 মাস পরেই ইহা প্রতি ডেসিলিটারে 10·5 গ্রামে হ্রাস পায়। বছরের শেষের দিকে ইহা প্রায় 12·5 গ্রাম/dl-এ ওঠে আসে, তারপরই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক পরিমাণে পেঁছয়।

4. **নির্ণয় পদ্ধতি** (Method of determination) **:** রক্তস্থিত হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। সঠিক পদ্ধতির গোড়ার কথা, রক্তের **অক্সিজেন ক্ষমতার** (oxygen capacity) নির্ধারণ এবং তার থেকে প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে লোহার পরিমাণ নির্ণয় (1 গ্রাম হিমোগ্লোবিন 1·34 মি.লি. অক্সিজেনের সংগে যুক্ত হতে পারে এবং প্রতি অণু হিমোগ্লোবিনে প্রায় 0·34% লোহা থাকে)। ভ্যান্‌স্লাইক (Van slyke) বা অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন-ক্ষমতা নির্ধারণ করা যায়। কোন রক্তে প্রতি 100 মিলিলিটারে 50 মিলিগ্রাম লোহা থাকলে তার হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ হবে (50/0·34) × 100 = 15 গ্রাম।
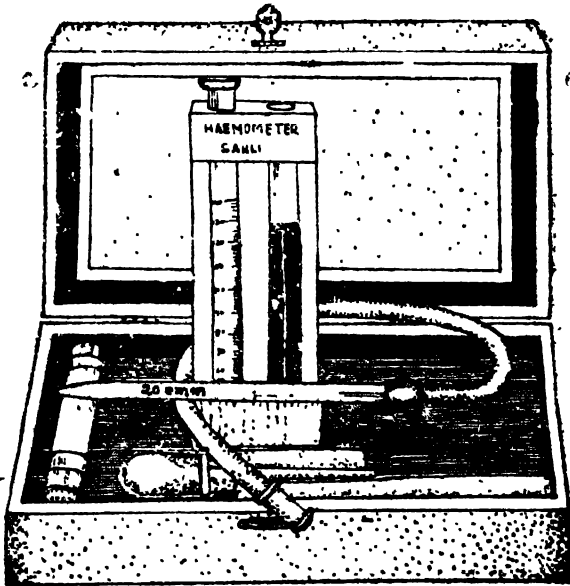
9-24নং চিত্র : সালির হিমোমিটার।

পরীক্ষাগারে যেসব সহজ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে প্রধান **:** (a) **সালির পদ্ধতি** (Sahli's method) এবং (b) **হ্যালডেনের পদ্ধতি**

(Haldane method)। উভয় ক্ষেত্রেই **হিমোগ্লোবিনোমিটার** বা **হিমোমিটার** যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়।

(a) **সালির পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে অ্যাসিডের দ্বারা হিমোগ্লোবিনকে **অ্যাসিড হিমাটিনে** (acid hematin) পরিণত করা হয় এবং একটি প্রমাণ বর্ণের সংগে উৎপন্ন বর্ণের তুলনা করে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

হিমোগ্লোবিনোমিটার পিপেটের দ্বারা 20 ঘনমিলিমিটার (c. mm) রক্তকে একটি অংশাঙ্কিত হিমোগ্লোবিনোমিটার টিউবের 20 দাগ অবধি পূর্ণ N/10HCl এ ডুবান হয়। HCl স্থিত রক্তকে কিছুক্ষণ ধরে নাড়ান হয় এবং প্রয়োজনবোধে পাতিত জল মিশিয়ে প্রমাণ বর্ণের সংগে তুলনা করা হয়। হিমোগ্লোবিনোমিটারের টিউবের অংশাঙ্কন গ্রামে বা শতাংশে দেওয়া থাকে। তার থেকে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়।

(b) **হ্যাল্‌ডেনের পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে রক্তকে একইভাবে নিয়ে অংশাঙ্কিত টিউবের 0·4% অ্যামোনিয়া দ্রবণে (20 দাগ অবধি) ডুবান হয়। রক্তের মধ্য দিয়ে এরপর মিনিট কয়েক ধরে কোলগ্যাস পাঠান হয়। রক্ত কার্‌বোক্সিহিমোগ্লোবিনে পরিণত হয়। প্রয়োজনে 0·4% অ্যামোনিয়া দ্রবণ মিশিয়ে প্রমাণ বর্ণের সংগে উৎপন্ন বর্ণের তুলনা করা হয়।

অধুনা **বর্ণালী-দীপ্তিমিতির** (spectrophotometry) সাহায্যে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

5. **পরিণতি** (Fate) **:** লোহিতকণিকার পরিণতির মত।

6. **কার্যাবলী** (Functions) **:** হিমোগ্লোবিন যেসব কার্যাবলী সম্পন্ন করে তাদের মধ্যে প্রধান **:** (a) **অক্সিজেন পরিবহন :** অক্সিজেনের সংগে যুক্ত হয়ে ইহা অক্সিহিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে। ইহা একটি শিথিল যোগবিশেষ। অতি সহজেই কলাকোষ এর থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। (b) **কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিবহন :** হিমোগ্লোবিন কোষনির্গত কার্বনডাই-অক্সাইডের একাংশকে পরিবহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায় এবং দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে সাহায্য করে। (c) **রঞ্জনপদার্থ উৎপাদন :** মলমূত্র ইত্যাদিস্থিত নানাপ্রকার রঞ্জকপদার্থ হিমোগ্লোবিন থেকেই হয়। (d) **বাফার :** বাফারের একটি উপাদান হিসাবে ইহা অম্ল-ক্ষারের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

হিমোগ্লোবিনের জৈব সংশ্লেষণ
Biosynthesis of Hemoglobin

অস্থিমজ্জায় প্রতিদিন প্রায় 7 গ্রাম হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন হয়। হিমোগ্লোবিনের জৈবসংশ্লেষণকে 4টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়ঃ (a) **প্রোটোপরফাইরিনের সংশ্লেষণ** (synthesis of protoporphyrin), (b) **প্রোটোপর্ফাইরিনের সংগে ফেরাস আয়রনের সংযুক্তি ও হিম উৎপাদন** (union of protoporphyrin with ferrous iron and hem production), (c) অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে **গ্লোবিনের সংশ্লেষণ** এবং (d) **গ্লোবিনের সংগে হিমের সংযুক্তি** (union of hem with globin)। সংক্ষেপে (9-21 নং চিত্র)ঃ

(a) গ্লাইসিন + সক্রিয় সাকসিনেট → প্রোটোপর্ফাইরিন III
(b) প্রোটোপর্ফাইন III + Fe^{++} → হিম
(c) অ্যামাইনো অ্যাসিড → গ্লোবিন।
(d) গ্লোবিন + হিম → হিমোগ্লোবিন।

(1) **প্রোটোপরফাইরিনের সংশ্লেষণঃ** সক্রিয় গ্লাইসিন ও সাক্সিনেটকে (succinyl CoA) আইসোটোপের দ্বারা লেবেল করে জানা গেছে, এই দুটো পদার্থ প্রোটোপর্ফাইরিনের সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। সক্রিয় সাক্সিনেটকে TCA চক্র থেকে পাওয়া যায়।

সংশ্লেষণের প্রারম্ভে গ্লাইসিন পিরাইডোক্সাল ফসফেটের (pyridoxal phosphate) সংগে যুক্ত হয়ে অন্তর্বর্তী **স্কিফ বেস** (schiff base intermediate) উৎপন্ন করে। স্কিফ বেসস্থিত গ্লাইসিনের α-কার্বন সক্রিয় সাক্সিনেটের কার্বনীল কার্বনের সংগে যুক্ত হয়ে **α-অ্যামাইনো-β-কিটো অ্যাডিপিক অ্যাসিড** (α-amino β-ketoadipic acid) উৎপন্ন করে। পিরাইডোক্সাল ফসফেট এবং কো-এনজাইম A (HSCoA) নির্গত হয়। এনজাইম অ্যামাইনোলেভুলিনিক অ্যাসিড সিন্থেটেজ অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

গ্লাইসিন + পিরাইডোক্সাল ফসফেট → স্কিফ বেস + H_2O
স্কিফ বেস + সক্রিয় সাক্সিনেট → α-অ্যামাইনো β-কিটো অ্যাডিপিক অ্যাসিড + পিরাইডোক্সাল ফসফেট + HSCoA

উৎপন্ন α-অ্যামাইনো β-কিটো অ্যাডিপিক অ্যাসিড এক অণু CO_2 হারিয়ে দ্রুত **δ-অ্যামাইনো লেভুলিনিক অ্যাসিডে (δALA)** রূপান্তরিত হয়। ডিকারবো-

ফ্লিলেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে এর রূপান্তর প্রধানত মাইটোকনড্রিয়াতে সম্পন্ন হয়।

$$\alpha\text{-অ্যামাইনো } \beta \text{ কিটো অ্যাডিপিক অ্যাসিড} \rightarrow \delta\text{ ALA} + CO_2$$

9-25নং চিত্র ঃ হিমোগ্লোবিনের জৈব সংশ্লেষণের পর্যায়ক্রম।
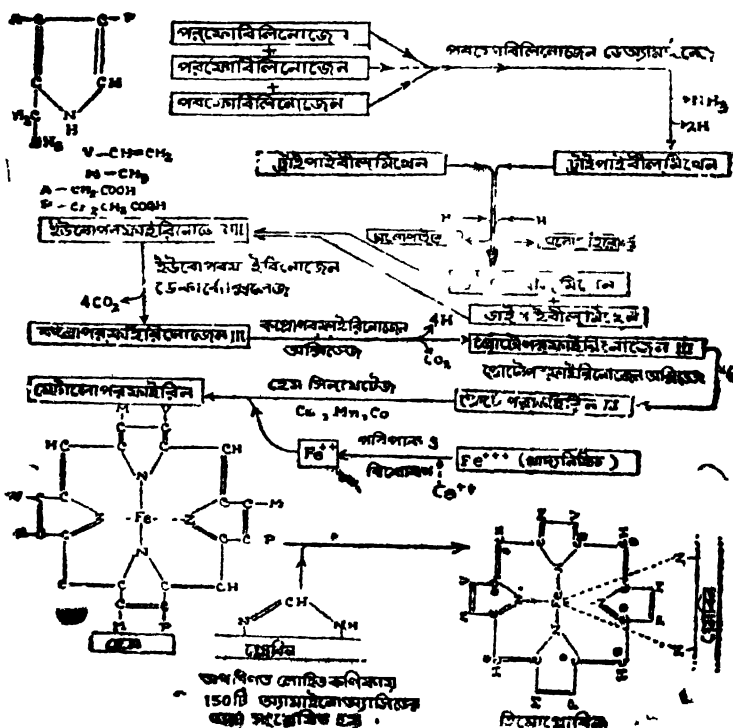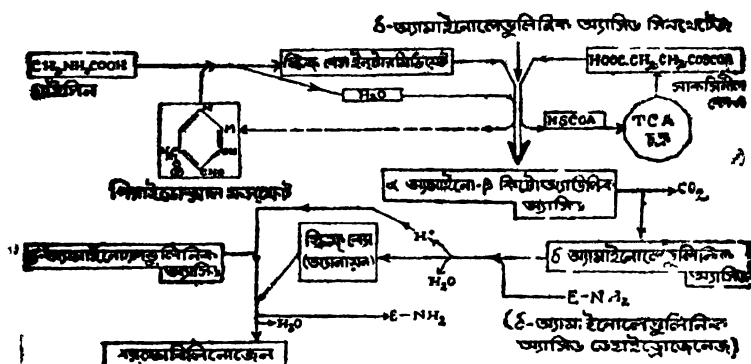
δ-অ্যামাইনো লেভুলিনিক অ্যাসিড δALA-ডেহাইড্রেজ এনজাইমের ($E\text{-}NH_2$) সংগে যুক্ত হয়ে প্রথমে একটি অন্তর্বর্তী শিফ বেস উৎপন্ন করে। এই পরিবর্তনের সময় এক অণু জল ও একটি H^+ আয়ন বিযুক্ত হয়, ফলে উৎপন্ন পদার্থটি এনায়ন (anion) বা ঋণাত্মক আয়ন হিসাবে আচরণ করে। এই বেস এনায়ন দ্বিতীয় δALA অণুর কার্বনীল গ্রুপকে আক্রমণ করে, ফলে একটি অন্তর্বর্তী অ্যালডোল (aldol) যোগ উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত পদার্থ থেকে এক অণু জল নির্গত হয় এবং পর্যায়ক্রমিক গঠনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ইহা **পরফোবিলিনোজেনে** রূপান্তরিত হয় এবং এনজাইম মুক্ত হয়।

δALA + $E\text{-}NH_2$ → শিফ বেস এনায়ন + H_2O + H^+
শিফ বেস এনায়ন + δALA → অন্তর্বর্তী অ্যালডোল
অন্তর্বর্তী অ্যালডোল → পরফোবিলিনোজেন + $E\text{-}NH_2$
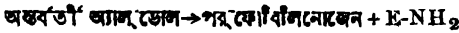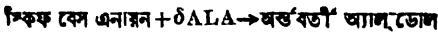
পরবর্তী পর্যায়ে পরফোবিলিনোজেন ডিঅ্যামাইনেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে পরফোবিলিনোজেনের তিনটি অণু একীভূত হয় এবং প্রথমে **ট্রাইপাইরিল মিথেন** (tripyrryl methane) উৎপন্ন করে, যা বিশ্লিষ্ট হয়ে এক অণু **ডাইপাইরিল মিথেন** (dipyrryl methane) এবং এক অণু **মনোপাইরোল** (monopyrrole) উৎপন্ন করে। NH_3 এবং দুটো H^+ নির্গত হয়।

3 × পরফোবিলিনোজেন → ট্রাইপাইরিল মিথেন + NH_3 + $2H^+$
2 ট্রাইপাইরিল মিথেন → ডাইপাইরিল মিথেন + মনোপাইরোল
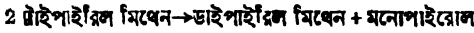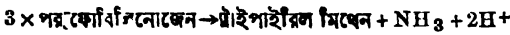
এরপর এনজাইম ইউরোপরফাইরিনোজেন সিনথেটেজের উপস্থিতিতে ডাইপাইরিল মিথেনের দুটো অণু সংযুক্ত হয়ে **ইউরোপরফাইরিনোজেন III** (uroporphyrinogen III) যোগ উৎপন্ন করে। এই পদার্থটি এরপর ডিকার্বক্সিলেজ এনজাইমের দ্বারা **কোপ্রোপরফাইরিনোজেন IIIতে** (coproporphyrinogen III) পরিণত হয় এবং 4 অণু CO_2 নির্গত হয়। ইউরোপরফাইরিনোজেন III-এর 4টি অ্যাসিটেট গ্রুপ থেকে এভাবে CO_2 নির্গত হবার ফলে তারা মিথাইল গ্রুপে পরিণত হয়।

2 × ডাইপাইরিল মিথেন → ইউরোপরফাইরিনোজেন III
ইউরোপরফাইরিনোজেন III → কোপ্রোপরফাইরিনোজেন III + $4CO_2$

কোপরোপরফাইরিনোজেন III এরপর মাইটোকনড্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং মাইটোকনড্রিয়াস্থিত এনজাইম কোপ্রোপরফাইরিনোজেন অক্সিডেজের

উপস্থিতিতে প্রোটোপর্‌ফাইরিনোজেন III-তে (protoporrphyrinogen III) রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের সময় প্রোপিওনিক পার্শ্বচেন থেকে CO_2 এবং $4H^+$ নির্গত হয় (oxidative decarboxylation), ফলে প্রোপিওনিক গ্রুপ $(-CH_2-CH_2-COOH)$ ভিনাইল গ্রুপে $(-CH=CH_2)$ পরিণত হয়।

উৎপন্ন পদার্থটি এরপর এন্‌জাইম প্রোটোপর্‌ফাইরিনোজেন অক্সিডেজের দ্বারা জারিত হয়ে **প্রোটোপর্‌ফাইরিন** III তে পরিণত হয় এবং $6H^+$ নির্গত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর যকৃতে এই রূপান্তরের সময় O_2 এর উপস্থিতি অত্যাবশ্যক।

প্রোটোপর্‌ফাইরিনোজেন III→প্রোটোপর্‌ফাইরিন III + 6H
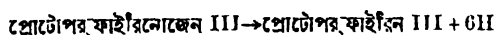
(2) **হিমের উৎপাদন:** মজ্জার অপরিণত লোহিতকণিকা **ফেরিটিন** (ferritin) বা **ট্রান্‌স্‌ফেরিন** (transferrin) থেকে প্রয়োজনীয় লোহা সংগ্রহ করে। উভয় অবস্থাতেই লোহা ফেরিক আয়রন (Fe^{+++}) হিসাবে অবস্থান করে, কিন্তু প্রোটোপর্‌ফাইরিনের সংগে সংযুক্তির জন্য ফেরাস আয়রন (Fe^{++}) আবশ্যক। Ca^{++}, Co^{++} এবং ভিটামিন C ফেরিক আয়রনকে ফেরাস আয়রনে রূপান্তরে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে (বিশেষত Ca^{++} আয়ন)। ফেরাস আয়রন (Fe^{++}) প্রোটোপর্‌ফাইরিনের প্রতিটি পাইরোল গ্রুপের নাইট্রোজেনের (N) সংগে যুক্ত হয় এবং মেটালোপর্‌ফাইরিন বা হিম উৎপাদন করে। এন্‌জাইম **হিমসিন্‌থেটেজ** এই সংযুক্তিকে পরিচালনা করে।

প্রোটোপর্‌ফাইরিন + Fe^{++}→মেটালোপর্‌ফাইরিন বা হিম
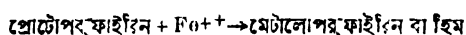
Fe^{++} যখন প্রোটোপর্‌ফাইরিন বলয়ে (ring) প্রবেশ করে, তখন দুটো পাইরোলের-NH গ্রুপ থেকে দুটো প্রোটোন স্থানচ্যুত হয়। দুটো N-পরমাণু তাই ঋণাত্মক আয়নের মত আচরণ করে। তবে বলয়ের মধ্যে অনুনাদের (resonance) ফলে দুটো আধানই (charge) সবকটি N-পরমাণুতে সমানভাবে বিস্তারলাভ করে বলে ধারণা করা হয়। অতএব পর্‌ফাইরিন বলয়ের সংগে ফেরাস আয়রনের চারটি বণ্ডই সমধর্মী হয়, যদিও তাদের মধ্যে দুটো কোভালেণ্ট (covalent) এবং দুটো কোওর্‌ডিনেট (co-ordinate) বণ্ড।

(3) **গ্লোবিনের সংশ্লেষণ:** গ্লোবিনের α ও β দুটো চেনই অপরিহার্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে অপরিণত লোহিতকণিকার সাইটোপ্লাজমস্থিত পলিরাইবোসোমে সংশ্লেষিত হয়। হিস্‌টিডিন (histidine), ফেনাইল অ্যালানিন

(phenylalanine), লিউসিন (leucine) প্রভৃতি অ্যামাইনোঅ্যাসিড গ্লোবিন উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সাইটোপ্লাজমের যে পলিরাইবোসোমে গ্লোবিনের সংশ্লেষণ সংঘটিত হয়, তা 5টি রাইবোসোমের সমন্বয়ে গঠিত। এক্ষেত্রে, দুটো রাইবোসোমের কেন্দ্রদূরত্ব 340Å। যে সংকেতবাহী RNA বা mRNA এই 5টি রাইবোসোমকে ধরে রাখে তার দৈর্ঘ্য প্রায় 1500Å। এই mRNA গ্লোবিনের পলিপেপ্টাইড চেনে কতটা অ্যামাইনোঅ্যাসিড থাকবে এবং তাদের পর্যায়ক্রম কি হবে তা ঠিক করে। এই বিশেষ mRNA নিউক্লিয়াসের DNA দ্বারা উৎপন্ন হয়। ক্রমোসোমের একটি **সিস্ট্রন** (cistrons) বা একটি **জিন** (gen) একটি পলিপেপটাইড চেন গঠনের জন্য দায়ী। অতএব দুটো চেনের জন্য (α, β) ক্রমোসোমের দুধরনের **সিস্ট্রন** প্রয়োজন। যে কোন সিস্ট্রনের পরিব্যক্তি বা মিউটেশন (mutation) থেকে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন হয়।

(4) **গ্লোবিনের সংগে হিমের সংযুক্তি :** হিমের ফেরাস আয়রন এরপর গ্লোবিনের ইমিড্যাজোল নাইট্রোজেনের সংগে (হিস্টিডিনের) সংযুক্ত হয়ে হিমোগ্লোবিন গঠন করে। এ ক্ষেত্রেও কোওর্ডিনেট বণ্ডের দ্বারা সংযোগ স্থাপিত হয়। ফেরাস আয়রনের ষষ্ঠ বণ্ডটি O_2 এর সংগে শিথিলভাবে যুক্ত হয়। অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে ইহা H_2O এর সংগে যুক্ত করে।

হিমোগ্লোবিনজাত পদার্থসমূহ
Derivatives of Hemoglobin

হিমোগ্লোবিন অন্যান্য পদার্থের সংগে যুক্ত হয়ে যেমন যৌগপদার্থ গঠন করে, তেমনি হিমোগ্লোবিন থেকে নানাপ্রকার পদার্থও উৎপন্ন হয়। নিম্নে সংক্ষেপে তাদের আলোচনা করা হয়েছে।

1 **হিমোগ্লোবিনের যৌগ** (Compounds of Hemoglobin) **:**

(a) **কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন** (Carboxyhemoglobin) **:** কার্বনমনোক্সাইডের (CO) সংগে হিমোগ্লোবিন যুক্ত হয়ে এই যৌগ উৎপন্ন করে। কোল গ্যাসের বিষপ্রয়োগে এটি রক্তে দেখা যায়। (b) **কার্বহিমোগ্লোবিন :** কার্বনডাইঅক্সাইড হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন অংশের সংগে যুক্ত হয়ে এই যৌগ উৎপন্ন করে। (c) **অক্সিহিমোগ্লোবিন** (Oxyhemoglobin) **:** হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সংগে যুক্ত হয়ে এই শিথিল যৌগটি উৎপন্ন করে। রক্তকে

বায়ুশূন্য স্থানে রাখলে হিমোগ্লোবিনস্থিত এই অক্সিজেন নিজে থেকেই মুক্ত হয়। অক্সিহিমোগ্লোবিনের লোহা ফেরাস আয়ন (F^{++}) হিসাবে অবস্থান করে। (d) **মেথেমোগ্লোবিন** (Mathemoglobin)ঃ হিমোগ্লোবিনের সংগে অক্সিজেনের স্থায়ী যৌগকে (stable compound) মেথেমোগ্লোবিন বলা হয়। এর বর্ণ চকোলেটের মত বাদামী। অক্সিজেনকে এই যৌগ থেকে মুক্ত করা সহজসাধ্য নয়। লোহা এখানে ফেরিক আয়ন (F^{+++}) হিসাবে থাকে। (e) **নাইট্রিক অক্সাইড হিমোগ্লোবিন** (Nitric oxide hemoglobin)ঃ দেহে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) প্রবেশ করলে এই যোগটি উৎপন্ন হয়। (f) **সালফে-হিমোগ্লোবিন** (sulphemoglobin)ঃ H_2S-এর সংগে হিমোগ্লোবিনের সংযোগে এই যৌগটি উৎপন্ন হয়। এই যৌগটি স্থায়ী যৌগ। কোন ঔষধের বিষক্রিয়ার ফলে কখনও কখনও রক্তে এর উপস্থিতি ধরা পড়ে।

2. **লব্ধ পদার্থ** (Derived products)ঃ (a) **হেমিন** (Hemin)ঃ হিমাটিন হাইড্রোক্লোরাইডকে হেমিন নামে অভিহিত করা হয়। ইহা ফেরিক লোহার একটি যৌগ। গ্ল্যাসিয়েল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (glacial acetic acid) এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংগে হিমোগ্লোবিনকে উত্তপ্ত করলে এই পদার্থটি পাওয়া যায়। (b) **হিমাটিন** (Hematin)ঃ হিমাটিন ফেরিক লোহার একটি যৌগ। অম্ল বা ক্ষার এই দু-ধরনের হিমাটিনের সন্ধান পাওয়া যায়। হিমোগ্লোবিনের সংগে অম্ল বা ক্ষারের বিক্রিয়া থেকে এই পদার্থটির আবির্ভাব ঘটে। (c) **হিম** (Hem)ঃ হিম ফেরাস লোহার যৌগ বিশেষ। ক্ষারকীয় হিমাটিনের বিজারণে ইহা উৎপন্ন হয়। (d) **হিমোসিডারিন** (Hemosiderin)ঃ হিমোগ্লোবিনের ক্রমাবনতির সময়ে এই যৌগটি উৎপন্ন হয়। ইহা একটি লোহার যৌগ। (e) **হিমোক্রোমোজেন** (Hemo-chromogen)ঃ এটিও একটি ফেরাস লোহার যৌগ। অ্যামোনিয়াম সালফাইড দিয়ে ক্ষারীয় হিমাটিনকে বিজারিত করলে এই পদার্থটি উৎপন্ন হয়। (f) **হিমাটোপরফাইরিন** (Hematoporphyrin)ঃ ইহা একটি লৌহবিহীন যৌগ। সালফিউরিক অ্যাসিডের সংগে রক্তকে মেশালে এই যৌগটি উৎপন্ন হয়। অম্ল ও ক্ষার এই দু প্রকারের হিমাটোপরফাইরিন দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন যকৃৎ রোগে এই পদার্থটিকে মূত্রের সংগে নির্গত হতে দেখা যায়। (g) **বিলিরুবিন** (Bilirubin)ঃ বিনষ্ট হিমোগ্লোবিন থেকে সৃষ্ট এই লৌহবিহীন যৌগটি পিত্তরসের প্রধান রঞ্জকপদার্থ। পিত্তরসের অন্যান্য রঞ্জক

পদার্থও এর থেকে উৎপন্ন হয়। (1) **হিমোপাইরোল** (Hemopyrrole): বিনষ্ট হিমোগ্লোবিন থেকে এই পদার্থটি উৎপন্ন হয়। ইহা লৌহবিহীন যৌগ। বিলিরুবিনের সংগে এর সাদৃশ্য প্রচুর।

শ্বেতকণিকা
LEUCOCYTES

লোহিতকণিকা ছাড়া রক্তে অবস্থানকারী শ্বেত কোষগুলোকে **শ্বেতকণিকা** বলা হয়। নিউক্লিয়াসযুক্ত এই কোষগুলো সংখ্যায় যেমন লোহিতকণিকার চেয়ে অনেক কম (প্রতি 700টি লোহিতকণিকায় একটি মাত্র শ্বেতকণিকা দেখতে পাওয়া যায়), তেমনি লোহিতকণিকার চেয়ে তারা বৃহদাকার। শ্বেতকণিকায় হিমোগ্লোবিন অনুপস্থিত। তাদের মধ্যে অ্যামিবার মত সক্রিয় গতি পরিলক্ষিত হয়। এদের জীবনকাল খুবই অল্প। এরা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। একজন মানুষের প্রতি ঘনমিলিমিটার বা মাইক্রোলিটার রক্তে গড়ে 6,000 থেকে 8,000টি (4000—11,000টি) শ্বেতকণিকা দেখতে পাওয়া যায়। নবজাতকে এই সংখ্যা প্রতি মাইক্রোলিটারে 20,000টি। জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ইহা হ্রাস পেতে থাকে এবং 5-10 বছরে স্বাভাবিকে ফিরে আসে। শৈশবে রক্তে লিম্ফোসাইটের সংখ্যাও বেশী থাকে, প্রায় 40-50 শতাংশ। শ্বেতকণিকার সংখ্যা প্রতি মাইক্রোলিটারে 11,000 এর বেশী হলে তাকে **লিউকোসাইটোসিস** (leucocytosis) বলা হয়। প্রতি মাইক্রোলিটারে এদের সংখ্যা 4000 এর চেয়ে হ্রাস পেলে তাকে **লিউকোপেনিয়া** (leucopenia) বলা হয়।

1. **শ্বেতকণিকার শ্রেণীবিন্যাস** (Classification of W.B.C.): শ্বেতকণিকাকে দু ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়; (a) **দানাদার শ্বেতকণিকা** (granular leucocytes) এবং (b) **দানাহীন শ্বেতকণিকা** (agranular leucocytes)। দানাদার শ্বেতকণিকার সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন প্রকার দানার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। লিশম্যান বর্ণের প্রয়োগ করে শ্বেতকণিকার সাইটোপ্লাজমে যেসব দানার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, তাদের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে দানাদার শ্বেতকণিকাকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা যায়: (i) **নিউট্রোফিল**, (ii) **ইওসিনোফিল** এবং (iii) **বেসোফিল**। নিউট্রোফিলের সাইটোপ্লাজমে দানাগুলো সূক্ষ্ম এবং দেখতে ফেকাশে লাল বা রক্তবেগনি হয়। ইওসিনোফিলের সাইটোপ্লাজমে লালবর্ণের স্থূল দানা দেখা যায়। বেসোফিলের

সাইটোপ্লাজমে ছোটবড় বেগুনি-নীল দানার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এদের নিউক্লিয়াস লোবযুক্ত হয়।

দানাহীন শ্বেতকণিকার সাইটোপ্লাজমে দানা থাকে না। তবে নিউট্রেল রেড ও জেনাস গ্রীনের দ্বারা শ্বেতকণিকাকে বর্ণযুক্ত করলে মাইটোকনড্রিয়া ও অসংখ্য লোহিত দানা দেখতে পাওয়া যায়। রাইটের বর্ণপ্রয়োগেও (Wright's stain) এদের সাইটোপ্লাজমে অ্যাজুরোফিল দানা (azurophilic granules)
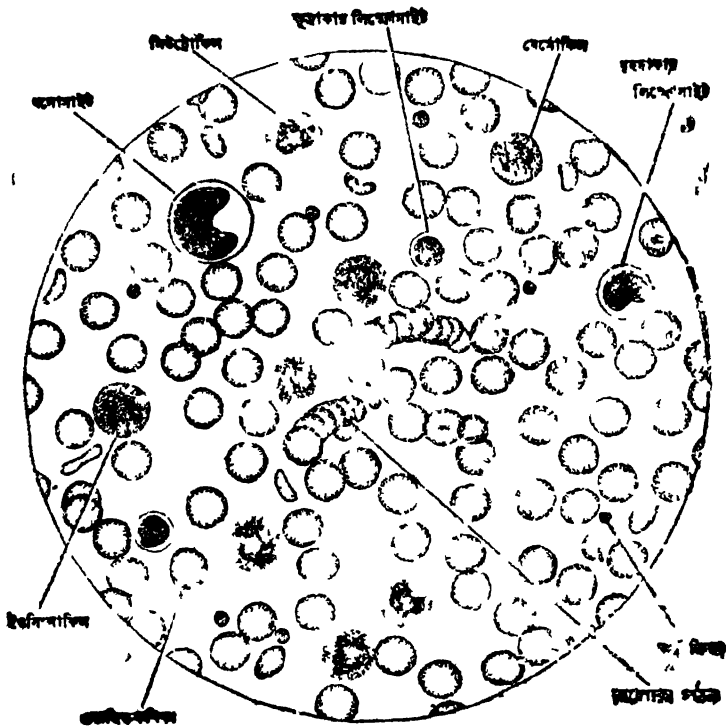
9-26 নং চিত্র : রক্তপ্রলেপে বিভিন্নপ্রকার শ্বেতকণিকা।

দেখা যায়। লিশম্যান বর্ণে এদের সাইটোপ্লাজম পরিষ্কার ধূসর নীল দেখায়। দানাহীন শ্বেতকণিকাকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় : (1) **লিম্ফোসাইট** (ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারের) এবং (2) **মনোসাইট** এদের সাধারণত একক নিউক্লিয়াস থাকে। শ্বেতকণিকার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

(1) **নিউট্রোফিল (Neutrophil) :** রক্তসংবহনে এদের গড় হাফ লাইফ 6 ঘণ্টা। তাই রক্তসংবহনে নিউট্রোফিলের সংখ্যা বজায় রাখতে হলে প্রতিদিন

100 বিলিয়নেরও বেশী নিউট্রোফিল উৎপাদন প্রয়োজন। নিউট্রোফিল 10 থেকে 12μ ব্যাসসম্পন্ন। অস্থিমজ্জার কমিটেট স্টেম সেল থেকে এরা উৎপন্ন হয়। নিউক্লিয়াসে 2 থেকে 7টি (সাধারণত 2-5টি) লোব বা খণ্ড থাকে। সূক্ষ্ম ক্রোমাটিন সূত্রের দ্বারা এরা আবদ্ধ থাকে। 3% কোষে ড্রামস্টিক যৌন **ক্রোমোসোম** (xx) থাকে। শ্বেতকণিকার বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে নিউক্লিয়াসের লোবের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানাযুক্ত। এদের বর্ণ ফেকাশে লাল বা রক্তবেগনি। সাইটোপ্লাজমে 50-2000টি গাঢ় দানার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। মানুষে এদের ব্যাস 0·2μ।এরা **লাইসোসোম** (lysosome) বিশেষ। এই দানাগুলোতে এনজাইম মায়েলোপেরোক্সিডেজ (myeloperoxidase) থাকে। এছাড়া ফসফাটেজ, নিউক্লিয়েজ, নিউক্লিওটিডেজ এবং β-গ্লুকুরোনিডেজ থাকে। এদের মধ্যে সক্রিয় অ্যামিবাগতি ও আগ্রাসী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

(ii) **ইওসিনোফিল** (Eosinophil)ঃ ইওসিনোফিলের জীবনকাল 8 থেকে 12 দিন। কোষগুলো 10 থেকে 12μ ব্যাসসম্পন্ন। নিউক্লিয়াস 2 থেকে 3-টি লোববিশিষ্ট (সাধারণত 2টি)। সাইটোপ্লাজম স্থূল দানাদার এবং অম্লধর্মী বর্ণের (acid dye) প্রতি আসক্ত। ইওসিন (eosin) বর্ণপ্রয়োগে সাইটোপ্লাজমীয় দানাগুলো লালবর্ণ ধারণ করে। এই দানাগুলোও লাইসোসোমধর্মী। নিউট্রোফিল দানায় যেসব এনজাইম পাওয়া যায়, এদের ভেতরও সে সব এনজাইমের সমাবেশ লক্ষ্য করা গেছে। তবে এদের মধ্যে পেরোক্সিডেজের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী থাকে এবং ব্যাকটেরিয়াবিনাশী পদার্থ কম থাকে। এদের মধ্যে সক্রিয় অ্যামিবা-গতি পরিলক্ষিত হয়, ও আগ্রাসীও হয়, কারণ অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি জটিলকে এরা গ্রাস করতে পারে। বিভিন্ন এলার্জিগত অবস্থায় এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যেমনঃ হে-ফিভার (hay-fever), হাঁপানি রোগ, চর্মরোগ এবং পরজীবি সংক্রমণ (parasitic infections)। 'হিস্টামিন' (histamine) জাতীয় পদার্থ এই কোষে পাওয়া যায়।

(iii) **বেসোফিল** (Basophil)ঃ বেসোফিলের জীবনকাল 12 থেকে 15 দিন। কোষের ব্যাস 8 থেকে 10μ। নিউক্লিয়াস কিছুটা লোবযুক্ত বা বৃক্কাকৃতি। সাইটোপ্লাজম বিভিন্ন আকৃতির দানাযুক্ত এবং ক্ষারধর্মী বর্ণের (basic dye) প্রতি আসক্ত। সাইটোপ্লাজম ইওসিনের চেয়ে কম দানাযুক্ত। দানাগুলো দেখতে বেগনি নীল হয়। এরা হেপারিন বা মেটাক্রমাটিন দানা হিসাবে পরিচিত। এদের মধ্যেও সক্রিয় অ্যামিবাগতি পরিলক্ষিত হয়। এরা R-E তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। দানাদার পদার্থে হিস্টামিন (histamine), হেপারিন,

5-হাইড্রোক্সিট্রিপ্‌টামিন (5-hydroxytryptamine) প্রভৃতি পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়।

(iv) **লিম্ফোসাইট** (Lymphocytes)**:** লিম্ফোসাইটের জীবনকাল 2 থেকে 3 দিন। এদের দুভাগে বিভক্ত করা চলে। যথা: (a) বৃহদাকার লিম্ফোসাইট (large lymphocytes) এবং (b) ক্ষুদ্রাকার লিম্ফোসাইট (small lymphocytes)। কিছু সংখ্যক লিম্ফোসাইট অস্থি মজ্জায় উৎপন্ন হয়। বাকীরা লিম্ফনোড, থাইমাস ও প্লীহা থেকে উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিম্ফোসাইট লসিকানালীর মাধ্যমে রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। হিসাব করে দেখা গেছে মানুষে প্রতিদিন 3.5×10^{10} লিম্ফোসাইট বক্ষনালীর (thoracic duct) মধ্য দিয়ে রক্তে প্রবেশ করে।

(a) **বৃহদাকার লিম্ফোসাইট:** এই কোষগুলোর আকৃতি বৃহদাকার (12μ ব্যাসসম্পন্ন)। সাইটোপ্লাজম দানাবিহীন এবং ক্ষারাসক্ত (basophilic)। রাইবোসোমে অত্যধিক RNA-এর উপস্থিতির জন্য প্রান্তদেশ অত্যধিক ক্ষারকাসক্ত হয়। রাইবোসোম বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান থাকে। নিউক্লিয়াস গোলাকার অথবা বৃক্কাকৃতি। তুলনামূলকভাবে সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ বেশী। নিউক্লিয়াসের চতুঃপার্শ্বস্থ এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ইহা বিস্তৃত থাকে। নিউক্লিয়াস দেখতে বেগনী-নীল বা ফেকাশে লাল হয়।

(b) **ক্ষুদ্রাকার লিম্ফোসাইট:** লোহিতকণিকার চেয়ে এই কোষগুলো আকৃতিতে খানিকটা বড়। প্রায় 7·5μ ব্যাসসম্পন্ন। বৃহদাকার নিউক্লিয়াসটি সাইটোপ্লাজমের প্রায় গোটা অঞ্চল জুড়েই অবস্থান করে। সাইটোপ্লাজম ক্ষারাসক্ত ও দানাহীন। শৈশবাবস্থায় এরা সংখ্যায় 50 শতাংশ থাকে। বছর দশেক বয়সে এই সংখ্যা কমে গিয়ে 35 শতাংশে এসে দাঁড়ায়।

(v) **মনোসাইট** (Monocytes)**:** এই কোষগুলো 16 থেকে 18μ ব্যাসবিশিষ্ট হয়। প্রথমাবস্থায় নিউক্লিয়াস গোলাকার থাকে। পরে তা বৃক্কাকৃতি বা অশ্ব-খুরাকৃতিতে পরিবর্তিত হয়। নিউক্লিয়াস গোলাকার হলে বৃহদাকার লিম্ফোসাইট থেকে এদের আলাদা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তবে এদের নিউক্লিয়াস কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে, কিন্তু বৃহদাকার লিম্ফোসাইটের নিউক্লিয়াস কোষঝিল্লির ধার ঘেঁষে থাকে। দ্বিতীয়ত, বৃহদাকার লিম্ফোসাইটের সাইটোপ্লাজম স্বচ্ছ কাচের মত দেখতে। অপরপক্ষে, মনোসাইটের সাইটোপ্লাজম বুদবুদযুক্ত (frosted)। নিউট্রোফিলের মত মনোসাইড সক্রিয়ভাবে আগ্রাসী। এদের মধ্যেও পেরোক্সিডেজ ও লাইসোজোমীয় এনজাইমের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অস্থিমজ্জা থেকে এরা রক্তসংবহনে প্রবেশ করে, কিন্তু 24 ঘণ্টার পরই তারা কলাকোষে tissue) প্রবেশ করে এবং **টিস্যু ম্যাক্রোফেজে** (tissue macrophages) পরিণত হয়। যকৃতের কুফ্‌ফার কোষ ও ফুসফুসের ম্যাক্রোফেজসমেত সবরকম টিস্যু ম্যাক্রোফেজ রক্তসংবহনের মনোসাইট থেকে আসে।

2. **শ্বেতকণিকার শতকরা হিসাব** (Differential count of W.B.C.) : আঙুলের অগ্রভাগকে সূচিবিদ্ধ করে খানিকটা রক্তকে একটা পরিষ্কার স্লাইডে নেওয়া হয় এবং সংগে সংগে রক্তের একটা পাতলা প্রলেপ বা ফিল্ম তৈরী করা হয়। রক্তের এই ফিল্মকে শুকিয়ে তাতে বর্ণপ্রয়োগ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে স্থাপন করা হয়। প্রতিটি শ্বেতকণিকার বৈশিষ্ট্য দেখে এবং স্লাইড-খানাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ঘুরিয়ে প্রত্যেক প্রকারের শ্বেতকণিকার সংখ্যা গণনা করা হয়। এরপর তাদের শতকরা হিসাব নির্ণয় করা হয়। সাধারণ-ভাবে শ্বেতকণিকার শতকরা হিসাব 5নং তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

5নং তালিকা : শ্বেতকণিকার শতকরা হিসাব।

নাম	**শতকরা হিসাব**	**প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে তাদের মোট সংখ্যা**
নিউট্রোফিল	60—70	3,000—6,000
ইওসিনোফিল	1—4	150—400
বেসোফিল	0—1	0—100
লিম্ফোসাইট	25 40	1,5000—2,700
মনোসাইট	5—10	350 –800

3. **আরনেথ ও সিলিং সূচক** (Arneth and Schilling index) : এই দুটো সূচকই নিউট্রোফিল শ্বেতকণিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিউট্রোফিলের নিউক্লিয়াসের লোবসংখ্যা তাদের বয়সের সংগে সমানুপাতিক। তরুণতম

9-27নং চিত্র : আরনেথ ও সিলিং সূচক।

নিউট্রোফিলের নিউক্লিয়াস তাই একক নিউক্লিয়াস, অপরপক্ষে সবচেয়ে বয়স্ক নিউট্রোফিলের লোবসংখ্যা সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ 5 বা তারও বেশী। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে **আরনেথ** 1904 সালে নিউট্রোফিলকে 5টি ভাগে বা গ্রুপে বিভক্ত করেন। 100টি নিউট্রোফিলের মধ্যে এক, দুই, তিন, চার ও

পাঁচটি (বা তারও বেশী) লোবসম্পন্ন নিউট্রোফিলের সংখ্যা কত তা গণনা করা হয় এবং পাঁচটি পৃথক গ্রুপে তাদের ভাগ করা হয়। প্রতিটি গ্রুপের নিউট্রোফিলের সংখ্যাকে শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন : গ্রুপ I (একক নিউক্লিয়াসযুক্ত) : 5%, গ্রুপ II (দুটো লোবযুক্ত নিউক্লিয়াস) : 25—30%, গ্রুপ III (তিনটি লোবযুক্ত নিউক্লিয়াস) : 45—47, গ্রুপ IV (চারটি লোবযুক্ত নিউক্লিয়াস) : 18% গ্রুপ V (পাঁচটি বা তার বেশী লোব) : 2%। নিউক্লিয়াসে তিনটি লোবযুক্ত নিউট্রোফিলেব সংখ্যা রক্তে সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। এরা সবচেয়ে পরিণত এবং সবচেয়ে সক্রিয় কোষ। যদি I ও II গ্রুপেব নিউট্রোফিলের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে বামাভিমুখী পরিবর্তন (shift to left) বলা হয়। সাধারণত দেহে সংক্রমণ হলে এজাতীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অস্থিমজ্জা উদ্দীপিত হবার ফলে অপরিণত নিউট্রোফিলের সংখ্যা রক্তসংবহনে বৃদ্ধি পায়। IV ও V গ্রুপের নিউট্রোফিলের সংখ্যাবৃদ্ধিকে দক্ষিণাভিমুখী পরিবর্তন (shift to right) বলা হয়। নিউট্রোফিল এক্ষেত্রে অধিকতর বৃদ্ধ, নিষ্ক্রিয় এবং চলচ্ছক্তিহীন হয়। অস্থিমজ্জা থেকে এদের উৎপাদন হ্রাস পেলে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়াতে এ জাতীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

সিলিং সূচক নিউট্রোফিলের এক ধরনের সরলতম শ্রেণীবিন্যাস। রক্ত-সংবহনে 100টি শ্বেতকণিকার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের অপরিণত ও পরিণত নিউট্রোফিলেব সংখ্যা কত, সিলিং সূচক তারই পরিচায়ক। একে চারভাগে বিভক্ত করা হয় : (a) **মায়েলোসাইট** (একক নিউক্লিয়াসযুক্ত) : 0% (b) **জুবেনাইল মেটামায়েলোসাইট** (সর্খাজ নিউক্লিয়াসযুক্ত) : 0—1%, (c) **স্টাফসেল** (T, V বা U আকৃতির নিউক্লিয়াসসম্পন্ন) : 3—5% এবং (d) **পরিণত নিউট্রোফিল** (দুই, তিন, চার ও পাঁচটি লোবযুক্ত নিউক্লিয়াসসম্পন্ন) : 55—70%। কোন কোন সময়ে অত্যধিক চাহিদা বৃদ্ধিতে মায়েলোসাইট এবং জুবেনাইল নিউট্রোফিল অস্থিমজ্জা থেকে রক্তসংবহনে প্রবেশ করে। সিলিং (Schilling) একে পুনরুৎপাদনশীল পরিবর্তন (regenerative change) নামে অভিহিত করেছেন। তেমনি তাঁর মতে অস্থিমজ্জার সক্রিয়তা হ্রাস পেলে নিউট্রোফিল পরিণত হতে পারে না। একে অপজননশীল পরিবর্তন (degenerative change) বলা চলে।

4. **শ্বেতকণিকার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি** (Origin and development of leucocytes) : রক্তকণিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। প্লুরিপোটেন্ট অ নকমিটেট স্টেম সেল (pluripotent uncommitted stem cell) থেকে যে সব লাইন প্রোজেনিটর সেল বা কমিটেড স্টেম সেল (committed stem cell) উৎপন্ন হয়, প্রধানত তারাই বিভিন্নপ্রকার রক্তকণিকার উৎপাদনের জন্য দায়ী। শ্বেতকণিকার উৎপাদনের জন্য যেসব লাইন প্রোজেনিটর সেল দায়ী তারা হল : (A) **মায়েলোব্লাস্ট** (myeloblast), (B) **লিম্ফোব্লাস্ট** (lymphoblast) এবং (C) **মনোব্লাস্ট** (monoblast)। প্রথমটি থেকে দানাদার শ্বেতকণিকা, দ্বিতীয়টি থেকে লিম্ফোসাইট এবং তৃতীয়টি থেকে মনোসাইট উৎপন্ন হয়। দানাদার শ্বেতকণিকা সম্পূর্ণভাবে লোহিত মজ্জার লাইন প্রোজেনিটর সেল থেকে উৎপন্ন হয়। অপরপক্ষে লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট অস্থিমজ্জা ছাড়াও বিশেষভাবে থাইমাস, প্লীহা ও লসিকাগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়।

মায়েলোব্লাস্টের বহুবিভাজন ও রূপান্তর থেকে তিন ধরনের প্রমায়েলোসাইট কোষ উৎপন্ন হয়। এই তিন ধরনের প্রমায়েলোসাইট তিনপ্রকার দানাদার শ্বেতকণিকা উৎপন্ন করে। শ্বেতকণিকার বৃদ্ধির পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ :

A. **দানাদার শ্বেতকণিকার বৃদ্ধির পর্যায়ক্রম :** দানাদার শ্বেতকণিকার বৃদ্ধির পর্যায়ক্রমে যে সব কোষের আবির্ভাব ঘটে, তারা নিম্নরূপ (9-28নং চিত্র) :

(1) **মায়েলোব্লাস্ট :** দেখা গেছে এদের ব্যাস 12-18μ। সাইটোপ্লাজম অদানাদার। প্রান্তদেশ নীল। নিউক্লিয়াস ধূসর বা নীলবেগনী, গোল এবং বৃহদাকৃতির। নিউক্লিয়াসে সূক্ষ্ম ক্রোমাটিনকণা এবং অনেকগুলো নিউক্লিওলাস দেখা যায়। এদের সাইটোপ্লাজমে বিশেষ ধরনের অন্তঃকোষজালক দেখা যায়। সাইটোপ্লাজমে সক্রিয়ভাবে প্রোটিন সংশ্লেষণ সংঘটিত হয়।

(2) **প্রমায়েলোসাইট :** বৃহদাকৃতি (12—18μ) এবং কোষগুলোর নিউক্লিয়াস গোলাকার। নিউক্লিয়াসে স্থূল ক্রোমাটিন পদার্থ থাকে এবং নিউক্লিওলাসসমূহ তেমন সুস্পষ্ট নয়। সাইটোপ্লাজম অত্যধিক ক্ষারকাসক্ত এবং অ্যাজুরোফিলিক গ্রানুয়েল বা কণাযুক্ত। কণাগুলো গলজিবডির সিসটারনা থেকে উৎপন্ন হয়। স্বাভাবিক অস্থিমজ্জায় এদের সংখ্যা প্রায় 4% (1%—8%)। এদের বহুবিভাজন ও রূপান্তর থেকে পরবর্তী পর্যায়ের কোষগুলো উৎপন্ন হয়। এদের সাইটোপ্লাজমে যে সূক্ষ্ম দানার আবির্ভাব ঘটে তাদের বর্ণাসক্তির উপর

চিত্র : শ্বেতকণিকার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির পর্যায়ক্রম।

নির্ভর করে তাদের **নিউট্রোফিলিক, ইওসিনোফিলিক ও বেসোফিলিক প্রমায়েলোসাইট** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।

(3) **মায়েলোসাইট :** অস্থিমজ্জায় এদের সংখ্যা প্রায় 12% (5—20%) এদের ব্যাস 15—16μ। এদের সাইটোপ্লাজম তুলনামূলকভাবে বেশী এবং কম ক্ষারকাসক্ত। নিউক্লিয়াসগুলো অধিকতর ক্ষুদ্র এবং অধিক ক্ষারকাসক্ত। দানাগুলো আরও সুস্পষ্ট ও বর্ণাসক্ত হয়। বর্ণাসক্তির উপর নির্ভর করে এদেরও একইভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (a) **নিউট্রোফিলিক মায়েলোসাইট,** (b) **ইওসিনোফিলিক মায়েলোসাইট** এবং (c) **বেসোফিলিক মায়েলোসাইট।**

(4) **মেটামায়েলোসাইট :** অস্থিমজ্জায় এদের সংখ্যা মজ্জাকোষের 20%। এদের ব্যাস 11—13μ। এই পর্যায়ের কোষগুলোর মধ্যে কতকগুলো বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত কোষবিভাজন বন্ধ হয়, দ্বিতীয়ত গাঢ় নিউক্লিয়াস খাঁজযুক্ত (indented) বা বৃক্কাকৃতি হয় এবং তৃতীয়ত তাদের মধ্যে অ্যামিবাগতির আবির্ভাব হয়। কিছুসংখ্যক কোষ এই অ্যামিবাগতির জন্য প্রান্তীয় রক্তসংবহনে নির্গত হয়। এরাও একইভাবে তিন ধরনের হয়।

(5) **পরিণত শ্বেতকণিকা :** মেটামায়েলোসাইটের রূপান্তর থেকে দানাদার শ্বেতকণিকা উৎপন্ন হয়। প্রধানত মজ্জার অভ্যন্তরেই এরা পরিণত হয় এবং নিউক্লিয়াসের লোবসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবে পরিণত নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল ও বেসোফিল রক্তসংবহনে প্রবেশ করে।

B. **লিম্ফোসাইটের বৃদ্ধির পর্যায়ক্রম :** অস্থিমজ্জা ও লসিকাপিণ্ড (lymph node) থেকে লিম্ফোসাইট উৎপন্ন হয়। প্রোজেনিটর কোষকে **লিম্ফোব্লাস্ট** বলা হয়। কোষের ব্যাস প্রায় 15—20μ। কোষের নিউক্লিয়াস গোলাকার এবং স্থূল নিউক্লিওলাসযুক্ত। সাইটোপ্লাজম দানাহীন। লিম্ফোব্লাস্টের বহুবিভাজন ও রূপান্তর থেকে প্রথমে বৃহদাকার **লিম্ফোসাইট,** এরপর **মধ্যমাকৃতি লিম্ফোসাইট** এবং পরিশেষে **ক্ষুদ্রাকার লিম্ফোসাইট** উৎপন্ন হয়। এই পরিণত কোষগুলো এরপর লসিকানালীর মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহনে প্রবেশ করে।

C. **মনোসাইটের বৃদ্ধির পর্যায়ক্রম :** মনোসাইটের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। কারও কারও মতে ইহা সরাসরি হিমোসাইটোব্লাস্ট থেকে উৎপন্ন হয়। অন্যদের মতে প্লুরিপোটেন্ট সেল হিমোসাইটোব্লাস্ট থেকে বহুবিভাজন ও রূপান্তরের মাধ্যমে যে লাইন প্রোজেনিটর সেল মনোব্লাস্ট উৎপন্ন হয় তার রূপান্তর থেকেই প্রমনোসাইট ও মনোসাইট উৎপন্ন হয়। অন্যদের মতো ইহা হিস্টিওসাইট থেকে উৎপন্ন হয়। অস্থিমজ্জা ছাড়াও ইহা প্লীহায় (spleen) উৎপন্ন হয়।

5. **শ্বেতকণিকার পরিণতি** (Fate of WBC) **:** সবরকম শ্বেতকণিকাই বিনষ্ট, বিশ্লিষ্ট, ও অদৃশ্য হয়। নিউট্রোফিল ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল শ্বেতকণিকা রক্তসংবহনেই বিনষ্ট হয়। R-E কোষ এই বিনাশসাধনে অংশগ্রহণ

করে। অপরপক্ষে অধিকাংশ লিম্ফোসাইট বোরই অন্ত্র ও শ্লেষ্মাঝিল্লির মধ্যে নির্গত ও বিনষ্ট হয়। মনোসাইট টিস্যু ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয়।

6. **শ্বেতকণিকার কার্যাবলী** (Functions of WBC) : শ্বেতকণিকার কার্যাবলী প্রধানত দেহের প্রতিরক্ষার সংগে জড়িত। তাদের কার্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(1) **অ্যান্টিবডি উৎপাদন :** লিম্ফোসাইট γ-গ্লোবিউলিন উৎপাদন করে ও দেহের প্রতিরক্ষার কার্যে সহায়তা করে, বিশেষত ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের বিরুদ্ধে।

(2 **আগ্রাসন** (Phagocytosis) : ইওসিনোফিল অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি জটিলকে গ্রাস করে। নিউট্রোফিল ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ কালে ব্যাকটেরিয়াকে খুঁজে বের করে। আগ্রাসন পদ্ধতিতে তাদের গিলে ফেলে এবং কোষদানাস্থিত এনজাইমের সাহায্যে মেরে ফেলে। নিউট্রোফিল তাই ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরক্ষার প্রথম সারিতে অবস্থান করে। মনোসাইটও সংক্রমণ স্থানে প্রবেশ করে ব্যাকটেরিয়া, অন্যান্য বিজাতীয়পদার্থ ও মৃত কোষগুলোকে গ্রাস করে হজম করে ফেলে। নিউট্রোফিলকে অনুসরণ করে মনোসাইট সংক্রমণ-স্থানে প্রবেশ করে এবং প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তর বা সারি গঠন করে যা সবিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। নিউট্রোফিল যে পদ্ধতিতে রক্তজালিকার মধ্য দিয়ে কলাস্থান বা সংক্রমণস্থানে বেরিয়ে আসে তাকে **ডায়াপেডেসিস** (diapedesis) বলা হয়। নিউট্রোফিল এই পদ্ধতিতে পৌষ্টিকনালীতেও বেরিয়ে আসে এবং বিনষ্ট হয়।

দানাদার শ্বেতকণিকার সাইটোপ্লাজমীয় দানায় **মায়েলোপেরোক্সিডেজ** (myeloperoxidase) নামক এনজাইম থাকে। এই এনজাইমের আণবিক ওজন প্রায় 150,000 এবং এটি ClO^- ও অন্যান্য হাইপোহেলাইট (hypohalite) আয়ন উৎপাদনে অনুঘটকের কাজ করে যা গিলেফেলা ব্যাকটেরিয়াকে বিনাশ করতে সাহায্য করে।

দেহ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে নিউট্রোফিল উৎপাদনে অস্থিমজ্জা উদ্দীপিত হয়। ব্যাকটেরিয়ানিঃসৃত পদার্থ প্লাজমা উপাদানের (ফাক্টর XII) সংগে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্যালিকরেইন (Kallekrein) ও প্লাজমিনোজেন (plasminogen নামক যে দুটি রাসায়নিক পদার্থ (chemotactic agent) উৎপন্ন করে তাদের আকর্ষণে নিউট্রোফিল সংক্রমণস্থানে প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়াকে কেমোটেক্সিস (chemotaxis) বা রাসায়নগতি বলা হয়। এছাড়া **ওপসোনিন** (opsonins) নামক যে সব প্লাজমা উপাদান (যেমন, IgG ও পরিপূরক প্রোটিন) ব্যাকটেরিয়াকে আবৃত করে তার আকর্ষণেও নিউট্রোফিল এদের সক্রিয়ভাবে আগ্রাসন করে। ফ্যাগোসাইটিক ভেসিকল (phagocytc vesicles) বা গ্রাসথলি নিউট্রোফিলের দানার সংগে একীভূত হয়। শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে ডিগ্রেনুলেশন (degranulation) বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার সংগে কোষের O_2-গ্রহণ ও বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি পায়; একই সংগে পেনটোজ ফসফেট পথের সক্রিয়তা, হাইড্রোজেন পেরোক্সিডেজ (H_2O_2) ও পেরোক্সাইড রেডিক্যাল (O_2^-) উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শেষোক্ত পদার্থ দুটো সম্ভবত দানাস্থিত

লাইটিক এনজাইমের (lytic enzyme) সংগে সংযুক্ত হয়ে ব্যকটেরিয়াকে বিনষ্ট করে ও হজম করে ফেলে।

(3) **টিউমার কোষের বিনাস** (Killing of tumor cells)**:** লিম্ফোসাইটের দ্বারা সংবেদী টিউমার কোষকে মনোসাইট বিনষ্ট করতে পারে।

(4) **ফাইব্রোব্লাস্ট উৎপাদন** (Fibroblast formation)**:** লিম্ফোসাইট দেহের প্রদাহ অঞ্চলে (inflammation area) জড়ো হয় এবং ফাইব্রোব্লাস্ট কোষে রূপান্তরিত হয়। এভাবে এরা দেহের মেরামতির কার্যে সহায়তা করে।

(5) **হেপারিন-ক্ষরণ** (.:eparin secretion)**:** বেসোফিল শ্বেতকণিকা হেপারিন ক্ষরণ করে এবং এভাবে রক্তনালীর অভ্যন্তরের রক্তকে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

(6) **এলার্জি'বিরোধী ক্রিয়া** (Anti-allergy function)**:** বেসোফিল ও কিছুটা ইওসিনোফিল শ্বেতকণিকায় হিস্টামিনের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। এই পদার্থ এলার্জি (alergy) বিরোধী কার্যে সহায়তা করে।

(7) **ট্রেফন** (Trephones)**:** শ্বেতকণিকা (মনোসাইট) প্লাজমাপ্রোটিন থেকে ট্রেফন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে। এই পদার্থটি কলা-কোষের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও সংস্কারের কার্যে সহযোগিতা করে।

রক্তের অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট
BLOOD PLATELETS OR THROMBOCYTES

মেগাকারীওসাইট (megakaryoc; tes) থেকে রক্তের অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়। অণুচক্রিকা নিউক্লিয়াসবিহীন, গোলাকার, ডিম্বাকার বা রড আকৃতির বর্ণহীন উভতল চাকতিবিশেষ (9-29 নং চিত্র)। এদের গড় আকৃতি 2·5μ। তবে বিভিন্ন আকৃতির অণুচক্রিকার সন্ধান অনায়াসলব্ধ। 4 থেকে 5μ ব্যাসসম্পন্ন অণুচক্রিকার অস্তিত্বও নির্ধারিত হয়েছে। লিশম্যান বর্ণে এদের সাইটোপ্লাজম ফেকাশে নীল এবং সাইটোপ্লাজমীয় দানা রক্তবেগনি দেখায়। সাইটোপ্লাজমে সংকোচী ভ্যাকুওল এবং পিনোসাইটিক ভ্যাকুওল দেখা যায়। সাইটোপ্লাজমে 50-100টি গাঢ় দানা দেখা যায়। কোষঝিল্লি 60 Å পুরু। এছাড়া গল্‌জিবডি, মাইটোকনড্রিয়া, ক্ষুদ্র মাইক্রোভ্যাকুওল, টিউবুল, অন্তঃকোষজালক প্রভৃতির সমাবেশ দেখা যায়। অণুচক্রিকার পরিমাণ প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে প্রায় 0·45 মিলিলিটার। এদের গড় জীবনকাল 3 দিন।
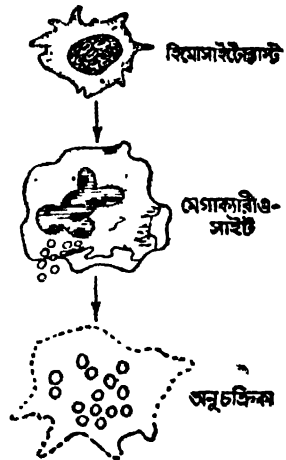
9-29 নং চিত্রঃ অণুচক্রিকার উৎস

প্লীহা ও অন্যান্য R-E কোষের দ্বারা এরা বিনষ্ট হয়। অণুচক্রিকার মধ্যে প্রোটিন ও প্রচুর পরিমাণে ফসফোলিপিড (যার অধিকাংশই কেপালিন) থাকে।

প্রতি ঘনমিলিমিটারে প্রায় 250,000 থেকে 500,000 সংখ্যক অণুচক্রিকা থাকে। যেসব কারণে শ্বেতকণিকার সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে, সেসব কারণে অণুচক্রিকারও পরিবর্তন ঘটে।

অণুচক্রিকার কার্যাবলী (Functions of platelets) : (1) অণুচক্রিকা রক্তের তঞ্চনপ্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। রক্তক্ষরণের সময় অণুচক্রিকা বিনষ্ট হয়ে থ্রম্বোপ্লাসটিন (thromboplastin) নামক পদার্থ মুক্ত করে। এই পদার্থ প্রোথ্রম্বিনের (prothrombin) সংগে যুক্ত হয়ে থ্রম্বিনে (thrombin) রূপান্তরিত হয়। (2) মেরামতি : অণুচক্রিকা রক্তজালিকার ক্ষতিগ্রস্ত অন্তর-আবরণী পর্দার গায়ে এঁটে গিয়ে মেরামতির কার্যকে দ্রুততর করে। (3) এণ্টিজেনজাতীয় পদার্থ (antigen like substance) : অণুচক্রিকায় সামান্য পরিমাণে এণ্টিজেনজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির দরুন নির্দিষ্ট অ্যাণ্টিসিরামের সংস্পর্শে তারা জমাট বাঁধে। (4) সংকোচনধর্মী পদার্থ (constrictor substances) : বিনষ্ট অণুচক্রিকা থেকে হিস্টামিন এবং 5-হাইড্রোক্সিট্রিপ্-টামিনজাতীয় পদার্থ মুক্ত হয়। এরা রক্তনালীর সংকোচন ঘটায় এবং রক্তের স্থিতিশীল প্রক্রিয়ায় (hemostatic mechanism) সহায়তা করে। (5) রক্ত-পিণ্ডের সংহরণ (clot retraction) : রক্তপিণ্ডের সংহরণের দ্রুততা অণু-চক্রিকার সংখ্যার সংগে সমানুপাতিক।

লোহিতকণিকা ও শ্বেতকণিকার সামগ্রিক গণনা
(TOTAL COUNT OF R. B. C. AND W. B. C.)

1. **লোহিতকণিকার গণনা** (Counting of R. B. C.) : লোহিতকণিকার গণনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি নিম্নরূপ :

(a) **প্রয়োজনীয় দ্রব্য** (Requirements) : লোহিতকণিকার সংখ্যা গণনায় যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয় তার মধ্যে প্রধান : (a) হিমোসাইটোমিটার যন্ত্র (hemocytometer), একটি অংশাংকিত পিপেট ও একটি বিশেষ কাঁচের স্লাইড বা গণনাকক্ষ (counting chamber), (b) লোহিতকণিকাকে লঘুকারী একটি দ্রবণ (diluting fluid), (c) একটি কভারস্লিপ (cover slip) এবং (d) একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

(b) **লঘুকারী দ্রবণ** (Diluting fluid) : লোহিতকণিকার জন্য ব্যবহৃত লঘুকারী দ্রবণের উপাদান সাধারণত নিম্নরূপ :

সোডিয়াম ক্লোরাইড	...	0·6 গ্রাম
সোডিয়াম সাইট্রেট	...	1·0 গ্রাম
ফরমালিন (formalin)	...	1·0 গ্রাম
পাতিত জল	...	100 মিলিলিটার পর্যন্ত

(c) **অংশাংকিত পিপেট** (Graduated pipette) **:** এই পিপেটকে লোহিতকণিকা-পিপেটও (R. B. C. pipette) বলা হয়। এর তিনটি অংশাংকন (graduation) রয়েছে। 0·5 এবং 1 এই অংশাংকন দুটো বালবের (bulb) নিচে এবং 101 অংশাংকনটি বালবের ওপরে অবস্থিত (9-30 নং চিত্র। এই বালবটিকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যার ফলে রক্তকে পিপেটের 1 দাগ অবধি টেনে লঘুকারী দ্রবণের দ্বারা 101 দাগ অবধি পরিপূর্ণ করলে তা 100
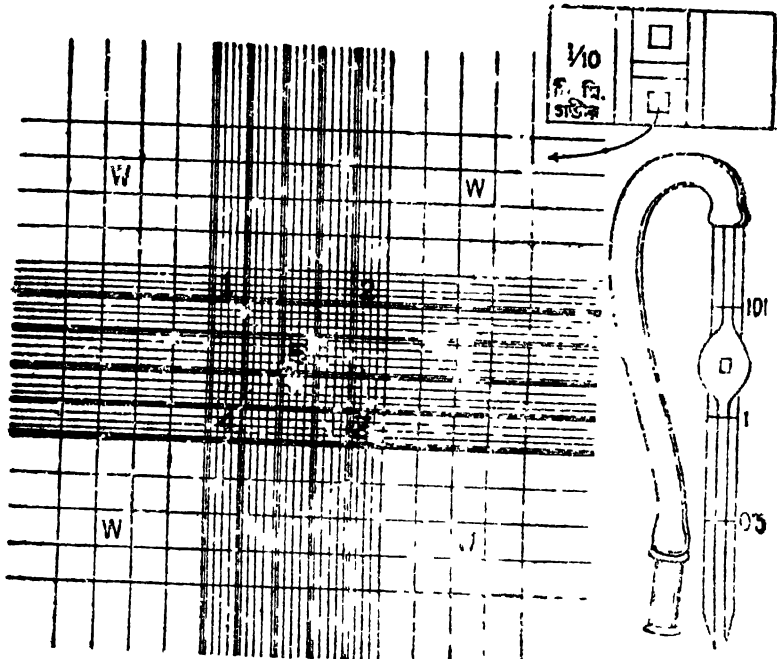
9-30নং চিত্র : গণনাকক্ষ ও লোহিতকণিকাপিপেট।

গুণ এবং 0 5 অংশাংকন অবধি টেনে 0·1 অংশাংকন অবধি পরিপূর্ণ করলে তা 200 গুণ লঘু হয়।

(d) **গণনা কক্ষ** (Counting chamber) **:** গণনাকক্ষের কার্যকরী অঞ্চলটি 9 বর্গমিলিমিটার ক্ষেত্রফলসম্পন্ন। কেন্দ্রস্থ বর্গমিলিমিটারকে 25টি বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতি বর্গক্ষেত্রে ত্রৈরেখ লাইন দ্বারা পৃথকীকৃত। 25টির প্রতিটি বর্গক্ষেত্র পুনরায় 16টি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত। ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক ধারের দৈর্ঘ্য $\frac{1}{20}$ মিলিমিটার।

(e) **গণনা পদ্ধতি** (Method of counting) **:** অংশাংকিত পিপেটে লঘুকৃত এক ফোটা রক্তকে গণনাকক্ষে ঢেলে তার ওপর একটি কভার-স্লিপ চাপা দেওয়া হয়। কভার-স্লিপ $\frac{1}{10}$ মিলিমিটার পুরু। গণনা-কক্ষকে এর পর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিম্নে প্রতিস্থাপন করে 25টি বর্গক্ষেত্রের 5টির (9-30 নং চিত্র) লোহিতকণিকার মোট সংখ্যা গণনা করা হয়। প্রতিটি লোহিতকণিকা

যাতে দুবার গণনা করা না হয়,তার জন্য প্রতিটি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রের ঊর্ধ্ব ও বাম পাশের লাইনের উপরিস্থিত লোহিতকণিকাকে শুধুমাত্র গণনা করা হয়ে থাকে।

(f) **হিসাব** (Calculation) :

প্রতিটি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রের আয়তন = $\frac{1}{20} \times \frac{1}{20} \times \frac{1}{10}$ বা $\frac{1}{4000}$ ঘনমিলিমিটার।

প্রতি ঘনমিলিলিটার রক্তে লোহিতকণিকার সংখ্যা

$$= \frac{\text{গণনাকৃত লোহিতকণিকার মোট সংখ্যা} \times \text{তরলীকরণ} \times 4000}{\text{গণনাকৃত ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা } (5 \times 16)}$$

2. **শ্বেতকণিকার গণনা** (Counting of W B. C.) : প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি নিম্নরূপ :

(a) **শ্বেতকণিকারলঘুকারী দ্রবণ** (Diluting fluid of W. B. C) শ্বেতকণিকার জন্য ব্যবহৃত লঘুকারী দ্রবণের উপাদান নিম্নরূপ :

গ্লাসিয়েল অ্যাসিটিক অ্যাসিড··· ··· 1 5 মিলিলিটাব
(glacial acetic acid)

জলে জেনটিয়ান বেগনি বর্ণের দ্রবণ ··· 1 0 মিলিলিটার
(gentian violet)

পাতিত জল ··· ··· 97·5 মিলিলিটার

গ্লাসিয়েল অ্যাসিটিক অ্যাসিড লোহিতকণিকাকে বিশ্লিষ্ট (hemolysed) করে এবং জেনটিয়ান বেগনিবর্ণ শ্বেতকণিকার নিউক্লিয়াসকে মৃদুভাবে রঞ্জিত করে। ফলে শ্বেতকণিকাকে সহজে চেনা সম্ভবপর হয়।

(b) **শ্বেতকণিকা-পিপেট** (W. B C. Pipette) : শ্বেতকণিকা-পিপেট লোহিতকণিকা-পিপেটের মতই নির্মিত হয়। বাল্বের নিচের অংশাংকন দুটো ঠিকই থাকে, তবে বাল্বের উপরের 101 অংশাংকনেব স্থানে 11 অংশাংকন থাকে। এক্ষেত্রে রক্তকে 10 বা 20 গুণ তরলীকরণ (dilution) সম্ভবপর।

(c) **গণনা পদ্ধতি** (Method of counting) : গণনাকক্ষের 1 বর্গমিলিমিটার ক্ষেত্রসম্পন্ন 4টি কৌণিক ও 1টি কেন্দ্রস্থ, মোট এই 5টি ক্ষেত্রের শ্বেতকণিকার সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। একই ভাবে হিমোসাইটোমিটারেব অপর পার্শ্বস্থ 2টি বর্গক্ষেত্রের শ্বেতকণিকার সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। সর্বমোট এই 10 বর্গমিলিমিটার ক্ষেত্রের শ্বেতকণিকাব মোট সংখ্যা থেকে শ্বেতকণিকার প্রয়োজনীয় হিসাব করা হয়। লাইন স্পর্শকারী শ্বেতকণিকাকে গণনার মধ্যে ধরা হয় না।

হিসাব (Calculation)

গণনাকৃত প্রতি বর্গক্ষেত্রের আয়তন = $1 \times 1 \times \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$ ঘনমিলিমিটার

প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা

$$= \frac{\text{গণনাকৃত শ্বেতকণিকার মোট সংখ্যা} \times \text{তরলীকরণ} \times 10}{\text{গণনাকৃত 1 বর্গমিলিমিটার ক্ষেত্রের সংখ্যা}}$$

অনুশীলনী

1. রক্তের উপাদান সম্বন্ধে যা জান লিখ। প্লাজমাপ্রোটিনের কার্যাবলীর আলোচনা কর। (C.U. 79, 84)

2. প্লাজমা ও লসিকা বলতে কি বোঝ? মানুষের প্লাজমার পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ করবে? (C.U. 78)

3. মানুষের রক্তের পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করা যায় লিখ। সুস্থ দেহে রক্তের পরিমাণ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? (C.U. 68, 70, 73)

4. রক্তের স্বাভাবিক পরিমাণ কত? কিভাবে ইহা নিয়ন্ত্রিত হয়? রক্তপরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর। (C.U.H. '72, 75)

5. মানুষের রক্তপরিমাণ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
যদি একজন মানুষের হিমাটক্রিট অনুপাত 45/55 এবং রঞ্জন পদ্ধতিতে নির্ণীত প্লাজমা পরিমাণ 2750 মিলিলিটার হয়, তবে তার লোহিতকণিকার পরিমাণ এবং রক্তের পরিমাণ কত হবে নির্ণয় কর। (C.U. 75)

6. ক্ষরণের পর কেন রক্ত তঞ্চিত হয়, অথচ রক্তনালীর ভেতর তঞ্চিত হয় না—আলোচনা কর। (রক্ততঞ্চনের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর, '73) প্লাজমা ও সিরাম উভয়েই কি তঞ্চিত হয়? অক্সালেটযুক্ত রক্ত থেকে কিভাবে তুমি প্লাজমা ও সিরামের নমুনা প্রস্তুত করবে? (C.U. '75, 81)

7. রক্তের তঞ্চন পদ্ধতির আধুনিক ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা কর। তঞ্চনের ত্রুটিসংজাত বিভিন্ন রোগের বর্ণনা দাও। (C.U. '65, 67, '71 C.U.H. '76)

8. a) থ্রমবোপ্লাসটিন উৎপাদনে প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টরগুলির নাম লিখ।
   (b) রক্ততঞ্চন পদ্ধতির আলোচনা কর। (C.U. '85)

9. প্লাজমাপ্রোটিন কাকে বলে? দেহে তাদের উৎপত্তি, পরিণতি ও কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। (C.U. '64, '66, '68, '74, C.U.H. '75, '77)

10. প্লাজমাপ্রোটিনের শ্রেণীবিন্যাস কর এবং তাদের রাসায়নিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর। রক্তে প্লাজমাপ্রোটিনের পরিমাণ কিরূপ?

11 রক্তের শ্রেণীবিন্যাসের উপর একটি রচনা লিখ। (C.U.H. '76)

12. রক্তের শ্রেণীর বিবরণ দাও। রক্তদানে এর ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C.U.H. '74, '81)

13. Rh-পদার্থ কী? তার সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বিবৃত কর। মানুষের পিতৃত্ব পরীক্ষার মাপকাঠি কী?

14 অস্থিমজ্জা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C.U. '71)

15. লোহিতকণিকার বৃদ্ধির পর্যায়ক্রম বিবৃত কর। (C.U.H. '73, '75, '83)

16. লোহিতকণিকা উৎপাদনে প্রভাব বিস্তারকারী কারণসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C.U.H. '77, '83)

17. রক্তাল্পতা কাকে বলে? রক্তাল্পতা সম্বন্ধে যা জান লিখ।

18 হিমোগ্লোবিন কী? হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করা যায়? কিছু হিমোগ্লোবিনজাত সামগ্রীর নাম কর। (C.U. '69)

19. (a) হিমোগ্লোবিনের ধর্মগুলো আলোচনা কর।
   (b) মানুষের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য সালির পদ্ধতির বর্ণনা কর।
   (c) যদি সালির পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ণয় করে দেখ যে তোমার বন্ধুর রক্তের স্বাভাবিকের 60% হিমোগ্লোবিন রয়েছে, তাহলে তার 100 মি.লি. রক্তে হিমোগ্লোবিনের প্রকৃত পরিমাণ কত হবে? (C.U. '86)

20. হিমোগ্লোবিন কাকে বলে? হিমোগ্লোবিনজাত পদার্থ কোনগুলি? হিমোগ্লোবিনের কার্যাবলী ও পরিণতির বর্ণনা দাও। (C.U.H. '76)

21. হিমোগ্লোবিনের জৈব সংশ্লেষণ, পরিণতি ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। ভ্রূণজ হিমোগ্লোবিন ও বয়স্ক হিমোগ্লোবিনের পার্থক্য দেখাও। (C.U. '61)

22. স্বাভাবিক রক্তে কী কী ধরনের শ্বেতকণিকা দেখতে পাওয়া যায়? সংক্ষেপে তাদের উৎপত্তি ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। (C.U '63, C U H. '76)

23 শ্বেতকণিকার শ্রেণীবিন্যাস কর এবং চিত্রসহ তাদের বিস্তৃত বিবরণ দাও। শ্বেতকণিকার শতকরা হিসাব কিরূপ? আরনেথ ও সিলিংসূচক কাকে বলে? শ্বেতকণিকার কার্যাবলীর বর্ণনা দাও।

24. লোহিতকণিকার আকার, আকৃতি ও সংখ্যার উল্লেখ কর। লোহিতকণিকার বৃদ্ধির পর্যায়ের বর্ণনা দাও। (C U. '83)

25 আপেক্ষিক আকৃতি অনুসারে মানুষের একটি লোহিতকণিকা, চার লতিসম্পন্ন একটি নিউট্রোফিল ও একটি ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইটের পরিচ্ছন্ন চিত্র অংকন কর এবং লিম্ফোসাইটের কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। হিমোগ্লোবিনজাত কিছু যৌগ ও লব্ধপদার্থের নাম কর। সালির পদ্ধতিতে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে যদি দেখ যে তা স্বাভাবিকের 70%, তবে প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে হিমোগ্লোবিনের প্রকৃত পরিমাণ কত। (C.I '77)

26 অণুচক্রিকা সম্বন্ধে যা জান লিখ।

27 টীকা লিখ:

(a) তঞ্চনরোধক পদার্থ, (b) Rh পদার্থ, (C.U. '74), (c) পলিসাইথেমিয়া, (d) হিমোলাইসিস (74), (e) ফেরিটিন (C U 64), (f) হিমোগ্লোবিন (C.U '62), (g) হিম, (h) রক্তাল্পতা (C U. '65) (i) হিমোসাইটোমিটার, (j) তঞ্চনকাল (C.U. '70), (k) শ্বেতকণিকা (C.U. '70), (l) ব্লাডগ্রুপ (C U '75), (m) থ্রম্বোসাইট (C.U.H '74), (n) আরনেথ সূচক (C.U H. '7.), (o) প্লাজমাফেরেসিস (C U H. 73), (p) ভ্রূণজ হিমগ্লোবিন (C.U. '73), (q) থ্রম্বোসাইট (77), (r) কোন শ্রেণীর রক্ত থাকলে কোন ব্যক্তিকে সার্বজনীন দাতা বলা হয় এবং কেন? (s) লোহিতকণিকার থিতানের হার (C U H. '81) (t) ক্রিস্টমাস ফ্যাক্টর (C U. '84)।

28. নিম্নলিখিতগুলির উত্তর দাও: (C.U. '81)

(a) রক্ততঞ্চনকাল ও রক্তমোক্ষণকালের স্বাভাবিক মান কত?

(b) তঞ্চনের জন্য প্রয়োজনীয় এমন উপাদানগুলোর উল্লেখ কর যাদের অভাবে হিমোফিলিয়া রোগ দেখা দেয়।

(c) জোঁকের কামড়ে কেন রক্ততঞ্চন মন্দীভূত হয়?

(d) হিমারেজ ও হিমোলাইসিসের পার্থক্য কি?

(e) AB গ্রুপের রক্তসম্পন্ন ব্যক্তিকে সর্বজনীন গ্রহীতা বলা হয় কেন? (C U. 86)

(f) 'প্যাকড সেল ভলিউম' কাকে বলে? এর নির্ধারণের কারণ কি?

(g) রক্তের প্লাজমা অপেক্ষা লোহিতকণিকার ভেতরে কার্বনিক অ্যাসিড বেশী তৈরী হয় কেন? C.U. '86)

দশ

দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

DEFENCE MECHANISM OF THE BODY
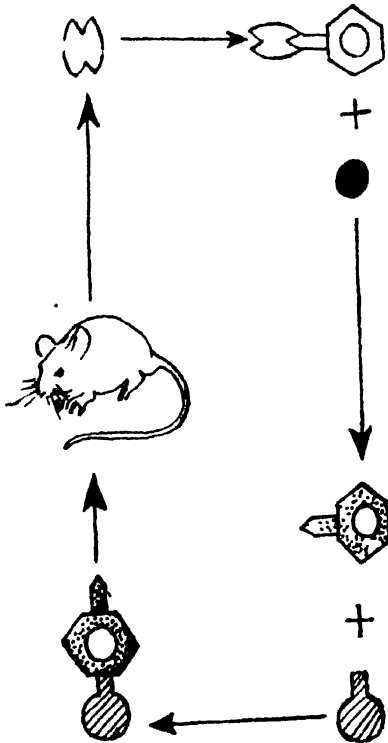
পরিবেশের সংগে মানুষকে মানিয়ে চলতে হয়। পরিবেশীয় নানাপ্রকার আণুবীক্ষণিক জীব এবং পদার্থ মানুষের দেহে নানাভাবে প্রবেশ করে এবং মানুষেব স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে কখন কখনও বিপর্যস্ত করে তুলে বা তুলার চেষ্টা করে। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, তাদের প্রতিবিষ এবং নানাপ্রকার বিজাতীয় প্রোটিন এর উদাহরণ। এদের বিরুদ্ধে মানুষের দেহ যেসব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে তাকে **অনাক্রম্যতা** (immunity) বলা হয়। এই অনাক্রমণ ব্যবস্থা এতই প্রবল যে দেখা যায় কোন প্রাণীর একটি অংগ বা কলাকে অন্য প্রাণীতে জুড়ে দিলে (transplanted) শেষোক্ত প্রাণীর অনাক্রমণ ব্যবস্থা তাকে নষ্ট করে দেয়

বা বাতিল করে দেয। শেষোক্ত প্রাণীর কাছে অন্য প্রাণীর এই অংগ বা কলা বিজাতীয় হিসাবে গণ্য হয (শুধু সদৃশ জমজ তার ব্যতিক্রম), ফলে তা আক্রান্ত ও বিনষ্ট হয়। কোন কোন পরিস্থিতিতে অনাক্রম্যতার আনুষংগিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে এলার্জি দেখা দেয। দেহের কিছু সংখ্যক আগ্রাসী কোষ (আব. ই. তন্ত্র), লসিকা গ্রন্থি, প্লীহা প্রভৃতি কলাকোষ দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংগ হিসাবে কাজ করে এবং পরিবেশীয় অদৃশ্য জগতের আক্রমণের বিরুদ্ধে দেহকে সুরক্ষা করে।

অনাক্রম্যতা
IMMUNITY

দেহের অনাক্রম্য ব্যবস্থাকে দুভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়: (1) **সহজাত অনাক্রম্যতা** (innate immunity) এবং **অর্জিত অনাক্রম্যতা** (acquired immu-

1নং তালিকা

বৈশিষ্ট্য	অনাক্রম্যতা				
	সহজাত অনাক্রম্যতা	অর্জিত অনাক্রম্যতা			
		কোষাভিত্তিক	রসনির্ভর	ইনটারফেরনজাত	নিষ্ক্রিয়
1. কী ধরনের	সাধারণ, জন্মগত	নির্দিষ্ট, সক্রিয ভাবে অর্জিত	নির্দিষ্ট, সক্রিয়-ভাবে অর্জিত	ভাইরাসজনিত, সক্রিয়ভাবে অর্জিত	অন্য প্রাণী বা মানুষ থেকে প্রাপ্ত।
2. কোন রোগের বা জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে	আমাশয়, কিছু ভাইরাসগত পংগু রোগ, প্লেগ ইত্যাদি	ধীরে উৎপন্ন ব্যাকটেরিয়া জাত রোগ যক্ষা, ব্রুসেলোসিস ক্যান্সার কোষ, রোপিত অংগের কোষ, টিউমার কোষ, ছত্রাক জাতীয় জীবাণু ইত্যাদি	ব্যাকটেরিয়া-জাত পুরানো রোগ, বসন্ত হুপিং কাশি, মামপস, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি	ভাইরাসজনিত চোখের অসুখ, হেপাটাইটিস, বুকের অসুখ, ফুসফুস ও স্তনের ক্যান্সার, ম্যালিগন্যান্সি ইত্যাদি	

বৈশিষ্ট্য	অনাক্রম্যতা				
	সহজাত অনাক্রম্যতা	অর্জিত অনাক্রম্যতা			
		কোষভিত্তিক	রসনির্ভর	ইনটারফেরন জাত	নিষ্ক্রিয়
3. হাতিয়ার	আর ন. কোষ, অ্যাসিড, ত্বক সাধারণ অ্যান্টিবডি, লাইসোজাইম, বেসিক পাল-পেপটাইড, প্রপার্ডিন ইত্যাদি	সংবেদনশীল T লিম্ফোসাইট ও নিঃসৃত লিম্ফোকাইন	নির্দিষ্ট B-লিম্ফোসাইট ও নিঃসৃত অ্যান্টিবডি	ইনটারফেরন ও অ্যান্টি-ভাইরাস প্রো (AVP	অন্য প্রাণী থেকে প্রাপ্ত অ্যান্টিবডি বা সংবেদনশীলকোষ
4. ক্রিয়া পদ্ধতি	আগ্রাসন, অ্যাসিডের দ্বারা বিনাশ-সাধন, ত্বকের দ্বার। বাধা সৃষ্টি, অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া, বিশ্লিষ্ট-করণ, প্রশমন ইত্যাদি	সাইটোটক্সিক ও লিম্ফোকাই-নের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে এবং সাধারণ লিম্ফোসাইট ও ম্যাক্রোফেজকে সক্রিয়করণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে	প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিপূরক সংস্থাকে ও এনাফাইলেসিস সংস্থাকে সক্রিয় করণের মাধ্যমে	AVP এর দ্বারা ভাইরাসের প্রোটিন সংশ্লেষণ ও নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরীতে বাধাদান কোষ বিভাজন বন্ধ	প্রত্যক্ষ আক্রমণ

nity)। অর্জিত অনাক্রম্যতা আবার সক্রিয় (active) বা নিষ্ক্রিয় হতে পারে। এর মধ্যে সক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, কারণ এটি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রতিবিষ এবং অন্য প্রাণীর বিজাতীয় কলাকোষের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম। অর্জিত অনাক্রম্যতাকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ a) কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা (cellular immunity), (b) রসনির্ভর অনাক্রম্যতা (humoral immunity) এবং (c) ইনটারফেরন অনাক্রম্যতা (interferon immunity)। অনাক্রম্যতার এই শ্রেণীবিন্যাস ও তাদের বিশেষত্ব 1নং তালিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

সহজাত অনাক্রম্যতা

Innate Immunity

সহজাত অনাক্রম্যতা জন্মগত। বিশেষ কোন রোগ বা জীবাণুর বিরুদ্ধে এটি নির্দিষ্ট নয়। ইহা দেহের সাধারণ ও স্থায়ী প্রতিরোধব্যবস্থার অংগ যা জন্ম থেকেই রোগ বা জীবাণুর বিরুদ্ধে সাধারণভাবে কার্যকরী। সহজাত অনাক্রম্যতা অংশত বা সম্পূর্ণভাবে আমাশয়, কিছু ভাইরাসগত পক্ষাঘাত, কলেরা (শূকর), প্ল্যাগ (গরু , বদমেজাজ, কুকুরের ভাইরাসগত রোগ ইত্যাদিকে বাধা দিতে সক্ষম। অপরপক্ষে পোলিও, মামপস, মানুষের কলেরা রোগ, হাম, সিফিলিস প্রভৃতিকে প্রাণী স্বাভাবিকভাবে রোধ করতে পারে। সহজাত অনাক্রম্যতা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে।

1. **আগ্রাসন** (Phagocytosis) : R. E. তন্ত্রের স্থির ও চলমান আগ্রাসক-কোষ, রক্তের মনোসাইট, সংযোগরক্ষাকারী কলার হিস্টোসাইট, প্লীহা, লসিকাগ্রন্থি ও থাইমাস গ্রন্থির জালককোষ (reticulum cells) প্রভৃতি সক্রিয় আগ্রাসন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে জীবাণু বা বিজাতীয় প্রোটিনকে গ্রাস করে এবং কোষস্থ এনজাইমের সাহায্যে পরিপাক করে ফেলে। এছাড়া দেহের ক্ষত অংগের কলাকোষের উদ্দীপনা থেকে প্রদাহ-প্রতিক্রিয়ার (স্থানীয় রক্তজালিকার প্রসারণ, রক্তপ্রবাহের মন্থর গতি, শোথ প্রভৃতি) সৃষ্টি হয়। এর ফলে আগ্রাসক কোষ প্রদাহস্থানে প্রবেশ করে এবং স্বাভাবিক অনাক্রম্যতায় অংশগ্রহণ করে।

2. **অ্যাসিড ও এনজাইম** (Acid and enzymes) : পাকস্থলীতে গলাধঃকৃত জীবাণু পাকস্থলীর অ্যাসিড ও পাচক এনজাইমের দ্বারা বিনষ্ট হয়।

3. **যান্ত্রিক বাধা ও তলীয় ক্ষরণ** (Mechanical barrier and surface secretions) : ত্বক ও শ্লেষ্মাঝিল্লি রোগজীবাণুকে প্রতিরোধ করে। ত্বক তার কঠিন বহিঃস্তরের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক বাধাদানকারী হিসাবে কার্য করে। শ্বাসনালীর শ্লেষ্মাঝিল্লি ও কেশসদৃশ সিলিয়াম (cilia) সম্মিলিতভাবে ক্রিয়া করে এবং বিজাতীয় প্রোটিন বা জীবাণুকে লালার মধ্যে ঠেলে দেয়, ফলে তারা গলাধঃকরণের মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌঁছয় ও বিনষ্ট হয়।

4. **রক্তস্থিত রাসায়নিকপদার্থ** (Chemical compound of blood) : রক্তের কিছু রাসায়নিক পদার্থ জীবাণু বা প্রতিবিষের সংগে যুক্ত হয় এবং তাদের বিনষ্ট করে। এসব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে : প্রধান (a)

লাইসোজাইম (Lysozyme) : এটি একটি পলিস্যাকারাইড জাতীয় পদার্থ যা ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ও বিনষ্ট করে ; (b) **যৌগিক পলিপেপটাইড** (basic polypeptide) : এই পদার্থটি কোন কোন গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার সংগে বিক্রিয়া করে ও তাকে বিনষ্ট করে ; (c) **প্রপারডিন** (properdin) : এটি একটি বৃহদাকারের প্রোটিন যা প্রত্যক্ষভাবে গ্রাম নিগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার সংগে বিক্রিয়া করে এবং তাদের বিনষ্ট করে ; এবং (d) **অ্যান্টিবডি** (antibody) : এরা রক্তের স্বাভাবিক অ্যান্টিবডি ; কোন অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি বা উদ্দীপনা ব্যতিরেকেই এরা দেহে উৎপন্ন হয় এবং কোন কোন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, বা প্রতিবিষকে বিনষ্ট করার ক্ষমতা রাখে।

অর্জিত অনাক্রম্যতার প্রধান দুটি শ্রেণীর উৎপত্তি

(Origin of Two Basic Types of Acquired Immunity)

দুধরনের লিম্ফোসাইট প্রধানত কোষভিত্তিক ও রসনির্ভর অনাক্রম্যতার জন্য দায়ী। আকৃতিগতভাবে তারা একই ধরনের। কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতার
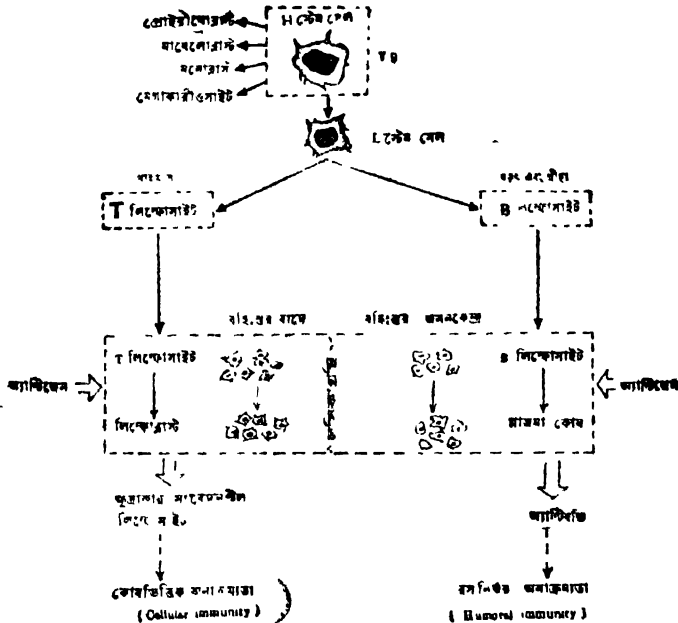
10-2নং চিত্র : T ও B লিম্ফোসাইটের উৎপত্তি এবং কোষভিত্তিক ও রসনির্ভর অনাক্রম্যতার সম্পর্ক। yS-কুসুম থলি, H স্টেম কোষ –রক্তকোষ উৎপাদনকারী কোষ ; L স্টেম কোষ –লিম্ফোসাইট উৎপাদক কোষ।

জন্য T-লিম্ফোসাইট দায়ী। অপরপক্ষে রসনির্ভর অনাক্রম্যতার জন্য B-লিম্ফোসাইট দায়ী। লিম্ফোসাইটের পূর্বসূরীরা (Precursors) কুসুমথলীতে (yolk sac) উৎপন্ন হয় এবং ভ্রূণদেহে সঞ্চালিত হয়। এদের মধ্যে যে সব কোষ ভ্রূণের থাইমাসে প্রবেশ করে ও বেড়ে ওঠে তাদের T-লিম্ফোসাইট নামে অভিহিত করা হয়। যেসব কোষ পাখীর ফেব্রিসিয়াসের বারসা (bursa of Fabricius), স্তন্যপায়ীর ভ্রূণের যকৃৎ ও প্লীহাতে প্রবেশ করে ও বেড়ে ওঠে তাদেব B-লিম্ফোসাইট বলা হয়। বারসা পাখীর পায়ুর নিকটবর্তী একটি লসিকাপিণ্ড বিশেষ। স্তন্যপায়ীতে এর কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। থাইমাস, যকৃৎ ও প্লীহাতে অবস্থানের পর এই দুধবনের লিম্ফোসাইট লসিকাগ্রন্থি (lymph node) এবং অস্থিমজ্জায় ছড়িয়ে পড়ে। T ও B লিম্ফোসাইট একই রকম দেখতে হলেও বিশেষ কলাকৌশলেব দ্বারা তাদের সনাক্ত করা যায়। এদের আরও বিশেষত্ব হল এরা লসিকা কলায় আলাদা আলাদা স্থানে বসতি স্থাপন করে। যেমন, লসিকাগ্রন্থিব বহিঃস্তর ও জননকেন্দ্রে (cortical and germinal areas) B-লিম্ফোসাইট বসতি স্থাপন করে, অপরপক্ষে T-লিম্ফোসাইট বহিঃস্তরের বাইরে অবস্থান কবে। দুধবনেব লিম্ফোসাইট সমগ্র জীবনব্যাপী দেহে থাকে। T-লিম্ফোসাইটেব পূর্ণতা-প্রাপ্তিতে থাইমাসের থাইমোসিন (thymosin) সক্রিয ভূমিকা পালন করে। থাইমাসে অন্য কিছু পলিপেপটাইডও পাওয়া গেছে যারা T-লিম্ফোসাইটেব সক্রিয়তায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

10-2 নং চিত্রে দুধরনের লিম্ফোসাইটের উৎপত্তি, উপনিবেশ স্থাপন ও অ্যান্টিবডি ও সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট উৎপাদনের সম্পর্ক দেখান হয়েছে।

এক এক ধরনেব অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে এক এক জাতীয় লিম্ফোসাইট তৈরী হয়। এরা নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের প্রতিই শুধু সংবেদনশীল হয় বা তাব বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি তৈবী করে। এদের তাই **শ্রেণী লিম্ফোসাইট** (clone of lymphocyte) বলা হয। প্রতিটি শ্রেণী লিম্ফোসাইটের কোষই একই রকম দেখতে হয় এবং সম্ভবত একটি বা মাত্র কয়েকটি লিম্ফোসাইট থেকেই তারা উৎপন্ন হয়।

কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা
Cellular Immunity

কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা T-লিম্ফোসাইটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে T-লিম্ফোসাইট যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট তার থেকে উৎপন্ন হয় এবং লসিকায় প্রবেশ করে। এসব সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট লসিকা থেকে এরপর রক্তসংবহনে প্রবেশ করে এবং কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। রক্তসংবহন থেকে এরপর বেরিয়ে এসে তারা দেহের সমগ্র কোষে ছড়িয়ে পড়ে।

এ ছাড়া এ জাতীয় উদ্দীপনা থেকে লসিকাকোষে নির্দিষ্ট ধরনের T-লিম্ফোসাইটেরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। ফলে একই জাতীয় অ্যান্টিজেন দেহে পুনরায় প্রবেশ করলে কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

1. **যেসব জীবাণুর বিরুদ্ধে এই অনাক্রম্যতা কাজ করে:** যে সব ব্যাক্‌টেরিয়া ধীরে ধীরে রোগের প্রকাশ ঘটায় (যেমন, যক্ষ্মা, ব্রুসেলোসিস ইত্যাদি) তাদের বিরুদ্ধে কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ ছাড়া ইহা ক্যান্সার কোষ, অন্য প্রাণীর জুড়ে দেওয়া অংগের কোষ, ছত্রাকজাতীয় জীবাণু, টিউমার কোষ প্রভৃতির বিরুদ্ধেও কাজ করে। এ সব কোষ ব্যাক্‌টেরিয়ার চেয়েও অনেক অনেক গুণ বড়। এ ছাড়া কিছুসংখ্যক ভাইরাসের বিরুদ্ধেও ইহা খুবই সক্রিয়।

2. **স্থায়িত্ব:** সংবেদনশীল লিম্ফোসাইটের জীবনকাল খুবই দীর্ঘ। নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে না এলে তারা দীর্ঘকাল দেহের মধ্যে বেঁচে থাকে। প্রমাণ পাওয়া গেছে তারা দশ বছর বা তারও বেশীদিন বেঁচে থাকতে পারে—তার মানে কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতার স্থায়িত্ব তুলনামূলকভাবে খুবই বেশী, বিশেষত রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা থেকে। শেষোক্ত অনাক্রম্যতার স্থায়িত্ব কয়েক বছর মাত্র।

3. **সংবেদনশীল লিম্ফোসাইটের ক্রিয়াপদ্ধতি:** সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট ব্যাক্‌টেরিয়া, ভাইরাস, ক্যান্সার কোষ, অন্য প্রাণীর রোপিত অংগের কোষ টিউমার কোষ প্রভৃতি কোষের অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে আসে এবং সংযুক্ত হয়। এই সংযুক্তির ফলে পর্যায়ক্রমিক যে বিক্রিয়া সংঘটিত হয় তারই ফলে সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট অনুপ্রবিষ্ট কোষকে বিনষ্ট করতে পারে। লিম্ফোসাইট দুভাবে অনুপ্রবেশকারীকে ধ্বংশ করে থাকে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে।

(a) **প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে বিনাশ :** সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট অনুপ্রবিষ্ট কোষের কোষঝিল্লির অ্যান্টিজেনের সংগে কিভাবে সংযুক্ত হয় তা 10-3 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। সংযুক্তির সংগে সংগে সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট ফেঁপে ওঠে এবং সাইটোটক্সিক পদার্থ (cytotoxic subtstance) **লিম্ফোকাইন** (lymphokine) মুক্ত করে যা অনুপ্রবেশকারী কোষকে আক্রমণ করে। এই পদার্থটি সম্ভবত লাইসোমজাতীয় এনজাইম বা লিম্ফোসাইটের মধ্যেই সংশ্লেষিত হয়।

(b) **পরোক্ষ পদ্ধতিতে বিনাশ :** সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট যখন নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের সংগে যুক্ত হয়, তখন তারা পাশাপাশি কলাকোষে নানা-প্রকার পদার্থ নিঃসৃত করে এবং এর ফলে যে পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় তা অনুপ্রবেশকারী কোষকে ধ্বংস করার অধিকতর শক্তিশালী প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করে।

প্রথমত, সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট থেকে নিঃসৃত একটি পলিপেপটাইড (যার আণবিক ওজন 10,000-এর কম) কলাতে ছড়িয়ে থাকা সংবেদনশীল
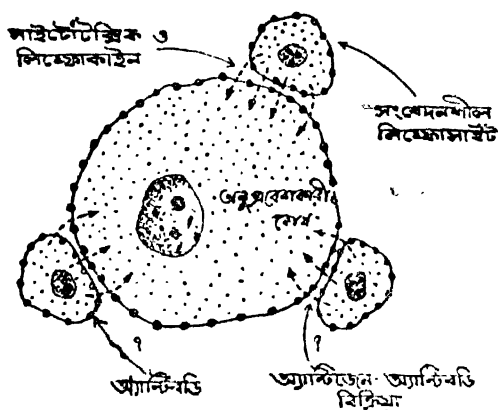
10-3 নং চিত্র : দেহে অনুপ্রবেশকারী কোষকে সংবেদনশীল লিম্ফোসাইটের প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে বিনাশসাধন।

নয় এমন লিম্ফোসাইটের ওপর ক্রিয়া করে এবং তাদের মধ্যে এমন সব পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে তারা নির্দিষ্ট সংবেদনশীল লিম্ফোসাইটের বৈশিষ্ট্য লাভ করে। অর্থাৎ তারাও নির্দিষ্ট সংবেদনশীল লিম্ফোসাইটের মত সমভাবে অ্যান্টিজেনের সংগে বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। লিম্ফোসাইট নিঃসৃত পলিপেপ্-

টাইডটিকে **ট্রান্সফার ফ্যাক্টর** (transfer factor) নামে অভিহিত করা হয়। এ ভাবে সংবেদনশীল লিম্ফোসাইটের সক্রিয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট **ম্যাক্রফেজ কেমোটেক্সিক ফ্যাক্টর** (macrophage chemotaxic factor) নামে আর একটি পদার্থের নিঃসরণ ঘটায় যা কমপক্ষে 1000টি ম্যাক্রফেজকে* আকর্ষণ করে সংবেদনশীল লিম্ফোসাইটের পাশাপাশি নিয়ে আসে। **মাইগ্রেশন ইনহিবিশন ফ্যাক্টর** (migration inhibition factor) নামে আর একটি নিঃসৃত উপাদান এরপর এই 1000টি ম্যাক্রফেজের গতিকে থামিয়ে দেয়। চতুর্থ আর একটি পদার্থ এসব কোষের আগ্রাসনক্রিয়া (phagocytic activity) বাড়িয়ে দেয়। এ ভাবে ম্যাক্রফেজ কোষ বিজাতীয় অ্যান্টিজেনের বিনাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রসনির্ভর অনাক্রম্যতা
Humoral Immuniiy

B-লিম্ফোসাইট রসনির্ভর অনাক্রম্যতার জন্য দায়ী। B-লিম্ফোসাইটের উপরিতলে বিশেষ বিশেষ অ্যান্টিজেনের জন্য গ্রাহকস্থান (receptors) লক্ষ্য করা যায়। অ্যান্টিজেন যখন কোষের গ্রাহকস্থানে যুক্ত হয় তখনই লিম্ফোসাইট আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং লিম্ফোব্লাস্টের আকৃতি ধারণ করে। তাদের কিছু-সংখ্যক কোষ প্লাজমাব্লাস্টে পরিণত হয় এবং এদের থেকে **প্লাজমাকোষের** আবির্ভাব ঘটে। প্লাজমাব্লাস্টের সাইটোপ্লাজম সম্প্রসারিত হয় এবং তাদের অন্তঃকোষ জালকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এরপর এই কোষগুলো প্রতি দশ ঘণ্টা অন্তর বিভাজিত হয় এবং এই বিভাজন প্রায় ন'বার সংঘটিত হয়। এভাবে মাত্র একটি প্লাজমাব্লাস্ট কোষ থেকে চার দিনে প্রায় 500টি প্লাজমা কোষ উৎপন্ন হয়। পরিণত প্লাজমা কোষ এরপর দ্রুত **অ্যান্টিবডি** উৎপন্ন করতে থাকে—সেকেন্ডে প্রায় 2000টি অণু হিসাবে। এসব অ্যান্টিবডি লসিকার মাধ্যমে রক্তে প্রবেশ করে এবং দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

যেসব লিম্ফোব্লাস্ট প্লাজমা কোষ উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে না, তারা একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অসংখ্য নূতন B-লিম্ফোসাইট উৎপাদনে ব্রতী হয়। এভাবে B-লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরবর্তীকালে একই ধরনের অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডির উৎপাদন দ্রুততর হয় এবং অ্যান্টিবডির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ অনাক্রম্যতা আরও জোরদার হয়।

* **ম্যাক্রফেজ :** মনোসাইট, হিস্টোসাইট এবং প্লীহা, লসিকাগ্রন্থি ও থাইমাসের **জালককোষ** (reticulum cells) প্রভৃতি।

প্রথম অ্যান্টিজেন প্রবেশের পর দেহে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা যেমন দেরীতে আসে তেমনি কয়েক সপ্তাহ ক্ষণস্থায়ী হয়; তাছাড়া প্রতিক্রিয়ার
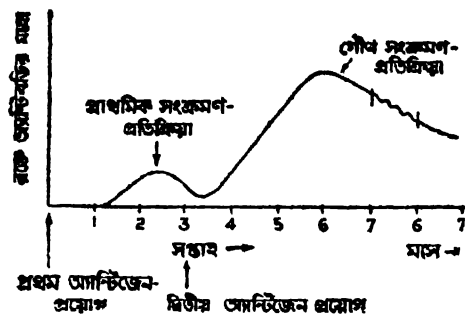
10-4 নং চিত্র : অ্যান্টিজেনকে প্রথম ও দ্বিতীয় বার দেহে প্রবেশ করালে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার বিশেষত্ব।

তীব্রতাও তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়। একে **প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া** (primary response) বলা হয়। নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন দ্বিতীয়বার দেহে প্রবেশ না করলে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া দ্রুত বিলুপ্ত হয়। তবে দেহে পুনরায় অ্যান্টিজেন প্রবেশ করালে দ্রুত **গৌণ প্রতিক্রিয়া** (secondary response) দেখা দেয় যার স্থায়িত্ব কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (10-4নং চিত্র)।

1. **অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি** (Antigen and Antibody) :

(a) **অ্যান্টিজেন :** বিজাতীয় জীবাণু বা প্রতিবিষ (toxin) দেহে প্রথমে প্রবেশ না করলে অর্জিত অনাক্রম্যতা আসে না। প্রতিটি প্রতিবিষ এবং প্রতিটি জীবাণুতে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ থাকে যারা অর্জিত অনাক্রম্যতা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে এরা প্রোটিন, বৃহদাকার পলিস্যাকারাইড বা বৃহদাকার লাইপোপ্রোটিন যৌগ। এসব রাসায়নিক পদার্থ **অ্যান্টিজেন** নামে পরিচিত।

ব্যাক্টেরিয়া যেসব প্রতিবিষ নিঃসৃত করে তারাও প্রোটিন, বৃহদাকারের পলিস্যাকারাইড বা মিউকোপলিস্যাকারাইড পদার্থ; এরা অত্যধিক অ্যান্টিজেনধর্মী। এছাড়া ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাসের দেহে বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিজেনধর্মী রাসায়নিক যৌগ বর্তমান। এভাবে অন্য প্রাণীর রোপিত কলায়, যেমন হৃৎপিণ্ডে অসংখ্য অ্যান্টিজেন থাকে যারা দেহে অনাক্রমণক্রিয়া

(immune process) শুরু করায় এবং বিনষ্ট হয়। লোহিতকণিকার আগ্লুটিনোজেন অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে।

কোন একটি পদার্থকে অ্যান্টিজেনধর্মী হতে হলে তার আণবিক ওজন অবশ্যই 8000 বা তারও বেশী হতে হবে। তাছাড়া অ্যান্টিজেনক্রিয়া সম্ভবত বৃহদাকারের অণুগুলির উপরিতলীয় নিয়মিত উৎপন্ন প্রস্থেটিক রেডিকেলের উপর নির্ভরশীল।

হেপ্টেন (haptens) **:** নানা প্রকার ওষুধ, ধুলোবালির রাসায়নিক উপাদান, নানাপ্রকার শিল্পজাত রাসায়নিক পদার্থ, ত্বকের শুক্নো আঁশের অপজাত পদার্থ, প্রাণীর খুস্কীজাত পদার্থ প্রভৃতিকে **হেপ্টেন** বলা হয়। এদের আণবিক ওজন 8000 এর নিচে, তাই এরা এককভাবে অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করতে পারে না, তবে কোন প্রোটিন বা বৃহদাকারের অণুর সংগে যুক্ত হলে অনাক্রমণ প্রতিক্রিয়া (immune response) উৎপাদন করতে পারে। অ্যান্টিবডি বা সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট এর বিরুদ্ধে উৎপন্ন হয় এবং প্রোটিন বা হেপ্টেনের সংগে বিক্রিয়া করে। পরবর্তীকালে শুধুমাত্র হেপ্টেনই এককভাবে এই প্রতিক্রিয়া শুরু করে এবং দেহে ছড়িয়ে পড়ার আগেই অ্যান্টিবডি বা সংবেদনশীল লিম্ফোসাইটের দ্বারা বিনষ্ট হয়।

(b) **অ্যান্টিবডি :** প্রতিবিষ বা জীবাণুগত অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে দেহের মধ্যে যেসব প্রোটিনের আবির্ভাব ঘটে এবং যারা জীবাণু বা তাদের থেকে নিঃসৃত প্রতিবিষকে বিনষ্ট করে তাদের **অ্যান্টিবডি** বলা হয়। সব অ্যান্টিবডিই গামা গ্লোবিউলিন। তারা **ইমিউনোগ্লোবিউলিন** নামে পরিচিত। তাদের আণবিক ওজন 150,000 থেকে 900,000-এর মধ্যে সীমিত থাকে।

প্রতিটি ইমিউনোগ্লোবিউলিনই প্রধানত চারটি পলিপেপটাইড চেনের দ্বারা গঠিত। এদের মধ্যে দুটো হাল্কা ও দুটো ভারী চেন থাকে। কোন কোন ইমিউনোগ্লোবিউলিনে চারটির বেশী পলিপেপটাইড চেনও থাকতে পারে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিটি ভারী চেনের প্রান্তে একটি হাল্কা চেন সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবং এভাবে প্রান্তদেশে অন্তত দুটো ভারী-হাল্কার জোড়া তৈরী হয় (10-5নং চিত্র)। প্রতিটি ভারী চেন ও হাল্কা চেনের দুটো অংশ থাকে : একটি অপরিবর্তিত অংশ এবং অপরটি পরিবর্তিত অংশ। পরিবর্তিত অংশ প্রতিপ্রকারের নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডির ক্ষেত্রে আলাদা হয় এবং এই অংশেই অ্যান্টিজেনের সংগে অ্যান্টিবডির সংযুক্তি ঘটে। অপরিবর্তিত অংশ অ্যান্টি

বডির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের নির্ণায়ক এবং কোষ ও কলা তথা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংগে সংযুক্তির সহায়ক। অ্যান্টিবডির প্রকৃতি দ্বিযোজী।
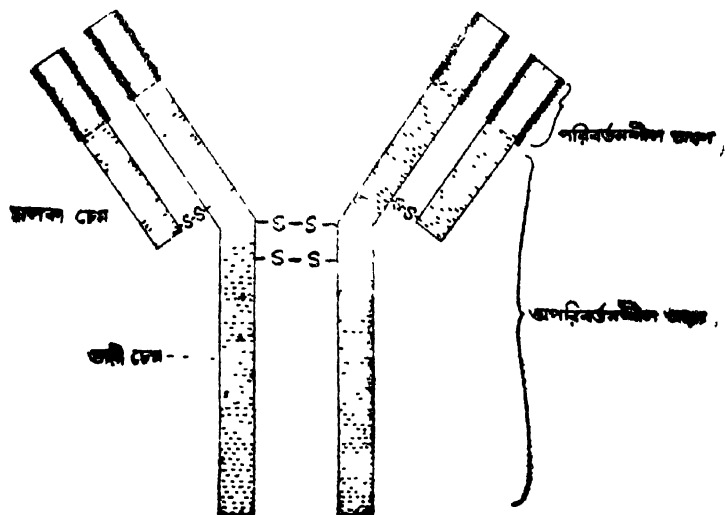
10-5নং চিত্র : একটি আদর্শ IgG অ্যান্টিবডির গঠন বিন্যাস। এটি দুটো ভারী ও দুটো হালকা চেনের সমন্বয়ে গঠিত। দুটো পরিবর্তনশীল অংশে অ্যান্টিজেন যুক্ত হয়।

অ্যান্টিবডিকে পাঁচভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় এবং IgM, IgG, IgA, IgD এবং IgE হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। Ig ইমিউনোগ্লোবিনকে বুঝায়, অন্যান্য অক্ষর শ্রেণীকে বুঝায়। এদের মধ্যে IgG ও IgE এর গুরুত্ব সর্বাধিক। স্বাভাবিক লোকের ক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের অ্যান্টিবডি প্রায় 75%, দ্বিতীয়টি খুব কম পরিমাণে থাকলেও তা এলার্জির সংগে সম্পর্কযুক্ত।

2. **যে সব জীবাণুর বিরুদ্ধে এই অনাক্রম্যতা কাজ করে :** রসনির্ভর অ্যান্টিবডি অধিকতর পুরনো ব্যাকটেরিয়াজাত রোগে অধিকতর ফলপ্রসূ। এছাড়া টাইফয়েড জ্বর, হুপিংকাশি, ডিফথেরিয়া প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়াজাত রোগের বিরুদ্ধে এবং প্রতিবিষের বিরুদ্ধেও ইহা কাজ করে। টিকা দেওয়ার মাধ্যমেও এসব রোগের বিরুদ্ধে এ জাতীয় অনাক্রম্যতা অর্জিত হয়। এছাড়া জীবন্ত জীবাণুকে বিশেষ কালচার মাধ্যমে রেখে বা বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে পাঠিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করে ইনজেকশন বা টিকার মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করান হয়। এসব জীবন্ত জীবাণু রোগ-ছড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, কিন্তু তাদের মধ্যে তখনও বিশেষ অ্যান্টিজেন থেকে যায়—ফলে তাদের

বিরুদ্ধে দেহে বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবডি তৈরী হয়। এভাবে পলিওরোগ, হাম, গুটি বসন্ত এবং অন্যান্য ভাইরাস ঘটিত রোগ প্রশমিত হয়।

3. **স্থায়িত্ব :** রসনির্ভর অনাক্রম্যতার স্থায়িত্ব তুলনামূলকভাবে কম। সাধারণত মাসকয়েক। তবে বছর কয়েকও তার স্থায়িত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। দেহে অ্যান্টিজেনের একাধিকবার প্রবেশে এজাতীয় অনাক্রম্যতার স্থায়িত্ব ও তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

4. **অ্যান্টিবডির ক্রিয়া পদ্ধতি :** অ্যান্টিবডি তিনভাবে অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে কাজ করে : (a) অনুপ্রবেশকারী জীবাণুকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করে, (b) পরিপূরক সংস্থাকে সক্রিয় করে এবং তার দ্বারা আক্রমণকারীকে বিনষ্ট করে এবং (c) অ্যানাফাইলেটিক সংস্থাকে সক্রিয় করে এবং তার সাহায্যে পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করে।

(a) **অ্যান্টিবডির প্রত্যক্ষ বিক্রিয়া** Direct action of antibody) : অনুপ্রবেশকারী জীবাণুতে বহু অ্যান্টিজেনধর্মী স্থান থাকে। অপরপক্ষে অ্যান্টিবডির প্রকৃতি দ্বিযোজী (bivalent) ; ফলে নিম্নলিখিত যে কোন একটি পদ্ধতির সাহায্যে অ্যান্টিবডি অনুপ্রবেশকারী জীবাণু বা তার প্রতিবিষকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে।
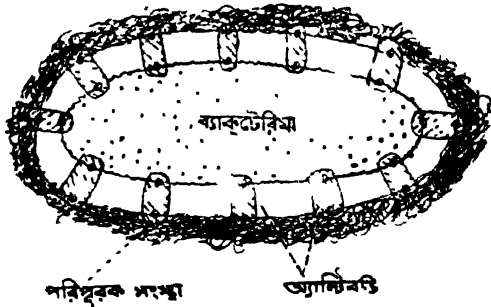
10-6 নং চিত্র : অ্যান্টিবডি বিক্রিয়ার পরিপূরক সংস্থা।

(1) **অ্যাগ্লুটিনেশন বা স্তূপীভবন :** এক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি একাধিক অ্যান্টিজেনসম্পন্ন জীবাণুর অ্যান্টিজেনের সংগে বিক্রিয়া ঘটিয়ে তাদের স্তূপীকৃত করে ফেলে।

(2) **প্রেসিপিটেশন বা অধঃক্ষেপন :** এ ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ দ্রবীভূত হয় না, ফলে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

(3) **প্রশমন :** এ ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনধর্মী জীবাণুর বিষাক্ত (toxic) স্থানকে আবৃত করে ফেলে।

(4) **বিশ্লেষণকরণ :** এ ক্ষেত্রে কিছু শক্তিশালী অ্যান্টিবডি সরাসরি জীবাণুর ঝিল্লিকে আক্রমণ করে এবং তাকে ছিন্ন করে ফেলে।

স্বাভাবিকভাবে অ্যান্টিবডি উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বংস করে, তবে এই প্রক্রিয়া তেমন জোরদার বা শক্তিশালী প্রক্রিয়া নয়। পরবর্তী প্রক্রিয়া দুটো অনাক্রম্য ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলে।

(b) **অ্যান্টিবডি-বিক্রিয়ার পরিপূরক সংস্থা :** (Complement system for antibody action) **:** পরিপূরক সংস্থানটি বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় এনজাইম নিয়ে গঠিত c_1 থেকে c_9 হিসাবে চিহ্নিত। এদের স্বাভাবিকভাবে প্লাজমা ও অন্যান্য দেহতরলে দেখা যায়। অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া থেকে যে জটিল যৌগ উৎপন্ন হয় প্রধানত তার দ্বারাই এসব নিষ্ক্রিয় এনজাইম বা এনজাইমের পূর্বসূরীরা সক্রিয়তা লাভ করে। খুব সামান্য সংখ্যক অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির যৌগ প্রথম পদক্ষেপেই বিরাটসংখ্যক নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় এনজাইমে রূপান্তরিত করে। পরবর্তী পদক্ষেপে এসব সক্রিয় এনজাইম আরো প্রচুর নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে তুলে। এসব সক্রিয় এনজাইম পরপর নানাভাবে অণুপ্রবিষ্ট জীবাণুকে আক্রমণ করে এবং তাদের বিনিষ্ট করে। নিম্নে তার উল্লেখ করা হল।

(1) **বিশ্লেষণকরণ :** পরিপূরক সংস্থার প্রোটিন-পরিপাককারী এনজাইম জীবাণুর কোষঝিল্লির অংশবিশেষকে পরিপাকের দ্বারা বিনষ্ট করে।

(2) **আগ্রাসন ও ওপসোনাইজেশন :** পরিপূরক সংস্থার এনজাইম ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য জীবাণুর উপরিতলকে আক্রমণ করে, ফলে তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তিত জীবাণুকে রক্তের নিউট্রোফিল, দেহের অন্যান্য ম্যাক্রোফেজ আগ্রাসনের মাধ্যমে বিনিষ্ট করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়া ওপসোনাইজেশন opsonization) নামে পরিচিত।

(3) **রসায়নগতি :** পরিপূরক সংস্থার এক বা একাধিক পদার্থ নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজের রসায়নগতি (chemotaxis) বৃদ্ধি করে, ফলে জীবাণুর চারিদিকে এসব কোষ অধিক সংখ্যায় জড়ো হয় ও আগ্রাসী হয়ে ওঠে।

(4) **স্তূপীভবন :** পরিপূরক এনজাইমসমূহ অ্যান্টিজেনিক এজেন্টের উপরিতলে এমনভাবে পরিবর্তন ঘটায়, ফলে তারা পরস্পর যুক্ত হয়ে স্তূপীভূত হয়।

(5) **ভাইরাসের প্রশমন ঃ** পরিপূরক এনজাইম প্রায়ই ভাইরাসের আণবিক গঠনে আক্রমণ করে এবং প্রশমনের মাধ্যমে তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে।

(6) **প্রদাহপ্রতিক্রিয়া ঃ** পরিপূরক এনজাইম অনেক সময় স্থানীয়ভাবে প্রদাহপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, ফলে প্রদাহস্থান লাল হয়ে ওঠে, ফুলে ওঠে, উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং কলাকোষের প্রোটিন তঞ্চিত হয়। এসব পরিবর্তনের ফলে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু কলাকোষের মধ্য দিয়ে এগোতে পারে না।

(c) **অ্যান্টিবডির দ্বারা অ্যানাফাইলেটিক সংস্থার সক্রিয়ভবন** (Activation of the Anaphyletic System by Antibodies) ঃ কিছু অ্যান্টিবডি, বিশেষত IgE, মাস্ট কোষ (mast cell) ও রক্তের বেসোফিলের ঝিল্লিতে আটকা পড়ে। এসব ঝিল্লিতে আটকে-পড়া কোন একটি অ্যান্টিবডির সংগে অ্যান্টি-জেনের বিক্রিয়া ঘটলে, মুহূর্তেই কোষটি ফেঁপেফুলে ওঠে ও ভেংগে যায়, ফলে তার মধ্য থেকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে নানাপ্রকার পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে এবং ...র পরির্তন ঘটায়। এই নিঃসৃত উপাদানের মধ্যে আছে ঃ

(1) **হিস্টামিন ঃ** এটি স্থানীয় রক্তনালীর প্রসারণ ঘটায় এবং রক্ত নালিকার ভেদ্যতার বৃদ্ধি ঘটায়।

(2) **মন্থর বিক্রিয়াধর্মী পদার্থ** (Slow-reacting Substance) ঃ এই পদার্থটি কোন কোন মসৃণ পেশীর দীর্ঘস্থায়ী সংকোচন ঘটায়, যেমন ক্লোমশাখার পেশী।

(3) **রসায়নগতি উৎপাদনকারী পদার্থ** (Chemotaxic factor) ঃ এই পদার্থটি নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল ও ম্যাক্রফেজের অ্যান্টিবডি-অ্যান্টিজেন বিক্রিয়াস্থানে রসায়নগতি বৃদ্ধি করে।

(4) **লাইসোজোমীয় এনজাইম ঃ** এই পদার্থ স্থানীয় প্রদাহপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

ইন্টারফেরন অনাক্রম্যতা
Interferon Immunity

ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত দেহকোষ এজাতীয় অনাক্রম্যতায় অংশগ্রহণ করে। ভাইরাস-আক্রান্ত কোষ খুব দ্রুত **ইন্টারফেরন** নামক একটি পদার্থ সংশ্লেষণ করে যা ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে দেহে যে সময় লাগে তার অনেক আগেই এই পদার্থটি দেহে উৎপন্ন হয় এবং নির্দিষ্ট

কোষ ছাড়াও দেহরসের দ্বারা সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ে। ইন্‌টারফেরন একটি গ্লাইকোপ্রোটিন বিশেষ। এর আণবিক ওজনও খুব বেশী নয় (20,000)। তিন ধরনের ইন্‌টারফেরন এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের উৎস শ্বেতকণিকা, T-লিম্ফোসাইট ও ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ। শ্বেতকণিকা থেকে **ইমিউন ইন্‌টারফেরন** নামক বিশেষ ধরনের ইন্‌টারফেরন পাওয়া যায়। উইস্‌ম্যান ও গিলবার্ট (1980) একটি নূতন পদ্ধতিতে ই. কোলাই নামক ব্যাক্‌টেরিয়াকে কাজে লাগিয়ে মানুষের ইন্‌টারফেরন প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন (কোন একটি প্রাণীর ইন্‌টারফেরন অন্য প্রাণীতে কার্যকারী নয়)।

ইন্‌টারফেরন ভাইরাসের দ্রুত বিভাজনকে বন্ধ করে। তাছাড়া এটি যে-কোন ভাইরাসকে আক্রমণ করতে পারে, ফলে তার গুরুত্ব খুব বেশী। বিশেষত ভ্যাক্‌সিন বা টিকার থেকেও। উদাহরণস্বরূপ, সর্দির জন্য দায়ী ভাইরাস মিউটেশনের (mutation) দ্বারা শতাধিক ভিন্ন রকম ভাইরাসে পরিণত হতে পারে। এদের যেকোন একটি বা দুটির বিরুদ্ধে ভ্যাক্‌সিন ব্যবহার সম্ভব, অথচ ইন্‌টারফেরন এদিক থেকে একাই একশ'।

1 **যেসব রোগের বিরুদ্ধে ইন্‌টারফেরন কাজ করে :** ইন্‌টারফেরন যেসব রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে তার মধ্যে প্রধান : ভাইরাসজনিত চোখের অসুখ, হেপাটাইটিস, বুকের অসুখ, ফুসফুস ও স্তনের ক্যান্সার, ম্যালিগনেন্‌সি ইত্যাদি।

2. **ইন্‌টারফেরনের ক্রিয়াপদ্ধতি :** ইন্‌টারফেরনের সঠিক ক্রিয়াপদ্ধতি জানা না গেলেও যেটুকু প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় ইন্‌টারফেরন ভাইরাসকে সরাসরি আক্রমণ করে না। আন্টি-ভাইরাল প্রোটিন (antiviral protein, AVP) নামক এক ধরনের প্রোটিন ইন্‌টারফেরনের উপস্থিতিতে কোষে তৈরী হয়। এই বিশেষ ধরনের প্রোটিনটিই ভাইরাসের কোষবিভাজনে বাধা দেয়। যখন কোন ভাইরাস দেহের কোষে প্রবেশ করে তখন আক্রান্ত কোষে ইন্‌টারফেরন সংশ্লেষণ বৃদ্ধি পায়। ইন্‌টারফেরন কোষের বাইরে বেরিয়ে আসে ও কোষঝিল্লির নির্দিষ্ট গ্রাহকস্থানে (receptor site) যুক্ত হয়। এই সংযুক্তির ফলে কোষঝিল্লিতে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার সংকেত কোষের নিউক্লিয়াসে পৌঁছয়। ফলে কোষনিউক্লিয়াসে একধরনের সংকেতবাহী আর. এন. এ (m RNA) তৈরী হয় যারা কোষের সাইটোপ্লাজমে বেরিয়ে এসে অ্যান্টিভাইরাস প্রোটিন তৈরী করে। সংশ্লেষিত এই প্রোটিনটি এরপর

ভাইরাসের প্রোটিন সংশ্লেষণ বা নিউক্লিক অ্যাসিড উৎপাদনে বাধাদান করে। ক্ষেত্রবিশেষে দুটো পদ্ধতিই কার্যকরী হয়। এভাবে ভাইরাসের কোষবিভাজন বন্ধ হয় ও বংশবিস্তার রোধ হয়। একটি ইন্টারফেরন অণু একাধিক কোষের গ্রাহকস্থানে সংযুক্ত হতে পারে।

নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা
Passive Immunity

দেহে অ্যান্টিজেনের প্রবেশ ব্যতিরেকেই প্রাণীতে যে সাময়িক অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠে তাকে **নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা** বলা হয়। এধরনের অনাক্রম্যতা অন্য প্রাণী থেকে প্রাপ্ত। এর বৈশিষ্ট্য হল অন্য কোন প্রাণীতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন প্রবেশ করিয়ে তাকে সক্রিয়ভাবে অনাক্রম্য করে তুলা হয়। এরপর সেই প্রাণীতে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি বা সংবেদনশীল লিম্ফোসাইটকে সংগ্রহ করে মানুষে প্রবেশ করানো হয়। এভাবে প্রবিষ্ট অ্যান্টিবডি মানুষের দেহে দুই থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে এবং নির্দিষ্ট রোগজীবাণুকে প্রতিহত করে। সংবেদনশীল লিম্ফোসাইটকে এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে প্রবেশ করালে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত মানুসের দেহে তা থেকে যায়. কিন্তু কোন প্রাণী থেকে মানুষে প্রবেশ করালে কয়েকদিন মাত্র স্থায়ী হয়।

এলার্জি
Allergy

কোন কোন পরিস্থিতিতে অনাক্রম্যতার আনুষংগিক প্রতিক্রিয়া (side effect) হিসাবে এলার্জি দেখা দেয়। এলার্জিকে তিনভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। এর মধ্যে দু ধরনের এলার্জি যেকোন মানুষে দেখা যায়। তৃতীয়টি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট এলার্জিপ্রবণ লোকেই দেখা যায়। যে দু ধরনের এলার্জি সব মানুষেই দেখা দিতে পারে তারা হল : (1) **দীর্ঘবিক্রিয়াজাত** এলার্জি এবং (2) অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়াজাত এলার্জি। তৃতীয়টিকে এলার্জেন-রিয়াজিন এলার্জি নামে অভিহিত করা যায়।

1. **দীর্ঘবিক্রিয়াজাত এলার্জি** (Delayed-Reaction Allergy) : এ জাতীয় এলার্জিতে ত্বকে প্রায়ই ফুসকুড়ি বেরোয়। কোন কোন ওষুধ, রাসায়নিক পদার্থ, কোন কোন অংগরাগ (cosmetics), গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি ত্বকের সংস্পর্শে এলে এজাতীয় এলার্জি দেখা দেয়। আইভিপয়জনের (ivy-poison) দ্বারাও এধরনের এলার্জির প্রকাশ ঘটে।

সংবেদনশীল লিম্ফোসাইটের দ্বারা এধরনের এলার্জি উৎপন্ন হয়। অ্যান্টি-বডির সংগে এজাতীয় এলার্জির কোন সম্পর্ক নেই। চিরহরিৎ বিষাক্ত আইভি লতার প্রতিবিষ দেহের কলাকোষের তেমন কোন ক্ষতিসাধন করে না তবে দেহে বার বার প্রবেশ করলে সংবেদনশীল লিম্ফোসাইটের উৎপাদন ঘটায়। এসব লিম্ফোসাইট ত্বকে পেঁছিয় এবং তাদেব থেকে যে বিভিন্ন ধরনের দূষিত পদার্থ (toxic substance) নির্গত হয় এবং মাইক্রফেজ কোষ এসে জড়ো হয় তাদের সম্মিলিত সক্রিয়তা থেকে ত্বকেব কোষে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার থেকেই এজাতীয় এলার্জিগত পরিবর্তন আসে।

2. **অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়াজাত এলার্জি** (Allergy caused by Antigen-Antibody Reaction)**:** আগে থেকে অ্যান্টিজেনজাত বিক্রিয়ার দ্বারা দেহে প্রচুর পবিমাণে IgG জাতীয় অ্যান্টিবডি তৈরী হলে পরবর্তীকালে দেহে একই অ্যান্টিজেন খুব বেশী সংখ্যায় প্রবেশ করলে দেহের কলাকোষে মাবাত্মক ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অ্যান্টিজেন-অ্যান্টি-বডির যে জটিল যৌগ তৈরী হয় তা অধঃক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষুদ্রাকার দানা হিসাবে ছোট ছোট রক্তনালীকে বন্ধ করে দেয়। এছাড়া এসব দানাদার পদার্থ পরি-পূরক সংস্থাকে সক্রিয় করে তুলে। ফলে প্রচুব পরিমাণে প্রোটিনবিশ্লিষ্টকারী এনজাইমের নিঃসবণ ঘটে। ফলস্বরূপ তীব্র প্রদাহ দেখা দেয় এবং ক্ষুদ্রাকার রক্তনালীর বিনাশ ঘটে।

আর্থুস প্রতিক্রিয়া (Arthus response) এবং **সিরাম সিকনেস** (serum sickness) এজাতীয় এলার্জি বিশেষ। প্রথম প্রকারের এলার্জি দেখা দেয় যখন তীব্রভাবে অনাক্রম্য ব্যক্তির দেহে প্রচুব পরিমাণে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করান যায়। IgG অ্যান্টিবডি এবং অ্যান্টিজেনেব মধ্যে যে বিক্রিয়া সংঘটিত হয় তার ফলে স্থানীয় রক্তনালী ও কলাকোষ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। ক্ষতিকর পরিবর্তন মিনিট কয়েকের মধ্যে শুরু হয় এবং দিনকয়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, কোন লোকে সিবাম ইনজেকট করলে ক্রমান্বয়ে IgG অ্যান্টিবডির উৎপাদন শুরু হয় এবং তারা সিরামস্থিত অ্যান্টিবডির সংগে বিক্রিয়া ঘটাতে শুরু করে। ফলে সমগ্র দেহে এলার্জি প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে।

3. **এলার্জেন-রিয়াজিন এলার্জি** (Allergen Reagin allergy)**:** কিছু লোক জন্ম থেকে এলার্জিপ্রবণ হয়। এধরনের এলার্জি-প্রবণতা বাবা-মা থেকে বংশানুক্রমে শিশুতে বিস্তারলাভ করে। এজাতীয় এলার্জির বৈশিষ্ট্য

হল, দেহে প্রচুর পরিমাণে lgE অ্যান্টিবডির উপস্থিতি। lgE অ্যান্টিবডিকে রিয়াজিন (reagin) বলা হয়। এলার্জেন (allergen) নামক নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন lgE এর সংগে বিক্রিয়া ঘটায়। ফলে দেহে যখনই এলার্জেন প্রবেশ করে তখনই এলার্জেন-রিয়াজিন বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং দেহে এলার্জি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

lgE অ্যান্টিবডি কোষের উপরিতলে এটে থাকে। ফলে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির বিক্রিয়ার সময় কোষটি বিনষ্ট হয় ও দেহে অ্যানাফাইলেটিক জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রধানত রক্তের ইওসিনোফিল ও বেসোফিল কোষের এজাতীয় পরিবর্তন থেকে এনাফাইলেটিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এসব কোষ বিনষ্ট হলে তাদের থেকে হিস্টামিন, মন্থর বিক্রিয়াধর্মী পদার্থ, ইওসিনোফিল কেমোটেক্সিক পদার্থ, লাইসোজোমীয় এন্‌জাইম প্রভৃতি নিঃসৃত হয়।

এজাতীয় কিছু এলার্জি প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ :

(a) **এনাফাইলেক্সিস** (Anaphylaxis) : নির্দিষ্ট এলার্জেন সরাসরি রক্তে প্রবেশ করলে দেহের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিক্রিয়া ঘটতে পারে; বিশেষত রক্তের বেসোফিল ও ক্ষুদ্র রক্তনালীর বহির্দেশীয় মাস্টকোষের সংগে। ফলে দেহের সর্বত্র এনাফাইলেক্সিস জাতীয় বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। হিস্টামিন রক্ত-সংবহনে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিস্তৃতভাবে প্রান্তীয় বাহপ্রসারণ (vasodilation) ঘটায়, রক্তজালিকার ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে, ফলে রক্ত থেকে প্লাজমাপ্রোটিনের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। হঠাৎ এজাতীয় প্রতিক্রিয়া থেকে মানুষ কয়েক মিনিটের মধ্যে সংবহনগত শকের (shock) জন্য মারা যায়। এছাড়া কোষের পরিবর্তন থেকে উৎপন্ন মন্থর বিক্রিয়াধর্মী পদার্থ নিঃসৃত হয়, যা ক্লোমশাখার (bronchioles) মসৃণ পেশীর আক্ষেপ ঘটায়। এজাতীয় আক্ষেপ হাঁপানি রোগের মত পরিবর্তন নিয়ে আসে।

(b) **চুলকানি** (Utricaria) : অ্যান্টিজেন ত্বকের নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রবেশ করে স্থানীয়ভাবে এনাফাইলেটিক বিক্রিয়া ঘটায়, তারই ফলে চুলকানি দেখা দেয়। নিঃসৃত হিস্টামিন (i) বাহপ্রসারণের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ সে স্থানকে রক্তিম করে তুলে এবং (ii) রক্তজালকের ভেদ্যতা বৃদ্ধির ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যে ত্বক ফুলে ওঠে। অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগ এই অবস্থায় নিরসন ঘটাতে পারে।

(c) **হে-জ্বর** (Hay-fever) : হে-জ্বরে নাকের মধ্যে এলার্জেন-রিয়াজিন

বিক্রিয়া ঘটে। নিঃসৃত হিস্টামিন এক্ষেত্রেও স্থানীয়ভাবে বাহপ্রসারণ ও রক্তজালিকার ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে। এই উভয়জাতীয় বিক্রিয়া থেকে তরলপদার্থ নাকের কলাতে বেরিয়ে আসে এবং নাকের আস্তরণ ফেঁপে ওঠে ও ক্ষরণধর্মী হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগ নাকের আস্তরণের ফেঁপে ওঠাকে রোধ করতে পারে। এলার্জেন-রিয়্যাজিন বিক্রিয়াঘটিত অন্যান্য পদার্থ নাকের মধ্যে তখনও উত্তেজনা দিতে থাকে, ফলে ওষুধ প্রয়োগ করলেও ব্যক্তিবিশেষে ঘন ঘন হাঁচির উদ্রেক হয়।

(d) **হাঁপানি** (Asthma) **:** এলার্জেন-রিয়্যাজিন বিক্রিয়া যখন ফুসফুসের ক্লোমশাখায় (bronchioles) সংঘটিত হয় তখনই হাঁপানি-রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এক্ষেত্রে মন্থর-বিক্রিয়াধর্মী পদার্থের নিঃসরণ থেকে ক্লোমশাখার মসৃণ পেশীতে আক্ষেপ (spasm) দেখা দেয়, ফলে শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। এক্ষেত্রে অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগের দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় না।

আর. ই. তন্ত্র
R. E System

দেহের প্রতিরক্ষার কার্যে অংশগ্রহণকারী কিছু সংখ্যক আগ্রাসী কোষকে (phagocytes) নিয়ে আর. ই. তন্ত্র গঠিত। এই কোষগুলো অন্তরাবরণী আস্তরণ (lining) ও সংযোগরক্ষকারী কলার জালকস্থানে অবস্থান করে। এরা ভ্রূণের মেসেনকাইমা (mesenchyme) অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন
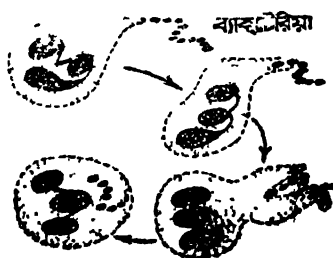
10-7 নং চিত্র : রক্তের নিউট্রোফিলের আগ্রাসন পদ্ধতি।

হবার পরও তাদের আদিম প্রকৃতি বজায় রাখে। এই প্রকৃতির জন্য এরা এদের আকার, আয়তন ও জীবিকার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। দেহে কোনপ্রকার ব্যাক্টেরিয়া বা রোগজীবাণু প্রবেশ করলে এরা তাদের গ্রাস করে (10-7 নং চিত্র) এবং বিনষ্ট করে।

1. **আর. ই. কোষের শ্রেণীবিন্যাস** (Classification of R. E. cells) : আর ই. কোষসমূহকে দুভাগে বিভক্ত করা যায় : (a) পর্যটক কোষ এবং (b) আবদ্ধ কোষ।

(a) **পর্যটক কোষ** (Wandering cells) : এসব কোষ দেহের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করে। এদের আবার দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন, (i) **পর্যটক হিস্‌টিওসাইট** (Wandering histeocyte) : এই বৃহদাকৃতি কোষগুলোকে সাধারণত অস্থিমজ্জা, লসিকাগ্রন্থি, লোহিত প্লীহামজ্জা (red splenic pulp) ইত্যাদিতে পরিলক্ষিত হয়। (ii) রক্তসংবহনের পর্যটক কোষ (Wardering cells of circulation) : রক্তের স্বাভাবিক মনোসাইট, নিউট্রোফিল ইত্যাদি কোষ এই পর্যায়ে পড়ে। এই কোষগুলো কলাকোষের মধ্য দিয়ে দেহের যে-কোন অংশে প্রবেশ করতে পারে। রক্তজালিকার অন্তরাবরণী আস্তরণের যে-কোন একটির সংযোগস্থলের মধ্য দিয়ে এই কোষগুলো মুহূর্তে তাদের প্রোটোপ্লাজমীয় ক্ষণপদ (Pseudopodium) প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং প্রোটোপ্লাজমের অর্ধতরল পদার্থকে ক্ষণপদের দিকে ঠেলে দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই পদ্ধতিতে খুব কম সময়ের মধ্যেই অসংখ্য রক্তকণিকা রক্তপ্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। দেহের যে অংশে ব্যাক্‌টেরিয়া প্রবেশ করে সেখানে পৌঁছেই তারা বিপদাপন্ন অঞ্চলকে ঘিরে ফেলে এবং ব্যাক্‌টেরিয়াকে ধ্বংস করতে শুরু করে। প্রতিটি কোষ 15 বা 20টি রোগজীবাণুকে গ্রাস করতে সক্ষম। এদেরে জীবন্ত অবস্থাযই তারা গ্রাস করে।

b) **আবদ্ধ কোষ** (Fixed cells) : চার ধরনের আবদ্ধ আর. ই. কোষের সন্ধান পাওয়া যায় : (i) **অন্তরাবরণী কোষ** (Endothelial cells) : এই কোষগুলোকে যকৃৎ, পিটুইটারী, অ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থির বহিঃস্তর, অস্থিমজ্জা, প্লীহা প্রভৃতির রক্ত বাহস্ফীতির (blood sinuses) আস্তরণে দেখতে পাওয়া যায়। যকৃতে এই কোষগুলো বৃহৎ ও নক্ষত্রাকৃতিবিশিষ্ট বলে তাদের **কুপ্‌ফার কোষ** (kupffer's cell) বলা হয়। (ii) **জালক কোষ** (Reticulum cells) : এই কোষগুলো অস্থিমজ্জা, প্লীহা, লসিকাগ্রন্থি প্রভৃতি অংগের জালকস্থলে অবস্থান করে। এরা দীর্ঘ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে পরস্পরের সংগে সংযুক্ত থাকে এবং সঠিক উদ্দীপনা পেলে গতিশীল হয়। (iii) **মাইক্রো-**

গ্লিয়া (Microglia) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এই ক্ষুদ্র আকৃতির কোষগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়। এরা রক্তবাহ ও মস্তিষ্কের তিনটি আবরক ঝিল্লি[2] থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রবেশ করে। প্রদাহজনিত অবস্থায় তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। (iv) **কলাস্থিত হিস্‌টিওসাইট** (Tissue histeocytes) : এই কোষগুলোকে সংযোগরক্ষাকারী কলা এবং প্লুরা (pleura), ওমেন্‌টাম (omentum) প্রভৃতি সেরাস-ঝিল্লির শিথিল অ্যারিওলার কলায় দেখতে পাওয়া যায়। সঠিক উদ্দীপনা পেলে এই কোষগুলিও সক্রিয়গতি লাভ করে।

(2) **আর ই. তন্ত্রের কার্যাবলী** (Functions of R. E. Systems) : সংক্ষেপে আর. ই. তন্ত্রের কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হল : (a) **আগ্রাসনপদ্ধতি** (Phagocytosis) : দেহে প্রবিষ্ট ব্যাক্‌টেরিয়া, প্যারাসাইট, বিজাতীয় পদার্থ প্রভৃতিকে আর. ই. কোষ এই পদ্ধতিতে গ্রাস করে এবং ধ্বংস করে। (b) **প্লাজমাপ্রোটিনের উৎপাদন** (Formation of plasma protein) : আর. ই. কোষ সামান্য পরিমাণে সিরাম গ্লোবিউলিন এবং অন্যান্য প্লাজমা প্রোটিন উৎপাদন করতে সক্ষম। (c) **অ্যান্টিবডির উৎপাদন** (Formation of antibody) : দেহের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এরা প্রতিবিষ, প্রতিব্যাক্‌টেরীয় পদার্থ (antibacterial substance) প্রভৃতি অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে। (b) **শ্বেতকণিকার উৎপাদন** (Formation of W B. C.) : লিম্ফোসাইট, মনোসাইট, নিউট্রোফিল প্রভৃতি শ্বেতকণিকা আর. ই. কোষ থেকেই উৎপন্ন হয়। (e) **লোহিতকণিকার উৎপত্তি** (Origin of R. B. C) : আর. ই কোষ (হিমোসাইটোব্লাস্ট) থেকে লোহিতকণিকা উৎপন্ন হয়। (f) **রক্তকোষের বিনাশসাধন** (Destruction of blood cells) : প্লীহা ও যকৃতের আর. ই. কোষ বৃদ্ধ লোহিত ও শ্বেতকণিকাকে আগ্রাসন পদ্ধতিতে গ্রহণ করে ও বিনষ্ট করে। হিমোগ্লোবিনের অবনয়নে বিলিরুবিন (bilirubin) উৎপন্ন হয়। (g) **সঞ্চয় কার্য** (Storage function) : আর. ই কোষ প্রচুর পরিমাণে লিপিড, কোলেস্‌টারোল এবং লোহাকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। (h) **আর. ই. কোষের রূপান্তর** (Conversion of R E. cells) : প্রদাহজনিত অবস্থায় মেরামতির সময়ে সঠিক উদ্দীপনা পেলে আর. ই. কোষ পরিবর্তিত হয়ে ফাইব্রোব্লাস্ট কোষে রূপান্তরিত হয়।

2. Meninges—duramater, arachnoid and piamater.

লসিকাগ্রন্থি

Lymph Gland

লসিকা রক্তপ্রবাহে পেঁছিবার পূর্বে এক বা একাধিক গ্রন্থি বা পিণ্ডের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। এদের **লসিকাগ্রন্থি** বা **লসিকাপিণ্ড** (lymph nodes) বলা হয়। লসিকাগ্রন্থি **ক্যাপ্সুল** (capsule) নামক সংযোগরক্ষাকারী কলা দ্বারা আবৃত থাকে। ক্যাপ্সুল থেকে সংযোগরক্ষাকারী কলার আঁশ বা তন্তু লসিকাগ্রন্থির গভীরে প্রবেশ করে। এদের **ট্র্যাবেকিউলি** (trabeculae) বলা হয়। অবশ্য মানুষের লসিকাগ্রন্থিতে ট্র্যাবেকিউলি ততটা সুস্পষ্ট নয়।

1. **লসিকাগ্রন্থির আণুবীক্ষণিক গঠন** (Histology of lymph andgl.) : লসিকাগ্রন্থিকে **বহিঃস্তর** (cortex) ও **মজ্জা** (medulla) এই দুভাবে বিভক্ত করা যায়। বহিঃস্তরের লসিকাকোষ একত্রিত হয়ে **উপলসিকাপিণ্ড** (lymphoid nodules) গঠন করে। উপলসিকাপিণ্ড উপরিতলের সংগে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। এদের ব্যাস 0·35—1·0 মিলিমিটার। প্রতিটি উপলসিকাপিণ্ডে একটি করে ক্ষুদ্র রক্তনালী প্রবেশ করে। উপলসিকাপিণ্ডের কেন্দ্রস্থলের ঘনত্ব
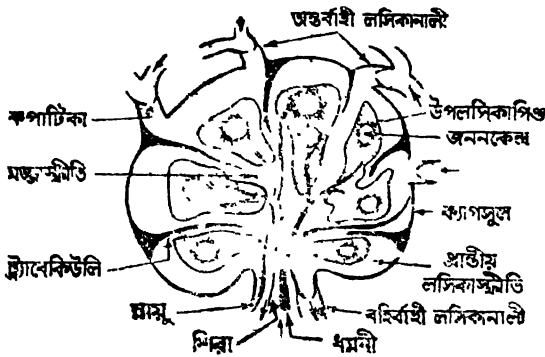
10-৭ নং চিত্র : লসিকাগ্রন্থির গঠনবিন্যাস।

তুলনামূলকভাবে কম। এই অংশকে **জননকেন্দ্র** germinal centre) বলা হয়। জননকেন্দ্রের বাহিরের অংশ **বহিঃস্তরীয় পিণ্ডক** (cortical nodules) নামে পরিচিত। সক্রিয় কোষবিভাজনের দ্বারা জননকেন্দ্রে লিম্ফোসাইট উৎপন্ন হয়। উপলসিকাপিণ্ডকে লসিকা সাইনাস (lymph sinus), ক্যাপ্সুল ও ট্র্যাবেকিউলি থেকে পৃথক করে রাখে (10-8নং চিত্র)।

লসিকাগ্রন্থির মজ্জাংশ বহিঃস্তরের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম ঘন। মজ্জাতে উপলসিকাপিণ্ড অনুপস্থিত। এই অংশে লসিকাকোষ, বিভিন্ন প্রকৃতির আর. ই. কোষ এবং কখনও কখনও একাধিক নিউক্লিয়াসযুক্ত বৃহদাকৃতি কোষ ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে। মজ্জাতে ট্রাবেকিউলি অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত থাকে। ট্র্যাবেকিউলি থেকে উৎপন্ন লসিকাসূত্র (lymph cord) পরস্পর যোগসূত্র গঠন করে। লসিকাসাইনাস ট্র্যাবেকিউলি ও লসিকাসূত্রকে পৃথক করে রাখে।

2. **লসিকাগ্রন্থির সংবহন** (Circulation through lymph gland) : (a **লসিকাসংবহন** (Lymph circulation) : অন্তর্বাহ লসিকানালী লসিকাগ্রন্থির সমগ্র উপরিতলের তন্তুময় ক্যাপসুলকে ভেদ করে অভ্যন্তরেপ্রবেশ করে। প্রতিটি লসিকানালীতে অন্তর্মুখী কপাটিকা বিদ্যমান। অন্তর্মুখী লসিকানালীর প্রাচীর যথেষ্ট পরিমাণে পাতলা হয়। বহির্মুখী লসিকানালীর চেয়ে এদের সংখ্যাও অনেক বেশী। লসিকাগ্রন্থিতে প্রবেশ করার পর লসিকানালী পুনঃপুনঃ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং ট্র্যাবেকিউলিজালক বরাবর অগ্রসর হয়ে প্রধান বহির্মুখী লসিকানালী গঠন করে এবং লসিকানাভীর (hilum) মধ্য দিয়ে নির্গত হয়। নির্গমনপথ বহির্মুখী কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। (b) **রক্তসংবহন** (Blood circulation) : লসিকানাভীর মধ্য দিয়ে ধমনী লসিকাগ্রন্থিতে প্রবেশ করে এবং বহুবিভক্ত হয়ে অসংখ্য উপধমনী উৎপন্ন করে। উপধমনীগুলো ট্র্যাবেকিউলি বরাবর অগ্রসর হয়ে রক্তজালিকায় বিভক্ত হয়। এদের চারিপাশে লসিকাকোষ দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে। রক্তজালিকা এরপর উপশিরা গঠন করে। উপশিরা পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রধান শিরা উৎপন্ন করে, যা পুনরায় লসিকানাভীর মধ্য দিয়ে নির্গত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, রক্তবাহ যেখানে লসিকানাভীর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে আবার একই পথে নির্গত হয় সেক্ষেত্রে লসিকানালী লসিকাগ্রন্থির ক্যাপসুলের মধ্য দিয়ে গ্রন্থিতে প্রবেশ করে এবং লসিকানাভী দিয়ে নির্গত হয়।

3 **লসিকাগ্রন্থির কার্যাবলী** (Functions of lymph gland) : লসিকাগ্রন্থি (a) গামা-গ্লোবিউলিন উৎপন্ন করে, b) যান্ত্রিক ফিলটার হিসাবে কার্য করে এবং বিষাক্ত পদার্থের রক্তসংবহনে প্রবেশে বাধা দেয়; (c) ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে; (d) আগ্রাসী লিম্ফোসাইট উৎপাদন করে; (e) কর্কটরোগের (cancer) কোষকে সমগ্র দেহে ছড়িয়ে

পড়তে সাময়িকভাবে বাধাদান করে এবং (f) লসিকা উৎপাদনে সহায়তা করে।

প্লীহা
Spleen

1. **প্লীহার আণুবিক্ষণিক গঠন** (Histology of spleen) **:** প্লীহা তন্তুময় ক্যাপসুলের দ্বারা আবৃত থাকে। ক্যাপসুলীয় তন্তু প্রধানত স্থিতিস্থাপক এবং কিছুসংখ্যক অনৈচ্ছিক পেশীর দ্বারা গঠিত। ক্যাপসুল থেকে নির্গত তন্তুগুচ্ছ বা ট্র্যাবেকিউলি প্লীহাপদার্থের গভীরে প্রবেশ করে এবং অপরাপর সদৃশ ট্র্যাবেকিউলির সংগে যুক্ত হয়ে জালকের সৃষ্টি করে। জালকের ফাঁকে ফাঁকে যেসব কলার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে প্রধান **:** (a) **শ্বেত প্লীহামজ্জা** (white splenic pulp), (b) **লোহিত প্লীহামজ্জা** (red splenic pulp) এবং (c) **প্লীহাস্থিত রক্তবাহ** (splenic vessels)।

শ্বেত প্লীহামজ্জা লসিকাকোষ দ্বারা গঠিত। ইহা আগে ম্যালপিজিয়ান
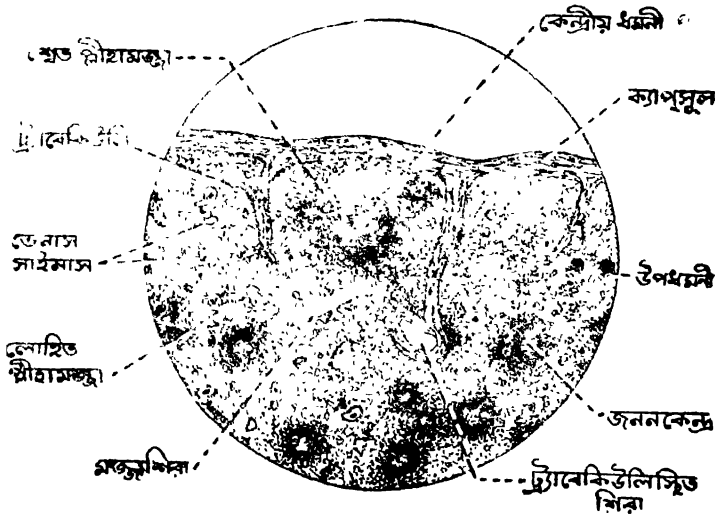
10-7নং চিত্র **:** প্লীহার আণুবিক্ষণিক গঠন।

কণা নামে পরিচিত ছিল। শ্বেত প্লীহামজ্জার কেন্দ্রস্থলকে জননকেন্দ্র বলা হয়। জননকেন্দ্রে লিম্ফোসাইটের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্লীহার লোহিত মজ্জার প্রায়

সর্বত্র ধূসর প্যাচ বা দাগ হিসাবে শ্বেত প্লীহামজ্জা বিস্তৃত থাকে। প্রতিটি শ্বেত মজ্জার অভ্যন্তরে একটি করে ক্ষুদ্র রক্তনালী প্রবেশ করে।

লোহিত প্লীহামজ্জায় বিভিন্ন প্রকার কোষের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে প্রধান: **জালককোষ, পর্যটক হিস্‌টিওসাইট** এবং **দানবকোষ** (gaint cells)। এরা প্রত্যেকেই আর. ই. কোষের পর্যায়ভুক্ত। জালককোষের আকৃতি অনিয়মিত। এরা প্রধানত ট্র্যাবেকিউলিস্থিত জালক এবং রক্তবাহের অন্তরাবরণীতে সংযুক্ত থাকে। শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এই কোষগুলো পরস্পর যুক্ত থাকে। পর্যটক হিস্‌টিওসাইটের মধ্যে অ্যামিবাগতি লক্ষ্য করা যায়। দানবকোষেও অ্যামিবাগতি দেখা যায়। এরাও আগ্রাসী কোষ। প্রতিটি কোষে অনেকগুলো করে নিউক্লিয়াস থাকে।

প্লীহার রক্তনালী প্লীহানাভির মধ্য দিয়ে প্লীহায় প্রবেশ করে। রক্তনালীর একাংশ বহুবিভক্ত হয়ে সছিদ্র শিরাস্ফীতিতে প্রবেশ করে এবং লোহিত প্লীহা-মজ্জার ভেতর দিয়ে ঘুরে প্লীহাশিরা গঠন করে। প্লীহাশিরা পুনরায় প্লীহা-নাভির মধ্য দিয়ে নির্গত হয়। রক্তনালীর অপরাংশ সরাসরি উপধমনী, রক্তজালিকা, উপশিরা ও শিরা গঠন করে।

2. **প্লীহার কার্যাবলী** (Functions of spleen): প্লীহার কার্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নে আলোচিত হল।

(a) **প্রতিরোধ ব্যবস্থা:** প্লীহার আর. ই কোষ দেহের প্রতিরোধব্যবস্থায় বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। তারা ব্যাক্‌টেরিয়া, প্যারাসাইট, বিজাতীয় পদার্থ ইত্যাদিকে যেমন আগ্রাসন-পদ্ধতির সাহায্যে বিনষ্ট করে, তেমনি অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করে। তাছাড়া মজ্জাস্থিত লসিকাকোষ সরাসরি আধিবিষের (toxin) সংগে যুক্ত হয়ে তাদেরে রক্তসংবহন থেকে পৃথক করে।

(b) **রক্তকোষের উৎপাদন:** প্লীহা লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট উৎপাদন করতে পারে। শ্বেত প্লীহামজ্জা লিম্ফোসাইট উৎপাদনের জন্য দায়ী। তাছাড়া প্লীহা লোহিতকণিকাও উৎপাদন করে, তবে দুটো বিশেষ অবস্থায় তার এই কার্য সীমিত থাকে। জন্মের পর এবং দেহের জরুরী অবস্থায়, অর্থাৎ রক্তাল্পতা ইত্যাদিতে প্লীহা লোহিতকণিকা উৎপন্ন করতে সক্ষম। গর্ভাবস্থার শেষের দিকে ভ্রূণদেহে প্লীহা লোহিতকণিকা উৎপাদন করে।

(c) **রক্তের সঞ্চয়ভাণ্ডার :** কারো কারো মতে লোহিতকণিকার এক তৃতীয়াংশ প্লীহাতে সঞ্চিত থাকে। রক্তক্ষরণ, শ্বাসরোধ, ভারী পেশীসঞ্চালন, পর্বতারোহণ, ইত্যাদি অবস্থায় দেহে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে প্লীহা সংকুচিত হয় এবং লোহিতকণিকা রক্তসংবহনে নিক্ষিপ্ত হয়। কুকুর, বিড়াল এবং ঘোড়া ইত্যাদি পশুর ক্ষেত্রে এই পর্যবেক্ষণ সত্য হলেও মানুষের ক্ষেত্রে এর সত্যতা কতটুকু তা সঠিকভাবে এখনও জানা যায়নি। রক্তের সঞ্চয়ভাণ্ডার হিসাবে মাত্র 200 গ্রাম ওজনের এই দেহাংশটির গুরুত্ব প্রশ্নাতীত নয়।

(d) **রক্তকোষের বিনাশসাধন :** জীর্ণ ও বয়স্ক রক্তকোষকে (শ্বেত ও লোহিতকণিকা উভয়কেই) প্লীহার আর. ই. কোষ বিনষ্ট করে। তাছাড়া প্লীহা অণুচক্রিকার উৎপাদনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে।

(e) **বিপাকক্রিয়া :** প্লীহায় বিনষ্ট লোহিতকণিকার হিমোগ্লোবিন বিশ্লিষ্ট হয়ে বিলিরুবিন উৎপাদন করে। হিমোগ্লোবিন-নিঃসৃত লোহা প্রথমে লোহিত প্লীহামজ্জায় সঞ্চিত থাকে, পরে মনোসাইট ও অন্যান্য মুক্ত আর. ই. কোষ দ্বারা পরিবাহিত হয়ে যকৃতে পৌঁছয় এবং সেখানে সঞ্চিত থাকে। এই লোহার একাংশ পুনরায় অস্থিমজ্জায় পৌঁছয় এবং হিমোগ্লোবিনের সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

(f) **হিমোলাইসিন উৎপাদন :** কোন এক জাতীয় প্রাণীর রক্ত অন্য প্রাণীতে পর্যায়ক্রমে প্রবেশ করালে প্লীহাতে হিমোলাইসিন (hemolysin) নামক একটি পদার্থ উৎপন্ন হতে দেখা যায়। এই পদার্থ হিমোলাইটিক রক্তাল্পতার (hemolytic Anemia) জন্য দায়ী।

প্রশ্নাবলী

1 অনাক্রম্যতা বলতে কি বোঝায় ? বিভিন্ন প্রকার অনাক্রম্যতার বর্ণনা দাও এবং অনাক্রম্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। (C. U. H. '81)

2 দেহে অ্যান্টিবডির উৎপাদনের পদ্ধতির বর্ণনা দাও। (C. U. H. 81 '83)

3. অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি বলতে কি বোঝায় ? এদের রাসায়নিক প্রকৃতির বর্ণনা দাও। অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া পদ্ধতির বর্ণনা দাও। (C U, H, '81)

4 সহজাত অনাক্রম্যতার বিশেষত্ব বর্ণনা কর।

5 ইনটারফেরন অনাক্রম্যতা সম্বন্ধে যা জান লিখ।

6 এলার্জি কাকে বলি ? এলার্জিতে দেহে কি কি ধরনের পরিবর্তন হয় ?

7 আর ই কোষের প্রকারভেদ, অবস্থান ও কার্যাবলীর উল্লেখ কর। (C. U. H. '77)

৪ প্লীহার আণুবীক্ষণিক গঠন ও কার্যাবলীর বর্ণনা দাও।

(C. U '66 '73, C. U. H '77)

9 প্লীহার স্থূল ও আণুবীক্ষণিক গঠনের বর্ণনা দাও এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা পদ্ধতিসহ রক্তকণিকার উৎপাদন ও বিনাশ-সাধনে তার ভূমিকার উল্লেখ কর। (C. U. H '74)

10 টীকা লিখ :—

(a) অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি (B. U. 84), (b) B-লিম্ফোসাইট ও T-লিম্ফোসাইট, (c) আর ই. তন্ত্র (d) এলার্জি, (e) লসিকাগ্রন্থি, (f) সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার মধ্যে পার্থক্য (B U '84)

এগার

দেহ তরল

BODY FLUID
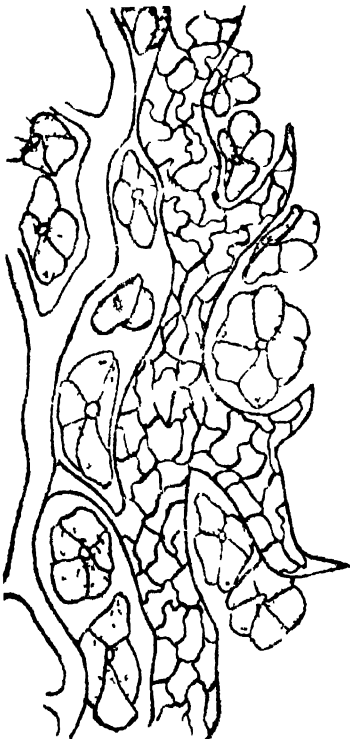
মানুষের দৈহিক ওজনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই জল। জলের অভাবে দেহের ওজন 10-20% হ্রাস পেলে প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খাদ্যাভাবে প্রাণী অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারলেও জলাভাবে একেবারেই সে বেঁচে থাকতে পারে না। প্রাণীদেহে জলের ভূমিকা নিম্নরূপঃ (1) জল কলাকোষের গঠনের অপরিহার্য উপাদান, (2) ইহা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দ্রাবক, যার মধ্যে Na^+, K^+, Ca^{++}, Mg^{++}, H^+, Cl^-, HCO_3 প্রভৃতি তড়িদবিশ্লেষ্য যেমন দ্রবীভূত থাকে, তেমনি প্রোটিন, এনজাইম, হরমোন, ভিটামিন, শর্করা ও স্নেহপদার্থ প্রভৃতি অ-তড়িদ্বিশ্লেষ্যও দ্রবীভূত থাকে। জলে এদের যথাযথ উপস্থিতি প্রাণীকোষের স্বাস্থ্য,

সজীবতা এবং স্বাভাবিক সক্রিয়তার পক্ষে অপরিহার্য, (3) জল প্রাণীদেহের পরিবহন মাধ্যম হিসাবে কাজ করে, যার মাধ্যমে কলাকোষ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও অক্সিজেন লাভ করে এবং উৎপন্ন বর্জ্যপদার্থ ত্যাগ করতে পারে, (4) প্রাণীদেহের প্রায় যাবতীয় রাসায়নিক বিক্রিয়াই এই তরল মাধ্যমে সংঘটিত হয়, (5) জল দেহের অন্তর্দেশীয় তরল পরিবেশের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। এই সাম্যাবস্থার ওপরই প্রাণীকোষের সক্রিয়তা নির্ভর করে, (6) দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণেও ইহা বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে, (7) কলাকোষের আকৃতি বজায় রাখতেও ইহা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

দেহতরল
Body Fluid

1. **দৈহিক ওজনের সংগে দেহতরলের সম্পর্ক ঃ** পুরুষের দৈহিক ওজনের প্রায় 60 শতাংশ এবং স্ত্রীলোকের 50 শতাংশ জলের দ্বারা গঠিত।
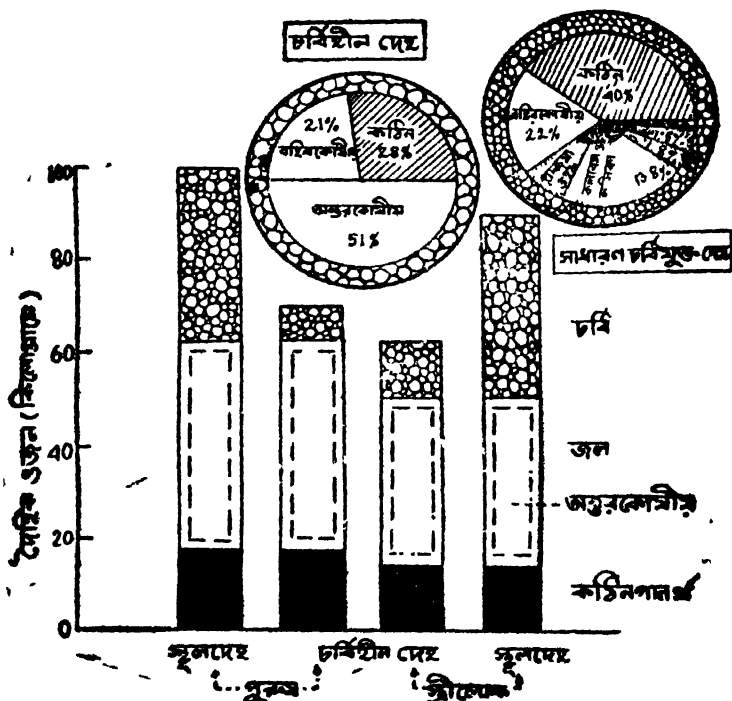
11-2নং চিত্র ঃ স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক ওজনের সংগে দেহতরলের সম্পর্ক।

চর্বিকলাতে যেহেতু খুব সামান্য পরিমাণ জল আবদ্ধ থাকতে পারে, সেহেতু স্থূলদেহী লোকের দেহের মোট জলের পরিমাণ শীর্ণকায় লোকের দেহের মোট-জলের পরিমাণের চেয়ে অনেক কম হয়। চর্বিহীন দেহের ওজন (lean body mass) ও দেহের মোট জলের পরিমাণের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অনুপাত লক্ষ্য করা যায়। একজন বয়স্কলোকের চর্বিহীন দেহের ওজনের 72 শতাংশই জল। নবজাতকে এই পরিমাণ আরও একটু বেশী, প্রায় 80 শতাংশ। বিভিন্ন উপাদান সম্বলিত এই তরলপদার্থ দেহের বিভিন্ন সহজাত তরলস্থানে (compartment) ছড়িয়ে থাকে। এসব জৈবাধার এবং পরিবেশের মধ্যে জলের অবিরাম বিনিময় চলে। 70 কিলোগ্রাম ওজনসম্পন্ন একজন লোকের দেহে প্রায় 4‑— 45 লিটার জল থাকে। কলাস্থানে জলের পরিমাণ প্রায় 12 লিটার।

2. **তরলস্থান** (Compartments of body fluid) : বিভিন্ন উপাদান সম্বলিত দেহমধ্যস্থ জলীয় তরল দেহতরল নামে পরিচিত। ইহা দেহের দুটো প্রধান স্থানে বিস্তৃত থাকে : কোষের মধ্যে এবং কোষের বহির্দেশে (যার মধ্যে কোষ ডুবে থাকে।) কোষঝিল্লির দ্বারা পৃথকীকৃত কোষমধ্যস্থ তরল **অন্তরকোষীয় তরল** (intracellular fluid) নামে পরিচিত। তেমনি কোষকে বেষ্টনকারী কোষবহির্ভূত তরলকে **বহিরকোষীয় তরল** extracellular fluid) বলা হয়। একজন বয়স্ক লোকের চর্বিহীন দেহের ওজনের ‑1% অন্তরকোষীয় তরল, 21% বহিরকোষীয় তরল এবং বাকী 2‑% শতাংশ কঠিন পদার্থে গঠিত। সাধারণ চর্বিযুক্ত দেহের ওজনের প্রায় 38% অন্তরকোষীয় তরল এবং 22% বহিরকোষীয় তরল। বহিরকোষীয় তরল **প্লাজমা**, **কলারস** (tissue fluid), **লসিকা** (lymph), **কোষান্তরীয় জল** (transcellular water), **তরুণাস্থি ও ঘন সংযোগরক্ষাকারী কলানিহিত জল** এবং **অলভ্য** অস্থিনিহিত **জলের** (inaccessible bone water) সমন্বয়ে গঠিত। নিম্নে দেহতরলের বিভিন্ন বিভাগ এবং তাদের হিসাব দেওয়া হল (সাধারণ চর্বিযুক্ত দেহের) :

বিভাগ	দৈহিক ওজনের শতভাগ	জলীয় শতাংশ
মোট দেহতরল	60	100
1. অন্তরকোষীয় তরল	38	63
2. বহিরকোষীয় তরল	22	37
(a) প্লাজমা	37	6 2
(b) কলারস ও লসিকা	13·8	23·0
(c) সংযোগরক্ষাকারী কলা ও তরুণাস্থি নিহিত জল	1·8	3·1
(d) অলভ্য অস্থিনিহিত জল	1·8	3·1
(e) কোষান্তরীয় জল	0·9	1·6

কোষান্তরীয় জল আবার যেসব তরলের সমন্বয়ে গঠিত তার মধ্যে প্রধান: (1) মস্তিষ্কমেরুরস (cerebrospinal fluid); (2) সন্ধিস্থলীয় তরল বা সাইনোভিয়েল ফ্লুইড (synovial fluid), (3) অন্তর্নেত্রীয় তরল (intraocular fluid), (4) হৃদ্ধরা, ফুসফুস-ধরা এবং উদরাবরক ঝিল্লিগহ্বরস্থিত তরল, (5) পাচকগ্রন্থির নালীস্থিত তরল, (6) শ্বাসনালী, পৌষ্টিকনালী এবং জনন-নালীগত শ্লেষ্মাঝিল্লিস্থিত তরল এবং (7) পৌষ্টিকনালীগত তরল।

অন্তঃকোষীয় তরল যেমন অবিচ্ছেদ্য নয়, তেমনি সমপ্রকৃতিরও নয়। ইহা দেহের যাবতীয় কোষের কোষঝিল্লি দ্বারা পৃথিকীকৃত তরলের মোট পরিমাণকে বুঝায়। কোষের শারীরস্থানের বিভিন্নতার জন্য সাইটোপ্লাজম, মাইটোকন্ড্রিয়া ও নিউক্লিয়াস প্রভৃতিতে নিহিত তরলের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়া দেহের বিভিন্ন কলাকোষে জলের পরিমাণও বিভিন্ন থাকে। বিভিন্ন প্রকার কলায় নিহিত জলের পরিমাণ এবং নির্দিষ্ট কলাটির ওজন দৈহিক ওজনের শতকরা কত ভাগ, তার সম্পর্ক নিম্নলিখিত তালিকায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

দেহকলা	দৈহিক ওজনের শতভাগ	জলের পরিমাণ (শতাংশে)	জলের পরিমাণ (লিটারে)
পেশী	42	76	22·0
দেহচর্ম	18	72	9·0
অস্থি	16	22	2·5
চর্বিকোষ	13	16	0·9
রক্ত	8	83	5·0
যকৃৎ	2·3	68	1·0
বৃক্ক	0·4	83	0·3
ফুসফুস	0·7	79	0·4
হৃৎপিণ্ড	0·5	79	0·3
মস্তিষ্ক	2	75	1·1

3. **তরলস্থানের পরিমাণ** (Measurement of b

দেহের তরলস্থানের পরিমাণ খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পরোক্ষ পদ্ধতির .

সাহায্যেই প্রধানত এসব তরলস্থানের পরিমাপ করা হয়। এব্যাপারে সাধারণত লঘুকরণ পদ্ধতিতে (dilution technique) শুধুমাত্র বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক-পদার্থের ব্যবহার করা হত, অধুনা তেজস্ক্রিয় আইসটোপের সমধিক ব্যবহার করা হয়। শেষোক্ত পদার্থের ব্যবহারে অধিকতর নির্ভুল তথ্য লাভ করা যায়। এ সব রঞ্জকপদার্থ বা আইসোটোপের বৈশিষ্ট্য হল : (1) এরা নির্বিষ, (2) দেহ উপাদানের গঠন বা ক্ষয়ক্রিয়ায় এরা প্রয়োজনীয় নয়, (3) এরা দ্রুত ও সমানভাবে তরলস্থানে মিশে যায়, (4) তরলস্থানে ছড়িয়ে পড়ার সময় সাধারণত এরা রেচিত হয় না, (5) দেহের অপর কোন উপাদানের সংগে সংযুক্ত হয় না, (6) দেহতরলের বণ্টনে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না, (7) যে তরলস্থানের পরিমাপ করা হয় তার মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে আটক পড়ে এবং (৪) এদের সহজ ও নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা যায়।

যে সহজ সমীকরণের দ্বারা দেহতলের পরিমাপ করা যায়, তা নিম্নরূপ :

$$\text{তরলের পরিমাপ} = \frac{\text{অনুপ্রবিষ্ট পদার্থ} - \text{রেচিত অংশ}}{\text{লঘুকারী তরলে পদার্থের গাঢ়ত্ব}}$$

এই সমীকরণকে ব্যবহার করে দেহের বিভিন্ন তরলস্থানের তরলের পরিমাণকে নির্ধারণ করা যায়।

(a) **মোট দেহতরল** (Total body fluid) : জীবন্ত প্রাণীতে লঘুকরণ পদ্ধতির সাহায্যে মোট দেহতরলের পরিমাপ করা হয়। তত্ত্বগতভাবে অনুপ্রবিষ্ট পদার্থ সমগ্র দেহের তরলস্থানে বিস্তারলাভ করে। যে সব পদার্থ এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়, তারা হল : ইউরিয়া, থায়োউরিয়া (thiourea), সালফানিল্যামাইড (sulfanilamide), অ্যাণ্টিপাইরিন (antipyrin), ডিউটেরিয়াম (deuterium) এবং ট্রাইটিয়াম tritium)। ব্যক্তিবিশেষের আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিমাপ করেও মোট দেহতলের নির্ধারণ করা যায়।

(b) **বহিরকোষীয় তরল** (Extracellular fluid) : শুধুমাত্র বহিরকোষীয় তরলে ছড়িয়ে পড়তে পারে এরকম কোন নির্দিষ্ট রঞ্জকপদার্থ বা আইসোটোপ নেই। কোরাইড, ব্রোমাইড, সোডিয়াম থায়োসায়ানেট এবং তাদের তেজস্ক্রিয় আইসটোপ এ ব্যাপারে যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়নি। সোডিয়াম থায়োসালফেট, রেডিওসালফেট, সুক্রোজ, ম্যানিটোল (manitol), র‍্যাফিনোজ, ইনুলিন প্রভৃতির, বিশেষত শেষেরটির সাহায্যে অধিকতর নির্ভুলভাবে বহিরকোষীয় তরল সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

প্লাজমা পরিমাণের নির্ধারণ রক্তের অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

(c) **অন্তরকোষীয় তরল** (Intracellular fluid) : লঘুকরণ পদ্ধতির দ্বারা সরাসরি অন্তরকোষীয় তরলের পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়। এই তরলের পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে প্রথমে দেহতরল ও বহিরকোষীয় তরলের পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়। দেহতরল থেকে এরপর বহিরকোষীয় তরলের পরিমাণ বাদ দিলে অন্তরকোষীয় তরলের পরিমাণ পাওয়া যায়।

জলসাম্য
WATER BALANCE

প্রতিদিন জলের গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও দেহের মোট দেহতরলের পরিমাণ অদ্ভুতভাবে অপরিবর্তিত থাকে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোন সময়সীমায় জলের গ্রহণ ও বর্জনের পরিমাণ অবশ্যই সমান হতে হবে। জলগ্রহণের পরিমাণ বর্জন বা রেচনের পরিমাণের চেয়ে বেশী হলে দেহে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় মানুষ **ধনাত্মক জলসাম্যে** (positive water balance) অবস্থান করে। তেমনি জলের গ্রহণের চেয়ে রেচনের পরিমাণ বেশী হলে মানুষ **ঋণাত্মক জলসাম্যে** (negative water balance) অবস্থান করে।

1. **ধনাত্মক ও ঋণাত্মক জলসাম্যের কারণ :** বিভিন্ন অবস্থায় দেহের জলসাম্য ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হয়। যেসব অবস্থায় মানুষ ধনাত্মক জলসাম্যে অবস্থান করে, তার মধ্যে প্রধান : a) শৈশবের ক্রমবৃদ্ধি, (b) গর্ভাবস্থা, (c) খাদ্যে অধিক স্নেহজাতীয় পদার্থের পরিবর্তে প্রোটিনের গ্রহণ, (d) দেহকে শীর্ণ করার উদ্দেশ্যে যেসব খাদ্যের প্রয়োজন তার গ্রহণ এবং (e) রোগমুক্তির পরবর্তী অবস্থা।

অপরপক্ষে যেসব অবস্থায় মানুষ ঋণাত্মক জলসাম্যে অবস্থান করে তার মধ্যে প্রধান : (a) দেহ থেকে রক্তপাত, (b) অগ্নিদগ্ধ হওয়া, (c) অস্ত্রোপচারের পরবর্তী সময়, (d) বমি, উদরাময়, অত্যধিক লালাক্ষরণ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত অবস্থা, (e) অচেতন অবস্থা, (f) অত্যধিক স্বেদক্ষরণে জলের হ্রাসপ্রাপ্তি (গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল), (g) যেসব রোগে সক্রিয়ভাবে খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্যের ব্যবহার সীমিত

হয় সেই সব অবস্থায় এবং (g) মধুমেহ, বহুমূত্র এবং অ্যাডিসোন রোগ (Addison's disease) প্রভৃতিতে।

2. **জলের গ্রহণ ও রেচন** (Intake and Output of Water) : মানুষ বিভিন্ন উৎস থেকে জল গ্রহণ করে, তেমনি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ থেকে জলের রেচন ঘটায়। জলগ্রহণের প্রধান উৎস : (a) **পানীয় :** জল, দুধ, শরবৎ, নুনের জল, চা, কফি, সুরা, ককোকোলাজাতীয় সবাত জল ইত্যাদি ; (b) **খাদ্যনিহিতজল :** ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, তরিতরকারী ইত্যাদি এবং (c) **দেহের বিপাকক্রিয়াজাত জল :** দেহে কার্বহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিনের জারণ থেকে সামান্য পরিমাণ জল উৎপন্ন হয়। এভাবে দেহে দৈনিক যে জল গৃহীত হয় তার পরিমাণ গড়ে 2500 মিলিলিটার (2000-3000 মিলিলিটার)। উষ্ণ আবহাওয়ায় এই পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে। 2নং তালিকায় বিভিন্ন উপায়ে গৃহীত জলের পরিমাণ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জলের রেচনের পরিমাণের সাম্যাবস্থা দেখান হয়েছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় জলের দৈনিক রেচনও তাই 2500 মিলিলিটার। যেসব প্রণালী দিয়ে জল দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় তার মধ্যে প্রধান, মূত্রত্যাগ। প্রায়

2নং তালিকা : দৈনিক গড় জলসাম্য।

জলের গ্রহণ (মিলিমিটারে)		জলের রেচন (মিলিমিটারে)	
পানীয় জল হিসাবে	1200	মূত্র	1400
খাদ্যনিহিত জল হিসাবে	1000	মল	200
দেহের জারণ প্রক্রিয়া	300	অতীন্দ্রিয় জলহানি (ত্বক ও ফুসফুসের মাধ্যমে)	800
		স্বেদক্ষরণ	100
মোট	2500	মোট	2500

1400 মিলিলিটার জল এভাবে দেহ থেকে নির্গত হয়। অন্যান্য রেচনপথের মধ্যে প্রধান মল, অতীন্দ্রিয় জলহানি (insensible water loss), স্বেদক্ষরণ ইত্যাদি। ব্যাপন ও বাষ্পীভবনের মাধ্যমে দেহচর্ম ও ফুসফুসের মধ্য দিয়ে এই জল দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

উষ্ণ আবহাওয়ায় জলের রেচন বৃদ্ধি প্রায়। প্রতিদিন প্রায় 3400 মিলি-লিটার জল এই অবস্থায় দেহ থেকে রেচিত হতে পারে। উষ্ণ আবহাওয়ায় ফুসফুসের মধ্য দিয়ে জলের রেচন হ্রাস পায়, তবে স্বেদক্ষরণের মাধ্যমে ইহা বৃদ্ধি পায়। প্রায় 1400 মিলিলিটার জল শুধুমাত্র স্বেদক্ষরণের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হতে পারে। অপরপক্ষে তেমনি মূত্র উৎপাদন হ্রাস পায়।

পেশীসঞ্চালন (exercise) দীর্ঘস্থায়ী ও ভারী হলে দেহের স্বেদক্ষরণ অত্যধিক হয়। ফলে প্রচুর জল দেহ থেকে নির্গত হয়। স্বেদক্ষরণের মাধ্যমে এই সময়ে 5000 মিলিলিটার বা তারও বেশী জল দেহ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। ফুসফুসের মধ্য দিয়েও প্রচুর পরিমাণে জল বাষ্পীভূত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হয়। মূত্র উৎপাদন এই সময়ে অত্যধিক হ্রাস পায়। দীর্ঘ ও ভারী পেশীসঞ্চালনে 6700 মিলিলিটার জল দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারে।

8. **জলসাম্যের নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Water Balance) :** জল সাম্যের নিয়ন্ত্রণে যেসব কারণ প্রভাববিস্তার করে তাদের মধ্যে প্রধান : (a) **তৃষ্ণা :** দেহে জলের ঘাটতি দেখা দিলে তৃষ্ণার উদ্রেক ঘটে এবং জল গ্রহণের মাধ্যমে তার নিবারণ করতে হয়। রক্তপরিমাণ বা বহিরকোষীর তরলের হ্রাস পেলে মুখের লালাক্ষরণ হ্রাস পায়, মুখ শুকিয়ে যায়, ফলে তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। (b) **বৃক্ক :** জলসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। দেহে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মূত্র উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি দেহে জলের পরিমাণ হ্রাস পেলে মূত্র উৎপাদন হ্রাস পায়। c) **উষ্ণতা ও আর্দ্রতা :** আবহ-উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে দেহচর্ম, স্বেদগ্রন্থি এবং শ্বাস-ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে জল নির্গত হয়। (d) **তড়িদ্-বিশ্লেষ্য :** সোডিয়াম ক্লোরাইড দেহতরলের সংগে সমান অভিস্রবণচাপে অবস্থান করে। দেহতরলে সোডিয়ামের হ্রাস বৃদ্ধিতে জলসাম্যেরও পরিবর্তন ঘটে। দেহ থেকে সোডিয়ামের রেচন বৃদ্ধি পেলে জলের রেচন বৃদ্ধি পায়। (e) **খাদ্য :** অধিক স্নেহজাতীয় খাদ্যের বদলে কার্বহাইড্রেট ও প্রোটিন বেশী খেতে দিলে দেহ অধিক জল ধরে রাখতে পারে। তেমনি কার্বহাইড্রেট ও প্রোটিনের বদলে অধিক স্নেহজাতীয় পদার্থ খেতে দিলে দেহ থেকে জলের রেচন বৃদ্ধি পায়। (f) **হাইপোথালামাস :** হাইপোথালামাস ADH হরমোনের ক্ষরণের মাধ্যমে জলের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে। (g) **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি :**

অ্যাড্রেন্যালের বহিঃস্তরীয় হরমোন, বিশেষ করে মিনার‍্যালোকর্টিকোয়েড বৃক্কীয় রেচননালিকা থেকে লবণের বিশোষণ বৃদ্ধি করে এবং জলের বিশোষণও বৃদ্ধি পায়। পশ্চাৎপিটুইটারীজাত হরমোন ADH বৃক্কের দূরসংবর্ত রেচননালিকা থেকে জলের পুনর্বিশোষণ বৃদ্ধি করে এবং এভাবে সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

4. **জলমত্ততা** (Water Intoxication): কোন লোক দ্রুত কয়েক লিটার জল পান করলে অথবা প্রচুর পরিমাণ জলকে শিরার মধ্য দিয়ে তার দেহে ইন্জেক্ট করলে তার মধ্যে **জলমত্ততা** দেখা দেয়। জলমত্ততার উপসর্গ অধিকাংশই স্নায়ুগত। জলমত্ততার প্রধান লক্ষণ: রোগীর চালচলনে অস্বাভাবিকতা, কখনও কখনও পেশী আক্ষেপ (convulsions) বা আচ্ছন্নভাব। এছাড়া পেশী দৌর্বল্য, অন্ত্রপাকাশয়ের বিপর্যয়, হৃৎস্পন্দনের অস্বাভাবিকতা (cardiac arrythmia) ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।

জলমত্ততার প্রধান কারণ: সমগ্র দেহকোষের বিপাকক্রিয়ার বিপর্যয়। কোষগত তড়িদ্‌বিশ্লেষ্যের (electrolytes) তীব্রতার হ্রাস থেকে বিপাকক্রিয়ার বিপর্যয় দেখা দেয়। বৃক্কের মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণে জলের রেচনের সময় প্রচুর তড়িদ্‌বিশ্লেষ্যও দেহ থেকে নির্গত হয়। ফলে দেহকোষের তড়িদ্‌-বিশ্লেষ্য লঘু হয়ে আসে।

কলারস
TISSUE FLUID

কলারস দেহের অভ্যন্তরে এমন একটি আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সৃষ্টি করে যা কলাকোষকে বেষ্টন করে থাকে এবং তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি, অক্সিজেন ইত্যাদির যোগান দেয়। তাছাড়া কলারস রক্তজালিকা, কলাকোষ এবং লসিকার মধ্যে সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করে। কলাস্থানে এর পরিমাণ প্রায় 12 লিটার।

1. **কলারসের উপাদান** (Composition of Tissue Fluid): বিশুদ্ধ কলারস সংগ্রহ করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। কলারসের সঠিক উপাদান নির্ণয় তাই অনেকটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে সাধারণভাবে কলারসের উপাদান লসিকার উপাদানের মত, পার্থক্য শুধু প্রোটিনের পরিমাণের। কলারসে প্রোটিন প্রায় অনুপস্থিত বললেই হয়, ফলে কলারসের অভিস্রবণ চাপও যথেষ্ট কম।

2. **কলারসের উৎপাদন** (Formation of Tissue Fluid) : কলারস দুটো উৎস থেকে উৎপন্ন হয়। প্রথম ও প্রধান উৎস রক্তজালিকা এবং দ্বিতীয় উৎস কলাকোষের নিজস্ব সক্রিয়তা। রক্তজালিকা থেকে কলারসের উৎপাদন প্রধানত নির্ভর করে **রক্তজালিকার ভেদ্যতা** এবং রক্তনালী ও কলারসের **জলচাপ ও অভিস্রবণ চাপের অন্তর ফলের উপর**। রক্তজালিকার উপধমনী প্রান্তে রক্তচাপ 32 মিলিমিটার এবং অভিস্রবণ চাপ 25 মিলিমিটার পারদচাপের সমান। আবার উপধমনীপ্রান্তে কলারসের চাপ এবং কলাস্থানের প্রোটিন-কোলয়েডীয় চাপ যথাক্রমে 1 মিলিমিটার এবং 4 মিলিমিটার পারদচাপের সমান। অতএব উপধমনীপ্রান্তে মোট পরিস্রাবণ চাপ (32+4)−(1+25) মিলিমিটার বা +10 মিলিমিটার পারদচাপের সমান 11-3 নং চিত্র)।
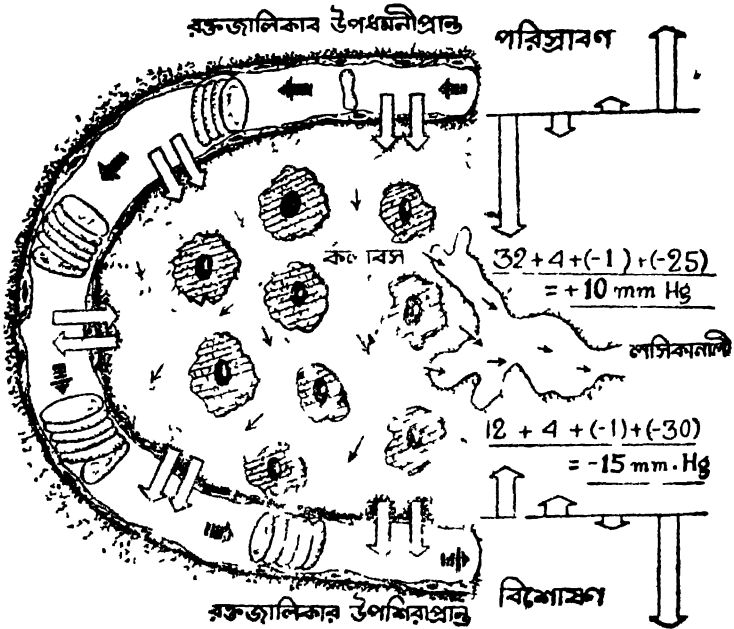
11-3 নং চিত্র : কলারসের উৎপাদন।

অপরপক্ষে রক্তজালিকার উপশিরাপ্রান্তে কোলয়েড অভিস্রবণ চাপ 30 মিলি-মিটার এবং রক্তচাপ 12 মিলিমিটার পারদচাপের সমান। আবার একইভাবে কলাস্থানের তরলের চাপ ও প্রোটিনের অভিস্রবণ চাপ যথাক্রমে 1 ও 4 মিলি-

মিটার পারদচাপের সমান। **অতএব উপশিরাপ্রান্তে বিপরীত পরিস্রাবণচাপ** (অর্থাৎ কলাস্থান থেকে রক্তজালিকার দিকে বা বিশোষণচাপ -15 মিলিমিটার পারদচাপের সমান। রক্তজালিকার উপধমনীপ্রান্তে তাই তরলপদার্থ কলাস্থানে প্রবেশ করে এবং উপশিরা প্রান্তে পুনরায় নির্গত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে।

কলাকোষের বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি পেলে বিপাকলব্ধ পদার্থ এবং জলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ফলে কলারসের পরিমাণেরও বৃদ্ধি ঘটে।

3. **কলারসের কার্যাবলী** (Functions of Tissue Fluid) **:** (a) কলাকোষ কলারসে ভেসে থাকে, ফলে তারা প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, পুষ্টি ইত্যাদি সহজেই সংগ্রহ করতে পারে। (b) কলারস বিপাকক্রিয়াজাত বর্জ্য-পদার্থ বহিষ্কারে সহায়তা করে। (c) কলারস জল, লবণ, খাদ্যবস্তু প্রভৃতির সঞ্চয়ভাণ্ডার হিসাবে কার্য করে। (d) কোন কারণে রক্তের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে কলারসই যথাক্রমে তা পূরণ বা গ্রহণ করে এবং এভাবে রক্ত-পরিমাণের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে।

শোথ
Edema

কলাস্থানে অধিক পরিমাণে তরলপদার্থ সঞ্চিত হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে **শোথ** বলা হয়। রক্তজালিকা, কলাস্থান ও লসিকাবাহের মধ্যে তরল পদার্থের বিনিময়-ব্যবস্থায় ত্রুটি দেখা দিলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। যে সব কারণ শোথের জন্য দায়ী তারা নিম্নরূপ।

1. **শোথের জন্য দায়ী কারণসমূহ** (Factors Responsible for Edema) **:** (a) প্লাজমাপ্রোটিনের গাঢ়ত্ব হ্রাস পেলে, বিশেষ করে অ্যালবুমিন 2·5-3·0 শতাংশে নেমে এলে কলাস্থানে তরলপদার্থ সঞ্চিত হতে থাকে। (b) রক্তজালিকার ভেদ্যতা বৃদ্ধি পেলে কলারসের আধিক্য ঘটে। (c) রক্তজালিকার আভ্যন্তরীণ রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে (সাধারণ বা স্থানীয়ভাবে) অধিক পরিমাণ তরলপদার্থ কলাস্থানে প্রবেশ করে। (d) রক্তজালিকার প্রসারণে পরিস্রাবণ-তলের বৃদ্ধিতে কলাস্থানে তরলপদার্থের সঞ্চয়বৃদ্ধি পায়। (e) লসিকাবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে বা (f) শিরাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে কলারসের বৃদ্ধি ঘটে।

2. **শোথের শ্রেণীবিন্যাস** (Classification of Edema) **:** শোথ বিশেষ বিশেষ রোগে প্রধানত রোগের লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পায়। (a) **হার্দ শোথ** (cardiac edema) **:** রক্তাধিক্যে হৃৎপিণ্ডের অবসাদ দেখা দিলে (congestive heart failure) শোথের আবির্ভাব ঘটে। **ডিজিটালিজ** (digitalis), **ল্যানাটোসাইড** (lanatoside) এবং অন্যান্য ওষুধের প্রয়োগে হার্দ শোথের নিরাময় সম্ভবপর। (b) **বৃক্কীয় রোগজনিত শোথ** (edema due to renal disease) **:** দীর্ঘস্থায়ী বৃক্কপ্রদাহ রোগে chronic nephritis) কখনও কখনও শোথ দেখা দেয়। বৃক্করোগে অধিক পরিমাণ প্রোটিন মূত্রের সংগে নির্গত হয়, ফলে প্লাজমার কোলয়েড অভিস্রবণচাপ হ্রাস পায় এবং অধিক পরিমাণ তরল কলাস্থানে জমা হয়। (c) **শিরাতে যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতাজনিত শোথ** (edema due to mechanical obstruction of veins) **:** দেহাংগের কোন শিরাতে তন্তুময়তা, থ্রম্বোসিস প্রভৃতি কারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে রক্তজালিকার ভেদ্যতা, পরিস্রাবণতল এবং আভ্যন্তরীণ রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে শোথের আবির্ভাব ঘটে। (d) **প্রদাহজনিত শোথ** (inflammatory edema) **:** দেহাংগের প্রদাহজনিত অবস্থায় ব্যাক্টেরীয় অধিবিষ বা অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ রক্তজালিকার প্রাচীরের ক্ষতি ঘটায়, ফলে রক্তজালিকার ভেদ্যতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং কলারসের আধিক্য ঘটে। **অ্যাস্পিরিন** (aspirin), **মর্ফিন** (morphin), **ডেমারোল** (demerol) প্রভৃতি ওষুধ এ জাতীয় শোথের নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। (e) **অপুষ্টিজনিত শোথ** (nutritional edema) **:** রক্তাল্পতা বা অন্যান্য অপুষ্টিজনিত অবস্থায় শোথের আবির্ভাব ঘটে। ভিটামিনের অভাব, খাদ্যে প্রোটিন বা স্নেহপদার্থের অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে কলারসের আধিক্য দেখা যায়। (f) **লসিকাবাহের প্রতিবন্ধকতাজনিত শোথ** (edema due to lymphatic obstruction) **:** লসিকাগ্রন্থি বা লসিকাবাহ **ফাইলেরিয়া** (filaria) জাতীয় সূক্ষ্ম কীটের দ্বারা অবরুদ্ধ হলে (elephantiasis) এজাতীয় শোথের আবির্ভাব ঘটে। প্রধানত ইহা শিশুদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। (g) **অনভ্যস্ত পেশীসঞ্চালনজাত শোথ** (edema due to unfamiliar exercise) **:** অনভ্যস্ত পেশীসঞ্চালনে অধিক পরিমাণে বিপাকলব্ধ পদার্থের সঞ্চয়ের ফলে কলারসের আধিক্য ঘটে। (h) **তাপীয় শোথ** (heat edema) **:** অত্যধিক উত্তাপে রক্তজালিকার ভেদ্যতার

পরিবর্তনে শোথের আবির্ভাব ঘটতে পারে। (i) **দানবীয় শোথ** (giant edema) ঃ অতি দ্রুততার সংগে এ জাতীয় শোথ হাত, পা, মুখমণ্ডল, স্ত্রী-পুরুষের বহির্জনাংগ, স্বরযন্ত্র প্রভৃতিতে প্রকাশ পায়। শোথস্থানে হিস্টামিন-জাতীয় পদার্থের মুক্তিতে বা কোন কোন এলার্জিতে (ellergy) এ ধরনের শোথ পরিলক্ষিত হয়।

লসিকা ও লসিকানালী

LYMPH AND LYMPHATICS

1. **লসিকানালীর গঠন ও বিন্যাস** (Structure and Arrangement of Lymph Vessels) ঃ প্রান্তীয় লসিকাতন্ত্র রক্তজালিকার মতই অসংখ্য সূক্ষ্ম লসিকানালীর সমন্বয়ে গঠিত। রক্তজালিকার মত এরা লসিকাজালকের সৃষ্টি করে এবং কলাস্থানের তরলপদার্থকে একটু একটু করে নিষ্কাষণ করে। লসিকা-নালী একমুখী বদ্ধনালিকা হিসাবে উৎপন্ন হয় এবং পরস্পর মিলিত হয়ে আরও বৃহদাকারের লসিকানালীর সৃষ্টি করে। এই লসিকানালী এরপর লসিকাগ্রন্থির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে এবং আরও অধিক সংখ্যক উপলসিকা-নালীর সংগে মিলিত হয়ে ধীরে ধীরে স্ফীত হয়ে ওঠে। দেহের সমগ্র লসিকা-নালী এরপর প্রধান ও বৃহৎ লসিকানালীতে মিলিত হয়। এই দুটো বৃহৎ লসিকানালী যথাক্রমে **দক্ষিণ লসিকানালী** (right lymphatic duct) এবং **বক্ষ লসিকানলী** (thoracic lymphatic duct) নামে পরিচিত। দক্ষিণ লসিকা-নালী দক্ষিণ অধঃকণ্ঠাস্থি-শিরা এবং বক্ষ লসিকানালী বাম অধঃকণ্ঠাস্থি শিরায় (subclavian vein) উন্মুক্ত হয়।

প্রান্তীয় লসিকানালীর প্রাচীর অতি সূক্ষ্ম অন্তরাবরণী কোষের দ্বারা গঠিত। কোষগুলো তন্তুময় অন্তঃকোষপদার্থের (intercellular cement substane) আস্তরণের দ্বারা সংযুক্ত থাকে। বৃহৎ লসিকানালীর প্রাচীরে পেশীতন্তু পরিলক্ষিত হয়। লসিকানালীতে অসংখ্য কপাটিকা দেখতে পাওয়া যায়। এদের উপস্থিতিতে লসিকাপ্রবাহ একমুখী হয় এবং পেশীসঞ্চালন ও

শ্বাসকার্যের বিচলনে (movements) ধীরে ধীরে বক্ষ-শিরার দিকে অগ্রসর হয় (11-4নং চিত্র)।
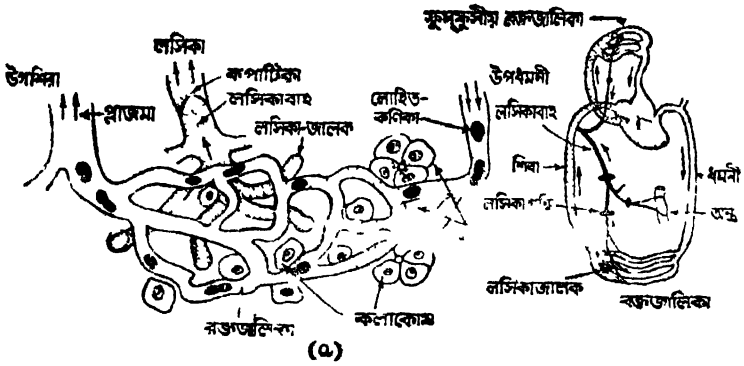
11-4নং চিত্র : রক্তনালী ও লসিকানালীর সম্পর্ক। ডানপাশে রক্তসংবহনের সংগে লসিকাপ্রণালীর সম্পর্ক।

লসিকানালী প্রধানত ত্বক, অধস্ত্বকীয় কলা, যকৃতের ক্যাপ্সুল ও সেপ্টামে (septa) এবং শ্বাসনালী, পাকস্থলী, অন্ত্রনালী, জনন-মূত্রনালী প্রভৃতির আস্তরণে (linings) অবস্থিত। অন্ত্রের ভিলাসে (villus) এরা দুগ্ধবাহ বা **ল্যাক্টিয়েল** (lacteal) নামে পরিচিত। ত্বকে অত্যধিক পরিমাণে লসিকাজালক দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন দেহাংশে এরা অনুপস্থিত থাকে। যেমন, অস্থিমজ্জা, ফুসফুসের বায়ুথলী, প্লীহামজ্জা এবং স্নায়ুতন্ত্রে। স্নায়ুতন্ত্রে মস্তিষ্কস্নায়ুরস লসিকার স্থান দখল করে। রক্তসংবহনের সংগে লসিকাপ্রণালীর সম্পর্ক 11-4নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

2 **লসিকার উপাদান** (Composition of Lymph) : লসিকাকে পরিবর্তিত কলারস (tissue fluid) বলা চলে। লসিকা ঈষৎ ক্ষারধর্মী, স্বচ্ছ হরিদ্রাভ তরলবিশেষ। স্নেহজাতীয় খাদ্যবস্তুর গ্রহণে বক্ষ-লসিকানলীতে প্রচুর পরিমাণে স্নেহকণার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। লসিকা সেখানে দুধের বর্ণ ধারণ করে।

কুকুরের বক্ষ লসিকানালীস্থিত লসিকায় প্রতি ঘনমিলিমিটারে প্রায় এক থেকে কুড়িহাজার শ্বেতকণিকা দেখতে পাওয়া যায়। লসিকার 94 শতাংশই জল এবং বাকী 6 শতাংশ কঠিন পদার্থে গঠিত।

কঠিন পদার্থের মধ্যে রয়েছে 2·0-4·5 শতাংশ প্রোটিন, যা প্লাজমা-

প্রোটিনের প্রায় অর্ধাংশ। অ্যাল্‌ব্যুমিন, গ্লোবিউলিন ও ফাইব্রিনোজেনের পরিমাণ লসিকাতে খুব অল্প থাকায় লসিকা ধীরে ধীরে তঞ্চিত হয়।

প্রোটিন ছাড়া লসিকাতে সামান্য পরিমাণে স্নেহপদার্থ, কার্বহাইড্রেট (0·73 গ্রা%), ইউরিয়া (0·024 গ্রা%), এন. পি এন. (NPN—0 035 গ্রা%) ক্রিয়েটিন, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। লসিকাতে ক্লোরাইড, ও গ্লুকোজের পরিমাণ প্লাজমায় এদের পরিমাণের চেয়ে সুস্পষ্টভাবে অধিক, তবে প্রোটিন, মোট ফসফরাস এবং ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্লাজমার চেয়ে লসিকাতে কম (3 নং তালিকা)।

3নং তালিকা : প্লাজমা ও লসিকার তুলনামূলক উপাদান।

উপাদান	প্লাজমা	লসিকা
প্রোটিন (গ্রাম শতাংশ)	6 2(5 5 –7 2)	3 3(1 4—4 6)
ক্যালসিয়াম মিলিগ্রাম 100 মি. লি.	11 7(10 [illegible]—12 [illegible])	9 8(8 9—10·9)
মোট ফসফরাস (মি. গ্রা. 100 মি লি)	22(18 3—26 1)	[illegible](10 3—13·7)
ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড হিসাবে মি. গ্রা 100 মি মি.)	67[illegible](649—721)	711(690—730
গ্লুকোজ (মি গ্রা 100 মি. লি.)	1[illegible]3(112—143)	1[illegible]2 2 107—144)
ইউরিয়া (মি গ্রা /100 মি. লি.)	21·7(17 [illegible]—28 0)	23·5(1[illegible] 8—33 3)

3. **লসিকার উৎপাদন** (Formation of Lymph)**:** লসিকা কলারস থেকে উৎপন্ন হয়। যে সব অবস্থায় রক্তজালিকা থেকে কলাস্থানে তরলের বিনিময় বৃদ্ধি পায় সে সব অবস্থায় লসিকার উৎপাদন ও প্রবাহেরও বৃদ্ধি ঘটে। রক্তজালিকা থেকে লসিকাজালক অধিকতর ভেদ্য বা প্রবেশ্য। প্রোটিন

বা কেলাসপদার্থের প্রবেশে তারা অতি সামান্যই বাধা সৃষ্টি করে। বস্তুতে লসিকাজালক এমন এক বিশেষ ধরণের নালিকা হিসাবে কার্য করে, যার সাহায্যে প্রোটিন রক্তবাহে প্রত্যাবর্তন করে। তাছাড়া লসিকাজালক কলাস্থানের অপরাপর কোলয়েড-পদার্থ বা অন্যান্য পদার্থকে শোষণ করে।

লসিকা উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহ: যেসব ভৌত কারণ কলারসের পরিবর্তনের জন্য দায়ী, তারা লসিকা উৎপাদনকেও নিয়ন্ত্রিত করে। যথা, (a) **রক্তজালিকাস্থিত চাপ** (capillary pressure : রক্ত-জালিকার আভ্যন্তরীণ চাপ বৃদ্ধি পেলে লসিকা উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শিরায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে এই পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। (b) **অভিস্রবণ চাপ** (osmotic pressure): যে সব পদার্থ রক্তের কোলয়েড-অভিস্রবণচাপ হ্রাস করে তারা লসিকা উৎপাদন বৃদ্ধি করে (c) **রক্তজালিকার পরিস্রাবণ-তলের বৃদ্ধি** increase of filtering surface of capillary): যে সব কারণ রক্তজালিকার পরিস্রাবণতলের বৃদ্ধি ঘটায় (স্থানীয় উষ্ণতা রক্তজালিকার আভ্যন্তরীণ চাপ ইত্যাদির বৃদ্ধি), তারা লসিকার উৎপাদন বৃদ্ধি করে। (d) **রক্তজালিকার ভেদ্যতা** (capillary permeability): রক্ত জালিকার ভেদ্যতা বৃদ্ধি পেলে লসিকাউৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। হিস্টামিন, ব্র্যাডিকাইনিন, পেপটোন, বিজাতীয় প্রোটিন ইত্যাদি রক্তজালিকার ভেদ্যতা পরিবর্তিত করে, ফলে লসিকা উৎপাদনেরও পরিবর্তন হয়। (e) **অক্সিজেন সরবরাহ** (supply of oxygen): অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ হলে বা হ্রাস পেলে রক্তজালিকার ভেদ্যতা পরিবর্তিত হয় এবং লসিকাউৎপাদন বৃদ্ধি পায়। (f) **উষ্ণতা** (temperature): দেহাংশের বিশেষ অংশের উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধিতে রক্ত-জালিকার ভেদ্যতারও হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। (g) **বিপাকক্রিয়া** (metabolism): দেহের কোন অংশের বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি পেলে সেই অঞ্চলের লসিকাপ্রবাহও বৃদ্ধি পায়। (h) **সমসারক ও অতিসারক দ্রবণ** (isotonic and hypertonic solutions): শারীরবৃত্তীয় লবণজল বা অতিসারক দ্রবণ (গ্লুকোজ, সোডিয়াম ক্লোরাইড বা ফসফেটের তীব্র দ্রবণ) শিরাতে প্রবেশ করালে লসিকাপ্রবাহের বৃদ্ধি ঘটে।

4. **লসিকার সংবহন** (Circulation of Lymph): লসিকানালীতে অবস্থানকারী অসংখ্য কপাটিকা লসিকা প্রবাহকে একমুখী করে রাখে। সাধারণ অবস্থায় রক্তাস্থিত লসিকানালীর লসিকাচাপ অত্যন্ত কম (0-4 মিলিমিটার পারদ-

চাপের সমান)। অপর পক্ষে প্রান্তীয় লসিকাবাহে লসিকাচাপ 8-10 মিলিমিটার পারদচাপের সমান। ফলে লসিকা সংবহন বজায় রাখতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় না। মানুষের বক্ষস্থিত লসিকানালীতে লসিকার প্রবাহ মিনিটে 1-15 মিলিলিটার। এছাড়া পেশীসঞ্চালন ও শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত কিলন লসিকাসংবহনের সহায়ক হিসাবে কার্য করে।

5. **লসিকার কার্যাবলী** (Function of Lymph) : (a) লসিকার প্রধান কার্য কলাস্থানে প্রোটিনকে রক্তসংবহনে ফিরিয়ে দেওয়া। (b) লসিকাবাহের মধ্য দিয়ে স্নেহপদার্থ লসিকায় বিশোষিত হয় এবং লসিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। c) দেহের যে সব অংশে রক্ত পেঁছিতে পারে না, লসিকা সেসব অংশে অক্সিজেন ও পুষ্টির যোগান দেয়। (d) লসিকাস্থিত লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট দেহের প্রতিরক্ষার কার্যে অংশগ্রহণ করে এবং ব্যাকটেরিয়া, বিজাতীয় প্রোটিন ইত্যাদিকে কলাস্থান থেকে স্থানান্তরিত করে। (e) রক্তসংবহনে এক অংশ থেকে অপর অংশে তরলপদার্থের পরিবহন করে দেহতরল বা দেহরসের (body fluid) পুনর্বিস্তৃতিতে অংশগ্রহণ করে। (f) কলারসের পরিমাণ ও উপাদান বজায় রাখে।

প্রশ্নাবলী

1. দৈহিক ওজনের সংগে দেহতলের সম্পর্ক দেখাও। বিভিন্ন তরলস্থানের উল্লেখ কর এবং কিভাবে এসব তরলস্থানের পরিমাপ করা যায় বিবৃত কর।

2. জলসাম্য বলতে কি বোঝায় দেহে জলসাম্য নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সংক্ষেপে বিবৃত কর। জলমত্ততার ব্যাখ্যা কর। (C. U H. '75)

3. কলারস উৎপাদনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যা জান বিবৃত কর। (C. U H. '73)

4. প্লাজমা ও লসিকা বলতে কি বোঝ? মানুষের প্লাজমার পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ করা যায়। (C. U. '78)

5. লসিকার উৎপাদন, উপাদান ও সংবহন সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C. U. H '76)

6. লসিকার উপাদান কিরূপ ? এর উৎপাদন ও কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। (C.U.H. '76)

7. লসিকা কি ? প্লাজমা ও লসিকার উপাদানের তুলনামূলক আলোচনা কর। লসিকার উৎপাদন, সংবহন ও কার্যাবলী বিবৃত কর।

8. লসিকাগ্রন্থির আণুবীক্ষণিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা কর। তাদের কার্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

9. টীকা লিখ :—

(a) শোথ, (b) কলারস (C. U. '78) (c) কলারস ও লসিকার উপাদানের পার্থক্য, (d) কলারসের উৎপাদন প্রক্রিয়া।

হৃৎপিণ্ডের পাম্পক্রিয়ার জন্যই মানুষের রক্ত সমগ্র দেহের একমাত্র পরিবহন সংস্থা হিসাবে দেহের অংগ ও কলাকোষের প্রয়োজনীয় চাহিদার যোগান দিতে পারে। দেহের অংগ ও কলাকোষ এভাবে অক্সিজেন, কার্বহাইড্রেট, অ্যামাইনোঅ্যাসিড, ফ্যাট, হরমোন ইত্যাদির সরবরাহ লাভ করে এবং তাদের বিপাকক্রিয়া থেকে উৎপন্ন বর্জ্যপদার্থ রক্তসংবহনে পরিত্যাগ করে। রক্তসংবহন এই বর্জ্য পদার্থসমূহকে দেহ থেকে নির্গত করতে সহায়তা করে। রক্তসংবহনের অন্যান্য পরিপূরক কার্যের মধ্যে প্রধান : দেহচর্মের রক্ত-প্রবাহ দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং বৃক্কের মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ মূত্র উৎপাদন করে ইত্যাদি।

1. **সংবহনের অন্যান্য কার্যকরী একক** (Other functional unit of circulation) : হৃৎপিণ্ডকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে, আর যেসব সংস্থা রক্তসংবহনের সংগে জড়িত, তারা হল : (a) **ধমনী** : হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয় এবং বন্ধ নল হিসাবে ফুসফুস বা সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ে। রক্তকে এরা হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুস বা অংগ ও কলাকোষের দিকে বয়ে নিয়ে যায়, (b) **রক্তজালিকা** : পরস্পর সংযোগী সূক্ষ্ম প্রণালী হিসাবে এরা ধমনীর প্রান্তদেশে বিস্তৃত থাকে। পাতলা প্রাচীরের মধ্য দিয়ে রক্ত ও কলারসের মধ্যে বিভিন্ন-প্রকার পদার্থের আদান-প্রদানে এরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, (c) **শিরা** : এরা রক্তজালিকা থেকে উৎপন্ন হয় এবং রক্তকে হৃৎপিণ্ডের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তন্ত্রীয় ধমনী বিশুদ্ধ রক্ত বা অক্সিজেনযুক্ত রক্তকে যেমন অংগ ও কলাকোষের দিকে নিয়ে যায় তেমনি তন্ত্রীয় শিরা অবিশুদ্ধ বা অক্সিজেনলঘূকৃত রক্তকে হৃৎপিণ্ডের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ফুসফুসীয় রক্তসংবহনের ক্ষেত্রে ধমনী ও শিরার কাজ ঠিক বিপরীত।

2. **দৈবত সংবহনের কেন্দ্র** (Center for double circulation) : মানুষের হৃৎপিণ্ড ক্রমবিবর্তনের ধারায় সর্বাপেক্ষা উন্নত ও দ্বৈতসংবহনের কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত। মানুষের মত অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখীদের হৃৎপিণ্ডও উন্নত স্তরের। মাছের হৃৎপিণ্ড মাত্র দুটো প্রকোষ্ঠের (অলিন্দ ও নিলয়) সমন্বয়ে গঠিত। তার মধ্যে একটি গ্রাহক প্রকোষ্ঠ (অলিন্দ) এবং অন্যটি পাম্পকারী প্রকোষ্ঠ (নিলয়)। উভচর বা ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড তিনটি প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত। তার মধ্যে দুটো অলিন্দ (atria) এবং একটি নিলয় (ventricle)। সরীসৃপের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে, তবে নিলয় দুটি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে

তারা পরস্পর থেকে পৃথক থাকে বটে, তবে সছিদ্র পর্দা দ্বারা যুক্ত থাকে। মানুষ, স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখীদের হৃৎপিণ্ড চারটি পৃথক প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত। তাদের মধ্যে দুটো অলিন্দ এবং দুটো নিলয়। দুটো অলিন্দ গ্রাহক প্রকোষ্ঠ হিসাবে কাজ করে, অপরপক্ষে নিলয় দুটো প্রধানত পাম্পকারী প্রকোষ্ঠ হিসাবে সকর্মে নিযুক্ত থাকে। মানুষ এবং এসব প্রাণীর হৃৎপিণ্ড **দ্বৈত সংবহনের** কেন্দ্রস্থল হিসাবে কাজ করে। এদের একটি **হ্রস্বতর সংবহন** (lesser circulation) বা **ফুসফুসীয় সংবহন** (pulmonary circulation) এবং অপরটি **দীর্ঘতর সংবহন** (great circulation) বা **তন্ত্রীয় সংবহন** (systemic circulation)।

3 **মানুষের হৃৎপিণ্ডের ওজন** (Weight of human heart) : পুরুষের হৃদযন্ত্রের ওজন স্ত্রীলোকের হৃদ্‌যন্ত্রের ওজনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেশী। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ওজন তার দৈহিক ওজনের প্রায় 0·43 শতাংশ এবং একজন পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের হৃদ্‌যন্ত্রের ওজন তার দৈহিক ওজনের প্রায় 0·4 শতাংশ। তবে বয়স বৃদ্ধির সংগে হৃৎপিণ্ডের ওজনবৃদ্ধি সমানুপাতিক নয় বা দৈহিক ওজনের সংগেও হৃৎপিণ্ডের ওজন সম্পর্কযুক্ত নয়। স্ত্রী পুরুষের হৃৎপিণ্ডের গড় ওজন, তাদের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের (chamber) ওজন এবং তারা কতটা পুরু, তুলনামূলকভাবে 1 নং তালিকায় তা দেখান হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রে বাম নিলয়ের (left ventricle) ওজন দক্ষিণ নিলয়ের ওজনের প্রায় দ্বিগুণ এবং বাম নিলয় দক্ষিণ নিলয় থেকে প্রায় 3 গুণ অধিক পুরু।

1 নং তালিকা

স্ত্রী-পুরুষের হৃৎপিণ্ডের তুলনা

লিংগ	মোট গড় ওজন (গ্রাম)	পেশীর গড় ওজন (গ্রাম)	বাম নিলয়ের ওজন (গ্রাম)	দক্ষিণ নিলয়ের ওজন (গ্রাম)	অলিন্দের মোট ওজন (গ্রাম)	বাম নিলয়ের স্থুলতা (মিলিমিটার)	দক্ষিণ নিলয়ের স্থুলতা (মিলিমিটার)
পুরুষ	328	254	94	46	49	15	4
স্ত্রীলোক	244	186	67	33	39	14	4

দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। দক্ষিণ অলিন্দ থেকে ইহা দক্ষিণ নিলয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। দক্ষিণ নিলয় এই রক্তকে ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে প্রেরণ করে। ফুসফুসে রক্ত অক্সিজেনযুক্ত হয় এবং ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। বাম অলিন্দ এই রক্তকে বাম নিলয়ে নিক্ষেপ করে। বাম নিলয় আবার একইভাবে এই রক্তকে মহাধমনীর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে পাঠিয়ে দেয়। 12-4 নং চিত্রে হৃৎপিণ্ডের এই সংবহনপ্রণালী প্রদর্শিত হয়েছে।

6. **হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা** (Valves of the heart) : রক্তসংবহনের গতি যাতে একমুখী হয় এবং কোনক্রমেই যাতে ধমনী ও শিরারক্তের সংমিশ্রণ না ঘটে, তার জন্য হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে চার প্রস্থ কপাটিকা সক্রিয় রয়েছে। প্রথম প্রস্থ দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয়ের ছিদ্রপথে অবস্থিত। এই কপাটিকাকে **ত্রি-সূঁচালমুখ কপাটিকা** (tricuspid valve) বলা হয়। বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যে তেমনি রয়েছে **মাইট্রাল** (mitral) বা **দ্বি-সূঁচালমুখ কপাটিকা** (bicuspid valve)। মহাধমনী ও ফুসফুসীয় ধমনীর ছিদ্রপথে একটি করে ত্রিমুখ **অর্ধচন্দ্র কপাটিকা** (semilunar valve) অবস্থিত। প্রতিটি কপাটিকাই একটি নির্দিষ্ট দিকে উন্মুক্ত হয় এবং বিপরীত দিকে বন্ধ হয়। অলিন্দনিলয় কপাটিকা শুধুমাত্র নিলয়ের দিকে উন্মুক্ত হয়, কিন্তু বিপরীত দিকে রুদ্ধ থাকে। অর্ধচন্দ্র কপাটিকা তেমনি নিলয়ের বহির্মুখে উন্মুক্ত হয় কিন্তু নিলয়ের দিকে বন্ধ থাকে।

হৃৎপেশীর ধর্ম

Properties of Cradiac Muscle

হৃৎপিণ্ডের পেশীকে দুভাবে ভাগ করা যায়। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের সংগে যুক্ত পেশীকে সংকোচী পেশী এবং হৃৎপ্রবাহের উৎপত্তি ও বিস্তারের সংগে সম্পর্কযুক্ত রূপান্তরিত হৃৎপেশীকে সংযোগীকলা নামে অভিহিত করা যায়।

এই উভয়প্রকার হৃৎপেশীর ধর্মকে মোটামুটিভাবে 7 ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : (1) উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া ও সংকুচিত হওয়া (excitability and contractility), (2) পরিবাহিতা (conductivity), (3) ছন্দময়তা (rhythmicity), (4) নিঃসাড়কাল (refractory period), (5) সিঁড়িক্রম ঘটনা (staircase phenomenon), (6) সর্বাধিক-বা-একেবারেই নয় প্রতিক্রিয়া (all-or-none response), (7) পেশীটান (tonicity)।

1. **উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া ও সংকুচিত হওয়া :** হৃৎপেশী সঠিক উদ্দীপনা পেলে উত্তেজিত হয় এবং সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়। ব্যতিক্রম রূপান্তরিত হৃৎপেশী। মায়োফাইব্রিলস্থিত অ্যাক্‌টিন ও মায়োসিন ফিলামেণ্ট ATP এবং Ca^{++} আয়নের উপস্থিতিতে সংকুচিত হয়। Ca^{++} আয়নের উপস্থিতিতে ATP-এর বিশ্লিষ্টকারী মায়োসিন এনজাইম সক্রিয় হয়। Ca^{++} আয়নের অপসারণে এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়, ফলে হৃৎপেশী শ্লথ হয়ে পড়ে।

2. **পরিবাহিতা** (Conductivity) **:** পরিবাহিতা প্রধানত রূপান্তারিত হৃৎপেশীর একটি বিশেষ ধর্ম। হৃৎপিণ্ডের S.A. নোডে (node) যে **হৃৎপ্রবাহের** (Cardiac impulse) সৃষ্টি হয়, তা ইনটারনোডাল বাণ্ডেলের মাধ্যমে অলিন্দ (atria) পেশীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিশেষে A. V নোডে পৌঁছায়। A. V. নোড থেকে এই প্রবাহ এরপর **হিজের** (His) বাণ্ডেল ও তার শাখাপ্রশাখাব মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগে (apex) পেঁছয়। সেখান থেকে **পারকিনজি** তন্তুর দ্বারা সমগ্র নিলয়পেশীতে ছড়িয়ে পড়ে। দেখা গেছে S.A এবং A.V. নোডের কলাকোষের পরিবাহিতা প্রতি সেকেণ্ডে 0·05 মিটার। নিলয়পেশীতে ইহা প্রতি সেকেণ্ড 1 মিটার। হিজেব বাণ্ডেল ও পারকিনজি (purkinje) তন্তুতে যথাক্রমে 1 ও 4 মিটার।

2নং তালিকা : হৃৎপেশীতে পবিবাহিতা।

হৃৎপেশী	পরিবাহিতা (মিটার/সেকেণ্ড)
SA নোড	0·05
ইনটারনোডাল বাণ্ডেল	1 00
AV নোড	0 05
হিজের বাণ্ডেল	1 00
পারকিনজি তন্তু	4·00
নিলয় পেশী	1·00

3. **ছন্দময়তা** (Rhythmicity) **:** হৃৎপেশীর সংকোচনের মধ্যে একটি নিজস্ব ছন্দ বা তাল রয়েছে, যে তাল বা ছন্দে তারা তাদের নিজস্ব স্পন্দন-প্রবাহ (impulse) উৎপাদন করতে সক্ষম। এদেরে·বিশেষ ধরনের ছন্দনিয়ামক কলা (pacemaker tissue) বলা হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের বিশেষ বিশেষ অংশের

পেশীকে পৃথক করে তাদের তড়িৎধর্মকে যাচাই করলে এই ধর্মের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখা গেছে S. A. নোডের ছন্দময়তা সর্বাপেক্ষা বেশী। এই অংশের পেশীকলা প্রতি মিনিটে 70-80 বার স্পন্দনপ্রবাহ উৎপন্ন করতে পারে। A V নোডে ইহা 40-60, অলিন্দের 60 এবং নিলয়পেশীতে 20 40। নোডের ছন্দময়তা সর্বাপেক্ষা বেশী বলে হৃৎপিণ্ডের এই বিশেষ অঞ্চলটি অন্যান্য অঞ্চলের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ S. A. নোডের ছন্দে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়।

ছন্দনিয়ামক কলার বৈশিষ্ট্য হল, তাদের ঝিল্লিবিভব (resting potential) স্থিতিশীল নয়। স্পন্দন প্রবাহের অন্তর্বর্তী সময়ে স্থিতিশীল ঝিল্লিবিভবের বদলে নিম্নলিখিত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক ক্রিয়াবিভব (action potential) উৎপাদনের পরই ঝিল্লিবিভব সুনির্দিষ্টভাবে হ্রাস পায় এবং এই হ্রাসপ্রাপ্তি ততক্ষণই চলে যতক্ষণ না পর্যন্ত তা প্রবাহের মোক্ষণ-মাত্রায় (firing level) পেঁছায়। ক্রিয়াবিভবের অন্তর্বর্তী স্থানে এধরনের মন্থর বিসমবর্তনকে (slow depolarization) **ছন্দ-নিয়ামক বিভব** (pacemaker potential) বা প্রাক্‌বিভব (prepotential) বলা হয় (12-5নং চিত্র)। এই বিভবের ঢাল (slope) বা নতি যত বেশী হবে, ছন্দনিয়ামক পেশী তত দ্রুত স্পন্দন-প্রবাহ উৎপাদন করবে। যেসব কারণ ছন্দনিয়ামক পেশীর স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে, তারা প্রধানত দেখা গেছে, প্রাক্‌বিভবের পরিবর্তন ঘটায়। অবশ্য কিছু কিছু অন্যান্য কারণও ঝিল্লি-বিভবের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই পরিবর্তন আনয়ন করে।

12-5নং চিত্র : ছন্দনিয়ামক পেশীর ঝিল্লিবিভব ও প্রাক্‌বিভব।

দেখা গেছে, K^+আয়নের ভেদ্যতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবার ফলে প্রাক্‌বিভব উৎপন্ন হয়। ভেদ্যতার হ্রাসপ্রাপ্তিতে K^+ আয়নের বহির্গমন (efflux) ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। প্রাক্‌বিভব অলিন্দ ও নিলয় পেশীতে

লক্ষ্য করা যায় না। ডায়াসটোল বা নিলয়পেশী প্রসারণের সময় এসব পেশী-কোষে K^+ আয়নের ভেদ্যতা তাই নির্দিষ্ট।

স্থিতিবিভব ও ক্রিয়াবিভব (Resting potential and Action potential):

স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপেশীর স্থিতিবিভব প্রায়-80mv (ভেতর ঋণাত্মক)। উদ্দীপনা-প্রয়োগে স্থিতিবিভব পরিবর্তিত হয়ে ক্রিয়াবিভব উৎপন্ন করে, যা হৃৎপেশীর সংকোচনের সূত্রপাত ঘটায়। বিসমবর্তন (depolarization) খুব দ্রুত প্রবাহিত হয় এবং অনেকটা অস্থিপেশীর মত ঊর্ধ্বক্ষিপ্ত (overshoot) হয়। এর পরই কিন্তু অধিত্যকার (plateau) আকারে ধীরে ধীরে স্থিতি-বিভবে নেমে আসে (12-6 ও 12-7নং চিত্র)। স্তন্যপায়ী প্রাণীব হৃৎপিণ্ডে
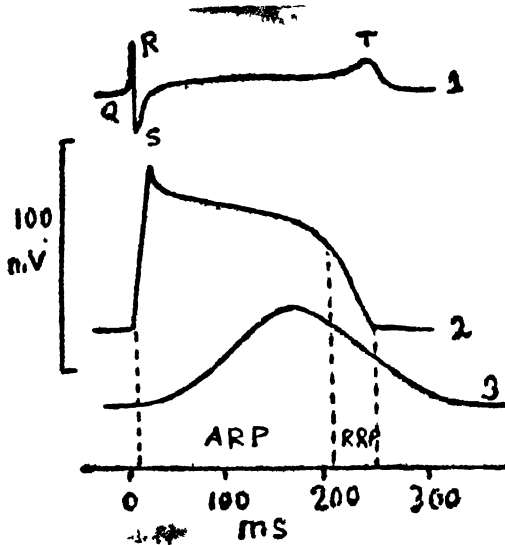
12-6নং চিত্র : স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎকোষের ক্রিয়াবিভব এবং সংকোচন প্রতিক্রিয়া। একই অক্ষে রেখাচিত্র অংকিত হয়েছে। ARP—পরম নিঃসাড়কাল, RRP—আপেক্ষিক নিঃসাড়কাল। 1—উপরিতলীয় তড়িদ্‌দ্বার সাহায্যে লিপিবদ্ধ ক্রিয়াবিভব, 2—কোষের ভেতরে লিপিবদ্ধ ক্রিয়াবিভব, 3—যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া।

বিসমবর্তন প্রায় 2 মিলিসেকেণ্ড স্থায়ী হয়, কিন্তু অধিত্যক দশা (plateau phase) এবং পুনঃসমবর্তন (repolarization) 200 মিলিসেকেণ্ড বা তারও বেশী স্থায়ী হয়। তাই সংকোচন যতক্ষণ না পর্যন্ত অর্ধেকের বেশী হচ্ছে তার আগে পুনঃসমবর্তন সম্পূর্ণ হয় না। হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগ থেকে তড়িৎবর্টনা-

কলাকে লিপিবদ্ধ করলে দেখা যায়, তার আকৃতি অনেকটা ECG-এর মত। অর্থাৎ ঊর্ধ্বক্ষিপ্ত অনেকটা QRS-এর মত এবং পরবর্তী একটি তরংগও T-এর মত দেখতে হয়।
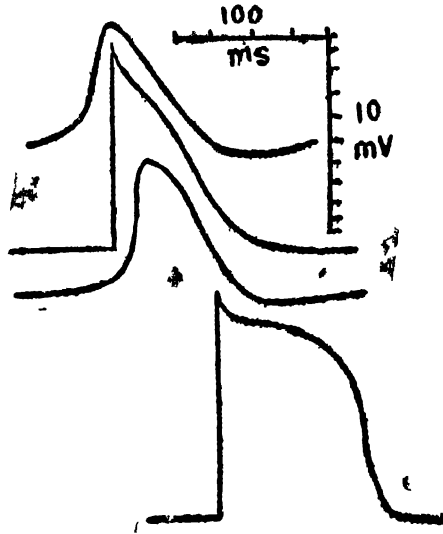
12-7নং চিত্র : হৃৎপেশীকোষের ক্রিয়াবিভব : উপর থেকে, SA নোড, অলিন্দপেশী, AV নোড এবং নিলয় পেশীর ক্রিয়াবিভব।

উদ্দীপনায় সাড়া দেয় এমন সব অপরাপর কলাকোষের মতই বহির্দেশীয় K^+ আয়নের গাঢ়ত্বের পরিবর্তন সাধন করলে হৃৎপেশীর স্থিতিশীল ঝিল্লিবিভব পরিবর্তিত হয়। অপরপক্ষে, বহির্দেশের সোডিয়াম আয়নের পরিবর্তন ঘটালে ক্রিয়াবিভবের বিস্তৃতি (magnitude) পরিবর্তিত হয়। প্রারম্ভিক দ্রুততর বিসমবর্তন ও ঊর্ধ্বক্ষিপ্ত প্রধানত Na^+ আয়নের দ্রুত ভেদ্যতা-বৃদ্ধির জন্য সংঘটিত হয়; তবে দ্বিতীয় অধিত্যক দশা (plateau phase) প্রধানত Ca^{++} আয়নের মন্থর, কম তীব্র এবং অধিকতর দীর্ঘসত্রীয় ভেদ্যতা বৃদ্ধির জন্য ঘটে থাকে। তৃতীয় দশা প্রধানত K^+ আয়নের ভেদ্যতা দেরীতে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সংঘটিত হয়। এজাতীয় বৃদ্ধি K^+ আয়নের বহির্গমনে সহায়তা করে, বা পুনঃসমবর্তন-প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করে।

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-হার বৃদ্ধি পেলে পুনঃসমবর্তনের সময় হ্রাস পায় (3নং তালিকা)। যেমন, হৃৎস্পন্দন যখন মিনিটে 75 বার, তখন ক্রিয়াবিভবের স্থায়িত্ব

0·25 সেকেণ্ড। এই স্পন্দনহার বৃদ্ধি পেয়ে যখন মিনিটে 200-তে দাঁড়ায় তখন এই সময় 0·15 সেকেণ্ডে নেমে আসে।

3নং তালিকা : হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনহারের সংগে ক্রিয়াবিভবের স্থায়িত্ব ও অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত ঘটনার পরিবর্তন।

ঘটনা	হৃৎস্পন্দনের হার 75 মিনিট	হৃৎস্পন্দনের হার 200/মিনিট	অস্থিপেশী
প্রতিটি হৃৎচক্রের স্থায়িত্ব	0 80	0 30	—
ক্রিয়াবিভবের স্থায়িত্ব	0 25	0 15	0·005
পরম নিঃসাড়কালের স্থায়িত্ব	0·20	0 13	0 004
আপেক্ষিক নিঃসাড়কালের স্থায়িত্ব	0·05	0 02	0 003
সিস্টোলের স্থায়িত্ব	0 27	0 16	—
ডায়াস্টোলের স্থায়িত্ব	0 53	0 14	—

4 **নিঃসাড়কাল** (Refractory period) : প্রথম উদ্দীপনা-প্রয়োগের পরবর্তী যে সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় উদ্দীপনা পেশীতে সাড়া জাগাতে পারে না, তাকে পেশীর নিঃসাড়কাল বলা হয়। হৃৎপেশীর নিঃসাড়কাল যথেষ্ট দীর্ঘ। নিস্সাড়কালকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : (i) **পরম নিঃসাড়কাল** (absolute refractory period) এবং (ii) **আপেক্ষিক নিঃসাড়কাল** (relative refractory period)।

হৃৎপেশী পরম নিঃসাড়কাল তাদের সমগ্র সংকোচনকালকে নিয়ে গঠিত। এই সময়ে যত বড় উদ্দীপনাই প্রয়োগ করা হোক না কেন, হৃৎপেশী কিছুতেই সাড়া দেয় না। বস্তুত, এই ধর্মের জন্য হৃৎপেশীর কখনও **টিটেনাস** (tetanus) পরিলক্ষিত হয় না।

আপেক্ষিক নিঃসাড়কাল পরম নিঃসাড়কালের পরমুহূর্তে শুরু হয়। এই সময়টি পেশীর প্রসারণকালের প্রথমাংশে পড়ে। উদ্দীপনা যথেষ্ট শক্তিশালী হলে হৃৎপেশী এই সময়সীমার মধ্যে সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়।

হৃৎপেশী দীর্ঘতম নিঃসাড়কালের অধিকারী বলে কখনও অবসন্ন বা অসাড় (fatigue) হয় না, কারণ সংকোচনের পর এই সময়ের মধ্যে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

5. **সিঁড়িক্রম ঘটনা** (Staircase phenomenon) : স্ট্যানিয়াসের বন্ধনী প্রস্তুত করে হৃৎপিণ্ডের নিলয়-পেশীকে আবিষ্ট তড়িতের দ্বারা উদ্দীপিত করলে হৃৎপিণ্ডের প্রথম কয়েকটি সংকোচন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়, এরপর আর বাড়ে না। এজাতীয় পরিবর্তনকে **সিঁড়িক্রম ঘটনা** নামে অভিহিত করা হয় (12-8 নং চিত্র)। এই ঘটনা শুধুমাত্র শান্ত বা অক্রিয় (quiescent) হৃৎপিণ্ডেই লক্ষ্য করা যায়—কখনই স্বাভাবিক সক্রিয় হৃৎপিণ্ডে নয়। জানা গেছে, এই অবস্থায় পেশীকোষের ভেতরে পটাসিয়ামের পরিমাণ হ্রাস পায়, বা বলা চলে কোষের ভেতর থেকে পটাসিয়াম বেরিয়ে আসে। শান্ত বা অক্রিয় হৃৎপিণ্ডে বেশী পরিমাণে K^+ আয়ন সঞ্চিত হয়, ফলে অ্যাক্টিন ও মায়োসিনের সংযুক্তিতে বাধা আসে। এ অবস্থায় উদ্দীপনা প্রযোগ করলে পেশীকোষের ভেতরে পটাসিয়াম যতই হ্রাস পায় হৃৎপেশীর সংকোচন প্রাথমিকভাবে ততই বৃদ্ধি পায়। কোষের ভেতরকার K^+ প্রায় 3mEq হ্রাস পাবার পরই সর্বাধিক পেশীটান পেশীতে লক্ষ্য করা যায়।
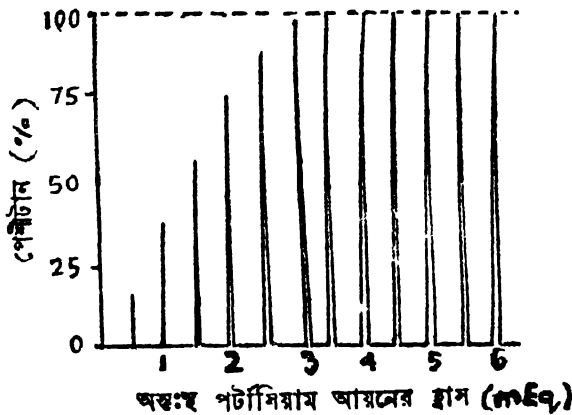
12-8 নং চিত্র : সিঁড়িক্রম ঘটনা।

6. **সর্বাধিক-বা-একেবারেই নয় প্রতিক্রিয়া** (All-or-none response) : একটি অক্রিয় হৃৎপেশীকে তড়িৎপ্রবাহের দ্বারা উদ্দীপিত করলে তড়িৎপ্রবাহ যখন ন্যূনতম ক্রিয়ামাত্রায় (threshold level) পৌঁছায়, একমাত্র তখনই সমগ্র পেশীকোষটি সংকুচিত হয়। অর্থাৎ তড়িৎপ্রবাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করলে পেশীকোষের সংকোচন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় না। একটি মাত্র অস্থিপেশী-

কোষের ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য প্রযোজ্য—সমগ্র পেশীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তড়িৎপ্রবাহের বৃদ্ধির সংগে পেশীসংকোচনের বলও বৃদ্ধি পায়।

7. **পেশীটান** (Tonicity) **:** ঐচ্ছিক পেশীর মত হৃৎপেশীতেও পেশীটান লক্ষ্য করা যায়। তবে হৃৎপেশীর পেশীটানের উপর স্নায়ুর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী কলা

SPECIAL JUNCTIONAL TISSUES OF HEART

হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের কতিপয় বিশেষ রূপান্তরিত পেশী হৃৎপ্রবাহের উৎপত্তি ও বিস্তারের জন্য প্রধানত দায়ী। এরা হৃৎপিণ্ডের অবশিষ্ট হৃৎপেশীর চেয়ে যেমন দ্রুত হৃৎপ্রবাহ উৎপন্ন করতে পারে, তেমনি দ্রুত সঞ্চালিত করতেও পারে। হৃৎপিণ্ডের এই বিশেষ ধরনের রূপান্তরিত পেশীসমূহকে সম্মিলিতভাবে **সংযোগী কলা** (junctional tissues) নামে অভিহিত করা হয়। এসব পেশীকোষ অস্পষ্ট ডোরাযুক্ত এবং এদের পদের মধ্যে স্যারকোপ্লাজমের পরিমাণ যেমন বেশী হয় তেমনি গ্লাইকোজেনের পরিমাণও বেশী।

1. **সংযোগীকলার শ্রেণীবিন্যাস** (Classification of junctional tissues) **:** সংযোগ-কলাকে 5 ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় **:** (a) S.A. **নোড** (sinoatrial node) বা **কেইথ ও ফ্লাকেরনোড** (node of Keith and Flack), (b) **আন্তরনোডীয় তন্তুপথ** (internodal tracts), (c) A. V. **নোড** (atrioventricular node) বা **তাওয়ারা** নোড (Tawara node), (d) **হিজের বাণ্ডেল** (bundle of His) ও তার **শাখা** এবং (e) **পারকিনজি তন্তু** (Purkinje fibers)। ভ্রূণদেহের ডান দিকের অংশ থেকে S.A. নোড এবং বাম দিকের অংশ থেকে A.V. নোড উৎপন্ন হয়। এর ফলে বয়স্ক লোকে **দক্ষিণ ভেগাস** (right vagus) প্রধানত S.A. নোডে ছাড়িয়ে থাকে, অপরপক্ষে **বাম ভেগাস** (left vagus) A.V. নোডে ছড়িয়ে থাকে। উভয় অঞ্চলই কার্ডিয়াক নার্ভের মাধ্যমে গ্রীবাদেশীয় স্বতন্ত্র গ্যাংগ্লিয়া থেকে অ্যাড্রেনারজিক নার্ভ (adrenergic nerves) লাভ করে। অলিন্দ ও নিলয় পেশীতেও শেষোক্ত স্নায়ু ছড়িয়ে থাকে তবে ভেগাস স্নায়ু সম্ভবত শুধুমাত্র S.A. নোড ও A.V. নোডে ছড়িয়ে থাকে।

(a) S.A. নোড (Sinoatrial node): S.A. নোড দক্ষিণ অলিন্দের উত্তরা মহাশিরা এবং অলিন্দ-উপাংগের (atrial appendix) সংযোগস্থলে অবস্থিত। একটি বিশেষ নোডাল ধমনী তাকে সম্পূর্ণভাবে বলয়ের মত বেষ্টন করে রাখে। এর ঊর্ধ্বপ্রান্ত প্রশস্ত এবং প্রান্তদেশ সূচাল। সালকাস টারমিনালিস (sulcus terminalis) বরাবর নিম্নদিকে 2 সেণ্টিমিটার পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত থাকে।

S. A. নোড সূক্ষ্ম, লম্বাটে, দুমুখ সূচাল রূপান্তরিত পেশীকোষের সমন্বয়ে গঠিত। এদের ব্যাস স্বাভাবিক হৃৎপেশীর এক তৃতীয়াংশ। নিউক্লিয়াস কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। এরা অস্পষ্ট অনুদৈর্ঘ্য ডোরাসম্পন্ন। এরা পরস্পর তন্তুজাল গঠন করে স্যারকোপ্লাজমের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশী। এদের মায়োফাইব্রিলের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। S. A. নোড মিনিটে 70-80টি স্পন্দপ্রবাহ উৎপন্ন করতে পারে। হৃৎপিণ্ডের বাকী অংশের ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত করে বলে একে ছন্দনিয়ামক (pacemaker) নামে অভিহিত করা হয়।

(b) আন্তরনোডীয় তন্তুপথ (Internodal bundle): পারকিনজি-

12-9 চিত্র: সংযোগীকলার অবস্থান।
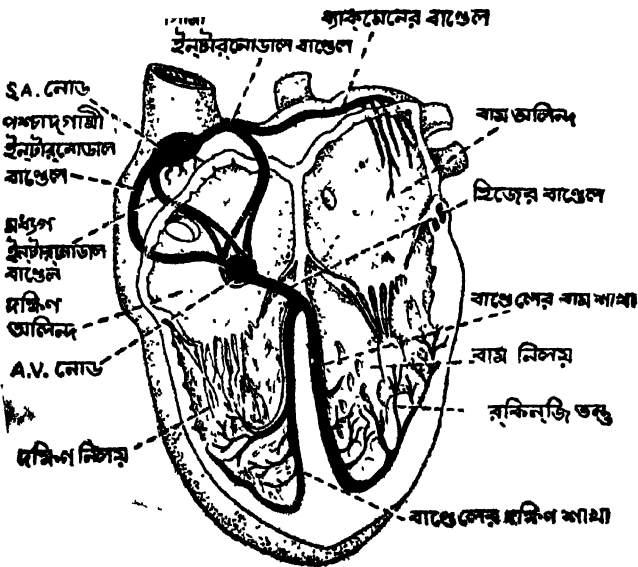
জাতীয় তন্তুর সমন্বয়ে আন্তরনোডীয় তন্তুপথ গঠিত। এরা S. A. নোড

থেকে বাম অলিন্দ এবং A.V. নোডে স্পন্দনপ্রবাহের সঞ্চালনের জন্য প্রধানত দায়ী। আন্তরনোডীয় তন্তু তিন প্রকারের : (1) সম্মুখস্থ ব্যাকমেনের ব্যাণ্ডেল (Bachman's bundle), (2) মধ্যগামী ওয়েনকেব্যাচের ব্যাণ্ডেল (Wenckebach) এবং (3) পশ্চাদগামী থোরেলের ব্যাণ্ডেল (Thorel)। সম্মুখস্থ আন্তরনোডীয় বাণ্ডেল S. A. নোড থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তরা মহাশিরাকে বেষ্টন করে অগ্রসর হয় এবং দুটো শাখায় বিভক্ত হয় (12-9 নং চিত্র)। একটি শাখা বাম অলিন্দে বিস্তার লাভ করে। এই শাখাকে প্রধান **ব্যাকমেনের ব্যাণ্ডেল** নামে অভিহিত করা হয়। ইহা S.A. নোড থেকে বাম অলিন্দে হৃৎপ্রবাহ বিস্তারের প্রধান সঞ্চালনপথ। অন্য শাখা অলিন্দপ্রাচীর বেয়ে নেমে এসে A. V নোডের সামনের দিকে তার সংগে একীভুত হয়।

মধ্য ও পশ্চাদগামী ওয়েনকেব্যাচের ও থোরেলের আন্তরনোডীয় ব্যাণ্ডেল S.A. নোড থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তরা মহাশিরাকে বেষ্টন করে অলিন্দ প্রাচীর বেয়ে নেমে আসে এবং যথাক্রমে A. V. নোডের ঊর্ধ্ব প্রান্তের সংগে পরস্পর একীভুত হয়।

(c) A. V. **নোড** (Atrioventricular node) : ইহা করোনারী সাইনাসেব ছিদ্রপথের সন্নিহিত আন্তর-অলিন্দ প্রাচীরের পশ্চাদংশে অবস্থিত। এর পেশীতন্তু S. A. নোডের পেশীতন্তুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর। মায়োফাইব্রিলের স্বল্পতার জন্য এদের অনুদৈর্ঘ্য ডোরা সুস্পষ্ট নয়। এরাও পরস্পর ঘন তন্তুজাল সৃষ্টি করে অবস্থান করে। পার্শ্বদেশে একটি ধমনীর সংগে ইহা অন্তরঙ্গভাবে মিশে থাকে।

A. V. নোড একাধারে যেমন S.A. নোডের হৃৎপ্রবাহকে গ্রহণ করে তেমনি নিজেও প্রতি মিনিটে 40-60টি স্পন্দনপ্রবাহ উৎপন্ন করতে পারে। S.A. নোড কোন কারণে বিনষ্ট হলে হৃৎপিণ্ড A. V. নোডের ছন্দে সংকুচিত হয়। A V. নোডকে তাই **সংরক্ষী ছন্দনিয়ামক** (reserve pacemaker) বলা হয়।

(b) **হিজের বাণ্ডেল এবং তার বাম ও দক্ষিণ শাখা** (Bundle of His and its right and left bundles) : হিজের বাণ্ডেল S. A. নোড থেকে উৎপন্ন হয়ে ঊর্ধ্বদিকে এগিয়ে আসে এবং আন্তরনিলয় প্রাচীরের পশ্চাদ্ভাগ স্পর্শ করে। আন্তরনিলয় প্রাচীরের পেশীবহুল অঞ্চলের সামান্য উপরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ইহা দক্ষিণ ও বাম শাখা হিসাবে হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগে গিয়ে পৌঁছায়। পরিশেষে তারা সূক্ষ্মভাবে বিন্যস্ত পারকিনজি তন্তুর সংগে

যুক্ত হয়। হিজের ব্যাণ্ডেল প্রায় 1-2 মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত এবং সমান্তরাল ডোরাদার পেশীতন্তুর দ্বারা গঠিত। এই পেশীতন্তুর আকৃতি শেষের দিকে বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে তারা পারকিনজি তন্তুর সংগে একীভূত হয়। হিজের ব্যাণ্ডেল 36টি স্পন্দনপ্রবাহ উৎপন্ন করতে পারে।

(e) **পারকিনজি তন্তু** (purkinge fibers) : পারকিনজি তন্তু হিজের ব্যাণ্ডেল থেকে উৎপন্ন হয় এবং আন্তরনিলয় প্রাচীর থেকে সরাসরি প্যাপিলা-পেশীতে এবং পরে নিলয়ের পার্শ্বপ্রাচীরে প্রসারলাভ করে। এই পেশীতন্তুর ব্যাস সাধারণ হৃৎপেশীর ব্যাসের (15μ) চেয়ে বেশী। এরা 50-70μ ব্যাসসম্পন্ন। পারকিনজিতন্তুর সাইটোপ্লাজম দানাদার এবং এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস সম্পন্ন। মায়োফাইব্রিল প্রধানত কোষের প্রান্তদেশে এবং গ্লাইকোজেন কেন্দ্রদেশে অবস্থান করে।

পারকিনজি তন্তুর প্রধান কাজ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনপ্রবাহকে দ্রুত নিলয়-পেশীতে ছড়িয়ে দেওয়া। তাছাড়া মিনিটে এরা 30-35টি স্পন্দনপ্রবাহও উৎপন্ন করতে পারে।

2. **হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রবাহের উৎপত্তি ও বিস্তার** (Origin and spread of cardiac impulse) : হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের রূপান্তরিত হৃৎপেশী বিভিন্ন হারে যে স্পন্দনপ্রবাহ উৎপন্ন করে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্টানিয়াসের বন্ধনীর দ্বারা। কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে এই পরীক্ষা চালান হয়।

(ক) **স্টেনিয়াসের বন্ধনী** (Stanius ligature) : কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের হৃৎপেশী যে বিভিন্ন হারে স্পন্দনপ্রবাহ উৎপাদন করে, স্ট্যানিয়াসের বন্ধনীর সাহায্যে তা প্রমাণ করা যায়। সাইনাস (sinus) ও অলিন্দের সংযোগস্থলে একটি বন্ধনী প্রয়োগ করে (**প্রথম স্টেনিয়াসের বন্ধনী**—first stanius ligature) সাইনাসকে হৃৎপিণ্ডের বাকী অংশ থেকে ক্রিয়াগতভাবে (functionally) পৃথক করলে (12-10 নং চিত্র) সাইনাস একইভাবে স্পন্দিতহতে থাকে, কিন্তু বাকী অংশ কিছু-ক্ষণের জন্য প্রসারিত অবস্থায় নিস্পন্দ থেকে পুনরায় স্পন্দন শুরু করে, তবে সাইনাসের চেয়ে এই অংশের স্পন্দনহার অনেক কম হয়।
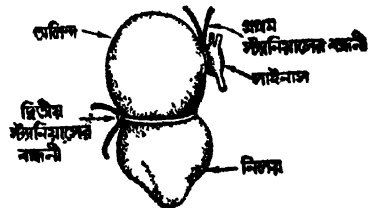
12-10 নং চিত্র : স্টেনিয়াসের বন্ধনী।

দ্বিতীয় একটি বন্ধনীর (দ্বিতীয় স্টেনিয়াসের বন্ধনী—second stanius ligature) দ্বারা অলিন্দ ও নিলয়কে একইভাবে পৃথক করলে দেখা যায়, নিলয় অনেকক্ষণ পরে পরে একবার সংকুচিত হয়, অর্থাৎ নিলয়ের স্পন্দনের হার আগের চেয়েও অনেক কম। এ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় : (a) সাইনাস যে ছন্দে (rhythm) স্পন্দন উৎপন্ন করে হৃৎপিণ্ডের বাকী অংশ তাকে অনুসরণ করে ; (b) সাইনাসের স্পন্দনপ্রবাহের উৎপত্তির হার অলিন্দ-নিলয়ের স্পন্দন-প্রবাহের উৎপত্তির হারের চেয়ে অনেক বেশী : (c) অলিন্দের স্পন্দনপ্রবাহের উৎপত্তির হার নিলয়ের স্পন্দনপ্রবাহের উৎপত্তি হারের থেকে বেশী এবং (d) নিলয়ের হৃৎপেশীর স্পন্দনপ্রবাহের উৎপত্তির সবচেয়ে কম। সাইনাস হৃৎপিণ্ডের বাকী অংশের ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত করে বলে তাকে ছন্দনিয়ামক (pace-maker) বলা হয়।

(d) **মানুষের হৃৎপিণ্ড (Human heart) :** মানুষের হৃৎপিণ্ডের S.A. নোডে স্পন্দনপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, অলিন্দপেশীতে বিস্তার লাভ করে এবং A.V. নোডে কেন্দ্রীভূত হয়। ব্যাকমেন বাণ্ডেলের মাধ্যমে S.A. নোডে উৎপন্ন স্পন্দনপ্রবাহে প্রধানত বাম অলিন্দে সঞ্চালিত হয় এবং বাম অলিন্দের
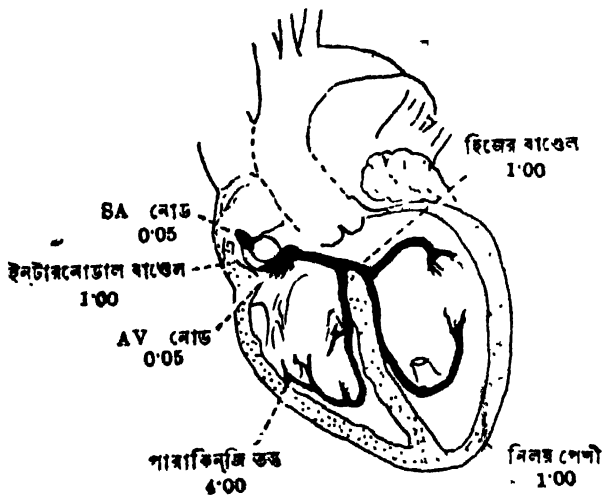
12-11 নং চিত্র : হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনপ্রবাহের সঞ্চালন ও গতিবেগ (মিটার/সেকেণ্ড)

পেশীতন্তুতে বিস্তৃত হয়। S.A. নোড থেকে এই প্রবাহ ব্যাকমেন, ওয়েনকেব্যাচ ও থোরেলের আন্তরনোডীয় বাণ্ডেলের মাধ্যমে সরাসরি A.V. নোডে পৌছায়। A. V. নোড এই স্পন্দনপ্রবাহকে গ্রহণ করে এবং হিজের বাণ্ডেল ও পারকিনজি

তন্তুর মাধ্যমে নিলয় পেশীতে পৌঁছে দেয়। দুটি নিলয়ের দুটি সমস্থানে স্পন্দনপ্রবাহ একই সময়ে গিয়ে পৌঁছায়। এ ব্যাপারে হিজের বাণ্ডেল ও পারকিনজি তন্তুর গুরুত্ব সমধিক। হিজের বাণ্ডেল থেকে হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগ পর্যন্ত স্পন্দনপ্রবাহের সময় লাগে প্রায় 0 013 সেকেণ্ড।

অলিন্দপেশী সম্পূর্ণভাবে বিসমবর্তিত হতে সময় নেয় প্রায় 0·1 সেকেণ্ড। স্পন্দনপ্রবাহের বিস্তার A V. নোডে যেহেতু মন্থর (0·05 মি/সে) সেহেতু নিলয়ে স্পন্দনপ্রবাহ বিস্তার লাভ করতে প্রায় 0·1 সেকেণ্ড বিলম্ব হয়। এই বিলম্বকে A.V. নোডীয় বিলম্ব (A V. nodal delay) বলা হয়। স্বতন্ত্র স্নায়ুকে উদ্দীপিত করলে এই বিলম্ব হ্রাস পায়, আর ভেগাস স্নায়ুকে উদ্দীপিত করলে তা আরও বৃদ্ধি পায়।

4নং তালিকা : হৃৎপেশীতে স্পন্দনপ্রবাহের গতিবেগ।

পেশীকলা	স্পন্দন প্রবাহের হার (m/Sec)
S. A. নোড	0·05
নোডাল বাণ্ডেল	0 1
A V. নোড	0·05
হিজের বাণ্ডেল	1 0
পারকিনজি তন্তু	4 0
নিলয় পেশী	0 1

হিজের বাণ্ডেলের মধ্য দিয়ে স্পন্দনপ্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে 1 মিটার গতিবেগে সঞ্চালিত হয়। পারকিনজি তন্তুর শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে সেকেণ্ডে 4 মিটার এবং নিলয় পেশীতে সেকেণ্ডে 1 মিটার গতিবেগ বিস্তার লাভ করে (4 নং তালিকা)। স্পন্দনপ্রবাহ উভয় নিলয়ের এনডোকারডিয়ামের নিম্নদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর লম্বভাবে এই প্রবাহ এনডোকারডিয়াম থেকে নিলয়পেশীর এপিকারডিয়ামে গিয়ে পৌঁছয়। ইনটারক্যালেটেড ডিস্কের নেকসাসের (nexus) মধ্য দিয়ে এই প্রবাহ কোষ থেকে কোষে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি পেশীকোষের সারকোটিউবুল এরপর এই প্রবাহকে মায়োফাইব্রিল বা পেশীর সংকোচী এককে পৌঁছে দেয়।

হৃৎপিণ্ডের S.A. নোডে হৃৎপ্রবাহের উৎপাদন যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় অথবা উৎপন্ন হৃৎপ্রবাহের পরিবহন সঠিক না হয়, তবে এই ত্রুটিকে **হার্দ অবরোধ** (heart block) বলা হয়। এই অবরোধ সৃষ্টির উৎসস্থল S.A. নোড, A.V. নোড, হিজের বাণ্ডেল অথবা পারকিনজি তন্তু—এদের যে কোন একটি হতে পারে।

ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম
Electrocardiogram

হৃৎপিণ্ডের S A নোডে যে তড়িৎধর্মী প্রবাহ সৃষ্টি হয় তা শুধুমাত্র A. V. নোড, হিজের বাণ্ডেল, পারকিনজি তন্তু এবং অপরাপর হৃৎপেশীতেই ছড়িয়ে পড়ে না, হৃৎপিণ্ডের চতুঃপার্শ্বস্থ কলাকোষ থেকে সমগ্র দেহেও বিস্তারলাভ করে। এর প্রধান কারণ প্রাণীদেহ **আয়তন পরিবাহী** (volume conductor)* হিসাবে কাজ করে এবং তড়িৎ-উৎপাদক হৃৎপেশী অসম মেরু বা **ডাইপোল** (dipole) হিসাবে কাজ করে। বিপরীত আধানযুক্ত দুটো বিন্দুকে সামান্য দূরত্বে সহাবস্থান করতে দিলে তাদের ডাইপোল বলা হয়। ডাইপোলের সমবিভবরেখা (isopotential lines) আয়তন পরিবাহীতে যেভাবে বিন্যস্ত হয়, হৃৎপিণ্ডের তড়িৎপ্রবাহও সেভাবে সমগ্র দেহে বিস্তারলাভ করে (12-12 নং চিত্র)। এরকম পরিস্থিতিতে হৃৎপিণ্ডের বিপরীত দেহাংশে যথোপযুক্ত তড়িদ্দ্বার (electrode) সংযোগ করলে সুগ্রাহী গ্যালভ্যানোমিটারে (galvanometer) হৃৎপিণ্ডের তড়িদ্বিভবের পরিবর্তন ধরা পড়ে। এই তড়িদ্বিভবের পরিবর্তনকে বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা লিপিবদ্ধ করলে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তাকে E.C.G বা **ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম** বলা হয়। অধিকাংশ ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফিক মেশিনে
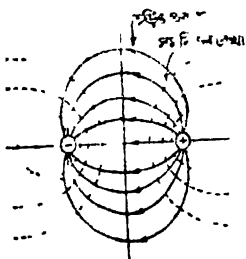
12-12 নং চিত্র : ডাইপোল

* জলীয় পরিবাহী বা তড়িৎবিশ্লেষ্যযুক্ত (electrolytic) যে মাধ্যমে বিভব-উৎস (potential source) নিমজ্জিত থাকে তাকে আয়তন পরিবাহী বলা হয়।

তড়িদ্‌বিভবের উত্থানপতনকে গতিশীল কাগজের ফালিতে লিপিবন্ধ করা হয়।

1. **ই. সি. জি.র লিপিপদ্ধতি** (Recording of E.C.G.) : E.C.G.-র লিপিপদ্ধতিকে দুভাগে ভাগ করা যায় : (i) **একমেরুলিপি** (unipolar recording) এবং (ii) **দ্বিমেরুলিপি** (bipolar recording)। প্রথম পদ্ধতিতে একটি সক্রিয় তড়িদ্‌দ্বারকে (exploring electrode) একটি শূন্য বিভবযুক্ত উদাসীন তড়িদ্‌দ্বারের (indifferent electrode) সংগে যুক্ত করা হয়। দ্বি-মেরু লিপিপদ্ধতিতে ECG-কে সক্রিয় তড়িদ্‌দ্বারের দ্বারা লিপিবন্ধ করা হয়। আয়তন পরিবাহিতে একটি তড়িৎ-উৎসকে একটি সমবাহু ত্রিভুজের কেন্দ্রস্থলে রেখে তার কৌণিক বিন্দুসমূহের বিভবসমূহকে যোগ করলে যোগফল সবসময় শূন্য হয়। হৃৎপিণ্ডকে কেন্দ্রস্থলে রেখে দুটি বাহু ও বাম পাকে তড়িৎদ্বার দ্বারা সংযুক্ত করলে এমনি একটি ত্রিভুজ পাওয়া যায় (**আইনথোভেনের ত্রিভুজ** Einthoven's triangle)। এই তড়িদ্দ্বারসমূহকে একত্রে যোগ করলে উদাসীন তড়িদ্‌দ্বার পাওয়া যায় যা শূন্যবিভব প্রদর্শন করে। আয়তন পরিবাহীতে বিসমবর্তন (depolarization) যখন সক্রিয় তড়িদ্‌দ্বারের **অভিমুখে** প্রবাহিত হয় তখন ধনাত্মক বিক্ষেপ (deplection) পাওয়া যায়, আর তা তড়িদ্‌দ্বারের **বিপরীতমুখে** প্রবাহিত হলে ঋণাত্মক বিক্ষেপ পাওয়া যায়।

হৃৎপিণ্ডের তড়িৎপ্রবাহকে লিপিবন্ধ করার কাজে প্রথমে আইনথোভেনের (Einthoven) **স্ট্রিং গাল্‌ভ্যানোমিটার** (string galvanometer) ব্যবহার করা হত। অধুনা এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে পরিবর্ধকযুক্ত (amplifier) গ্যাল্‌ভ্যানোমিটার তৈরি করা হয়েছে। পরিবর্ধক দেহের উপরিতলের অতি সামান্য ভোল্টকে পরিবর্ধন করে যে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে তা সহজেই একটা বৃহৎ গাল্‌ভ্যানোমিটারকে সক্রিয় করে তোলে। সক্রিয় গ্যাল্‌ভ্যানোমিটার এরপর সহজেই একটি উষ্ণ লেখনী বা স্টাইলাসকে (stylus) তাপ-সুগ্রাহী পেপারের ওপর গতিশীল করে তোলে (12-13 নং চিত্র)। পরিবর্ধকে প্রবিষ্ট 1 মিলিভোল্ট বিভবপার্থক্য লেখনীতে (writing pen) 1 সেণ্টিমিটার বিক্ষেপ (deflection) ঘটাতে পারে। লিপিবন্ধকারী পেপার প্রতি সেকেণ্ডে 25 মিলিমিটার গতিসম্পন্ন হয়।

2. **প্রচলিত তড়িদ্‌দ্বার বা লীড :** প্রচলিত যেসব তড়িৎদ্বার বা লীড (leads) একাজে ব্যবহার করা হয় তারা দক্ষিণবাহু, বামবাহু এবং বাম পায়ের

বিভবপার্থক্য রেকর্ড করে। এছাড়া লীড IV বা বক্ষলীড (chest leads) নামক আর এক প্রকার লীডকে একাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
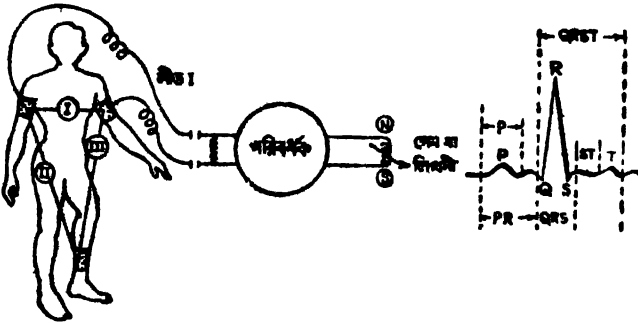
12-13 নং চিত্র : ECG-এর লিপিপদ্ধতি।

(a) একমেরু তড়িদ্দ্বার (Unipolar leads) : ECG-কে লিপিবদ্ধ করার জন্য দেহের নির্দিষ্ট 9টি স্থানে সক্রিয় তড়িদ্দ্বারকে সংযোগ করা হয়। এর মধ্যে 6টি একমেরু বক্ষলীড (unipolar chest leads); এদেরে V_1, V_2, V_3 ইত্যাদি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় (12-14 নং চিত্র)। অপর তিনটি একমেরু প্রত্যংগ লীড (limb leads) হল—V_R (দক্ষিণবাহু), V_L (বামবাহু) এবং V_F (বাম পা)।

বিবর্ধক প্রত্যংগ লীড (Augmented limb loads) : অধুনা বহুল প্রচলিত। এদেরে aV_R, aV_L এবং aV_F-এর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। বিবর্ধক প্রত্যংগ
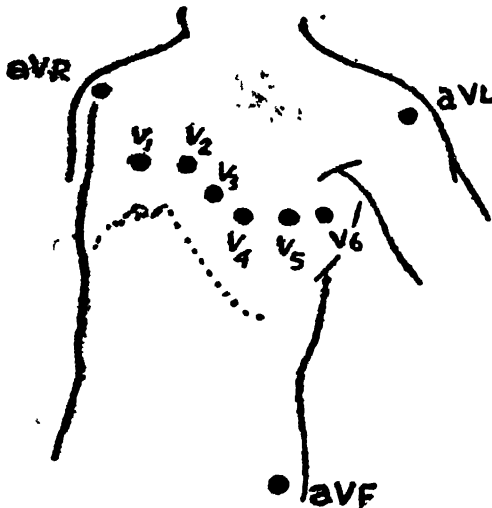
12-14 নং চিত্র : একমেরু তড়িদ্দ্বার স্থাপনের স্থান। চিত্রে ছটি বক্ষ লীড ও তিনটি প্রত্যংগ লীডের অবস্থান দেখান হয়েছে।

লীড একদিকে একটি এবং অপরদিকে দুটি প্রত্যংগের মধ্যে লিপিগ্রহণ করে। এর ফলে আকৃতির পরিবর্তন না ঘটিয়ে বিভবকে অবিবর্ধক লীডের চেয়ে প্রায় 50% বাড়িয়ে দেয়; কারণ দেখা গেছে একটি বিবর্ধক লীড = 3/2 অ-বিবর্ধক লীড।

$$aV_R = V_R - \frac{(V_L + V_F)}{2}$$

$$2aV_R = 2V_R - (V_L + V_F)$$

আইনথোভেনের ত্রিভুজ অনুসারে,

$$V_R + V_L + V_F = 0$$

$$V_R = -(V_L + V_F)$$

এই মানকে উপরের সমীকরণে বসালে পাওয়া যায়,

$$2aV_R = 2V_R + V_R$$

$$= 3V_R$$

$$\therefore\ aV_R = 3/2 V_R$$

(b) দ্বিমেরু তড়িদ্দ্বার (Bipolar leads): একমেরু তড়িদ্দ্বার
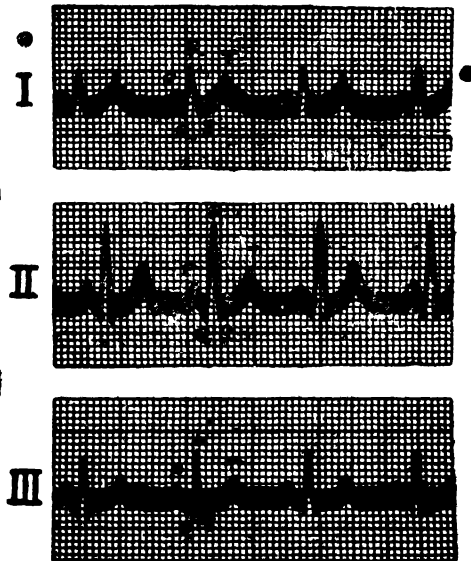
12-15নং চিত্র: লীড I, লীড II, এবং লীড III-তে লিপিবদ্ধ স্বাভাবিক ECG।

আবিষ্কারের পূর্বে সাধারণত দ্বিমেরু তড়িদ্দ্বার ব্যবহৃত হত। দ্বিমেরু তড়িদ্-

থাকে দুটো তড়িদ্দ্বারই সক্রিয়। এদের লীড I, লীড II এবং লীড III নামে অভিহিত করা হয়। এদের প্রত্যেকে দুটো প্রত্যংগের বিভবপার্থক্যকে রেকর্ড করে। লীড I-এ তড়িদ্দ্বার দুটোকে বাম বাহু ও দক্ষিণ বাহুর সংগে যুক্ত করা হয় (বাম ধনাত্মক)। লীড II তে তড়িদ্দ্বার দুটো দক্ষিণ বাহু ও বাম পায়ে যুক্ত হয় (বাম পা ধনাত্মক থাকে)। লীড III-তে তড়িদ্দ্বার বাম বাহু ও বাম পায়ে যুক্ত হয় (বাম পা ধনাত্মক থাকে)।

3. **স্বাভাবিক ই.সি.জি. তরংগ** (Normal ECG Waves) : লীড I থেকে সুস্থ মানুষের যে ইলেকট্রকারডিওগ্রাম পাওয়া সম্ভব 12-13নং চিত্রের ডানপাশে এবং 12 5 ও 12-16নং চিত্রে তা দেখান হয়েছে। ইলেকট্রকারডিওগ্রাম পর্যায়ক্রমিক 5টি তরংগের সমন্বয়ে গঠিত। এই পাঁচটি তরংগ হল PQRST। P, R এবং T উর্ধ্বমুখী তরংগ, Q এবং S দুটো নিম্নমুখী তরংগ। P তরংগের উৎপত্তি অলিন্দ থেকে এবং QRST-তরংগের উৎপত্তি নিলয় থেকে।
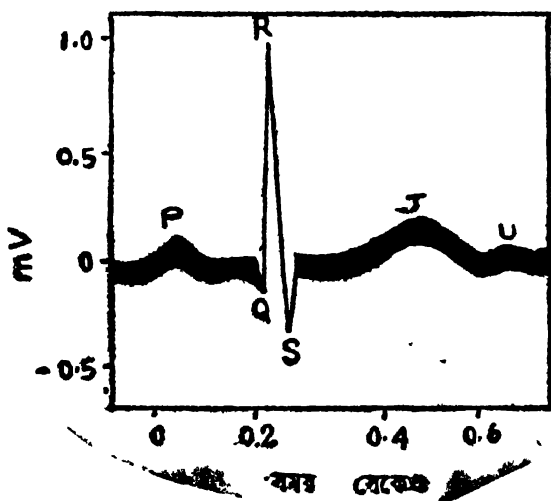
12-16 নং চিত্র : স্বাভাবিক ECG তরংগাবলী।

P তরংগকে S.A. নোড থেকে A.V. নোডে সঞ্চালিত স্পন্দনপ্রবাহ বলা চলে। S.A. নোডে উৎপন্ন স্পন্দনপ্রবাহ সমগ্র অলিন্দ-পেশীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং A.V. নোডে পৌঁছায়। যখন ইহা A.V. নোডে পৌঁছায় তখন P তরংগের উচ্চতা সর্বাধিক হয়। P তরংগের গড় স্থিতিকাল 0·1 সেকেণ্ড। হৃৎপেশীতে কোন প্রকার ত্রুটি দেখা দিলে এই তরংগের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, **অলিন্দতন্তুর ছন্দহীনতায়** (atrial fibrillation) P তরংগ

অনুপস্থিত থাকে। তেমনি **অলিন্দের বিকারে আয়তন বৃদ্ধিতে** (atrial hypertropy) এই তরংগের আকৃতি বৃদ্ধি পায়।

নিলয়ে স্পন্দনপ্রবাহ বিস্তৃত হলে Q R S T **তরংগাবলী পর্যায়ক্রমে** আত্ম-প্রকাশ করে। এদের গড় স্থিতিকাল 0.40 সেকেণ্ড। Q.R.S.-**এর স্থিতিকাল** গড়ে 0·08 সেকেণ্ডে, 0·1 সেকেণ্ড পর্যন্ত এই সময় বিস্তৃত হতে পারে।

5নং তালিকা ঃ ECG অবকাশ।

নাম	স্বাভাবিক স্থায়িত্ব		অবকাশে হৃৎঘটনাবলী
	গড় (8)	বিস্তার	
PR অবকাশ	0·18	0·12—0·20	অলিন্দের বিসমবর্তন ও A V নোডের মধ্য দিয়ে প্রবাহ
QRS স্থায়িত্ব	0 08	0·10 পর্যন্ত	নিলয়ের বিসমবর্তন
QT অবকাশ	04 0	0·43 পর্যন্ত	নিলয়ের বিসমবর্তন ও পুনঃসমবর্তন
ST অবকাশ (QT – QRS)	0·32	......	নিলয়ের পুনঃসমবর্তন।

হৃৎপ্রবাহ যখন নিলয় মধ্যস্থ প্রাচীরের পেশীবহুল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তখনই Q তরংগের সৃষ্টি হয়। R তরংগটি সবচেয়ে বড় হয়। সংকোচনপ্রবাহ **দক্ষিণ** নিলয়ে বিস্তারলাভ করে R **তরংগের** সৃষ্টি করে। S তরংগ একটি নিম্নমুখী তরংগ, **বাম নিলয়ের সক্রিয়তা** থেকে এই তরংগের উৎপত্তি হয়। লীড III-তে এর বিপরীত পরিবর্তন ঘটে। অন্তর্বর্তী নিলয়প্রাচীরে জন্মগত ত্রুটি থাকলে ECG-তে Q তরংগ অনুপস্থিত থাকে। নিলয়ের ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় R ও S এই তরংগ দুটোর আকৃতি, প্রকৃতি এবং স্থিতিকালের পরিবর্তন ঘটে। যেমন, হিজের বাণ্ডেলের শাখা দুটোতে **হার্দ অবরোধে** (heart block) এদের স্থিতিকাল 0·1 সেকেণ্ডের চেয়েও বৃদ্ধি পায় এবং তাদের আপেক্ষিক উচ্চতারও পরিবর্তন ঘটে।

P-তরংগের প্রারম্ভ থেকে R তরংগের প্রারম্ভকাল্ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়কে PR অবকাশ (PR-interval) বলা হয়। ইহা SA নোড থেকে নিলয় পর্যন্ত হৃৎপ্রবাহের বিস্তারের পরিমাপক। এই সময় 0·12—0·20 সেকেণ্ডের মধ্যে সীমিত। হিজের বাণ্ডেলের মধ্য দিয়ে হৃৎপ্রবাহের পরিবহন ব্যাহত হলে এই অবকাশ দীর্ঘ হয়।

T তরংগ সর্বশেষ ঊর্ধ্বমুখী গোলাকৃতি তরংগ। নিলয়ের পুনঃসমবর্তন (repolarization) থেকে এই তরংগটি উৎপন্ন হয়। এই তরংগের স্থিতিকাল 0·27 সেকেন্ডে। ST-অবকাশ সাধারণত 0·32 সেকেন্ড, শিশুদের ক্ষেত্রে T তরংগ সুস্পষ্ট। পেশীসঞ্চালনে এর উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। তবে গুরুত্বপূর্ণ হৃৎপেশীর অবক্ষয়ে (myocardial damage) T তরংগের আকৃতি, প্রকৃতি, স্থিতিকাল ও গতিপথ পরিবর্তিত হয় (প্রধানত লীড I ও II-তে)। V তরংগ সুনির্দিষ্ট নয়। প্যাপিলারী পেশীতে (papillary muscle) মন্থর পুনঃসমবর্তনের ফলে এর উৎপত্তি ঘটে বলে ধারনা করা হয়।

4. **বিভিন্ন লীডে স্বাভাবিক ই.সি.জি. তরংগের আকার ও আকৃতি (Waves of normal ECG in different leads :** বিভিন্ন তড়িদদ্বারে বা লীডে ই. সি. জি. তরংগের আকার আকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় (12-17নং চিত্র)। হৃৎপিণ্ডের বিসমবর্তনের দিক, হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশের অবস্থান ও তড়িদদ্বারের অবস্থানের উপর এসব পরিবর্তন নির্ভর করে। বক্ষদেশে অলিন্দ পেছনের দিকে অবস্থান করে, নিলয় পাদদেশ ও সম্মুখ তল গঠন করে এবং দক্ষিণ নিলয় বাম নিলয়ের তুলনায় অনেকটা সম্মুখ পার্শ্বদেশে থাকে।
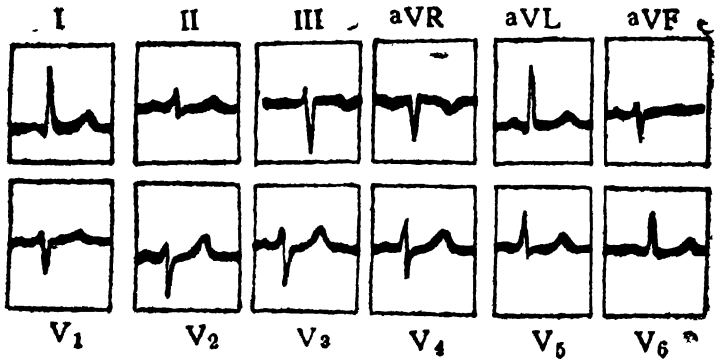
12-17নং চিত্র : বিভিন্ন লীডে স্বাভাবিক ECG তরংগ।

aVR লীড : সক্রিয় তড়িদ্দ্বার থেকে অলিন্দের বিসমবর্তন নিলয়ের বিসমবর্তন ও নিলয়ের পুনঃসমবর্তন যেহেতু দূরে সরে যায় সেহেতু aVR লীডে P-তরংগ, QRS-তরংগাবলী এবং T-তরংগ ঋণাত্মক বা নিম্নমুখী হয়।

aVL ও aVF : তড়িৎপ্রবাহ সক্রিয়তড়িদদ্বারের অভিমুখে প্রবাহিত হবার ফলে P-তরংগ QRS তরংগাবলী ও P-তরংগ ধনাত্মক বা উভয়মুখী (biphasic) হয়।

বক্ষলীড : V_1 ও V_2 লীডে Q-তরংগ অনুপস্থিত। QRS-তরংগের

প্রথম অংশে ক্ষুদ্র ঊর্ধ্বমুখী তরংগ লক্ষ্য করা যায়। নিলয়ের বিসমবর্তন প্রাথমিকভাবে সেপটামের মধ্যঅঞ্চল অতিক্রম করে বাঁদিক থেকে ডান দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এই পরিবর্তন দেখা যায়। তড়িৎপ্রবাহ এরপর সেপটাম বরাবর নিচের দিকে বাম নিলয়ের দিকে অগ্রসর হয় এবং এভাবে তড়িদদ্বার থেকে দূরে সরে যায়, ফলে বৃহদাকৃতির S-তরংগের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে, সক্রিয় তড়িদ্দ্বার অভিমুখে নিলয়ের প্রাচীর বরাবর পশ্চাদ্দিকে প্রবাহিত হয়।

বিপরীতক্রমে বাম নিলয়ের লীডগুলোতে (V_4-V_6) ক্ষুদ্রাকার প্রাথমিক Q-তরংগ থাকতে পারে (বাম থেকে ডানদিকে সেপটাম অঞ্চলের বিসমবর্তনের জন্য)। তবে R-তরংগ বৃহদাকারের হয় বিশেষত সেপটাম ও নিলয়েরবিসম-বর্তনের জন্য। V_4 ও V_5-এ S-তরংগ মধ্যমাকৃতির হয়, কারণ নিলয়প্রাচীর থেকে AV সংযোগস্থলের দিকে বিসমবর্তন দেরীতে হয়।

5. **দ্বিমেরু লীড ও কার্ডিয়াক ভেক্টর** (Bipolar leads and cardiac vector) : যার দিক ও মান নির্দিষ্ট তাকে ভেক্টর বলা হয়। দ্বিমেরু লীড বা তড়িদ্দ্বার যেহেতু দুটো বিন্দুর বিভবপার্থক্য লিপিবদ্ধ করে, সেহেতু প্রতিটি লীডের বিক্ষেপ লীডের অক্ষবরাবর হৃৎপিণ্ডে উৎপন্ন তড়িৎপ্রবাহের
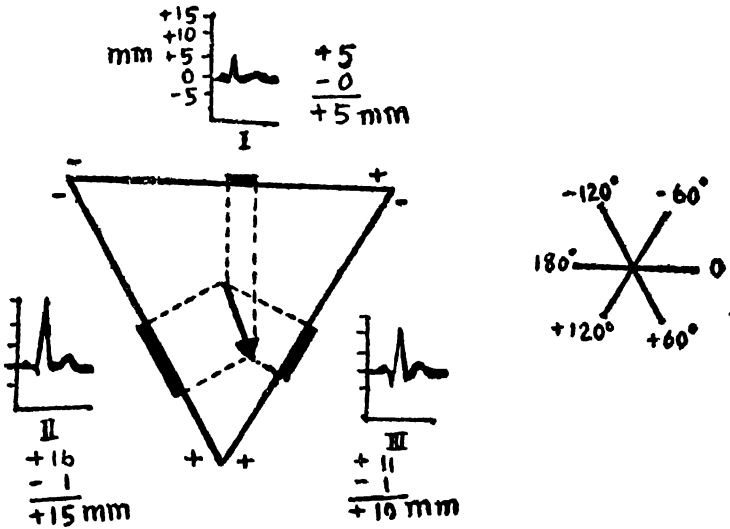
12-14নং চিত্র : গড় QRS ভেক্টরের নির্ধারণ।

মান ও দিকের পরিচায়ক। ভেক্টরকে তাই যে কোন সময়ে যে কোন—দুটো প্রমাণ প্রত্যংগ লীড থেকে নির্ণয় করা যায়, তবে এক্ষেত্রে স্বীকার করে নিতে

হবে তড়িদ্‌দ্বারত্রয়ের সংযোগবিন্দু একটি **সমবাহু ত্রিভুজ** (Einthoven's triangle) গঠন করে এবং হৃৎপিণ্ড তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। এই **স্বীকার্য** যদিও সম্পূর্ণ বা একেবারে সঠিক নয়, তথাপি নির্ণীত ভেক্টরকে আসন্ন মান (approximation) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 12-18নং চিত্রে দেখা যায়, প্রতিটি লীডের গড় QRS বিক্ষেপকে প্লট করে একটি **গড় QRS ভেক্টর** (mean QRS vector) বা **হৃৎপিণ্ডের তড়িৎ-অক্ষ** (electrical axis of heart) পাওয়া যায়। QRS-এর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিক্ষেপসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করে এই মান নির্ধারণ করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় গড় QRS ভেকটরের দিক – 30 থেকে + 110 ডিগ্রি। দক্ষিণ অক্ষে এর বিচ্যুতি (deviation) হলে দক্ষিণ নিলয়ের পেশীবৃদ্ধি (hypertrophy) হয়েছে বুঝতে হবে। একই ভাবে বিচ্যুতি হলে বাম নিলয়ের পেশী বৃদ্ধি হয়েছে বুঝতে হবে।

হার্দ ছন্দবিচ্যুতি
Cardiac Arrhythmias

স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডে প্রতিটি হৃৎস্পন্দন S.A. নোড থেকে উৎপন্ন হয়। একে স্বাভাবিক **সাইনাস ছন্দ** (normal sinus rhythm, NSR) নামে অভিহিত করা হয়। বিশ্রামরত অবস্থায় হৃৎস্পন্দন মিনিটে প্রায় 70 বার। হৃৎস্পন্দনের হার হ্রাস পেলে তাকে **ব্রেডিকারডিয়া** (bradycardia) এবং বৃদ্ধি পেলে তাকে **টেকিকারডিয়া** (tactycardia) নামে অভিহিত করা হয়। ঘুমের সময় ব্রেডিকারডিয়া এবং আবেগ, উত্তেজনা, ব্যায়াম, জ্বর ইত্যাদি কারণে টেকিকারডিয়া দেখা যায়। এছাড়া শ্বাস গ্রহণের সময় হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পায় এবং শ্বাসত্যাগের সময় হ্রাস পায়। এজাতীয় নিয়মিত হৃৎস্পন্দনের পরিবর্তনকে **সাইনাস ছন্দবিচ্যুতি** (sinus arrhythmia) বলা হয়। এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। শ্বাসগ্রহণের সময় ফুসফুসের টান গ্রাহক থেকে ভেগাসের মাধ্যমে যে স্নায়ুপ্রবাহ মেডালাতে পৌঁছয় তা হার্দ বিমুখ কেন্দ্রকে cardioinhibitory) বাধাদান করে, ফলে হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পায়। অস্বাভাবিক অবস্থায় A.V. নোড অথবা হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য পরিবাহী সংস্থা ছন্দনিয়ামক pacemaker) হিসাবে কাজ করতে পারে। অলিন্দ থেকে নিলয়ে স্পন্দনপ্রবাহ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হলে নিলয় স্বাধীনভাবে ধীরে ধীরে স্পন্দিত হয়। একে **ইডিওভেন্ট্রিকুলার রিদম**

(idioventricular rhythm) বা **নৈলয়িক ছন্দ** বলা হয়। A.V. নোডের অসুস্থতা (A.V. **নোডীয় অবরোধ,** A.V. nodal block) বা নিম্নবর্তী বাণ্ডেলের অবরোধ (bandle block) থেকে এজাতীয় অবস্থার উদ্ভব হয়। A.V. নোডীয় অবরোধে অবশিষ্ট নোডাল টিস্যু ছন্দনিয়ামক হিসাবে কাজ করে এবং এক্ষেত্রে ইডিওভেণ্ট্রিকুলার রিদিম প্রায় মিনিটে 45 বার হয়। বাণ্ডেল ব্লকে হিজের বাণ্ডেল ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে নিলয়ের স্পন্দন আরো হ্রাস পায়। গড়ে মিনিটে 35 বার স্পন্দিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই হার মিনিটে 15 স্পন্দনেও নেমে আসতে পারে। এক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল হ্রাস পায় (cerebral ischemia), ফলে মাথা ঝিমঝিম ও মূর্চ্ছারোগ দেখা যায়। এই অবস্থাকে **স্টোক্‌স আদমস সিনড্রোম** (stokes adams syndrome) নামে অভিহিত করা হয়।

অলিন্দের কোন অংশ থেকে স্বাধীনভাবে হৃৎস্পন্দন উৎপন্ন হয়ে A.V. নোডকে উদ্দীপিত করলে যে ছন্দবিচ্যুতি ঘটে তাকে **অলিন্দ ছন্দবিচ্যুতি** (atrial arrhythmias) বলা হয়। এক্ষেত্রে অলিন্দের এই এক্সট্রাসিস্টোলে (extrasystoles) P-তরংগ অস্বাভাবিক হয়। কিন্তু QRST স্বাভাবিক হয়। অলিন্দে কোন অংশ থেকে মিনিটে 150-200 বার স্পন্দনপ্রবাহ উৎপন্ন হলে তাকে **অ্যাট্রিয়েল টেকিকারডিয়া** (atrial tachycardia) নামে অভিহিত করা হয়।

নিলয়ের কোন অংশ থেকে অতিরিক্ত সিস্টোল (extrasystole) উৎপন্ন হলে তাকে **নিলয় ছন্দবিচ্যুতি** (ventricular arrhythmia) বলা হয়। QRS তরাংগাবলী এক্ষেত্রে উদ্ভটভাবে পরিবর্তিত হয়, উৎপন্ন স্পন্দনপ্রবাহ মন্থরগতিতে নিলয় পেশীতে ছড়িয়ে পড়াব জন্যই এই পরিবর্তন আসে। অবশ্য নিলয় থেকে উৎপন্ন স্পন্দনপ্রবাহ হিজের বাণ্ডেলকে উদ্দীপিত করতে পারে না।

হার্দ উৎপাদ
Cardiac Output

প্রতি সংকোচনে উভয় নিলয়ই কিছু পরিমাণ রক্তকে সংবহনতন্ত্রে নিক্ষেপ করে। বাম নিলয় তন্ত্রীয় রক্তসংবহনতন্ত্রে (systemic circulation) এবং দক্ষিণ নিলয় ফুসফুসীয় রক্তসংবহনতন্ত্রে রক্তকে উৎক্ষেপণ করে। প্রতি সংকোচনে প্রতিটি নিলয়ে রক্ত-উৎক্ষেপণের পরিমাপকে **হার্দ উৎপাদ** বলা হয়। উভয় নিলয়ের হার্দ উৎপাদ সমান।

হার্দ উৎপাদকে প্রধানত দুভাবে প্রকাশ করা যায়। যথা : (a) হৃৎপিণ্ডের **ঘাত-পরিমাণ** (stroke volume) এবং (b) হৃৎপিণ্ডের মিনিট-পরিমাণ (minute volume)। প্রতিসংকোচনে প্রতিটি নিলয় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্তকে উৎক্ষেপণ করে তাকে **হৃৎপিণ্ডের ঘাত-পরিমাণ** বলা হয়। অপর পক্ষে প্রতি মিনিটে প্রতিটি নিলয় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্তকে উৎক্ষেপণ করে তাকে **হৃৎপিণ্ডের মিনিট-পরিমাণ** বলা হয়। অতএব মিনিট-পরিমাণ = হৃৎপিণ্ডের ঘাত-পরিমাণ × হৃৎস্পন্দনের হার।

1. **স্বাভাবিক উৎপাদ** (Normal output) : দেখা গেছে, একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ডের ঘাত-পরিমাণ 70 **মিলিলিটার** এবং হৃৎপিণ্ডের মিনিট-পরিমাণ 5 **লিটার**। প্রতি মিনিটে দেহের একক বর্গমিটারে হার্দ উৎপাদের সম্পর্ককে **হৃৎসংকেত** (cardiac index) বলা হয়। এর গড় পরিমাণ 3·2 লিটার। দেহের একক বর্গমিটারের সংগে হৃৎপিণ্ডের ঘাত-পরিমাণের সম্পর্কের নাম **ঘাত-পরিমাণ সংকেত** (stroke volume index)। এর গড় মান 47 মিলিলিটার।

বিভিন্ন অবস্থায় হার্দ উৎপাদ পরিবর্তিত হয় (6নং তালিকা)।

6 নং তালিকা : হার্দ উৎপাদের ওপর বিভিন্ন অবস্থার প্রভাব।

পরিবর্তন	কারণ বা অবস্থা
বৃদ্ধি পায়	উদ্বেগ ও উত্তেজনা (50 100%) ভোজন (30%) পেশীসঞ্চালন (700% পর্যন্ত) পরিবেশীয় উচ্চ তাপমাত্রা গর্ভ (শেষের দিকে) এপিনেফ্রিন হিস্টামিন
হ্রাস পায়	শোওয়া থেকে ওঠে বসা বা দাঁড়ান (20 – 30%) দ্রুত হার্দ ছন্দবিচ্যুতি হৃদ্‌রোগ

2. **হার্দ উৎপাদ নির্ণয়ের পদ্ধতি** (Methods of determination of cardiac output) : মানবদেহে হার্দ উৎপাদ প্রত্যক্ষভাবে নির্ণয় করা

সম্ভবপর নয়, পরোক্ষ পদ্ধতিই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরোক্ষ পদ্ধতির মধ্যে প্রধান: (a) **ফিকের মূলনীতি** (Fick's principle): (b) **রঞ্জন পদ্ধতি** (dye method) এবং (c) **ব্যালিসটোকার্ডিওগ্রাফি** (Ballistocardiography)। প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মধ্যে প্রধান: (d) **হার্ট ফুসফুসীয় প্রস্তুতি** (Heart-lung preparation) এবং (e) **কার্ডিওমিটার** (Cardiometer)।

(a) **ফিকের মূলনীতি:** ফিক 1870 সালে এই পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। তাঁর বক্তব্য হল, একটা নির্দিষ্ট সময়ে ফুসফুসে যে পরিমাণ গ্যাসকে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়, তা ফুসফুসগামী ধমনীরক্তে অবস্থানকারী গ্যাস ও ফুসফুসত্যাগী শিরারক্তের গ্যাসের পার্থক্যের সমান; হার্ট উৎপাদকে তাই সহজেই নির্ণয় করা যায়, যদি (a) প্রতি একক সময়ে কী পরিমাণ অক্সিজেন ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে তার পরিমাপ করা যায়, (b) ধমনীরক্তের
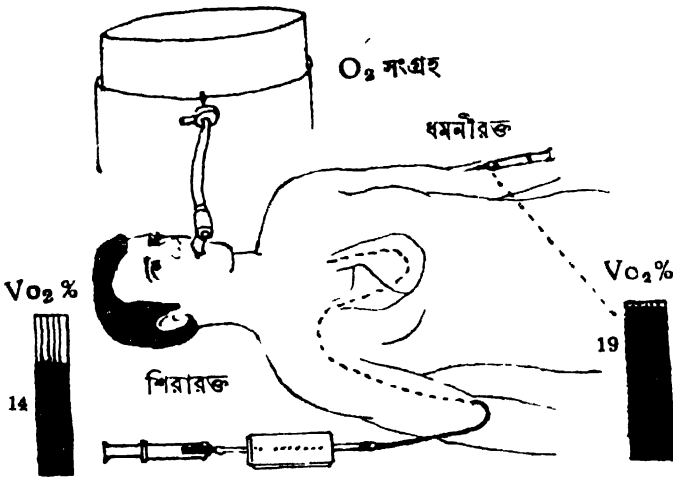
12-19নং চিত্র: ফিকের মূলনীতি।

অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় এবং (c) মিশ্র শিরারক্তের অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

ধরা যাক,

প্রতি 100 মিলিলিটার ধমনীরক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ 19 মিলি-লিটার এবং প্রতি 100 মিলিলিটার মিশ্র শিরারক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ 14 মিলিলিটার।

অতএব, ফুসফুসের মধ্য দিয়ে অতিক্রমের সময় প্রতি 100 মিলিলিটার রক্ত যে অক্সিজেন গ্রহণ করে তার পরিমাণ (19—14) বা 5 মিলিলিটার। এবার প্রতি মিনিটে মোট 250 মিলিলিটার অক্সিজেন যদি ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে, তবে নির্ণেয় হার্দ উৎপাদ হবে $= \frac{250}{5} \times 100$ মিলিলিটার বা 5 লিটার।

অতএব, হার্দ উৎপাদ নির্ণয়ের মূল নীতি,

$$\text{হার্দ উৎপাদ (মিনিট পরিমাণ)} = \frac{\text{প্রতি মিনিটে অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ} \times 100}{\text{ধমনী ও শিরারক্তের } O_2\text{-এর পার্থক্য}}$$

স্পাইরোমিটার (spirometer) বা ডগলাস ব্যাগের (Douglas bag) সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। সিরিঞ্জের সাহায্যে ধমনীরক্তের নমুনা সংগ্রহ করে তার অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ফুসফুস স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় হলে শুধুমাত্র শিরারক্তের বিশ্লেষণ করে এবং ধমনীরক্তকে 95% সম্পৃক্ত ধরে নিয়ে হার্দ উৎপাদ নির্ণয় করা যেতে পারে।

(b) **রঞ্জন পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণে কোন নির্বিষ রঞ্জক পদার্থকে (Evan's blue) বেসিলিক শিরার (basilic vein) মধ্যে প্রবেশ করান হয়। রঞ্জক পদার্থটি হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ক্যারোটিড ধমনীতে (carotid artery) গিয়ে পেঁছায়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ধমনীস্থিত রক্তের একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং একটি **বর্ণ-মাপক যন্ত্রের** (colourimeter) সাহায্যে রক্তস্থিত বর্ণের তীব্রতা নির্ণয় করা হয়। নির্ণীত তীব্রতাকে একটি সেমিলগ পেপারে প্রতিস্থাপন করে তার থেকে রঞ্জক পদার্থের গড় তীব্রতা (mean concentration) নির্ধারণ করা হয়। C গড় তীব্রতা, A অনুপ্রবিষ্ট রঞ্জক পদার্থের পরিমাণ এবং t ধমনীরক্তে রঞ্জক পদার্থের প্রথম প্রবাহ যতক্ষণ পর্যন্ত বজায় থাকে সেই সময়কে (সেকেণ্ড) বুঝালে নিম্নলিখিত সূত্রদ্বারা অতি সহজেই এক মিনিটে রক্ত প্রবাহের পরিমাণ বা হার্দ উৎপাদ নির্ণয় করা যায়।

$$\text{হার্দ উৎপাদন} = \frac{60A}{Ct} \text{ লিটার/মিনিট}$$

রঞ্জন পদ্ধতিতে কোন লোকের দেহে 12 মিলিগ্রাম রঞ্জক পদার্থ ইন্‌জেকশন করার পর নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তার ধমনী থেকে রক্তের একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত রক্তের গড় তীব্রতা যদি প্রতি লিটারে 10 মিলিগ্রাম হয় এবং ধমনী রক্তে রঞ্জকপদার্থের প্রথম প্রবাহ 15 সেকেণ্ড ধরে বজায় থাকে, তাহলে তার হার্দ উৎপাদের পরিমাণ হবে,

$$\text{হার্দ উৎপাদ (মিনিট পরিমাণ)} = \frac{60\text{A}}{\text{Ct}} = \frac{60 \times 12}{10 \times 15} = 4 \cdot 8 \text{ লিটার}$$

এক্ষেত্রে ঘাত পরিমাণের মান হবে, 4·8/75 বা 64 মিলিলিটার।

(c) **ব্যালিস্‌টোকার্‌ডিওগ্রাফি (Ballistocardiography)** : নিউটনের তৃতীয় সূত্রের মূলনীতি এই পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট লোককে ব্যালিস্‌টোকার্‌ডিওগ্রাফ টেবিলে চিৎ করে শোয়ান হয়। হৃৎপিণ্ডের রক্ত ধমনীতে উৎক্ষিপ্ত হলে অথবা নিম্নগ আওর্টার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে তার দেহে যে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাতে টেবিলটি বিপরীত দিকে দোল খায়। টেবিলের এই দোল বা বিচলনকে সুসংবেদী ইলেকট্রনীয় যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করলে যে পর্যায়ক্রমিক তরংগ পাওয়া যায়, তাকে **ব্যালিস্‌টোকার্‌-ডিওগ্রাম** বলা হয়। ব্যালিস্‌টোকার্‌ডিওগ্রামের প্রথম ঋণাত্মক তরংগ (I) এবং দ্বিতীয় ধনাত্মক তরংগের (J) অন্তর্নিহিত ক্ষেত্রফলের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের ঘাত-পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।
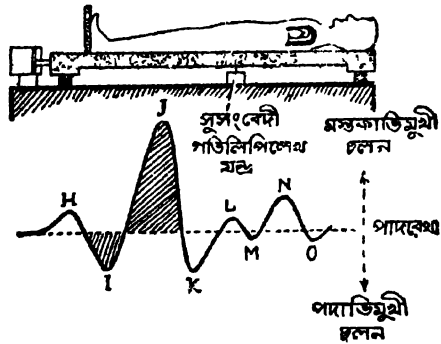
12 20নং চিত্র : রেখাংশসহ ব্যালিসটোকার্‌ডিওগ্রাফি।

হৃৎপিণ্ডের রক্ত আওর্টাতে উৎক্ষিপ্ত হলে দেহ পশ্চাদ-অভিমুখী যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তার ফলে ঋণাত্মক I-তরংগের সৃষ্টি হয়। তেমনি নিম্নগ আওর্টার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় রক্ত দেহে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার ফলে দেহ সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং ধনাত্মক J-তরংগের সৃষ্টি হয়। এই দুটো তরংগের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফলের পরিমাপ করে নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে হার্দ উৎপাদ নির্ণয় করা যায় :

$$\text{ঘাত পরিমাণ} = 7\sqrt{2AC}\ (\overline{I+J})/3$$

এখানে, A=আওর্টার ব্যাস, C=সেকেণ্ডে হৃৎচক্রের স্থায়িত্ব।

(d) হার্দ ফুসফুসীয় প্রস্তুতি (Heart-lung preparation) : এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র স্বাভাবিক হার্দ উৎপাদই নয়, বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থায় প্রাণীর (বিশেষত কুকুর ও বিড়ালের) হার্দ উৎপাদের পরিবর্তনকেও অনুশীলন করা যায়। 12-21নং চিত্রে হার্দ ফুসফুসীয় প্রস্তুতির ব্যবস্থাপনা দেখান হয়েছে।

কুকুর বা বিড়ালকে প্রথমে অবেদনিক (anesthesia) প্রয়োগ করে এবং
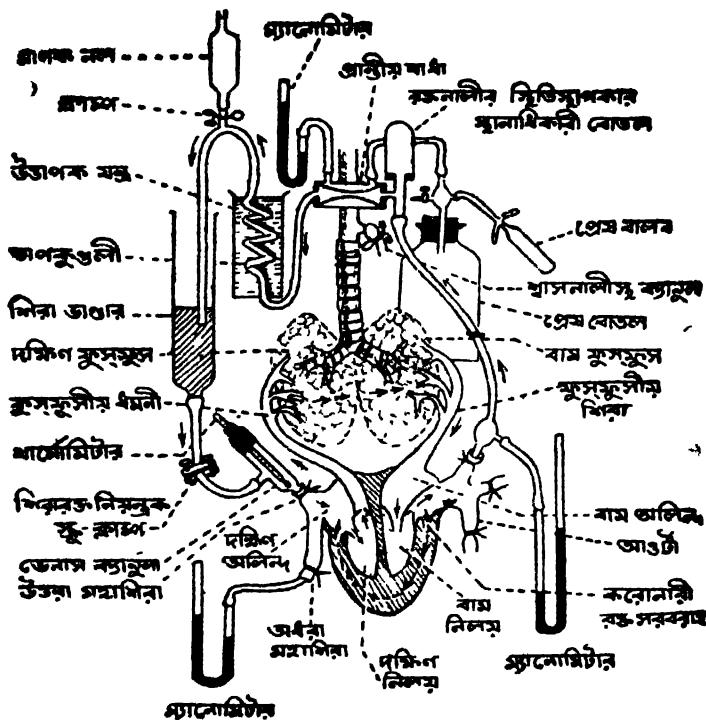
12-21নং চিত্র : হার্দ ফুসফুসীয় প্রস্তুতি।

তার শ্বাসনালীতে নল দিয়ে প্রেসার পাম্পের দ্বারা কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর অপারেশনের দ্বারা বক্ষচ্ছেদ করে তার হৃৎপিণ্ডকে অনাবৃত করা হয় এবং ভেগাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় (হৃৎস্পন্দনের পরিবর্তন রোধকল্পে)। ত্রিমুখী ক্যানুলার (cannula) একপ্রান্ত আওর্টার

একটি শাখা, দ্বিতীয় প্রান্ত প্রেষ-বোতল (press bottle) এবং তৃতীয় প্রান্ত একটি পারদ ম্যানোমিটারের সংগে-সংযুক্ত করা হয়। নিম্নগ আওর্টার অন্য সব শাখাকে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। প্রেষ-বোতলের বায়ু ধমনীগাত্রের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ধমনীনলের সংগে রাবার নির্মিত যে পার্শ্ব নলটি যুক্ত করা হয়, তাকে একটি বদ্ধ কাচের নলে রাখা হয়। কাচের নলের সংগে প্রেসার পাম্পের সংযোগ থাকায় প্রেসার বা চাপের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার মধ্যস্থিত রবার নলের চাপের পরিবর্তন ঘটান যায়। এই ব্যবস্থা ধমনীর প্রান্তীয় বাধার (preipheral resistance) মত কাজ করে। চাপের পরিমাপ করার জন্য একটি ম্যানোমিটার কাচনলের সংগে যুক্ত থাকে।

প্রান্তীয় বাধার অপর প্রান্ত একটি তাপ কুণ্ডলীর (warming coil) সংগে যুক্ত করা হয়। তাপকুণ্ডলী উষ্ণতানিয়ন্ত্রক জলগাহে ডুবান থাকে। তাপ কুণ্ডলীকে এরপর একটি নলের দ্বারা শিরাভাণ্ডারের (venous reservor) সংগে যুক্ত করা হয়। শিরাভাণ্ডার ও একটি থার্মোমিটারকে উত্তরা মহাশিরার (superior vena cava) সংগে যুক্ত করা হয়। উত্তরা মহাশিরার অন্যান্য শাখাকে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। উত্তরা মহাশিরার সংগে একটি পারদ ম্যানোমিটার যুক্ত করা হয়।

শিরাভাণ্ডার থেকে রক্ত প্রথমে দক্ষিণ অলিন্দে, দক্ষিণ অলিন্দ থেকে দক্ষিণ নিলয়ে, দক্ষিণ নিলয় ফুসফুসের মাধ্যমে বাম অলিন্দে ও পরিশেষে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। বাম নিলয় থেকে ব্রাকিওসেফালিক ধমনীর (আওর্টার শাখা) মাধ্যমে ইহা প্রান্তীয় বাধা ও তাপকুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে পুনরায় শিরাভাণ্ডারে প্রবেশ করে।

তাপকুণ্ডলী ও শিরাভাণ্ডারের মধ্যবর্তী ক্ল্যাম্পকে অপসারণ করে এবং রক্তকে একটি মাপক সিলিণ্ডারে নির্দিষ্ট সময় ধরে সংগ্রহ করে বাম নিলয়ের হার্দ উৎপাদ নির্ণয় করা হয়। সঠিক মান পেতে গেলে করোনারী রক্তনালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্তকেও এর মধ্যে যোগ করতে হবে।

(e) **কারডিওমিটার** (Cardiometer): এই পদ্ধতিতে বক্ষচ্ছেদের মাধ্যমে প্রাণীর হৃৎপিণ্ডকে অনাবৃত করে একটি পাতলা ডায়াফ্রাম আটা কারডিওমিটারে প্রবেশ করান হয়। ডায়াফ্রাম হৃৎপিণ্ডের অলিন্দ-নিলয় খাঁজে (atrioventricular grove) এটে যায়। কারডিওমিটারের নল একটি পিসটোন ও লেখনীর সংগে যুক্ত থাকে। ডায়াস্টোলের সময় নিলয়ের আয়তন

বৃদ্ধি পায় এবং সিস্টোলের সময় তা হ্রাস পায়। ডায়াস্টোলের সময় নিলয়ের আয়তন যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে 2 দিয়ে ভাগ করলে প্রতি নিলয়ের হার্দ উৎপাদের পরিমাণ পাওয়া যায়।

3. **হার্দ উৎপাদের নিয়ন্ত্রণ** (Control of Cardiac Output) **:** নিম্নলিখিত 4টি কারণ বিশেষভাবে হার্দ উৎপাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী **:** **হৃৎপিণ্ডের সংকোচনবল** (force of the contraction of heart), **হৃৎস্পন্দনের কম্পনাংক** (frequency of heart beat), **শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন** (venous return) এবং প্রান্তীয় বাধা (peripheral resistance)।

(a) **হৃৎপিণ্ডের সংকোচনবল** (Force of the contraction of the heart) **:** হার্দ উৎপাদ পেশীসংকোচনের বলের সংগে সমানুপাতিক। অর্থাৎ নিলয় পেশীর সংকোচনবল বৃদ্ধি পেলে হার্দ উৎপাদও বৃদ্ধি পায়। স্টার্লিং-এর মতে সংকোচন বল বা **সংকোচনের শক্তি হৃৎপেশীর প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক।** একে **হৃৎপিণ্ডের স্টার্লিং সূত্র** (Starling's law of the heart) বা **ফ্র্যাংক-স্টার্লিং সূত্র** (Frank-Starling law) নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ হৃৎপেশীর প্রাথমিক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে পেশীসংকোচনের বল বৃদ্ধি পাবে এবং সংকোচনবলের বৃদ্ধির সংগে সংগে হার্দ উৎপাদও বৃদ্ধি পাবে।

হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে, নিলয়পেশীর প্রাথমিক দৈর্ঘ্য তার **প্রসারণশেষের আয়তনের** (end diastolic volume) সংগে সমানুপাতিক। অর্থাৎ প্রসারণের সময় নিলয়ে রক্তের পূর্তি বেশী হলে হৃৎপেশীর প্রাথমিক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। নিলয়ের প্রসারণ-বিরতি (diastolic pause) বৃদ্ধি পেলেও রক্তের পূর্তি বৃদ্ধি পায় ও হৃৎপেশীর প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটায়। হৃৎপেশীর দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের দ্বারা হার্দ উৎপাদের নিয়ন্ত্রণকে **অসমদৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ** (heterometric regulation) এবং দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধুমাত্র সংকোচন ধর্মের (contractility) পরিবর্তনের দ্বারা হার্দ উৎপাদের নিয়ন্ত্রণকে **সমদৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ** (homometric regulation) বলা হয়।
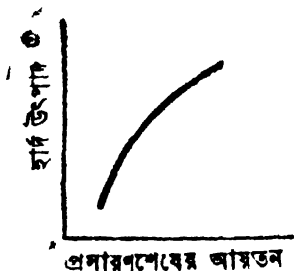
12-22নং চিত্র **:** নিলয়ের উৎপাদ ও প্রসারণশেষের আয়তনের (EDV) সম্পর্ক।
(ফ্র্যাংক স্টার্লিং রেখাচিত্র)

নিলয়ের রক্তপূর্তির উপর আর যেসব কারণ প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে প্রধান : মোট রক্তপরিমাণ, শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন, অন্তর্বক্ষগহ্বরীয় চাপের পরিবর্তন, দেহের অবস্থান, অস্থিপেশীর পাম্পক্রিয়া, পেরিকারডিয়ামের অন্তর্বর্তী চাপ, স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুর উদ্দীপনা প্রভৃতি। স্বতন্ত্র স্নায়ু উদ্দীপিত হলে হৃৎপেশীর সংকোচনবল বৃদ্ধি পায়। স্বতন্ত্র স্নায়ুর উদ্দীপনা থেকে নিঃসৃত ক্যাটেকোলামিনই (catecholamines) হৃৎপেশীর সংকোচনবল বৃদ্ধি করে। এই ঘটনাকে **আইনোট্রোপিক ইফেক্ট** (inotropic effect) বলা হয়। হৃৎপেশীর সংকোচনবলের বৃদ্ধিকে ধনাত্মক আইনোট্রোপিক এবং হ্রাসকে ঋণাত্মক আইনোট্রোপিক ইফেক্ট বলা হয়। ক্যাটেকোলামিন ধনাত্মক আইনোট্রোপিক ইফেক্ট এবং ভেগাসের উদ্দীপনা অলিন্দ পেশীতে ঋণাত্মক আইনোট্রোপিক ইফেক্ট প্রদর্শন করে।

ক্যাটেকোলামিন প্রধানত β-গ্রহকের মাধ্যমে এই প্রভাব বিস্তার করে। β-গ্রাহকের সক্রিয়তা আবার cAMP এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। জানথিন (xanthines), যেমন ক্যাফেইন (caffeine) ও থিওফাইলিন, (theophylline) যা cAMPকে ভাঙ্গতে বাধাদান করে ধনাত্মক আইনোট্রোপিক হিসাবে কাজ করে। গ্লুকাগোন cAMP এর উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটায় বলে ধনাত্মক আইনোট্রোপিক হিসাবে কাজ করে।

(b) **হৃৎস্পন্দনের কম্পাংক** (Frequency of heart beat) **:** হৃৎস্পন্দনের কম্পাংক হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ বিরতির দৈর্ঘ্য ক (diastolic pause) পরিবর্তিত করে। এই পরিবর্তনের ফলে হৃৎস্পন্দনের হার, হৃৎপিণ্ডের ঘাত পরিমাণ, হৃৎপিণ্ডের মিনিট পরিমাণ, হৃৎপেশীর সংকোচন বল ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়। শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন অপরিবর্তিত থাকলে হৃৎস্পন্দনের হারের বৃদ্ধিতে প্রসারণবিরতির দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়, ফলে হৃৎপিণ্ডের ঘাত পরিমাণ (stroke volume) কমে যায়। তবে হৃৎস্পন্দনের হার $\times$ ঘাতপরিমাণ অর্থাৎ মিনিট পরিমাণ (minute volume) হ্রাস নাও পেতে পারে। তবে হৃৎস্পন্দনের হার অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে মিনিট পরিমাণ হ্রাস পায়।

হৃৎস্পন্দনের হার প্রাথমিকভাবে হৃৎপিণ্ডের স্নায়ু সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। স্বতন্ত্র স্নায়ু উদ্দীপিত হলে হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পরাস্বতন্ত্র স্নায়ু উদ্দীপিত হলে হৃৎস্পন্দনের হার হ্রাস পায়। স্বতন্ত্র স্নায়ু উদ্দীপিত হলে স্নায়ুপ্রান্ত থেকে ক্যাটেকোলামিন নিঃসৃত হয় এবং

হৃৎস্পন্দনকে উদ্দীপিত করে। এই ঘটনাকে ক্রোনোট্রোপিক ইফেক্ট (chronotropic effect) বলা হয়।

(c) **শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন** (Venous return)**:** শিরারক্তের প্রত্যাবর্তনের সংগে হার্দ উৎপাদের পরিবর্তন অনেকটা সমানুপাতিক। যেসব কারণ শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন নিয়ন্ত্রিত করে তারা হার্দ উৎপাদেরও পরিবর্তন ঘটায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, পেশীসঞ্চালন, রক্তজালিকা ও শিরার মধ্যে রক্তচাপের পার্থক্য, উপধমনী ও উপশিরার (arterioles or venules) উপরে বাহনিয়ামক (vasomotor) অংশের প্রভাব, রক্তপরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি যেমন শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি তারা হার্দ উৎপাদকেও নিয়ন্ত্রিত করে।

(d) **প্রান্তীয় বাধা** (Peripheral Resistance)**:** প্রান্তীয় বাধার হ্রাস বৃদ্ধিতে হার্দ উৎপাদের পরিবর্তন ঘটে। সাধারণভাবে উপধমনীর (arterioles)

12-23 নং চিত্র: প্রান্তীয় বাধার বৃদ্ধির ফলাফল। A—ধমনী বাধার বৃদ্ধি, B—বাধার পূর্বাবস্থায় হ্রাস।

সংকোচনের ফলে প্রান্তীয় বাধা বৃদ্ধি পায় ও রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটায়। প্রথমে পেশীসংকোচন শক্তিশালী না হওয়ায় হার্দ উৎপাদ ব্যাহত হয়। পরে হৃৎপিণ্ডে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চিত হবার ফলে হৃৎপেশীর প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি

ঘটে এবং সংকোচনবলও বৃদ্ধি পায়। হৃৎপিণ্ড তখন অধিক পরিমাণ রক্তকে উৎক্ষেপণ করে। প্রান্তীয় বাধার বৃদ্ধির ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে শিরারক্ত চাপ, হৃৎপিণ্ডের আকৃতি অর্থাৎ প্রসারী আয়তন (diastolic volume), ঘাতপরিমাণ (stroke volume), সংকোচী আয়তন (systolic volume) সবই বৃদ্ধি পায় (12-23 নং চিত্র)।

(c) হার্দ উৎপাদের পরিবর্তনের জন্য দায়ী অন্যান্য কারণসমূহ (Other factors controlling cardiac out put) : অন্যান্য যেসব কারণ হার্দ উৎপাদের পরিবর্তন ঘটায় তারা নিম্নরূপ : ব্যায়াম, জ্বর, উত্তেজনা, দেহভংগি, সুপ্তাবস্থা, রক্তক্ষরণ, হৃদরোগ, থাইরোয়েড গ্রন্থির অধিক ও স্বল্প সক্রিয়তা (hyper and hypothyroidism) ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যায়ামের মাত্রা বৃদ্ধির সংগে হার্দ উৎপাদও বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে, ভারী ব্যায়াম বা পেশীসঞ্চালনে হার্দ উৎপাদ স্বাভাবিকের চেয়ে 10 গুণ বৃদ্ধি পায়। দণ্ডায়মান অবস্থার চেয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় হার্দ উৎপাদের বৃদ্ধি ঘটে, কারণ প্রথমাবস্থায় অভিকর্ষের টান অধিক ক্রিয়া করে বলে হৃৎপিণ্ডে শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন কম হয়; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অভিকর্ষের টান কম ক্রিয়া করে বলে শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন অধিক হয়। নিদ্রাবস্থায় হার্দ উৎপাদ সামান্য হ্রাস পেতে দেখা যায়। উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে হার্দ উৎপাদ 10-25 শতাংশ বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। রক্তস্রাব, হৃদরোগ, থাইরয়েড গ্রন্থির স্বল্প-সক্রিয়তা ইত্যাদিতে হার্দ উৎপাদ হ্রাস পায়। জ্বর ও থাইরয়েড গ্রন্থির অধিক সক্রিয়তায় এর বৃদ্ধি ঘটে। এছাড়া খাদ্যবস্তুর গ্রহণ, পরিপাক, অধিক CO_2, অক্সিজেনের অভাব, অ্যাডরেন্যালিন, নরঅ্যাড্রেন্যালিন প্রভৃতি হার্দ উৎপাদকে বৃদ্ধি করে। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় হার্দ উৎপাদ প্রায় 45-85 শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

হৃৎচক্রের যান্ত্রিক ঘটনাবলী

Mechanical Events of the Cardiac cycle

প্রতিটি হৃৎস্পন্দনে হৃৎপিণ্ডে যেসব পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, পরবর্তী হৃৎস্পন্দনেও সেসব পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। স্পন্দন থেকে স্পন্দনে হৃৎপিণ্ডের এই চক্রাকার পরিবর্তন হৃৎচক্র (cardiac cycle) নামে পরিচিত। স্বাভাবিক ভাবে হৃৎস্পন্দনের হার যেহেতু মিনিটে 70-80 বার (গড়ে 75), সেহেতু প্রতি হৃৎচক্রের স্থিতিকাল প্রায় 60/75 বা 0·8 সেকেণ্ড। হৃৎচক্রের স্থিতিকাল হৃৎস্পন্দনের সংগে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়।

1. হৃৎচক্রে অলিন্দ ও নিলয়ের ঘটনা প্রবাহ (Atrial and ventricular events in cardiac cycle) : হৃৎচক্রের প্রধান ঘটনাপ্রবাহকে প্রধানত 4 ভাগে বিভক্ত করা। যথা :

(a) অলিন্দের সংকোচন (atrial systole)
(b) অলিন্দের প্রসারণ (atrial diastole)
(c) নিলয়ের সংকোচন (ventricular systole)
(d) নিলয়ের প্রসারণ (ventricular diastole)

1 (a). অলিন্দের সংকোচন (Atrial Systole) : অলিন্দের পেশী-সংকোচন 0·1 সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। এই সংকোচনকালে অলিন্দস্থিত কিছু অতিরিক্ত রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে কারণ প্রায় 70% রক্ত নিলয়ের প্রসারণকালীন পূর্তিদশায় নিষ্ক্রিয় ভাবে প্রবেশ করে। বাম অলিন্দ S. A. নোড থেকে খানিকটা দূরত্বে অবস্থান করায় দক্ষিণ অলিন্দের সামান্য পরে ইহা সংকুচিত হয়। অলিন্দের সংকোচনের প্রথমার্ধে পেশীসংকোচনবল অধিকতর বেশী বলে প্রথমার্ধের সংকোচনকে গতিশীল পর্যায় (dynamic phase) এবং শেষার্ধে পেশীসংকোচনবল তুলনামূলকভাবে কম বলে, শেষার্ধের সংকোচনকে স্থিতিশীল পর্যায় adynamic phase) নামে অভিহিত করা হয়।

12-24 নং চিত্র : অলিন্দের সংকোচন।

1 (b). অলিন্দের প্রসারণ (Atrial Diastole) : অলিন্দের পেশীপ্রসারণ 0·7 সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। এই সময়ে অলিন্দের পেশীপ্রসারণে শিরাস্থিত রক্ত অলিন্দে প্রবেশ করে। দক্ষিণ অলিন্দ মহাশিরা ও বাম অলিন্দ ফুসফুসীয় শিরা থেকে রক্ত গ্রহণ করে। অলিন্দের প্রসারণের পরমুহূর্তেই পুনরায় অলিন্দের সংকোচন শুরু হয়। এভাবে সংকোচন ও প্রসারণের পর্যায়ক্রমিক পুনরাবৃত্তি ঘটে।

1 (c). নিলয়ের সংকোচন (Ventricular Diastole) : নিলয়ের সংকোচন মোট 0·3 সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। অলিন্দের সংকোচন শেষ হবার ঠিক পরমুহূর্তেই নিলয়ের সংকোচন আরম্ভ হয়। নিলয়ের সংকোচনকালকে দুভাবে ভাগ করা যায় :

(I) **সমদৈর্ঘ্য সংকোচনকাল (0·05 সে)**

(II) **নিক্ষেপণকাল (0·25 সে)**

(a) সর্বাধিক নিক্ষেপণকাল (0·11 সে.)

(b) মন্থর নিক্ষেপণকাল (0·14 সে.)

নিলয়ের সংকোচনের শুরুতে অলিন্দ-নিলয় ভালব বা কপাটিকা বন্ধ হয়। বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে **প্রথম হৃৎধ্বনি** (first heart sound) শোনা যায়। কপাটিকাদ্বয় বন্ধ হয়ে যাবার পরই নিলয়ের **সমদৈর্ঘ্য সংকোচন** (isometric contraction) শুরু হয়। নিলয় এই সময় নিজের সঞ্চিত রক্তের ওপরই রুদ্ধ-দ্বার গহ্বরের মত সংকুচিত হতে থাকে। এ সময় হৃৎপেশীর দৈর্ঘ্য সামান্য হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু আন্তর্নিলয় রক্তচাপ (intraventricular pressure) দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মাইট্রাল ও ট্রাইকাসপিড ভালব বা কপাটিকা অলিন্দের দিকে ঠেলে ওঠে। সংকোচন শুরু হওয়া থেকে মহাধমনী ও ফুসফুসীয় ধমনীর সেমিলুনার ভালব বা অর্ধচন্দ্র কপাটিকা উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের এই ব্যবধানকে নিয়ে **সমদৈর্ঘ্য সংকোচনকাল** (isometric contraction period) গঠিত। এর স্থিতিকাল প্রায় 0·05 সেকেণ্ড।
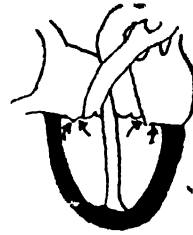
12-25 নং চিত্র : নিলয়ের সমদৈর্ঘ্য সংকোচন।

সমদৈর্ঘ্য সংকোচন শেষ হবার পরই মহাধমনী ও ফুসফুসীয় ধমনীর অর্ধচন্দ্র কপাটিকাদ্বয় উন্মুক্ত হয় এবং নিলয়ের রক্ত সজোরে রক্তসংবহনে নিক্ষিপ্ত হয়। বাম নিলয়ের রক্ত মহাধমনীতে এবং দক্ষিণ নিলয়ের রক্ত ফুসফুসীয় ধমনীতে নিক্ষিপ্ত হয়। (12-26নং চিত্র)। নিলয়ের রক্ত যতক্ষণ ধরে সংবহনে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে তাকে **নিক্ষেপণকাল** (ejection period) বলা হয়। নিক্ষেপণকালের মোট স্থায়িত্ব 0·25 সেকেণ্ড। প্রথমার্ধে নিলয়ের রক্ত-নিক্ষেপণ অধিকতর দ্রুত বলে এই সময়কে **সর্বাধিক নিক্ষেপণকাল** (maximum ejection period) বলা হয়। এর স্থিতিকাল 0·11 সেকেণ্ড। দ্বিতীয়ার্ধে রক্তের গতি কিছুটা মন্দীভূত হয়ে পড়ে। এই সময়কে
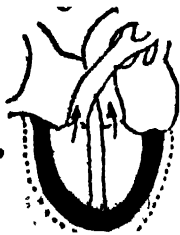
12-26 নং চিত্র : নিলয়ের নিক্ষেপণ।

হ্রস্বের নিক্ষেপণকাল (reduced ejection period) বলা হয়। এর স্থিতিকাল 0·14 সেকেণ্ড। নিলয়ের সংকোচন এখানেই সমাপ্ত হয় এবং নিলয়ের প্রসারণ শুরু হয়।
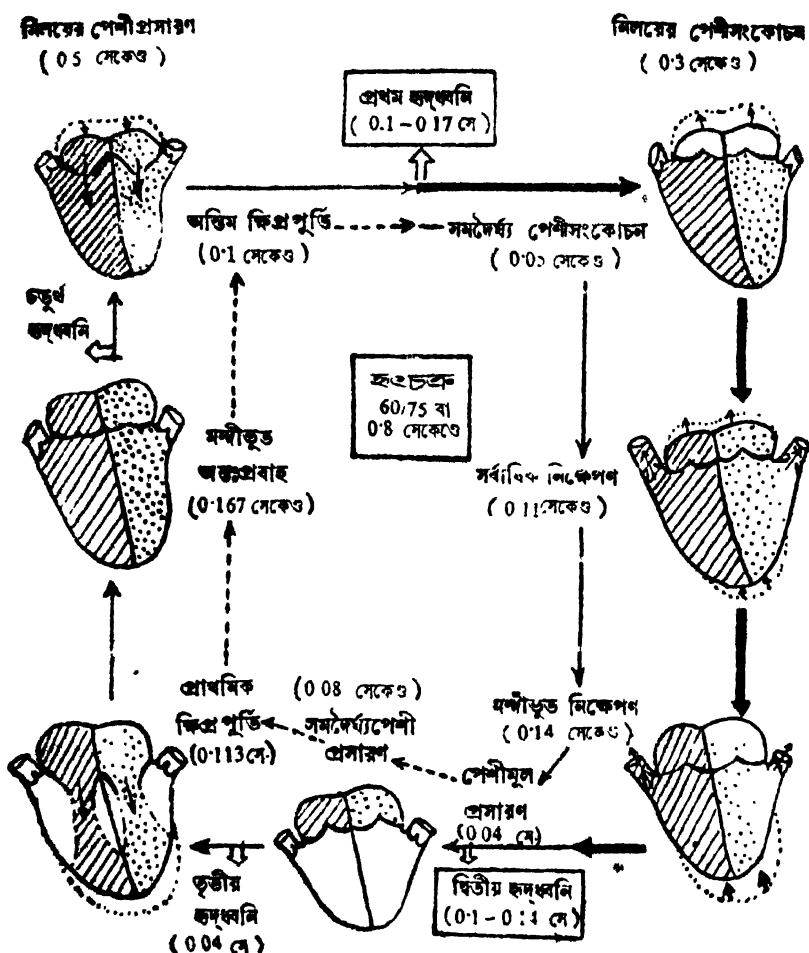
12-27 নং চিত্র : হৃদ্‌চক্রে অলিন্দ ও নিলয়ের পরিবর্তন ও তাদের স্থিতিকাল।

1(d). **নিলয়ের প্রসারণ** (Ventricular Systole) : নিলয়ের প্রসারণের স্থায়িত্ব 0·5 সেকেণ্ড। নিলয়ের প্রসারণকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় :

(1) **পেশীমূল বা আদি প্রসারণকাল** (0·04 সে)

(2) **সমদৈর্ঘ্য প্রসারণকাল** 0·08 সে.)

(3) **প্রাথমিক ক্ষিপ্র পূর্তিদশা** (0·113)

(4) **মন্থর বা মন্দীভূত অন্তঃপ্রবাহ দশা** (0·167)

(5) **সর্বশেষ ক্ষিপ্র পূর্তিদশা** (0·10)

নিলয়ের প্রসারণের সময়ে নিলয়ের আভ্যন্তরীণ রক্তচাপ হ্রাস পায়, ফলে মহাধমনীর ও ফুসফুসীয় ধমনীর রক্ত নিলয়ে ফিরে আসতে চায়। ঠিক এই মুহূর্তে অর্ধচন্দ্র কপাটিকাদ্বয় রুদ্ধ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি উদগত হয়। নিলয়ের প্রসারণ ও অর্ধচন্দ্র কপাটিকাদ্বয়ের রুদ্ধ হয়ে যাবার মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত সময়টুকুকে **আদি প্রসারণকাল** protodiastolic period) বলা হয় (12-28 নং চিত্র)। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের স্থিতিকাল 0 04 সেকেণ্ড। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের অন্তিম মুহূর্তে হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনির উদ্ভব হয়।

অর্ধচন্দ্র কপাটিকা রুদ্ধ হয়ে যাবার পরও নিলয়ের চাপ হ্রাস পেতে থাকে এবং যখন অলিন্দের রক্তচাপের চেয়ে নিচে নেমে আসে তখনই সমদৈর্ঘ্য প্রসারণকাল শেষ হয় এবং মাইট্রাল ও ট্রাইকাসপিড ভালব খুলে যায়। অর্ধচন্দ্র কপাটিকা বন্ধ হওয়া ও অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা উন্মুক্ত হওয়া, এই দুটো পারস্পরিক ঘটনার অন্তর্বর্তী সময়কে **সমদৈর্ঘ্য প্রসারণকাল** (isometric relaxation period) নামে অভিহিত করা হয়। এই সময়ের স্থিতিকাল 0·08 সেকেণ্ড।

12-28 নং চিত্র : আদি প্রসারণকাল।

অর্থাৎ নিলয় এই সময়ে একটি রুদ্ধ প্রকোষ্ঠের মত পসারিত হয় এবং তার আভ্যন্তরীণ রক্তচাপ অত্যধিক দ্রুতগতিতে হ্রাস পায়। সমদৈর্ঘ্য সংকোচনকালের শেষ মুহূর্তে অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা উন্মুক্ত হয় এবং রক্তস্রোত প্রবল বেগে নিলয়ে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের তৃতীয় হৃদধ্বনি বিশেষত এই মুহূর্তে উত্থিত হয়।

অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা উন্মুক্ত হবার পর প্রথমার্ধে নিলয়ে রক্তের নিম্ন গতি অত্যন্ত তীব্রতর হয়। প্রথমার্ধের এই সময়কে **প্রাথমিক ক্ষিপ্র পূর্তিদশা** (first rapid filling phase) বলা হয়। এই সময়ের স্থিতিকাল 0·113 সেকেণ্ড। নিলয়ের সর্বাধিক পরিমাণ রক্ত এই সময়ের মধ্যেই হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। মধ্যবর্তী সময়ে রক্তপ্রবাহ খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসে এবং অনেকক্ষণ ধরে চলে। এই সময়কে **মন্থর অন্তঃপ্রবাহ দশা** (slow inflow phase) বলা হয়। এই সময়ের স্থিতিকাল সর্বাধিক 0 167 সেকেণ্ড, কিন্তু রক্তপূর্তির পরিমাণ এই সময়ে সর্বাপেক্ষা কম।

নিলয়ের প্রসারণের শেষাংশ অলিন্দের সংকোচনের শেষাংশের সংগে একীভূত হয়। এই সময়ে অলিন্দের সংকোচনের ফলে নিলয়ে রক্তের প্রবাহ হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। এই সময়কে তাই **সর্বশেষ ক্ষিপ্রপূর্তি দশা** (last rapid filling phase) নামে অভিহিত করা হয়। এর স্থিতিকাল 0 1 সেকেণ্ড। রক্তের তীব্র প্রবাহে এই সময়ে আর একটি হৃদ্‌ধ্বনি উত্থিত হয়, যাকে হৃৎপিণ্ডের চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি বলা হয়। নিলয়ের প্রসারণের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে এবং পুনরায় নিলয়ের পেশীসংকোচন শুরু হয়। হৃৎচক্র এভাবেই আবর্তিত হয়।
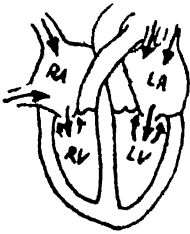
12-29 নং চিত্র : সর্বশেষ ক্ষিপ্র-পূর্তিদশা।

হৃৎচক্রের সময় চাপ ও আয়তনের পরিবর্তন

Pressure Volume Changes during Cardiac cycle

উপকনুই শিরার (antecubital vein) মধ্য দিয়ে সরু রাবারের নলকে সরাসরি দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয়ে পাঠিয়ে এই দুটো প্রকোষ্ঠের রক্তচাপের প্রত্যক্ষ পরিমাপ করা সম্ভবপর। এ ছাড়া জগুলার শিরার রক্তচাপের পরিমাপ করে পরোক্ষভাবে দক্ষিণ অলিন্দের রক্তচাপের অনুশীলন করা যায়। কার্ডিও-মিটার (cardiometer) যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের আয়তনের পরিবর্তনকে গতিশীল কাইমোগ্রাফে রেকর্ড করা হয়। এসব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে হৃৎচক্রের বিভিন্ন দশায় হৃৎপ্রকোষ্ঠের চাপ ও আয়তনের যে পরিবর্তন নির্ণীত হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা গেল।

1. **অলিন্দ রক্তচাপের পরিবর্তন** (Atrial blood pressure change) :

অলিন্দের পেশীসংকোচনের প্রথমার্ধে অলিন্দ-রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটে, পরে তা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে লেখচিত্রের a-তরংগের উদ্ভব ঘটে (12-30 নং চিত্র)। অলিন্দের পেশীপ্রসারণের প্রারম্ভে অলিন্দ-রক্তচাপ হ্রাস না পেয়ে হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং ধনাত্মক b-তরংগের সৃষ্টি করে। এই রক্তচাপের স্থায়িত্ব
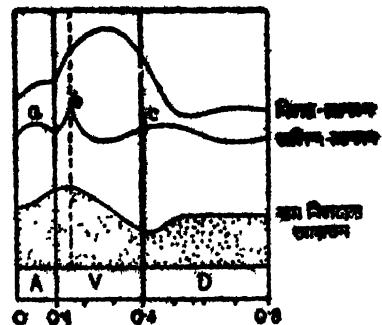
12-30 নং চিত্র : A—অলিন্দ পেশীসংকোচন, V—নিলয় পেশীসংকোচন, D—নিলয় পেশীপ্রসারণ।

নিলয়ের সমদৈর্ঘ্য সংকোচনকালের অনুরূপ। এরপরই আলিন্দ রক্তচাপ দ্রুত-গতিতে হ্রাস পায় এবং নিলয়ের সর্বাধিক নিক্ষেপণকাল পর্যন্ত স্থিতিশীল হয়। নিলয়ের সংকোচনের অন্তিম পর্যায়ে অলিন্দ-রক্তচাপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমদৈর্ঘ্য প্রসারণে এই চাপ আরও কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং ধনাত্মক c-তরংগের সৃষ্টি হয়। অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা উন্মুক্ত হবার সংগে সংগে অলিন্দ-রক্তচাপ হ্রাস পেতে থাকে এবং নিলয়ের প্রসারণের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এভাবে চলে। নিলয়ের মন্থর অন্তঃপ্রবাহ দশায় অলিন্দের রক্তচাপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এরপরই অলিন্দে সংকোচন পুনরায় ফিরে আসে।

কারণ ঃ নিলয় সংকোচনের প্রারম্ভে অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং স্ফীত হয়ে খানিকটা গম্বুজের মত অলিন্দ-গহ্বরে প্রবেশ করে। ফলে অলিন্দ রক্তচাপ হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং ধনাত্মক b-তরংগের সৃষ্টি করে। এরপর অলিন্দ-রক্তচাপের অবনতির জন্য তিনটি কারণ দায়ী ঃ (1) অলিন্দের প্রসারণ তখনও যথারীতি চলতে থাকে, (2) নিলয়ের সংকোচনে অলিন্দনিলয় বলয় নীচের দিকে আকর্ষিত হয়, ফলে অলিন্দ-গহ্বর আরও বিস্তৃত হয়, (3) নিলয়ের আয়তন হ্রাস পায়, ফলে পাতলা প্রাচীরসম্পন্ন অলিন্দের প্রসারণ ঘটে।

নিলয়ের সংকোচনে শেষের দিকে অলিন্দে রক্ত সঞ্চিত হতে থাকে। অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা উন্মুক্ত না হওয়া অবধি রক্ত-সঞ্চয় বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অলিন্দ-রক্তচাপও সমানুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। নিলয়ের সমদৈর্ঘ্য প্রসারণকালে অলিন্দ-নিলয় বলয় উপরের দিকে উঠে যায় এবং অলিন্দ-রক্তচাপের আরও খানিকটা বৃদ্ধি ঘটায়। এরপর অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা উন্মুক্ত হয়, রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে এবং অলিন্দ-রক্তচাপও হ্রাস পায়।

2. **নিলয় রক্তচাপের পরিবর্তন (Ventricular blood-pressure changes) ঃ** নিলয়ের সংকোচনের সময়ে নিলয়-রক্তচাপের যেসব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে তা নিম্নরূপ ঃ (1) সমদৈর্ঘ্য সংকোচনকালে নিলয়ের রক্তচাপ হঠাৎ বৃদ্ধি পায়, (2) পরবর্তী সর্বাধিক নিক্ষেপণকালে নিলয়-রক্তচাপ কিছুটা মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে লেখচিত্র ধীরে ধীরে একটি সমান্তরাল অধিত্যকার (plateau) আকার ধারণ করে। (3) এরপরই নিলয় রক্তচাপ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

নিলয়ের প্রসারণের সময়ে নিলয়-রক্তচাপের যেসব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নরূপ ঃ (1) আদি প্রসারণকালে নিলয়-রক্তচাপ পূর্বের মত একই ভাবে একই

হারে হ্রাস পেতে থাকে, (2) সমদৈর্ঘ্য প্রসারণকালে নিলয়-রক্তচাপের অকস্মাৎ দ্রুত অবনতি ঘটে এবং অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা উন্মুক্ত না হওয়া অবধি এভাবে চলতে থাকে, (3) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা উন্মুক্ত হবার পর রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে এবং নিলয়-রক্তচাপের অবনতি মন্থর হয়ে আসে, (4) মন্থর অন্তঃপ্রবাহ-দশায় চাপ কিছুটা বৃদ্ধি পায়, (5) শেষদশায় (যা অলিন্দের সংকোচনকালের সমান) নিলয়-রক্তচাপ হঠাৎ খানিকটা বৃদ্ধি পায়। এরপর নিলয় সংকোচনের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

কারণ : সমদৈর্ঘ্য সংকোচন : এই সময়ে নিলয়ের উভয় কপাটিকা বন্ধ থাকে এবং আবন্ধ রক্তের উপরে নিলয়ের সংকোচনের প্রচণ্ড চাপ এসে পড়ে।

সর্বাধিক নিক্ষেপণকাল : এই সময়ে হৃৎপিণ্ডের রক্ত মহাধমনীতে নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু নিলয়-রক্তচাপ হ্রাস পায় না। এর কারণ রক্তের বহিঃপ্রবাহের হারের চেয়ে সংকোচনবল সমধিক হয়। এরপর অবশ্য ধীরে ধীরে সংকোচনবল এবং রক্তের বহিঃপ্রবাহের হার সমপর্যায়ে নেমে আসে। লেখচিত্র তাই অধিত্যকার আকৃতি ধারণ করে।

মন্দীভূত নিক্ষেপণকাল : এই সময়ে পেশীসংকোচনবল অধিক পরিমাণে হ্রাস পায়। রক্তের বহিঃপ্রবাহের হারের চেয়েও ইহা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। নিলয়ের সংকোচন এখানেই শেষ হয়।

সমদৈর্ঘ্য প্রসারণকালে নিলয় একটি বন্ধ গহ্বরের মত সক্রিয়ভাবে প্রসারিত হয় এবং এই প্রসারণ অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা উন্মুক্ত না হওয়া অবধি চলতে থাকে। এরপর অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা উন্মুক্ত হওয়ায় রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে, তবে প্রসারণের মাত্রা রক্তপূর্তির চেয়ে তখনও অধিক হওয়ায় নিলয়-রক্তচাপ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

মন্থর অন্তঃপ্রবাহদশায় নিলয়পেশী আর প্রসারিত হয় না, নিলয়-রক্তচাপ তাই খানিকটা বৃদ্ধি পায়। শেষ দশায় অলিন্দ পাম্পের মত রক্তকে নিলয়ে নিক্ষেপ করে, ফলে নিলয়-রক্তচাপের হঠাৎ কিছুটা বৃদ্ধি ঘটে।

হৃদ্ধ্বনি
Heart Sounds

হার্ভে পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন প্রতিটি হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের সময় একটি করে হৃদ্ধ্বনি উত্থিত হয়। তাঁর সময় থেকে চিকিৎসকেরা দুটো হৃদ্ধ্বনির উল্লেখ করে এসেছেন। হৃৎপিণ্ডের সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট এই ধ্বনি

দুটোকে প্রথম ও দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি (first and second heart sounds) বলা হয়। এদের অতি সহজেই হৃদ্‌বীক্ষণ যন্ত্রের (stethoscope) সাহায্যে শোনা যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি নামে হৃৎপিণ্ডের আরো দুটি ধ্বনির অস্তিত্ব আছে যাদের হৃদ্‌বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে স্পষ্টভাবে শোনা যায় না। বুকে মাইক্রোফোন লাগিয়ে ওস্‌সিলোগ্রাফ (oscillograph), দর্পণ ও ফটোগ্রাফি-প্লেটের ব্যবস্থাপনায় যে লেখচিত্র লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় তার থেকেই এই ধ্বনি দুটোর অস্তিত্ব সঠিকভাবে ধরা পড়ে।
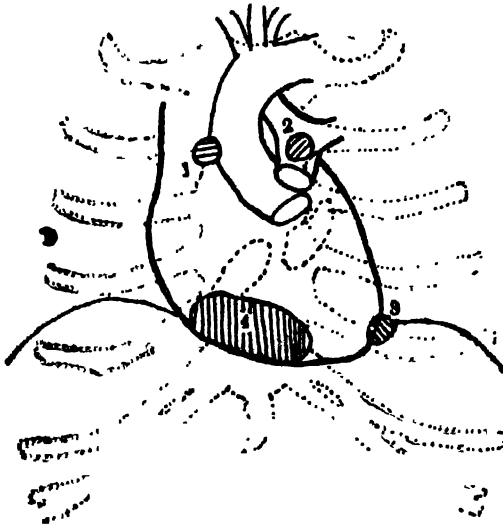
12-31 নং চিত্র : দেহের উপরিতলের যেসব স্থান থেকে নির্দিষ্ট ভাল্‌বের শব্দ সবচেয়ে ভাল শোনা যায়। 1-মহাধমনী, 2-ফুসফুস 3-মাইট্রাল, 4-ট্রাইকাসপিড.

1. **হৃদ্‌ধ্বনির শ্রেণী ও প্রকৃতি** (Division and nature of sounds)

প্রথম ও দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি অনেকটা পাশাপাশি সহাবস্থান করে। দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনির পরই দীর্ঘ বিরতি লক্ষ্য করা যায় (12-32 নং চিত্র)। হৃদ্‌বীক্ষণযন্ত্র ও মাইক্রোফোন ব্যবস্থার সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের যে চারটি ধ্বনির সন্ধান পাওয়া যায়, নীচে তাদের প্রকৃতি ও উৎসের বর্ণনা দেওয়া হল।

(a) **প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি** (First heart sound) **:** নিলয়ের সংকোচনের শুরুতে প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি উত্থিত হয়। এই ধ্বনির স্থিতিকাল 0·1-0·17 সেকেণ্ড, গড়ে 0·15 সেকেণ্ড, কম্পাংক 25-45 H । অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে যাবার সময় কপাটিকার পত্রকে (leaflet) যে কম্পনের সৃষ্টি

হয় তার ফলেই প্রথম হৃদ্‌ধ্বনির সৃষ্টি হয়। অবশ্য নিলয় থেকে মহাধমনী ও ফুসফুসীয় ধমনীতে রক্তক্ষেপণে ধমনীর প্রাচীরগাত্রে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তাও
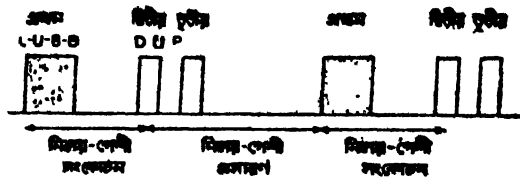
12-32 নং চিত্র : হৃদ্‌ধ্বনির সময়কাল ও প্রকৃতি।

কপাটিকাপত্রের কম্পনের সংগে যুক্ত হয়। প্রথম হৃদ্‌ধ্বনির প্রকৃতি কিছুটা অস্পষ্ট ও দীর্ঘ, অনেকটা ইংরেজী শব্দ L-U-B-B এর মত।

(b) দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি (Second heart sound) : নিলয়ের প্রসারণের প্রারম্ভে দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি উত্থিত হয়। এই ধ্বনির স্থিতিকাল 0·1-0·14 সেকেণ্ড গড়ে 0·12 সেকেণ্ড কম্পাংক 50 H । মহাধমনী ও ফুসফুসীয় ধমনীর ছিদ্রমুখে অর্ধচন্দ্র কপাটিকা রুদ্ধ হয়ে যাবার সময় দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনির সৃষ্টি হয়। অর্ধচন্দ্র কপাটিকার পত্রকে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তা-ই ধ্বনির আকারে শ্রুত হয়। রক্তচাপের সংগে এই ধ্বনির তীব্রতা নির্ভরশীল। দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনির প্রকৃতি তীক্ষ্ন ও হ্রস্ব। অনেকটা ইংরেজী শব্দ DUP-এর মত।

(c) তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি (Third heart sound) : দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনির সামান্য পরেই তৃতীয় হৃদধ্বনির আবির্ভাব ঘটে। এই ধ্বনির স্থিতিকাল 0·04 সেকেণ্ড। অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাদ্বয় উন্মুক্ত হবার পর অলিন্দ থেকে নিলয়ে হঠাৎ রক্ত যে ক্ষিপ্রগতিতে ধাবিত হয়, তার থেকেই তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনির জন্ম হয়। শতকরা 60 জন সুস্থ লোকের ক্ষেত্রে এর অস্তিত্ব ধরা পড়লেও প্রকৃতপক্ষে এর সনাক্তকরণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

(d) চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি (Fourth heart sound : চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনিকে অলিন্দজাত হৃদ্‌ধ্বনিও বলা হয়। এর স্থায়িত্ব প্রায় 0·1 সেকেণ্ড। অলিন্দের সংকোচনের সময় নিলয়াভিমুখী রক্তপ্রবাহ থেকে এই ধ্বনির উদ্ভব হয়। প্রথম হৃদ্‌ধ্বনির ঠিক পূর্বেই চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এই ধ্বনির সনাক্তকরণ খুবই কষ্টকর।

2. হৃদ্‌ধ্বনির গুরুত্ব (Importance of heart sounds) : প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি নিলয়-সংকোচনের সূচনা করে। হৃদ্‌ধ্বনির তীব্রতা ও স্থিতিকাল

হৃৎপেশীর অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে। হৃৎপেশী দুর্বল হলে এর স্থিতিকাল ও তীব্রতার হ্রাস ঘটে। এছাড়া মাইট্রাল ও ট্রাইকাসপিড ভালব বা কপাটিকা সঠিকভাবে রুদ্ধ হচ্ছে কিনা প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি তারও আভাস দেয়।

দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি নিলয় সংকোচনের সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং নিলয়ের প্রসারণের সূচনা করে। দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনির তীক্ষ্ণতা রক্তচাপের সংগে সমানুপাতিক। রক্তচাপের বৃদ্ধিতে হৃদ্‌ধ্বনির তীক্ষ্ণতাও বৃদ্ধি পায় এবং রক্তচাপ হ্রাস পেলে এর তীক্ষ্ণতাও হ্রাস পায়। সুস্পষ্ট ধ্বনি থেকে অর্ধচন্দ্র-কপাটিকাদ্বয় সঠিকভাবে রুদ্ধ হচ্ছে কিনা তাও বুঝতে পারা যায়।

প্রথম দুটো হৃদ্‌ধ্বনির গুরুত্ব সমধিক। তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি শুধুমাত্র নিলয়ে রক্ত-প্রবেশের সূচনা করে এবং চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি নিলয়ে রক্তপূর্তির সমাপ্তি ঘোষণা করে।

অস্বাভাবিক ধ্বনি
Abnormal Sound

রক্তসংবহনের বিভিন্ন অংশে অস্বাভাবিক ধ্বনি বা শব্দ শোনা যায়। এর মধ্যে মারমার (murmurs) এবং ব্রুইট (bruits) অন্যতম। ঘরঘর বা ঝিরঝির শব্দকে মারমার বলা হয়। ঘূর্ণিবাত্যার শব্দের মত অস্বাভাবিক শব্দকে ব্রুইট বলা যায়। বাধাহীন রক্তের প্রবাহ নিঃশব্দ হয়। রক্তের প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হলে বা রক্ত সংকীর্ণ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে প্রবাহের গতি বৃদ্ধির জন্য গতিপথে ঘূর্ণ বা আবর্তের সৃষ্টি হয়, ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়। অবিন্যস্ত গতি থেকেও শব্দ উৎপন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, অত্যধিক রক্তনালীযুক্ত গয়টারের (goiter) বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ব্রুইট শোনা যায়; ধমনীর স্ফীত হয়ে ওঠা অঞ্চলে, A-V ফিসটুলা এবং সুস্পষ্ট ডাকটাস আরটারিওসাসের উপরি অঞ্চল থেকে মারমার শোনা যায়।

হৃৎপিণ্ডের ভালব বা কপাটিকার ত্রুটি থেকেও মারমার ধ্বনি শোনা যায়। যেমন, কোন একটি ভালব বা কপাটিকা সংকীর্ণ হয়ে উঠলে (স্টেনোসিস stenosis) রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক দিকে অবিন্যস্ত (turbulent) হয়ে ওঠে। কোন ভালব অসম্পূর্ণ হলে রক্ত বিপরীত দিকে ছিদ্রপথে প্রবাহিত হয় (অসম্পূর্ণতা, insufficiency)। হৃৎচক্রের যান্ত্রিক ঘটনাবলীর জ্ঞান থেকে কোন ভালব বা কপাটিকার স্টেনোসিস বা অসম্পূর্ণতার জন্য মারমার সংঘটনের সময় নির্ধারণ করা যায় (7নং তালিকা)। কোন ভালবের ত্রুটিজনিত মারমারকে

নির্দিষ্ট ভাল্‌ভের ওপরে বসান স্টেথোস্কোপ থেকে সবচেয়ে ভাল শোনা যায়। যখন মহাধমনীর অর্ধচন্দ্র কপাটিকার কোন ছিদ্র দিয়ে রক্ত পেছন দিকে প্রবাহিত হয় তখন সবচেযে উচ্চধ্বনির মারমার শোনা যায়।

7নং তালিকা : হৃৎপিণ্ডের মারমার।

কপাটিকা	অস্বাভাবিকতা	মারমারের স ব
মহাধমনী বা ফুসফুসীয়	স্টেনোসিস	সিসটোলিক
	অসম্পূর্ণতা	ডায়াসটোলিক
মাইট্রাল বা ট্রাইকাসপিড	স্টেনোসিস	ডায়াসটোলিক
	অসম্পূর্ণতা	সিসটোলিক

যে সব রোগীর জন্মগত ত্রুটির জন্য অন্তর্নিলয় প্রাচীরে ছিদ্র থেকে যায় তাদের ক্ষেত্রে সিস্‌টোলিক মারমার শোনা যায়। রক্তাল্পতা সম্পন্ন রোগীর ক্ষেত্রেও সিসটোলিক মারমার শোনা যায়। রক্তের সান্দ্রতা হ্রাস ও রক্তপ্রবাহের দ্রুততা এর কারণ।

হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রণ

REGULATION OF THE ACTIVITY OF HEART

হৃৎপিণ্ড যদিও তাব নিজস্ব ছন্দে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পাবে তবু তাকে স্নায়ুতন্ত্রের অধীন কাজ করতে হয়, কারণ দেহেব শারীরবৃত্তীয় চাহিদা অনুসাবে সে তার নিজস্ব সক্রিয়তার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটাতে পাবে না। হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তা প্রধানত উচ্চতর স্নায়ুকেন্দ্র ও প্রতিবর্তের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। আবেগ, উত্তেজনা, ভয়ভীতি প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে। এসব উদ্দীপনার উৎস গুরুমস্তিষ্ক, বিশেষত লিম্বিক সংস্থা। এসব উদ্দীপনা হাইপোথালামাস ও সম্ভবত মধ্যমস্তিষ্কের মাধ্যমে মেডালাস্থিত স্নায়ু-কেন্দ্রাবলীতে পৌঁছয় এবং হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রণ ঘটায়। দেহেব বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন উদ্দীপনাও প্রতিবর্তভাবে হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রণ করে।

1. হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুসংযোগ (Cardiac Innervation) : দু ধরনের স্নায়ু হৃৎপিণ্ডে স্নায়ুসংযোগ স্থাপন করে : (a) অ্যাড্রেনালিন ক্ষরণকারী

স্বতন্ত্র স্নায়ু (Adrenergic sympathetic nerves), যারা গ্রীবাদেশীয় স্বতন্ত্র গ্যাংগ্লিয়া থেকে কার্ডিয়াক নার্ভের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছয় এবং S.A. নোড, A.V. নোড, অলিন্দ পেশী ও নিলয় পেশীতে ছড়িয়ে পড়ে; (b) অ্যাসিটাইলকোলিন ক্ষরণকারী **ভেগাস স্নায়ু** (Cholinergic vagus nerves)। ভেগাস স্নায়ু শুধুমাত্র S.A. নোড, A.V. নোড এবং অলিন্দ পেশীতে স্নায়ু সরবরাহ করে। মনুষ্যকলোকে দক্ষিণ ভেগাস প্রধানত S.A. নোডে এবং বাম ভেগাস প্রধান A.V. নোডে ছড়িয়ে থাকে। ভেগাস স্নায়ু নিলয় পেশীতে পৌঁছয় না।

অ্যাড্রেনারজিক স্বতন্ত্র স্নায়ু উদ্দীপিত হলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও সংকোচনবল বৃদ্ধি পায়। হৃৎস্পন্দনের বৃদ্ধিকে স্বতন্ত্র স্নায়ুর **ক্রোনোট্রোপিক অ্যাক্শন** (chronotropic action) এবং সংকোচনবলের বৃদ্ধিকে **আইনো-ট্রোপিক অ্যাক্শন** (inotropic action) বলা হয়।

কোলিনারজিক ভেগাস স্নায়ু উদ্দীপিত হলে হৃৎস্পন্দন হ্রাস পায়। বিশ্রামকালীন অবস্থায় যদিও কার্ডিয়াক স্বতন্ত্র স্নায়ু থেকে অবিরাম প্রবাহ-মোক্ষণ (discharge) ঘটে, মানুষ সমেত অন্যান্য বৃহদাকৃতি প্রাণীতে ভেগাসের অবিরাম প্রবাহমোক্ষণ (vagal tone) তার থেকেও বেশী প্রভাবশালী। পরীক্ষামূলক প্রাণীর ভেগাস স্নায়ু কাটলে হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পায়, আবার অ্যাট্রোপিন (atropine) প্রবেশ করালে মানুষের হৃৎস্পন্দন তার স্বাভাবিক মান (মিনিটে 75 বার) থেকে মিনিটে 150-180 বার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। মানুষের হৃৎপিণ্ডে সরবরাহকারী অ্যাড্রেনারজিক ও কোলিনারজিক এই উভয়প্রকার সংস্থাকে বাধা দিলে হৃৎস্পন্দন (heart rate) প্রায় 100তে গিয়ে দাড়ায়।

2. **হার্দ প্রতিরোধকেন্দ্র** (Cardioinhibitory Center): মেডালাস্থিত নিউক্লিয়াস অ্যামবিগুয়াস (nucleus ambiguus) **হার্দ প্রতিরোধকেন্দ্র** হিসাবে কাজ করে এবং বিশ্রামকালীয় অবস্থায়ও ভেগাসের নিয়মিত প্রবাহমোক্ষণ ঘটায় (12-33 নং চিত্র)। উচ্চতর স্নায়ুকেন্দ্র বা সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা এই স্নায়ু-কেন্দ্রকে উদ্দীপিত করলে হৃৎস্পন্দনের হার হ্রাস পায় বা ব্রাডিকারডিয়া (bradycardia) দেখা যায়। **হার্দ-উদ্দীপক কেন্দ্র** (cardioacceleratory) হিসাবে মেডালাতে কোন পৃথক স্নায়ুকেন্দ্র নেই। আবেগ, উত্তেজনা, ভয় প্রভৃতি কার্ডিয়াক স্বতন্ত্র স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে এবং কিছুটা ভেগাসের প্রবাহমোক্ষণ হ্রাস করে, ফলে হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায় বা টেকিকারডিয়া

(tachycardia) দেখা দেয়। তবে **বাহনিয়ামক কেন্দ্রের** (vasomotor center) প্রেষকেন্দ্র (pressor center) উদ্দীপিত হলে রক্তচাপের বৃদ্ধির সংগে সংগে হৃৎস্পন্দনের হারও বৃদ্ধি পায় (টেকিকারডিয়া)।

12-31নং চিত্র : হৃৎস্পন্দের স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ।

3. **বাহনিয়ামক কেন্দ্র** (Vasomotor center) : বাহনিয়ামক কেন্দ্র মেডালাতে অবস্থিত। মেডালার জালক সংগঠনের প্রশস্ত অঞ্চল জুড়ে এটি ছড়িয়ে থাকে। নীচ থেকে ওপরে ওবেক্স থেকে ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস অঞ্চল পর্যন্ত এবং অপরদিকে চতুর্থ প্রকোষ্ঠের তলদেশের সম্মুখ থেকে প্রায় পিরামিড পর্যন্ত এটি ছড়িয়ে থাকে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের অগ্রাঞ্চল ও পার্শ্ব

অঞ্চলে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং টেকিকারডিয়া দেখা যায়। সম্মিলিত ভাবে এই অঞ্চল দুটি **প্রেষ অঞ্চল** (pressor area) নামে পরিচিত। অপরপক্ষে ওবেক্সে (obex) পরিবেষ্টিত সংকীর্ণ অঞ্চলে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে রক্তচাপ হ্রাস পায় এবং ব্রাডিকারডিয়া দেখা যায়। শেষোক্ত অঞ্চল **প্রেষবিমুখ অঞ্চল** (depressor area) নামে অভিহিত। এই দুটো অঞ্চল থেকে উৎপন্ন স্নায়ুতন্তু সুষুম্নাকাণ্ডের বিভিন্ন খণ্ডে অবতরণ করে এবং প্রাক-গ্যাংগ্লিয়ন নিউরোনের চারিপাশে গিয়ে শেষ হয় এবং তাদের প্রবাহমোক্ষণের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

4. **হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিবর্তসমূহ** (Reflexes for regulation of cardiac activity) : বিভিন্ন প্রতিবর্ত হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে এসব প্রতিবর্ত উৎপন্ন হয়। যথা : ধমনীগত প্রেষগ্রাহক ও রসায়নগ্রাহক, অলিন্দের প্রসারণ গ্রাহক, দক্ষিণ নিলয়ের গ্রাহক, ফুসফুসীয় গ্রাহক প্রভৃতি।

(a) **বাফার নার্ভ ও প্রেষ গ্রাহক প্রক্রিয়া** (Buffer nerve and baro-receptor mechanism) : ক্যারোটিড সাইনাস ও আওর্টিক আর্চ (aortic arch) নিহিত প্রেষগ্রাহক তাদের অন্তর্বাহী স্নায়ু (বাফার নার্ভ), হার্দ-বিমুখকেন্দ্র এবং বহির্বাহী স্নায়ু (ভেগাস নার্ভ) যে প্রতিবর্ত গঠন করে তা হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তচাপের বৃদ্ধিতে প্রেষগ্রাহক উদ্দীপিত হলে উৎপন্ন স্নায়ুপ্রবাহ বাফার নার্ভের মধ্য দিয়ে হার্দবিমুখ কেন্দ্রে পৌঁছয় এবং তাকে উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনা হার্দবিমুখ কেন্দ্র থেকে ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছয় এবং হৃৎস্পন্দনের হারকে মন্দীভূত করে। তাকে ব্রাডিকারডিয়া বলা হয়। এই প্রতিবর্তকে **হার্দবিমুখ প্রতিবর্ত** (Cardio-inhibitory reflex) বা **ম্যারের প্রতিবর্ত** (Marey's reflex) বলা হয়।

প্রেষগ্রাহক বস্তুত প্রসারণ গ্রাহক (stretch reflex) হিসাবে কাজ করে। ক্যারোটিড সাইনাস ও আওর্টিক আর্চে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে রক্তনালীর প্রাচীর গাত্রে যে টান পড়ে তার থেকেই এরা উদ্দীপিত হয়। সাধারণ ক্যারোটিড ধমনী যেখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনী গঠন করেছে ঠিক তার উপরে অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনীতে যে ক্ষুদ্র স্ফীতি (small dilation) লক্ষ্য করা যায় তাকে **ক্যারোটিড সাইনাস** (carotid sinus) বলা হয়। ক্যারোটিড সাইনাস ও আওর্টিক আর্চের বহিঃস্তরে (adventitia) প্রেষগ্রাহকের অবস্থান। প্রেষগ্রাহক মায়েলিন স্নায়ুতন্তুর শাখাযুক্ত, পাকানো স্ফীত প্রান্ত

বিশেষ। **ক্যারোটিড সাইনাস নার্ভ** (carotid sinus nerve) গ্লোসোফ্যারিনজিয়েল নার্ভের (ix করোটি স্নায়ু) একটি পৃথক শাখা হিসাবে প্রেষগ্রাহক থেকে উৎপন্ন হয়। ক্যারোটিড সাইনাস নার্ভ এবং আওর্টিক আর্চ থেকে উৎপন্ন ভেগাস নার্ভ এই দুটোকে একত্রে **বাফার নার্ভ** (buffer nerve) বলা হয়।

প্রেষগ্রাহক, বাফার নার্ভ, হার্দবিমুখ কেন্দ্র এবং তাদের বহির্মুখী স্নায়ুতন্তু প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ায় (feed back mechanism) হৃৎস্পন্দনের হার ও রক্তচাপের স্থিতাবস্থা বজায় রাখে; অর্থাৎ রক্তচাপ হ্রাস পেলে বাফার নার্ভের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধধর্মী প্রবাহমোক্ষণ (inhibitory discharge) হ্রাস পায়, ফলে পরিপূরকভাবে রক্তচাপ ও হার্দ উৎপাদের বৃদ্ধি ঘটে। অপরপক্ষে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে বাফার নার্ভের প্রবাহমোক্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং রক্তচাপ ও হার্দ উৎপাদ হ্রাস পায়।

(b) **অলিন্দের প্রসারণগ্রাহক ও ব্রেইনব্রিজ প্রতিবর্ত** (Atrial stretch Receptors and Brainbridge Reflex) **:** হৃৎস্পন্দনের হার যখন প্রাথমিকভাবে কম হয় তখন মহাশিরা ও দক্ষিণ অলিন্দে রক্ত বা স্যালাইনকে (saline) দ্রুত প্রবেশ করালে হৃৎস্পন্দনের হার (heart rate) বৃদ্ধি পায়। 1915 সালে ব্রেইনব্রিজ এজাতীয় প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দেন। তাঁর নামানুসারে এই প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে **ব্রেইনব্রিজ প্রতিবর্ত** (Brainbridge Reflex) বলা হয়। তবে প্রথম থেকে হৃৎস্পন্দনের হার বেশী হলে এই প্রতিবর্ত কাজ করে না।

উত্তরা ও অধরা মহাশিরার প্রবেশ পথের কাছাকাছি অলিন্দের প্রাচীর গাত্রে অবস্থানকারী **প্রসারণ গ্রাহকের** উদ্দীপনা থেকে এই প্রতিবর্ত সক্রিয়তা লাভ করে। অলিন্দপ্রাচীরে দুধরনের প্রসারণগ্রাহক লক্ষ্য করা যায় **:** (1) A শ্রেণীর প্রসারণগ্রাহক যারা অলিন্দের সংকোচনের (atiral systole) সময় প্রবাহমোক্ষণ করে এবং (2) B শ্রেণীর প্রসারণগ্রাহক যারা অলিন্দের প্রসারণের শেষপর্যায়ে দ্রুত রক্তপূর্তির সময়ে প্রবাহমোক্ষণ করে। দেখা গেছে শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন বৃদ্ধি পেলে B গ্রাহকের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এই উভয় প্রকার গ্রাহক উদ্দীপিত হলে হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায়।

(c) **বাম নিলয়ের গ্রাহক ও প্রতিবর্ত** Left Ventricular Receptors and Reflexes) **:** বাম নিলয়ের প্রাচীরে যেসব প্রসারণ গ্রাহকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তারা উদ্দীপিত হলে হৃৎস্পন্দনের হার মন্দীভূত হয় অর্থাৎ, বাম নিলয় রক্তের দ্বারা বেশী পরিমাণে সম্প্রসারিত হলে এসব গ্রাহক উদ্দীপিত

হয় এবং ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে সেই উদ্দীপনা হার্দবিমুখ কেন্দ্রে গিয়ে তাকে বাধ দেয় ফলে ভেগাসের স্বাভাবিক প্রবাহমোক্ষণ (vagal tone) হ্রাস পায় ও হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায়।

আরো দেখা গেছে, কোন পরীক্ষাধীন প্রাণীর বাম নিলয়ে সরবরাহকারী করোনারী ধমনীতে ভেরাট্রিডিন (veratridine) নামক ওষুধ প্রয়োগ করলে হৃৎস্পন্দনের হার ও রক্তচাপের হ্রাস ঘটে এবং শ্বসনবিরতি (apnea) লক্ষ্য করা যায়। এই প্রতিবর্তীক্রিয়াকে **করোনারী রসায়ন প্রতিবর্ত** (coronary chemo-reflex) বা **বেজোলড-জারিচ প্রতিবর্ত** (Bezold-Jarisch reflex) নামে অভিহিত করা হয়। ভেগাস নার্ভকে কেটে দিলে এই প্রতিবর্ত তিরোহিত হয়। নিকোটিনও একই ধরনের পরিবর্তন ঘটায়। বাম অলিন্দের প্রসারণ গ্রাহকের রাসায়নিক উদ্দীপনা থেকেই সম্ভবত এই পরিবর্তন আসে।

(d) **ফুসফুসীয় গ্রাহক ও প্রতিবর্ত** (Pulmonary Receptors and Reflex)ঃ ফুসফুসীয় রক্তনালীপূর্ণ অঞ্চল রক্তের দ্বারা প্রসারিত হলে হৃৎস্পন্দনের হার প্রতিবর্তভাবে হ্রাস পায়। ফুসফুসীয় শিরাতেই সম্ভবত গ্রাহকের অবস্থান। দেখা গেছে ফুসফুসীয় ধমনীতে ভেরাট্রিডিন (veratri-dine), ফেনাইল বাইগুয়ানাইড (phenyl biguanide) এবং সেরোটোনিন প্রবেশ করালে শ্বসনবিরতি, রক্তচাপের হ্রাস ও ব্রাডিকারডিয়া দেখা যায়। ভেগাসকে কেটে দিলে এ জাতীয় পরিবর্তন আর দেখা যায় না। যে প্রতিবর্তের মাধ্যমে এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাকে **ফুসফুসীয় রসায়ন প্রতিবর্ত** (Pulmo-nary chemoreflex) নামে অভিহিত করা হয়।

(e) **ক্যারোটিড ও আওর্টিক বডির রসায়ন গ্রাহক ও প্রতিবর্ত** (Carotid and Aortic Chemoreceptors and Reflexes)ঃ ক্যারোটিড ও আওর্টিক বডি নিহিত রসায়ন গ্রাহক প্রধানত শ্বাসক্রিয়ার উপর প্রভাববিস্তার করলেও তাদের অন্তর্বাহী স্নায়ু বাহনিয়ামক স্নায়ুকেন্দ্রেও প্রবেশ করে। ফলে রসায়ন গ্রাহক উদ্দীপিত হলে প্রান্তীয় রক্তনালীর সংকোচন (vasoconstriction) এবং হৃৎস্পন্দনহারের হ্রাস (ব্রাডিকারডিয়া) লক্ষ্য করা যায়। রক্তক্ষরণ থেকে রক্তচাপের হ্রাসপ্রাপ্তিতে রসায়ন গ্রাহক উদ্দীপিত হয়। এর কারণ রসায়ন গ্রাহকে রক্তপ্রবাহের হ্রাসপ্রাপ্তি এবং অক্সিজেন ঘাটতি (asoxia)।

5. **অন্যান্য স্নায়ুজ কারণ** (Other Nervous Factors)ঃ স্নায়ুতন্ত্রের অন্যান্য কিছু অংশও হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার উপর প্রভাববিস্তার করে। যেমন, **লিম্বিক সংস্থা** থেকে নিম্নগামী যেসব স্নায়ুপথ হাইপোথালামাস ও

মধ্যমস্তিষ্কে স্নায়ুতন্তু প্রেরণ করে তারা হার্দবিমুখকেন্দ্র ও বাহনিয়ামক কেন্দ্রের সংগেও স্নায়ুসংযোগ স্থাপন করে। আবেগ, কোন উত্তেজনা ও রেগে যাওয়ার সময় যে টেকিকারডিয়া ও রক্তচাপের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় শেষোক্ত স্নায়ুসংযোগই এই পরিবর্তনের জন্য প্রধানত দায়ী।

হৃৎস্পন্দনের হার ও তার নিয়ন্ত্রণ

Heart Rate and its Regulation.

একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের হার গড়ে 72 বার। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরও একটু বেশী। বয়স বৃদ্ধির সংগে হৃৎস্পন্দনের হারও হ্রাস পায়। ভ্রূণাবস্থায় হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে 140-150, নবজাতকে 130-140, তৃতীয় বৎসর বয়ঃক্রমে 95-100, সাত থেকে 14 বৎসরের মধ্যে 80-90 এবং 15 বৎসরের উর্ধ্বে প্রতিমিনিটে 70-80 বার হয় (12-34 নং চিত্র)। হৃৎস্পন্দনের হার বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত
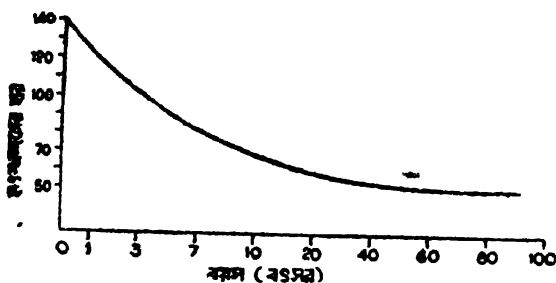
12-34 নং চিত্র : বয়স বৃদ্ধির সংগে হৃৎস্পন্দনের হারের পরিবর্তন।

হয়। বিপাকক্রিয়ার হারের সংগে এটি সমানুপাতিক। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধিতে হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায়। শরীরচর্চা, ভাবাবেগ, কোন উত্তেজনা, রেগে যাওয়া প্রভৃতি অবস্থায় হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায়। সুপ্তাবস্থায় এই হার খানিকটা হ্রাস পায়।

হৃৎস্পন্দনের হারের নিয়ন্ত্রণ (Regulation Heart rate) : হৃৎস্পন্দনের হার দুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় : (1) S. A. নোড ও অপরাপর সংযোগীকলার সক্রিয়তা যেসব কারণে পরিবর্তিত হয় হৃৎস্পন্দনের হারও সেসব কারণে পরিবর্তিত হয়। (2) স্নায়ু মারফৎ হৃৎস্পন্দনের হার পরিবর্তিত হয়। **হার্দবিমুখকেন্দ্র, বাহনিয়ামক কেন্দ্র, ভেগাস স্নায়ু এবং স্বতন্ত্র স্নায়ু** হৃৎস্পন্দনের হার নিয়ন্ত্রিত করে। প্রেষগ্রাহকের মাধ্যমে যেসব প্রতিবর্ত হৃৎস্পন্দনের হারকে

নিয়ন্ত্রণ করে তারও আলোচনা ওপরে করা হয়েছে। এসব উদ্দীপনা এবং অপরাপর যেসব অবস্থা হৃৎস্পন্দনের হারকে নিয়ন্ত্রিত করে তার বিবরণ ৪নং তালিকায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৪নং তালিকা ঃ হৃৎস্পন্দন হারের উপর প্রভাব বিস্তারকারী কারণসমূহ।

হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি

ধমনী, বাম নিলয় ও ফুসফুসীয় সংবহনের
প্রেষগ্রাহকের সক্রিয়তা হ্রাস
শ্বাসগ্রহণ
উত্তেজনা
রাগ
অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক উদ্দীপনা
অক্সিজেন ঘাটতি
শরীরচর্চা
নরএপিনেফ্রিন
এপিনেফ্রিন
থাইরোয়েড হরমোন
জ্বর
বেইনব্রিজ প্রতিবর্ত

হৃৎস্পন্দনের হার হ্রাস

প্রেষগ্রাহকের সক্রিয়তা বৃদ্ধি
শ্বাসত্যাগ
ভয়
শোক
ট্রাইজেমিনাল নার্ভে নিহিত স্নায়ুতন্তুতে
উদ্দীপনা প্রয়োগ
অন্তঃকরোটিচাপের বৃদ্ধি

দেখা গেছে, সাধারণত যেসব উদ্দীপনা হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি করে তারা রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটায়, আবার যারা হৃৎস্পন্দনের হ্রাস করে তারা রক্তচাপেরও হ্রাস ঘটায়। উদাহরণ স্বরূপ, রাগ ও উত্তেজনায় হৃৎস্পন্দনের হার যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি রক্তচাপেরও বৃদ্ধি ঘটে। অপরপক্ষে ভয় ও শোকে যেমন হৃৎস্পন্দনের হারের হ্রাস ঘটে তেমনি রক্তচাপও হ্রাস পায়। প্রধান ব্যতিক্রম, অন্তঃকরোটি চাপ (intracranial pressure) বৃদ্ধি পেলে একদিকে যেমন রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে তেমনি হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পায়। তেমনি জ্বরে দেহ উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায় কিন্তু দেহচর্মের রক্তনালীর প্রসারণের ফলে রক্তচাপ অপরিবর্তিত থাকে বা হ্রাস পায়। S. A. নোডকে গরম করলে হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায়, অতএব জ্বরে

হৃৎস্পন্দনের হারের বৃদ্ধির কারণ সম্ভবত হৃৎপেশীর উষ্ণতা বৃদ্ধি। থাইরোয়েড হরমোন পালস প্রেসার বৃদ্ধি করে এবং সম্ভবত ক্যাটেকোলামিনের (catecholamines) প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি করে। এপিনেফরিন ও নরএপিনেফরিন উভয়েই সরাসরি হৃৎপিণ্ডের উপর কাজ করে হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি করে, কিন্তু ধমনী প্রেষগ্রাহকের উপর উদ্দীপনা প্রয়োগ করে যে রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটায় তা প্রতিবর্তভাবে হৃৎস্পন্দনের হার হ্রাস করে, ফলে উভয়বিধ পরিবর্তনের সার্বিক ফলাফল ব্রাডিকারডিয়া।

শ্বাসগ্রহণের সময় হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধির কারণ (a) অংশত হার্দবিমুখ কেন্দ্রের প্রতিবন্ধকতা: ফুসফুসীয় প্রসারণ গ্রাহক থেকে উৎপন্ন স্নায়ুপ্রবাহ অন্তর্বাহী ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে হার্দবিমুখ কেন্দ্রে পৌঁছিয় এবং তার কাজে বাধা দান করে; এবং (b) অংশত প্রশ্বাসকেন্দ্রের উদ্দীপনা স্নায়ুর মাধ্যমে হৃৎস্পন্দনের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে।

ভাবাবেগজাত উদ্দীপনা হাইপোথালামাস থেকে হার্দবিমুখ কেন্দ্রে পৌঁছে তার থেকে প্রবাহমোক্ষণের হার বৃদ্ধি করে বা হ্রাস করে হৃৎস্পন্দনের হারের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

ব্যায়ামের শুরুতেই হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায়, এমনকি অনেক সময় ব্যায়াম শুরু করতে হবে এমন চিন্তা থেকেও হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায়। এধরনের হৃৎস্পন্দনের হারের বৃদ্ধির কারণ সম্ভবত গুরুমস্তিষ্ক থেকে হাইপোথালামাসের মাধ্যমে হার্দবিমুখ কেন্দ্র ও বাহনিযামক কেন্দ্রে প্রেরিত উদ্দীপনা। কার্ডিয়াক স্বতন্ত্র স্নায়ুর সক্রিয়তা বৃদ্ধি এবং ভেগাসের টোন (tone) বা প্রবাহমোক্ষণের হ্রাসপ্রাপ্তি সম্ভবত এর সংগে জড়িত।

হৃৎপিণ্ডের অগ্রঘাত
Apex Beat of Heart

বুকের বামপার্শ্বে, মধ্য অক্ষরেখার 1·7 সেন্টিমিটার দূরত্বে, পঞ্চম ইনটারকোস্টাল (fifth intercostal) বা অন্তঃপঞ্জরাস্থি অঞ্চলে যে বহির্মুখী ধাক্কা অনুভূত হয় তাকে হৃৎপিণ্ডের অগ্রঘাত বলা হয়। প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি ও নিলয়ের সংকোচনের প্রারম্ভে ইহা অনুভূত হয়। হৃৎপিণ্ডের অগ্রঘাতের জন্য দুটো কারণ বিশেষভাবে দায়ী। প্রথমত, নিলয়পেশী যেহেতু জটপাকানো (complex spiral) অবস্থায় বিন্যস্ত থাকে, সেজন্য সংকোচনের সময় হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগ (apex) সম্মুখের দিকে ও দক্ষিণপাশে ঘুরে যায় এবং বক্ষপ্রাচীরে আঘাত

করে। দ্বিতীয়ত, মহাধমনীতে রক্ত প্রবেশের ফলে মহাধমনী খিলান বা আওর্টিক আর্চ আরও স্থূল হয়ে ওঠে এবং হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়।

হৃৎপিণ্ডের পুষ্টি
Nutrition of Heart

হৃৎপেশীর পুষ্টি অস্থিপেশী থেকে খানিকটা আলাদা। হৃৎপেশী একাধারে যেমন রক্তের গ্লুকোজকে গ্রহণ করতে পারে, তেমনি ল্যাকটিক অ্যাসিড (lactic acid), পাইরুভিক অ্যাসিড (pyruvic acid) এবং অল্প দৈর্ঘ্যসম্পন্ন স্নেহঅম্লকে (fatty acid) সরাসরি বিপাকক্রিয়ায় ব্যবহার করতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্রতি 100 গ্রাম হৃৎপেশী যেখানে প্রতিঘণ্টায় 200 মিলিগ্রাম ল্যাকটিক অ্যাসিডের ব্যবহার করে, সেখানে মাত্র 70 মিলিগ্রাম গ্লুকোজকে তারা একই কাজে ব্যবহার করে, অর্থাৎ হৃৎপেশী বিপাকক্রিয়ায় গ্লুকোজের চেয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিডকে সমধিক পছন্দ করে (গ্লুকোজের প্রায় 3 গুণ)। অপরপক্ষে এই পদার্থকে জারিত করতে প্রতি 100 গ্রাম হৃৎপেশীতে প্রতি ঘণ্টায় 200 মিলিলিটার অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে 350 মিলিলিটার অক্সিজেন ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয়, হৃৎপেশী সরাসরি স্নেহপদার্থকে পুষ্টি হিসাবে গ্রহণ করে এবং বিপাকক্রিয়ায় ব্যবহার করে ; অধিক অক্সিজেন তার জন্যই প্রয়োজন হয়। স্নেহপদার্থ ছাড়া হৃৎপেশী অ্যামাইনোঅ্যাসিডকে পুষ্টি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, কারণ দেখা গেছে, হৃৎপেশীতে প্রচুর পরিমাণে ট্রান্সঅ্যামাইনেজ এনজাইম (glutamic-oxaloacetic transaminase) রয়েছে। হৃৎপেশীতে গ্লাইকোজেন কিছুটা কম পরিমাণে রয়েছে।

হৃৎপেশীর R.Q. 0·7-1·0। উপরিউক্ত পদার্থসমূহের বিপাকক্রিয়া থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয় (ATP হিসাবে) তার প্রায় 65 শতাংশই হৃৎপেশীর যান্ত্রিক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। হৃৎপিণ্ডের মায়োগ্লোবিনের পরিমাণ বেশী বলে বেশী পরিমাণ অক্সিজেনকেও এরা ধরে রাখতে পারে।

বাম নিলয় প্রতি হৃৎঘাতে যে কার্য সম্পন্ন করে তার একাংশ নিলয়ের রক্তকে বল প্রয়োগ করে মহাধমনীর রক্তচাপের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করতে ব্যয়িত হয় ; অপরাংশ নিক্ষিপ্ত রক্তের গতিবেগ প্রদানে ব্যয়িত হয়। অতএব হৃৎপিণ্ডের পেশীসংকোচনের শক্তি অংশত স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় (ধমনীকে অধিকতর স্ফীত করে সেখানেই সঞ্চিত থাকে) এবং অংশত গতিশক্তিতে

রূপান্তরিত হয় (গতিশীল রক্তের ভরবেগ হিসাবে)। প্রতি হৃৎঘাতে প্রতিটি নিলয় যে কার্য সম্পন্ন করে নিম্নলিখিতভাবে তা প্রকাশ করা যায়। যথা :

$$W = QR + \frac{mV^2}{2g}$$

যেখানে W = সম্পাদিত কার্য (গ্রাম-মিটারে), Q = নিক্ষিপ্ত রক্তের পরিমাণ (মিলিলিটারে), R = গড় ধমনী রক্তচাপ (মিলিমিটার পারদচাপ হিসাবে), m = নিক্ষিপ্ত রক্তের ওজন (গ্রামে), V = রক্তের গড় গতিবেগ (প্রতি সেকেণ্ডে মিলিমিটার হিসাবে) এবং g = অভিকর্ষজ ত্বরণ। সমীকরণের QR কার্য মহাধমনীর রক্তচাপের বাধাকে অতিক্রমের জন্য সম্পাদন করতে হয় এবং $\frac{mV^2}{2g}$ শক্তি নিক্ষিপ্ত রক্তকে গতিবেগ প্রদান করতে ব্যয়িত হয়। হার্দ উৎপাদ অধিক না হলে সমীকরণের শেষাংশকে বাদ দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের কার্য = QR অর্থাৎ, হৃৎপিণ্ডের কার্য = হার্দ উৎপাদ × ধমনী-রক্তচাপ।

করোনারী রক্তসংবহন
Coronary Circulation

হৃৎপিণ্ডের হৃৎপেশীতে রক্তসঞ্চালনকারী রক্তসংবহনকে **করোনারী রক্ত-সংবহনতন্ত্র** বলা হয়। হৃৎপেশীতে রক্ত-সরবরাহের প্রাচুর্য বিস্ময়কর। দেখা গেছে, পূর্ণবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে প্রতিটি পেশীতন্তুতে একটি করে রক্তজালিকা রক্ত সরবরাহ করে। ভ্রূণাবস্থায় এই সংখ্যা 4-৫টি পেশীতন্তুতে একটি করে।

1. **করোনারী রক্তসংবহনের ধমনী ও শিরাতন্ত্র** (Arterial and venous systems of coronary circulation) : করোনারী রক্তসংবহনের ধমনীতন্ত্র দক্ষিণ ও বাম করোনারী ধমনী এবং তাদের শাখাপ্রশাখা নিয়ে গঠিত। শিরাতন্ত্র গভীর ও অগভীর এই দু প্রকার শিরাতন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত।

1(a). **দক্ষিণ ও বাম করোনারী ধমনী** : এই দুটো ধমনী মহাধমনীর প্রথম দুটি শাখা হিসাবে আওর্টিক ভালব বা মহাধমনী কপাটিকার পত্রকের (cups) পশ্চাদ্বর্তী সাইনাস থেকে উৎপন্ন হয় এবং হৃৎপেশীতে রক্তসংবহন করে। রক্তের ঘূর্ণিপ্রবাহ কপাটিকাকে ধমনী দুটির ছিদ্রপথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, ফলে সমগ্র হৃৎচক্র জুড়ে এদের ছিদ্রপথ উন্মুক্ত থাকে। বাম করোনারী ধমনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে **সম্মুখস্থ নিম্নগামী ধমনী** (anterior discending artery) এবং **বাম বংকিম ধমনী** (left circumflex artery) সৃষ্টি করে। শেষোক্ত ধমনীর একটি শাখা ম্যারজিন্যাল ব্রাঞ্চ (Marginal branch) বা প্রান্ত শাখা

হিসাবে নেমে আসে। সম্মুখস্থ নিম্নগামী ধমনী সোজা হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগে (apex) নেমে যায়। বাম বংকিম ধমনী অলিন্দ-নিলয় খাঁজ (atrio-ventricular groove) বরাবর অগ্রসর হয়ে পশ্চাৎ নিম্নগামী (posterior discending) ধমনী হিসাবে নীচের দিকে নেমে যায়।

দক্ষিণ করোনারী ধমনী উভয় নিলয়ে অসংখ্য নিম্নগামী শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে নীচের দিকে অগ্রসর হয়। দক্ষিণ ও বাম করোনারী ধমনী উভয়েই বহুবিভক্ত হয়ে অসংখ্য রক্তজালিকার সৃষ্টি করে।

রক্ত সরবরাহ (Blood supply) : দক্ষিণ করোনারী ধমনী একাই
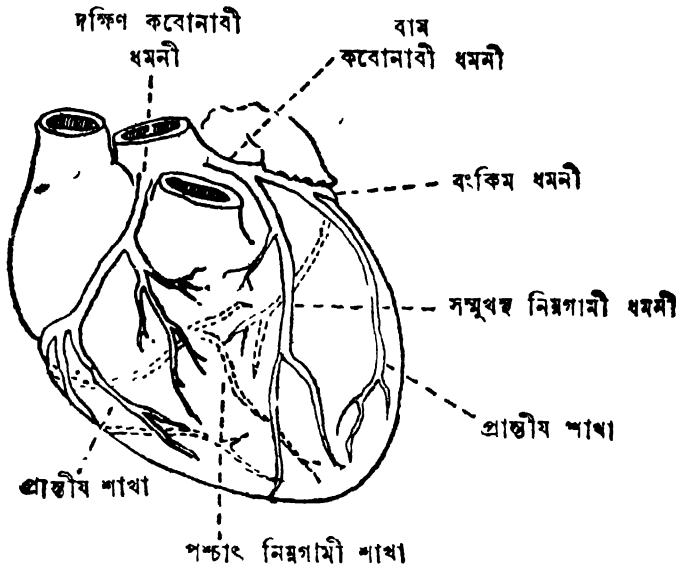
12 নং চিত্র : দক্ষিণ ও বাম করোনারী ধমনীর অবস্থান।

হৃৎপিণ্ডে প্রায় 50 শতাংশ অংশে রক্ত সরবরাহ করে। সমগ্র দক্ষিণ নিলয় এবং নিলয়মধ্যস্থ প্রাচীরের পশ্চাৎ-অর্ধাংশ এই আওতায় পড়ে। অপরপক্ষে, বাম করোনারী ধমনী একা হৃৎপিণ্ডের 20 শতাংশ অংশে রক্ত সরবরাহ করে। বাম নিলয় ও নিলয়মধ্যস্থ প্রাচীরের সম্মুখস্থ অর্ধাংশ এই পর্যায়ে পড়ে। দেখা গেছে, হৃৎপিণ্ডের প্রায় 30 শতাংশ অংশে উভয় ধমনীই রক্ত সরবরাহ করে থাকে। শেষোক্ত অঞ্চলে উভয় ধমনীর মধ্যে কারো পৃথক প্রাধান্য না থাকায় হৃদ্‌বাহপীড়ায় (cardiovascular disorder) হৃৎপিণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সুযোগ কম থাকে। এছাড়াও দেখা গেছে, 50% মানুষে দক্ষিণ করোনারী ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহ অধিকতর বেশী হয়, 30% ক্ষেত্রে বাম করোনারী ধমনীর মধ্য দিয়ে এবং 30% ক্ষেত্রে রক্তের প্রবাহ উভয় ধমনীর মধ্য দিয়েই সমান।

1(b). **অগভীর ও গভীর শিরাতন্ত্র** (Superfitial and deep venous

system) : হৃৎপিণ্ডের শিরাতন্ত্রকে অগভীর ও গভীর এই দুভাগে ভাগ করা যায়। হৃৎপিণ্ডের উপরিস্তরের (epicardium) নীচে অবস্থানকারী অগভীর শিরাতন্ত্র (1) করোনারী সাইনাস, (2) সম্মুখস্থ হৃৎশিরা (anterior cardiac vein) এবং (3) বৃহৎ হৃৎশিরা (great cardiac vein) নিয়ে গঠিত। করোনারী সাইনাস প্রধানত বাম করোনারী ধমনী ও খুব সামান্য দক্ষিণ করোনারী ধমনীর দ্বারা সরবরাহকারী অঞ্চলের প্রায় 60 শতাংশ রক্তকে দক্ষিণ নিলয়ের পশ্চাৎ অংশে নিয়ে আসে। বৃহৎ হৃৎশিরা বাম নিলয়ের রক্তকে বহন করে এনে করোনারী সাইনাসে প্রবেশ করে। (12-36নং চিত্র)।

গভীর শিরাতন্ত্র তিনধরণের রক্তনালীর দ্বারা গঠিত :

(1) ধমনীসাইনুসোয়েডাল রক্তনালী (Arterio-sinusoidal vessels),

(2) ধমনীলুমিন্যাল রক্তনালী (Ateriolumiņal vessels)

(3) থেবেসিয়ান শিরা (Thebesian vein)

ধমনীসাইনুসোয়েডাল রক্তনালী স্ফীত রক্তজালিকাসদৃশ নালীবিশেষ। এরা সরাসরি হৃৎপিণ্ডের চেম্বারে উন্মুক্ত হয়। ধমনীলুমিন্যাল রক্তনালী ক্ষুদ্র ধমনী বা উপধমনী বিশেষ। থেবেসিযান শিরা ও এসব ধমনী সরাসরি অলিন্দ ও নিলয়ে প্রবেশ করে। করোনারী উপধমনী ও হৃৎপিণ্ডের বহির্ভূত উপধমনীও কিছুসংখ্যক নালীসংযোগ (anastomoses) স্থাপন করে,
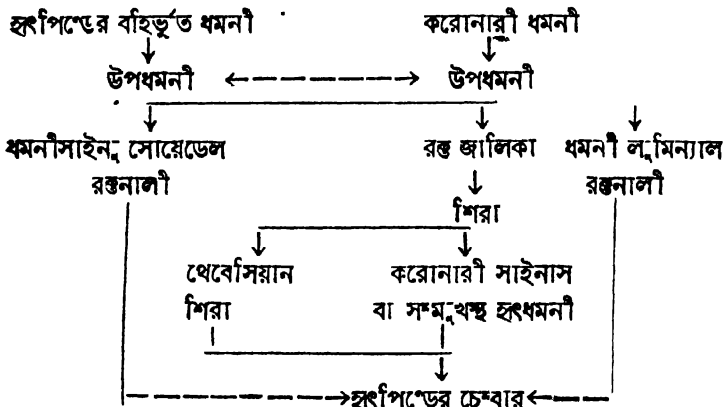
12-36নং চিত্র : করোনারী রক্তসংবহনের ছক।

বিশেষত মহাশিরার মুখের চারিপাশে। মানুষে করোনারী উপধমনীর অন্তর্বর্তী নালীসংযোগ মাত্র 4μm দূরত্ব বা তারও কম দূরত্ব অতিক্রম করে, তবে করোনারী ধমনীর রোগে এই নালীপথগুলো বৃহদাকার ধারণ করে এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়।

2. **করোনারী রক্তপ্রবাহ ও সাইনাস রক্তচাপ** (Coronary blood flow and sinus pressure) : পদ্ধতিগত অসুবিধের জন্য করোনারী রক্তপ্রবাহের নির্ধারণ সঠিকভাবে সম্ভব নয়। মানুষে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাবে না এমন-ভাবে শিরা ক্যাথেটার (venous catheter) প্রবেশ করানো সম্ভব। এছাড়া ফিকের মূলনীতি (Fick's principle) এবং কেটির নাইট্রাস অক্সাইড পদ্ধতির (Kety's N_2O method) সহায়তায় মানুষে হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রবাহ নির্ণয় করা মোটামুটিভাবে সম্ভব। বিশ্রামরত অবস্থায় করোনারী রক্তপ্রবাহ মানুষে প্রায় মিনিটে 250 মিলিলিটার বা প্রতি গ্রাম হৃৎপেশীতে গড়ে 84 মিলিলিটার। (9নং তালিকা)। 250 মিলিলিটার হার্দ উৎপাদের প্রায় 5%। এই হিসাবের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, কোন কারণে হার্দ উৎপাদ যদি মিনিটে 300 মিলি-লিটারে বৃদ্ধি পায়, তবে করোনারী রক্ত প্রবাহ মিনিটে প্রায় 1500 মিলিলিটারে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, কিন্তু কার্যত তা হয় না। দেখা গেছে করোনারী রক্ত-প্রবাহের বৃদ্ধি এর চেয়ে অনেক কম হয়। অর্থাৎ হার্দ উৎপাদ যেভাবে পর্যায়-ক্রমে বৃদ্ধি পায় করোনারী রক্তপ্রবাহ সেভাবে বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পেতে থাকে।

9 নং তালিকা : একজন বয়স্ক লোকের করোনারী রক্তপ্রবাহ ও O_2 গ্রহণ।

হৃৎপেশীর মোট ওজন (g)	300
মিনিটে করোনারী রক্তপ্রবাহ (ml)	250
মিনিটে প্রতি 100 গ্রাম হৃৎপেশীতে করনারী রক্তপ্রবাহ (ml)	84
মিনিটে অক্সিজেন গ্রহণ (ml)	29
মিনিটে প্রতি 100 গ্রামে O_2-গ্রহণ (ml)	9·7
ধমনী শিরার O_2-পার্থক্য (ml/L)	114
মোট হার্দ উৎপাদের কত শতাংশ	4·7

একটি প্রবিষ্ট ক্যাথেটার থেকে করোনারী সাইনাসের যে অভ্যন্তরীন চাপ নির্ণয় করা গেছে তা নিম্নরূপ : হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকালে সাইনাসের রক্তচাপ পায় 16 মিলিমিটার পারদ চাপের সমান হয় এবং প্রসারণকালে প্রায় 8 মিলিমিটার পারদচাপের সমান হয়।

3. **করোনারী রক্তসংবহনের নিয়ন্ত্রণ** (Control of coronary circulation) : বিশ্রামকালীন অবস্থাতেও হৃৎপেশী প্রতি লিটারে প্রচুর পরিমাণ O_2 কে নিষ্কাষণ করতে পারে (9নং তালিকা)। করোনারী রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি করে O_2-গ্রহণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর, অতএব হৃৎপেশীর বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি পেলে করোনারী রক্তপ্রবাহও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তা

বৃদ্ধি পেলে করোনারী রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং সক্রিয়তা হ্রাস পেলে রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায়।

করোনারী রক্তপ্রবাহ প্রধানত তিনটি প্রধান কারণের উপর নির্ভর করে: (a) **মহাধমনীর রক্তচাপ**, (b) **রাসায়নিক উপাদান** ও c) **স্নায়ুজ উপাদান**।

3(a). **মহাধমনীর রক্তচাপ** (Aortic pressure): মহাধমনীর রক্তচাপের পরিবর্তন হলে করোনারী রক্ত প্রবাহেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মহাধমনীর রক্তচাপ করোনারী রক্তপ্রবাহের প্রধান চালকবল (driving force) হিসাবে কাজ করে। যেসব কারণে মহাধমনীর রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তারাই করোনারী রক্তপ্রবাহের বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য দায়ী।

3(b). **রাসায়নিক কারণ** Chemical factors): করোনারী রক্তপ্রবাহ ও হৃৎপেশীর অক্সিজেন গ্রহণের সুস্পষ্ট সম্পর্ক থেকে ধারণা করা হয় হৃৎপেশীর বিপাকক্রিয়ালব্ধ এক বা একাধিক পদার্থ করোনারী রক্তনালীর প্রসারণ ঘটিয়ে থাকে। এসব পদার্থের মধ্যে প্রধান অক্সিজেন ঘাটতি, স্থানীয়ভাবে CO_2, H^+, K^+, ল্যাকটিক অ্যাসিড, প্রোস্টাগ্লানডিন, অ্যাডেনিন নিউক্লিওটাইড ও অ্যাডেনোসিনের বৃদ্ধি। শ্বাসরোধ, হাইপোক্সিয়া, করোনারী রক্তনালীতে সায়ানাইডের ইনজেকশন প্রভৃতি করোনারী রক্তপ্রবাহকে 200-300% বৃদ্ধি করতে পারে। স্বাভাবিক বা স্নায়ুবিযুক্ত (denervated) হৃৎপিণ্ডে একই ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই তিনটি উদ্দীপনার সাধারণ বিশেষত্ব হৃৎপেশীতন্তুতে হাইপোক্সিয়া বা অক্সিজেন ঘাটতি। কোন করোনারী ধমনীকে কিছুক্ষণ বন্ধ করে রেখে ছেড়ে দিলে তার ভেতর দিয়েও একইভাবে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। একে **সক্রিয় রক্তাধিক্য** (reactive hyperemia) বলা হয়।

3(c). **স্নায়ুজ কারণ** (NeuralFactors: করোনারী উপধমনীতে (aterioles) α-গ্রাহক ও β-গ্রাহক এই উভয়বিধ গ্রাহকই আছে। প্রথম প্রকারের গ্রাহক রক্তনালীর সংকোচন ও দ্বিতীয় প্রকারের গ্রাহক রক্তনালীর প্রসারণ মধ্যস্থতা করে। তবে দেখা গেছে হৃৎপিণ্ডে সরবরাহকারী অ্যাড্রেনারজিক নার্ভের সক্রিয়তা এবং এপিনেফ্রিনের ইনজেকশন করোনারী রক্তনালীর প্রসারণ (vasodilation) ঘটায়। অপরপক্ষে, একই নার্ভের সক্রিয়তা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনহার যেমন বৃদ্ধি করে তেমনি হৃৎপেশীর সংকোচন ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। করোনারী রক্তনালীর প্রসারণ সম্ভবত সক্রিয়তার সময় হৃৎপেশীতে উৎপন্ন রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্য ঘটে থাকে। β-অ্যাড্রেনারজিক ড্রাগ বা ওষুধের প্রয়োগে হৃৎপিণ্ডের উপর অ্যাড্রেনারজিক নার্ভের আইনোট্রোপিক ও ক্রোনোট্রোপিক প্রভাব বন্ধ করে। সেই নার্ভকে উদ্দীপনা দিলে বা এপিনেফ্রিন ইনজেকশন করলে প্রাণীতে করোনারী রক্তনালীর সংকোচন (vasoconstriction) লক্ষ্য করা যায়। অতএব অ্যাড্রেনারজিক উদ্দীপনার প্রভাব প্রধানত সংকোচক ধর্মী। হৃৎপিণ্ডগামী ভেগাস নার্ভকে উদ্দীপিত করলে করোনারী রক্তনালী প্রসারিত হয়।

তন্ত্রীয় রক্তচাপ হ্রাস পেলে যে সার্বিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তার ফলে যে প্রতিবর্তী অ্যাডরেনারজিক মোক্ষণ (discharges) ঘটে তাতে করোনারী

রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় (হৃৎপেশীর রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্য), কিন্তু একই সময়ে ত্বক, কিডনি ও স্প্ল্যান্‌কনিক (splanchnic) রক্তনালী সংকোচিত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে অন্যান্য অংগে যখন রক্তনালীর সংকোচন হয়মস্তিষ্কের মত হৃৎপিণ্ডের রক্তসংবহন তখনও সংরক্ষিত থাকে বা বৃদ্ধি পায়।

করোনারী ধমনীর রোগ
CORONARY ARTERY DISEASE

ক্লান্তি বা অবসাদের সময় হৃৎপেশীতে রক্তসঞ্চালন হ্রাস পেলে বুকের নীচে যে ব্যথা বা যন্ত্রণা অনুভূত হয় তাকে **আনজিনা পেকটোরিস** (angina pectoris) বলা হয়। করোনারী ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ হ্রাস পেয়ে যখন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছয় ও হৃৎপেশীতে (myocardium) অক্সিজেন ঘাটতি বা হাইপোক্সিয়া দেখা যায় তখনই লুউইজের পি-ফ্যাকটর (Lewis P-factor) নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ স্থানীয়ভাবে পেশীতে জমা হয় ও আন্‌জিনা পেকটোরিস প্রকাশ পায়। পি-ফ্যাকটরকে এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সেটি K^+ বা কাইনিন (kinin) হতে পারে। বিশ্রাম নিলে আনজিনা তিরোহিত হয়, কারণ বিশ্রামকালে হৃৎপেশীর অক্সিজেন চাহিদা হ্রাস পায় এবং পি-ফ্যাকটরটি ধুয়ে বেরিয়ে যায়।

হৃৎপেশীতে রক্তপ্রবাহ যথেষ্ট হ্রাস পেলে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হলে পেশীতে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তা অপরিবর্তনযোগ্য হয় এবং এর ফলে **হৃৎপেশীর অবক্ষয়** বা মায়োকার্ডিয়েল ইনফারকশন (myocardial infarction) দেখা দেয়।

বর্তমান পৃথিবীতে মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ করোনারী ধমনী রোগ, করোনারী রক্তনালী অ্যাথেরোস্‌ক্লেরোটিক প্লাগে যখন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখনই **করোনারী থ্রম্বোসিস** দেখা দেয়। অবশ্য এছাড়াও প্রমাণ পাওয়া গেছে, করোনারী ধমনীতে α-অ্যাডরেনারজিক গ্রাহকের মাধ্যমে যে স্পাজম বা তীব্র সংকোচন পরিলক্ষিত হয় তাতেও আনজিনা দেখা দেয়, হৃৎপেশীর অবক্ষয় আসে এবং হঠাৎ মৃত্যু ঘটতে পারে।

দেখা গেছে হ্রাসপ্রাপ্ত রক্ত সঞ্চালনের ফলে যেসব পেশীকোষ মারা যায় তারা মৃত্যুর পূর্বে সংকোচন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সংকোচনক্ষমতা হারিয়ে ফেলার কারণ সঠিকভাবে জানা না গেলেও সম্ভবত কোষের অভ্যন্তরে বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয়, কোষ অভ্যন্তরের অ্যাসিডোসিস, নিঃসৃত ফসফেটের দ্বারা Ca^{++}-এর অধঃক্ষেপ প্রভৃতি এর জন্য দায়ী।

প্রশ্নাবলী

1. হৃৎপিণ্ডের শারীরস্থান ও রক্তসঞ্চালন প্রণালীর বর্ণনা দাও। এ কার্যে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার গুরুত্ব কতটুকু?

2. হৃৎপেশীর পরিবাহিতা বলতে কি বুঝ? হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনপ্রবাহ কোথায় উৎপন্ন হয়? উৎসস্থল থেকে নিলয়ের মূলদেশে স্পন্দন-প্রবাহের সঞ্চালন সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত কর। (C U '77)

3 হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রবাহের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে যা জান বিবৃত কর। (C U. '65, 72)

4. হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুকেন্দ্র কোনগুলি? তাদের অবস্থান কোথায়? হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণের বর্ণনা দাও। (C.U. '75)

5 ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম বলতে কি বুঝায়? (C U. '85)। কার্ডিওগ্রাম সম্পর্কিত বিভিন্ন লীড কি কি? মানুষের স্বাভাবিক ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামের বর্ণনা দাও। আইনথোভেনের লীড কাকে বলে? (C.U H. '78)

6. হার্দ উৎপাদ বলতে কি বুঝায়? মানুষের হার্দ উৎপাদ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর ('66)। স্বাভাবিক হার্দ উৎপাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী কারণসমূহের উল্লেখ কর। (C.U. '68),

7. যেসব কারণ হার্দ উৎপাদকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দাও। (C.U. '71)

8 হার্দ উৎপাদ নিয়ন্ত্রণকারী কারণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। ফিকের মূলনীতি প্রয়োগ করে হার্দ উৎপাদের পরিমাপের বর্ণনা দাও। (C.U H. 81)

যদি কোন লোকের 100 মিলিলিটার ধমনী রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ 19 মিলিলিটার ও শিরারক্তে 13 মিলিলিটার হয় এবং লোকটি মিনিটে 360 মিলিলিটার অক্সিজেন গ্রহণ করে, তা হলে তার ফুসফুসীয় রক্তপ্রবাহের পরিমাণ কতটুকু হবে নির্ণয় কর। (C U. '75)

9. হৃৎচক্র কী? হৃৎচক্রের ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা কর। | (C.U. '70)

10. হৃৎচক্র বলতে কী বুঝায়? হৃৎ-চক্রের বিভিন্ন দশায় হৃৎপিণ্ডে বিভিন্ন প্রকারের রক্ত-চাপের যে পরিবর্তন হয় তার বর্ণনা দাও। (C. U. '72),

11. হৃৎচক্র বলতে কি বুঝ? অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বন্ধ হবার পর থেকে শুরু করে হৃৎচক্রে নিলয়ের ঘটনাবলীর বর্ণনা দাও। (C.U. '81, 83, 86)

12. হৃদ্ধ্বনি কি? কত রকমের হৃদ্ধ্বনির অস্তিত্ব জানা আছে? তাদের প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

13 (a) হৃৎচক্রের ঘটনাপ্রবাহ, (b) শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন, (c) হৃৎপিণ্ডের অগ্রঘাত এবং (d) হৃদ্ধ্বনির উল্লেখসহ স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (C U. '64)

14. হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণের আলোচনা কর। (C.U. '86),

15. হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুসংযোগের বর্ণনা দাও। হৃৎস্পন্দনের হারের উপর প্রভাববিস্তারকারী কারণসমূহের বর্ণনা কর। হৃৎপিণ্ডের স্বকীয় নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে। (C U.H '76)

16 করোনারী সংবহনতন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন-প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও এবং সেই রক্তসঞ্চালন কী কী কারণে প্রভাবিত হয় লিখ। (C.U. '69, '76, '83)

17 টীকা লিখ:

(a) স্ত্রী পুরুষের হৃৎপিণ্ডের পার্থক্য, (b) হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা, (c) ডাইপোল, (d) হৃৎপিণ্ডের মিনিট-পরিমাণ, (e) হৃদ্ধ্বনি (C.U. '75), (f) হৃৎপুষ্টি, (g) হৃৎপিণ্ডের কার্য, (h) ECG (C.U '73, (i) ঘাত পরিমাণ (C U. '74), (j) হিজের বান্ডেল (C.U '76), (k) অধিক পরিশ্রমে ঐচ্ছিক পেশী ক্লান্ত হয়, কিন্তু হৃৎপেশী হয় না কেন? (C.U. 78, 86)

(l) ব্যালিস্টোকার্ডিওগ্রাফি (C.U.H. '81)

তের

রক্তসংবহনতন্ত্র

CIRCULATORY SYSTEM

রক্তসংবহনতন্ত্র রক্ত, রক্তনালী ও হৃৎপিণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত। রক্ত একটি তরল পদার্থ। রক্ত-নালীর মধ্য দিয়ে ইহা প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের পাম্পক্রিয়া থেকে যে ধমনীচাপের উদ্ভব হয় তরল রক্ত প্রধানত তার সাহায্যেই রক্তনালীতে প্রবহমান থাকে।

নিম্নতর প্রাণীতে রক্তসংবহন একটি **মুক্ত সংবহন** (open system)। এই ব্যবস্থায় হৃৎপিণ্ড একটি সছিদ্র থলির মধ্যে অবস্থান করে। হৃৎপিণ্ডের সংগে যে রক্তনালী যুক্ত থাকে তারা ধমনী হিসাবে কাজ করে। এই ব্যবস্থাপনায় শিরা বা রক্ত-জালিকার অনুপস্থিতি

লক্ষ্য করা যায়। রক্ত প্রধানত ধমনীর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের কিছু গহবর বা খাতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে থেকে ছিদ্রপথে হৃৎপিণ্ডের চারিপাশের থলিতে এসে জমা হয়; পরে কয়েকটি ছিদ্রপথে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। এজাতীয় সংবহনব্যবস্থা আরশোলা, চিংড়ি, কাঁকড়া, বিছা প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে লক্ষ্য করা যায়। আরও একটু উন্নততর ব্যবস্থা শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে দেখা যায়।

উচ্চতর প্রাণীতে রক্তসংবহন **বন্ধ সংবহন** (closed system)। রক্ত এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের দ্বারা শুধুমাত্র রক্তনালীর মধ্যেই চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায় বা প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডও ধীরে ধীরে উন্নততর পর্যায়ে পেঁছায়। মাংসপেশীর বৃদ্ধির ফলে একদিকে হৃৎপিণ্ড যেমন একটি শক্তিশালী পাম্পে পরিণত হয়, তেমনি তার প্রকোষ্ঠের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে রক্তসংবহনেরও উন্নতি ঘটে। এছাড়া রক্তনালীর মধ্যেও নানা প্রকার বিভাগ লক্ষ্য করা যায়, যা উন্নততর শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের সংগে সম্পর্কযুক্ত। প্রাণীদেহের অন্যতম পরিবহন মাধ্যম হিসাবে রক্তসংবহন একাধারে যেমন সমগ্র দেহে বিস্তারলাভ করে, তেমনি রক্ত ও কলাকোষের মধ্যে বণ্টন, বিনিময় ও নিষ্কাশনের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রাণীদেহের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কাজের মধ্যে যোগ-সূত্র রচনা করে।

রক্তনালী

Blood Vessels

রক্তসংবহনের সংগে সম্পর্কযুক্ত রক্তনালীকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়: (a) **ধমনীতন্ত্র**, (b) **রক্তজালিকা** এবং (c) **শিরাতন্ত্র**। ধমনীতন্ত্র প্রধানত দেহের অংগ ও কলাকোষের দিকে অক্সিজেনযুক্ত রক্তকে এবং ফুসফুসের দিকে অক্সিজেন লঘুকৃত রক্তকে পরিবহন করে। রক্তজালিকা প্রধানত রক্ত ও কলারসের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ঘটায়। শিরাতন্ত্র কলাকোষ, অংগ ও ফুসফুস থেকে রক্তকে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়ে আনে। ইহা কলাকোষ ও অংগ থেকে অক্সিজেন-লঘুকৃত এবং ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্তকে পরিবহন করে।

1. **তিন ধরনের রক্তনালীর বৈশিষ্ট্য** (Characteristics of three kinds of vessels): ধমনীতন্ত্র যেসব পর্যায়ক্রমিক রক্তনালীর সমন্বয়ে গঠিত, তাদের মধ্যে প্রধান: (a) **বৃহদাকার ধমনী** (large arteries), (b) **মধ্যমা-**

কৃতি ধমনী (medium size arteries) এবং (c) **প্রান্তীয় ধমনী ও উপধমনী** (terminal arteries and arterioles)। বৃহদাকার ধমনী স্থিতিস্থাপক ধমনী। এদেরে **পরিবহনকারী ধমনীও** (conducting arteries) বলা হয়, কারণ এরা রক্তকে মধ্যমাকৃতি বণ্টনধর্মী ধমনীতে (distributing arteries) পরিবহন করে। বৃহদাকার ধমনীকে **পেশীবহুল ধমনীও** বলা হয়, কারণ এদের প্রাচীরগাত্রে পেশীর পরিমাণ স্থিতিস্থাপক কলার চেয়ে অনেক বেশী। তাছাড়া তাদের **বণ্টন ধমনীও** বলা হয়, কারণ তারা সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে রক্তকে দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে বণ্টন করে। বিভিন্ন অঞ্চল বা দেহাংশের বিভিন্ন ধরনের কার্যভিত্তিক চাহিদার অনুপাতে রক্তের সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে এরা এভাবে সহায়তা করে। ক্ষুদ্র প্রান্তীয় ধমনী এবং উপধমনী প্রধানত একটি বা দুটি পেশীস্তরবিশিষ্ট রক্তনালী বিশেষ। এরা **বাহসংকোচন** (vasoconstriction) এবং **বাহপ্রসারণের** (vasodilation) মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রক্তজালিকাস্থানে (capillary bed) রক্তের সরবরাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তসংবহনের **প্রান্তীয় বাধা** (peripheral resistance) এদের সংকোচন ও প্রসারণের উপর নির্ভর করে, এরা তাই রক্তচাপের নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র এদের সংকোচন ও প্রসারণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

উপধমনীর শেষপ্রান্ত থেকে রক্তজালিকা শুরু হয়। রক্তজালিকা পরস্পর যোগসূত্র স্থাপন করে জালের মত বিন্যস্ত থাকে। এদের ছিদ্রপথ যেমন সর্বাপেক্ষা ছোট তেমনি প্রাচীরগাত্রও সবচেয়ে পাতলা। রক্তজালিকাকে 4 ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়ঃ (a) বিশুদ্ধ রক্তজালিকা (true capillaries), (b) কেন্দ্রীয় প্রণালী (central channel) বা আন্তর-প্রণালী (thoroughfare), (c) সাইনুসোয়েড এবং সাইনুসোয়েডীয় রক্তজালিকা (sinusoidal capillary এবং (d) ধমনীশিরা সংযোগীনালী (arteriovenous anastomoses)।
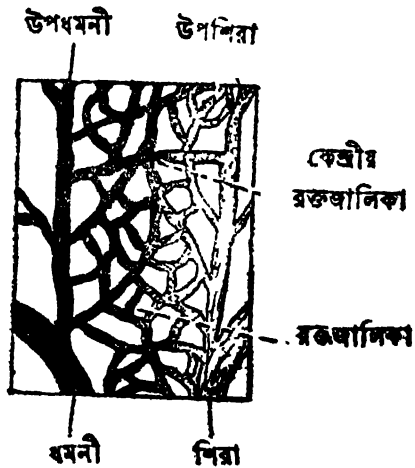
13-2 নং চিত্র : বিশুদ্ধ রক্তজালিকা।

7-9μ ছিদ্রপথসম্পন্ন বিশুদ্ধ রক্তজালিকা অত্যধিক শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে জালকাকারে বিন্যস্ত থাকে। যেসব কলাকোষ বা অংগের বিপাকক্রিয়া সবচেয়ে বেশী, সেসব কলাকোষ বা অংগে তারা অত্যধিক শাখাপ্রশাখার ঘন জাল রচনা করে বিন্যস্ত থাকে। ফুসফুস, যকৃৎ, বৃক্ক, অধিকাংশ গ্রন্থি এবং শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতে তাদের এভাবে বিন্যস্ত থাকতে দেখা যায়। রক্তজালিকার যে প্রান্ত উপধমনীর কাছাকাছি থাকে এবং কলাবসে বিভিন্ন প্রকার পদার্থ সরবরাহ করে তাদের ধমনীধর্মী রক্তজালিকা (arterial capillary) বলা হয়। তেমনি যেসব রক্তজালিকা শিরাপ্রান্তে অবস্থান করে এবং অংগ ও কলাকোষ থেকে বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাষণ করে তাদের শিরাধর্মী রক্তজালিকা (venous capillary) নামে অভিহিত করা হয়।

উপধমনী ও উপশিরার অন্তবর্তী রক্তজালিকার মধ্যে কখনও একটি কেন্দ্রীয় প্রণালী বা আন্তরপ্রণালী (thoroughfare) থাকে। আন্তরপ্রণালীর প্রথম ভাগকে মেটআরটারিওল (metarteriole) বা পরোপধমনী নামে অভিহিত করা হয়। আন্তরপ্রণালীর এই অংশে অনৈচ্ছিক পেশী বিক্ষিপ্তভাবে

রক্তজালিকা

উপধমনী — উপশিরা

ধমনীশিরা সংযোগনালী

ধমনী
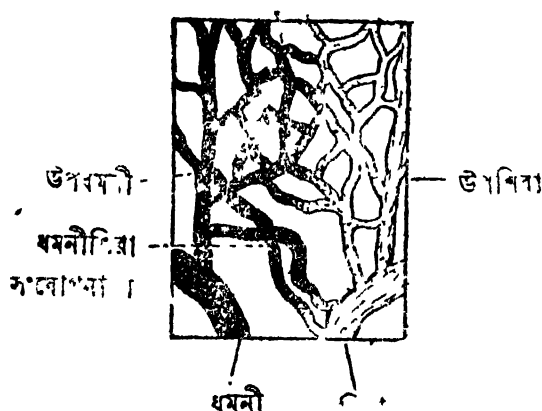
13-3 নং চিত্র : ধমনীশিরা সংযোগীনালী।

ছড়ান থাকে। এদের মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহ অবিরাম চলে, কিন্তু শাখা-প্রশাখায় রক্তপ্রবাহ সবিরামধর্মী। দেহত্বকে এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং অস্থিপেশীতে সবচেয়ে কম।

সাধারণ রক্তজালিকা থেকে সাইনুসোয়েড ও সাইনুসোয়েডীয় রক্তজালিকার পার্থক্য অনেক দিক দিয়ে। প্যারোটিড গ্রন্থি, অন্তঃক্ষরাগ্রন্থি, অ্যাড্রেন্যালের বহিঃস্তর, সম্মুখ পিটুইটারী প্রভৃতিতে সাইনুসোয়েড রক্তজালিকার ছিদ্রপথ অনেক বৃহদাকারের হয়। তাছাড়া তাদের বহিঃস্তর (adventitial layer) অনেক পাতলা থাকে, ফলে তারা গ্রন্থির প্যারেনকাইমা কোষের সংগে আরও
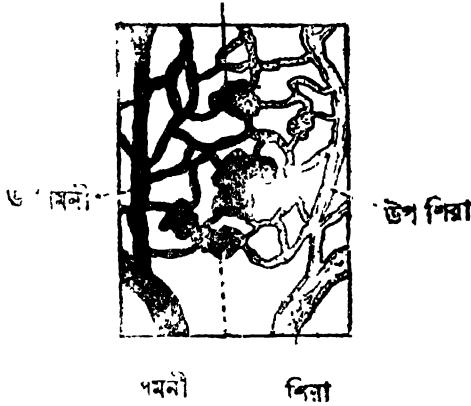
13-4 নং চিত্র: সাইনুসোয়েড।

অন্তরংগভাবে মিলিত হতে পারে। যকৃৎ, প্লীহা এবং রক্ত-উৎপাদক অংগসমূহের সাইনুসোয়েডের নালীপথের ব্যাস সাইনুসোয়েড রক্ত-জালিকার নালীপথের ব্যাসের চেয়ে অনেক বৃহদাকারের। তাছাড়া তাদের প্রাচীরগাত্রের কোষাবলী লক্ষণীয়ভাবে আগ্রাসক (phagocytic)। এরা R-E তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। যকৃতের কুপ্ফার কোষ (Kupffer cell) এ ধরনের একটি কোষ।

ধমনী ও শিরার মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র-রচনাকারী রক্তনালী ধমনী-শিরা সংযোগীনালী হিসাবে পরিচিত। এদের বিশেষভাবে পদতল, করতল, আঙুলের ডগার ত্বক এবং নখস্থানে (nail bed) দেখা যায়। এই সংযোগীনালী সাধারণত সংযোগরক্ষাকারী কলাস্তরের দ্বারা আবৃত থাকে। সন্নিহিত উপধমনী সাধারণত কুণ্ডলীকৃতভাবে বিন্যস্ত হয়ে গ্লোমাস (glomus) গঠন করে। স্বাভাবিক অবস্থায় এরা প্রায় সারাক্ষণ বন্ধ থাকে, তবে যখন উন্মুক্ত হয়, তখন প্রচুর রক্তকে শিরায় পরিবহন করে, ফলে সন্নিহিত উপধমনীর মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায়।

শিরাতন্ত্র প্রধানত উপশিরা (venules), মধ্যমাকৃতি শিরা এবং বৃহদাকৃতি শিরার সমন্বয়ে গঠিত। রক্তজালিকা থেকে উৎপন্ন সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র শিরা উপশিরা নামে পরিচিত। এদের অন্তরাবরণীকে বেষ্টন করে কোলাজেন তন্তুর একটি স্তর থাকে। দেহব্যবচ্ছেদে যাদের শিরা বলা হয়, মধ্যমাকৃতি শিরা সেই পর্যায়ে পড়ে। বক্ষ ও উদরীয় গহ্বরে অবস্থানকারী শিরা বৃহদাকৃতি শিরা নামে পরিচিত।

পোর্টাল রক্তনালী (Portal vessel)ঃ রক্তজালিকার মাধ্যমে ধমনী ও শিরার সংযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার রূপান্তর কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। রক্তজালিকা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যে রক্তনালী গঠন করে, তা পুনরায় বিভক্ত হয়ে দ্বিতীয়প্রস্থ রক্তজালিকা বা সাইনুসোয়েড গঠন করে। এদের পোর্টাল রক্তনালী নামে অভিহিত করা হয। পোর্টাল রক্তনালী আবার দুপ্রকাবের হয়ঃ (a) শিরাগত পোর্টালতন্ত্র এবং (b) ধমনীগত পোর্টালতন্ত্র। যকৃৎ ও সম্মুখস্থ পিটুইটারী শিরাগত পোর্টালতন্ত্রের (venous portal system) দুটো উদাহরণ। এই দুটো ক্ষেত্রেই দুটো শিরার অন্তর্বর্তী স্থানে রক্তজালিকার জাল গঠিত হয়। অপরপক্ষে, বৃক্ক একটি ধমনীগত পোর্টালতন্ত্রের উদাহবণ। এক্ষেত্রে ধমনীর অন্তর্বর্তী স্থানে রক্তজালিকাব জাল গঠিত হয়।

কপাটিকা (Valves)ঃ 2 মিলিমিটারের ঊর্ধ্বে ব্যাসসম্পন্ন শিরাগুলোতে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে কপাটিকা থাকতে দেখা যায়। এরা অর্ধচন্দ্রাকার ঝুলের (flap) মত, যার মুক্তপ্রান্ত হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে অবস্থান করে। রক্ত যখন হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে প্রবাহিত হয, তখন এরা রক্তনালীর প্রাচীরগাত্রে চেটাল অবস্থায় এঁটে থাকে, ফলে রক্তপ্রবাহে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু রক্ত যখন বিপরীত অভিমুখে প্রবাহিত হতে শুরু করে, তখন কপাটিকা-গুলো ভেসে উঠে পরস্পরের কাছাকাছি আসে, ফলে রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কপাটিকার সংখ্যা প্রচুর এবং নিম্ন দেহের বৃহদাকার শিরাতে প্রধানত এরা বেশ মজবুত। মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড ও তাদের আবরক-ঝিল্লি (meninges), নাভিশিরা, অধিকাংশ আন্তরযন্ত্রীয় শিরা, উত্তরা ও অধরা মহাশিরা এবং তাদের শাখা-প্রশাখার মধ্যে এধরনের কপাটিকা অনুপস্থিত থাকে।

2. **রক্তনালীর কলাস্থানিক গঠন** (Histology of Blood

Vessels) ঃ সমগ্র সংবহনতন্ত্রে রক্তনালীর আণুবীক্ষণিক গঠনবিন্যাস প্রায় একই রকম। প্রতিটি রক্তনালীতে তিনটি স্তরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়ঃ (a) বহিঃস্তর (tunica adventitia), (b) মধ্যস্তর (tunica media) এবং (c) অন্তঃস্তর (tunica intima) (13-5 নং চিত্র)

বহিঃস্তরটি তন্তুময় কোলাজেন কলা এবং স্থিতিস্থাপক কলার সমন্বয়ে গঠিত। অন্তঃস্তর অন্তঃ-আবরণী কলা ও তাকে পরিবৃতকারী স্থিতিস্থাপক কলার সমন্বয়ে গঠিত। তবে এই তিনটি স্তর সবরকম রক্তনালীতে সমানভাবে থাকে না। ধমনীতে প্রথম দুটো স্তর সবচেয়ে বেশী, কারণ ধমনীকে অধিক রক্তচাপের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। **ভ্যাসা ভ্যাসোরাম** (Vasa vasorum) নামক এক **বিশেষ রক্তবাহ-প্রণালী** **এই স্তর দুটোতে** রক্ত সরবরাহ করে। ধমনীর অন্তঃস্তর স্থিতিস্থাপক বেসমেন্ট মেম্‌ব্রেন (basement membrane) বা স্থিতিস্থাপক ফলকের (elastic lamina) উপর এককোষীয় অন্তঃআবরণী কলা নিয়ে গঠিত। স্থিতিস্থাপক ফলক বহু-ভাঁজবিশিষ্ট হয় এবং ধমনীঘাত (pulse) থেকে অন্তঃআবরণী কলাকোষকে রক্ষা করে। উপধমনীতে (arterioles) শুধুমাত্র অন্তঃ ও মধ্যস্তর দেখতে পাওয়া যায়। বহিঃস্তর অনুপস্থিত থাকে। মধ্যস্তর অধিকতর পুরু হয় এবং এই স্তরে চেষ্টীয় স্নায়ু বা বাহনিয়ামক স্নায়ুর (vasomotor nerves) উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রক্তজালিকায় শুধুমাত্র অন্তঃস্তরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এদের উপরিতলে **রাওগেট কোষ** (Rouget cell) নামক একপ্রকার শাখা-প্রশাখাবহুল কোষ দেখতে পাওয়া যায়। এদের শাখাপ্রশাখা পরস্পরের সংগে যুক্ত হয়ে রক্তজালিকার চারিপাশে জালকের সৃষ্টি করে। এই কোষগুলোকে মধ্যস্তরের অবশিষ্ট রূপান্তরিত পেশীকোষ বলে মনে করা হয়। সংকোচন-প্রসারণে রক্তজালিকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে।

13-5 নং চিত্রঃ ধমনী, শিরা ও রক্তজালিকার কলাস্থানিক গঠন।

শিরাতেও এই তিনটি স্তরের অস্তিত্ব রয়েছে, তবে অনেকটা কম পরিমাণে। একটি নির্দিষ্ট অবকাশে শিরাস্থ অন্তঃস্তর তির্যকভাবে ভেতরের দিকে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং অনেকটা অসম্পূর্ণ কপাটিকার মত কাজ করে। এরা রক্তপ্রবাহের গতিকে হৃৎমুখী রাখতে সাহায্য করে।

দেহের কোন কোন অংশে উপধমনী রক্তজালিকাতে বিভক্ত না হয়ে স্ফীত থলিতে প্রবেশ করে। এই স্ফীত থলিকে **স্ফীতবাহ** বা **সাইনাস** (sinus) বলা হয়। এদের প্লীহা, অস্থিমজ্জা, কোন কোন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি প্রভৃতিতে দেখতে পাওয়া যায়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ধমনী যতই দেহপ্রান্তের
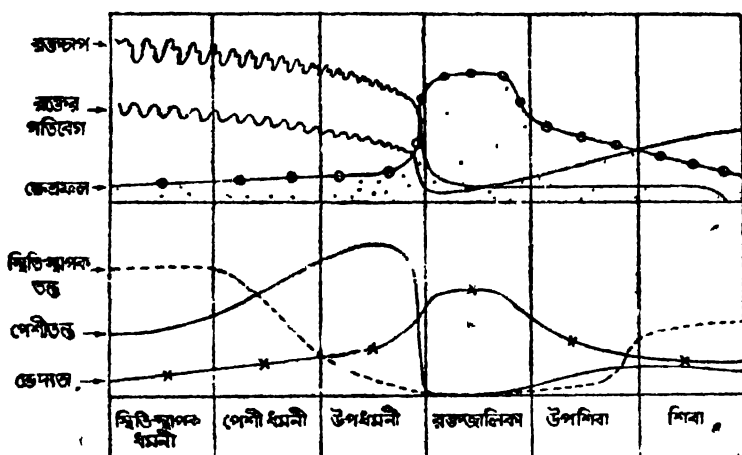
13-6 নং চিত্র : বিভিন্ন ধরনের রক্তনালীর রক্তচাপ, রক্তের গতিবেগ, ক্ষেত্রফল, স্থিতিস্থাপক তন্তু, পেশীতন্তু ও ভেদ্যতা।

দিকে অগ্রসর হয়, ততই তারা প্রথমে স্থিতিস্থাপক স্তর এবং তারপর পেশীয় স্তরকে হারায়। অন্তঃস্তর সব সময়েই বজায় থাকে (13-6 নং চিত্র)। তাদের এই আণুবীক্ষণিক গঠনের জন্য এবং বহুবিভক্তির ফলে রক্তনালীর মোট প্রস্থ-চ্ছেদীয় ক্ষেত্রফলের বিস্তৃতি ঘটে। রক্তজালিকায় ইহা সর্বাধিক হয়, ফলে রক্ত যখন হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনীর মাধ্যমে দেহের প্রত্যন্তে প্রবাহিত হয়, তখন রক্তচাপ আনুপাতিকভাবে হ্রাস পায় এবং রক্তের গতিবেগ প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফলের সংগে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় (13-6 নং চিত্র। এছাড়া আণুবীক্ষণিক গঠন থেকে আর একটা ব্যাপারও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল আণুবীক্ষণিক গঠনের

পরিবর্তনের সংগে রক্তনালীর ভেদ্যতারও (permeability) পরিবর্তন ঘটে এবং রক্তজালিকায় তা সর্বাধিক হয়।

রুধিরের গতিবিদ্যা

Hemodynamics

রক্তনালীর মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহ ও তার সংগে রক্তচাপের সঠিক অনুশীলন **রুধির গতিবিদ্যা** (hemodynamics) নামে পরিচিত। রক্ত ও রক্তপ্রবাহের কতকগুলো বিশেষত্ব আছে, যা সাধারণ তরল ও তাদের প্রবাহের থেকে আলাদা। **প্রথমত,** রক্তপ্রবাহ সুস্থির প্রবাহ নয়, অধিকাংশ রক্তনালীতেই এটি স্পন্দনধর্মী (pulsatile)। **দ্বিতীয়ত,** রক্ত একটি তরল পদার্থ হলেও এটি একটি জটিল অসমসত্ব ও কিছুটা অস্বাভাবিক সান্দ্রতাধর্মী তরল পদার্থ। **তৃতীয়ত,** রক্তনালী সুদৃঢ় নালী নয়, তারা যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক ও প্রসারণক্ষম। রক্তনালীর আভ্যন্তরীণ ব্যাস কখন কি হবে তা নির্ভর করে রক্তচাপ ও রক্তনালীর নিজস্ব প্রাচীরের অনৈচ্ছিক পেশীর উপস্থিতির উপর। অতএব গতিবিদ্যার যেসব সূত্র সুদৃঢ় নলের মধ্য দিয়ে সমসত্ব ও স্বাভাবিক সান্দ্রতাধর্মী তরলের প্রবাহ ও চাপপার্থক্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা রুধির গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না।

1. **গুরুত্বপূর্ণ দুটো চাপ** (The two Impcrtant Pressures) ঃ যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ চাপ রক্তপ্রবাহের সংগে সম্পর্কযুক্ত তারা নিম্নরূপ ঃ

a) **কার্যকরী প্রবাহীচাপ** (Effective Perfusion Pressure)।

(b) **প্রাচীরান্তর চাপ** (Transmural Pressure)।

রক্তনালীর যে কোন অংশের গড় ধমনীচাপ ও গড় শিরাচাপের অন্তরফলকে **কার্যকরী প্রবাহীচাপ** (EPP) নামে অভিহিত করা হয়। অপরপক্ষে, যে কোন রক্তনালীর অন্তঃস্থ চাপ ও তার প্রাচীরের বহির্দেশীয় চাপের (কলাজাত চাপ, tissue pressure) অন্তরফলকে **প্রাচীরান্তর চাপ** (TP) বলা হয়। শেষোক্ত চাপ প্রধানত প্রসারণশীল রক্তনালীর আকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে, বিশেষত সেসব ধমনী (যেমন, উপধমনী) যারা রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

রক্তপ্রবাহের সংগে এই দুটো চাপের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ধমনী রক্তচাপ ও শিরা রক্তচাপ সমানভাবে বৃদ্ধি পেলে কার্যকরী প্রবাহীচাপের কোন পরিবর্তন হয় না, তবে প্রাচীরান্তর চাপের বৃদ্ধি ঘটে, ফলে রক্তনালীর ব্যাস বৃদ্ধি পায় এবং রক্তপ্রবাহের বৃদ্ধি ঘটে। তেমনি কলাজাত চাপ (tissue pressure) বৃদ্ধি পেলে বা প্রাচীরান্তর চাপ হ্রাস পেলে রক্তনালীর ব্যাস হ্রাস পায়, ফলে রক্তপ্রবাহের হ্রাস ঘটে।

2. **প্রবাহ, চাপ ও রোধ** (Flow, Pressure and Resistance) : রক্ত যেহেতু উচ্চচাপসম্পন্ন অঞ্চল থেকে নিম্নচাপসম্পন্ন অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়, সেহেতু রক্তের প্রবাহ (F), কার্যকরী প্রবাহীচাপ (P) এবং বাধা বা রোধের (R) মধ্যে একটি সম্পর্ক পাওয়া যায়। যথা :

$$F=\frac{P}{R}$$

অর্থাৎ রক্তসংবহনেব কোন অংশে রক্তপ্রবাহ কি হবে তা পেতে গেলে সেই অংশের কার্যকরী প্রবাহীচাপকে রোধ বা বাধার দ্বারা ভাগ করতে হবে। রক্ত-প্রবাহের একককে মিলিলিটার/সেকেন্ড (ml/sec) বা ঘনমিলিমিটার/সেকেন্ডে (mm^3/sec) এ প্রকাশ করা যায়। চাপকে মিলিমিটার পারদে (mm Hg) এবং রোধকে ডাইন-সেকেন্ড সেন্টিমিটার$^{-5}$এ (dyne-sec cm^{-5}) প্রকাশ করা হয়। শেষোক্ত এককের জটিলতার জন্য হৃৎসংবহনতন্ত্রে (cardiovascular system) রোধকে *R*-**এককে** প্রকাশ করা হয়। চাপকে (mm Hg) রক্তপ্রবাহের (ml/sec) দ্বারা ভাগ করলে *R* একক পাওয়া যায়। অর্থাৎ

$$R \text{ একক} \equiv \frac{\text{চাপ (mm Hg)}}{\text{প্রবাহ (ml/sec)}}$$

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক গড় ধমনী চাপ 90 mm Hg ও বাম নিলয়ের হার্দ উৎপাদ 90 ml/sec। সুতরাং মোট প্রান্তীয় বাধা (*R*) এক্ষেত্রে,

$$\frac{90 \text{ mm Hg}}{90 \text{ ml/sec}} = 1\ R \text{ একক।}$$

3. **রক্তপ্রবাহ ও কার্যকরী প্রবাহীচাপের সম্পর্ক** (Relation between Blood Flow and EPP) : পয়সেউলির সমীকরণ অনুসারে (প্রাণপদার্থ-

বিদ্যা অধ্যায়ে সান্দ্রতায় দ্রষ্টব্য। সুদৃঢ় নলের মধ্য দিয়ে নিউটনীয় তরলের[1] প্রবাহ কার্যকরী প্রবাহী-চাপের সংগে সমানুপাতিক। তরলের প্রবাহের হার হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে কার্যকরী প্রবাহী-চাপ প্রবাহের এই সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়। প্রবাহ তখন **সরলরেখ**-(stream line) থেকে **অবিন্যস্ত** (turbulent) হয়ে পড়ে (13-7নং চিত্র)। যে
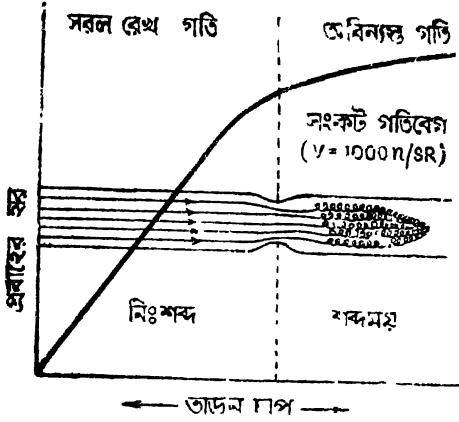
13-7 নং চিত্র : সরলরেখ ও অবিন্যস্ত গতি
S=ঘনত্ব, R= নলের ব্যাসার্ধ।

গতিবেগে তরলের প্রবাহ সরলরেখ থেকে অবিন্যস্ত গতিতে পরিবর্তিত হয় তাকে **সংকট গতিবেগ** (critical velocity) বলা হয়। অর্থাৎ

সংকট গতিবেগ, V (সেণ্টিমিটার/সেকেণ্ড) $= \frac{R\eta}{\rho D}$, এখানে η সান্দ্রতা, ρ = ঘনত্ব

$$\text{বা} \quad R = \frac{\rho DV}{\eta}$$

D = নলের ব্যাসার্ধ, এবং R একটি ধ্রুবক, যা **রেনোল্ড সংখ্যা** Renold's number) নামে পরিচিত। R-এর মান যত বেশী হয় প্রবাহের অবিন্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশী হয়। রক্তসমেত কিছু সংখ্যক তরল পদার্থের ক্ষেত্রে এই সংখ্যার মান 1000-এর কাছাকাছি।

1. যেসব তরল নিউটনের সূত্র মেনে চলে তাদের **নিউটনীয় তরল** (Newtonian fluid) বলা হয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ও চাপে তাদের সান্দ্রতাংক ধ্রুবক হয়। কিছুসংখ্যক অবিশুদ্ধ তরল ও অর্ধতরল এই সূত্র মেনে চলে না বলে তাদের **অনিউটনীয় তরল** (Non-Newtonian liquid) বলা হয়।

নিউটনের সূত্রে : $F = -\eta A.\frac{dv}{dx}$.

এখানে $\frac{dv}{dx}$ = গতিবেগের নতিমাত্রা, A = তরলস্তরের ক্ষেত্রফল

η = সান্দ্রতা, dx = দুটো স্তরের নিকটবর্তী দূরত্ব এবং dv = আপেক্ষিক গতিবেগ।

তরলের অবিন্যস্ত গতিতে চাপ ও প্রবাহের সম্পর্ক সূচকধর্মী (exponential) হয়। চাপ এক্ষেত্রে গতিবেগের বর্গের সংগে সমানুপাতিক হয়, অর্থাৎ প্রবাহকে দ্বিগুণিত করতে গেলে চাপকে 4 গুণ বৃদ্ধি করতে হয়।

হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের সময় মহাধমনীর রক্তপ্রবাহের গতিবেগ সবচেয়ে বেশী হয়। হৃৎপেশীর সংকোচনের প্রারম্ভে নিক্ষেপণকালে মহাধমনীতে রক্তের গতিবেগ সংকট-গতিবেগ অতিক্রম করে। ভারী পেশীসঞ্চালনে হার্দ উৎপাদ 4-5 গুণ বৃদ্ধি পেলেও সিস্টোল বা নিলয়-সংকোচনের অধিকাংশ সময়ব্যাপী রক্তপ্রবাহ অবিন্যস্ত হয়। এ ছাড়া হৃৎকপাটিকার নিকটবর্তী স্থান ব্যতিরেকে রক্তসংবহনের অন্য কোথাও অবিন্যস্ত গতি দেখতে পাওয়া যায় না।

সরলরেখ গতি দোলন বা স্পন্দনধর্মী হলেও তা নিঃশব্দ। অপরপক্ষে অবিন্যস্ত গতি যে ঘূর্ণী বা আবর্তের সৃষ্টি করে তার থেকে শব্দ উত্থিত হয়। অবিন্যস্ত গতি তাই শব্দময়। হৃদ্‌ধ্বনির ব্যাখ্যাও এভাবে পাওয়া যায়। পরোক্ষ পদ্ধতিতে মানুষের রক্তচাপ পরিমাপ করার সময়ে যেসব শব্দের উপর নির্ভর করা হয়, তারাও রক্তপ্রবাহের অবিন্যস্ত গতি থেকে উৎপন্ন হয়। রক্তচাপমাপক যন্ত্রের বাহুবন্ধে বায়ুচাপ বৃদ্ধি করে প্রথমে বাহুধমনীর রক্তপ্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর বাহুবন্ধের বায়ুচাপ ধীরে ধীরে হ্রাস করলে বাহুধমনীর গতিপথে যে সংকীর্ণ ছিদ্র উন্মুক্ত হয়, সেখানে রক্তপ্রবাহের গতিবেগ সংকট-গতিবেগ অতিক্রম করে। রক্তপ্রবাহ তখন অবিন্যস্ত ও শব্দময় হয়ে পড়ে (সিস্টোলিক প্রেসার)। বায়ুচাপ আরও হ্রাস করলে রক্তের প্রবাহ পুনরায় সরলরেখ গতিতে ফিরে আসে এবং শব্দ অন্তর্হিত হয় (ডায়াস্টোলিক প্রেসার)।

4. পয়সেউলি-হ্যাগেন ফরমুলা (Poiseuille-Hagen Formula): একটি দীর্ঘ সংকীর্ণ নালীর মধ্য দিয়ে কোন তরলের প্রবাহ, তরলের সান্দ্রতা এবং নালীর ব্যাসার্ধের মধ্যে যে সম্পর্ক পাওয়া যায় তাকে পয়সেউলি-হ্যাগেনের গাণিতিক সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যথা:

$$F=(P_A-P_B)\times\left(\frac{\pi}{8}\right)\times\left(\frac{1}{\eta}\right)\times\left(\frac{r^4}{L}\right)$$

F = তরলের প্রবাহ,

$P_A - P_B$ = নালীর A ও B প্রান্তের অন্তর্বর্তী চাপপার্থক্য,

η = তরলের সান্দ্রতা,

r = নালীর ব্যাসার্ধ,

L = নালীর (দৈর্ঘ্য)।

যেহেতু, প্রবাহ চাপপার্থক্য ভাজিত রোধ (R) এর সমান (F = P/R), সেহেতু,

$$R = \frac{8\eta L}{\pi r^4} \quad \text{(উপরের সম্পর্ক থেকে)}$$

আবার যেহেতু $F \propto r^4$ এবং $R \propto \frac{1}{r^4}$ সেহেতু রক্তনালীর ছিদ্রপথের সামান্য পরিবর্তনেও রক্তপ্রবাহ ও রোধের বা বাধার প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন, কোন রক্তনালীর ব্যাসার্ধ 16 গুণ বৃদ্ধি পেলে তার মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ দ্বিগুণিত হয় এবং ব্যাসার্ধ যখন দ্বিগুণিত হয় তখন তার বাধা বা রোধ তার পূর্বের মানের 6% হ্রাস পায়। এর থেকেই বোঝা যায় উপধমনীর ছিদ্রপথের সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে কত কার্যকরভাবে কোন দেহাংগের রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উপধমনীর ব্যাসের পরিবর্তন তন্ত্রীয় রক্তচাপের উপর কিরকম সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

5. **রক্তপ্রবাহের পরিমাপের পদ্ধতি** (Methods For Measuring Blood Flow)ঃ কোন দেহাংগের রক্তপ্রবাহ নির্ণয়ের সহজতম উপায় হল একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেই অংগের শিরাসমূহ থেকে প্রাপ্ত সব রক্তকে সংগ্রহ করা এবং তার পরিমাপ করা। কিন্তু এই পদ্ধতির ব্যবহার সীমিত। বিকল্প হিসাবে ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহকে **লাডিগের** (Luddig) **স্ট্রমুর** (Stromuhr) যন্ত্রের দ্বারা পরিমাপ করা যায়। লাডিগনির্মিত স্ট্রমুরের একটি ঘূর্ণায়মান প্লাটফর্মের (P) ওপরে সমান ধারণক্ষমতা সম্পন্ন A ও B দুটো বালব স্থাপন করা থাকে। বালব A কে তেল দ্বারা পূর্ণ করা হয়। অনুশীলনের পূর্বে ধমনীকে দ্বিধাবিভক্ত করে তার দুটো প্রান্তকে x ও y স্থানে বাঁধা হয়। এরপর ধমনীকে ক্লিপমুক্ত করলে রক্ত Aস্থিত তৈলজাতীয় পদার্থকে ঠেলে B-তে নিয়ে যাবে। B যখন তেলদ্বারা পূর্ণ হবে তখন P প্লাটফর্মকে হাতদ্বারা ঘুরিয়ে B বালবকে A এবং A বালবকে B-এর স্থানে নিয়ে আসা হয়।

A বালবের আয়তন জানা থাকলে, নির্দিষ্ট সময়ে স্ট্রমুরকে কতবার ঘুরান হয়েছে তা লক্ষ্য করে তার থেকে রক্তের প্রবাহকে নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়। এছাড়া পরোক্ষ-ভাবে কোন দেহাংগের রক্তপ্রবাহকে **প্লেথীসমোগ্রাফ** (plethysmo graph) যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, অগ্রবাহুকে একটি জলরোধক (watertight) চেম্বারে বা প্লেথীসমোগ্রাফে রুদ্ধ (sealed করা হয়। অগ্রবাহু বা হাতের নিচের অংশের আয়তনের পরিবর্তন প্লেথীসমোগ্রাফের জলে সঞ্চালিত হয় এবং একটি স্টাইলাসের দ্বারা গতিশীল ড্রামে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় (13-9 নং চিত্র)। অগ্রবাহুর আয়তনের পরিবর্তন রক্ত ও আন্তরকোষীয় তরলের আয়তনের পরিবর্তনের পরিচায়ক। অগ্রবাহুর শিরারক্তের প্রবাহকে বন্ধ করে দিলে অগ্রবাহুতে আয়তনের পরিবর্তন ধমনী রক্তপ্রবাহের সমানুপাতিক হয়। শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে **শিরাপ্রতিরোধী প্লেথীসমোগ্রাফি** (Venous occlusion plethysmography) নামে অভিহিত করা হয়।

13-8নং চিত্র : স্ট্রমুর যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের প্রবাহ নির্ধারণ।

6. **রক্তপ্রবাহ ও রক্তের সান্দ্রতা** (Blood Flow and Blood Viscosity) : রক্ত প্রবাহের শারীরবৃত্তীয় সীমার মধ্যে রক্তের সান্দ্রতা নিউটনীয় থাকে। লোহিতকণিকার অক্ষীয় পুঞ্জীভবন (axial accumulation) এই অবস্থায় রক্তের সান্দ্রতার খুব কমই পরিবর্তন ঘটাতে পারে (**অক্ষীয় পুঞ্জী-ভবন :** রক্তসংবহনে প্রবাহমান লোহিতকণিকার রক্তনালীর অক্ষবরাবর পুঞ্জীভূত হওয়ার নাম অক্ষীয় পুঞ্জীভবন)। রক্তপ্রবাহে পিং পং বলের মত লোহিতকণিকা গতিবেগের নতিমাত্রায় অনবরত ঘূর্ণিত হয় এবং এর ফলে তাদের উভয়প্রান্তে যে চাপ-পার্থক্যের (ব্যারনৌলি বল) সৃষ্টি হয়, তার দ্বারাই তারা অক্ষ বরাবর

সঞ্জিত হয়। অক্ষীয় পুঞ্জীভবনের ফলে রক্তনালীর প্রাচীরগাত্র বরাবর লোহিত-কণিকামুক্ত পরিষ্কার তরলপদার্থ জমা হয়। রক্তে লোহিতকণিকার সংখ্যা-
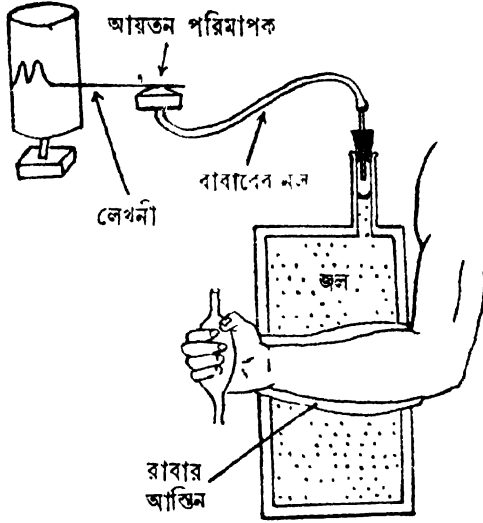
13-9 নং চিত্র : প্লেথীস্‌মোগ্রাফ।

বৃদ্ধিতে রক্তের সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। তখন রক্ত অনিউটনীয় হয়ে পড়ে এবং রক্তপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অক্ষীয় পুঞ্জীভবনও তখন সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে। রক্তপ্রবাহ বজায় রাখার জন্য হৃৎপিণ্ডকে তখন অধিক কাজ করতে হয়, অপরপক্ষে রক্তাল্পতায় রক্তের সান্দ্রতা হ্রাস পায় (ফলে হার্দ উৎপাদের বৃদ্ধি ঘটে)।

এ ছাড়া রক্তনালীর মধ্য দিয়ে যখন রক্ত প্রবাহিত হয় তখন রক্তের সান্দ্রতা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেতে দেখা যায়। এই পরিবর্তনকে **সিগমা ইফেক্ট** (sigma effect) নামে অভিহিত করা হয়। এ ক্ষেত্রে পয়সেউলির সমীকরণের দ্বারা চাপ-প্রবাহের সম্পর্ক প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় না।

7. **রক্তনালীতে চাপ ও প্রবাহের সম্পর্ক** (Pressure-Flow Relation In Vascular Bed) : বাহসংকোচক স্নায়ুতে তড়িৎ-উদ্দীপনা প্রয়োগ করে রক্তনালীর যে পরিবর্তন পাওয়া যায় তার সংগে রক্তপ্রবাহ ও কার্যকরী প্রবাহীচাপের সম্পর্কের অনুশীলন করা হয়েছে। সুদৃঢ় নালীর মধ্য দিয়ে চাপ ও প্রবাহের সম্পর্ক সমানুপাতিক। রক্তনালী যখন প্রসারিত অবস্থায় থাকে তখন সেখানেও চাপ ও প্রবাহের সম্পর্ক সমানুপাতিক হয়। রক্তনালীর সংকোচন পরিমিত বা মাঝামাঝি হলে চাপ ও প্রবাহের লেখচিত্র 'S'-আকৃতিবিশিষ্ট হয়।

সংকোচন অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে প্রবাহের দ্রুত অবনতি ঘটে এবং চাপ হ্রাস পেয়ে শূন্যেতে না পৌঁছলেও (যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকরী প্রবাহীচাপ বর্তমান থাকে) রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। হ্রাসপ্রাপ্ত যে চাপে প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তাকে **শূন্য-প্রবাহ চাপ** (zero-flow pressure) বা **সংকট-সমাপ্তি চাপ** (critical closing pressure) বলা হয় (13-10 নং চিত্র)। ক্ষুদ্র রক্তনালী এই সময়ে
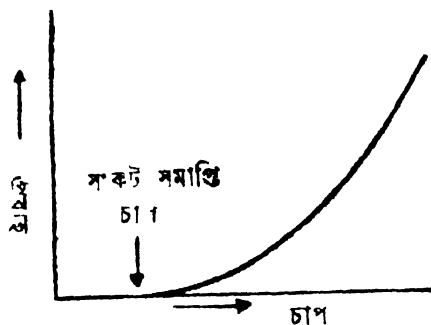
13-10নং চিত্র : রক্তনালীতে চাপ ও প্রবাহের সম্পর্ক এবং সংকট-সমাপ্তি চাপ।

সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ এসব রক্তনালীকে পরিবেষ্টনকারী কলা-কোষের চাপ রক্তনালীর আভ্যন্তরীণ চাপের চেয়ে অনেক বেশী হয় অর্থাৎ প্রাচীরান্তর চাপ যথেষ্ট হ্রাস পেয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যখন রক্তনালী বন্ধ হতে বাধ্য হয়।

8. **রক্তের গতিবেগ** (Velocity of Blood) : একটা নির্দিষ্ট রক্তনালীর মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহের হারকে **রক্তের গতিবেগ** বলা হয়, অর্থাৎ যে সমান্তরাল গতিবেগ নিয়ে রক্তসংবহনতন্ত্রের কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট বিন্দুকে অতিক্রম করে তাকেই রক্তের গতিবেগ বলা হয়। ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ (cm^3/sec) স্পন্দধর্মী (pulsatile) হলে রক্তের গতিবেগ (cm/sec) মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। রক্তপ্রবাহের সংগে এর পার্থক্য হল, রক্তপ্রবাহ নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু রক্তের গতিবেগ রক্তনালীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সংগে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। Q একটা নির্দিষ্ট সময়ে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ এবং A রক্তনালীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হলে, রক্তের গতিবেগ (V) নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$V = \frac{Q}{A}$$

হৃৎপিণ্ডের উৎপাদ এবং মহাধমনীর প্রস্থচ্ছেদ থেকে মহাধমনীর রক্তের যে গড় গতিবেগ নির্ণয় করা হয়েছে, তার মান সেকেণ্ডে 40 সেন্টিমিটার। শিরার প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফল মহাধমনীর দ্বিগুণ বলে শিরার মধ্য দিয়ে রক্তের গতিবেগ 20 সেন্টিমিটার। রক্তজালিকার প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফল মহাধমনীর প্রস্থচ্ছেদীয়

ক্ষেত্রফলের প্রায় 1000 গুণ বেশী বলে সেখানে রক্তের গতিবেগ সেকেণ্ডে 0·4 মিলিমিটার। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রক্তজালিকায় লোহিতকণিকার যে গতি লক্ষ্য করা যায় তাও অনেকটা এই রকম। অর্থাৎ রক্তের গতিবেগ মহাধমনীতে সবচেয়ে বেশী, তারপরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীতে দ্রুত হ্রাস পায় রক্তজালিকায় সবচেয়ে, কম হয় এবং শিরাতে তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়, এবং মহাশিরাতে আরও বেশী হয়, তবে কখনও তা মহাধমনীর মত নয়।

9. **সংবহন কাল** (Circulation Time) : রক্তসংবহনের কোন একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে পেঁছিতে কোন পদার্থকণার যে ন্যূনতম সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে **সংবহনকাল** বলা হয়। সংবহনকাল রক্তের
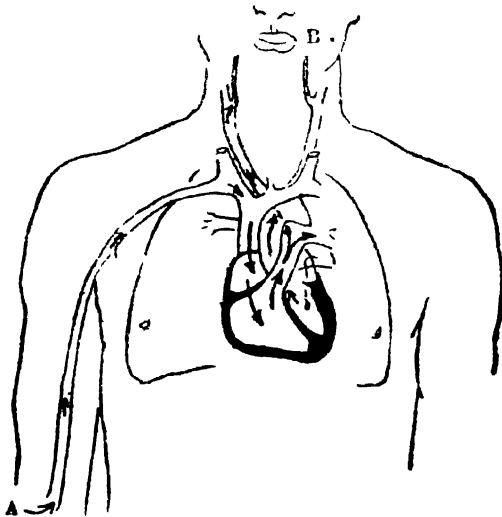
13·11 নং চিত্র : বাহু থেকে জিহ্বা পর্যন্ত সংবহনকাল।
A-ইনজেকশন স্থল (বাহু), B-গন্তব্য স্থল (জিহ্বা)।

সমান্তরাল গতিবেগের পরিমাপক। একটা নির্দিষ্ট রঞ্জক পদার্থকে কোন একটি শিরাতে প্রবেশ করিয়ে দেহের বিপরীত পার্শ্বস্থ অনুরূপ শিরাতে পেঁছিতে তার কত সময় লাগে তা নির্ণয় করা সম্ভবপর। এই পদ্ধতিতে ফ্লোরেসিন (flourescein) রঞ্জকপদার্থের ব্যবহার করে জুগুলার শিরা (jugular) থেকে অনুরূপ জুগুলার শিরা পর্যন্ত পদার্থের যে সংবহনকাল নির্ণয় করা হয়েছে তা প্রায় 22 সেকেণ্ড। একই ভাবে দেখা গেছে পায়ের অনুরূপ শিরাতে পেঁছিতে রঞ্জক পদার্থের সময় লাগে প্রায় 28 সেকেণ্ড। এই সময়কে **সম্পূর্ণ সংবহন** (total circulation) বলা হয়।

সংবহনকাল নির্ণয়ের জন্য অন্যান্য যেসব পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে আছে পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড (potassium ferrocyanide), হিস্টামিন (histamine), ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেট, স্যাকারিন (saccharin), ডেকোলিন (decholin), ইথার, সোডিয়াম সায়ানাইড, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি। এসব পদার্থ ব্যবহার করে দেহের বিভিন্ন অংশে তাদের যেসব **স্বাভাবিক সংবহনকাল** নির্ণয় করা হয়েছে তা 1 নং তালিকায় উপস্থাপিত করা হয়েছে।

1 নং তালিকা : স্বাভাবিক সংবহনকাল।

ব্যবহৃত পদার্থ	প্রয়োগস্থল	গন্তব্যস্থল	গতিপথ	ইংগিত	সংবহনকাল (সেকেন্ডে)
স্যাকারিন (20%) ডেকোলিন (2%)	কনুই শিরা (cubital vein)*	জিহ্বার রক্তজালিকা	বাহু-জিহ্বা (শিরা-হৃৎপিণ্ড-রক্তজালিকা)	স্বাদ	12 (8-16)
অ্যাসিটোন ইথার	কনুই শিরা	ফুসফুসীয় রক্তজালিক	বাহু-ফুসফুস (শিরা-হৃৎপিণ্ড-রক্তজালিকা)	প্রশ্বাস বায়ুর গন্ধ	6 (4-8)
হিস্টামিন	কনুই শিরা	মুখমণ্ডলের রক্তজালিকা	বাহু-মুখমণ্ডল	মুখমণ্ডলের রক্তোচ্ছ্বাস	24 †
সোডিয়াম সায়ানাইড	কনুই শিরা	ক্যারোটিড বডি	বাহু-ক্যারোটিড বডি (শিরা-হৃৎপিণ্ড-ক্যারোটিড বডি)	শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি	13 (12-15)
তেজস্ক্রিয় পদার্থ	কনুই শিরা	হৃৎপিণ্ড	বাহু	আয়নন কক্ষ (ionisation chamber)	6 6 (2-12)

* ল্যাটিন, cubital = কনুই

† ডেকোলিনের মতই হওয়া উচিত ; বাহু প্রসারণই হয়ত দীর্ঘ সময়ের জন্য দায়ী।

সংবহনকালের পরিবর্তনসাধনকারী কারণসমূহ (Factors affecting circulation time) **:** যে সব কারণ রক্তের গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য দায়ী তারা সংবহনকালকে হ্রাস করে। যেমন : পেশীসঞ্চালন, উত্তেজনা, হৃদ্‌ উৎপাদের বৃদ্ধি, বি. এম. আর. (B. M. R) বৃদ্ধি, অ্যাড্রেন্যালিন ক্ষরণ ; রক্তাল্পতা, জ্বর, থাইরোয়েডের অতিক্রিয়া প্রভৃতিতে রক্তের গতিবেগ বৃদ্ধি পায় এবং সংবহনকালের হ্রাস ঘটে। অপরপক্ষে হৃদ্‌রোগ (heart failure), প্রান্তীয় ব্যর্থতা (peripheral failure), মীক্সিডেমা (myxedema), পলিসাইথেমিয়া ভেরা (polycythemia vera) প্রভৃতি রোগে সংবহনকালের বৃদ্ধি ঘটে।

10. **ল্যাপলাসের সূত্র** (Law of Laplace) **:** রক্তজালিকার মত সূক্ষ্ম ও এত পাতলা প্রাচীরযুক্ত নালীও কেন তেমন ভঙ্গুরপ্রবণ নয় তা অবাক হওয়ার মত ঘটনাই বটে। দেখা গেছে, এদের ক্ষুদ্র ব্যাসই এর মূল কারণ। **ল্যাপলাসের সূত্র** কার্যকরভাবে এদের সুরক্ষার জন্য দায়ী। শুধু এক্ষেত্রেই নয় এই অতি প্রয়োজনীয় সূত্রটি শারীরবৃত্তের অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই সূত্রের বক্তব্য হল : প্রসারণধর্মী ফাঁপা বস্তুর উপর যে প্রসারণকারী চাপ (P, distending pressure) কাজ করে তা সাম্যাবস্থায় প্রাচীরের টানকে (T) বস্তুটির বক্রতলের প্রধান দুটি ব্যাসার্ধ (R_1 এবং R_2) দিয়ে ভাগ দিলে যে মান পাওয়া যায় তার সমান হয়। অর্থাৎ

$$P = T(1/R_1 + 1/R_2)$$

এক্ষেত্রে P প্রাচীরান্তর চাপ (transmural pressure), একে ডাইন / বর্গ-সেন্টিমিটারে ($dynes/cm^2$) প্রকাশ করা হয়। T কে ডাইন / সেন্টিমিটার এবং R_1 ও R_2 কে সেন্টিমিটারে (cm) প্রকাশ করা হয়। গোলকের ক্ষেত্রে যেহেতু $R_1 = R_2$, সুতরাং এখানে $P = 2T/R$

রক্তনালীর মত, সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে, যেখানে একটি ব্যাসার্ধ অসীম, সেখানে

$$P = T/R.$$

ফলে, একটি রক্তনালীর ব্যাসার্ধ যত ক্ষুদ্র হবে রক্তনালীর প্রাচীরগাত্রে তত কম টান (T) প্রয়োগ করে প্রসারণকারী চাপকে সাম্যাবস্থায় নিয়ে আসা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের মহাধমনীতে স্বাভাবিক চাপে প্রাচীরগাত্রের টান প্রায় 170,000 ডাইন / সেন্টিমিটার ; মহাশিরাতে প্রায় 21,000 ডাইন / সেন্টিমিটার ; কিন্তু রক্তজালিকায় তা মাত্র 16 ডাইন / সেমি।

ল্যাপলাসের সূত্র অনুযায়ী প্রসারণশীল হৃৎপিণ্ডকে বিশেষ অসুবিধাজনক

পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয়। হৃৎপ্রকোষ্ঠের ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেলে নির্দিষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে গেলে হৃৎপেশীতে অধিকতর বেশী পেশীটান উৎপাদন করতে হয়। ফলে একটি প্রসারিত হৃৎপিণ্ডকে অপ্রসারিত হৃৎপিণ্ডের চেয়ে বেশী কাজ করতে হয়। ফুসফুসের ক্ষেত্রেও বায়ুনালীর বক্রতলের ব্যাসার্ধ শ্বাস ত্যাগের সময় হ্রাস পাবার ফলে পৃষ্ঠটানের জন্য বায়ুনালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, এবং তা রোধ করে পৃষ্ঠটান হ্রাসকারী পদার্থ সারফ্যাকটেন্ট (surfactant)। মূত্রথলিতেও ল্যাপলাসের সূত্র কার্যকরী হয়।

11. **বৃহদাকার রক্তনালীতে চাপ ও আয়তনের সম্পর্ক (Pressure Volume Relationships in Large Blood Vessels) :** মহাধমনীর একটি
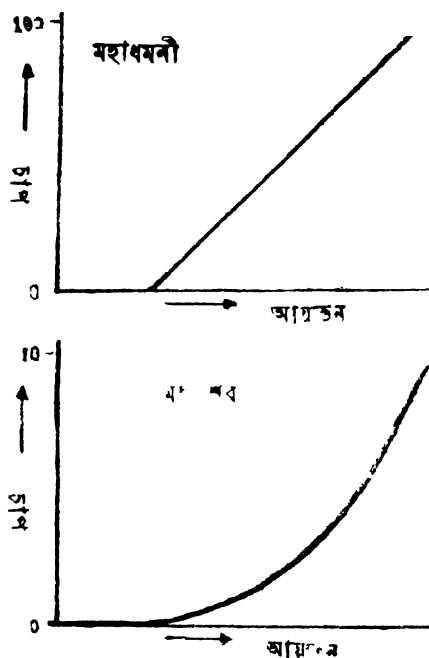
13-12 নং চিত্র : মানুষের মহাধমনী ও শিরার চাপ-আয়তন লেখাচিত্রের আকৃতি।

খণ্ডকে প্রথমে রক্ত দ্বারা পূর্ণ করে এরপর তরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকলে চাপ প্রথম থেকেই সরল অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে (13-12 নং চিত্র)। মহাশিরা বা বৃহদাকার একটি শিরার খণ্ডকে নিয়ে একই পরীক্ষা

চালালে দেখা যায় যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণ তরলকে খণ্ডটির মধ্যে প্রবেশ করানো হচ্ছে ততক্ষণ চাপ বৃদ্ধি হতে চায় না। দেহের অভ্যন্তরে শিরা গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চয় ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় তারা অংশত বন্ধ হয়ে থাকে এবং তখন তাদের প্রস্থচ্ছেদ গোলাকার থাকে। শিরা রক্তপূর্তিতে প্রসারিত হওয়ার পর যে সময়ে রক্ত পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করলে চাপ দ্রুত বৃদ্ধি পায় তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত চাপের তেমন পরিবর্তন না ঘটিয়ে বিপুল পরিমাণ রক্তকে শিরাতন্ত্রে পাঠানো যায়। শিরা-সমূহকে তাই **ক্যাপাসিটেনস ভেসেলস** (capacitance vessels) বা **ধারক নালী** বলা হয়। অপরপক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী ও উপধমনীকে **রেসিসটেন্স ভেসেলস** (resistance vessels) বা **রোধক নালী** বলা হয়।

বিশ্রামকালীন অবস্থায় রক্ত সংবহনের প্রায় 50% রক্তই শিরাতন্ত্রে থাকে। বাকী রক্তের 12% থাকে হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলোতে, 18% ফুসফুসীয় রক্ত-সংবহনে, 2% মহাধমনীতে, 8% অন্যান্য ধমনীতে, 1% উপধমনীতে এবং 5% রক্তজালিকাতে। অন্তরপূর্তি বা ট্রান্সফিউশনের (transfusion) মাধ্যমে অতিরিক্ত রক্তকে সংবহনে প্রবেশ করালে 1% এরও কম রক্ত ধমনীতন্ত্রে বণ্টিত হয় (উচ্চ-চাপ সংস্থা), বাকী অংশের পুরোটাই শিরাতন্ত্র, ফুসফুসীয় সংবহন এবং বাম নিলয় ছাড়া অন্যান্য হৃৎপ্রকোষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে (নিম্ন-চাপ সংস্থা)।

রক্তচাপ
Blood Pressure

রক্তনালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্ত নালীগাত্রে যে পার্শ্বচাপের সৃষ্টি করে তাকে **রক্তচাপ** (blood pressure) বলা হয়। প্রবাহিত রক্ত ধমনীগাত্রে যে পার্শ্বচাপের সৃষ্টি করে তাকে **ধমনী রক্তচাপ** (arterial blood pressure), শিরাগাত্রে যে পার্শ্বচাপের সৃষ্টি করে তাকে **শিরা রক্তচাপ** (venous blood pressure) এবং রক্তজালিকায় যে পার্শ্বচাপের সৃষ্টি করে তাকে **জালিকা রক্তচাপ** (capillary blood pressure) বলা হয়। রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনী রক্তচাপকেই বুঝায়। রক্তচাপের প্রধান কাজ : (1) রক্তপ্রবাহকে বজায় রাখা এবং (2) রক্তজালিকায় পারিস্রাবণের প্রয়োজনীয় চাপের জোগান দেওয়া। রক্তজালিকার পারিস্রাবণ প্রধানত কলাকোষের পুষ্টি, মূত্র উৎপাদন, কলাকোষ ও লসিকা উৎপাদন প্রভৃতির সংগে সম্পর্কযুক্ত।

1. **ধমনী রক্তচাপ ও তার প্রকাশের পরিভাষা** (Arterial Blood Pressure and its Expression) : রক্তচাপকে 4 ভাবে প্রকাশ করা যায় :

(a) **সিস্‌টোলিক প্রেসার** (systolic pressure) বা **সংকোচীচাপ :** ইহা হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকালীন সর্বাধিক রক্তচাপ,

(b) **ডায়াস্‌টোলিক প্রেসার** (diastolic pressure) বা **প্রসারীচাপ :** ইহা হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকালীন সর্বনিম্ন রক্তচাপ,

(c) **পালস্‌ প্রেসার** (pulse pressure) বা **স্পন্দন চাপ :** সিস্‌টোলিক ও ডায়াস্‌টোলিক প্রেসারের অন্তরফলকে পালস্‌ প্রেসার বা স্পন্দনচাপ বলা হয়,

(d) **গড়চাপ** (mean pressure) : ডায়াস্‌টোলিক প্রেসার ও পালস প্রেসারের এক-তৃতীয়াংশের যোগফলকে গড়চাপ বলা হয়।

2. **স্বাভাবিক রক্তচাপ** (Normal Blood Pressure) : বয়স্ক পুরুষের স্বাভাবিক সংকোচীচাপ 125—130±15 mmHg। তেমনি স্বাভাবিক প্রসারীচাপ বা ডায়াসটোলিক প্রেসার 70—90 mmHg। বয়স্ক স্ত্রীলোকে উভয় রক্তচাপ 5 মিলিমিটার কম। এই প্রভেদের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। রক্তচাপকে সাধারণত 120/80 এভাবে প্রকাশ করা যায়। সাধারণ-ভাবে **সিস্‌টোলিক প্রেসার, ডায়াস্‌টোলিক প্রেসার** এবং **পালস্‌ প্রেসারের** স্বাভাবিক অনুপাত 3 : 2 : 1. অর্থাৎ সিস্‌টোলিক প্রেসার 120 হলে, ডায়াস্‌টোলিক প্রেসার ও পালস্‌ প্রেসার যথাক্রমে 80 এবং 40 মিলিমিটার পারদচাপের সমান হবে।

সিস্‌টোলিক প্রেসার 150 মিলিমিটার এবং ডায়াস্‌টোলিক প্রেসার 90 মিলিমিটার পারদচাপের ঊর্ধ্বে উঠলে তাকে **ঊর্ধ্ব রক্তচাপ** (high blood pressure) বলা হয়। তেমনি সিসটোলিক প্রেসার 100 মিলিমিটার ও ডায়াস্‌টোলিক প্রেসার 50 মিলিমিটার পারদচাপের কম হলে, তাকে **নিম্ন রক্তচাপ** (low blood pressure) বলা হয়।

বয়স বৃদ্ধির সংগে উভয় রক্তচাপই বৃদ্ধি পায় (13-13 নং চিত্র)। তবে ডায়াসটোলিক প্রেসারের চেয়ে সিসটোলিক প্রেসারের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশী। বয়স বৃদ্ধির সংগে ধমনীর প্রাচীর অধিকতর দৃঢ় হয় ও ধমনীর প্রসারণধর্ম হ্রাস পায়। ফলে সিস্‌টোলিক প্রেসারের বৃদ্ধি ঘটে। হার্দ

উৎপাদ অপরিবর্তনীয় থাকলেও বৃদ্ধ বয়সে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, কারণ হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের সময় ধমনীতন্ত্রের আয়তনবৃদ্ধি কম হওয়ায় একই পরিমাণ রক্তকে আগের মত স্থান সংকুলান করে দিতে পারে না।
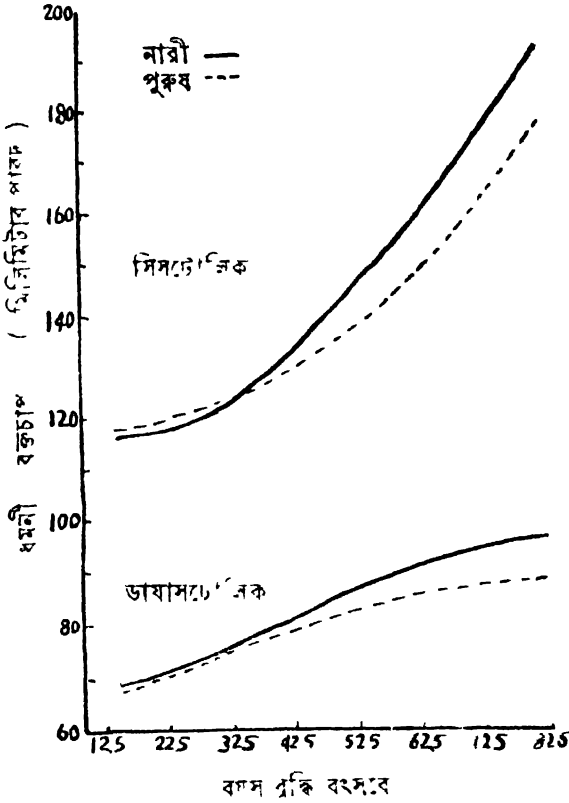
13-13 নং চিত্র : বয়স বৃদ্ধি সংগে ধমনী রক্তচাপের বৃদ্ধি
পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের রক্তচাপের বৃদ্ধি বেশী হয়।

ছমাস বয়সে রক্তচাপ যেখানে 90/60, চার বৎসর বয়সে তা প্রায় 100/65 এবং ষোল বৎসর বয়সে 120/80 মিলিমিটার পারদচাপের সমান হয়। অবশ্য বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের কাছে এই মান বিভিন্ন। যেহেতু 1 mmHg = 0·133 kPa, সুতরাং SI এককে শেষোক্ত মান 16·0/10·6 kPa।

অস্বাভাবিক স্থূল লোকের রক্তচাপ সামান্য বেশী হয়। পেশীসঞ্চালন, উত্তেজনা, আবেগ প্রভৃতি রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটায়। সুপ্তাবস্থায় সিস্টোলিক প্রেসার 14-20 মিলিমিটার হ্রাস পায়। সাধারণভাবে হার্দ উৎপাদ বৃদ্ধি পেলে সিস্টোলিক প্রেসার বৃদ্ধি পায় এবং প্রান্তীয় বাধা বৃদ্ধি পেলে ডায়াস্টোলিক প্রেসারের বৃদ্ধি ঘটে।

3. **রক্তচাপের ওপর অভিকর্ষের প্রভাব** (Effects of Gravity on Blood Pressure) : অভিকর্ষের প্রভাবের জন্য হৃৎপিণ্ডের অনুভূমিক তলের নিচের রক্তনালীতে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং উপরের রক্তনালীতে তা হ্রাস পায়। কতটুকু বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তা নির্ভর করে রক্তের ঘনত্ব ও অভিকর্ষের জন্য উদ্ভূত ত্বরণের (980cm/s/s) গুণফল এবং হৃৎপিণ্ডের উপর ও নিচের উল্লম্ব দূরত্বের উপর। রক্তের স্বাভাবিক ঘনত্বে অভিকর্ষজ প্রভাবের পরিমাণ (magnitude) 0·77mm Hg/cm। সুতরাং দণ্ডায়মান অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের অনুভূমিকতলে ধমনী রক্তচাপ যখন 100 mmHg মস্তিষ্কের বৃহদাকার ধমনীতে তখন গড় রক্তচাপ (হৃৎপিণ্ডের 50cm উপরে $=(100-0{\cdot}77\times50)=62$mmHg. একইভাবে তখন পায়ের বৃহদাকার
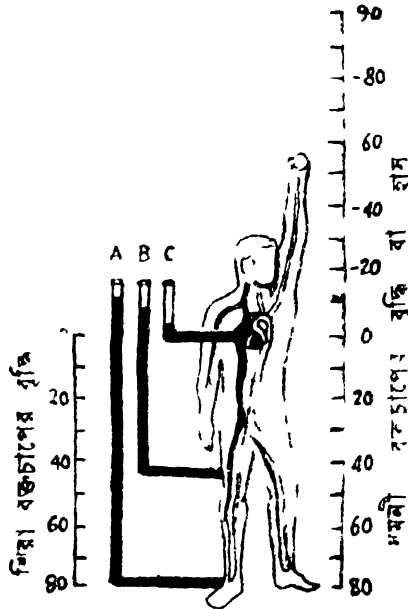
13-14 নং চিত্র : ধমনী ও শিরা রক্তচাপের উপর অভিকর্ষের প্রভাব। ডানপাশে ধমনী রক্তচাপ এবং বাঁ পাশে শিরা রক্তচাপের যথাযথভাবে হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

ধমনীতে রক্তচাপ (হৃৎপিণ্ডের 105cm নীচে) $=(100+0{\cdot}77\times105)$ $=108$mmHg (13-14 নং চিত্র)। শিরা রক্তচাপের উপর অভিকর্ষের প্রভাবও একই ধরনের।

বাম নিলয়ের অনুভূমিকতলের সব রকম ধমনীর গড় রক্তচাপ প্রায় 100 মিলিমিটার পারদ চাপের সমান। 13-14 নং চিত্রের বামপাশে যেসব ম্যানোমিটার দেখান হয়েছে তাদের সংগে গুলফ শিরা (ankle vein, A), উরু-শিরা (femoral vein, B) এবং দক্ষিণ অলিন্দের (c) সংগে দণ্ডায়মান অবস্থায় যুক্ত করলে রক্ত ম্যানোমিটারের উর্ধ্বদিকে কত দূরত্বে উঠবে তা দেখান হয়েছে। অর্ধশায়িত অবস্থায় ম্যানোমিটারকে এই তিনটি শিরার একই স্থানে সংযুক্ত করলে যে রক্তচাপ পাওয়া যায় তার মান A = 10mmHg, B = 7·5mmHg এবং C = 4 6mmHg।

4. রক্তচাপ নির্ণয়ের পদ্ধতি (Methods of determination of Blood Pressure) : রক্তচাপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। প্রত্যক্ষ পদ্ধতি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি
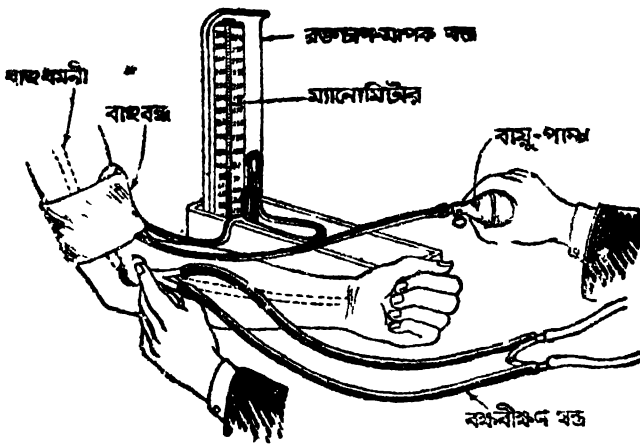
13-15 নং চিত্র : রক্তচাপ নির্ণয়।

প্রাণীর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা হয়। মানুষের রক্তচাপ পরোক্ষ পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। রক্তচাপ নির্ণয়ের পরোক্ষ পদ্ধতি 3টি : (1) **শ্রুতি-নির্ভর পদ্ধতি** (auscultatory method), (2) **নাড়ীস্পর্শন পদ্ধতি** (palpatory method) এবং (3) **দোলন পদ্ধতি** (oscillatory method। এই তিনটি পদ্ধতিতেই **রক্তচাপমাপক যন্ত্রের** (sphygmomanometer)[2] ব্যবহার করা হয়। পরোক্ষ পদ্ধতিতে ব্রাকিয়েল আর্টারী (brachial artery)[3] বা বাহুধমনীর রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়।

---

2. গ্রীক : Sphysmos--ধমনীঘাত। 3. brachialis = বাহু।

(1) **শ্রুতিনির্ভর পদ্ধতি** (Auscultatory method)[4] **:** যন্ত্রটিকে হৃৎপিণ্ডের সমতলে স্থাপন করে ঊর্ধ্ববাহুকে যন্ত্রের বাহুবন্ধের (cuff) দ্বারা বেঁধে নেওয়া (13-15 নং চিত্র) হয়। এরপর যন্ত্রের বায়ুপাম্পের (air-pump) সাহায্যে বাহুবন্ধের আভ্যন্তরীণ বায়ুচাপকে বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রায় 200 মিলিমিটার পারদের সমচাপে উন্নীত করা হয়। অত্যধিক চাপের ফলে ধমনীর রক্তপ্রবাহ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এরপর একটি বক্ষবীক্ষণ যন্ত্রকে (Stethoscope)[5] বাহুধমনীর উপর উপস্থাপন করে বাহুবন্ধনীর বায়ুচাপ মুক্ত করার সময়ে ধমনী-রক্তে পরপর কতকগুলি ধ্বনি শোনা যায়, যাদের উপর ভিত্তি করে সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ নির্ণয় করা হয় (13-16 নং চিত্র)। ধ্বনিগুলোর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ : (a) প্রথমে হঠাৎ একটি শ্রবণযোগ্য ধ্বনি উৎপন্ন হয়। ধমনীতে অবরুদ্ধ রক্তের প্রথম অবিন্যস্ত গতির ফলে এর আবির্ভাব ঘটে। এই ধ্বনির সংগে ম্যানোমিটারের পারদচাপ সিস্টোলিক রক্তচাপের সমান হয়। এই ধ্বনিকে তাই সিস্টোলিক প্রেসার বা সংকোচী রক্তচাপের সূচক হিসাবে ধরা হয়। (b) ধ্বনি এরপর অনেকটা ধারাবাহিক হয়ে আসে এবং ঘরঘর শব্দ শ্রুত হয়। (c) ধ্বনি আরও উচ্চতর হয় এবং অনেকটা পেটা ঘড়ির ধ্বনির মত শোনায়। (d) ধ্বনি এরপর জড়িয়ে যায় এবং দ্রুত অন্তর্হিত হতে থাকে। (e) ধ্বনি হঠাৎ অন্তর্হিত হয়। রক্তের **সরলরেখ** গতি ফিরে আসার ফলেই এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ম্যানোমিটারে এই বিন্দুর পারদচাপকে ডায়াস্টোলিক প্রেসার বা প্রসারী রক্তচাপ হিসাবে ধরা হয়।

13-16 নং চিত্র : বায়ু চাপ মুক্ত করার সময় ধমনীর পরিবর্তন।

(2) **নাড়ীস্পর্শন পদ্ধতি** (palpatory method) **:** এই পদ্ধতিতে একইভাবে বাহুবন্ধের বায়ুচাপকে 200 মিলিমিটার পারদের সমচাপে উন্নীত

4. ল্যাটিন : auscultate – শ্রবণ করা।
5. গ্রীক. Stethos – বক্ষ, Skopeein – পরীক্ষা করা।

করা হয়। নাড়ীস্পন্দন এই চাপে লোপ পায়। হাতের অঙ্গুলীকে রেডিয়াল ধমনীর উপর স্থাপন করে বাহুবন্ধনীর বায়ুচাপকে এরপর ধীরে ধীরে হ্রাস করা হয়। যে মুহূর্তে নাড়ীস্পন্দন অনুভূত হয় সেই মুহূর্তের ম্যানোমিটারের পারদচাপ সিস্টোলিক প্রেসারের সমান হয়। এই পদ্ধতিতে ডায়াস্টোলিক প্রেসারের পরিমাপ করা যায় না।

(3) **দোলন পদ্ধতি** (Oscillatory method) : এই পদ্ধতিতে একই ভাবে বাহুবন্ধের বায়ুচাপকে 200 মিলিমিটার পারদের সমচাপে তুলা হয় এবং এরপর ধীরে ধীরে হ্রাস করা হয়। এই সময়ে একটি স্প্রিং গজে (spring-gauge) বা পারদ ম্যানোমিটারে পারদের দোলনের পর্যবেক্ষণ করা হয়। দোলন যখন ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট ও সুবৃহৎ হয়, তখন পারদচাপকে সিস্টোলিক প্রেসারের সমান ধরা হয়। চাপ আরও হ্রাস করলে দোলন অদৃশ্য বা অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার ধারণ করে। এই সময়ের ম্যানোমিটারের পারদচাপ ডায়াস্টোলিক প্রেসারের সমান হয়।

(4) **প্রত্যক্ষ পদ্ধতি** (Direct method) : প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সাহায্যে বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর রক্তচাপকে পরিমাপ করা যায়। অবেদনিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণীকে অজ্ঞান করে প্রথমে তার ক্যারোটিড ধমনীকে ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে অনাবৃত করা হয়। এরপর একটি ধমনী ক্যানুলা (arterial cannula) বা T-নলের মাধ্যমে ক্যারোটিড ধমনীকে U ম্যানোমিটারের সংগে যুক্ত করা হয়। U ম্যানোমিটারের অপরপ্রান্তে একটি স্টাইলাস (stylus) যুক্ত থাকে যা রক্তচাপের পরিবর্তনকে ধূমায়িত ড্রামে লিপিবদ্ধ করতে পারে। রক্তচাপ U নলের পারদকে ঠেলে উপরের দিকে তুলে দেয়। U নলের অংশাংকন দেখে এরপর প্রাণীর রক্তচাপের পরিমাপ
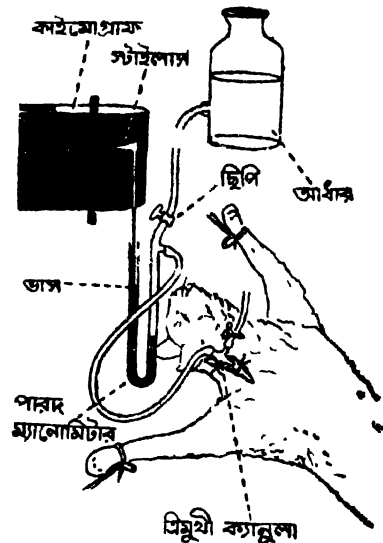
13-17 নং চিত্র : প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে প্রাণীর রক্তচাপ নির্ণয়।

করা হয়। রক্তচাপের ফলে U নলের একটি বাহুর পারদ নীচের দিকে নেমে আসে এবং অপর বাহুর পারদ উপরের দিকে উঠে যায়, সেহেতু স্কেলের মানকে দ্বিগুণ করে সঠিক রক্তচাপের গণনা করা হয়।

5. **রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী কারণসমূহ** (Factor Controlling Blood Pressure) ঃ সাধারণভাবে যেসব কারণসমূহ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী সংক্ষেপে তাদের সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা কবা হল ঃ

(i) **হার্দ উৎপাদ** (Cardiac output) ঃ হার্দ উৎপাদেব পরিবর্তনে রক্তচাপেরও পরিবর্তন ঘটে। হার্দ উৎপাদ প্রধানত হৃৎপিণ্ডের পেশী-সংকোচনবল, হৃৎস্পন্দনেব হার এবং শিরারক্তের প্রত্যাবর্তনের উপর নির্ভরশীল। এদের পরিবর্তনে হার্দ উৎপাদেরও পরিবর্তন হয়।

(ii) **হৃৎপিণ্ডের সংকোচনক্ষমতা** (Contraction power of the heart) ঃ হৃৎপেশীব সফল সংকোচন শুধুমাত্র রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে না, ইহা রক্তপ্রবাহ ও হার্দ উৎপাদকেও নিয়ন্ত্রিত কবে। প্রতিটি সফল সংকোচন নিলয়স্থিত রক্তকে মহাধমনীতে নিক্ষেপ কবে এবং তাড়ন-বলের (driving force) সৃষ্টি কবে।

(iii) **রক্তের পরিমাণ** (Blood volume) ঃ রক্তপরিমাণের বৃদ্ধিতে সংকোচী রক্তচাপ ও প্রসারী রক্তচাপ উভয়েই বৃদ্ধি পায়। এর প্রধান কারণ হার্দ উৎপাদের পরিবর্তনে ধমনীতন্ত্রে রক্তের পরিবর্তন বৃদ্ধি পায় এবং ধমনীগাত্র অত্যধিক প্রসারিত হয়।

iv) **ধমনীগাত্রের স্থিতিস্থাপকতা** (Elasticity of arterial wall) ঃ ধমনীগাত্রের স্থিতিস্থাপকতার উপর রক্তচাপ অনেকটা নির্ভরশীল। ধমনীর স্থিতিস্থাপক ধর্মের জনা রক্তপ্রবাহ ধমনীতে তরংগধর্মী হয। রক্তজালিকা ও শিরাতে রক্তপ্রবাহ ধারাবাহিক। বৃদ্ধ বযসে ধমনীপ্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা বিনষ্ট হয় এবং রক্তচাপও বৃদ্ধি পায়।

(v) **রক্তের সান্দ্রতা** (Viscosity of blood) ঃ রক্তের সান্দ্রতার পরিবর্তনে সংকোচী রক্তচাপ পরিবর্তিত হয়। রক্তের সান্দ্রতা প্রধানত প্রান্তীয় বাধার উপর ক্রিয়া কবে, কারণ সান্দ্রতার হ্রাস-বৃদ্ধিতে আণবিক ঘর্ষণেরও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

(vi) **প্রান্তীয় বাধা** (Peripheral resistance) : রক্ত যখন দেহ-প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয় তখনই তা এই বাধার সম্মুখীন হয়। বাধা প্রধানত

আসে উপধমনী (arterioles) থেকে এবং কিছুটা রক্তজালিকা থেকে। প্রান্তীয় বাধা প্রধানত রক্তের সান্দ্রতা, রক্তের প্রবাহ, উপধমনীর স্থিতিস্থাপকতা এবং রক্তনালীর আভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে। রক্তের সান্দ্রতা ও রক্তপ্রবাহের সংগে প্রান্তীয় বাধা সমানুপাতিক। অপর দুটির সংগে ইহা ব্যস্তানুপাতিক। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে প্রান্তীয় বাধার গুরুত্ব অনেকখানি।

(vii) **স্নায়ুতন্ত্র** (Nervous system): স্নায়ুতন্ত্র বাহনিয়ামক ব্যবস্থার (**vasomotor** system) মাধ্যমে উপধমনীর নালীপথের (lumen) পরিবর্তন ঘটিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। উপধমনীতে চেষ্টীয় স্নায়ু বা বাহনিয়ামক স্নায়ুর প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

(viii) **কার্বনডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, আয়ন ইত্যাদি** (Carbondioxide, oxygen, hydrogen ions etc): অধিক কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন আয়নের তীব্রতা, অক্সিজেনের অভাব, হিস্টামিন ও বিপাকলব্ধ পদার্থ (metabolites) ইত্যাদি সরাসরি রক্তনালীর উপর ক্রিয়া করে এবং তাদের প্রসারণ ঘটায়, ফলে রক্তচাপের পরিবর্তন ঘটে। কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেন স্নায়ুকেন্দ্রের মাধ্যমে রক্তনালীর সংকোচন ঘটায়। মানুষে এই দুটো বিপরীতধর্মী ক্রিয়া পরস্পরকে সম্ভবত প্রশমিত করে।

(ix) **হরমোন** (Hormones): অ্যাড্রেন্যালিন (adrenaline), নর্-অ্যাড্রেন্যালিন (nor-adrenaline) এবং পিটুইট্রিন (pituitrin) রক্তনালীর সংকোচন ঘটিয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। ব্র্যাডিকাইনিন (bradykinin) রক্ত-নালীর প্রসারণ ঘটায়।

শিরা রক্তচাপ

Venous Pressure

উপশিরাতে (venules) রক্তচাপ প্রায় 12-18 mmHg। রক্ত যত বৃহত্তর শিরার দিকে এগিয়ে যায় তত তার চাপ হ্রাস পায়। বৃহদাকারের শিরায় এই রক্তচাপ 5·5 mmHg। দক্ষিণ নিলয়ের প্রবেশ মুখে মহাশিরার রক্তচাপ (কেন্দ্রীয় শিরা রক্তচাপ) 4·6 mmHg এর সমান। তবে শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার পরিবর্তনে তা পরিবর্তিত হয়।

ধমনী রক্তচাপের মত প্রান্তীয় শিরা রক্তচাপও অভিকর্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়। দক্ষিণ অলিন্দের নীচে প্রতি সেণ্টিমিটার দূরত্বে শিরা রক্তচাপ 0·77

mmHg হারে বৃদ্ধি পায় এবং দক্ষিণ অলিন্দের উপরে একই হারে হ্রাস পায় (13-18 নং চিত্র) ।

1. **শিরা রক্তচাপের পরিমাপ** (Measuring Venous Pressure) **:** বক্ষ মহাধমনীতে ক্যাথেটার প্রবেশ করিয়ে **কেন্দ্রীয় শিরা রক্তচাপ** (central venous pressure) সরাসরি নির্ধারণ করা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রান্তীয় শিরা রক্তচাপ কেন্দ্রীয় শিরা রক্তচাপের সমান হয়। প্রান্তীয় শিরা রক্তচাপকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা যায়ঃ একটি ম্যানোমিটারে জীবাণুমুক্ত স্যালাইন ভর্তি করা হয়। এই ম্যানোমিটারের সংগে একটি নিডল বা সূচকে যুক্ত করে বাহুর একটি শিরায় প্রবেশ করানো হয়। প্রান্তীয় শিরাটি দক্ষিণ অলিন্দের অনুভূমিকতলে অবস্থান করা উচিত। মিলিমিটার স্যালাইনে যে মান পাওয়া যাবে তাকে 13·6 দিয়ে (পারদের ঘনত্ব) ভাগ করে মিলিমিটার পারদে (mmHg) রূপান্তরিত করা যায়। হৃৎপিণ্ড থেকে বেশী দূরত্বে অবস্থানের জন্য প্রান্তীয় শিরা রক্তচাপ একটু বেশী হয়। যেমন, অ্যান্টিকিউবিটাল শিরায় স্বাভাবিক শিরা রক্তচাপ যেখানে 7·1mmHg কেন্দ্রীয় শিরায় সেখানে তা 4·6mmHg ।

শ্বাস গ্রহণের সময় বক্ষগহ্বরে যে ঋণাত্মক চাপের সৃষ্টি হয় তার ফলে কেন্দ্রীয় শিরা রক্তচাপ হ্রাস পায়। এছাড়া শক (shock) ইত্যাদিতে শিরা রক্তচাপ হ্রাস পায়। শ্বাসত্যাগের সময় বক্ষগহ্বরে যে ধনাত্মক চাপের বৃদ্ধি হয় তা কেন্দ্রীয় শিরা রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটায়। এছাড়া পীড়ন, রক্ত পরিমাণের বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতা (heart failure) প্রভৃতিও শিরা রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটায়। উর্ধ্বা মহাশিরায় অবরোধ সৃষ্টি হলে অ্যান্টিকিউবিটাল শিরায় রক্তচাপ 20 mmHg বা তারও বেশী বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।
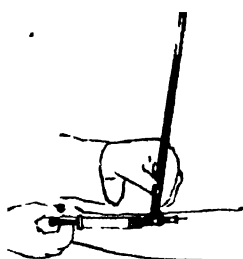
13-18 নং চিত্র **:** প্রান্তীয় শিরা-রক্তচাপ পরিমাপ করার পদ্ধতি।

2. **মস্তকে শিরা রক্তচাপ** (Venous Pressure in the Head) **:** দণ্ডায়মান অবস্থায় অভিকর্ষের প্রভাবে হৃৎপিণ্ডের উপরের দিকে অবস্থানকারী শিরাসমূহে শিরা রক্তচাপ হ্রাস পায়। গ্রীবাদেশের শিরা রক্তচাপ যেখানে

শূন্যতে নেমে আসে সেখানে শিরাগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া শিরার সমগ্র দৈর্ঘ বরাবর চাপ শূন্যতেই থেকে যায়। তবে মস্তিষ্কের ডুরামেটারের সাইনাসের প্রাচীর যেহেতু শক্ত তাই তারা কখনও বন্ধ হয়ে যায় না। এদের মধ্যেকার শিরা রক্তচাপ তাই ঋণাত্মক হয়। এই ঋণাত্মক চাপ কতটুকু হবে তা নির্ভর করে গ্রীবাদেশে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিরা থেকে তাদের উল্লম্ব দূরত্ব কতটুকু তার উপর। সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাসে (superior sagittal sinus) এই চাপ – 10mmHg। এই ঋণাত্মক চাপের জন্য নিউরোসার্জারির সময় এধরনের কোন শিরাকে উন্মুক্ত করলে সে বায়ু টেনে নিতে পারে এবং **এয়ার এমবোলিজম** (air embolism) বা **বায়ু বুদবুদের** সৃষ্টি করে।

3. **শিরা রক্তচাপের পরিবর্তন** (Variation in Venous Pressure) ঃ শিরা রক্তচাপ কি কি কারণে পরিবর্তিত হয় তার কিছু উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। এছাড়া যেসব কারণে শিরা রক্তচাপের পরিবর্তন ঘটে তা নিম্নরূপ ঃ

3. (a) **বক্ষ পাম্প** (Thoracic Pump) ঃ শ্বাস গ্রহণের সময় প্লুরার আভ্যন্তরীণ চাপ 2·5 mmHg থেকে – 6mmHg পর্যন্ত হ্রাস পায়। এই ঋণাত্মক চাপ বৃহদাকার শিরাসমূহে এবং অংশত অলিন্দে সঞ্চালিত হয়। ফলে কেন্দ্রীয় শিরা রক্তচাপ শ্বাসত্যাগের সময় প্রায় 6mmHgতে উন্নীত হয় এবং শ্বাস গ্রহণের সময় প্রায় 2 মিলিমিটার পারদচাপে নেমে যায়। শ্বাস গ্রহণের সময় শিরারক্তের এজাতীয় হ্রাসপ্রাপ্তি শিরারক্তের প্রত্যাবর্তনে সহায়ক।

3. (b). **পেশী পাম্প** (Muscle Pump) ঃ হাতপায়ের শিরার চারিপাশে অস্থিপেশীর উপস্থিতির জন্য পেশীর সংকোচনের সময় শিরাসমূহে চাপ পড়ে এবং একমুখী ভালবের উপস্থিতির জন্য রক্ত সামনের দিকে এগিয়ে যায়। নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে অভিকর্ষের প্রভাবে পায়ের গোড়ালীতে শিরা রক্তচাপ 85-90 mmHgতে উন্নীত হয়। পায়ের শিরায় রক্তকে এভাবে টেনে রাখার ফলে হৃৎপিণ্ডের রক্তের পুনাবর্তন হ্রাস পায়। ফলে হার্দ উৎপাদও কমে। কখনও কখনও হার্দ উৎপাদের হ্রাস প্রাপ্তি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছয় যে দণ্ডায়মান ব্যক্তি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে পারে।

দণ্ডায়মান অবস্থায় পায়ের পেশীর ছন্দবদ্ধ সংকোচন শিরা রক্তচাপের হ্রাস

ঘটায়। রক্তকে হৃৎপিণ্ডের দিকে ঠেলে দেওয়ার ফলে রক্তচাপ 30mmHg বা তারও নিচে হ্রাস পায়।

যেসব রোগীর শিরার ভালব কাজ করতে পারে না (vericose vein) তাদের ক্ষেত্রে শিরারক্তের অগ্রগমন হ্রাস পায় ও পায়ের গোড়ালি ফুলে যায় অর্থাৎ শোথ (edema) হয়। এসব ক্ষেত্রে পেশী সংকোচনের জন্য রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে এগিয়ে যায়।

এয়ার এমবোলিজম
Air Embolism

তরলপদার্থ সংনমনীয় (compressible) না হলেও বায়ু যেহেতু সংনমনীয় তাই রক্তসংবহনে বায়ুর উপস্থিতি মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। হৃৎপিণ্ডে প্রচুর পরিমাণে বায়ুর উপস্থিতি রক্তসংবহন বন্ধ করে দিতে পারে এবং অকস্মাৎ মৃত্যুও ঘটাতে পারে, কারণ অধিকাংশ রক্তই নিলয়ের সংকোচনে সংনমিত হয়ে হৃৎপিণ্ডে আটকা পড়ে। ধমনীতে সঞ্চালিত হয় না। সামান্য পরিমাণ বায়ু হলে তা হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহে বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র রক্তনালীতে বুদবুদ হিসাবে আটকা পড়ে ও রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায় বা বন্ধ হয়ে যায়। মস্তিষ্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালী এভাবে এয়ার এমবোলিজমের ফলে বন্ধ হয়ে গেলে গুরুতর ও মারাত্মক স্নায়ুজ বিকারগ্রস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

জালিকা রক্তচাপ
Capillary Pressure

রক্তজালিকার চাপ ও প্রবাহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। রক্তজালিকার বাইরে প্রযুক্ত যে চাপ রক্তজালিকার মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহকে বন্ধ করে দিতে পারে তার পরিমাপ করে **জালিকা রক্তচাপ** নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া রক্তজালিকার ধমনীপ্রান্তে প্রবিষ্ট একটি মাইক্রোপিপেটের মধ্য দিয়ে স্যালাইনের প্রবাহ শুরু করতে যে চাপের প্রয়োজন হয় তার পরিমাপ করে জালিকা রক্তচাপের মান নির্ধারণ করা হয়।

জালিকা রক্তচাপ নির্দিষ্ট নয়। তবে মানুষের নখের নিম্নস্থ রক্তজালিকার চাপ ধমনীপ্রান্তে 32 mm Hg এবং শিরাপ্রান্তে 15mmHg। পালস প্রেসার প্রায় 5 mmHg। রক্তজালিকা স্বল্প দৈর্ঘ্যের হবার ফলে রক্ত এদের

মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় (প্রায় 0·07 cm/s) কারণ রক্তজালিকা বেডের মোট প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল খুব বেশী।

স্পন্দন চাপ ও চাপ স্পন্দন
Pulse Pressure and Pressure Pulse

সংকোচী রক্তচাপ ও প্রসারী রক্তচাপের অন্তরফলকে **স্পন্দন চাপ** (Pulse Pressure) বলা হয়। সংকোচী রক্তচাপ (systolic pressure) 120 ও প্রসারী রক্তচাপ (diastolic pressure) 80 হলে স্পন্দন চাপের মান হবে (120—80) বা 40 mmHg। স্পন্দন চাপ সাধারণত ঘাতপরিমাণের (stroke volume) সংগে সমানুপাতিক।

অপরপক্ষে, **চাপ স্পন্দন** (pressure pulse) রক্তচাপের দ্বারা সৃষ্ট তরংগবিশেষ যা মহাধমনীতে নিলয়ের রক্ত-উৎক্ষেপণের ফলে উৎপন্ন হয় এবং রক্তপ্রবাহের সংগে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এই তরংগ সৃষ্টির মূলে আছে ধমনীর স্থিতিস্থাপক ধর্ম। হার্দ উৎপাদের ফলে মহাধমনী হঠাৎ প্রসারিত হয় এবং তারই ফলে এই চাপ-তরংগের সৃষ্টি হয়।

1. **চাপ স্পন্দনের গতিবেগ** (Velocity of Pressure Pulse) : রক্ত-প্রবাহের গতিবেগের চেয়ে চাপ স্পন্দনের গতিবেগ অনেক বেশী (প্রায় 6 গুণ)। চাপ স্পন্দনের গতিবেগ প্রধানত রক্তনালীর স্থিতিস্থাপক ধর্মের উপর নির্ভরশীল। বয়সবৃদ্ধির সংগে রক্তনালীর স্থিতিস্থাপক ধর্ম হ্রাস পায়, ফলে চাপ স্পন্দনের গতিবেগের বৃদ্ধি ঘটে। 5 বৎসর বয়সে চাপ স্পন্দনের গতিবেগ যেখানে গড়ে সেকেন্ডে 5 মিটার, 60 বৎসর বয়সে সেখানে তা সেকেন্ডে 8 মিটারের মত।

2. **চাপ স্পন্দনের হার** (Pulse rate) : চাপ স্পন্দনের হার বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। মনের অবস্থা, নিদ্রা, সক্রিয়তা প্রভৃতির উপর ইহা নির্ভরশীল। সুস্থদেহী বয়স্ক লোকের চাপ স্পন্দন গড়ে প্রতি মিনিটে 72 বার। চাপ স্পন্দনের হার হৃৎপিন্ডের স্পন্দনহারের (heartrate) অনুরূপ বা অভিন্ন, তবে কোন কোন হৃদ্‌রোগে (atrial fibrillation, extra systole etc.), হৃৎপিন্ডের সংকোচন অনিয়মিত হলে হৃৎপিন্ডের স্পন্দনহার চাপ স্পন্দনের চেয়েও বৃদ্ধি পেতে পারে, কারণ এই সময়ে কোন কোন ঘাত-পরিমাণ অপর্যাপ্ত হবার ফলে মহাধমনীগাত্রে যে স্পন্দন-তরংগের সৃষ্টি

হয় তা মণিবন্ধে (wrist) পৌঁছতে পারে না। একে **স্পন্দন ঘাটতি** (pulse deficit) বলা হয়।

3. **নাড়ী স্পন্দনের নিদানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য** (Clinical features of radial pulse)ঃ মণিবন্ধে চাপা স্পন্দনকে নাড়ী স্পন্দন বলা হয়। রোগীকে-পরীক্ষার সময়ে নাড়ী-স্পন্দনের যে বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি নজর দিতে হয় তা হলঃ নাড়ীস্পন্দনের (1) **হার** (Rates), (2) **ছন্দ** (Rhythm), (3) **মান** (volume) এবং (4) **চাপ** (tension)। প্রতি মিনিটে নাড়ী-স্পন্দনের ঘটনমাত্রাকে (frequency) নাড়ীস্পন্দনের হার বলা হয়। **ছন্দ** বলতে প্রতিটি ধমনীঘাত (beats) সমদূরবর্তী কি না তার ইংগিত দেয়। মান বলতে ডায়াস্টোলিক লেবেল থেকে নাড়ীস্পন্দনের বৃদ্ধির পরিমাণকে বোঝায়। অন্যান্য কারণ (factors) অপরিবর্তিত থাকলে ইহা ঘাত-পরিমাণের সংগে সমানুপাতিক হয়। চাপ বলতে সিস্টোলিক প্রেসারের আসন্ন মানকে বুঝায়। নাড়ীস্পন্দনকে বন্ধ করতে যে পরিমাণ চাপের প্রয়োজন হয় তার পরিমাপের মাধ্যমে এর মান নির্ধারণ করা হয়। রেডিয়াল ধমনীর (redial artery) উপরে পাশাপাশি তিনটি আঙ্গুলীকে স্থাপন করে নাড়ীস্পন্দনকে পরীক্ষা করা হয়। সম্মুখবর্তী অঙ্গুলী চাপকে নিয়ন্ত্রণ করে, মধ্যবর্তী অঙ্গুলী স্থির থাকে এবং নাড়ী স্পন্দনের উত্থান-পতনকে অনুভব করে, দূরবর্তী অঙ্গুলী নির্দিষ্ট চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পশ্চাদ্‌গামী স্পন্দনকে বোধ করে।

4. **নাড়ী স্পন্দনের রেখচিত্র** (Pulse curve)ঃ নাড়ীস্পন্দনের রেখ-চিত্রকে দুভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপরঃ (a) একটি প্রেষ-সংগ্রাহী (pressure sensitive) ক্যাপসুলকে (capsule) ধমনীর উপর উপস্থাপন করে শুধুমাত্র স্পন্দনতরংগের রেখচিত্র লিপিবদ্ধ করা এবং (b) ইলেকট্রনীয় ম্যানো-মিটারের (electronic manometer) সংগে যুক্ত একটি সূচক সরাসরি ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে একই সংগে সঠিক রক্তচাপ ও স্পন্দন তরংগের রেখচিত্র লিপিবদ্ধ করা। শেষোক্ত পদ্ধতিতে বাহু-ধমনী (brachial artery) থেকে লিপিবদ্ধ করা একটি চাপ স্পন্দনের রেখচিত্র 13-19 নং চিত্রে দেখান হয়েছে। a-তরংগটি নিলয়ের পেশীসংকোচন থেকে উৎপন্ন হয়। এর ঊর্ধ্ব-বাহুতে কোন প্রকার খাঁজ থাকে না। রেখচিত্রের নিম্নবাহুর মধ্যভাগে একটি

খাঁজ (notch) দেখতে পাওয়া যায়। এই খাঁজকে **আঁকশি খাঁজ** বা **ডাই-ক্রোটিক নচ** (dicrotic notch) এবং এর **পরবর্তী তরংগকে আঁকশি-**
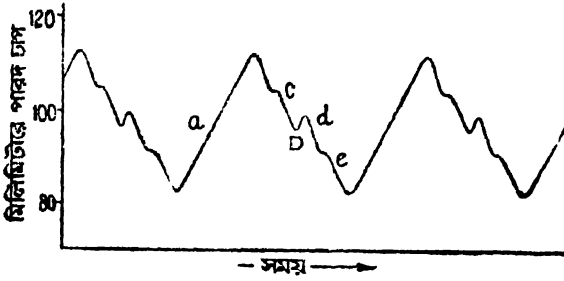
13-19 নং চিত্র : চাপ স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য।
a—প্রাথমিক তরংগ, c—প্রাক্ আঁকশি তরংগ, d—আঁকশি তরংগ
e—পশ্চাৎ আঁকশি তরংগ, D—আঁকশি খাঁজ।

তরংগ (dicrotic wave) বলা হয়। একটি স্বাভাবিক চাপ স্পন্দনের রেখচিত্রে এই দুটো বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ সব সময় পাওয়া যায়। রক্তচাপের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি এবং রক্তনালীর প্রাচীরের স্থিতিস্থাপক প্রতিক্ষেপের (recoil) সংগে এরা সম্পর্কযুক্ত। নিলয়ের প্রসারণের প্রারম্ভে মহাধমনী-স্থিত রক্ত নিলয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করার ফলে হঠাৎ যে রক্তচাপের হ্রাস হয় তারই ফলে ডাইক্রোটিক নচ বা আঁকশি খাঁজের সৃষ্টি হয়। অর্ধচন্দ্র কপাটিকায় ধাক্কা খেয়ে একই রক্তের পুনঃ-প্রত্যাবর্তনে আঁকশি-তরংগের উদ্ভব হয়। প্রাক্-আঁকশি-তরংগের উদ্ভব হয়। প্রাক্-আঁকশি-তরংগ (pre-dicrotic wave) ও পশ্চাৎ-আঁকশি-তরংগ (post dicrotic wave) (c,e) প্রধানত মহাধমনীর স্থিতিস্থাপক দোলনের (oscillation) ফলে উৎপন্ন হয়।

5. **চাপ স্পন্দন বা নাড়ী স্পন্দনের গুরুত্ব** (Importance of Pressure Pulse) **:** চাপ স্পন্দনের অনুশীলন করে হৃৎপিন্ড, ধমনী ও রক্তচাপ সম্পর্কে কিছুটা অবগত হওয়া যায়। যেসব ক্ষেত্রে আঙ্গুলের অগ্রভাগের সাহায্যে চাপ স্পন্দন অনুভব করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে চাপ স্পন্দনের রেখচিত্র থেকে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। সাধারণভাবে প্রান্তীয় বাধা ও হৃৎপিন্ডের হার হ্রাস পেলে এবং ঘাত-পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে লেখচিত্রের প্রাথমিক তরংগের বিস্তৃতি ঘটে। অপরপক্ষে প্রান্তীয় বাধা অত্যধিক বৃদ্ধি

পেলে, রক্তনালীর প্রাচীর কঠিন হলে, হৃৎস্পন্দনের হার দ্রুততর হলে এবং হার্দ উৎপাদ হ্রাস পেলে প্রাথমিক তরংগটি ছোট হয়। এছাড়া বিভিন্ন রোগে নাড়ীস্পন্দনের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নরূপ :

(a) **স্পন্দন পর্যায়ক্রম** (Pulsus alternus) : হৃৎপেশীর গুরুতর ক্ষয়-বিকৃতিতে (myocardial damage) চাপস্পন্দন বা নাড়ীস্পন্দন পর্যায়-ক্রমিকভাবে বড় ও ছোট হয়।

(b) **সাইনাস ছন্দবিকার** (Sinus arrythmia) : নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় নাড়ীস্পন্দনের কম্পনাংক বৃদ্ধি এবং প্রশ্বাসের সময় তার হ্রাস প্রাপ্তিকে সাইনাস ছন্দবিকার বলা হয়। ভেগাস স্নায়ুর সক্রিয়তার পরিবর্তনে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিশুদের মধ্যে এই অবস্থা কখন কখন দেখতে পাওয়া যায়।

(c) **ওয়াটার-হ্যামার নাড়ীস্পন্দন** (Water-Hammer pulse) : মহা-ধমনীর অসামর্থ্যতার ফলে এ ক্ষেত্রে নাড়ীস্পন্দনেব উত্থান-পতন খুবই গভীর ও আকস্মিক হয়। রেখচিত্রে আঁকশি-খাঁজ বা আঁকশি-তবংগ অনুপস্থিত থাকে।

(d) **দুর্বল নাড়ীস্পন্দন** (Weak pulse) : প্রতি পেশীসংকোচনে বাম-নিলয় মহাধমনীতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম পরিমাণ রক্তকে নিক্ষেপ করলে নাড়ীস্পন্দন দুর্বল হয়।

(e) **অত্যধিক নাড়ীস্পন্দন** (Plateau pulse) : মহাধমনীস্থ কপাটিকা সংকীর্ণ বা সংকুচিত হলে (stenosed, গ্রীক stenos = সংকীর্ণ বা সংকুচিত হওয়া) রেখচিত্রের তরংগ প্রথমে উত্থিত হয়ে পরে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়।

(f) **পতনশীল নাড়ীস্পন্দন** (Collapsing pulse) : মহাধমনীস্থ কপাটিকা অসম্পূর্ণ হলে মহাধমনীতে নিক্ষিপ্ত রক্তের কিছুটা অংশ বাম নিলয়ে ফিরে যায়। এই অবস্থায় স্পন্দন তরংগ দ্রুত উত্থিত হয়ে দ্রুত পতিত হয়।

রক্তনালীর স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ
(Neural Regulation of Blood Vessels)

1852 খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক **ক্লড বার্নার্ড** (Claude Bernard) রক্তনালীর স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ প্রথমে পর্যবেক্ষণ করেন। ইঁদুরের ঘাড়ের একটি স্বতন্ত্র স্নায়ুকে ব্যবচ্ছেদ করে তিনি দেখতে পান ইঁদুরটির সেই পার্শ্বের

রক্তনালীর প্রসারণ ঘটেছে এবং কান গরম হয়ে উঠেছে। স্নায়ুর কর্তিত অংশে তড়িৎ-উদ্দীপনা প্রয়োগ করে তিনি রক্তনালীর সংকোচন এবং কানের উষ্ণতা-হ্রাস লক্ষ্য করেন। এই পর্যবেক্ষণ ও পরবর্তী আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়েছে, দেহাভ্যন্তরের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে রক্তনালীর স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

1. **বাহনিয়ামক নিয়ন্ত্রণ** (Vasomotor control): বাহনিয়ামক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়: (A) বাহনিয়ামক কেন্দ্র (vasomotor centre), (B) বাহসংকোচক স্নায়ু (vasoconstrictor nerves) এবং (C) বাহপ্রসারক স্নায়ু (vasodilator nerves)।

(A) **বাহনিয়ামক কেন্দ্র** (Vasomotor Centre): বাহনিয়ামক কেন্দ্র মেডালাতে অবস্থিত। মেডালার জালক সংগঠনের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এর অবস্থান। নিম্নে ওবেক্স (obex) থেকে উর্ধ্বে ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস পর্যন্ত এবং অপরদিকে চতুর্থ প্রকোষ্ঠের তলদেশের সম্মুখ থেকে প্রায় পিরামিড পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের অগ্রাঞ্চল ও পার্শ্ব অঞ্চলে উদ্দীপনা
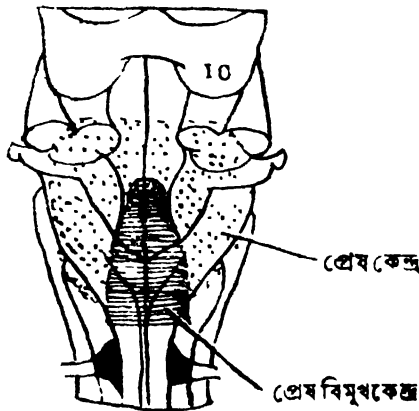
13-20 নং চিত্র: বিড়ালে বাহনিয়ামক অঞ্চল। প্রেষ অঞ্চল, বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত প্রেষবিমুখ অঞ্চল, সমান্তরাল লাইন দ্বারা চিহ্নিত।

প্রয়োগ করলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং টেকিকারডিয়া দেখা যায় (13-20 নং চিত্র)। সম্মিলিতভাবে এই অঞ্চল দুটিকে **প্রেষ অঞ্চল** (pressor area) নামে অভিহিত করা হয়। অপরপক্ষে, ওবেক্সের চারিপাশে বেষ্টনকারী সংকীর্ণ অঞ্চলে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে রক্তচাপ হ্রাস পায় এবং ব্রাডিকারডিয়া

দেখা দেয়। শেষোক্ত অঞ্চল **প্রেষবিমুখ অঞ্চল** (depressor area) নামে পরিচিত। এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক বর্তমান তা এখনও
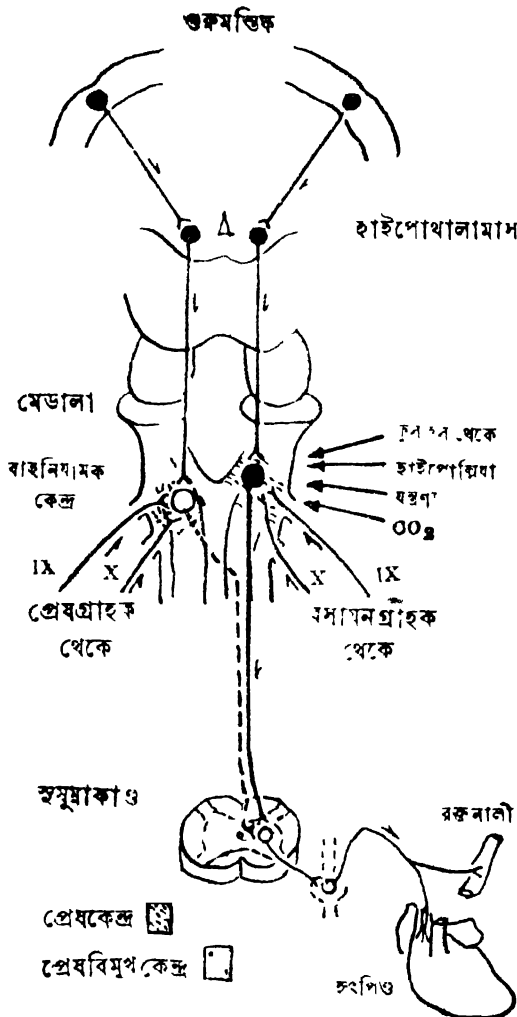
13-21 নং চিত্র : বাহনিয়ামক স্নায়ুতন্ত্রের সরলীকৃত ছক। যেসব উপাদান বাহনিয়ামক স্নায়ুকেন্দ্রে প্রভাব বিস্তার করে তাদেরও চিত্রে দেখান হয়েছে। IC—ইনফিরিওর কুলিকুলাস।

বিস্তৃতভাবে জানা যায়নি। তবে প্রেষ অঞ্চল থেকে যে উদ্দীপক স্নায়ুতন্তু (excitatory fibers) এবং প্রেষবিমুখ অঞ্চল থেকে প্রতিরোধক স্নায়ুতন্তু

(inhibitory fibers) উৎপন্ন হয় তা নিম্নগামী স্নায়ুতন্তু হিসাবে সুষুম্নাকাণ্ডের বিভিন্ন অংশে গিয়ে পেঁছিয়। এই স্নায়ুতন্তুগুলো প্রাকগ্যাংগ্লিয়নিক নিউরোনের চারিপাশে গিয়ে শেষ হয় এবং তাদের প্রবাহমোক্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করে (13·21 নং চিত্র)।

(B) **বাহসংকোচক স্নায়ু :** বাহসংকোচক স্নায়ু **বাহসংকোচক প্রতিবর্তকের** (vasoconstrictor reflex) অংগ হিসাবে রক্তবাহের সংকোচন ঘটায়। রক্তবাহের (উপধমনীর) সংকোচনের ফলে রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটে।

বাহসংকোচক প্রতিবর্তক প্রধানত আওর্টা এবং ক্যারোটিড সাইনাসে উৎপন্ন হয়। দৈহিক রক্তচাপ হ্রাস পেলে অ্যাওর্টা ও ক্যারোটিড সাইনাসস্থিত প্রেষ-গ্রাহক (baroreceptors) উদ্দীপিত হতে পারে না, ফলে হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহের উপর পরাস্বতন্ত্র স্নায়ুর (parasympathetic nerve) প্রতিবন্ধক চাপ বিনষ্ট হয়। **আওর্টা ও ক্যারোটিড বডিস্থিত রসায়ন-গ্রাহককোষও** (chemoreceptors) উদ্দীপিত হয় এবং এই উদ্দীপনাকে তারা বাহ-নিয়ামক কেন্দ্রে পাঠিয়ে তাকে উদ্দীপিত করে তোলে। বাহসংকোচককেন্দ্র বা প্রেষ-কেন্দ্রের সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে স্বতন্ত্রস্নায়ুর (বাহসংকোচক স্নায়ু) সক্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। উপধমনী সংকুচিত হয়ে এরপর রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটায়। দৈহিক রক্তচাপ হ্রাস পেলে বাহসংকোচনের সংগে হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে, যে-কোন অন্তর্বাহ স্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে বাহসংকোচক প্রতিবর্তকের সৃষ্টি হয়।

বাহসংকোচক স্নায়ু স্বতন্ত্রস্নায়ু (sympathetic nerve) হিসাবে প্রথম বক্ষখণ্ডক থেকে দ্বিতীয় কটিখণ্ডকের (lumbar segments) প্রত্যেকটি থেকে নির্গত হয়। নিম্নে তাদের বর্ণনা দেওয়া হল।

(1) **মস্তিষ্ক ও গ্রীবার স্নায়ু :** এই স্নায়ুগুলো মেরুদণ্ডের প্রথম থেকে চতুর্থ বক্ষ-খণ্ডকের প্রতিটি খণ্ড থেকে নির্গত হয়ে **উত্তরা বক্ষ গ্যাংগ্লিয়নে** (superior servical ganglion) প্রবেশ করে। এই গ্যাংগ্লিয়ন থেকে গ্যাংগ্লিয়নোত্তর স্নায়ু (post ganglionic fibres) নির্গত হয় এবং ক্যারোটিড ধমনী ও তার শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে।

(2) **ত্বক ও পেশীর স্নায়ু:** এই স্নায়ুগুলো ধূসর স্নায়ু-সংযোগ (greyrami communicants) বা স্বয়ংক্রিয় গ্যাংগ্লিয়নের (autonomic ganglia) মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে মিশ্র মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুতে পৌঁছয় এবং পরিশেষে সাধারণ চেষ্টীয় স্নায়ু (motor nerve) এবং সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর (sensory nerve) মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

13-22 নং চিত্র : প্রেষ গ্রাহক ও রসায়ন গ্রাহকের অবস্থান।
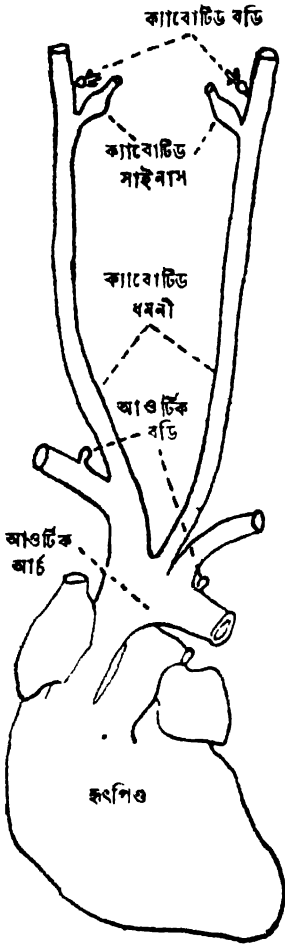
(3) **ঊর্ধ্বাংগের স্নায়ু:** এই স্নায়ুগুলো মেরুদণ্ডের চতুর্থ থেকে দশম বক্ষ-খণ্ডকে উৎপন্ন হয়ে নক্ষত্র গ্যাংগ্লিয়নে (stellate ganglion) প্রবেশ করে। এই গ্যাংগ্লিয়ন থেকে গ্যাংগ্লিয়নোত্তর স্নায়ু নির্গত হয় এবং মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুর সংগে অগ্রসর হয়ে রক্তবাহে বিস্তারলাভ করে।

(4) **নিম্নাংগের স্নায়ু:** একাদশ বক্ষখণ্ডক থেকে দ্বিতীয় কটিখণ্ডক পর্যন্ত প্রত্যেক খণ্ডকে উৎপন্ন হয়ে এসব স্নায়ু নিম্ন কটি-গ্যাংগ্লিয়ন ও ঊর্ধ্ব ত্রিকাস্থি-গ্যাংগ্লিয়নে (sacral ganglions) প্রবেশ করে। গ্যাংগ্লিয়নোত্তর স্নায়ু এই অংশ থেকে নির্গত হয় এবং ত্রিকাস্থি-স্নায়ু-জালকের (sacral plexus) স্নায়ুর সংগে একত্রে অগ্রসর হয়ে রক্তবাহে ছড়িয়ে পড়ে।

(5) **বক্ষ-আন্তরযন্ত্রের স্নায়ু:** হৃৎপিণ্ড ভেগাস-স্নায়ুর মাধ্যমে এবং ফুসফুস স্বতন্ত্র স্নায়ুর মাধ্যমে বাহসংকোচক স্নায়ু লাভ করে।

(6) **উদর-আন্তরযন্ত্রের স্নায়ু:** এই স্নায়ুগুলো নিম্ন বক্ষখণ্ডক ও

দুটো উর্ধ্ব কটিখণ্ডকের মধ্য থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুর (splanchnic nerve) মাধ্যমে সিলিয়াক গ্যাংগ্লিয়নে (coeliac ganglion) প্রবেশ করে। সেখান থেকে গ্যাংগ্লিয়নোত্তর স্নায়ু নির্গত হয়ে রক্তবাহে বিস্তারলাভ করে।

(C) **বাহপ্রসারক স্নায়ু :** (Vasodilator nerves) : বাহপ্রসারক প্রতিবর্তকের (Vasodilator reflex) অংগ হিসাবে বাহপ্রসারক স্নায়ু বাহসংকোচক কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রক্তনালীর প্রসারণ ঘটায়। উপধমনীর প্রসারণে রক্তচাপ হ্রাস পায়।

রক্তচাপের বৃদ্ধিতে ক্যারোটিড সাইনাস ও আওর্টিক আর্চের প্রেষগ্রাহক-কোষ উদ্দীপিত হয়, ফলে প্রতিবর্তকের উৎপত্তি ঘটে। হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তা হ্রাস পায় এবং উপধমনী, বিশেষ করে অস্থিপেশীস্থ উপধমনী প্রসারলাভ করে।

বাহপ্রসারক স্নায়ুকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : (a) **স্বতন্ত্র,** (b) **পরাস্বতন্ত্র** এবং (c) প্রতিপরিবাহী স্নায়ু।

(a) **স্বতন্ত্র বাহপ্রসারক স্নায়ু** (sympathetic vasodilator nerves) : স্বতন্ত্র স্নায়ুর অধিকাংশই বাহসংকোচক স্নায়ু। কিছুসংখ্যক বাহপ্রসারক স্নায়ুর অস্তিত্বও বর্তমান। যেমন, (i) দক্ষিণ আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে রক্তবাহের প্রসারণ হয় এবং রক্তচাপ হ্রাস পায় (ii) সর্বশেষে সম্মুখস্থ বক্ষ-স্নায়ুপথে (thoracic nerve root) উদ্দীপনা প্রয়োগে বৃক্ক-রক্তবাহের প্রসারণ ঘটে। (iii) করোনারী রক্তবাহের বাহপ্রসারক স্নায়ু স্বতন্ত্র স্নায়ুর মাধ্যমে রক্তবাহে বিস্তার লাভ করে। (iv) মানুষের প্রান্তীয় স্নায়ুতে স্বতন্ত্র বাহপ্রসারক স্নায়ুর অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে।

(b) **পরাস্বতন্ত্র বাহপ্রসারক স্নায়ু** (parasympathetic vasodilator nerves) : করোটি-স্নায়ু ও ত্রিকাস্থি-স্নায়ু বাহপ্রসারক স্নায়ু হিসাবে অধঃচোয়াল গ্রন্থি (sub-maxillary gland), কর্ণসন্নিহিত গ্রন্থি (parotid gland), জিহ্বা প্রভৃতির রক্তবাহে এবং জননেন্দ্রিয়ের রক্তবাহে ছড়িয়ে পড়ে।

(c) **প্রতিপরিবাহী স্নায়ু** (antidromic vasodilators) : পশ্চাৎ-মেরুদণ্ডীয় স্নায়ু অন্তর্বাহ স্নায়ু হলেও গ্যাংগ্লিয়নের কিছুটা দূরত্বে তাকে ব্যবচ্ছেদ করলে এবং প্রান্তীয় অংশে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে ত্বক

ও পেশীর রক্তবাহের প্রসারণ ঘটতে দেখা যায়। পেশীতে অ্যাসিটাইল-কোলিন (acetylcholine) এবং ত্বকে হিস্টামিনের (histamine) মুক্তিতে রক্তবাহের প্রসারণ ঘটে। একে অ্যাক্সন-প্রতিবর্ত (axon reflex) বলা হয়।
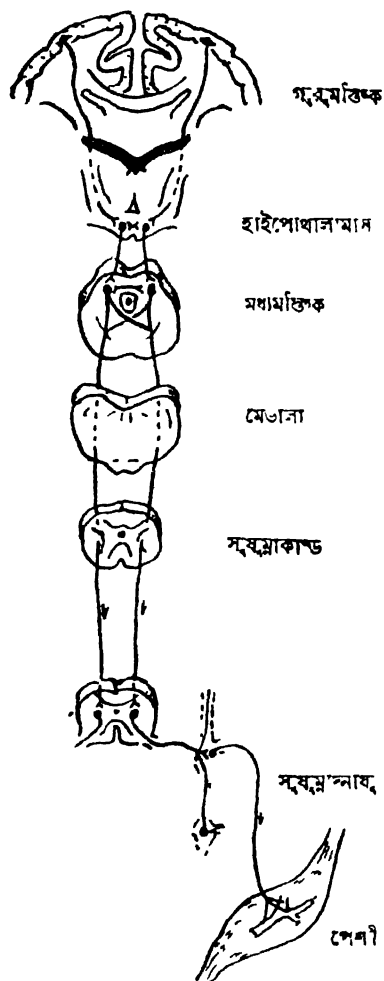
13-23 নং চিত্র : স্বতন্ত্র বাহ প্রসারক স্নায়ুপথ।

2. **বাহনিয়ামক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি** (Mechanism of vasomotor control) : দেহের চাহিদা অনুযায়ী রক্তচাপের নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন উপায়ে সম্পন্ন হয়।

(a) **গুরুমস্তিষ্ক ও হাইপোথালামাস** (Cerebral contex and hypothalamus) : গুরুমস্তিষ্ক ও হাইপোথালামাস বাহনিয়ামক কেন্দ্রের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবেগ (emotion) ইত্যাদি ঘটনা বাহনিয়ামক কেন্দ্রকে উদ্দীপিত করে এবং রক্তবাহের সংকোচন ঘটায়। আঘাত (shock) বাহনিয়ামক কেন্দ্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে রক্তচাপ আকস্মিকভাবে হ্রাস পায়।

(b) **প্রেষ-গ্রাহক** (Baroreceptors) : প্রেষ-গ্রাহক ক্যারোটিড সাইনাস ও মহাধমনী-খিলানে (aortic arch) অবস্থিত। সাইনাস ও খিলানের বহিঃস্তরের গভীরে অন্তর্বাহ স্নায়ুর মুক্তপ্রান্ত প্রেষ-গ্রাহক হিসাবে কাজ করে। রক্তচাপের বৃদ্ধিতে ক্যারোটিড সাইনাস ও মহাধমনী খিলানের প্রাচীরে টান বৃদ্ধি পেলে এরা উদ্দীপিত হয় এবং

অন্তর্বাহ সাইনাস স্নায়ু মহাধমনী-স্নায়ুর মারফত বাহনিয়ামক কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তার ক্রিয়াকে অবদমিত করে, ফলে রক্তচাপ হ্রাস পায়।

(c) **রসায়ন গ্রাহক** (Chemoreceptors) : রসায়ন-গ্রাহক ক্যারোটিড বডি ও আওর্টিক বডিতে অবস্থিত। বহুতলীয় গ্লোমাস কোষ (glomus
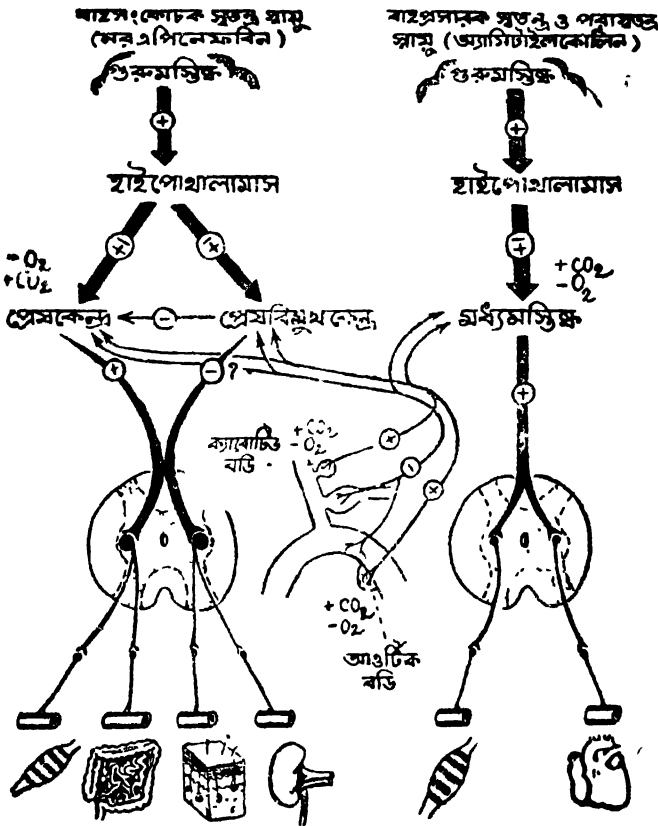
13-24 নং চিত্র : বাহনিয়ামক কেন্দ্র ও তার উপর প্রভাববিস্তারকারী ফ্যাক্টরসমূহ।

cells) গঠিত ক্যারোটিড বডি এবং ফুসফুসীয় ধমনী ও ঊর্ধ্বগ মহাধমনীর সংযোগস্থলে অবস্থিত আওর্টিক বডির অন্তর্বাহ স্নায়ুর-মুক্তপ্রান্ত রসায়ন-গ্রাহক হিসাবে ক্রিয়া করে। রক্তের O_2, CO_2 এবং H^+ আয়নের তীব্রতার পরিবর্তনে এরা উদ্দীপিত হয় এবং বাহনিয়ামক কেন্দ্রকে উদ্দীপিত করে। ফলে রক্তবাহের সংকোচন ঘটে এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

(b) **দেহের অপরাপর অংশের প্রেষ ও রসায়ন-গ্রাহক** (**Baro- and chemoreceptors located in other parts of the body**) **:** প্রায় সব রক্তবাহের প্রাচীরেই রসায়ন-গ্রাহকের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। প্রেষ-গ্রাহক যেসব স্থানে দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান **:** (1) অধঃকণ্ঠাস্থি ধমনী (subclavian artery) ও সাধারণ ক্যারোটিড ধমনীর সংযোগস্থল, (2) উত্তরা থাইরোয়েড-ধমনী (superior thyroid artery) এবং সাধারণ ক্যারোটিড ধমনীর সংযোগস্থল, (3) অধঃকণ্ঠাস্থি ধমনী ও উত্তরা থাইরোয়েড ধমনীর মধ্যস্থ সাধারণ ক্যারোটিড ধমনী, (4) ধারণ-ঝিল্লিস্থ (mesenteric) রক্তবাহ, প্যাসিনিয়ান কণিকা (pacinian corpuscles), (5) মহাধমনীর বক্ষদেশীয়-খিলান (thoracic arch) এবং (6) কেন্দ্রীয় শিরা (central vein)। এ সব গ্রাহক রক্তচাপের বৃদ্ধি ও রক্তের রাসায়নিক উপাদানের পরিবর্তনে উদ্দীপিত হয়ে অন্তর্বাহ স্নায়ুর মাধ্যমে রক্তবাহের প্রসারণ বা সংকোচন ঘটায়।

(c) **কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেন** (**Carbondioxide and oxygen**) **:** রক্তে CO_2 এর আধিক্য এবং O_2-এর অভাব বাহনিয়ামক কেন্দ্রকে উদ্দীপিত করে এবং রক্তপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটায়।

আঞ্চলিক রক্তসংবহনের বিশেষত্ব

PECULIARITIES OF REGIONAL CIRCULATION

দেহের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল বা অংগের মধ্য দিয়ে যে রক্তসংবহন বিস্তারলাভ করে, তার মধ্যে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে, নির্দিষ্ট অংগ বা অঞ্চলের রক্তনালীর বিন্যাস এবং তাদের মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহ সেই অঞ্চল বা অংগের সক্রিয়তার সংগে সমানুপাতিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেসব দেহাংগের রক্তসংবহনের বিশেষত্ব শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ তারা হল **:** (a) **করোনারী রক্তসংবহন** (coronary circulation), (b) **ফুসফুসীয় রক্তসংবহন** (pulmonary circulation), (c) **মস্তিষ্কের রক্তসংবহন** (cerebral circulation), (d) **যকৃতের রক্তসংবহন** (hepatic circulation), (e) **প্লীহার রক্তসংবহন** (splenic circulation), (f) **বৃক্কীয় রক্তসংবহন** (renal circulation), (g) **অস্থিপেশীর রক্তসংবহন** (skeletal circulation), এবং (h)

চার্ম রক্তসংবহন (cutaneous circulation)। করোনারী রক্তসংবহন 'হৃৎপিন্ড অধ্যায়ে' এবং বৃক্কীয় রক্তসংবহন 'রেচনতন্ত্র অধ্যায়ে' বর্ণিত হয়েছে। অন্যগুলির পর্যালোচনা নিম্নে করা হল।

ফুসফুসীয় রক্তসংবহন
PULMONARY CIRCULATION

ফুসফুসীয় রক্তসংবহনের প্রধান কার্য গ্যাসীয় বিনিময়। এই উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত ফুসফুসীয় রক্তনালী ফুসফুসের বায়ুথলির চতুঃপার্শ্বে রক্তজালিকার সৃষ্টি করে। রক্তজালিকাগুলো তুলনামূলকভাবে কম দৈর্ঘ্যের এবং অত্যধিক প্রসারণক্ষম হয়, ফলে তারা অধিক পরিমাণ রক্তকে ধরে রাখতে পারে। রক্ত সাধারণ অবস্থায় জালিকাতে প্রায় 0·75 সেকেন্ড অবস্থান করে। পেশীসঞ্চালন কালে এই সময় হ্রাস পেয়ে 0·3 সেকেন্ডে দাঁড়ায়।

1. **রক্তনালীর বিন্যাস** (Arrangement of blood vessels); **ফুসফুসীয় ধমনী** (pulmonary artery) এবং **ক্লোমশাখাগত ধমনীর** (bronchial arteries) সাহায্যে রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসীয় ধমনী দক্ষিণ নিলয় থেকে উৎপন্ন হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং উপধমনী ও জালিকায় বহুবিভক্ত হয়ে বায়ুথলির চতুঃপার্শ্বে নিবিড় রক্তজালিকার সৃষ্টি

13-25 নং চিত্র ঃ ফুসফুসীয় রক্তসংবহন।

করে। অপরপক্ষে ক্লোমশাখাগত ধমনী মহাধমনী থেকে উৎপন্ন হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং রক্তজালিকায় বহুবিভক্ত হয়ে অংশত বায়ুথলীস্থ জালিকার সংগে সংযুক্ত হয়। এই ধমনীর কিছু শাখা-প্রশাখা শ্বাসনালীস্থ গ্রন্থি ক্লোম-

শাখার (bronchioles) প্রাচীর এবং শ্বসন নালিকাতে (respiratory bronchioles) ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিশেষে রক্তজালকের সৃষ্টি করে।

ফুসফুসীয় শিরা, ক্লোমশাখাগত শিরা ও অযুগ্ম শিরার (azygos vein) মাধ্যমে রক্ত ফুসফুস থেকে নির্গত হয় এবং যথাক্রমে বাম অলিন্দ ও দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। ফুসফুসীয় ধমনী অক্সিজেন লঘুকৃত রক্তকে (deoxygenated blood) ফুসফুসে পরিবহন করে এবং ফুসফুসীয় শিরা অক্সিজেনযুক্ত রক্তকে ফুসফুস থেকে বাম অলিন্দে পরিবহন করে। তাদের বৈশিষ্ট্য 2নং তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। ফুসফুসীয় ও ক্লোমশাখাগত রক্তবাহের মধ্যে যেমন আন্তরবাহ সংযোগনালী (anastomoses) লক্ষ্য করা যায় তেমনি ফুসফুসীয় ধমনী ও শিরার মধ্যে ধমনী-শিরা সংযোগও পরিলক্ষিত হয়।

2নং তালিকা ঃ ফুসফুসীয় রক্তনালীর বিশেষত্ব।

রক্তনালী	উৎসস্থল	সমাপ্তি স্থল	পরিবহন করে
ফুসফুসীয় ধমনী	দক্ষিণ নিলয়	ফুসফুস	অক্সিজেন লঘুকৃত রক্ত
শ্বাসনালীস্থ ধমনী	মহাধমনী	ফুসফুস	অক্সিজেনযুক্ত রক্ত
ফুসফুসীয় শিরা	ফুসফুস	বাম অলিন্দ	অক্সিজেনযুক্ত রক্ত
শ্বসননালীস্থ শিরা	ফুসফুস	দক্ষিণ অলিন্দ	অক্সিজেনলঘুকৃত রক্ত
অযুগ্ম শিরা	ফুসফুস	দক্ষিণ অলিন্দ	অক্সিজেন লঘুকৃত রক্ত

2. **রক্তচাপ ও রক্তপ্রবাহ** (Blood Pressure and Blood Flow): দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে ক্যাথেটার প্রবেশ করিয়ে সরাসরি ফুসফুসীয় ধমনীর রক্তের পরিমাপ করা সম্ভবপর। দেখা গেছে, ফুসফুসীয় ধমনীর সিস্টোলিক প্রেসার 19 থেকে 20 মিলিমিটার পারদচাপের সমান, যা দক্ষিণ নিলয়ের সংকোচনজাত রক্তচাপের সমান। ফুসফুসীয় ধমনীর ডায়াস্টোলিক প্রেসার 6-12 মিলিমিটার পারদচাপের সমান। ফুসফুসীয় রক্তজালিকা ও ফুসফুসীয় শিরার রক্তচাপ যথাক্রমে 8 মিলিমিটার ও 5 মিলিমিটার পারদচাপের সমান। বাম অলিন্দের রক্তচাপ প্রায় 4 মিলিমিটার পারদচাপের সমান। অতএব ফুসফুসীয় ধমনী এবং বাম অলিন্দের রক্তচাপের গড় পার্থক্য মহাধমনী ও দক্ষিণ অলিন্দের রক্তচাপের গড় পার্থক্যের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। অর্থাৎ ফুসফুসীয় রক্তনালী রক্তপ্রবাহে তন্ত্রীয় সংবহনতন্ত্রের তুলনায় মাত্র এক-পঞ্চমাংশ বাধা (resistance) প্রয়োগ করে।

প্রধানত ফুসফুসীয় ধমনীর মধ্য দিয়েই সমগ্র রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং ইহা দক্ষিণ নিলয়-উৎপাদের সমান (মিনিটে প্রায় 5 লিটার) হয়। শ্লেম-শাখাগত ধমনীর মাধ্যমেও কিছুটা রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে।

3. **ফুসফুসীয় রক্তসংবহনের নিয়ন্ত্রণ** (Control of pulmonary circulation) : যে সব কারণ ফুসফুসীয় রক্তসংবহনকে নিয়ন্ত্রিত করে তারা হল ঃ (1) ফুসফুসীয় রক্তনালীর প্রতিবন্ধকতা (pulmonary vascular resistance), যা অক্সিজেনের অভাব বা কার্বন-ডাইঅক্সাইডের আধিক্য-জনিত অবস্থায় রক্তনালীর সংকোচনে বৃদ্ধি পায়, (2) স্বকীয় নিয়ন্ত্রণ (autoregulation) ঃ একটা ফুসফুসকে শুধুমাত্র অক্সিজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মিশ্রণে এবং অপরটিকে স্বাভাবিক বায়ুতে শ্বাসকার্য চালাতে দিলে অধিকাংশ রক্তই দ্বিতীয় ফুসফুসের দিকে প্রবাহিত হয়। (3) যান্ত্রিক কারণ (mechanical factor) ঃ ইহা প্রধানত দক্ষিণ নিলয়ের পেশীসংকোচনবল, পেশীসংকোচনের হার এবং শিরারক্তের প্রত্যাবর্তনের (venous return) উপর নির্ভরশীল। (4) শ্বাসকার্য (respiration) ঃ শ্বাসগ্রহণের সময় ফুসফুসীয় রক্তচাপ হ্রাস পায় এবং শ্বাসত্যাগে তা বৃদ্ধি পায়। শ্বাসগ্রহণের সময় অধিক পরিমাণ রক্তকে ফুসফুসীয় রক্তবাহ ধরে রাখতে পারে। (5) স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ (nervous regulation) ঃ ফুসফুসীয় রক্তবাহে স্বতন্ত্র ও পারস্বতন্ত্র উভয় প্রকার স্নায়ুর উপস্থিতি স্বাভাবিক ফুসফুসীয় রক্তসংবহন বজায় রাখতে সাহায্য করে। (6) প্রতিবর্তী-নিয়ন্ত্রণ (reflex control) ঃ ক্যারোটিড সাইনাস ও আওর্টিক খিলানস্থিত প্রেষ-গ্রাহকে উদ্দীপনা প্রয়োগে ফুসফুসীয় রক্তবাহের প্রসারণ লক্ষ্য করা যায়। অপরপক্ষে ক্যারোটিড বা আওর্টিক বাডাস্থত রসায়ন-গ্রাহকের উদ্দীপনা থেকে ফুসফুসীয় রক্তনালী সংকুচিত হতে দেখা যায়।

মস্তিষ্কের রক্তসংবহন

CEREBRAL CIRCULATION

মস্তিষ্কের রক্তসংবহনের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। দেখা গেছে, মস্তিষ্কের রক্তসংবহনকে শুধুমাত্র 5 সেকেণ্ডের জন্য প্রতিহত করলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মিনিট পাঁচেকের জন্য রক্তসংবহন বন্ধ রাখলে মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। মস্তিষ্কের প্রতি 100 গ্রাম কলাকোষে

মিনিটে গড়ে 54 মিলিলিটার রক্ত প্রবাহিত হয়। বৃহৎ মস্তিষ্ক-ধমনীতে হৃৎপেশীসংকোচনজাত চাপ প্রায় 100 মিলিমিটার এবং হৃৎপেশীপ্রসারণজাত চাপ 65 মিলিমিটার পারদচাপের সমান।

1. **রক্তনালীর বিন্যাস** (Arrangement of blood vessels): মস্তিষ্ক অভিমুখী রক্তনালী: দুটো **অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনী** (internal carotid arteries) এবং দুটো **মেরুদণ্ডীয় ধমনীর** (vertebral arteries) মাধ্যমে রক্ত মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। শেষোক্ত ধমনী দুটো সম্মিলিতভাবে **ব্যাসিলার ধমনী** (basilar) গঠন করে। ব্যাসিলার ধমনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে
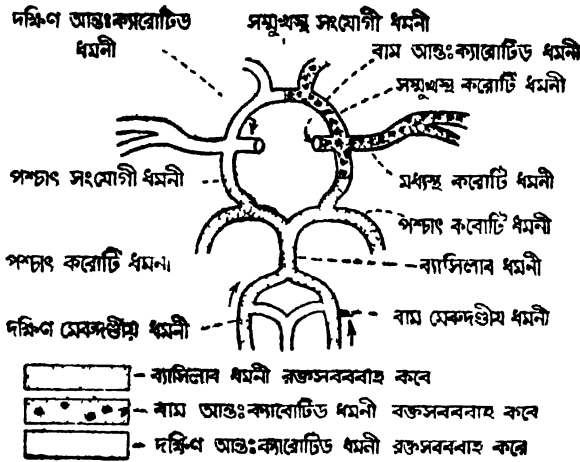
13-26 নং চিত্র—মস্তিষ্কের রক্তসংবহনের বিশেষত্ব।

দুটো **পশ্চাৎ করোটি ধমনী** (posterior cerebral arteries) উৎপন্ন করে (13-26 নং চিত্র)। অপরপক্ষে প্রতিটি অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে **মধ্যস্থ** ও **সম্মুখস্থ করোটি-ধমনী** উৎপন্ন করে। এভাবে উৎপন্ন মোট 6টি ধমনীর শাখা-প্রশাখা পরস্পর উভয়পার্শ্বে মিলিত হয়ে **উইলিসের বলয়** (circle of Willis) গঠন করে। করোটি ধমনী ও তাদের শাখাপ্রশাখা উইলিস-বলয়ে স্বচ্ছন্দে অন্তর্বাহ সংযোগনালী (anastomosis) স্থাপন করে, ফলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে রক্তসরবরাহের প্রাচুর্য বজায় থাকে এবং জরুরী অবস্থার মোকাবিলায় সহায়ক হয়।

মস্তিষ্ক-বহির্মুখী রক্তনালী: শিরারক্ত উত্তরা এ অধরা শিরাকৃতি সাইনাস

(superior and inferior sagittal * sinus), গুহাকৃতি সাইনাস প্রভৃতিতে এসে জমা হয়। এই সাইনাসগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে দুটো তির্যক সাইনাসের সৃষ্টি করে। তির্যক সাইনাস আলাদা আলাদাভাবে দুটি **অন্তঃস্থ জুগুলার শিরার** (internal jugular veins) সংগে সংযুক্ত হয় এবং এভাবে মস্তিষ্কের রক্তকে বহন করে নির্গত হয়।

মস্তিষ্কের ধূসরপদার্থে (grey matter) রক্তসংবহনের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশী। অপরপক্ষে শ্বেতপদার্থ কম সক্রিয় বলে রক্তসংবহন সেখানে কিছুটা কম হয়।

2. **মস্তিষ্কের রক্তসংবহনের নিয়ন্ত্রণ** (Control of Cerebral Circulation) **:** করোটির কাঠিন্যের জন্য কোন পরিস্থিতিতেই মস্তিষ্কে রক্তের পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে এতটুকুও বৃদ্ধি পেতে পারে না। রক্তের গতিবেগ বৃদ্ধি করে মস্তিষ্কের রক্তসরবরাহ বৃদ্ধি করা যায়। নিম্নলিখিত কারণসমূহ মস্তিষ্কের রক্তসংবহন নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী।

(a) **স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ :** মস্তিষ্কের রক্তবাহে বাহনিয়ামক স্নায়ুর সরবরাহ লক্ষ্য করা যায়। তবে উভয় নক্ষত্র-গ্যাংগ্লিয়নে অবেদনিক (anesthetic) প্রয়োগের দ্বারা মস্তিষ্ক-রক্তবাহের স্বতন্ত্র স্নায়ুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রক্তপ্রবাহের কোনরূপ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়নি। মস্তিষ্ক রক্তবাহের সরবরাহকারী স্বতন্ত্রস্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রয়োগ করেও কোনরূপ বাহসংকোচন দেখা যায়নি। ক্যারোটিড সাইনাস ও আওর্টিক খিলানস্থিত প্রেষ গ্রাহকের দ্বারা প্রবর্তিত বাহনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সংগে মস্তিষ্ক ধমনী কোনভাবে জড়িত নয়, তবে তাদের আভ্যন্তরীণ রক্তচাপের নিয়ন্ত্রণ ক্যারোটিড সাইনাস প্রক্রিয়ার সংগে জড়িত। এই ব্যবস্থা মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহকে নিরাপদে রক্ষা করে।

(b) **উষ্ণতা :** উষ্ণতাবৃদ্ধিতে মস্তিষ্কের রক্তবাহ প্রসারিত হয়।

(c) **পি এইচ (pH) :** পি এইচ. হ্রাস পেলে রক্তবাহ প্রসারিত হয়।

(d) **কার্বন-ডাইঅক্সাইড :** কার্বনডাইঅক্সাইডের পার্শ্বচাপের বৃদ্ধিতে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

(e) **অক্সিজেন অভাব :** অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্কের রক্তসংবহন বৃদ্ধি পায় এবং রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটে।

* ল্যাটিন, Sagittal—শর, তীর

(f) **অ্যাড্রেন্যালিন ও নরঅ্যাড্রেন্যালিন ঃ** বাহপ্রসাবণ ঘটিযে অ্যাড্-রেন্যালিন বক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি করে এবং বাহসংকোচন ঘটিযে নর্অ্যাডরেন্যালিন রক্তপ্রবাহ হ্রাস করে।

(g) **রক্তের সান্দ্রতা ঃ** বক্তাল্পতায বক্তেব সান্দ্রতা হ্রাস পায এবং **রক্ত**-প্রবাহের বৃদ্ধি ঘটে। 'পলিসাইথেমিযা ভেবা'-তে (polycythemia **vera)** বিপবীত পরিবর্তন লক্ষ্য কবা যায।

(h) **ধমনী রক্তচাপ ঃ** ধমনী বক্তচাপেব সংগে **মস্তিষ্কেব** বক্তপ্রবাহ সমানুপাতিক হয।

(i) **আন্তর-করোটিচাপ ঃ** মস্তিষ্কে টিউমাব ইত্যাদি কাবণে আন্তব-কবোটিচাপ বৃদ্ধি পেলে মস্তিষ্কেব বক্তপ্রবাহ হ্রাস পায।

(j) বযস ঃ বযসবৃদ্ধিব সংগে মস্তিষ্কেব বক্তপ্রবাহ হ্রাস পেতে দেখা যায।

(k) মস্তিষ্কেব ধমনীকাঠিন্য (Arteriosclerosis) ঃ ধমনীকাঠিন্যে মস্তিষ্কের বক্তবাহেব প্রাচীবেব স্থিতিস্থাপক ধর্ম বিনষ্ট হয, বক্তবাহেব বাধা বৃদ্ধি পায এবং রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায।

যকৃতের রক্তসংবহন

HEPATIC CIRCULATION

যকৃতেব বক্ত সংবহনকে প্বাব-সংস্থা বা পোর্টাল সিস্টেম (portal system) বলা হয, কাবণ বক্তকে একবাব আন্তবযন্ত্রীয বক্তজালক ও পুনবায যকৃতস্থ বক্তজালকেব মধ্য দিযে প্রবাহিত হতে হয। যকৃতস্থ বক্তজালক দেহেব মোট রক্তেব এক চতুর্থাংশ বক্তকে ধবে বাখতে সক্ষম হয। প্রতি মিনিটে প্রতি 100 গ্রাম যকৃতস্থ কলা কোষে প্রায 100 মিলিলিটাব বক্ত প্রবাহিত হয। দেখা গেছে, প্বাব-শিবার (portal vein) বক্তচাপ প্রায 8 10 মিলিমিটার পাবদচাপেব সমান।

1. রক্তবাহের বিন্যাস

Arrangement of blood vessels

প্বার শিরা (portal vein) এবং **যকৃৎ-ধমনীর** (hepatic artery) মাধ্যমে রক্ত যকৃতে প্রবেশ কবে। প্বাব-শিবা দুটো রক্তবাহ থেকে উৎপন্ন হয ঃ (a) **প্লীহাজ-শিরা** (splenic vein), যা প্লীহাস্থিত রক্তকে বহন করে নিযে আসে এবং (b) **উত্তরা ধারণীঝিল্লিজ শিরা** (superior mesenteric vein),

যা ধারণঝিল্লির রক্তকে বহন করে আনে। যকৃতের বাম-অংশ প্লীহাস্থিত রক্ত এবং দক্ষিণ-অংশ ধারণঝিল্লির রক্ত প্রাপ্ত হয়। যকৃতের অধিকাংশ রক্তই এই দুটো উৎস থেকে পাওয়া যায়। দ্বার-শিরা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সাইনুসোয়েডে (sinusoid) রূপান্তরিত হয়। সাইনুসোয়েডের প্রাচীরগাত্রে আগ্রাসী (phagocytic) **কুপ্‌ফার কোষ** (kupffer cells) দেখতে পাওয়া যায়। সাইনুসোয়েড সংযুক্ত হয়ে **কেন্দ্রীয় শিরা** (central vein) এবং কেন্দ্রীয় শিরা মিলিত হয়ে **অধঃলতি শিরা** (sublobular vein) গঠন
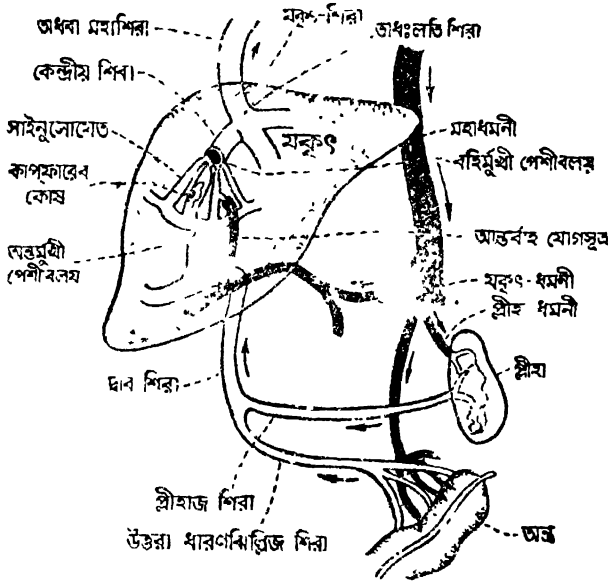
13 27 নং চিত্র ঃ যকৃতের রক্তসংবহনের বিশেষত্ব।

করে। পরিশেষে শেষোক্ত শিরা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে **যকৃৎ শিরা** গঠন করে। যকৃত-শিরা অধরা মহাশিরার সংগে যুক্ত হয় (13-27 নং চিত্র)।

যকৃৎধমনী প্রান্তধমনী (end artery) নয়। ইহা দ্বার-শিরা এবং সাইনুসোয়েডের সংগে বিভিন্ন স্থানে আন্তরবাহ সংযোগনালী গঠন করে।

2. **যকৃতের রক্তসংবহনের নিয়ন্ত্রণ** (Control of hepatic circulation) ঃ যকৃতের রক্তসংবহনের নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী কারণসমূহ নিম্নরূপ :

(a) **স্নায়ুজ কারণ ঃ** স্বতন্ত্র স্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে যকৃতে রক্তপ্রবাহের বৃদ্ধি ঘটে। (b) বাহনিয়ামক প্রতিবর্ত ঃ ক্যারোটিড সাইনাস ও আওর্টিক খিলানে রক্তচাপের বৃদ্ধিতে যকৃতে রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

অ্যাড্রেন্যালিন ও নরঅ্যাড্রেন্যালিন ঃ রক্তে অ্যাড্রেন্যালিনের পরিমাণ অধিক হলে রক্তনালীর সংকোচন ঘটতে দেখা যায়, অপরপক্ষে কম হলে প্রসারণ ঘটে। নরঅ্যাডরেন্যালিন রক্তনালীর সংকোচন ঘটায়। অধিক CO_2, অক্সিজেনের অভাব, H আয়নের তীব্রতার পরিবর্তন ইত্যাদি রক্তনালীতে পরিবর্তন ঘটিয়ে রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। (e) শ্বাসগ্রহণের সময় বক্ষস্থিত রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটে এবং অধিক রক্ত উদরের দিকে ধাবিত হয়, ফলে যকৃতের রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। (f) প্লীহাসংকোচন ও অপরাপর তন্ত্রের চলনক্রিয়ার ফলে যকৃতে রক্তের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। (g) রক্তচাপ ঃ দৈহিক রক্তচাপের বৃদ্ধিতেও যকৃতে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পেলে বিপরীত পরিবর্তন দেখা যায়। (h) আন্তরযন্ত্রের প্রসারণ : পাকস্থলীর প্রসারণে (খাদ্যগ্রহণে) যকৃতে রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায়। (i) পেশীসঞ্চালন ঃ পেশীসঞ্চালনে যকৃতে রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায়। (j) রক্তক্ষরণ ঃ রক্তক্ষরণে যকৃতের রক্তপ্রবাহের অবনতি ঘটে।

প্লীহার রক্তসংবহন
SPLENIC CIRCULATION

রক্তবাহের বিন্যাস ঃ প্লীহায় রক্তসংবহন দুভাবে সম্পন্ন হয় ঃ (1) **দীর্ঘ রক্তসংবহন** (long circulation) এবং (b) **হ্রস্ব রক্তসংবহন** (short circulation)। দীর্ঘ রক্তসংবহনে রক্ত প্লীহাধমনীর (splenic artery) মাধ্যমে প্লীহায় প্রবেশ করে এবং উপধমনী, সছিদ্র শিরাস্ফীতি (perforated venous sinus) ও প্লীহার মজ্জাকোষের মধ্য দিয়ে পুনরায় সছিদ্র শিরা-স্ফীতিতে প্রবেশ করে (13-28 নং চিত্র)। এরপর উপশিরা ও প্লীহাশিরার মাধ্যমে প্লীহা থেকে নির্গত হয়। হ্রস্ব রক্তসংবহনে রক্ত প্লীহাধমনীর মাধ্যমে একই-ভাবে প্লীহায় প্রবেশ করে এবং উপধমনী, রক্তজালিকা, উপশিরা, শিরা ও প্লীহাশিরার মাধ্যমে নির্গত হয়।

প্লীহাধমনী প্লীহানাভির (hilum) মধ্য দিয়ে প্লীহায় প্রবেশ করে এবং বহুবিভক্ত হয়ে ট্র্যাবেকুলি (trabeculi) বরাবর অগ্রসর হয়ে ম্যালপিঘিয়ান কণায় (malpighian corpuscles) প্রবেশ করে। এরপরই ধমনীগুলো একপ্রস্থ উপধমনীতে (penicillus) বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি উপধমনী পাতলা স্পিনডিলাকৃতি (spindle shaped) সংযোগরক্ষাকারী কলার (ellipsoid) মধ্যে প্রবেশ করে। ইলিপসোয়েড কপাটিকা হিসাবে কার্য করে, ফলে রক্তের

পশ্চাৎ-প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অংশ অতিক্রম করে উপধমনী দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং সচ্ছিদ্র শিরাস্ফীতিতে প্রবেশ করে। প্রথম শিরাস্ফীতি অন্তর্মুখী এবং পরবর্তী শিরাস্ফীতি বহির্মুখী পেশীবলয় বা স্ফিংক্‌টার দ্বারা সুরক্ষিত

13-28 নং চিত্র ঃ প্লীহার সংবহন।
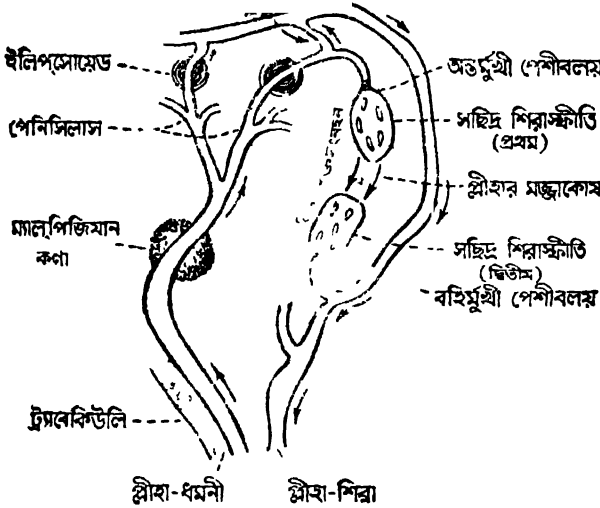
থাকে। শিরাস্ফীতি সছিদ্র হবার ফলে রক্ত সরাসরি মজ্জাকোষের সংস্পর্শে আসে, ফলে মজ্জার R. E. কোষ রক্তের লোহিতকণিকাকে গ্রাস করে।

প্লীহার আভ্যন্তরীণ রক্তচাপ 3-17 মিলিমিটার পারদচাপসম্পন্ন হয়।

2. **প্লীহার রক্তসংবহনের নিয়ন্ত্রণ ঃ** (Control of Splenic Circulation) ঃ (1) স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ ঃ স্বতন্ত্র স্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে প্লীহাভিমুখী ধমনীপ্রবাহ হ্রাস পায় এবং প্লীহা-বহির্মুখী শিরারক্তের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, (2) অ্যাড্‌রেন্যালিন ঃ অ্যাড্‌রেন্যালিন প্লীহার বহির্মুখী রক্ত-প্রবাহ বৃদ্ধি করে (প্লীহার অনৈচ্ছিক পেশীর সংকোচন ঘটিয়ে)। (3) নর্‌-অ্যাড্‌রেন্যালিন ঃ নর্‌অ্যাড্‌রেন্যালিন প্লীহাভিমুখী ধমনী-রক্তপ্রবাহের হ্রাস ঘটায় (রক্তবাহের সংকোচন ঘটিয়ে)। (4) অক্সিজেন-অভাব (hypoxia) ঃ রক্তে অক্সিজেনের অভাবে প্লীহা সংকুচিত হয় এবং বহির্মুখী রক্তপ্রবাহের বৃদ্ধি ঘটে। (5) শ্বাসরোধ (asphyxia) ঃ শ্বাসরোধে প্লীহা সংকুচিত হয়ে শিরার বহির্মুখী রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি করে। (6) রক্তক্ষরণ ঃ রক্তক্ষরণ বা

রক্তস্রাবে প্লীহার সংকোচন ঘটে। (7) **পেশীসঞ্চালন ঃ** পেশীসঞ্চালনে প্লীহা সংকুচিত হয় এবং শিরারক্তের বহির্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

অস্থিপেশীর রক্তসংবহন

Skeletal Circulation

1. **রক্তনালীর বিন্যাস ও রক্তপ্রবাহ** (Vascular arrangement and blood flow) ঃ অস্থিপেশীর রক্তনালীর বৈশিষ্ট্য হল, ত্বকস্থিত রক্তনালীর মত এদের মধ্যে ধমনীশিরা-সংযোগনালী (arteriovenous anastomosis) নেই। রক্তসংবহন সেখানে শুধু রক্তজালিকাধর্মী। অস্থিপেশীর স্থিতাবস্থায় অধিকাংশ রক্তজালিকাই সুপ্তাবস্থায় থাকে। সক্রিয় অস্থিপেশীতে এরা উন্মুক্ত হয়। সক্রিয় অস্থিপেশীতে উন্মুক্ত রক্তজালিকার সংখ্যা স্থির পেশীর রক্তজালিকার প্রায় 30 গুণ বেশী। পেশীসঞ্চালনে রক্তজালিকা এভাবে উন্মুক্ত হবার ফলে পেশীতে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। রক্ত তখন সংকোচনশীল পেশী-তন্তুর আরও সান্নিধ্যে আসতে পারে।

অস্থিপেশীর রক্তসংবহনকে দুভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (1) পুষ্টিগত রক্তসংবহন (nutritional circulation) এবং (2) পুষ্টিবিহীন রক্তসংবহন (non-nutritional circulation)। পুষ্টিবিহীন রক্তসংবহন পেশীর স্থিতাবস্থায় সংগঠিত হয়। এই অবস্থায় প্রতি 100 গ্রাম পেশীতে প্রতি মিনিটে গড়ে 1·8-9·6 মিলিলিটার রক্ত প্রবাহিত হয়। পুষ্টিগত রক্তসংবহনে (পেশীসঞ্চালন কালে) রক্তপ্রবাহ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ভারী পেশীসঞ্চালনে রক্তপ্রবাহ 20-75 গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। পেশীসংকোচন ও পেশীপ্রসারণের সময় রক্তপ্রবাহের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে (13-29 নং চিত্র)।
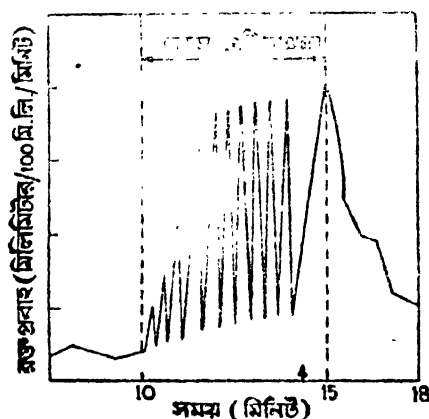
13-29 নং চিত্র ঃ পেশীর সংকোচন প্রসারণের সময় রক্তপ্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি।

2. **অস্থিপেশীর রক্তসংবহনের নিয়ন্ত্রণ** (Control of skeletal circulation) : স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ : বাহসংকোচক ও বাহপ্রসারক উভয়প্রকার স্নায়ুই অস্থিপেশীতে বর্তমান। বাহসংকোচক স্নায়ু অ্যাড্রেন্যালিন এবং বাহপ্রসারক স্নায়ু অ্যাসিটাইলকোলিন মুক্ত করে বিভিন্ন অবস্থায় অস্থিপেশীর রক্তনালীর পরিবর্তন ঘটায়। (b) হাইড্রোজেন আয়ন : H^+ আয়নের বৃদ্ধিতে অস্থিপেশীর ধমনীর প্রসারণ ঘটে এবং হ্রাসপ্রাপ্তিতে তারা সংকুচিত হয়। (c) অন্যান্য আয়ন : ক্যাল্সিয়ামের আধিক্য, পটাসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামের অভাব এবং বাইকার্বনেটের আধিক্য সম্মিলিতভাবে ধমনীসংকোচন বৃদ্ধি করে। রক্তে পটাসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম বৃদ্ধি পেলে এবং ক্যাল্সিয়াম হ্রাস পেলে পেশী-ধমনীর প্রসারণ ঘটে। (d) অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইড : রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা পরিবর্তিত হলে পুরোবাহস্থিত রক্তবাহের বাধা খানিকটা বৃদ্ধি পায়। কার্বনডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধিতে রক্তনালীর সংকোচন ঘটে (ক্যারোটিড ও আওর্টিক বডিস্থিত রসায়ন-গ্রাহকের উপর ক্রিয়া করে)। (e) বিপাকলব্ধ পদার্থ : পেশীর বিপাকলব্ধ পদার্থ সরাসরি রক্তনালীর উপর ক্রিয়া করতে পারে অথবা স্থানীয় স্নায়ুজ প্রক্রিয়ার (প্রান্তীয় গ্যাংগ্লিয়নকোষ বা আক্ষন-প্রতিবর্তকের) সাহায্যে রক্তবাহের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। (f) ব্রাডিকাইনিন (bradykinin) : ব্রাডিকাইনিন রক্তনালীর প্রসারণ ঘটায়। (g) পেশীসঞ্চালন : পেশীসংকোচনের সময় যান্ত্রিক চাপে রক্তনালী চেপে যায়, ফলে রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায়। পেশী-প্রসারণে যান্ত্রিক চাপমুক্তি এবং বিপাকলব্ধ পদার্থের সক্রিয়তার জন্য রক্তনালীর প্রসারণ ঘটে এবং রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

চার্ম রক্তসংবহন

Cutaneous Circulation

রক্তবাহের বিন্যাস (Arrangement of blood vessels) : অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ত্বকের জীবন্ত রক্তনালীর বিন্যাস ও তাদের মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর। উপধমনী বহিঃত্বকের (epidermis) অব্যবহিত পরের তন্তুময় স্তর বা প্যাপিলাতে (papillae) পৌঁছেই সমান্তরাল-ভাবে মোড় নেয় এবং সহোপধমনীতে (metarterioles) বিভক্ত হয়। সহোপধমনী থেকে কেশকাঁটা সদৃশ (hairpin-shaped) অন্তরাবরণী নালিকা বা **জালক-লুপ** (capillary loop) উৎপন্ন হয়। জালক-লুপের ঊর্ধ্ববাহু প্যাপিলাতে প্রবেশ করে এবং ঘুরে নিম্নবাহু গঠন করে, যা প্যাপিলার গোড়াতে

নেমে এসে অপর আর একটি লুপের-নিম্নবাহুর সংগে সংযুক্ত হয়ে **সংগ্রহ-উপশিরা** (collecting venules) গঠন করে। সংগ্রহ উপশিরা পরস্পর যোগসূত্র গঠন করে একটি নিবিড় **অধঃপ্যাপিলা শিরাজালক** (subpapillary venous plexus) সৃষ্টি করে। এই শিরাজালক প্যাপিলার গোড়াতে সমান্তরাল-ভাবে অবস্থান করে এবং রক্তকে গভীর উপশিরা ও শিরাতে পরিবহন করে (13-30 নং চিত্র)। উপধমনী উপশিরার মধ্যে আন্তরবাহ যোগসূত্র রক্ষা করে।

জালক-লুপ ও অধঃপ্যাপিলা শিরাজালকের আভ্যন্তরীণ রক্তের পরিমাণ ও রক্তের অক্সিজেন-সম্পৃক্তির উপর চর্ম বা ত্বকের বর্ণ নির্ভর করে। ত্বকস্থিত রঞ্জকপদার্থের উপস্থিতির কথা বাদ দিলে, চার্ম রক্তনালীর মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহ মন্থর হলে এবং রক্তের অক্সিজেন সম্পৃক্তি কম হলে চর্ম বা ত্বকের বর্ণ নীলাভ হয়। অপরপক্ষে রক্তপ্রবাহ দ্রুত ও রক্তের অক্সিজেন-সম্পৃক্তি সমধিক হলে ত্বকের বর্ণ রক্তিমাভ হয়।

13-30 নং চিত্র : চর্মের রক্তসংবহন।

2. **চার্মবাহের রক্তচাপ** (Pressure of the cutaneous vessels) : জালক-লুপে মাইক্রোপিপেট প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে, লুপের উর্ধ্ববাহুতে গড় রক্তচাপ 32 মিলিমিটার (21—48 মিলিমিটার) পারদচাপের সমান। লুপের শীর্ষদেশে এই চাপ গড়ে 20 মিলিমিটার (15-32 মিলিমিটার) এবং নিম্নবাহু বা শিরাপ্রান্তে গড়ে 12 মিলিমিটার (6-18 মিলিমিটার) পারদ-চাপের সমান। লুপের ধমনীপ্রান্ত বা উর্ধ্ববাহুতে স্পন্দনচাপ (pulse pressure) কমপক্ষে 5-10 মিলিমিটার পারদচাপের সমান হয়।

3. **চার্মবাহে রক্তপ্রবাহ** (Blood flow in the cutaneous Vessels) : চার্ম জালিকায় রক্তপ্রবাহের স্পন্দন প্রকৃতি (pulsatile nature)

অদৃশ্য হয়। তবে উপধমনীতে হৃৎপিণ্ডের প্রতিঘাতে রক্তকণিকা ঝাকুনি দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। রক্তজালিকা অধিকতর সরু হলে লোহিতকণিকা একের পর এক সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত হয়। কখনও কখনও তারা খানিকটা লম্বাটে আকৃতি ধারণ করে। তবে প্রশস্ত রক্তনালীতে পৌঁছেই তারা তাদের আকৃতি ফিরে পায়। উপশিরাতে লোহিতকণিকা স্থির অক্ষ-প্রবাহ (steady axial stream) উৎপন্ন করে। অক্ষ-প্রবাহের চতুঃপার্শ্বে বর্ণহীন প্লাজমার প্রান্তীয় প্রবাহ সৃষ্টি হয়।

চার্মবাহে রক্তপ্রবাহ দুটো কার্য সম্পন্ন করেঃ (1) দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ এবং (2) ত্বকের পুষ্টি সরবরাহ।

4. **চার্মরক্তসংবহনের পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণসমূহঃ** চার্ম রক্তসংবহনের পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণসমূহ নিম্নরূপঃ (1) স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র স্বতন্ত্রস্নায়ুর মাধ্যমে চার্ম বাহের সংকোচন ও প্রসারণ (প্রতিপারিবাহী বাহপ্রসারণঃ antidromic vasodilation) ঘটায়, তবে রক্তজালিকার কার্যাবলী কতটুকু স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল তার সঠিক মূল্যায়ন এখনও সম্ভবপর হয়নি। (2) রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণঃ কার্বন-ডাইঅক্সাইডের আধিক্য, অক্সিজেনের অভাব, H^+ আয়নের বৃদ্ধি, বিপাকলব্ধ পদার্থের (metabolites) আধিক্য প্রভৃতি চার্ম রক্তবাহের প্রসারণ ঘটায়। (3) হিস্টামিন ও ব্রাডিকাইনিনঃ হিস্টামিন ও ব্রাডিকাইনিন চর্মরক্তবাহের প্রসারণ ঘটায়। চর্মগ্রন্থির সক্রিয় অবস্থায় প্রোটিনবিশ্লেষণধর্মী এনজাইম মুক্ত হয় এবং কলারসের ব্রাডিকাইনিনোজেনের উপর বিক্রিয়া করে ব্রাডি-কাইনিন উৎপন্ন করে। (4) শীত বা ঠাণ্ডার প্রতিক্রিয়াঃ শৈত্যাবস্থায় ত্বক্ উন্মুক্ত থাকলে চর্মবাহের সংকোচন ঘটে, রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায় এবং দেহের উষ্ণতাহানি ঘটে। ত্বকের তাপমাত্রা 10° ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে নেমে গেলে, ত্বকের অনুভূতি বিনষ্ট হয়। (5) আলোর প্রতিক্রিয়াঃ অতিবেগুনী রশ্মিকে বাদ দিয়ে, তীব্র আলোকরশ্মি চর্ম বা ত্বকে এসে পড়লে ত্বক লাল হয়ে ওঠে। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে চার্মবাহের প্রসারণ ঘটে এবং রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

5. **চার্মবাহে যান্ত্রিক উদ্দীপনা** (Mechanical stimuli on skin vessels): (a) **শ্বেতরেখা** (White line): সুস্থ লোকের চর্ম বা ত্বকে সামান্য আঘাত দিলে আঘাতস্থানে একটি শ্বেতরেখার উদ্ভব হয়, যা মিনিটখানেক বা আর একটু বেশী স্থায়ী হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

চার্মবাহের স্থানীয় সংকোচনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। (b) **ত্রয়ী প্রতিক্রিয়া** (Triple response): কোন কোন লোকের ত্বক অধিক অনুভূতিপ্রবণ (hypersensitive) হয়। এরকম ত্বক বা চর্মে সহনীয় আঘাত প্রয়োগ করলে নিম্নলিখিত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়: (c) **রক্তিম রেখা** (Red line): আঘাতের সামান্য পরেই আঘাতস্থানে একটি রক্তিম রেখার উদ্ভব হয়। আঘাতপ্রয়োগে আঘাতস্থানে হিস্টামিন (histamine) মুক্ত হয়ে রক্তবাহের প্রসারণ ঘটায়ত ফলে রক্তিম রেখার আবির্ভাব হয়। (d) **রক্তিম রক্তোচ্ছ্বাস** (Flare): আঘাতের 15-20 সেকেণ্ডের পর হঠাৎ একটি আকস্মিক বক্তোচ্ছ্বাস দৃষ্টিগোচরে আসে, যা বক্তিমবেখাকে অতিক্রম করে বিস্তৃতিলাভ করে। উৎপন্ন হিস্টামিন স্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রয়োগ করে অ্যাক্সন প্রতিবর্তকে সক্রিয় করে, ফলে চার্মবাহের প্রসাবণ ঘটে এবং এই পরিবর্তন আসে। (e) **অকুস্থলীয় শোথ** (Wheal): আঘাতস্থানে শোথেব আবির্ভাব ঘটে এবং খানিকটা দূর অবধি তা ছড়িয়ে পড়ে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এই পরিবর্তন সর্বাধিক আকার নেয়। চার্ম রক্তবাহেব উপর হিস্টামিনের ক্রিযা এবং রক্তপ্রবাহ স্থির (stagnant) হয়ে পড়ায় তাদের ভেদ্যতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্নাবলী

1. রক্তনালীর আণুবীক্ষণিক গঠন ও তাদের মধ্য দিযে রক্তসংবহনের ব্যবস্থাপনা কিবূপ বর্ণনা কর।

2. একটি ধমনী, একটি রক্তজালিকা ও একটি শিরাব আণুবীক্ষণিক গঠনেব চিত্র অংকন কর। শিরা, রক্তজালিকা ও ধমনীতে রক্তচাপ কত ? মানুষেব ধমনী বক্তচাপ নির্ধারণেব পদ্ধতিব বর্ণনা দাও। (C, U, '78)

3. রুধিরগতিবিদ্যা বলতে কী বোঝায় ? এ সম্বন্ধে যা জান বিবৃত কব।

4 একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের স্বাভাবিক রক্তচাপ কত ? একজন মানুষ ও একটি বিড়ালের রক্তচাপ কিভাবে পরিমাপ করবে ? (C. U '70)

5. রক্তচাপ বলতে কী বোঝায় ? মানুষেব রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী কাবণসমূহ সম্বন্ধে যা জান আলোচনা কর। (C U. '65, '68)

6 রক্তচাপ কাকে বলে ? মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বর্ণনা কর। তোমার বন্ধুর রক্তচাপের পরিমাপ কিভাবে করবে। (C. U '74)

7. একব্যক্তির সংকোচী চাপ 125 মি মি. পারদ ও স্পন্দনচাপ 45 মি.মি. পারদ সম্পন্ন। ঐ ব্যক্তির প্রসারী চাপ নির্ণয় কর। প্রসারী চাপের গুরুত্ব কি ? (C. U. '85)

8. (a) রক্তচাপের সংজ্ঞা লিখ। (b) তোমার বয়সী ব্যক্তির সংকোচী চাপ ও প্রসারী চাপের মান লিখ। (c) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে চাপ গ্রাহক ও রাসায়নিক গ্রাহকের আলোচনা কর। (C. U. 84)

9. স্পন্দনচাপ ও চাপ স্পন্দনের সংজ্ঞা লিখ। চাপস্পন্দনের একটি পরিচ্ছন্ন রেখচিত্র অংকন করে তার বর্ণনা দাও। (C. U. '67)

10. রক্তবাহের স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যা জান লিখ।

11. নিম্নলিখিত রক্তসংবহনের যে কোন একটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর ;

(a) ফুসফুসীয় রক্তসংবহন (C. U. 85)

(b) মস্তিষ্কের রক্তসংবহন (C. U. '77, C. U. H. '77),

(c) যকৃতের রক্তসংবহন (C. U. 86) (d) প্লীহার রক্তসংবহন (C. U. '77)

(e) অস্থিপেশীর রক্তসংবহন, (f) চার্ম রক্তসংবহন।

12. টীকা লিখ :

(a) সরলগতি ও অবিন্যস্তগতি, (b) নাড়ীস্পন্দনের গুরুত্ব, (c) রক্তপ্রবাহ (d) সংবহন কাল (C. U. '74) (e) প্রেস গ্রাহক ও রসায়ন গ্রাহক, (f) চার্মবাহের যান্ত্রিক উদ্দীপনা (g) রক্তচাপমাপক যন্ত্র (C. U. '73), (h) শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন (C. U. '76)।

চোদ্দ

শ্বাসতন্ত্র

RESPIRATORY SYSTEM
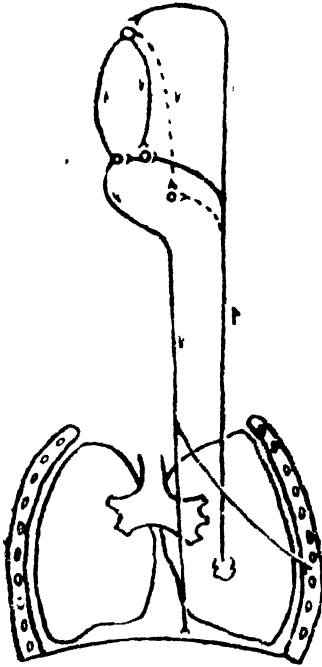
পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডল ও প্রাণীদেহের মধ্যে গ্যাসীয় অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইডের যে বিনিময় সংঘটিত হয় তাকে **শ্বাসক্রিয়া** বলা হয়। বায়ুমণ্ডলীয় অক্সিজেন ফুসফুসীয় রক্তজালিকার মাধ্যমে রক্তে গৃহীত হয় এবং ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে পেঁছিয়। হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনীরক্তের দ্বারা পরিবাহিত হয়ে ইহা দেহের বিভিন্ন কলাকোষে ছড়িয়ে পড়ে। কলাকোষ রক্তের এই অক্সিজেনকে গ্রহণ করে এবং কোষের বিপাকক্রিয়ায় ব্যবহার করে। বিপাকক্রিয়া থেকে উৎপন্ন কার্বনডাই অক্সাইড রক্তে প্রবেশ করে এবং শিরারক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ডে পেঁছিয়। হৃৎপিণ্ড থেকে এরপর ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ইহা

ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং দেহ থেকে নির্গত হয়। ফুসফুস ও ফুসফুসীয় রক্তজালিকার মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইডের বিনিময়কে **বাহিঃস্থ শ্বাসক্রিয়া** (external respiration) এবং কলাকোষ ও রক্তের মধ্যে এদের বিনিময়কে **অন্তঃস্থ শ্বাসক্রিয়া** (internal respiration) বা **কলাকোষীয় শ্বাসক্রিয়া** (tissue respiration) বলা হয় (14·2 নং চিত্র)।
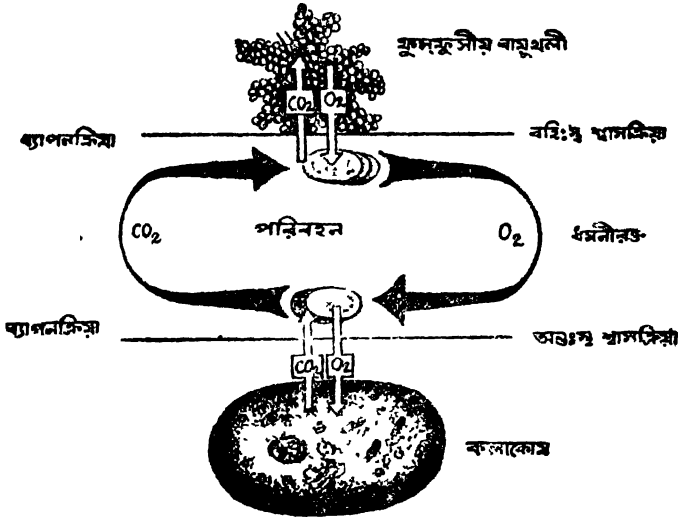
14-2 নং চিত্র ঃ অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিবহন পদ্ধতি।

উভয় স্থানে অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইডের বিনিময় তাদের পার্শ্বচাপের উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট গ্যাস তাদের উর্ধ্ব পার্শ্বচাপীয় অঞ্চল থেকে নিম্ন-পার্শ্বচাপীয় অঞ্চলের দিকে গড়িয়ে যায়, অর্থাৎ তারা ব্যাপন ও অভি-স্রবণের সূত্র অনুসরণ করে চলে। ফুসফুসীয় বায়ুথলীতে অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ (100 মিলিমিটার পারদচাপের সমান) ফুসফুসীয় রক্তজালিকার পার্শ্বচাপের (40 মিলিমিটার) চেয়ে 60 মিলিমিটার বেশী, ফলে অক্সিজেন ফুসফুসীয় বায়ুথলী থেকে রক্তজালিকায় প্রবেশ করে এবং লোহিতকণিকার হিমোগ্লোবিনের সংগে যুক্ত হয়ে রক্তসংবহনে পরিবাহিত হয়। কার্বনডাই-অক্সাইড একই কারণে ফুসফুসীয় রক্তজালকা থেকে ফুসফুসীয় বায়ুথলীতে প্রবেশ করে, কারণ বায়ুথলীতে কার্বনডাইঅক্সাইডের পার্শ্বচাপ যেখানে 40 মিলিমিটার সেখানে ফুসফুসীয় রক্তজালিকায় তার পরিমাণ 46 মিলিমিটার

পারদচাপের সমান। বহিঃস্থ শ্বাসক্রিয়ার স্থায়িত্ব সেকেণ্ড বা সেকেণ্ডরও কম। ফুসফুস ত্যাগ করার পূর্বে 0·7 সেকেণ্ড বা তার কাছাকাছি সময়ে রক্তজালিকায় এই দুটো গ্যাস ফুসফুসীয় বায়ুথলীর গ্যাসের সংগে ব্যবহারিক সাম্যাবস্থায় পেঁছয়। অর্থাৎ ফুসফুসীয় রক্তজালিকায় রক্তের প্রবাহ দ্রুত হলেও শ্বাসক্রিয়ার হার এবং শ্বাসক্রিয়ার মধ্যে এমন একটি সুন্দর সমন্বয় গড়ে উঠে যার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ুথলীর মধ্যে দ্রুত ও ফলপ্রসূ গ্যাসীয় বিনিময় ঘটতে পারে।

অন্তঃস্থ শ্বাসক্রিয়াতেও একই কারণে অক্সিজেন রক্তজালিকার ধমনীপ্রান্ত থেকে কলাকোষে প্রবেশ করে এবং কার্বনডাইঅক্সাইড কলাকোষ থেকে রক্তজালিকার শিরাপ্রান্তীয় রক্তে প্রবেশ করে। রক্তজালিকার ধমনীপ্রান্তীয় রক্ত ও কলাকোষের মধ্যে অক্সিজেনের চাপপার্থক্য প্রায় 60 মিলিমিটার পারদচাপের সমান, ফলে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় 25-30 শতাংশ অক্সিজেন রক্ত থেকে কলাকোষে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রশ্ন জাগতে পারে, স্বাভাবিক অবস্থায় এর বেশী অক্সিজেন বা রক্তের সব অক্সিজেনই কলাকোষে কেন প্রবেশ করে না, কারণ কলাকোষে বস্তুত মুক্ত অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম এর সহজ উত্তর হল, রক্তজালিকায় রক্তপ্রবাহ অত্যন্ত দ্রুত, তাই গ্যাসের বিনিময় সেখানে সম্পূর্ণ হতে পারে না। পেশীসঞ্চালনের সময় বাহপ্রসারণের (vasodilation) ফলে রক্তপ্রবাহ খানিকটা মন্থর হয়ে এলে, গ্যাসের বিনিময় বৃদ্ধি পায় এবং অক্সিজেন আরও বেশী পরিমাণে কলাকোষে প্রবেশ করে। দেহের কোন একটি আঙুলকে বেঁধে তার রক্তপ্রবাহ বন্ধ করলে আবদ্ধ রক্তনালীর অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে।

1. **শ্বাসযন্ত্রের শারীরস্থান ও কলাস্থানীয় গঠন** (Anatomy And Histology of Respiratory Organ)ঃ শ্বাসযন্ত্রকে 3 ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (a) বায়ুবিশোধনকারী অংশ, (b) বায়ুপরিবহনকারী অংশ এবং (c) গ্যাসের বিনিময়কারী অংশ বা ফুসফুস।

(a) **বায়ুবিশোধনকারী অংশ** (Zone of Air Purification)ঃ এই অংশটি প্রধানত নাসাবিবর নিয়ে গঠিত। নাসারন্ধ্র, নাসাবিবর (nasal cavity), নাসাগলবিল (nasopharynx), মুখগলবিল (oropharynx)

অথবা **বায়ুথলীয় নালীর** (alveolar duct) সংগে সংযুক্ত হয়। শ্বসন ক্লোমনালিকা সিলিয়ামবিহীন ঘনতলাকৃতি আবরণীকলা দ্বারা গঠিত।

(c) **গ্যাসীয় বিনিময়কারী অংশ** (Zone of Gaseous Exchange) **:** প্রান্তীয় ক্লোমনালিকা, বায়ুথলীয় নালী, নালীপ্রকোষ্ঠ (atria), বায়ুথলী এবং ফুসফুসীয় বায়ুথলী সম্মিলিতভাবে এক একটি **প্রাইমারী লোবিউল** (primary lobules) গঠন করে। ফুসফুসীয় বায়ুথলী কখনও কখনও **প্রাচীর ছিদ্রের** (alveolar pores) মারফৎ সংযুক্ত থাকে।

14-5 নং চিত্র **:** শ্বাসনালীর শাখাপ্রশাখার 23টি পর্যায়ক্রম।

ফুসফুস ও রক্তের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় বায়ুথলীতে সম্পন্ন হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেছে বায়ু ও রক্ত দুটো সূক্ষ্ম কোষঝিল্লির (0·1 মিউ পুরু) দ্বারা পৃথক হয়ে থাকে। এই ঝিল্লি দুটো রক্তজালিকার অন্তরাবরণী কলা এবং বায়ুথলীয় চেপ্টাকৃতি (flat) আবরণী কলার সমন্বয়ে গঠিত। বায়ুথলীর আবরণী ঝিল্লি আবরণী-কোষ ও প্রাচীরকোষের (septal cells) সমন্বয়ে গঠিত। আবরণী-কোষের নিউক্লিয়াসও চেপ্টাকৃতি এবং সাইটোপ্লাজমও যথেষ্ট সংকীর্ণ। এরা পার্শ্বদেশে পরস্পরের সংগে ও প্রাচীর-কোষের সংগে সংযুক্ত থাকে। দুটো বায়ুথলীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একক প্রাচীরে অবস্থানকারী প্রাচীরকোষ অনিয়মিত এবং ঘনতলাকার। ইলেকট্রন অণু-বীক্ষণযন্ত্রে দেখা গেছে, এদের সুস্পষ্ট দানাদার অন্তঃকোষজালক, মুক্ত

রাইবোসোম এবং প্রচুর গলজি বডি থাকে, অর্থাৎ ক্ষরণশীল কোষের যাবতীয় ধর্ম এদের মধ্যে সুস্পষ্ট। এছাড়া থলীপ্রাচীরে বা থলীর উপরিতলে অগ্রাসক কোষ বা ডাস্টকোষ (dust cell) দেখা যায়। এরা R. E. কোষের অন্তর্গত। প্রশ্বাসের সময় যেসব ধূলিকণা ফুসফুসে প্রবেশ করে এরা তাদের সরিয়ে নেয়, এজন্য এদের ডাস্ট সেল বলা হয়। দেখা গেছে, মানুষের উভয় ফুসফুসের বায়ুথলীর ঝিল্লির মোট ক্ষেত্রফল প্রায় 50-80 **বর্গমিটার**।

2. **শ্বাসনালীর শাখাপ্রশাখার পর্যায়ক্রম** (Generations of branches of trachea): শ্বাসনালী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে উভয় ফুসফুসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রায় 23টি পর্যায়ক্রমে বিভক্ত হয় এবং অসংখ্য শ্বসন এককে ছড়িয়ে পড়ে। (14-5 নং চিত্র)। প্রথম 16টি পর্যায়ক্রম মোটামুটি পরিবহনকারী অংশ হিসাবে কাজ করে যেখানে কোনওভাবে রক্ত ও বায়ুর মধ্যে বিনিময় চলে না। পরবর্তী 17 থেকে 19 পর্যায়ক্রম শ্বসন ক্লোমনালিকা (respiratory bronchioles) গঠন করে যাদের প্রত্যেকের ব্যাস গড়ে 1 মিলিমিটার। শ্বসন ক্লোমনালিকা পরবর্তী 4টি পর্যাযক্রমে বিভক্ত হযে প্রায় 1 মিলিয়ন বায়ুথলীয নালী গঠন করে। 17 থেকে 23 পর্যায়ক্রমের মধ্যে ফুসফুসের আযতনেব প্রায় 90% থাকে। এই অংশেই গ্যাসেব বিনিমষ হয়। মানুষের ফুসফুসে প্রায় 300 মিলিয়ন বাযুথলী আছে যাদের মোট ক্ষেত্রফল $70m^2$।

3. **প্লুরা** (Pleura): প্রতিটি ফুসফুস একটি সূক্ষ্ম পর্দা দ্বাবা (sérous membrane) আবৃত থাকে। একে আন্তরযন্ত্রীয প্লুরা (visceral pleura) বলা হয়। আন্তরযন্ত্রীয় প্লুরা বক্ষপ্রাচীরের সেরাস ঝিল্লি বা প্যারাইটাল প্লুরার সংগে সংযুক্ত থাকে। অর্থাৎ আন্তরন্ত্রীয় প্লুরা ফুসফুসীয কলাকে আবৃত করে এবং প্যারাইটাল প্লুরা বক্ষপ্রাচীরকে আবৃত করে। এই দুটো প্লুরা বা ফুসফুস-ধরা ঝিল্লির মধ্যবর্তী স্থান ইন্টারপ্লুরাল স্পেস (interpleural space) নামে পরিচিত। ইহা বহিরকোষীয় তরলে পূর্ণ থাকে। প্লুরাপ্রাচীরের সংক্রমণজাত প্রদাহকে প্লুরিসি (pleurisy) নামে অভিহিত করা হয়।

4. **শ্বাসক্রিয়ার কার্যাবলী** (Functions of respiration): শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা দেহের যেসব কার্যাবলী সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে প্রধান: (a) **গ্যাসের বিনিময়:** ফুসফুসে অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইডের বিনিময়ের ফলে বায়ুমণ্ডলীয় অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে এবং কার্বনডাইঅক্সাইড রক্ত থেকে

ফুসফুসের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। (b) **বিপাকক্রিয়া :** শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে কলাকোষের বিপাকক্রিয়ার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন কলাকোষ লাভ করতে পারে। অক্সিজেনের অভাবে কলাকোষে যেমন সবাত বিপাকক্রিয়া (aerobic metabolism) চলতে পারে না, তেমনি দেহের প্রয়োজনীয় জৈবশক্তিও উৎপন্ন হতে পারে না। (c) **রেচনক্রিয়া :** কিটোন বডি (অ্যাসিটোন), অ্যামোনিয়া, অ্যালকোহল প্রভৃতি নিঃশ্বাসের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। (d) **জলসাম্য :** শ্বাসক্রিয়া জলসাম্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। নিঃশ্বাসক্রিয়ার সময় 600-800 মিলিলিটার জল দেহ থেকে নির্গত হয়। (e) **দেহ উষ্ণতার নিয়ন্ত্রণ :** নিঃশ্বাস বায়ুতে প্রচুর তাপ দেহ থেকে নির্গত হয়। (f) **অম্লক্ষারের নিয়ন্ত্রণ :** নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বনডাইঅক্সাইডের নির্গমনের মাধ্যমে এই কার্য সম্পন্ন হয়। (g) **রক্তসংবহনের সংগে সম্পর্ক :** শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধি পেলে রক্তসংবহন বৃদ্ধি পায়, তেমনি শ্বাসক্রিয়া হ্রাস পেলে রক্তসংবহন হ্রাস পায়। প্রতিবর্তের মাধ্যমে হৃৎস্পন্দনের হার ও হার্দ উৎপাদের পরিবর্তন থেকে রক্তসংবহনের এই পরিবর্তন আসে। তাছাড়া প্রশ্বাসক্রিয়ার শেষের দিকে এবং নিঃশ্বাসক্রিয়ার প্রথম দিকে রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটে।

শ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতি
Mechanism of Respiration

ফুসফুসে বায়ুর দ্বিমুখী গতি বক্ষগহ্বরের আয়তনের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বক্ষগহ্বর সম্প্রসারিত হলে ফুসফুসেরও সম্প্রসারণ ঘটে এবং বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে। বিপরীতক্রমে বক্ষগহ্বর সংকুচিত হলে ফুসফুসেরও সংকোচন ঘটে, ফলে ফুসফুসীয় চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে বৃদ্ধি পায় ; বায়ু তখন ফুসফুস থেকে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়।

শ্বাসক্রিয়াকে তাই দুভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। *(1)* **প্রশ্বাস** বা শ্বাসগ্রহণ (inspiration) এবং *(2)* **নিঃশ্বাস** বা শ্বাসত্যাগ (expiration)। ফুসফুসে বায়ুর প্রবেশকে প্রশ্বাস এবং নির্গমনকে নিঃশ্বাস বলা হয়। শান্ত শ্বাসক্রিয়ায় প্রশ্বাস একটি সক্রিয় পদ্ধতি, কারণ বহুসংখ্যক পেশীর সংকোচন ও তাদের কার্যের সমন্বয়সাধন এই পদ্ধতির সংগে জড়িত এবং নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ একটি নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি। প্রশ্বাসক্রিয়ার সংগে সম্পর্কযুক্ত পেশীর শ্লথভবনে ইহা সংঘটিত হয়। অবশ্য জোর নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগের (forced expiration)

সময় অন্তস্থ আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশী (internal intercostal muscle) ও উদরপেশীর সংকোচন প্রয়োজন হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে এটি সক্রিয় পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হয়।

1. **শ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতির ব্যাখ্যার মডেল** (Models for Explaining Mechanism of Respiration) : শ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতিকে বিভিন্ন মডেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। নিচে বেলজার ও হাপরকে দুটি মডেল করে শ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

1. (a). **ডোনডারের বেলজার মডেল** (Donder's Bell-jar Model) : এই মডেলের সাহায্যে প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসের পদ্ধতির ব্যাখ্যা সহজভাবে করা যায়। একটি উল্টান Y-টিউবের উভয়প্রান্তে দুটো রবারের বেলুনকে বেঁধে, একটি কর্কের দ্বারা তাকে একটি বেলজারের মধ্যে শক্তভাবে এঁটে দেওয়া হয়। বেলুন ছাড়া নিম্নতর প্রাণীর ফুসফুসকেও ব্যবহার করা যায়। বেলজারের খোলা নিম্ন প্রান্তকে রবারে নির্মিত একটি পর্দার দ্বারা আবৃত করা হয় এবং
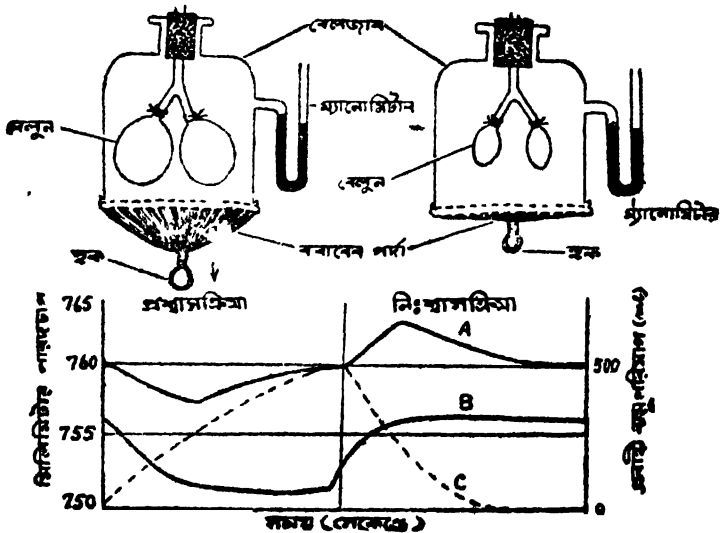
14-6 নং চিত্র : উপরে—শ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতির ব্যাখ্যায় একটি সহজ মডেল। নিম্নে—শ্বাসক্রিয়ার সময় আন্তর ফুসফুসীয় চাপ (A), অন্তর বক্ষগহ্বরীয় চাপ (B) এবং প্রবাহী বায়ুপরিমাণের সম্পর্ক (C)।

তার নিম্ন-মধ্যদেশে একটি হুককে এঁটে দেওয়া হয়। বেলজারের প্রান্তদেশে পারদ ম্যানোমিটার যুক্ত করা হয়। এই ব্যবস্থাপনায় বেলজার মানুষের বক্ষগহ্বর,

Y-টিউব শ্বাসনালী, বেলুন ফুসফুস এবং বেলজারের নিম্নদেশীয় রবারের পর্দা মধ্যচ্ছদা (diaphragm) হিসাবে কাজ করে। ম্যানোমিটার বেলজারের চাপের পরিবর্তনকে রেকর্ড করে।

বেলজারের আভ্যন্তরীণ বায়ুচাপকে বায়ুমণ্ডলীয় বায়ুচাপের চেয়ে খানিকটা কম রাখা হয়, ফলে বেলুন দুটো অংশত বায়ুপূর্ণ থাকে। ডায়াফ্রাম বা রবারের পর্দাকে হুকের সাহায্যে নীচের দিকে টানলে বেলজারের বায়ুচাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে হ্রাস পায়। ফলে বায়ু বেলুনে প্রবেশ করে, বেলুন তাই ফুলে উঠে। প্রশ্বাসক্রিয়ার সময়ে বক্ষগহ্বর সম্প্রসারিত হলে একই কারণে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে। হুকের টানকে মুক্ত করলে রবারের পর্দা তার স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্য স্বস্থানে ফিরে আসে। এর ফলে বেলজারের বায়ুচাপ পূর্বের অবস্থায় আসে ও বেলুনে চাপ বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে এই চাপ বেশী বলে বেলুনের বায়ু বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। নিঃশ্বাসও এ ধরনেরই একটি নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি।

বেলজারের চাপপরিবর্তনকে ইনট্রাপ্লুরাল প্রেসারের সংগে এবং বেলুনের চাপপরিবর্তনকে ইনট্রাপালমোনারী প্রেসারের সংগে তুলনা করা হয়।

1. (b). **হাপর মডেল** (Bellows Model) ঃ ফুসফুসকে বিশেষ ধর্ম-সমন্বিত একজোড়া হাপরের (bellows) সংগে তুলনা করা চলে। হাপরের প্রসারণের সংগে প্রশ্বাসকার্যের তুলনা করা যায়। হাপরকে প্রসারিত করতে মোট যে কার্য সম্পাদন করতে হয়, তা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়, (i) স্প্রিং-এর প্রসারণ ঘটাতে, (ii) হাপর যে সব পদার্থে গঠিত সেই সব সান্দ্র পদার্থকে
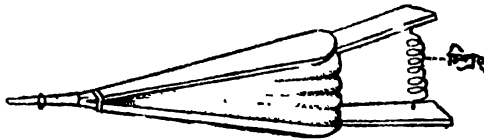
14-7 নং চিত্র ঃ হাপর মডেল।

চলমান করতে এবং (iii) হাপরের মুখরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বায়ুকে গ্রহণ করতে। হাপরের সংকোচন নিঃশ্বাসকার্যের মত একটি নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি। প্রশ্বাস-কার্যের সময় যে স্থিতিস্থাপক কার্য সম্পন্ন করা হয়, তা স্প্রিং-এ স্থিতিশক্তি হিসাবে সঞ্চিত থাকে এবং নিঃশ্বাসকার্যের সময় তা ফুসফুস ও বায়ুচলনের

সান্দ্র বাধার (viscous resistance) বিরুদ্ধে কার্য করে। অতএব হাপরের প্রসারণকে প্রশ্বাসকার্য এবং তার সংকোচনকে নিঃশ্বাসকার্যের সংগে সংগত-ভাবেই তুলনা করা চলে এবং এভাবে শ্বাসক্রিয়ার-পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা যায়।

2. **শ্বসন পেশী** (Respiratory Muscles): শ্বসনপেশীকে দুভাগে ভাগ করা যায়: (a) প্রশ্বাসক্রিয়ার সংগে যুক্ত পেশী বা প্রশ্বাস পেশী (inspiratory muscles) এবং (b) নিঃশ্বাসক্রিয়ার সংগে যুক্ত পেশী বা নিঃশ্বাস পেশী (expiratory muscles)।

2 (a). **প্রশ্বাস পেশী** (Inspiratory Muscles): স্বাভাবিক শান্ত শ্বাসক্রিয়ায় দুধরনের পেশী প্রশ্বাসক্রিয়ার সংগে যুক্ত: (i) **মধ্যচ্ছদা** (diaphragm) এবং (ii) **বহিঃস্থ আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশী** (external intercostal muscles)। জোরদার প্রশ্বাসক্রিযায় আর যেসব পেশী যুক্ত হয় তার মধ্যে প্রধান: (i) **স্টারনোমাসটোয়েড** (Sternomastoid), (ii) **স্কেলোন** (scalene), (iii) **স্কেপুলার এলিভেটর** (Scapular elevator) প্রভৃতি। শেষোক্ত পেশীসমূহ গভীর ও জোরদার প্রশ্বাসক্রিযার সময বক্ষ-পঞ্জরকে উপরের দিকে তুলতে সাহায্য করে।

মধ্যচ্ছদার বিচলন শান্ত প্রশ্বাস ক্রিযায় অন্তর্বক্ষগহ্বরীয আযতনের প্রায 75% এর পরিবর্তনেব জন্য দায়ী। বক্ষপঞ্জরেব নিচের দিকে বেষ্টন করে থাকার ফলে মধ্যচ্ছদা যকৃতের উপরে খিলানেব মত অবস্থান করে এবং যখন সংকুচিত হয তখন পিস্টোনের মত নীচের দিকে নেমে আসে। মধ্যচ্ছদা প্রশ্বাসক্রিয়ার সময় 1·5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত নিচে নেমে আসতে পাবে। সুষুম্নাকান্ডকে তৃতীয় গ্রীবাখন্ডকের (C-3) উপরে ব্যবচ্ছেদ করলে যেহেতু ফ্রেনিক নার্ভ বিনষ্ট হয এবং মধ্যচ্ছদা পংগু হয়ে পড়ে সেহেতু প্রাণীব শ্বাসক্রিয়া কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া ব্যতিরেকে সংকটজনক অবস্থায় পেঁছয। সুষুম্না-কান্ডের যে অঞ্চল দিযে ফ্রেনিক নার্ভ নির্গত হয় (তৃতীয থেকে পঞ্চম গ্রীবাখন্ডক) তাকে বাদ দিয়ে সুষুম্নাকান্ডকে ব্যবচ্ছেদ করলে শ্বাসক্রিযার কোন পরিবর্তন হয না।

বহিঃস্থ আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশী পাঁজরের হাড় থেকে হাড়ে তির্যকভাবে নিচের দিকে ও সামনের দিকে যুক্ত থাকে। পাঁজরের হাড় বা অস্থি পেছনে সংযোগস্থলে যেহেতু পিভট (pivot) হয়ে থাকে সেহেতু এরা যখন সংকুচিত হয় তখন নীচের পাঁজরের অস্থি উপরের দিকে উত্থিত হয়। স্টারনাম

(sternum) বা উরঃফলককেও তারা উপরের দিকে তুলে না। ফলে বক্ষ-গহ্বরের সম্মুখ-পাশ্চাতের ব্যাস বর্ধিত হয়।

2(b). **নিঃশ্বাস পেশী** (Expiratoy Muscle) ঃ শান্ত নিঃশ্বাসক্রিয়ায় সাধারণত কোন পেশীর সংকোচনের প্রয়োজন হয় না। বলপ্রযুক্ত নিঃশ্বাস-ক্রিয়ায় যেসব পেশীর প্রয়োজন হয় তাদের মধ্যে প্রধান (i) **অন্তঃস্থ অন্তর পঞ্জরাস্থি পেশী** (internal intercostal muscles) এবং (ii) **সম্মুখ উদরপ্রাচীরের পেশী** (muscles of anterior abdominal wall)। এদের সংকোচনে অন্তর্বক্ষগহ্বরীয় আয়তন হ্রাস পায় এবং জোরদার নিঃশ্বাস-ক্রিয়াকে কার্যকরী করে তুলে। অন্তঃস্থ আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশী যেহেতু পাঁজরের হাড় থেকে হাড়ে তির্যকভাবে নিচের দিকে ও পেছনের দিকে যুক্ত থাকে সেহেতু তাদের সংকোচনে অন্তর্বক্ষগহ্বরীয় আয়তন হ্রাস পায়। এছাড়া অন্তঃস্থ উদরপ্রাচীরের পেশীর সংকোচন যেমন বক্ষপঞ্জরকে নিম্নদিকে ও ভেতরের দিকে টেনে নামায় তেমনি আন্তর উদরীয় চাপবৃদ্ধির মাধ্যমে মধ্যচ্ছদাকে উপরের দিকে ঠেলে দেয়।

3. **প্রশ্বাসক্রিয়া** (Inspiration) ঃ প্রশ্বাসক্রিয়ার সময় বক্ষগহ্বরের উল্লম্ব সম্মুখপশ্চাৎ ও সামান্য তির্যক ব্যাসের বৃদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ বক্ষগহ্বর প্রায় সব দিকে সম্প্রসারিত হয়। প্রশ্বাসকার্যের সময় মধ্যচ্ছদা নীচের দিকে নেমে আসে। বহিঃস্থ পঞ্জরাস্থি পেশীর সংকোচনে বক্ষদেশ যখন উপরের দিকে উত্থিত হয় তখন উরঃফলকের অগ্রপ্রান্ত এবং পাঁজর ঊর্ধ্বদিকে ও সামনের দিকে ধাক্কা খায়, ফলে পেশীর সংকোচনের সময় ২য় পাঁজর থেকে ৫ম পাঁজর ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হয়ে মেরু-দণ্ডের সংগে প্রায় সমকোণে অবস্থান করে (14-8 নং চিত্র)। উরঃফলক বা স্টারনাম (sternum) উপর ও সামনের দিকে গতিশীল হয়। বক্ষগহ্বরে সামনেপেছনে সম্প্রসারিত হয়। এছাড়া ষষ্ঠ থেকে দশম পাঁজর তির্যকভাবে অগ্রপশ্চাৎ অক্ষে আবর্তিত হয়। একাদশ ও দ্বাদশ পাঁজর উদরপেশীর সংগে সঞ্চালিত হয়।
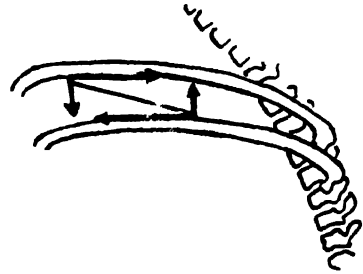
14-8 নং চিত্র ; প্রশ্বাসক্রিয়ার সময় পাঁজরের হাড়ের চলনের প্রক্রিয়া। প্রশ্বাসক্রিয়ার সময় বলের অভিমুখ তীর-চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

বক্ষগহ্বরের প্রসারণের সংগে ফুসফুস প্রসারিত হয় না। ফুসফুসের যেসব অংশ পাঁজর, উরঃফলক, মধ্যচ্ছদার সংস্পর্শে থাকে তারা প্রত্যক্ষভাবে প্রসারিত হয়। অপরপক্ষে ফুসফুসের যেসব অংশ দেহের স্থিতিশীল অংশের (মেরুদন্ড, মেরুদন্ড সংলগ্ন পাঁজর ইত্যাদির) সংগে সম্পর্কযুক্ত থাকে তারা পরোক্ষভাবে প্রসারিত হয়।

বক্ষগহ্বরের সম্প্রসারণে আন্তরপ্লুরা চাপ (intrapleural pressure) আবহচাপের তুলনায় শুরুতে –2·5 মিমি পারদে (mmHg) এবং শেষে –6 মিমি পারদে নেমে আসে। ফুসফুসের প্রসারণের ফলে বায়ুথলীর চাপ –3 মিলিমিটার থেকে 5 মিলিমিটার পারদচাপে নেমে আসে। তীব্র প্রশ্বাস ক্রিয়ায় আন্তরপ্লুরা চাপ 30 মিমি পারদচাপ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে এবং আনুপাতিক হারে ফুসফুসও প্রসারিত হয়।
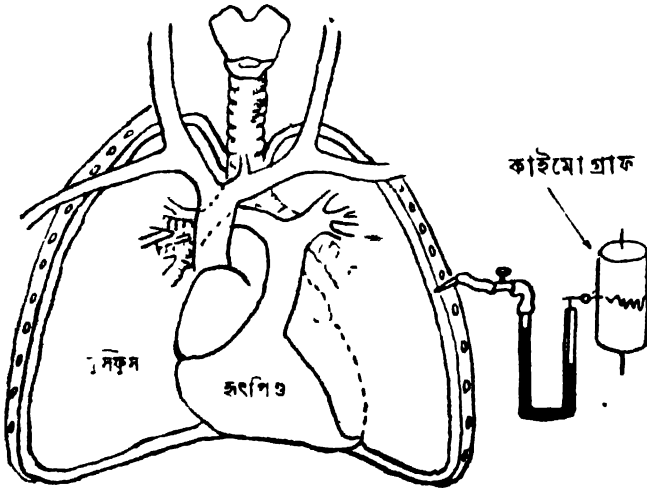
14·9 নং চিত্র; আন্তরপ্লুরা চাপ নির্ধারণ পদ্ধতি।

4. **নিঃশ্বাসক্রিয়া (Expiration)** : শান্ত নিঃশ্বাসক্রিয়া নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি। তবে নিঃশ্বাসক্রিয়ার প্রথমাংশে শ্বাসক্রিয়ার সংগে যুক্ত পেশীর খানিকটা সংকোচন লক্ষ্য করা যায়। এর উদ্দেশ্য নিঃশ্বাসক্রিয়াকে খানিকটা মন্থর করা।

শান্ত প্রশ্বাসক্রিয়ার সংগে জড়িত পেশীসমূহের সংকোচন শেষ হলে তারা তাদের স্থিতিশক্তির সহায়তায় এবং স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে

আসে। মধ্যচ্ছদা উপরের দিকে উত্থিত হয় ও ফুসফুস তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ফলে প্লুরার অভ্যন্তরস্থ চাপ ও ফুসফুসের বায়ুথলীর চাপ বৃদ্ধি পায়। ফুসফুসের বায়ুথলীর চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে +3 মিলিমিটার থেকে +4 মিলিমিটার পারদচাপে বৃদ্ধি পায়, ফলে বায়ু ফুসফুস থেকে নির্গত হয়।

সম্প্রসারণশীলতা

Compliance

ফুসফুস এবং বক্ষপ্রাচীর অংশত স্থিতিস্থাপক কলা দ্বারা গঠিত। প্রশ্বাস-ক্রিয়ার সময় এসব কলা সম্প্রসারিত হয়। এসব কলার স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্য যখনই প্রশ্বাসক্রিয়ার শেষে পেশী শ্লথ হয় তখন এরা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরেও আসে। এরা যত দৃঢ় হবে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের পরিবর্তন পেতে গেলে তাদের উপর তত বেশী পেশীবল প্রয়োগ করতে হবে। এই বল ও সম্প্রসারণ (বা চাপ ও আয়তনের) সম্পর্কের পরিমাপ করা সম্ভব। এভাবে সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে কলার স্থিতিস্থাপক বাধার পরিমাপ পাওয়া যায়।

প্রতি একক চাপের পরিবর্তনে ফুসফুসের আয়তনের যে পরিবর্তন ($\Delta V/\Delta P$) পাওয়া যায় তাকে ফুসফুসের **সম্প্রসারণশীলতা** বা **কমপ্লায়েন্স** (Compliance) বলা হয়। অন্তর্বক্ষগহ্বরীয় গ্রাসনালীতে একটি বেলুনকে প্রতিস্থাপিত করে তার সাহায্যে স্বাভাবিক নিঃশ্বাসক্রিয়ার শেষে চাপের পরিবর্তনকে যেমন লিপিবদ্ধ করা যায় তেমনি পুনরায় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসকে প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করার পরও তার চাপকে নির্ধারণ করা যায়। গ্যাসের আয়তনের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই পরীক্ষাকে বার কয়েক সম্পন্ন করা যেতে পারে। এভাবে পাওয়া চাপ ও আয়তনের পরিবর্তন থেকে কমপ্লায়েন্সকে নির্ণয় করা যায়ঃ

$$\text{কমপ্লায়েন্স} = \frac{\text{আয়তনের পরিবর্তন (লিটারে)}}{\text{চাপের একক পরিবর্তন (সে.মি. জলচাপে)}}$$

$$= \frac{\Delta V}{\Delta P}$$

উদাহরণস্বরূপ, 5 সেণ্টিমিটার জলচাপের (cm H_2O) সমান কোন চাপের পরিবর্তনে ফুসফুসের আয়তনের পরিবর্তন এক লিটারের সমান হলে ফুসফুসের সম্প্রসারণশীলতা (lung compliance) 1·0 লিটার/5 সে.মি. জল

বা 0·2 লিটার/সে.মি. জল হবে। শান্ত শ্বাসক্রিয়ায় এটিই হল ফুসফুসের সম্প্রসারণশীলতার স্বাভাবিক মান। সর্বাধিক প্রশ্বাসক্রিয়া বা সর্বাধিক নিঃশ্বাসক্রিয়ায় ফুসফুসের আয়তনের যে পরিবর্তন হয় তার জন্য যেহেতু একটি নির্দিষ্ট আয়তনের পরিবর্তনের জন্য অধিকতর বেশী চাপ প্রয়োগ করতে হয় সেহেতু কমপ্লায়েন্স বা সম্প্রসারণশীলতা হ্রাস পায়। কমপ্লায়েন্স হ্রাস পেলে শ্বসনকার্য বৃদ্ধি পায়। যেমন, আন্তরকোষীয় বা প্লুরাগত ফাইব্রোসিসে (fibrosis) ফুসফুস অধিকতর দৃঢ় হয়ে পড়লে কমপ্লায়েন্সও হ্রাস পায় এবং শ্বসনকার্যও (respiratory work) বৃদ্ধি পায়।

ফুসফুসীয় সারফ্যাকটেণ্ট
Lung Surfactant

বায়ুথলীর গায়ে তরলের যে আস্তরণ থাকে তাব পৃষ্ঠটান (surface tension) ফুসফুসের কমপ্লায়েন্সের বা সম্প্রসারণশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বায়ুথলী ছোট হলে পৃষ্ঠটান কম হয়, তার কারণ বায়ুথলীর তরল আস্তরণে **সারফ্যাক্টেন্ট** (surfactant) নামক একটি পদার্থের উপস্থিতি। এই পদার্থটি পৃষ্ঠটান হ্রাস করে। সারফ্যাকটেনট প্রোটিন ও লিপিডের একটি দ্বিস্তরীয় মিশ্রণ, কিন্তু তার প্রধান উপাদান হল ডাইপালমিটোইলফসফাটিডীলকোলিন (DPPC, dipalmitoylphosphatidylcholine)। একটি কোষ ঝিল্লির ফসফোলিপিডের মত এই ফসফোলিপিডেরও একটি জলাসক্ত (hydrophilic) মস্তক এবং 2টি সমান্তরাল জল-অনাসক্ত (hydrophobic) লেজ থাকে। অণুগুলি বায়ুথলীর বায়ু-তরল অন্তস্তলে (interface) সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে। পৃষ্ঠটান এসব অণুর গাঢ়ত্বের সংগে ব্যস্তানুপাতে (inversely) পরিবর্তিত হয়। প্রশ্বাসক্রিয়ার সময় সারফ্যাকটেনট নিহিত অণুগুলি বায়ুথলীর আকার বৃদ্ধির সংগে সংগে দূরে সরে যায়। কিন্তু নিঃশ্বাসক্রিয়ার সময় আবার কাছাকাছি চলে আসে, অর্থাৎ শ্বাসক্রিয়ার সময় পৃষ্ঠটানের নিয়ন্ত্রণ করে। নিঃশ্বাসক্রিয়ার সময় বায়ুথলি যখন ক্ষুদ্রাকার ধারণ করে তখন পৃষ্ঠটানের হ্রাস ঘটাতে না পারলে ল্যাপলাসের সূত্র অনুযায়ী বায়ুথলী বন্ধ হয়ে যাবে। বায়ুথলীর মত গোলাকার বস্তুর ক্ষেত্রে, 2 গুণ টানকে ব্যাসার্ধ দ্বারা ভাগ করলে প্রসারণ চাপ পাওয়া যায় ($P = 2T/R$), সুতরাং R-এর মান যখন হ্রাস পায় তখন T-এর মান হ্রাস না পেলে প্রসারণ চাপের চেয়ে পৃষ্ঠটান বেশী

হয়ে যায়। সারফ্যাক্‌টেন্‌ট ফুসফুসে শোথ (edema) হতেও বাধা সৃষ্টি করে।

বায়ুথলীর আবরণীকোষ সারফ্যাক্‌টেন্‌ট উৎপন্ন করে। এসব কোষের ফলকাকার বস্তু থেকে এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় এই পদার্থটি ক্ষারিত হয়। বায়ুথলীর ম্যাক্রোফেজ অংশত এই পদার্থকে সরিয়ে নেয়।

জন্মের সময় সারফ্যাক্‌টেন্টের গুরুত্ব সর্বাধিক। মাতৃগর্ভে শিশুর শ্বাসক্রিয়াজনিত চলন শুরু হলেও জন্মের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ফুসফুস বন্ধ (collapse) থাকে। জন্মের পর শিশু বারকয়েক তীব্র প্রশ্বাসক্রিয়া চালায়, ফলে ফুসফুস সম্প্রসারিত হয়। সারফ্যাক্‌টেন্ট এরপর ফুসফুসকে আর বন্ধ হতে দেয় না। **হায়ালিন মেমব্রেন রোগে** (hyaline membrane disease) সারফ্যাকটেন্ট সংস্থা তৈরী হওয়ার আগেই শিশু জন্ম নেয়, ফলে ফুসফুসের পৃষ্ঠটান বেশী হয় ও ফুসফুসের অনেকাংশেরই বায়ুথলী বন্ধ থাকে ও শ্বাসক্রিয়ার বিপর্যয় ঘটায়।

থাইরোয়েড হরমোন ও অ্যাড্‌রেনোকরটিকোয়েড হরমোন সারফ্যাক্‌টেন্টের উৎপাদন ও পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে সহায়তা করে।

শ্বাসক্রিয়ার চলন
Respiratory Movements

শ্বাসক্রিয়ার সময় বক্ষপ্রাচীরের যে উঠা-নামা লক্ষ্য করা যায়, তাকে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড করা সম্ভবপর। সবচেয়ে সহজতম যে যন্ত্রটি এই উদ্দেশ্যে
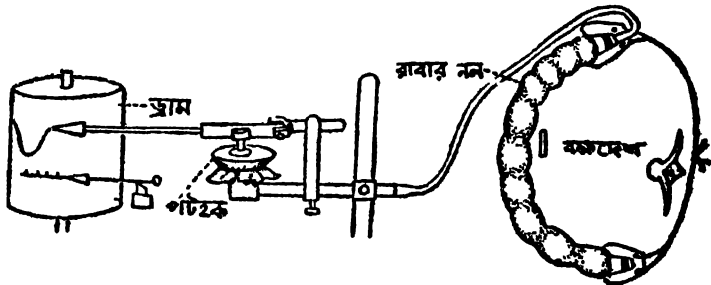
14-10 নং চিত্র : স্টেথোগ্রাফ।

পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয় তাকে **বক্ষলেখ যন্ত্র** বা **স্টেথোগ্রাফ** (stethograph) বলা হয়। স্টেথোগ্রাফ রবার নলের আবৃত ও কুণ্ডলীকৃত স্প্রিং-এ নির্মিত একটি যন্ত্রবিশেষ (14-10নং চিত্র)। এই অংশকে বক্ষদেশে বাঁধা হয়। একটি

নলের দ্বারা এই অংশকে পটহকের (tambour) সংগে যুক্ত করা হয়। বক্ষচালনার সময় স্টেথোগ্রাফের রবার নলে বায়ুচাপের যে পরিবর্তন হয়, তা পটহকে পরিচালিত হয়। পটহকের উপরিস্থিত লেখনীর সাহায্যে এই পরিবর্তনকে গতিশীল ধূমায়িত ড্রামে রেকর্ড করা হয়। এই রেকর্ডকে 'স্টেথোগ্রাম' বা 'নিউমোগ্রাম' (pneumogram) বলা হয়। রেখচিত্রের নিম্নদেশে একই সংগে সময়রেখ (time-tracing) রেকর্ড করা হয়।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে (কাশি, জলপান, দম বন্ধ করে থাকা, জোরে কথা বলা, হেসে ওঠা ইত্যাদিতে) শ্বাসক্রিয়ার পরিবর্তনের সংগে এই রেখচিত্রের কি কি পরিবর্তন হয়, তাও রেকর্ড ও অনুশীলন করা সম্ভবপর হয়। স্বাভাবিক নিউমোগ্রাম থেকে যে সব জিনিস অনুশীলন করা যায তার মধ্যে রয়েছেঃ (a) প্রতি মিনিটে শ্বাসক্রিয়ার হার (respiratory rate) নির্ণয়, (b) প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসক্রিয়ার আপেক্ষিক স্থিতিকাল (duration) নির্ণয়, (c) উভয় ক্রিয়ার অন্তর্বর্তী বিবর্তির পরিমাপ করা, (d) নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসক্রিয়ার প্রারম্ভিক ও অন্তিমদশার আপেক্ষিক গতির পর্যালোচনা করা ইত্যাদি।

প্রতি মিনিটে শ্বাসক্রিয়ার হার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক মানুষে ভিন্ন হলেও প্রাপ্তবয়স্কদেব ক্ষেত্রে তা মিনিটে 12-20-এর মধ্যে সীমিত থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার অধিক হয। বয়স বৃদ্ধির সংগে প্রতি মিনিটে শ্বাসক্রিয়ার হার হ্রাস পায (1নং তালিকা)। পেশীসঞ্চালন, মানসিক আবেগ

1নং তালিকা ঃ বিভিন্ন বয়সে প্রতি মিনিটে শ্বাসক্রিয়ার হার

বয়স	প্রতি মিনিটে শ্বাসক্রিয়ার হার
জন্ম মুহূর্তে	18—40
প্রথম বৎসরে	25—35
2—4 বৎসরে	20—30
5—14 বৎসরে	20—25
প্রাপ্তবয়স্কে	12—20

ইত্যাদি কারণে শ্বাসক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায়। অতএব কোন ব্যক্তি যদি বুঝতে পারে যে তার শ্বাসক্রিয়ার অনুশীলন চলছে, তবে তার সঠিক শ্বাসক্রিয়ার হার নির্ণয় দুঃসাধ্য হয়।

ফুসফুসের বায়ুধারণের পরিমাপ
Spirometry

অবস্থাভেদে ফুসফুসে বায়ুর পরিমাণের যে পরিবর্তন হয়, **স্পাইরোমিটার** (spirometer) যন্ত্রের সাহায্যে তার পরিমাপ করা যায়। স্পাইরোমিটারের **মুখখণ্ডককে** (mouth piece) অ্যালকোহলের সাহায্যে নির্বীজিত করে তাকে মুখের মধ্যে প্রবেশ করান হয় এবং নাসারন্ধ্র বন্ধ করে শ্বাসক্রিয়া চালাতে অভ্যস্ত করান হয়। এরপর স্পাইরোমিটারের সূচককাঁটাকে শূন্যদাগে স্থাপন করা হয় এবং স্বাভাবিকভাবে শ্বাসগ্রহণ করে তাকে মুখখণ্ডকের মাধ্যমে ত্যাগ করা হয় (14-11নং চিত্র)। এভাবে যে সমস্ত ফুসফুসীয় বায়ুর পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর, তাকে **স্পাইরোগ্রামে** (spirogram) লিপিবদ্ধ করা যায়।

1. **প্রবাহী বায়ুপরিমাণ** (TV, Tidal volume) : স্বাভাবিক ও শান্ত প্রশ্বাসে বা নিঃশ্বাসে যে পরিমাণ বায়ুকে গ্রহণ বা ত্যাগ করা হয় তাকে প্রবাহী বায়ুপরিমাণ বলা হয়। এই পরিমাণ প্রায় 500 মিলিলিটার।

2. **প্রশ্বাসক্রিয়ার বায়ুধারণক্ষমতা** (IC, Inspiratory capacity) : প্রবাহী বায়ুপরিমাণ এবং সর্বোচ্চ প্রশ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে যে অধিক পরিমাণ বায়ুকে গ্রহণ করা সম্ভবপর, তাদের যোগফলকে প্রশ্বাসক্রিয়ার বায়ুধারণক্ষমতা বলা হয়। এই পরিমাণ প্রায় 3,500 মিলিলিটার।

14-11নং চিত্র : স্পাইরোমিটার।

3. **প্রশ্বাসক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ুপরিমাণ** (IRV, Inspiratory reserve volume) : প্রবাহী বায়ুপরিমাণের ঊর্ধ্বে সর্বোচ্চ প্রশ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে যে অধিক পরিমাণ বায়ুকে ফুসফুসে গ্রহণ করা সম্ভবপর, তাকে প্রশ্বাসক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ুপরিমাণ বলা হয়। এই পরিমাণ প্রায় 3,000 মিলিলিটার।

4. **নিঃশ্বাসক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ুপরিমাণ** (ERV, Expiratory reserve volume) : স্বাভাবিক নিঃশ্বাসক্রিয়ার পরও বলপ্রযুক্ত নিঃশ্বাসের মাধ্যমে যে অধিক পরিমাণ বায়ুকে বহিষ্কার করা সম্ভবপর হয়, তাকে নিঃশ্বাসকার্যের অতিরিক্ত
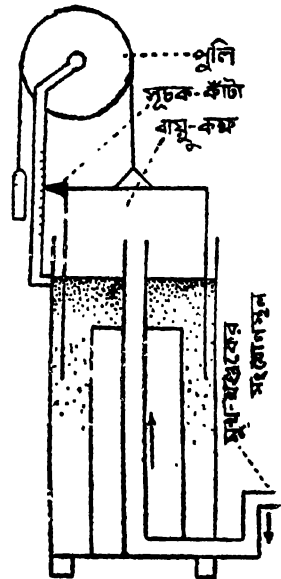
বায়ুপরিমাণ নামে অভিহিত করা হয়। এই পরিমাণ প্রায় 1000 মিলিলিটার।

5. **অবশেষ বায়ুপরিমাণ** (RV, Residual volume): সর্বোচ্চ নিঃশ্বাসক্রিয়ার পরও যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে অবশিষ্ট থেকে যায়, তাকে অবশেষ বায়ুপরিণাম বলা হয়। এই পরিমাণ গড়ে প্রায় 1200 মিলিলিটার।

6. **ক্রিয়োপযোগী অবশেষ বায়ুপরিমাণ** (FRV, Functional residual volume): স্বাভাবিক নিঃশ্বাসক্রিয়ার পর ফুসফুসে যে পরিমাণ বায়ু অবশিষ্ট থাকে, তাকে ক্রিয়োপযোগী অবশেষ বায়ুপরিমাণ বলা হয়। ইহা অবশেষ বায়ুপরিমাণ এবং নিঃশ্বাসক্রিযার অতিরিক্ত বায়ুপরিমাণের যোগফলের সমান। এই পরিমাণ প্রায় 2500-3000 মি. লি।

7, **ফুসফুসের মোট বায়ুধারণক্ষমতা** (TLC, Total lung capacity): সর্বাধিক প্রশ্বাসক্রিয়ার পর ফুসফুসে মোট যে পরিমাণ বায়ু অবস্থান করে, তাকে ফুসফুসের মোট বায়ুধারণ-ক্ষমতা বলা হয। ইহা অবশেষে বায়ু-পরিমাণ এবং বায়ুধারকত্বের যোগ-ফলের সমান। এই পরিমাণ প্রায 5000-6000 মিলিলিটার।

14-12নং চিত্রঃ ফুসফুসীয় বায়ুপরিমাণ।

8. **নিষ্ক্রিয় বায়ুপরিমাণ** (Dead space): কিছু পরিমাণ বায়ু নাসাগলবিল, শ্বাসনালী, ক্লোমশাখা ইত্যাদি বায়ুপথে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই বায়ু কখনও বায়ুথলীর আবরণী-কলার সংস্পর্শে আসতে পারে না বা গ্যাসীয় বিনিময়ে অংশ গ্রহণ করে না। এই বায়ুপরিমাণকে তাই নিষ্ক্রিয় বায়ুপরিমাণ বলা হয়। এই পরিমাণ প্রায় 150 মিলিলিটার।

ফুসফুসের বায়ুধারণের এই বিভিন্ন পরিমাণকে **স্পাইরোগ্রাম** (spirogram) বা **শ্বসন-লেখচিত্রের** সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। স্পাইরোমিটার ও কাইমোগ্রাফের

(kymograph) সাহায্যে শ্বসন-লেখচিত্রের রেকর্ড করা হয় (14-13 নং চিত্র)।
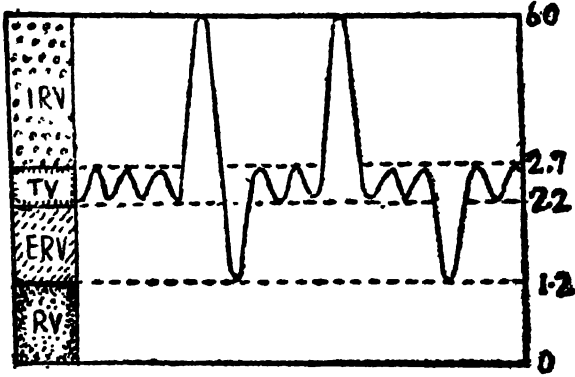
14-13 নং চিত্র : ফুসফুসীয় বায়ুপরিমাণ ও স্পাইরোগ্রাম।

এই লেখচিত্রে অবশেষ বায়ুপরিমাণ, ক্রিয়োপযোগী অবশেষ বায়ুপরিমাণ এবং ফুসফুসের মোট বায়ুধারণক্ষমতা লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়!

বায়ুধারকত্ব

Vital Capacity

গভীরতম প্রশ্বাসক্রিয়ার পর যে পরিমাণ বায়ুকে বলপ্রযুক্ত নিঃশ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে নিষ্ক্রান্ত করা সম্ভবপর, তাকে ফুসফুসের **বায়ুধারকত্ব** বলা হয়। ইহা ফুসফুসের মোট বায়ুধারণক্ষমতার 70-80 শতাংশ। বায়ু-ধারকত্ব নিম্নলিখিত দুটো বায়ুপরিমাণের সমষ্টির সমান।

প্রশ্বাসক্রিয়ার বায়ুধারণক্ষমতা	...	3500 মিলিলিটার
নিঃশ্বাসক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ুপরিমাণ	...	1000 ,,

বায়ুধারকত্ব = 4500 মিলিলিটার

স্ত্রীলোকের বায়ুধারকত্ব তুলনামূলকভাবে কম, প্রায় 3100 মিলিলিটার। কোন নীরোগ ও দুর্বল লোকের বায়ুধারকত্ব 20-30 শতাংশ কম হয়। ব্যায়ামবীর বা নিয়মিত পেশীসঞ্চালনকারীর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ আরও অধিক হতে পারে। বায়ুধারকত্বের পরিমাপ করে কোন লোকের **শ্বসন ক্ষমতা** (respiratory efficiency) নির্ণয় করা যায়।

1. **বায়ুধারকত্বের পরিমাপ** (Measurement of vital capacity) ঃ স্পাইরোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুধারকত্বের পরিমাপ করা হয়। শ্বসন-লেখচিত্রেও এই পরিমাণকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর। এছাড়া বায়ুধারকত্ব নির্ণয়ের জন্য সাধারণভাবে যে সূত্রের ব্যবহার করা হয় তা, নিম্নরূপ ঃ

(1) পুরুষের বায়ুধারকত্ব = {27·63—(বয়স × 0·112) × উচ্চতা (সে. মি)}

(3) স্ত্রীলোকের বায়ুধারকত্ব = {21·78—(বয়স × 0·101) × উচ্চতা (সে. মি.)}

এই সূত্র থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, বায়ুধারকত্ব লিংগ, বয়স এবং উচ্চতার সংগে সম্পর্কযুক্ত।

2. **বায়ুধারকত্বের পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণসমূহ** (Factors influencing vital capacity) ঃ (1) **বয়স** ঃ বার্ধক্যে বায়ুধারকত্ব হ্রাস পায়। (2) **লিংগ** ঃ স্ত্রীলোকের বায়ুধারকত্ব তুলনামূলকভাবে কম হয়। (3) **দেহ-আকৃতি** ঃ ব্যক্তিবিশেষের দেহ-আকৃতির সংগে ইহা প্রত্যক্ষভাবে সমানুপাতিক। তাছাড়া শ্বসন সঞ্চালনের (respiratory exercise) সংগেও ইহা সমানুপাতিক। (4) **উপরিতলের ক্ষেত্রফল** (surface area) ঃ দেহের উপরিতলের ক্ষেত্রফলের সংগে বায়ুধারকত্বের সম্পর্ক বর্তমান। পুরুষের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটার দেহতলে বায়ুধারকত্ব প্রায় 2·6 লিটার। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ 2 লিটার। (5) **দেহভংগী** (posture) ঃ শায়িত অবস্থায় বায়ুধারকত্ব খানিকটা হ্রাস পায়। (6) **রোগ** (disease) ঃ হৃদরোগ, নিউমোনিয়া (pneumonia) বা ফুসফুস-প্রদাহ, যক্ষ্মা, ফুসফুসীয় রক্তাধিক্য (pulmonary congestion), এক্সোফথালমিক গয়টার (exopthalmic goitre) বা অক্ষিগোলক বহিঃস্ফীত গলগণ্ড প্রভৃতি রোগে বায়ুধারকত্ব হ্রাস পায়।

ফুসফুসীয় বায়ুচলন
Ventilation

ফুসফুস-অভিমুখী এবং ফুসফুস-বহির্মুখী বায়ুপ্রবাহকে **ফুসফুসীয় বায়ুচলন** বলা হয়। দেখা গেছে, 500 মিলিলিটার প্রবাহী বায়ুপরিমাণ ও মিনিটে 12 বার শ্বাসক্রিয়ার হারসম্পন্ন 70 কিলোগ্রাম ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক লোকের স্বাভাবিক বায়ুচলন প্রতি মিনিটে প্রায় 6000 মিলিলিটার। শিশুদের ক্ষেত্রে (2·5 কিলোগ্রাম) এই পরিমাণ (শ্বাসক্রিয়ার হার 33 এবং প্রবাহী বায়ুপরিমাণ 15 মি.লি.) প্রতি মিনিটে প্রায় 500 মিলিলিটার, অর্থাৎ ইহা প্রতি কিলোগ্রাম

দৈহিক ওজনে প্রতি মিনিটে 200 মিলিলিটার। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ তার অর্ধেকেরও কম (6000/70 মি.লি.)।

শ্বাসক্রিয়ার সময় মুখ-প্রান্তের বায়ুপথ ও বায়ুথলীয় বায়ুপথের মধ্যে যে চাপপার্থক্যের উদ্ভব হয়, ফুসফুসীয় বায়ুচলন তারই দ্বারা সংঘটিত হয়। স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ায় ফুসফুসীয় বায়ুচলনের গতিবেগ চাপপার্থক্যের সংগে সমানুপাতিক। বায়ুপ্রবাহ ও চাপপার্থক্যের সম্পর্ক বায়ুপ্রবাহের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বায়ুপ্রবাহ 'সরলরেখ, (linear) হলে তা পয়সেউলির সূত্র অনুসরণ করে এবং 'অবিন্যস্ত' (turbulent) হলে চাপপার্থক্য বায়ুপ্রবাহের গতিবেগের বর্গের সমানুপাতিক হয় ($P_1 - P_2 \propto V^2$)।

শ্বসন গ্যাসের উপাদান ও পার্শ্বচাপ

Composition and partial pressures of respiratory gases

পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত। অক্সিজেন তার মধ্যে একটি। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী এই বায়ুমণ্ডলে ডুবে থাকে। স্থান ও কালভেদে বায়ুর উপাদানের তারতম্য ঘটে। যেমন জনবহুল স্থান অপেক্ষা ফাঁকা মাঠে অক্সিজেন বেশী থাকে। পর্বত উচ্চতায় অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসের পরিমাণ ও পার্শ্বচাপ হ্রাস পায়। আবার শহর বা নগরে ধুঁয়ো, ধূলিকণা, অধিক কার্বনডাই-অক্সাইড প্রভৃতির উপস্থিতি বায়ুর উপাদানকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত করে। এসব এবং অন্যান্য কারণে আধুনিক পরিবেশের বায়ুমণ্ডল তাই দূষিত হয়।

বায়ুর চারটি প্রধান উপাদান হল **নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বনডাই-অক্সাইড** এবং **জলীয় বাষ্প**। হিলিয়াম, আর্গন, ক্রিপটন প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসের পরিমাণ যেহেতু 1 শতাংশেরও কম এবং যেহেতু তারা শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয়, সেইজন্য তাদের একই সংগে নাইট্রোজেনের মধ্যে ধরা হয়। নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস ও বায়ুথলীয় বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি মানুষের শ্বাসক্রিয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশীয় বায়ুচাপ এবং তাদের শতকরা উপাদানের উপর শ্বাসক্রিয়ার গ্যাসীয় বিনিময় নির্ভর করে। গ্যাসীয় মিশ্রণের প্রতিটি গ্যাসই এমনভাবে আচরণ করে, যাতে মনে হয় তারা একাই সম্পূর্ণ আয়তন দখল করে আছে এবং স্বাধীনভাবে যে একক চাপের সৃষ্টি করে তাকে

তাদের পার্শ্বচাপ (partial pressure) বলা হয়। সবকটি গ্যাসের পার্শ্বচাপের যোগফলই একটি মিশ্র গ্যাসের মোট চাপ। ফুসফুসের জলীয় বাষ্প অন্যান্য গ্যাসের মতই পৃথক চাপের সৃষ্টি করে। প্রশ্বাস বায়ু, নিঃশ্বাস বায়ু বায়ুথলীয় বায়ুতে এসব গ্যাসের পরিমাণ এবং পার্শ্বচাপ যেমন ভিন্ন, তেমনি 100 মিলিলিটার ধমনী ও শিরারক্তেও তাদের পরিমাণ ও পার্শ্বচাপ ভিন্ন হয়। 2নং তালিকায় সমুদ্র সমতলীয় বায়ুমণ্ডলে প্রশ্বাসবায়ু, বায়ুথলীয় বায়ু এবং ধমনীরক্ত ও শিরারক্তে তাদের পরিমাণ ও পার্শ্বচাপের উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট তাপ ও চাপে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্যাসীয় অণু যে আয়তন দখল করে তা সমসংখ্যক যেকোন গ্যাসঅণুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একটি আদর্শ গ্যাসের পার্শ্বচাপ নিম্নলিখিত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল।

$$P=\frac{nRT}{V}$$

যেখানে, P = পার্শ্বচাপ

n = অণুর সংখ্যা

R = গ্যাস ধ্রুবক

T = পরম উষ্ণতা

V = আয়তন

1. **বিভিন্ন গ্যাসের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব :** (a) **অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইড :** প্রাণী বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনকে গ্রহণ করে এবং খাদ্যের কার্বন ও হাইড্রোজেনকে জারিত করে। ফলে কলাকোষে কার্বনডাইঅক্সাইড, জল, ও জৈবশক্তি উৎপন্ন হয়। একজন বয়স্ক লোক মিনিটে 250 মিলিলিটার অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং 200 মিলিলিটার কার্বনডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে অর্থাৎ দেহ থেকে যে পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গত হয় তার চেয়ে বেশী পরিমাণ অক্সিজেন গৃহীত হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় O_2 শুধুমাত্র খাদ্যের কার্বনকেই জারিত করে না, খাদ্যের হাইড্রোজেনকেও জারিত করে, ফলে H_2O উৎপন্ন হয়। (b) **নাইট্রোজেন :** নাইট্রোজেন দেহের রক্ত, কলারস এবং সবরকম কলাকোষে ভৌত দ্রবণ হিসাবে অবস্থান করে। দেহতরলে এর পরিমাণ ফুসফুসীয় বায়ুথলীতে এর পার্শ্বচাপের উপর নির্ভর করে।

বায়ুথলীতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সামান্য বেশী থাকে, এর প্রধান কারণ বায়ুথলী থেকে যে পরিমাণ অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে সে পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড বায়ুথলীতে ফিরে আসে না, ফলে অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইডের

2 নং তালিকা

গ্যাস		প্রশ্বাসবায়ু	নিঃশ্বাসবায়ু	বায়ুথলীয়বায়ু	ধমনীরক্ত	শিরারক্ত
অক্সিজেন	উপাদান (শতকরা আয়তন)	20 94	16 3	14 0	19	14
	পার্শ্বচাপ (মি.মি.পারদ)	158*	116·0*	100·0*	100*	40*
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	উপাদান (শতকরা আয়তন)	0·04	4·5	5·6	48	52
	পার্শ্বচাপ (মি মি পারদ)	0 30*	32*	40 0*	40*	46*
নাইট্রোজেন	উপাদান (শতকরা আয়তন)	79 02	79 2	80 4	0 9	0 9
	পার্শ্বচাপ (মি মি. পারদ)	596*	565*	573*	573*	573*
জলীয় বাষ্প	উপাদান (শতকরা আয়তন)	0 66	6 2	6 2	6·2	6·2
	পার্শ্বচাপ (মি মি পারদ)	5 7*	47*	47*	47*	47*
মোট গ্যাসীয় চাপ*		760	760	760	760	760

পরিমাণ হ্রাস পায় এবং নাইট্রোজেনের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলীয় চাপে একজন বয়স্ক লোকে প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে প্রায় 0·9

মিলিলিটার নাইট্রোজেন দ্রবীভূত থাকে। সমগ্র দেহতরলে এই পরিমাণ 1·5 লিটার। স্বাভাবিক বায়ুচাপে নাইট্রোজেনের কোন শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব নেই, কারণ কোন শারীরবৃত্তীয় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইহা অংশগ্রহণ করে না। তবে সমুদ্র গভীরে যেসব চালক অথবা কেইসোন কর্মীকে (worker in caisson) উচ্চচাপে শ্বাসক্রিয়া চালাতে হয়, তাদের দেহে অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন দ্রবীভূত হয়। তাই হঠাৎ তাদেব স্বাভাবিক বায়ুচাপে নিয়ে এলে বিপত্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যাকে **কেইসোন পীড়া** বলা হয়। (3) **জলীয় বাষ্প ঃ** জলীয় বাষ্প প্রশ্বাস বায়ুকে আর্দ্র করে, তাপক্ষযের মাধ্যমে দেহ-উষ্ণতার নিযন্ত্রণ করে এবং দেহের জলসাম্য নিযন্ত্রণে সহাযতা কবে।

2. **প্রশ্বাস বায়ু** (Inspired air) ঃ প্রশ্বাসবাযুর উপাদান ও চাপ বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসের উপাদান ও তাদের পার্শ্বচাপের সমষ্টির সমান। জলীয় বাষ্প প্রশ্বাসবায়ুকে আর্দ্র কবে। দেহ প্রশ্বাসবাযু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। প্রশ্বাসবায়ু থেকে দেহ যে অক্সিজেন গ্রহণ কবে তাব পবিমাণ = (প্রশ্বাসবায়ুতে অক্সিজেনেব পবিমাণ — নিঃশ্বাস বাযুতে অক্সিজেনেব পরিমাণ)।

3. **নিঃশ্বাসবায়ু** ঃ নিঃশ্বাসবাযুতে অক্সিজেনেব পরিমাণ কম থাকে, কিন্তু কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ প্রশ্বাসবাযু (V_I) থেকে যে অক্সিজেন (Vo_2) বক্তে প্রবেশ কবে তাকে বাদ দিলে এবং যে পবিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড (Vco_2) বক্ত থেকে প্রশ্বাসবাযুতে প্রবেশ কবে তাকে যোগ করলে নিঃশ্বাস বায়ু পাওয়া যায়। অর্থাৎ —

$$V_E = V_I - Vo_2 + Vco_2$$

প্রশ্বাসবাযুতে নিঃশ্বাসবাযুর চেযে প্রায় (20 94 – 16·3) বা 4 64 শতাংশ অক্সিজেন বেশী থাকে। এই অক্সিজেন ফুসফুসের বাযুথলীর মাধ্যমে রক্তে প্রবেশ করে। দেহের কলাকোষ এই অক্সিজেনের সাহায্যে খাদ্যের কার্বন (C) ও হাইড্রোজেনকে বিজারিত করে, ফলে কার্বনডাইঅক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয। CO_2 নিঃশ্বাস বাযুর মধ্য দিযে দেহ থেকে নির্গত হয়। নিঃশ্বাস বায়ুব কার্বনডাইঅক্সাইডের পবিমাণ (V_ECO_2) থেকে প্রশ্বাসবায়ুর কার্বনডাই-অক্সাইডেব পরিমাণকে (V_ICO_2) বাদ দিলে, কি পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইড নিঃশ্বাসবায়ুতে প্রবেশ করেছে তা পাওয়া যায, অর্থাৎ

$$VCO_3 = V_ECO_2 - V_ICO_2$$

নিঃশ্বাসবায়ু প্রধানত নিষ্ক্রিয় বায়ু (dead space) ও বায়ুথলী থেকে

নির্গত বায়ুর সমন্বয়ে গঠিত। **ডগলাস ব্যাগের** দ্বারা নিঃশ্বাস বায়ুকে সংগ্রহ করে এবং তার পার্শ্বনল থেকে গ্যাসীয় নমুনা আলাদা করে **হ্যালডেন গ্যাস বিশ্লেষক যন্ত্রের** দ্বারা তার উপাদানের বিশ্লেষণ করা হয়।

4. **বায়ুথলীয় বায়ু** (Alveolar air) ঃ ফুসফুসে শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বায়ুই হল বায়ুথলীয় বায়ু, কারণ ইহা ধমনীরক্তের সংগে গ্যাসীয় সাম্যে অবস্থান করে। বায়ুথলীয় বায়ু বলতে শুধুমাত্র শারীরস্থানীয় বায়ুথলীর বায়ুকেই বুঝায় না, ফুসফুসের গভীরে অবস্থানকারী বায়ুকেও বুঝায়। নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে বায়ুথলীয় গ্যাসের যে উপাদান দেখা যায়, তা নিম্নরূপ ঃ অক্সিজেন 14%, কার্বনডাইঅক্সাইড 5·6%, নাইট্রোজেন 80·4% এবং জলীয় বাষ্প 6·2%। অর্থাৎ বায়ুথলীয় বায়ুতে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ প্রশ্বাসবায়ুতে তার পরিমাণের চেয়ে প্রায় 100 গুণ বৃদ্ধি পায়। জলীয় বাষ্পও প্রশ্বাসবায়ুর চেয়ে প্রায় 10 গুণ বৃদ্ধি পায়।

বায়ুথলীয় গ্যাসের সংগ্রহ পদ্ধতি (Collection of alveolar air) ঃ হ্যালডেন ও প্রিস্টলির (Haldane and Priestly) পদ্ধতির সাহায্যে বায়ুথলীয় বায়ুকে সংগ্রহ করা যায় এবং হ্যালডেন গ্যাসবিশ্লেষক যন্ত্রের (Haldane gas analyzer) দ্বারা তার বিশ্লেষণ করা চলে। প্রায় 1 22 মিটার দীর্ঘ একটি নলের একপ্রান্তকে একটি মুখখন্ডকের (mouth piece) সংগে সংযুক্ত করা হয়। মুখখন্ডকের সন্নিহিত অঞ্চলে একটি নমুনা সংগ্রহকারী নল (sampling tube) সংযুক্ত থাকে। দীর্ঘ নলের মধ্য দিয়ে পর পর দুয়েক সজোরে নিঃশ্বাস ফেলতে হয় ঃ (1) প্রথমত স্বাভাবিক প্রশ্বাসের পর এবং (2) দ্বিতীয়ত স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের পর। নিঃশ্বাসের শেষাংশ থেকে নমুনা সংগ্রহকারী নলের মাধ্যমে দুটো নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং তার বিশ্লেষণ করা হয়।

5. **ধমনী ও শিরারক্তের গ্যাসীয় উপাদান ঃ** ধমনী ও শিরারক্তে অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ও পার্শ্বচাপ বিভিন্ন। প্রতি 100 মিলিলিটার ধমনী ও শিরারক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ যথাক্রমে 19 মিলিলিটার ও 14 মিলিলিটার। অর্থাৎ ধমনী ও শিরারক্তের অক্সিজেন-পার্থক্য প্রায় 5 মিলিলিটার। ধমনীরক্ত তাই রক্তজালিকার মধ্য দিয়ে যখন শিরারক্তের দিকে এগিয়ে যায়, তখন দেহের কলাকোষ প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তের অক্সিজেনকে গ্রহণ করে এবং কোষমধ্যস্থ খাদ্যের কার্বন ও হাইড্রোজেনকে জারিত করে। কার্বনের

HbO_2^- লোহিতকণিকার K^+ আয়নের সংগে $KHbO_2$ হিসাবে অবস্থান করে এবং প্রধানত এভাবে ফুসফুস ত্যাগ করে।

3. **অক্সিজেনের কলাকোষে প্রবেশ** (Entry of oxygen to tissues) : কলারসে অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ 30-40 মিলিমিটার পারদচাপের সমান। অপরপক্ষে, ধমনীরক্তে অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ 95-100 মিলিমিটার পারদচাপের সমান। অতএব এই চাপপার্থক্যের দরুণ অক্সিজেন রক্ত থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কলারস ও কলাকোষে প্রবেশ করে। স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় স্থিতাবস্থায় এভাবে প্রায় 25-33 শতাংশ অক্সিজেন কলাতে প্রবেশ করে। চাপপার্থক্য ছাড়াও অন্য যেসব কারণ হিমোগ্লোবিনকে বিশ্লিষ্ট হতে সহায়তা করে, তাদের মধ্যে প্রধান : (1) কার্বনডাইঅক্সাইডের অধিক পার্শ্বচাপ, (2) অধিক উষ্ণতা এবং (3) অধিক হাইড্রোজেন আয়নের উপস্থিতি।

পেশীসঞ্চালনে অধিক CO_2 উৎপন্ন হলে তা নিম্নলিখিতভাবে অক্সিজেনের বিয়োজন বৃদ্ধি করে ; কলাকোষ থেকে নির্গত CO_2 রক্তে নির্গমনের পর দ্রুত লোহিতকণিকায় প্রবেশ করে এবং কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজের উপস্থিতিতে H_2O-এর সংগে যুক্ত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে :

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

উৎপন্ন H^+ আয়ন $Hb_4O^-_2$ আয়নের সংগে যুক্ত হয়ে HHb_4 উৎপন্ন করে এবং O_2 মুক্ত হয়।

$$H^+ + Hb_4O_2 \leftrightarrow HHb_4 + O_2 \uparrow$$
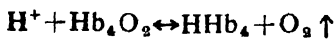
দেখা গেছে রক্তে pH হ্রাস পেলে হিমোগ্লোবিনের O_2 আসক্তি হ্রাস পায়। এই ঘটনা **বোর ইফেক্ট** (Bohr effect) নামে পরিচিত। এর কারণ ডিঅক্সিহিমোগ্লোবিন অক্সিহিমোগ্লোবিনের চেয়ে অধিকতর সক্রিয়ভাবে H^+ আয়নের সংগে যুক্ত হয়।

এভাবে উৎপন্ন O_2 কলাকোষে প্রবেশ করে। লোহিতকণিকায় এধরনের পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়াকে **আইসোহাইড্রিক চক্র** (isohydric cycle) বলা হয়, কারণ রক্তে CO_2-এর গ্রহণ ও কলাকোষে O_2 এর প্রবেশ থেকে অধিক H^+ আয়ন উৎপন্ন হয় না বা pH-এর পরিবর্তন হয় না।

4. **শিরারক্তে অক্সিজেনের পরিবহন** (Transport of oxygen in venous blood) : কলাকোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে ধমনীরক্ত যখন শিরারক্তে প্রবেশ করে তখন রক্তের অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ, পরিমাণ ও সংপৃক্তির হ্রাস ঘটে।

শিরারক্তে অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ, পরিমাণ ও সংপৃক্তি যথাক্রমে 40 মিলিমিটার (পারদ), 14 মিলিলিটার (100 মিলিলিটারে) এবং 70 শতাংশ। অক্সিজেন প্রধানত অক্সিহিমোগ্লোবিন হিসাবেই পরিবাহিত হয়। ভৌত দ্রবণ হিসাবে শতকরা 0·15 ভাগ পরিবাহিত হয়।

অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন বিয়োজন লেখচিত্র
Oxygen Hemoglobin Dissociation Curve

রক্তে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন সংপৃক্তি ও অক্সিজেনের পার্শ্বচাপের পারস্পরিক সম্পর্ককে অক্সিজেন-হিমোগ্লোবিন বিয়োজন লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। x-অক্ষে (ভুজ) অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ (মিলিমিটার পারদচাপে) এবং y-অক্ষে (কোটি) অক্সিজেনের সংপৃক্তিকে (শতকরা সংপৃক্তি) স্থাপন করে এই লেখচিত্রটি অঙ্কন করা হয়।

1. **কিভাবে লেখচিত্রটি পাওয়া যায়** (How to obtain the curve): নিম্নলিখিত উপায়ে লেখচিত্রটি পাওয়া যায়। 2 মিলিলিটার রক্তকে নির্দিষ্ট পার্শ্বচাপসম্পন্ন অক্সিজেনে পূর্ণ একটি **টনোমিটারে** (tonometer, 250 মিলিলিটার বোতল) গ্রহণ করা হয় এবং তাকে 37·5 ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতাসম্পন্ন একটি জলগাহে (water-bath) ডুবিয়ে 20 মিনিট ধরে আবর্তিত করা হয়, যাতে রক্তের বিস্তৃত অংশ অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে। এরপর **ভ্যানস্লাইক** (Van Slyke), **হ্যালডেন** (Halden) বা **সোলাণ্ডার** (Scholander) যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের অক্সিজেন-সংপৃক্তির পরিমাপ করা হয় এবং তাকে নির্দিষ্ট পার্শ্বচাপসম্পন্ন অক্সিজেনের বিপরীতে গ্রাফ-পেপারে উপস্থাপন করা হয়। এভাবে অক্সিজেনের বিভিন্ন পার্শ্বচাপে রক্তের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন সংপৃক্তির পরিমাপ করা হয় এবং গ্রাফ্‌পেপারে উপস্থাপন করে লেখচিত্রটি অঙ্কন করা হয়।

লেখচিত্রের আকৃতি অনেকটা 'S'-এর মত। এর থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় রক্তে অক্সিজেনের সংপৃক্তি ও অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ পরস্পর প্রত্যক্ষভাবে সমানুপাতিক নয়। তবে বায়ুথলীয় অক্সিজেনের পার্শ্বচাপে (100 মিলিমিটার পারদচাপ) রক্তের অক্সিজেন সংপৃক্তি প্রায় সম্পূর্ণ হয়, এবং কলাকোষস্থ পার্শ্বচাপে (40 মিলিমিটার) তা দ্রুত হ্রাস পায়। হিমোগ্লোবিনের বিভিন্ন প্রকৃতি (Hb_2, Hb_3, বা Hb_4), লোহিতকণিকায় তাদের পরিমাণগত

অবস্থা এবং রক্তে তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের উপস্থিতি সম্মিলিতভাবে লেখচিত্রের 'S' আকৃতির জন্য দায়ী (এক্ষেত্রে ভরসূত্র প্রযোজ্য)।
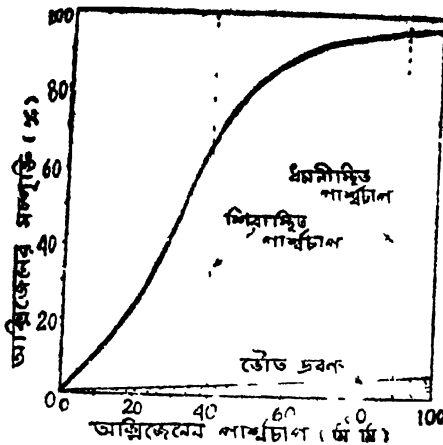
14-15 নং চিত্র ঃ অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন বিয়োজন লেখচিত্র।

2. **লেখচিত্রের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব ঃ** অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন বিয়োজন লেখচিত্রের নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব রয়েছে। 80 মিলিমিটার ঊর্ধ্ব পারদচাপে লেখচিত্র সমতলীয় আকার ধারণ করে। এর দ্বারা বোঝা যায় বায়ুথলীর অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ পরিবর্তিত হ'লেও ধমনীরক্তে তার পার্শ্ব-চাপ অপরিবর্তিত থাকে। দ্বিতীয়ত, 20 থেকে 60 মিলিমিটার পারদচাপে লেখচিত্র অত্যধিক ঢালু হয়। এ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় এই চাপে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন রক্ত থেকে কলাকোষে মুক্ত হয়।

3. **লেখচিত্রের পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণসমূহ ঃ** (1) **উষ্ণতা ঃ** উষ্ণতা-বৃদ্ধিতে লেখচিত্র ডান দিকে স্থান পরিবর্তন করে। অর্থাৎ পার্শ্বচাপ অপরিবর্তিত থাকলেও উষ্ণতার বৃদ্ধিতে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেনকে ধরে রাখার ক্ষমতা হ্রাস পায়। যেমন, 100 মিলিমিটার পারদচাপে ও 30°C উষ্ণতায় রক্তের অক্সিজেন-সংপৃক্তি যেখানে 93%, 25°C উষ্ণতায় সেখানে তা 99%। (2) **তড়িৎ-বিশ্লেষ্য ঃ** তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম পার্শ্বচাপেও অক্সিহিমোগ্লোবিন বিশুদ্ধ দ্রবণের অক্সিহিমোগ্লোবিনের চেয়ে অধিক অক্সিজেন মুক্ত করতে পারে। (3) **কার্বনডাইঅক্সাইড ঃ** কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পার্শ্বচাপ বৃদ্ধি পেলে রক্তের অক্সিহিমোগ্লোবিনের বিয়োজন

বৃদ্ধি পায়, ফলে লেখচিত্র ডানপাশে স্থান পরিবর্তন করে। **(4) pH :** pH হ্রাস পেলে বা রক্তের হাইড্রোজেন আয়নের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে হিমোগ্লোবিনের অধিক-অক্সিজেনকে ধরে রাখার ক্ষমতা হ্রাস পায়। লেখচিত্র তাই ডান পাশে স্থান পরিবর্তন করে। (5) **হিমোগ্লোবিনের তীব্রতা :** লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে লেখচিত্রের 'S' আকৃতি অধিকতর স্পষ্ট হয়। (6) **হিমোগ্লোবিনের শ্রেণী :** বয়স্ক হিমোগ্লোবিনের চেয়ে ভ্রূণজ হিমোগ্লোবিনের আসক্তি অধিক। এক্ষেত্রে লেখচিত্র বাম পাশে স্থান পরিবর্তন করে। পেশীস্থ মায়োগ্লোবিনও (myoglobin) অধিক পরিমাণ অক্সিজেনকে ধরে রাখতে পারে, লেখচিত্র তাই বাম পাশে স্থান পরিবর্তন করে এবং পরাবৃত্তীয় (hyperbola) আকৃতি ধারণ করে। (7) **অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ :** অক্সিজেনের পার্শ্বচাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে লেখচিত্রের আকৃতিও পরিবর্তিত হয়। (৪) **2, 3-ডাইফসফোগ্লিসারেট** (DPG) : এর গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পেলে লেখচিত্র ডানদিকে সরে যায় অর্থাৎ O_2 ধরে রাখার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

4. **মায়োগ্লোবিন** (Myoglobin) : লৌহঘটিত এই পদার্থটিকে প্রধানত অস্থিপেশীতে পাওয়া যায়। মায়োগ্লোবিন হিমোগ্লোবিনের মতই দেখতে, তবে হিমোগ্লোবিন যেখানে 4টি অক্সিজেন অণুর সংগে যুক্ত হতে পারে
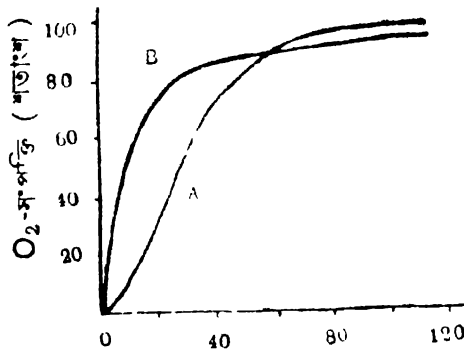
14-16 নং চিত্র : অক্সিহিমোগ্লোবিন ও মায়োগ্লোবিনের বিয়োজন লেখচিত্র। তাপমাত্রা 38°C, pH 7·40। A-মানুষে স্বাভাবিক রক্ত। B-মায়োগ্লোবিন।

সেখানে মায়োগ্লোবিন মাত্র 1টি অক্সিজেন অণুর সংগে যুক্ত হয়। মায়োগ্লোবিনের বিয়োজন লেখচিত্র আয়তাকার পরাবৃত্ত (rectangular hyper-

bola)। এর লেখচিত্র যেহেতু হিমোগ্লোবিনের লেখচিত্রের (14-16 নং চিত্র) বাঁপাশে থাকে সেহেতু এটি হিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। মায়োগ্লোবিন নিম্ন পার্শ্বচাপে O_2-কে ছেড়ে দিতে পারে। যেসব পেশীর অনবরত কাজ করতে হয় তাদের মায়োগ্লোবিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। পেশীসংকোচনের সময় রক্তনালী চেপে গিয়ে যেখানে রক্তপ্রবাহ বন্ধ থাকে মায়োগ্লোবিন সেখানে O_2 সরবরাহ করে। এছাড়া রক্ত থেকে মাইটোকনড্রিয়াতে O_2 পরিবহনেও এটি সহায়তা করে।

কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিবহন

Carriage of Carbondioxide

দেহের সবরকম জীবন্ত কলাকোষ ধমনীরক্তের অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং তার সাহায্যে খাদ্যকে জারিত করে জৈবশক্তি উৎপন্ন করে। একই সংগে CO_2 এবং H_2O উৎপন্ন হয়। CO_2-কে বর্জ্যপদার্থ হিসাবে দেহ থেকে বর্জন করতে হয়। কোষমধ্যস্থ জৈবপদার্থের বিপাকক্রিয়া থেকে যেহেতু ইহা উৎপন্ন হয়, সেহেতু তাকে বিপাকীয় কার্বনডাইঅক্সাইড নামে অভিহিত করা হয়।

উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড কোষ থেকে নির্গত হয়ে, কলারসের মধ্য দিয়ে রক্তজালিকার সূক্ষ্ম প্রাচীরগাত্র ভেদ করে রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্তের মাধ্যমে ফুসফুসে পরিবাহিত হয়। এরপর ফুসফুসীয় রক্তজালিকা থেকে ফুসফুসীয় বায়ুথলীতে প্রবেশ করে এবং দেহ থেকে নির্গত হয়।

কলাকোষ থেকে ফুসফুস CO_2-এর পরিবহনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়: (1) শিরারক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের প্রবেশ, (2) শিরারক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিবহন এবং (3) কার্বনডাইঅক্সাইডের ফুসফুসে প্রবেশ।

1. **কার্বনডাইঅক্সাইডের শিরারক্তে প্রবেশ** (Entry of carbondioxide to venous blood): বিপাকক্রিয়া থেকে উৎপন্ন CO_2 কলারসের মধ্য দিয়ে রক্তে প্রবেশ করে। কলারসে CO_2-এর পার্শ্ব চাপ প্রায় 46 মিলিমিটার (পারদ)। কোষের অভ্যন্তরে এই চাপ আরও বেশী। ধমনীরক্তে CO_2 এর পার্শ্বচাপ 40 মিলিমিটার (পারদ)। CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কলাকোষ থেকে রক্তে প্রবেশ করে।

2. **শিরারক্তে CO_2-এর পরিবহন** (Carriage of CO_2 in Venous Blood): দুটো পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে CO_2 রক্তে পরিবাহিত হয়:

(a) প্লাজমা ও (b) লোহিতকণিকা। সংক্ষেপে প্লাজমা ও লোহিতকণিকার পরিবহন পদ্ধতি নিম্নরূপ :

প্লাজমার পরিবহন

1. **ভৌত দ্রবণ** (Physical solution)

পার্শ্বচাপে CO_2 রক্তে H_2CO_3 হিসাবে দ্রবীভূত হয় :

$$\uparrow CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$$
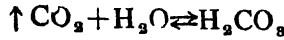
2. **প্রোটিন কার্বামিনো যৌগ গঠন** (Formation of protein carbamino compound)

প্লাজমাপ্রোটিনের অ্যামাইনো গ্রুপের সংগে CO_2 যুক্ত হয়ে প্লাজমা প্রোটিন কার্বামিনো যৌগ গঠন করে :

$$CO_2 + R-N\begin{matrix}/H \\ \backslash H\end{matrix} \rightleftharpoons R-N\begin{matrix}/H \\ \backslash COOH\end{matrix}$$
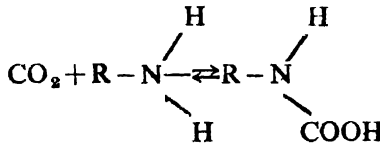
3. **সোডিয়াম বাইকার্বনেট উৎপাদন** (Formation of Sodium Bi-carbonate)

ক্লোরাইড শিফটের মাধ্যমে লোহিতকণিকা থেকে 70% HCO^-_3 প্লাজমায় প্রবেশ করে এবং Na^+সংগে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম বাইকার্বনেট উৎপাদন করে।

$$Na^+ + HCO^-_3 \rightleftharpoons NaHCO_3$$
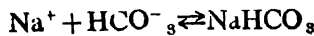
লোহিত কণিকার পরিবহন

1. **ভৌত দ্রবণ** (Physical Solution)

পার্শ্বচাপে CO_2 লোহিতকণিকার তরলে দ্রবীভূত হয় :

$$\uparrow CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$$
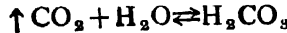
2. **কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন গঠন** (Formation of Carbamino Hb)

হিমোগ্লোবিনের অ্যামাইনোগ্রুপের সংগে CO_2 যুক্ত হয়ে কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন গঠন করে :

$$CO_2 + Hb-N\begin{matrix}/H \\ \backslash H\end{matrix} \rightleftharpoons Hb-N\begin{matrix}/H \\ \backslash COOH\end{matrix}$$
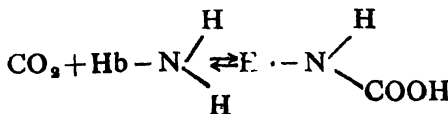
3. **পটাসিয়াম বাইকার্বনেট উৎপাদন**

CO_2 রক্তে প্রবেশ করার সংগে সংগে লোহিত কণিকায় ঢুকে এবং

কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজের উপস্থিতিতে H_2CO_3-তে রূপান্তরিত হয় এবং KHb_4-এর সংগে যুক্ত হয়ে $KHCO_3$ উৎপাদন করে ;

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$$

$$H_2CO_3 + KHb_4 \rightarrow KHCO_3 + HHb_4$$
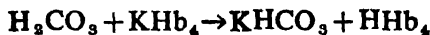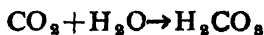
4. **লোহিতকণিকায় Cl^- শিফট** (Cl^- shift in RBC)

প্লাজমা থেকে Cl^- লোহিতকণিকায় প্রবেশ করে এবং HCO^- মুক্ত হয়ে প্লাজমায় চলে যায়। এই প্রক্রিয়ায় লোহিতকণিকায় অভিস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পায়

$$KHCO_3 + Cl^- \rightleftharpoons KCl + HCO^-_3$$
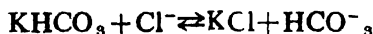
দেখা গেছে প্রতি 100 মিলিলিটার ধমনী ও শিরা রক্তে যথাক্রমে প্রায় 48 মিলিলিটার এবং 52 মিলিলিটার CO_2 থাকে। অর্থাৎ প্রায় 4 মিলি CO_2 রক্তজালিকার মধ্য দিয়ে শিরারক্তে প্রবেশ করে। শিরারক্তে 52 মিলি লিটারের মধ্যে স্বাভাবিক চাপ ও উষ্ণতায় 2·7 মিলি. ভৌত দ্রবণ হিসাবে, 3·6 মিলি. কার্বামিনো যৌগ হিসাবে এবং বাকী 45 7 মি.লি. বাইকার্বনেট হিসাবে পরিবাহিত হয় (3নং তালিকা)

লোহিতকণিকায় কার্বামিনো হিমোগ্লোবিনের উৎপাদন অক্সিজেনের সংগে সম্পর্কযুক্ত, কারণ দেখা গেছে অক্সিহিমোগ্লোবিনের চেয়ে হিমোগ্লোবিন অধিকতর দ্রুত CO_2 এর সংগে যুক্ত হতে পারে এবং ১ গুণ বেশী কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে।

$$Hb - NH_2 + CO_2 \rightleftharpoons Hb - NHCOOH$$

$$HbO_2 - NH_2 + CO_2 \rightleftharpoons HbO_2 - NHCOOH$$
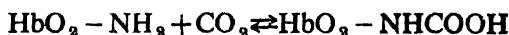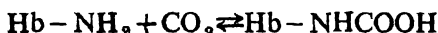
প্লাজমার চেয়ে লোহিত কণিকাতেই বেশী পরিমাণ কার্বামিনো যৌগ উৎপন্ন হয়। এছাড়া লোহিতকণিকায় **কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ** (carbonic anhydase) এনজাইমের উপস্থিতির দরুণ যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সংগে CO_2 ও H_2O এর সংযুক্তি ঘটে ও কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়

$$CO_2 + H_2O \overset{C.A.}{\rightleftharpoons} H_2CO_3$$
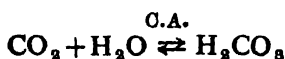
রক্তজালিকার ধমনীপ্রান্তে O_2 ছেড়ে দেওয়ার পর যে ডিঅক্সিহিমোগ্লোবিন উৎপন্ন হয় তা H_2CO_3 থেকে H^+ গ্রহণ করে HCO_3^- উৎপন্ন করে

$$Hb^- + H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO^-_3 + HHb$$
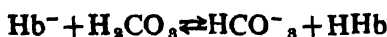
এছাড়া এই সময় অক্সিহিমোগ্লোবিনের সংগে যুক্ত K^+ মুক্ত হয় এবং উৎপন্ন HCO_3^- সংগে যুক্ত হয়ে তাকে প্রশমিত করে

$$K^+ + HCO_3^- \rightleftharpoons KHCO_3$$ ।

সমগ্র বিক্রিয়াকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ

$$CO_2 + H_2O + KHbO_2 \underset{\text{ফুসফুস}}{\overset{\text{কলা}}{\rightleftharpoons}} KHCO_3 + HHb + O_2$$
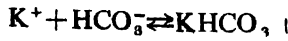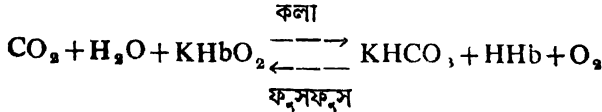
রক্ত যখন ফুসফুসীয় রক্তজালিকার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন এই বিক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়।

Cl^- শিফ্‌টের জন্য $KHCO_3^-$ থেকে মুক্ত HCO_3^- লোহিতকণিকা থেকে প্লাজমায় প্রবেশ করে এবং Cl^- দ্বারা পরিত্যক্ত Na^+এর সংগে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম বাইকার্বনেট তৈরী করে ঃ

$$Cl^- + KHCO_3 \rightleftharpoons KCl + HCO^-{}_3$$

$$HCO^-{}_3 + Na^+ \rightleftharpoons NaHCO_3$$
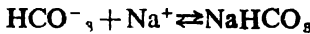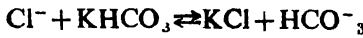
এছাড়া প্লাজমাতে যে সামান্য পরিমাণ H_2CO_3 উৎপন্ন হয় তা সরাসরি Na-প্রোটিনেট এবং ফস্‌ফেট বাফারের সংগে যুক্ত হয়ে সামান্য পরিমাণে $NaHCO_3$ উৎপন্ন করে ঃ

$$NaPr = H_2CO_3 \rightleftharpoons NaHCO_3 + HPr$$

$$NaHPO_4 + H_2CO_3 \rightleftharpoons NaHCO_3 + NaH_2PO_4$$
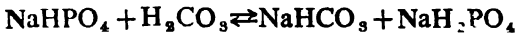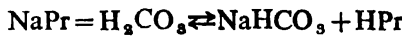
ক্লোরাইড শিফ্‌ট (Chloride shift) **ঃ হ্যাম্‌বার্‌গারের** (Hamburger) পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, কার্বনডাইঅক্সাইড যখন কলাকোষ থেকে রক্তে প্রবেশ করে তখন প্লাজমাস্থিত NaCl-এর শুধুমাত্র ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) প্লাজমা থেকে লোহিতকণিকায় প্রবেশ করে। আবার কার্বনডাইঅক্সাইড যখন রক্ত থেকে নির্গত হয় (ফুসফুসে) তখন ক্লোরাইড আয়ন লোহিতকণিকা থেকে প্লাজমাতে প্রত্যাবর্তন করে ও সোডিয়াম আয়নের সংগে পুনরায় যুক্ত হয়। প্লাজমা ও লোহিতকণিকার মধ্যে ক্লোরাইড আয়নের এজাতীয় পর্যায়-ক্রমিক শিফ্‌ট বা বদলকে **ক্লোরাইড শিফ্‌ট** বলা হয়। ক্লোরাইড শিফ্‌ট হল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার সহায়তায় প্লাজমাতে অধিক পরিমাণ বাইকার্বনেট উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং 1 সেকেণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়।

লোহিতকণিকায় এন্‌জাইম কার্বনিক অ্যান্‌হাইড্রেজের উপস্থিতির দরুণ রক্তে প্রবিষ্ট কার্বনডাইঅক্সাইড লোহিতকণিকায় প্রবেশ করার পর দ্রুতগতিতে কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। কার্বনিক অ্যাসিড KHb-এর সংগে বিক্রিয়া করে অধিক পরিমাণে $KHCO_3$ উৎপন্ন করে। অধিক $KHCO_3$-এর উৎপাদনে লোহিতকণিকার pH-বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। পটাসিয়াম লোহিতকণিকা থেকে নির্গত হতে পারলে এই প্রবণতা রোধ হতে পারত; কিন্তু পটাসিয়াম লোহিতকণিকার ঝিল্লির মধ্য দিয়ে ভেদ্য নয়, সেহেতু প্লাজমা
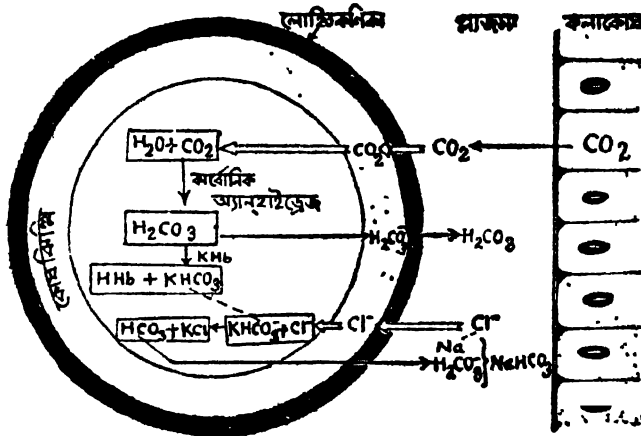
14-17 নং চিত্র : ক্লোরাইড শিফ্‌ট

থেকে ক্লোরাইড আয়ন কোষে প্রবেশ করে এবং $KHCO_3$-এর সংগে যুক্ত হয়ে pH বৃদ্ধির প্রবণতাকে নষ্ট করে এবং বাইকার্বনেট আয়ন মুক্ত করে :

$$KHCO_3 + Cl^- \rightarrow KCl + HCO_3^-$$
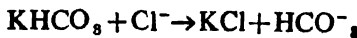
বিক্রিয়ালব্ধ HCO_3^- আয়ন রক্তকোষে বৃদ্ধি পেলে প্লাজমা ও কোষের আয়ন-সাম্য ব্যাহত হয়। লোহিতকণিকার কোষঝিল্লির বিশেষ ভেদ্যতা-ধর্মের উপর নির্ভর করে মুক্ত HCO_3^- আয়নের প্রায় 70% তাই কোষ থেকে নির্গত হয় (যতক্ষণ না আয়নসাম্য প্রতিস্থাপিত হয়) এবং প্লাজমাস্থিত মুক্ত Na^+ আয়নের সংগে সংযুক্ত হয়ে সোডিয়াম বাইকার্বনেটে পরিবর্তিত হয় (14-17 নং চিত্র)।

$$HCO_3^- + Na^+ \rightarrow NaHCO_3$$
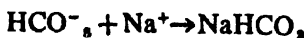
ফুসফুসে এই পরিবর্তনসমূহ বিপরীতমুখী হয়, ফলে CO_2 রক্ত থেকে

নির্গত হয়, ক্লোরাইড আয়ন পুনরায় প্লাজমায় প্রত্যাবর্তন করে এবং কোষের আকৃতিও ছোট হয়ে আসে।

ক্লোরাইড শিফ্‌টের জন্য Cl^- আয়ন ও H^+ কে প্রশমিত করার ফলে HCO_3^- আয়ন লোহিতকণিকায় বেশী জমা হয়। যেহেতু প্রতিটি প্রোটিন অণুতে অনেক ঋণাত্মক আধান থাকে, কিন্তু প্রতিটি Cl^- ও HCO_3^- এ একটি করে ঋণাত্মক আধান থাকে সেহেতু শিরারক্তে লোহিতকণিকায় অভিস্রবণ-উৎপাদক কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় (14-18 নং চিত্র)। ফলে লোহিতকণিকা বেশী পরিমাণে জল গ্রহণ করে ও আকারে বৃদ্ধি পায়। আকার
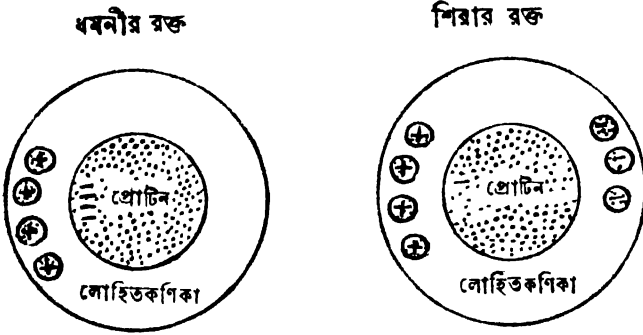
14-18 নং চিত্র ঃ শিবাবক্তে লোহিতকণিকায় অভিস্রবণ-উৎপাদক কণার সংখ্যা কেন বেশী তা দেখান হয়েছে। প্রোটিন ছাড়া ঋণাত্মক আয়ন Cl^- ও HCO_3 1+ = ধণাত্মক আয়ন।

বৃদ্ধির ফলেই শিরারক্তের হিমাটোক্রিট (hematocrit) স্বাভাবিক অবস্থায় ধমনীরক্তের চেয়ে 3% বেশী।

3. **কার্বনডাইঅক্সাইডের ফুসফুসে প্রবেশ** (Entry of carbon-dioxide to the lung) ঃ কার্বনডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় বায়ুথলীর সংস্পর্শে এলে বিপরীত বিক্রিয়াসমূহ শুরু হয় এবং CO_2 রক্ত থেকে ফুস্‌-ফুসের বায়ুথলীতে প্রবেশ করে। শিরারক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের পার্শ্ব চাপ ফুস্‌ফুসের বায়ুথলীয় কার্বনডাইঅক্সাইডের পার্শ্বচাপের চেয়ে 6 মিলিমিটার অধিক পারদ চাপসম্পন্ন হওয়ায় শিরারক্ত যখন ফুসফুসীয় রক্তজালিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয় তখন কার্বনডাইঅক্সাইড ব্যাপনপদ্ধতিতে রক্ত থেকে ফুসফুসে প্রবেশ করে। প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে 4 মিলিলিটার কার্বনডাইঅক্সাইড

ফুসফুসে প্রবেশ করে। 4 মিলিলিটারের প্রায় 20 শতাংশ আসে কার্বামিনো-যৌগ থেকে, 72 শতাংশ বাইকার্বনেট থেকে এবং 8 শতাংশ ভৌত দ্রবণ থেকে।

(d) **ধমনীরক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিবহন** (Carriage of carbondioxide in arterial blood): শিরারক্তের মত ধমনীরক্তেও কার্বনডাইঅক্সাইড দুভাবে পরিবাহিত হয়। প্রতি 100 মিলিলিটার ধমনীরক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ শিরারক্তের চেয়ে প্রায় 4 মিলিলিটার কম থাকে।

কার্বনডাইঅক্সাইডের বিয়োজন লেখচিত্র

Dissociation Curve of Carbondioxide

রক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের পার্শ্বচাপ ও তার সংপৃক্তির সম্পর্ককে যে সব লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, তাদের **কার্বনডাইঅক্সাইডের বিয়োজন লেখচিত্র** বলা হয়।
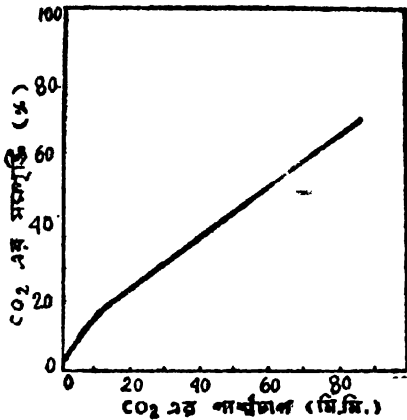
14-19 নং চিত্র: কার্বনডাইঅক্সাইডের বিয়োজন লেখচিত্র।

কার্বনডাইঅক্সাইড প্রথমে খুব দ্রুত রক্তের সংগে সংযুক্ত হয়, কিন্তু পরে সংযুক্তির হার মন্থর হয়ে আসে। তবে সর্বোচ্চ পার্শ্বচাপেও লেখচিত্রের যে আকৃতি দেখা যায় তাতে বোঝা যায় রক্তের একটি সংরক্ষিত ক্ষমতা রয়েছে, যার সাহায্যে সে আরও অধিক পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইডকে পরিবহন করতে পারে। শূন্য পার্শ্বচাপে কার্বনডাইঅক্সাইডের সংপৃক্তি বিশুদ্ধ প্লাজমা বা রক্তে শূন্য হয়। অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ বৃদ্ধি পেলে রক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের সংপৃক্তি হ্রাস পায় এবং অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ হ্রাস পেলে তা বৃদ্ধি পায়।

শ্বাসক্রিয়ার স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ
Nervous Regulation of Respiration

দেহের চাহিদা অনুযায়ী শ্বাসক্রিয়ার পরিবর্তন যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তার জন্য প্রয়োজন শ্বাসক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ। শ্বাসক্রিয়ার স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ প্রধানত (1) শ্বাসকেন্দ্র, (2) স্নায়ু ও প্রতিবর্ত এবং (3) শ্বাসকেন্দ্রে প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য স্নায়ুকেন্দ্রের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়।

1. **শ্বাসকেন্দ্র** (Respiratory centre) ঃ মস্তিষ্কের মেডালা (medulla) ও পন্‌সে (pons) অবস্থানকারী একাধিক স্নায়ুকেন্দ্রের সমন্বয়ে শ্বাসকেন্দ্র গঠিত। মধ্যমস্তিষ্ক, মেডালা ও পন্‌সের বিভিন্ন তলে ব্যবচ্ছেদ করে বা তড়িৎ-উদ্দীপনা প্রয়োগ করে শ্বাসক্রিয়ার যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে তার সঠিক অনুশীলনের সাহায্যে এসব স্নায়ুকেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে।

পন্‌সের দুটো এবং মেডালার দুটো—মোট এই 4টি স্নায়ুকেন্দ্রের সমন্বয়ে শ্বাসকেন্দ্র গঠিত। পন্‌সের দুটো স্নায়ুকেন্দ্র যথাক্রমে **নিউমোটাক্‌সিক** (pneumotaxic) এবং **অ্যাপ্‌নাস্‌টিক** (apneustic) স্নায়ুকেন্দ্র হিসাবে
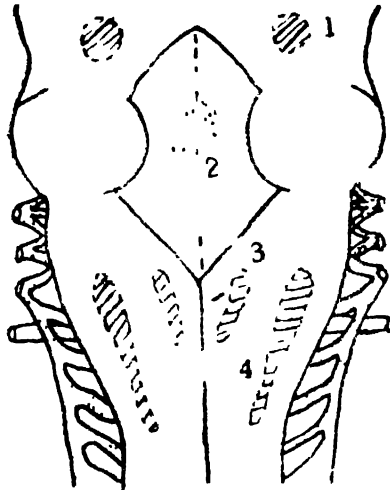
14-20 নং চিত্র ঃ শ্বাসকেন্দ্র। 1. নিউমোটাক্সিক কেন্দ্র, 2. অ্যাপনাস্টিক কেন্দ্র, 3, 4 পৃষ্ঠদেশীয় ও অংকদেশীয় কেন্দ্র (প্রশ্বাস কেন্দ্র)।

পরিচিত। মেডালার স্নায়ুকেন্দ্র দুটিকে **প্রশ্বাসকেন্দ্র** (inspiratory centre) এবং **নিঃশ্বাসকেন্দ্র** (expiratory centre) বলা হয় (14-20 নং চিত্র)।

পন্‌সস্থিত অ্যাপ্‌নাসটিক স্নায়ুকেন্দ্রের প্রভাবে প্রশ্বাসকেন্দ্রের সক্রিয়তা

বৃদ্ধি পেলে প্রশ্বাসক্রিয়া শুরু হয়। প্রশ্বাসক্রিয়া চলাকালে অ্যাপনাসটিক স্নায়ুকেন্দ্র থেকে উত্থিত স্নায়ু-উদ্দীপনা নিউমোটাকসিক স্নায়ুকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করে। প্রশ্বাসক্রিয়ার চরম অবস্থায় নিউমোটাকসিক স্নায়ুকেন্দ্র এবং একই সংগে ফুসফুসের টানগ্রাহক (stretch receptors) থেকে প্রেরিত স্নায়ুউদ্দীপনা অ্যাপনাসটিক স্নায়ুকেন্দ্রকে প্রশমিত করে, ফলে প্রশ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয় এবং নিঃশ্বাসক্রিয়া শুরু হয়। অপরপক্ষে নিঃশ্বাসক্রিয়া চলাকালে অ্যাপনাসটিক স্নায়ুকেন্দ্রের এই বিরুদ্ধ ক্রিয়া অপসৃত হয়, ফলে পুনরায় প্রশ্বাসক্রিয়া শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এভাবে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।
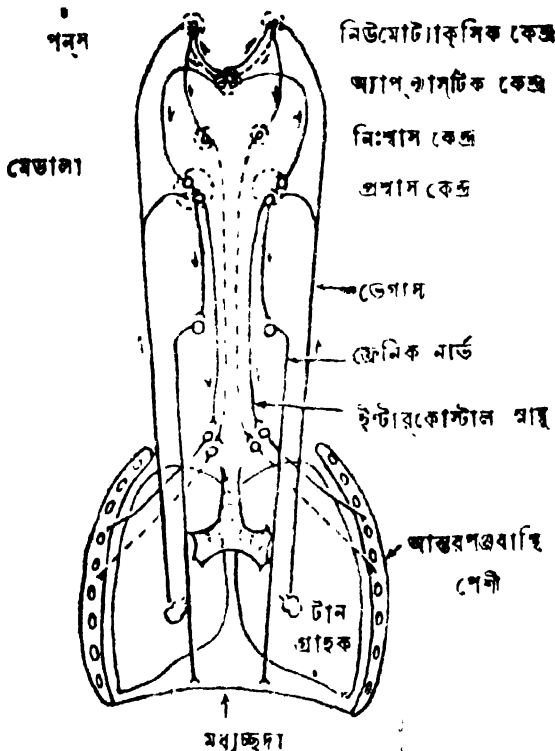
14-21 নং চিত্র : শ্বাসকেন্দ্র ও শ্বাসক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে তাদের ভূমিকা।

2. **স্নায়ু ও প্রতিবর্ত (Nerves and reflexes) :** নিম্নলিখিত স্নায়ু ও প্রতিবর্ত শ্বাসক্রিয়ার স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে।

(a) **হেরিং-ব্রুয়ার প্রতিবর্ত ও ভেগাসস্নায়ু** (Hering-Breuer reflex and vagus nerve)ঃ শ্বাসক্রিয়ার ছন্দ ও গভীরতা এই প্রতিবর্তের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। ফুসফুস বায়ুস্ফীত হলে বায়ুথলীস্থিত টান-গ্রাহক উদ্দীপিত হয়। টানগ্রাহকের উদ্দীপনা ফুসফুসের বায়ু-স্ফীতির সংগে সমানুপাতিক। ভেগাসস্নায়ুর মাধ্যমে এই উদ্দীপনা শ্বাস কেন্দ্রে পেঁছিয় এবং প্রধানত অ্যাপনাস্টিক স্নায়ুকেন্দ্রের ক্রিয়াকে প্রশমিত করে, ফলে প্রশ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়। নিঃশ্বাসক্রিয়ার সময় ফুসফুসের টান অনুপস্থিত থাকে, ফলে টানগ্রাহক উদ্দীপিত হয় না এবং ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমেও কোন স্নায়ু-উদ্দীপনা পরিবাহিত হয় না (14-21 নং চিত্র)। ভেগাস স্নায়ুকে ব্যবচ্ছেদ করলে এই প্রতিবর্ত ব্যাহত হয় এবং শ্বাসক্রিয়া গভীর ও মন্থর হয়ে পড়ে।

(b) **সাইনাস মহাধমনী প্রক্রিয়া ও সাইনাস মহাধমনী স্নায়ু** (Sino-aorti mechanism and sino-aortic nerves)ঃ ক্যারোটিড বডি ও আওর্টিক বডির সংগে যুক্ত সাইনাস ও মহাধমনীজাত স্নায়ুসমূহ সরাসরি শ্বাসকেন্দ্রের সংগে সংযুক্ত থাকে। রক্তের কার্বনডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধি, অক্সিজেনের অভাব, হাইড্রোজেন আয়নের আধিক্য, রক্তচাপ-বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণ ক্যারোটিড ও আওর্টিক বডিস্থিত রসায়ন-গ্রাহককোষ ও প্রেস-গ্রাহককে উদ্দীপিত করে, যা এইসব সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে শ্বাসকেন্দ্রে পেঁছিয় এবং প্রতিবর্তের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করে।

(c) **অন্যান্য প্রতিবর্ত** (Other reflexes)ঃ অন্যান্য যে সব প্রতিবর্ত শ্বাসক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের মধ্যে প্রধান ঃ (a) কাশপ্রতিবর্ত (coughing reflex)ঃ গলবিলস্থিত শ্লেষ্মাঝিল্লিতে উত্তেজক বা বিজাতীয় পদার্থের দ্বারা যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তা ভেগাস স্নায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাশ প্রতিবর্তের উদ্ভব ঘটায়, ফলে কাশির উদ্ভব হয়। (b) হাঁচি-উদ্দীপক প্রতিবর্ত (sneezing reflex)ঃ নাসিকার শ্লেষ্মাঝিল্লীর উত্তেজনা-জাত স্নায়ু-উদ্দীপনা সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর (olfactory and trigeminal) মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে এই প্রতিবর্তের উদ্ভব ঘটায়। (c) গ্রাস-প্রতিবর্ত (swallowing reflex)ঃ কোনকিছু গলাধঃকরণের সময় এই প্রতিবর্ত সক্রিয় হয় এবং শ্বাসক্রিয়াকে বন্ধ রাখে। পশ্চাদগলবিলস্থিত প্রাচীর থেকে

স্নায়ু-উদ্দীপনা উৎপন্ন হয় এবং গ্লসোফ্যারিংজিয়েল (glossopharyngeal) স্নায়ুর মাধ্যমে প্রবাহিত হয় এবং প্রতিবর্তের সৃষ্টি করে। (d) অন্যান্য প্রতিবর্ত (other reflexes): দেহের উপরিতল, আন্তরযন্ত্র, পেশী, পেশী-সন্ধি, পঞ্জরাস্থিপেশী, মধ্যচ্ছদা প্রভৃতি থেকে উত্থিত অন্তর্বাহ স্নায়ুর মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া উদ্দীপিত হয়।

4. **অন্যান্য স্নায়ুকেন্দ্রের প্রভাব** (Influence of other centres): অন্য যে সব স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাসকেন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের মধ্যে আছে: (i) গুরুমস্তিষ্ক (cerebral cortex): গুরুমস্তিষ্কের কোন কোন অংশ (চেষ্টীয় গুরুমস্তিষ্ক, সিলভিয়ান জাইরাস, সম্মুখস্থ সিনগুলেট জাইরাস ইত্যাদি) শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধি করে, আবার কোন কোন অংশ শ্বাসক্রিয়া হ্রাস করে। (ii) হাইপোথালামাস ও লিম্বিক সংস্থা (hypothalamus and limbic system): এই দুটো অংশও শ্বাসকেন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। (iii) বাহনিয়ামক কেন্দ্র (vasomotor centre): বাহনিয়ামক কেন্দ্র সরাসরি শ্বাসকেন্দ্রের উপর ক্রিয়া করে ফুসফুসীয় বায়ুচলন বৃদ্ধি করে। (iv) হার্দ বিমুখকেন্দ্র (cardioinhibitory centre): হার্দ বিমুখকেন্দ্র সম্ভবত সরাসরি শ্বাসকেন্দ্রের উপর ক্রিয়া করে শ্বাসক্রিয়াকে পরিবর্তিত করে।

শ্বাসক্রিয়ার রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ
Chemical Regulation Of Respiration

রক্তের কার্বনডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন ও H^+ আয়নের স্বাভাবিক মাত্রার পরিবর্তন ঘটলে শ্বাসক্রিয়া গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়। শ্বাসক্রিয়ার এই পরিবর্তন এমনভাবে সংঘটিত হয়, যাতে দৈহিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হয়। শ্বাসকেন্দ্র শ্বাসক্রিয়ার রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। রক্তের রাসায়নিক উপাদানের পরিবর্তন সরাসরি শ্বাসকেন্দ্রের উপর ক্রিয়া করতে পারে, অথবা স্নায়ুর মাধ্যমে শ্বাসকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করতে পারে। শ্বাসকেন্দ্রের বর্ণনা উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

1. **অক্সিজেন**: রক্তে অক্সিজেনের অভাব ও আধিক্য এই দুটো কারণই শ্বাসকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করে।

অক্সিজেনের অভাব স্নায়ুকেন্দ্রে দুভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ক্যারোটিড

ও আওর্টিক বডির সংগে যুক্ত স্নায়ুর মাধ্যমে ইহা শ্বাসকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করে। অপরপক্ষে, সরাসরি ইহা শ্বাসকেন্দ্রের সক্রিয়তা প্রশমিত করে। তবে প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে বলে সমগ্রভাবে শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি ঘটে।

মাঝারি ধরনের অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। 10 শতাংশ অক্সিজেনের অভাব শ্বাসকেন্দ্রের উপর কোনপ্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। এর থেকে বোঝা যায় শ্বাসকেন্দ্র অক্সিজেন-অভাবের প্রতি তুলনামূলকভাবে কম সংবেদনশীল। অক্সিজেনের অভাব প্রধানত ক্যারোটিড ও আওর্টিক বডিস্থিত রসায়ন গ্রাহককে উদ্দীপিত করে এবং শ্বাসকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবর্তের সৃষ্টি করে, যা শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি ঘটায়।

অপরপক্ষে, 60 শতাংশ অক্সিজেনসম্পন্ন বায়ুতে কোনপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন না হয়েই যতক্ষণ ইচ্ছা শ্বাসকার্য চালানো সম্ভবপর। তবে 75 শতাংশ অক্সিজেনসম্পন্ন বায়ুতে কোন প্রাণীকে রাখলে কিছুদিন ধরে সে এই পরিস্থিতিকে সহ্য করতে পারলেও পরে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ অক্সিজেনে কোন প্রাণী কয়েক ঘণ্টায় বেশী শ্বাসক্রিয়া চালাতে সক্ষম হয় না, শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

2. **কার্বনডাইঅক্সাইড:** প্রশ্বাসবায়ুতে কার্বনডাইঅক্সাইডের পার্শ্বচাপ সামান্য বৃদ্ধি পেলে প্রথমে শ্বাসকার্যের গভীরতা ও পরে শ্বাসকার্যের হার বৃদ্ধি পায়। রক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের আধিক্য তাই শ্বাসক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। অপরপক্ষে, রক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের অভাব শ্বাসক্রিয়ার হ্রাস ঘটায়। সরাসরি শ্বাসকেন্দ্রের উপর ক্রিয়া করে অথবা ক্যারোটিড ও আওর্টিক বডির মাধ্যমে কার্বনডাইঅক্সাইড এই পরিবর্তন ঘটায়। ক্যারোটিড ও আওর্টিক বডিস্থিত রসায়ন-গ্রাহকের মত মেডালাতেও কার্বনডাইঅক্সাইডের প্রতি-সংবেদনশীল কোষের অস্তিত্ব রয়েছে (Micthell), যারা কার্বনডাইঅক্সাইড ছাড়াও অধিক H^+ আয়নের তীব্রতা, অ্যাসিটাইলকোলিন ও নিকোটিনের দ্বারা উদ্দীপিত হয়।

প্রশ্বাসবায়ুতে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ 5 শতাংশের অধিক বৃদ্ধি পেলে নিয়ন্ত্রণপ্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, রক্তে কার্বনডাইঅক্সাইড জমা হতে থাকে এবং রক্ত অম্লধর্মী (acidotic) হয়ে পড়ে।

3. **হাইড্রোজেন আয়ন ঃ** রক্তে H^+ আয়নের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধিতে শ্বাস-ক্রিয়ারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কার্বনডাইঅক্সাইডের মত H^+ আয়নের পরিবর্তন সরাসরি শ্বাসকেন্দ্রে অথবা আওর্টিক ও ক্যারোটিড বডির মাধ্যমে ক্রিয়া করে শ্বাসকার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তে অম্লের আধিক্য হলে (acidosis) শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং অধিক কার্বনডাইঅক্সাইড ফুসফুস থেকে নির্গত হয়। বায়ুথলীর কার্বনডাইঅক্সাইডের পার্শ্বচাপ হ্রাস পায়, ফলে অধিক পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইড রক্তসংবহন থেকে ফুসফুসে প্রবেশ করে। এভাবে রক্তে H^+ আয়নের তীব্রতা হ্রাস পায়।

রক্তে ক্ষারাধিক্যে (alkalosis) বিপরীত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

কিছুসংখ্যক অস্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া

Some Abnormal Respiration

1. **শ্বসনবিরতি** (Apnoea) ঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার খানিক বিরতিকে **শ্বসনবিরতি** বলা হয়। সাময়িক শ্বসনবিরতি বিভিন্ন অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। রক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের পার্শ্বচাপের হ্রাস, খাদ্যবস্তুর গলাধঃকরণ, হঠাৎ রক্তচাপবৃদ্ধি, ভেগাস স্নায়ুস্থিত সংজ্ঞাবহ স্নায়ুতে উদ্দীপনা-প্রয়োগ বা অ্যাড্রেন্যালিন ইন্জেকশন ইত্যাদি কারণে সাময়িক শ্বসনবিরতি ঘটে। প্রায় প্রতিটি ঘটনাই প্রতিবর্ত শ্বসনবিরতির (reflex apnoea) উদাহরণ। কোন কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় (চেইনি-স্টোকস) শ্বাসক্রিয়া ও শ্বসন-বিরতি পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়।

2. **বর্ধিত শ্বসন** (Hyperpnoca) ঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধিকে **বর্ধিত শ্বসন** বলা হয়। বর্ধিত শ্বসনে অক্সিজেনের গ্রহণ বা কার্বনডাই-অক্সাইডের বর্জন পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত শ্বসনের জন্য দায়ী কারণসমূহের মধ্যে আছে ঃ (1) পেশীসঞ্চালন, (2) রক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের আধিক্য, (3) অক্সিজেনের অভাব, (4) স্বতঃপ্রবৃত্তি, (5) মানসিক আবেগ ইত্যাদি কারণে শ্বাসকেন্দ্রের উপর গুরুমস্তিষ্কের প্রভাব, (6) শ্বাসকেন্দ্রের উপর হাইপোথালামাসের প্রভাব, (7) চার্ম উদ্দীপনা (যন্ত্রণা, উত্তাপ, ঠান্ডা ইত্যাদি) থেকে উৎপন্ন প্রতিবর্ত, (8) রক্তচাপের হ্রাসপ্রাপ্তি, (9) H^+ আয়নের তীব্রতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

3. **ক্লেশদায়ক শ্বসন** (Dyspnoea) : শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি যখন অস্বস্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক হয় তখন তাকে **ক্লেশদায়ক শ্বসন** বলা হয়। ফুসফুসীয় বায়ু-চলন যখন স্বাভাবিকের চেয়ে 4 থেকে 5 গুণ বৃদ্ধি পায় ও বায়ুধারকত্বের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন ক্লেশদায়ক শ্বসন শুরু হয়। শ্বাসকেন্দ্রের অত্যধিক সক্রিয়তা প্রধানত ক্লেশদায়ক শ্বসনের জন্য দায়ী। শ্বাসকেন্দ্রকে সরাসরি বা স্নায়ুর মারফৎ যেসব কারণ উদ্দীপিত করে এবং ক্লেশদায়ক শ্বসনের উদ্ভব ঘটায় তাদের মধ্যে প্রধান : (1) রক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের আধিক্য, (2) H^+ আয়নের তীব্রতাবৃদ্ধি, (3) অক্সিজেনের অভাব, (4) আন্তরযন্ত্র বা দেহের অন্যান্য অংশ অথবা গুরুমস্তিষ্কস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র থেকে উৎপন্ন স্নায়ু-উদ্দীপনা, (5) হেরিংব্রুয়ার প্রতিবর্তের অত্যধিক সক্রিয়তা ইত্যাদি।

যে সব অস্বাভাবিক বা অসুস্থ অবস্থা ক্লেশদায়ক শ্বসনের সংগে জড়িত তাদের মধ্যে আছে : (1) ফুসফুসের ব্যাধি (শোথ, রক্তাধিক্য,[1] প্রদাহ, তন্তু-ময়তা[2] ইত্যাদি) : এই অবস্থায় ফুসফুসের প্রসারণক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায়। হেরিং-ব্রুয়ার প্রতিবর্ত অস্বাভাবিকভাবে সংবেদনশীল হয়। (2) হাঁপানিরোগ (asthma), স্বরযন্ত্র ও ক্লোমশাখার প্রতিবন্ধকতা (obstruction), (3) মধ্যচ্ছদা ও আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশীর পক্ষাঘাত (poliomyelitis), (4) কার্বনমনোক্সাইডের বিষক্রিয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতা ইত্যাদিতে প্রশ্বাসবায়ুতে গ্যাসীয় পার্শ্বচাপের হ্রাস, (5) রক্তাল্পতা (6) রক্তাধিক্য-জনিত হৃদ্‌রোগ (congestive heart failure), (7) রক্তে অম্লাধিক্য (acidosis), (8) বিপাকক্রিয়ার হারবৃদ্ধি, (9) স্নায়ুজ অবস্থা : মানসিক আবেগজনিত বিকৃতি, মৃগীরোগ (hysteria), মস্তিষ্কপ্রদাহ (encephalitis), স্নায়বিক দুর্বলতা (neurasthenia), গুরুমস্তিষ্কের টিউমার, শোথ, রক্তক্ষরণ ইত্যাদি।

4. **অক্সিজেন অভাব** (Hypoxia) : রক্তে অক্সিজেনের স্বাভাবিক পরিমাণ হ্রাস পেলে যে অবস্থায় সৃষ্টি হয় তাকে **অক্সিজেন অভাব** নামে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন কারণে দেহে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিতে পারে।

1. Congestion
2. Fibrosis

অক্সিজেন-অভাবকে 4 ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়ঃ (a) অভাব-জনিত অক্সিজেন-অভাব (anoxic anoxia বা ধমনীগত অক্সিজেন-অভাব) (arterial hypoxia) (b) রক্তাল্পতা-জনিত অক্সিজেন-অভাব (anemic hypoxia), (c) কলাকোষের বিষক্রিয়া-জনিত অক্সিজেন-অভাব (histotoxic hypoxia), (d) শ্লথগতিজ অক্সিজেন-অভাব (hypokinetic hypoxia)।
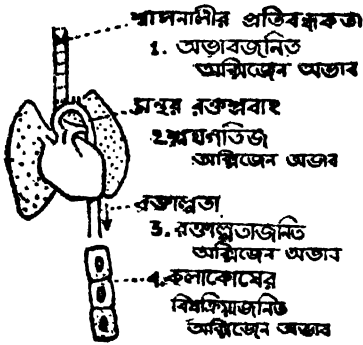
14-22 নং চিত্রঃ হাইপোক্সিয়ার বিভাগ।

(a) **অভাবজনিত অক্সিজেন অভাবঃ** ফুসফুসে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন-সংপৃক্তি অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ হলে এ জাতীয় অক্সিজেনঅভাব পরিলক্ষিত হয়। নিউমোনিয়া, ফুসফুস-প্রদাহ, হাঁপানিরোগ, ফুসফুসীয় শোথ, শ্বাসনালীর প্রতিবন্ধকতা, প্রশ্বাসবায়ুতে কার্বনমনোক্সাইড (CO), নাইট্রিক অক্সাইড (NO) প্রভৃতির উপস্থিতি, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় অবস্থান, হৃৎপিণ্ডের বাম পার্শ্বের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ (হৃদ্‌রোগ) প্রভৃতি কারণ প্রধানত এর জন্য দায়ী।

(b). **রক্তাল্পতাজনিত অক্সিজেনঅভাবঃ** রক্তাল্পতায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ হ্রাস পায় বলে রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়া নাইট্রিক অক্সাইড, কার্বনমনোক্সাইড, সাল্‌ফোন্যামাইড (sulfonamides) প্রভৃতির দ্বারা রক্ত দূষিত হলে এ জাতীয় অক্সিজেন-অভাব দেখা যায়। এই পদার্থগুলো হিমোগ্লোবিনের সংগে সংযুক্ত হয়ে থাকে বলে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন-পরিবহনক্ষমতা হ্রাস পায়।

(c) **কলাকোষের বিষক্রিয়াজনিত অক্সিজেনঅভাবঃ** সায়নাইড (cyanide), চেতনানাশক ভেষজ (nacrotics) প্রভৃতি কলাকোষের জারণক্রিয়া বিনষ্ট করে, ফলে কলাকোষ রক্তের অক্সিজেনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে অসমর্থ হয়। এ জাতীয় অক্সিজেনঅভাবে রক্তের অক্সিজেন-সংপৃক্তি স্বাভাবিক থাকে।

(a) **শ্লথগতিজ অক্সিজেন অভাবঃ** রক্তস্রাব, রক্তাধিক্যজনিত হৃদ্‌রোগ (congestive heart failure), শল্যচিকিৎসাজাত অভিঘাত (surgical shock), শিরারক্তের প্রত্যাবর্তনে প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি কারণে রক্তসংবহন মন্থর

হয়ে পড়ে। ফলে রক্তের অক্সিজেন-সংপৃক্তি ও মোট পরিমাণ স্বাভাবিক হলেও কলাকোষের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন-সরবরাহ ব্যাহত হয়। কলাকোষ তাই এ জাতীয় অক্সিজেন অভাবের সম্মুখীন হয়।

5. **শ্বাসরোধ** (Asphyxia)ঃ রক্তের অক্সিজেন-সংপৃক্তি অস্বাভাবিক-ভাবে হ্রাস পেলে এবং এই অবস্থা কিছুক্ষণ ধরে চলতে দিলে প্রাণীদেহে যেসব বিকারদশার উদ্ভব হয় এবং যার ফলে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে, সম্মিলিতভাবে তাদের শ্বাসরোধ বলা হয়। শ্বাসরোধকে দুভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়ঃ (1) সাধারণ শ্বাসরোধ (গলাটিপে ধরা, শ্বাসনালীর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি) এবং (2) অংগগত শ্বাসরোধ (দেহের কোন অংশের রক্তবাহে প্রতি-বন্ধকতা সৃষ্টি ইত্যাদি)।

শ্বাসরোধে যেসব বিকারদশার উদ্ভব হয় তাকে 3টি পর্যায়ে ভাগ করা যায় : (i) বর্ধিত শ্বসনদশা (stage of hyperpnoea), (ii) কেন্দ্রীয় উদ্দীপনদশা (stage of central excitation) এবং (iii) কেন্দ্রীয় প্রশমন দশা (stage of central depression)। এদের স্থিতিকাল যথাক্রমে 1 মিনিট, 1-2 মিনিট এবং 2-3 মিনিট।

বর্ধিত শ্বসনদশা বা প্রথম পর্যায়ঃ এই পর্যায়ে শ্বাসক্রিয়ার হার ও গভীরতা বৃদ্ধি পায়। প্রথমে প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসক্রিয়া সমহারে বৃদ্ধি পেলেও পরে নিঃশ্বাসক্রিয়া অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের আধিক্যই প্রধানত এর জন্য দায়ী।

কেন্দ্রীয় উদ্দীপনদশা বা দ্বিতীয় পর্যায় : এই পর্যায়ে নিঃশ্বাসক্রিয়া আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং প্রতি নিঃশ্বাসে সমগ্র দেহ আন্দোলিত হতে থাকে। কেন্দ্রীয় স্নায়বিক উদ্দীপনা অধিকতর প্রকট হয়ে উঠে। বাহসংকোচন, রক্তচাপের বৃদ্ধি, লালাক্ষরণ, চোখের তারার সংকোচন প্রভৃতি দেখা যায়। এছাড়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনহার, অন্ত্রের বিচলন প্রভৃতি পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। অধিকতর অক্সিজেনের অভাব এবং দেহ-আন্দোলনের (convulsion) ফলে ল্যাকটিক অ্যাসিডের আধিক্য শ্বাসকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করে এবং এসব পরিবর্তন ঘটায়। প্রাণীর চেতনাশক্তি লোপ ।।য়।

কেন্দ্রীয় প্রশমনদশা বা তৃতীয় পর্যায়ঃ এই পর্যায়ে স্নায়বিক নিষ্ক্রিয়তা প্রকট হয়ে ওঠে, দেহ-আন্দোলন নিবৃত্ত হয় এবং প্রশ্বাসক্রিয়া গভীর ও মন্থর হয়। প্রতি প্রশ্বাসক্রিয়ায় প্রাণী খিঁচুনিসহ অংগপ্রত্যংগ টান টানভাবে

প্রসারিত করে এবং মুখব্যাদান করে শ্বাসগ্রহণের চেষ্টা করে। স্নায়বিক নিষ্ক্রিয়তার ফলে রক্তবাহের প্রসারণ, রক্তচাপের অবনতি, চোখের তারার প্রসারণ ইত্যাদি সুস্পষ্ট হয়ে পঠে। প্রাণী অন্তিম শ্বাসগ্রহণের চেষ্টা করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রধানত শ্বাসকেন্দ্রের ওপর অক্সিজেনের প্রত্যক্ষ সক্রিয়তার ফলে এসব পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

6. **নীলব্যাধি** (Cyanosis) : যেসব রোগে বা অস্বাভাবিক অবস্থায় দেহের ত্বক বা শ্লেষ্মাঝিল্লি নীলাভ বর্ণ ধারণ করে তাকে নীলব্যাধি বলা হয়। নীলব্যাধি সাধারণ বা অসংগত হতে পাবে। সাধারণ নীলব্যাধিতে গণ্ডদেশ, ওষ্ঠ, নাসিকা, হাত, পা, কান প্রভৃতি নীলবর্ণ ধারণ করে। রক্তে অত্যধিক বিজারিত হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতি প্রধানত এই অবস্থার জন্য দায়ী।

যে সব কারণ নীলব্যাধির জন্য প্রধানত দায়ী তাদের মধ্যে প্রধান : ফুসফুসের রোগ, শ্বাসনালী ও ক্লোমশাখার প্রতিবন্ধকতা, কার্বনমনোক্সাইডের বিষক্রিয়া, জন্মগত শৈত্যস্পর্শ, অংগগত শৈত্যস্পর্শ, শিরারক্তের প্রতিবন্ধকতা, কলাকোষের অত্যধিক অক্সিজেন-ব্যবহার ইত্যাদি।

7. **ক্রমশ্বসন** (Periodic breathing) : কোন কোন অবস্থার শ্বাসক্রিয়া অবিন্যস্ত বা পর্যায়ক্রমিক হয়। **কেইনি-স্টোক্‌স্ শ্বসন** (Cheynestokes
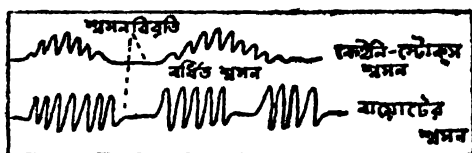
14-23 নং চিত্র : ক্রমশ্বসন।

breathing) এবং **বায়োটের শ্বসন** (Biot's breathing) এই পর্যায়ে পড়ে। কেইনি-স্টোকস্ শ্বসনে পর্যায়ক্রমে বর্ধিত শ্বসন ও শ্বসনবিরতি ঘটতে দেখা যায়। শ্বসনবিরতির পরই শ্বাসক্রিয়া পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে চরম অবস্থায় পৌঁছয়, এরপর একইভাবে হ্রাস পায় (14-23 নং চিত্র)। বায়োটের শ্বসনে শ্বাসক্রিয়া পর্যায়ক্রমিক হলেও বর্ধিত শ্বসন ও শ্বসনবিরতির স্থিতিকাল ভিন্ন হয়। বায়োটের শ্বসন প্রধানত মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ রোগে (meningitis) ও অন্যান্য রোগে দেখতে পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে কেইনে-স্টোক্‌স শ্বসন কোন

2. গ্রীক, Cyanos=নীলবর্ণ।

কোন রোগে যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অবস্থাও (সুস্থ শিশু বা ঘুমন্ত বয়স্ক লোকে) দেখা যায়।

আবহসহিষ্ণুতা

Acclimatization

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় নূতন জলবায়ুতে নিজেকে উপযোগী করে তোলার জন্য মানুষের দেহে যে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন আসে তাকে **আবহসহিষ্ণুতা** বলা হয়। পর্বতারোহণের সময় এজাতীয় পরিবর্তন অগ্রাধিকার লাভ করে এবং দেহকে পরিবেশের উপযোগী করে তোলে। তবে এজাতীয় পরিবর্তন শুধুমাত্র মাঝারি ধরনের উচ্চতা (10000-14000 ফুট) ও মন্থর পর্বত আরোহণেই সম্ভবপর। এর উর্ধ্বে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের পরিধি সীমিত হয়ে পড়ে। বায়ুচাপের চেয়েও অক্সিজেনের অভাব সে ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে।

14-24নং চিত্রে বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুচাপ ও অক্সিজেনের পার্শ্বচাপের সংগে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের সীমারেখার সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। ফুসফুসে
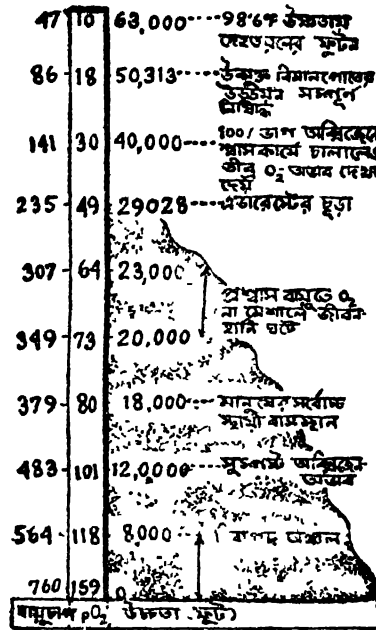
14-24 নং চিঃ পর্বত উচ্চতার সংগে শ্বসনের সম্পর্ক।

রক্তের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেনের সংযুক্তির জন্য অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ প্রায় 80 মিলিমিটার পারদচাপের সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। একমাত্র 18000 ফুট উচ্চতায়ই তা সম্ভপর। 36,000 থেকে 37,000 ফুট উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের সরবরাহ চালু রাখলেও মানুষের চাহিদার পক্ষে তা মোটেই পর্যাপ্ত হয় না, কারণ ফুসফুসীয় বায়ুথলীতে বাষ্পচাপ (vapour pressure) সর্বক্ষণ প্রায় 47 মিলিমিটার পারদচাপের সমান থাকে। এই চাপের সংগে বায়ুথলীয় কার্বনডাইঅক্সাইডের পার্শ্বচাপ (আবহসাহিষ্ণুতা

পারদস্তম্ভীর মধ্যে বা 40-54 মিলিমিটার পারদচাপে পরিবর্তিত হয়) এবং অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ যোগ করলে সম্মিলিতভাবে (47+40+80=167) এই উচ্চতায় শুধুমাত্র বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান হয় (14-24 নং চিত্র)। আবার 63000 ফুট উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ 47 মিলিমিটার পারদচাপের সমান। এই উচ্চতার ঊর্ধ্বে মানুষের রক্ত ফুটতে আরম্ভ করে। গাইটন (Guyton) হিসাব করে দেখেছেন 70,000 ফুট উচ্চতায় হঠাৎ একজন লোককে উত্তোলন করলে মৃত্যুর মিনিট তিনেক আগে তার ফুসফুস থেকে প্রায় 4 পাউণ্ড জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যাবে।

আবহসহিষ্ণুতায় শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন : আবহসহিষ্ণুতায় দেহে দুধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় : (1) আশু পরিবর্তন (immediate changes) এবং (2) বিলম্বিত পরিবর্তন (delayed changes)।

1. **আশু পরিবর্তন :** রক্ত, রক্তসংবহন, শ্বাসক্রিয়া ও বৃক্কে আশু পরিবর্তন বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। রক্তের পরিমাণ ও হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় রক্তের অক্সিজেন-ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্লীহা-সংকোচনের ফলে প্লীহাস্থিত সঞ্চিত রক্ত সংবহনে নিক্ষিপ্ত হয় এবং রক্তপরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে।

রক্তসংবহনতন্ত্রে যে সব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে প্রধান হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনহার, মিনিট-পরিমাণ ও রক্তচাপের বৃদ্ধি। বাহনিয়ামক কেন্দ্রের সক্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে রক্তপ্রবাহের সংকোচন ঘটে। তাছাড়া রক্তের গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

শ্বাসক্রিয়ার পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে, ফুসফুসীয় বায়ুচলন ও ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধি। ফুসফুসের বায়ুচলনের বৃদ্ধিতে অধিক কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গত হয়। রক্ত অধিকতর ক্ষারধর্মী হয়ে পড়ে এবং মূত্রে অধিক ক্ষারকীয় পদার্থ নির্গত হয়। এছাড়া মূত্রে ইউরিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং অ্যামোনিয়া-লবণের পরিমাণ হ্রাস পায়।

2. **বিলম্বিত পরিবর্তন :** বিলম্বিত পরিবর্তনের মধ্যে প্রধানত অস্থি-মজ্জায় পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোহিতমজ্জা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে লোহিতকণিকার উৎপাদন ও রক্তে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। প্রতি ঘনমিলিমিটারে লোহিতকণিকার সংখ্যা 6 থেকে 8 মিলিয়ন (60-80 লক্ষ) পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রক্তসংবহনে অনেক অপরিণত লোহিতকণিকার উপস্থিতি

লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়ত, বেশী দিন অধিক উচ্চতায় বসবাস করলে ফুসফুসের বায়ুধারকত্ব বৃদ্ধি পায়।

পর্বতপীড়া (Mountain sickness) : প্রায় 18000 ফুট উচ্চতা পর্যন্ত আবহসহিষ্ণুতা সম্ভবপর। এর উর্ধ্বে বসবাসের চেস্টা করলে যে সব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে প্রধান : (1) শিরঃপীড়া, (2) বমি বমি ভাব, (3) কষ্টদায়ক শ্বসন, (4) বুকে ব্যথা, (5) হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনহার বৃদ্ধি, (6) হাঁপানি, (7) অনিদ্রা, (8) ক্ষুধামান্দ্য, (9) দেহের ওজন হ্রাস (10) দুর্বলতা, (11) নিদ্রালুতা ইত্যাদি। দৈহিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সংগে চেতনালোপও ঘটতে পারে।

কেইসোন-পীড়া
Caisson Disease

জলের নীচে কাজ করার জন্য স্টীলের দ্বারা বিশেষভাবে নির্মিত জলাভেদ্য কক্ষে প্রযুক্ত উচ্চ বায়ুচাপে লোককে কাজ করতে দিলে শুরুতে তার কোনপ্রকার অসুবিধা হয় না। অবশ্য সাময়িক মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা, শ্বাসক্রিয়ার হ্রাস প্রাপ্তি, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনহার কমে যাওয়া, প্রস্রাবের প্রবণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি উপসর্গও দেখা দিতে পারে। তবে প্রকৃত বিপত্তি দেখা দেয় তখনই যখন লোকটিকে প্রযুক্ত উচ্চ বায়ুচাপসম্পন্ন কক্ষ থেকে হঠাৎ স্বাভাবিক বায়ুচাপে তুলে আনা হয়। এই অবস্থায় তার মধ্যে যে সব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাকে সম্মিলিতভাবে **কেইসোন পীড়া** বলা হয়। মৃদু কেইসোন-পীড়ায় দেহসন্ধিতে ব্যথা অনুভূত হয় এবং হাত-পা গুটিয়ে রাখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তীব্র কেইসোন পীড়াতে যে সব পরিবর্তন দেখা যায় তার মধ্যে আছে : (a) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি, বিশেষ করে পায়ের পক্ষাঘাত, (b) ক্ষুদ্র রক্তজালিকায় রক্তসংবহনে বাধা সৃষ্টি, (c) মৃদু হৃৎস্পন্দন, (d) চেতনালোপ এবং (e) মৃত্যু পর্যন্ত ঘটা ইত্যাদি।

এসব পরিবর্তনের প্রধান কারণ নিম্নরূপ : প্রযুক্ত উচ্চচাপে রক্তে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস দ্রবীভূত থাকে। যেমন, কোন লোককে 5000 মিলিমিটার উচ্চ পারদচাপে কাজ করতে দিলে তার রক্ত ও দেহরস যখন বায়ুথলীয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পার্শ্ব-

1. caisson=জলের নীচে বসে কাজ করার সময়ে কর্মীকে যে জলাভেদ্য কক্ষের মধ্য অবস্থান করতে হয় তাকে কেইসোন বলা হয় (ল্যাটিন)।

চাপের সংগে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন এই রক্ত ও দেহরসে বিভিন্ন গ্যাসের যে পার্শ্বচাপ (মিলিমিটার পারদে) লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নরূপ : বাষ্পচাপ 47 মিলিমিটার, কার্বনডাই অক্সাইড 40 মিলিমিটার, অক্সিজেন 40 মিলিমিটার এবং নাইট্রোজেন 3918 মিলিমিটার (সম্মিলিতভাবে যা 8000 মিলিমিটারেরও অধিক)। বহিঃস্থ পার্শ্বচাপ অধিক হওয়ায় এরা দেহের কলাকোষে পরিবাহিত হয়। ফলে রক্ত ও দেহরসে অধিক গ্যাস দ্রবীভূত হলেও তারা কোনপ্রকার বুদবুদ সৃষ্টি করতে পারে না। এই লোকটিকে হঠাৎ স্বাভাবিক বায়ুচাপে (760 মিলিমিটার পারদচাপে) তুলে আনলে বহিঃস্থ বায়ুচাপ দ্রবীভূত গ্যাসের চাপের কম হওয়ায় দেহের অভ্যন্তরে সর্বত্র গ্যাসীয় বুদবুদ উৎপন্ন হয়।
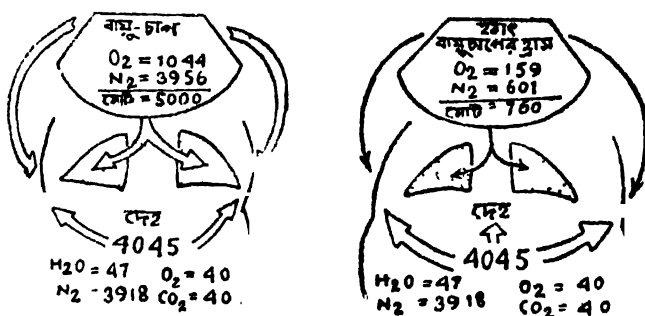
14-25 নং চিত্র : বায়ুচাপ।

গ্যাসীয় অক্সিজেন কলাকোষেব দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারলেও নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হতে পারে না, ফলে নাইট্রোজেন বুদবুদ রক্তজালিকার পথ বন্ধ করে প্রতি-বন্ধকতার সৃষ্টি করে হৃৎপিণ্ডে জমা হয়, ফলে রক্তসংবহন ব্যাহত হয়। ফুস-ফুসীয় রক্তজালিকায় বুদবুদ জমা হয়ে ফুসফুসীয় শোথ উৎপন্ন করে। মস্তিষ্ক রক্তবাহে বুদবুদ জমা হয়ে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতিসাধন করতে পারে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে স্নেহদ্রব্যের পরিমাণ বেশী থাকায় সেখানে উচ্চ চাপে জলের চেয়েও 5 গুণ বেশী নাইট্রোজেন দ্রবীভূত হিসাবে থাকে। অতএব হঠাৎ চাপ হ্রাস পেলে সেখানে অধিক বুদবুদের সৃষ্টি হয় যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে পক্ষাঘাত সৃষ্টি করে। চেতনালোপের সংগেও একই কারণ জড়িত। প্রান্তীয় স্নায়ুকেন্দ্র বা মেরুদণ্ডে বুদবুদ সৃষ্টির ফলে সাময়িক পক্ষাঘাতের আবির্ভাব ঘটে। মস্তিষ্কে বুদবুদের সৃষ্টিতে চিত্তভ্রংশ (dementia) প্রভৃতি মস্তিষ্ক-বিকৃতির উদ্ভব ঘটে।

মুদু কেইসোন পীড়ায় দেহের যে সব অঞ্চল থেকে সহজে বুদ্‌বুদ্‌ নির্গত হতে পারে না, সেসব স্থানে (যেমন—সন্ধি, অস্থি ইত্যাদি) ব্যথা অনুভূত হয়। তাছাড়া স্নায়ু-আবরণীতে (nerve sheaths) বুদ্‌বুদ্‌ জমা হয়ে ব্যথার সৃষ্টি করতে পারে বা স্নায়ুতে সাময়িক বা স্থায়ী বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

এই অবস্থা থেকে রেহাই পেতে গেলে লোকটির চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুচাপকে পর্যায়ক্রমে হ্রাস করে স্বাভাবিক চাপে নিয়ে আসতে হয়। কেইসোন-পীড়ার উপসর্গ দেখা দিলে পুনরায় বায়ুচাপ বৃদ্ধিকরে (যাতে বুদ্‌বুদ্‌ পুনরায় দ্রবীভূত হয়) এই ব্যবস্থা নিতে হয়।

কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া
Artificial Respiration

জলে ডোবা, ইলেকট্রিক শক্‌-খাওয়া, কার্বনমনোক্সাইড বিষক্রিয়া প্রভৃতি সংকটময় মুহূর্তে জীবনরক্ষার প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। তাছাড়া অবেদনিক ওষুধের প্রয়োগের সময় কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, কারণ এই ওষুধ মধ্যচ্ছদাসমেত সমস্ত ঐচ্ছিক পেশীকে নিঃসাড় করে ফেলে। এসব ক্ষেত্রে হৃৎপিন্ড সক্রিয় থাকলেও শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য তাই ফুসফুস ও রক্তসংবহনে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটিয়ে শ্বাসকেন্দ্র ও হৃৎপিন্ডের প্রাণশক্তি বজায় রাখা এবং ফুসফুসকে পর্যায়ক্রমে বায়ু-স্ফীতি ও সংকুচিত করে শ্বাসকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করা, যাতে সে তার নিজস্ব স্বাভাবিক সক্রিয়তা ফিরে পেতে পারে। অতএব কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া এমন হওয়া উচিত, যাতে (a) ফুসফুসে বায়ুচলন পর্যাপ্ত হয়, (b) শ্বাসনালী যথাসম্ভব উন্মুক্ত থাকে এবং (c) ফুসফুসে বায়ুচলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।

কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার বিভিন্ন **পদ্ধতি** (Methods of artificial respiration): কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়াকে দুভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা চলে. (1) হস্তকৃত পদ্ধতি এবং (2) যান্ত্রিক পদ্ধতি।

1. **হস্তকৃত পদ্ধতি** (Manual methods): (a) **ইভের দোলন পদ্ধতি** (Eve's rocking methods): এই পদ্ধতিতে রোগীকে কোন এক ধরনের স্ট্রেচারে উপুড় করে বাঁধা হয় (14-26 নং চিত্র)। এরপর তার মাথা ও পায়ের দিককে পর্যায়ক্রমে 45 ডিগ্রী কোণে উপর ও নীচে দোলান হয়। প্রতি

মিনিটে এভাবে 8 থেকে 9টি দোলন দেওয়া হয়। প্রতি 7 সেকেন্ড স্থায়িত্বসম্পন্ন দোলনকালে মাথাকে অন্তত 4 সেকেন্ড এবং পায়েব দিককে 3 সেকেন্ড নীচের দিকে রাখতে হয়। মাথাব দিক নীচের দিকে থাকাকালে উদরাংগ মধ্যচ্ছদাকে উপরের দিকে ঠেলে দেয়, ফলে ফুসফুস থেকে বায়ু নির্গত হয়। পায়ের দিককে নীচে অবস্থান করতে দিলে মধ্যচ্ছদা নীচের দিকে নেমে আসে এবং প্রশ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

14 26 নং চিত্র: ইভের দোলনপদ্ধতি।
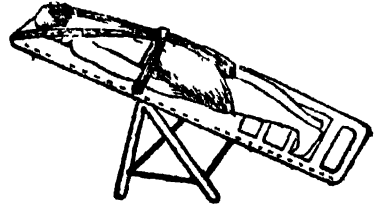
(b) **মুখ-থেকে-মুখ পদ্ধতি** (Mouth-to-mouth method): হস্তকৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এই পদ্ধতি উৎকৃষ্ট, কারণ এই পদ্ধতিতে সর্বক্ষেত্রে ফুসফুসীয বায়ুচলন বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রসারিত-মস্তক বোগীকে প্রথমে চিৎ করে শোযানো হয এবং তার নীচের চোযালকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ ও তর্জনীর দ্বারা চেপে ধরে অন্য বৃদ্ধাংগুষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্যে বোগীব নাসাবন্ধ্র চেপে বন্ধ কবে দেওযা হয। এবপব রোগীর মুখে মুখ লাগিয়ে স্বাভাবিক-প্রবাহী বাযুপরিমাণের দ্বিগুণ পরিমাণ বাযুকে জোর করে তার ফুসফুসে প্রবেশ কবানো হয (14-27 নং চিত্র)। ফলে ফুসফুস ও বক্ষ প্রসারিত হয। এরপবই মুখ সরিযে নিযে পুনরায একই ভাবে জোর কবে রোগীর দেহে বায়ু প্রবেশ কবানো হয। মিনিটে 14-28 বাব এই প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন কবা বাঞ্ছনীয়।

14-27 নং চিত্র:

(c) **হোলজার নেইলসেন পদ্ধতি** (Holger-Nielsen method): এই পদ্ধতিতে হাতের কনুইকে ভাঁজ করে, বাহু দুটোকে ঘাড়ের সংগে জোর করে চেপে, বোগীকে উপুড় করে শুইযে দেওয়া হয এবং মাথাকে কাত কবে হাতেব উপর তুলে দেওয়া হয। তাব আগে মুখগহবরে শ্লেষ্মা, জল ইত্যাদি পবিষ্কার করে নিতে হয়। পবিচালক এরপর রোগীব মাথার দিকে হাঁটু গেড়ে বসে তার প্রসারিত দুটো হাত বোগীর পিঠের দুপাশে স্থাপন করে ধীরে ধীরে সামনেব দিকে ঝুঁকে নিজের পুরো দৈহিক ওজন তার পিঠের ওপর চাপিয়ে

দেয়। এই চাপে বক্ষগহ্বর সংকুচিত হয় এবং ফুসফুসের বায়ু নির্গত হয় (নিঃশ্বাসক্রিয়া)। পরিচালক এরপর সোজা হয়ে ওঠে এবং রোগীর বাহু দুটোকে কনুইয়ের উপর ধরে সামনের দিকে টেনে নেয়। ফলে স্বাভাবিক প্রশ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া প্রতি মিনিটে পর্যায়ক্রমে 10 থেকে 90 বার সম্পন্ন করতে হয়।

2. **যান্ত্রিক পদ্ধতি** (Instrumental method) : এ সব পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতির সুবিধে হল, দীর্ঘ সময় ধরে এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া চালানো যায় এবং অক্সিজেন সরাসরি দেহে প্রবেশ করানো সম্ভবপর হয়।

(a) **ড্রিংকারের পদ্ধতি** (Drinker's method) : এই পদ্ধতিতে রোগীর মস্তককে শুধুমাত্র বাইরে রেখে সমগ্র দেহকে একটা বায়ু-নিরোধক কক্ষে প্রবেশ করানো হয়। এরপর কক্ষের সংগে সংযুক্ত একটি যান্ত্রিক পাম্পের সাহায্যে কক্ষের বায়ুচাপকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস করা হয়। বায়ুচাপ হ্রাস পেলে রোগীর ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে এবং বৃদ্ধি পেলে নির্গত হয়। এভাবে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা চালানো সম্ভবপর হয়।

(b) **সবিরাম বায়ুস্ফীতি পদ্ধতি** (Intermittent inflation method) : পরীক্ষাগারে মনুষ্যেতর কোন প্রাণীকে নিয়ে পরীক্ষা চালানোর সময় এই পদ্ধতি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাণীর শ্বাসনালীতে সরাসরি পাম্পের নল প্রবেশ করিয়ে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুকে ছ'-স পাম্পের সাহায্যে ফুসফুসে প্রবেশ করানো হয়। যান্ত্রিক পাম্পের সংগে তাল রেখে শ্বাসনালীর সংগে বাঁধা নলের পার্শ্বনালী দিয়ে বায়ু ফুসফুস থেকে নির্গত হয়। পর্যায ক্রমে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

নবজাতকের কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা : ভূমিষ্ঠ হবার পরও যে সব শিশুর শ্বাসক্রিয়া বন্ধ থাকে, তাদের ক্ষেত্রে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রধানত নবজাতকের পা দুটোকে চেপে ধরে মাথাকে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং পৃষ্ঠদেশে মৃদু আঘাত করা হয়, ফলে তার শ্বাসক্রিয়া সক্রিয়তালাভ করে। মস্তক নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখলে মস্তিষ্কে অধিক রক্ত জমা হয়, যা শ্বাসকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করে। পৃষ্ঠদেশে মৃদু আঘাতে প্রতিবর্ত উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং শ্বাসক্রিয়ার স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। মুখের সাহায্যে বা পাম্পের দ্বারা নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে ফুসফুসে কার্বনডাইঅক্সাইড

প্রবেশ করালে শ্বাসকেন্দ্র উদ্দীপিত হয় এবং শ্বাসক্রিয়া ফিরে আসে। মাতৃসদনে আরও বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. শ্বাসক্রিয়া বলতে কী বুঝায়? চিত্রসহ শ্বাসযন্ত্রের শারীরস্থান ও আণুবীক্ষণিক গঠনের বর্ণনা দাও।

2. মধ্যচ্ছদার পরিবর্তনসহ প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস প্রক্রিয়ার বর্ণনা কর। (C.U.'72,'77)

3. (a) শ্বসনপেশীর ভূমিকার উল্লেখসহ স্বাভাবিক প্রশ্বাসক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(b) হেরিং-ব্রয়ার প্রতিবর্ত এবং শ্বাসক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। (C.U.'81)

4. প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসক্রিয়ার সংগে জড়িত পেশীসমূহ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী চেষ্টীয় স্নায়ুর নাম লিখ। শ্বাসক্রিয়ার সংগে জড়িত রসায়ন-গ্রাহক সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার আলোচনা কর। (C. U. H. '81)

5. শ্বাসক্রিয়ার চলন লিপিবদ্ধ করা যায় এমন একটি পরীক্ষার বর্ণনা দাও। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের বায়ুধারকত্বের পরিমাণ কীভাবে করবে? (C.U '66)

6. বায়ুথলীর বায়ু কাকে বলে? প্রশ্বাস বায়ু, নিঃশ্বাস বায়ু এবং বায়ুথলীর বায়ুর উপাদানের পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা কর। মানুষের বায়ুথলীর বায়ুর নমুনা কিভাবে সংগ্রহ করবে? (C.U '77)

7. বায়ুর তিনটি নমুনায় অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইডের শতকরা হার যথাক্রমে (a) 13·2 এবং 5·3, (b) 20·9 এবং 0·04 এবং (c) 25·9 এবং 4·0। এদের কোনটি বায়ুথলীর বায়ুর নমুনা ও কেন?

বায়ুথলীর বায়ু থেকে দেহকলা পর্যন্ত অক্সিজেনের পরিবহন সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C.U.'78)

8. কারণসহ ব্যাখ্যা কর: (a) নিঃশ্বাসবায়ুর চেয়ে বায়ুথলীর বায়ুতে অক্সিজেন বেশী থাকে, (b) ধমনীরক্তের অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ কম, (c) স্বেচ্ছাকৃত বর্ধিত শ্বসনের পর মিনিটকয়েক শ্বসনবিরতি লক্ষ্য করা যায়। (C.U.'75)

9. কলাকোষের শ্বাসক্রিয়া বলতে কী বুঝায়? ফুসফুস থেকে কলাকোষে অক্সিজেনের পরিবহনক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (C.U.'63,'68,'70,'74)

10. রক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিবহন-পদ্ধতি বর্ণনা কর। (C.U '66,'70,'72, C.U.H. '77)

11. বিয়োজন-লেখচিত্র বলতে কী বুঝায়? চিত্রসহ অক্সিজেন বিয়োজন লেখচিত্রের যথাযথ বর্ণনা দাও (C.U.H.'73)। রক্তের অক্সিজেনের পার্শ্বচাপের পরিবর্তনে ইহা কিভাবে পরিবর্তিত হয়? (C.U. H. '71)

12. শ্বাসক্রিয়ার স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। (C.U '65,'71,83)

13. শ্বাসক্রিয়ার রাসায়নিক বর্ণনা দাও। (C U.'71)

14. (ক) হাইপোক্সিয়ার শ্রেণীবিন্যাস কর। (খ) বক্ষগহবর ও ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ চাপের পরিবর্তনসহ স্বাভাবিক শান্ত প্রশ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতির আলোচনা কর। (C U.86)

15 (ক) শ্বাসকেন্দ্র বলতে কি বোঝায়? (খ) রক্তের কার্বনডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের মাত্রার পরিবহনে শ্বাসকেন্দ্রগুলি কিভাবে প্রভাবিত হয়? (গ) ক্লেশদায়ক শ্বসন ঘটার কারণ কি? (C.U. 85)

16 শ্বাসক্রিয়ার স্নায়বিক ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের বর্ণনা দাও। (C U.H'76)

17. শ্বাসক্রিয়ার হার ও গভীরতার নিয়ন্ত্রণে প্রতিবর্তের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C.U.H. '73)

18 হাইপোক্সিয়ার সংজ্ঞা লিখ এবং শ্রেণীবিন্যাস কর। শ্বাসক্রিয়ার উপর হাইপোক্সিয়ার প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ কর। (C.U.'69)

19. দেহের বিভিন্ন তন্ত্রের উপর 'অভাবজনিত অক্সিজেন অভাবের' প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C.U. '71)

20. দেহের বিভিন্ন কলাকোষের উপর হাইপোক্সিয়ার সক্রিয়তার ফলাফলের বর্ণনা কর। অক্সিঅ্যাক্রেস্‌টিয়া কাকে বলে? (C.U.H.'76)

21 আবহসহিষ্ণুতার সময় দেহে লক্ষণীয়ভাবে যে সব আশু ও বিলম্বিত পরিবর্তন সংগঠিত হয় তাদের বর্ণনা দাও। (C.U.'67, '84)

22. শ্বাসক্রিয়ার উপর উচ্চ ও নিম্ন বায়ুচাপের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দাও। (C.U.'65)

23. শ্বাসক্রিয়ার উপর নিম্ন বায়ুচাপের প্রভাব বর্ণনা কর। পর্বতপীড়া ও আবহসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ। (C.U H.'76)

24 কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া বলতে কী বুঝায়? কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা দাও এবং এর মধ্যে কোন্ পদ্ধতি সবচেয়ে ভাল, কারণসহ বিবৃত কর। (C.U.H.'68)

25. টীকা লিখ: (a) প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসবায়ুর উপাদান ('62), (b) ফুসফুসীয় বায়ুধারণক্ষমতা ('70,'77), (c) নিউমোগ্রাম, (d) স্পাইরোমিটার, (e) বায়ুধারকত্ব ('71, '75, '77), (f) ফুসফুসীয় বায়ুচলন, (g) ক্লোরাইড শিফ্‌ট (84), (h) কার্বনডাই-অক্সাইড-বিয়োজন লেখচিত্র, (i) ক্লেশদায়ক শ্বসন ('71), (j) শ্বাসরোধ ('63), (k) নীলব্যাধি, (l) চেইনি-স্টোকস শ্বসন ('76), (m) পর্বতপীড়া ('63), (n) কেইসন-পীড়া ('63, '73), (o) প্রবাহী বায়ুপরিমাণ ('74), (p) হেরিংব্রুয়ার প্রতিবর্ত ('73), (q) পর্বতপীড়ার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ('79), (r) একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের ফুসফুসের বায়ুধারণ ক্ষমতা 5600 মিলি এবং অবশেষ বায়ু পরিমাণ 100 মিলি। তার বায়ুধারকত্ব কত? (C U ,86), (s) ফুসফুসের মোট বায়ুধারণ ক্ষমতা (85)

পনের

রেচন তন্ত্র

EXCRETORY SYSTEM
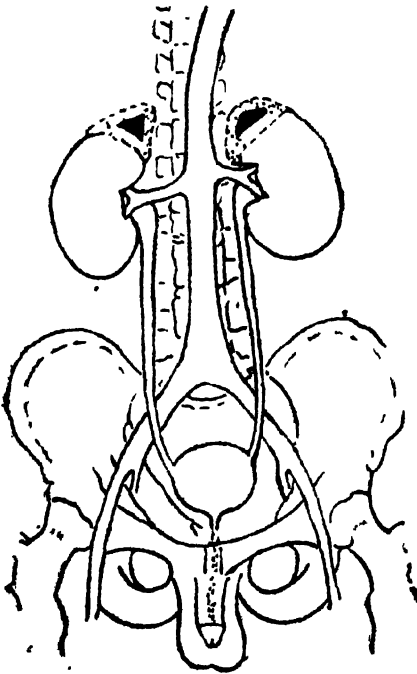
দেহের মধ্যে যে সব বর্জ্য-পদার্থ উৎপন্ন হয়, তারা যাতে দেহে কোন প্রকার বিষক্রিয়া না করতে পারে, তাদের তাই যথা সম্ভব দ্রুত দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত করা প্রয়োজন। দেহের যে সব রেচনতন্ত্র এ কার্যে অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে বৃক্ক, ফুসফুস, ত্বক, পৌষ্টিকনালী, লালাগ্রন্থি ইত্যাদি প্রধান। এদের মধ্যে অন্যতম রেচনযন্ত্র হল বৃক্ক, কারণ শতকরা 75 ভাগ বর্জ্য-দ্রব্য এই অংগটির মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদরা অবশ্য একে শুধুমাত্র রেচনযন্ত্র বলতে রাজী নন, ওঁদের বক্তব্য, বৃক্ক দেহের অন্তর্দেশীয় সাম্যাবস্থা বজায়

রাখার মুখ্য যন্ত্র বিশেষ।

বৃক্ক অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসাবেও কাজ করে এবং রেনিন ও ইরীথ্রোপয়েটিক ফ্যাকটর ক্ষরণ করে।

1. **বৃক্কের শারীরস্থান** (Anatomy of Kidney)ঃ মানুষের এক জোড়া বৃক্ক উদরগহ্বরের পশ্চাদংশে ও মেরুদন্ডের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। প্রতিটি বৃক্ককে লম্বভাবে ব্যবচ্ছেদ করলে তার মধ্যে দুটো অংশ দেখা যায়ঃ (a) গ্রন্থিময় অংশ যা কর্টেক্স ও মেডালা নিয়ে গঠিত, এবং (b) কেন্দ্রীয় সাইনাস। বৃক্ক দুটো প্রায় 20 লক্ষ রেচননালী বা নেফ্রোন (nephron) নিয়ে
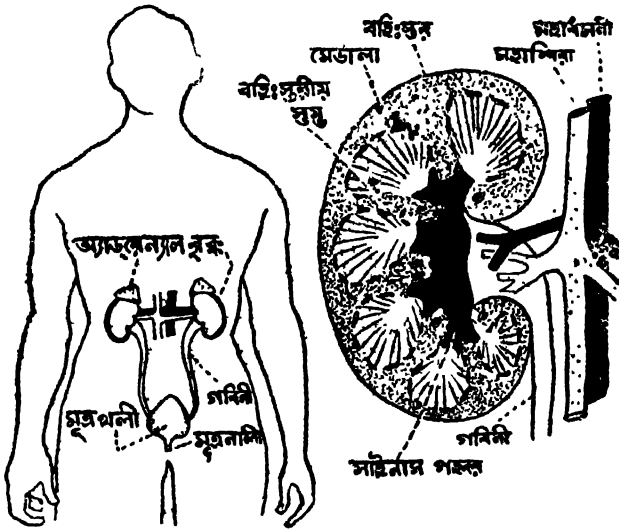
15-2 নং চিত্রঃ বৃক্কের শারীরস্থান।

গঠিত। **নেফ্রোনকে বৃক্কের গঠন ও কার্যসম্পাদনের একক বলা হয়।** বৃক্কের বহিঃস্তরীয় নেফ্রোনসমূহ মেডালাস্থিত সংগ্রহনালীর (collecting ducts) মাধ্যমে সাইনাসগহ্বরে প্রবেশ করে। সাইনাসগহ্বরকে **গবিনির** (ureter) স্ফীতপ্রান্ত বলা চলে। গবিনীর মাধ্যমে মূত্র বৃক্ক থেকে **মূত্রথলীতে** প্রবেশ করে (15-2 নং চিত্র)। মূত্রথলীতে ইহা সঞ্চিত থাকে এবং পরিশেষে মূত্রনালীর মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়।

2. **বৃক্কের কলাস্থানিক গঠন** (Histology of kidney)ঃ সাধারণ প্রস্থচ্ছেদ থেকে বৃক্কের আণুবীক্ষণিক গঠনের ধারণা পাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার,

কারণ, প্রস্থচ্ছেদে ইহা একত্রে জটপাকান অসংখ্য নালিকার সমন্বয়ে গঠিত (15-4 নং চিত্র)। 1842 সালে বোম্যানই (Bowman) প্রথম বৃক্কের আণুবীক্ষণিক গঠনের সঠিক বর্ণনা দেন। তিনি পর্যায়ক্রমে পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ও লেড অ্যাসিটেটের দ্রবণকে বৃক্কধমনীতে (renal artery) ইন্জেক্ট করান এবং গ্লোমারুলাসে লেড ক্রোমেটের অধঃক্ষেপ উৎপাদন করেন। ইন্জেকশনের চাপ কখনও কখনও বেশী হওয়ার ফলে রক্তজালিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে লেড ক্রোমেট বোম্যান ক্যাপসুলে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে কন্ভোলুটেট টিউবুল (convoluted tubules) বা সংবর্তনালিকাতে পরিবাহিত হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে তিনি বৃক্কের একক নেফ্রোনের বিভিন্ন অংশের সঠিক বর্ণনা দিতে সমর্থন হন। বৃক্কে দুশ্রেণীর নেফ্রোনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে ঃ
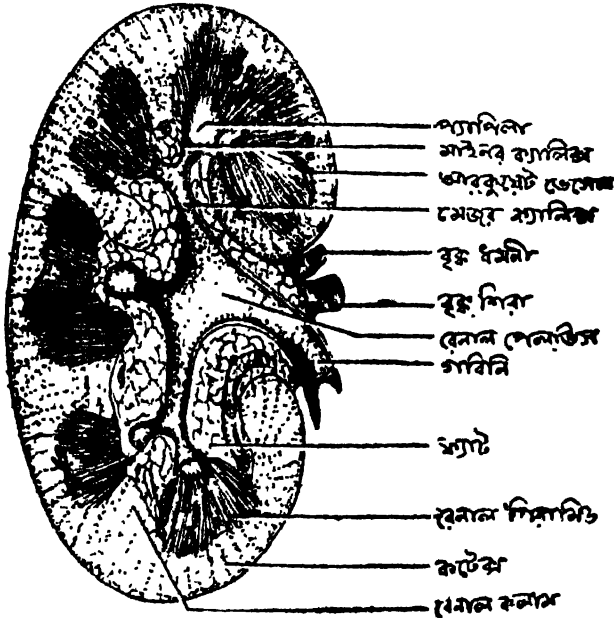
15-3 নং চিত্র

(1) বহিঃস্তরীয় নেফ্রোন ঃ বৃক্কের বহিঃস্তরের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে এরা অবস্থিত। এদের সংখ্যা বৃক্কস্থিত মোট নেফ্রোনের 85 শতাংশ, (2) মেডালাস্থিত নেফ্রান ঃ বৃক্কের মেডালার শেষ প্রান্তে এরা অবস্থিত। এদের মোট সংখ্যা শতকরা 15 ভাগ।

প্রতিটি নেফ্রোন 30-40 মিলিমিটার দীর্ঘ। এরা শাখাপ্রশাখাহীন, তবে সমগ্র গতিপথব্যাপী কুণ্ডলীকৃতভাবে বিন্যস্ত থাকে। প্রতিটি নেফ্রোন দুটো অংশের সমন্বয়ে গঠিত : (a) **ম্যাল্‌পিঘিয়ান কণা** (Malpighian corpuscles) এবং (b) **বৃক্কনালিকা** (renal tubules)।

ম্যাল্‌পিঘিয়ান কণা

বৃক্কের শুধামাত্র কর্টেক্স বা বহিঃস্তরেই ম্যাল্‌পিঘিয়ান কণা দেখতে পাওয়া যায়। বহিঃস্তরীয় ম্যাল্‌পিঘিয়ান কণা প্রায় 200μ ব্যাসসম্পন্ন। দুটো
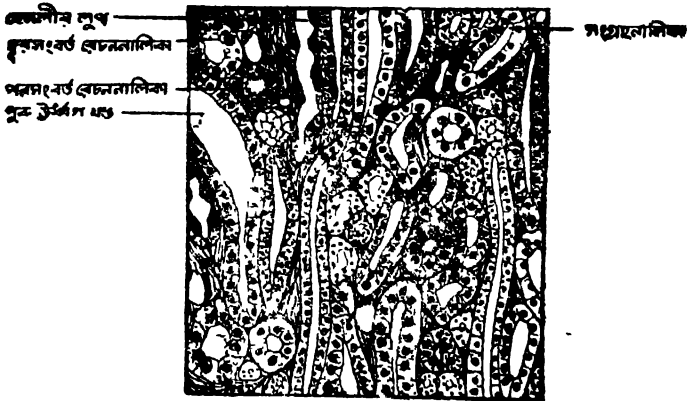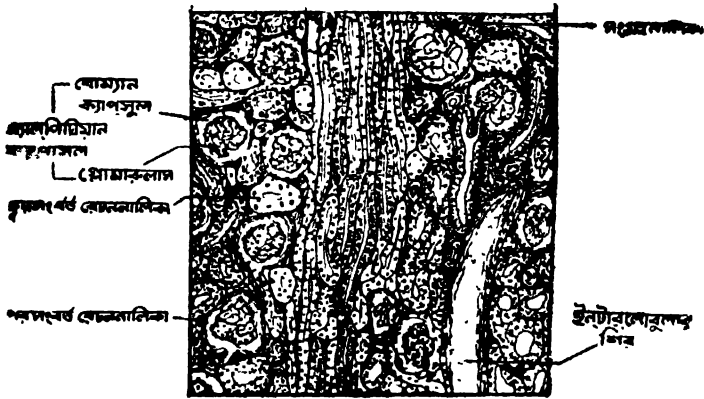
15-4 নং চিত্র : বৃক্কের কর্টেক্স ও মেডালার আণুবীক্ষণিক গঠন।

অংশের সমন্বয়ে ইহা গঠিত : (1) **বোম্যান ক্যাপসুল** (Bowman's Capsule) এবং (2) **গ্লোমারুলাস** (Glomerulus)।

1. **বোমান ক্যাপ্সুল :** ইহা নেফ্রোনের বদ্ধ স্ফীতপ্রান্তবিশেষ। ইহা গ্লোমারুলাসকে কাপের মত আবৃত করে রাখে। দুটো একক কোষস্তর নিয়ে বোম্যান ক্যাপ্সুল গঠিত। অন্তঃস্থ বা আন্তরযন্ত্রীয় স্তর (visceral layer) গ্লোমারুলাসকে আবৃত করে। বহিঃস্থ স্তর প্যারাইটাল বা প্রাচীরস্তর নামে পরিচিত। অন্তঃস্তর আবরণী কোষের এককস্তরে গঠিত। কোষাবলী যে বেসাল ল্যামিনার (basal lamina) উপর অবস্থান করে তা নিম্নস্থ রক্ত-জালিকার বেসাল ল্যামিনার সংগে একীভূত। এই একীভূত ল্যামিনার গভীরতা 0·08-0·12μ। হীমাটক্সিলিন ও ইওসিন বর্ণপ্রয়োগে একে সনাক্ত করা সম্ভবপর না হলেও, পিরিয়ডিক অ্যাসিড শিফ (PAS) বর্ণ প্রয়োগে সহজেই সনাক্ত করা যায়।

আন্তরযন্ত্রীয় স্তরের কোষাবলী তুলনামূলকভাবে বৃহদাকৃতি। কোষের নিউক্লিয়াস ক্যাপসুলার স্পেসে (capsular space) ঝুকে পড়ে। কোষের সাইটোপ্লাজম অনেকটা ট্রাবেকুলার প্রোসেস (trabecular process) বা তন্তু বিস্তারের মত। ট্রাবেকুলার প্রোসেস বিভক্ত হয়ে অসংখ্য পদতলসদৃশ উদ্গম নির্গত করে, এদের **পেডিকল** (pedicles) বলা হয়। পেডিকল বেসাল ল্যামিনার সংস্পর্শে থাকে। ক্ষুদ্র পদতল সমেত গ্লোমারুলাসস্থিত আবরণী কোষকে **পোডোসাইট** (podocytes) বলা হয়। বিভিন্ন পোডোসাইটের পেডিকলসমূহ বেসাল ল্যামিনা বরাবর একে অন্যের ভেতর প্রবেশ করে। পেডিকলের অন্তর্বর্তী স্থানের বিস্তৃতি 0·02—0·04μ। পোডোসাইটের পেডিকলের অন্তবর্তী স্থানে ইলেকট্রনঘন **স্লিট মেমব্রেনের** (slit membrane) সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, স্লিট মেমব্রেন সর্বশেষ আস্রাবণ প্রতিবন্ধক (ultimate filtration barrier) হিসাবে কাজ করে এবং আণবিক আকৃতির উপর ভিত্তি করে প্রোটিনের ভেদ্যতার নিয়ন্ত্রণ করে।

আন্তরযন্ত্রীয় স্তর যেস্থানে বহির্মেরুতে (vascular pole) প্রতিফলিত হয় বোম্যান ক্যাপ্সুল সেখান থেকেই শুরু হয়। সাধারণভাবে বহির্মেরুর বিপরীতে অবস্থিত রেচনমেরুতে (urinary pole) প্যারাইটালস্তর রেচননালিকার পরসংবর্ত খণ্ডের প্রাচীরের সংগে একীভূত হয়ে পড়ে। এই অংশ গ্রীবাদেশ (neck region) নামে পরিচিত। ক্যাপ্সুলের অন্তর্বর্তী স্থান পরসংবর্ত নালিকার নালীপথের সংগে এই অংশে মিশে যায়। প্রাচীরস্তর সরল আবরণী

কোষের একক স্তরে গঠিত, তবে কোষাবলী এক্ষেত্রে অধিকতর পুরু। ক্রমান্বয়ে
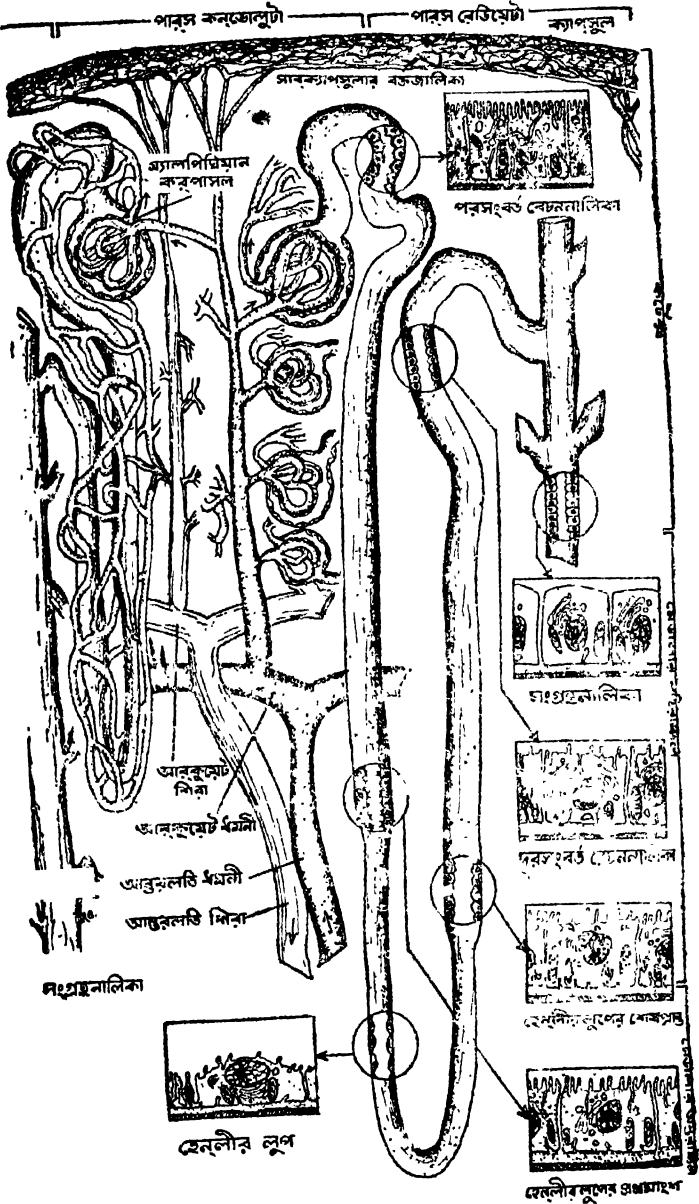
15-5 নং চিত্র : নেফ্রোনের আণুবীক্ষণিক গঠনের বিশেষত্ব।

এই কোষের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে গ্রীবাদেশে তারা ঘনতলীয় কোষে রূপান্তরিত হয়।

2. **গ্লোমারুলাস :** গ্লোমারুলাস বোম্যান ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে রক্তজালিকার একটি পিণ্ডকবিশেষ। পেশীময় **অন্তর্মুখী রক্তনালী** (afferent vessels) গ্লোমারুলাসে প্রবেশ করে এবং 0·5 মিলিমিটার দৈর্ঘ্যসম্পন্ন প্রায় 50টি রক্তজালিকায় বিভক্ত জালিকাপিণ্ডের সৃষ্টি করে। রক্তজালিকার মধ্যে কোন অন্তর্বাহ যোগসূত্র নেই। রক্তজালিকা পুনরায় পুনর্মিলিত হয়ে **বহির্মুখী** রক্তনালী (efferent vessels) গঠন করে। অন্তর্মুখী রক্তনালী ছোট ও প্রশস্ত (50μ ব্যাসসম্পন্ন), অপরপক্ষে বহির্মুখী রক্তনালী দীর্ঘ এবং অপ্রশস্ত (25μ ব্যাসসম্পন্ন)।

গ্লোমারুলাসস্থিত রক্তজালিকার অন্তরাবরণী কোষ নিউক্লিয়াসগত অঞ্চল ছাড়া অত্যন্ত পাতলা। অধিকাংশ অন্তরাবরণী কোষের সাইটোপ্লাজমই সছিদ্র ফলকের আকারে ল্যামিনা বরাবর সম্প্রসারিত হয়। ছিদ্রের ব্যাস প্রায় 0·04—0·10μ। রক্তনালীর এই অন্তরাবরণীস্তর, বেসাল ল্যামিনা এবং বোম্যান ক্যাপসুলের আন্তরযন্ত্রীয় স্তর সম্মিলিতভাবে বৃক্কের **পরিস্রাবণ ঝিল্লী** গঠন করে!

বৃক্কনালিকা
Renal Tubules

মানুষের প্রতিটি বৃক্কনালিকা প্রায় 3 সেন্টিমিটার দীর্ঘ এবং 20-60μ ব্যাসযুক্ত। উভয় বৃক্কে প্রায় 20 লক্ষ্য নেফ্রোন রয়েছে, তাদের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য প্রায় 40 মাইল বা 64 4 কিলোমিটারের সমান। সুদীর্ঘ ও সংবর্ত প্রতিটি বৃক্কনালিকাকে কার্যগত ও গঠনগত ভাবে 4 ভাগে বিভক্ত করা যায়।

1. **প্রথম বা পরসংবর্ত রেচননালিকা** (first or proximal convoluted tubules) **:** বৃক্কনালিকার এই অংশ প্রায় 14 মিলিমিটার দীর্ঘ এবং প্রায় 57-60μ ব্যাসসম্পন্ন। বৃক্কের বহিঃস্তর ও গ্লোমারুলাসের সন্নিকটে ইহা অবস্থান করে। ব্রাশবর্ডারযুক্ত ঘনতলাকৃতি বা পিরামিডসদৃশ একক কোষস্তর দ্বারা ইহা গঠিত। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা গেছে ব্রাশবর্ডার মাইক্রোভিলাসবিশেষ। মাইক্রোভিলাস প্রায় 1·2μ দীর্ঘ এবং 0 03μ বিস্তৃত। এদের উপস্থিতির জন্য কোষের পুনর্বিশোষণের প্রয়োজনীয় বিশোষণতল বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। কলাকোষীয় অনুশীলন থেকে জানা গেছে, মাইক্রো-

ভিলাসে অ্যালকালাইন ফস্‌ফাটেজ (alkaline phosphatase) এবং জারণ-বিষয়ক এন্‌জাইম (oxidative enzyme) প্রচুর পরিমাণে থাকে। এ ছাড়া এই অংশে মিউকোপলিস্যাকারাইডের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেছে।

কোষের নিউক্লিয়াস গোলাকার। সাইটোপ্লাজম দানাদার। সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্‌ড্রিয়া ও অনুপ্রবিষ্ট কোষঝিল্লির ভাঁজ পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া সাইটোপ্লাজমে লাইসোসোম ও পেরোক্সিসোমের প্রাধান্যও লক্ষ্য করা গেছে। শীর্ষদেশীয় সাইটোপ্লাজমে ভেসিক্‌ল (vescicles) ও ভ্যাকুওলের উপস্থিতি এবং ডায়উরেসিসে (diuresis) তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে ধারণা করা হয়, পিনোসাইটোসিস (pinocytosis) পুনর্বিশোষণেরই একটা অংশ।

পরসংবর্ত রেচনালিকার শেষপ্রান্ত সোজা হয়ে মেড্রালায় প্রবেশ করে এবং হেন্‌লীর লুপ গঠন করে।

2 **হেন্‌লীর লুপ** (Henle's loop): ইংরেজী U-আকৃতিসম্পন্ন হেন্‌লীর লুপ নিম্নবাহু ও উর্ধ্ববাহুর সমন্বয়ে গঠিত। গ্লোমারুলাসের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এরা বৃক্কের মেডালার বিভিন্ন গভীরতায় প্রবেশ করে। যেসব গ্লোমারুলাস বৃক্কের কর্টেক্স বা বহিঃস্তরের উপরিতলে অবস্থান করে তাদের লুপ মেডালার সামান্য গভীরে প্রবেশ করতে পারে। অপরপক্ষে বৃক্কের বহিঃস্তর ও অন্তস্তরের সংযোগস্থলে যেসব গ্লোমারুলাস অবস্থান করে, তাদের হেন্‌লীর লুপ মেডালার অনেক গভীরে প্রবেশ করতে পারে।

হেন্‌লীর লুপ তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত: পুরোভাগের পুরু খন্ডাংশ, একটি পাতলা খন্ডাংশ এবং দূরপ্রান্তীয় পুরু খন্ডাংশ।

পুরোভাগের পুরু খন্ডাংশ (proximal thick segment): পরসংবর্ত রেচননালিকার মত এই অংশ ঘনতলাকৃতি কোষের দ্বারা গঠিত, তবে কোষের আকৃতি, মাইক্রোভিলাসের সংখ্যা এবং মাইটোকন্‌ড্রিয়ার সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

পাতলা খন্ডাংশ (thin segment): ইহা প্রায় 15μ ব্যাসসম্পন্ন এবং অপ্রশস্ত ও চ্যাপ্টাকৃতি কোষের এককস্তরে গঠিত। কোষের নিউক্লিয়াস লিউমেনের (lumen) দিকে ঝুঁকে পড়ে। মানুষের বৃক্কের এই অংশের কোষাবলী অধিকতর কম চেপ্টাকার, বিশেষত সন্নিহিত রক্তনালীর অন্তরাবরণীকোষের চেয়ে। ইলেক্‌ট্রন্‌ অণুবীক্ষণযন্ত্রে এদের প্রান্তদেশে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার মাইক্রোভিলাস লক্ষ্য করা গেছে। নিউক্লিয়াসের চারিপাশে অধিক পরিমাণে

সাইটোপ্লাজমের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। কোষের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যাও অপ্রতুল।

দূরপ্রান্তীয় পুরু খন্ডাংশ (distal thick segment)ঃ ইহা প্রায় 9 মিলিমিটার দীর্ঘ এবং 30μ ব্যাসসম্পন্ন। ইহা উর্ধ্বদিকে বৃক্কের বহিঃস্তর বা কর্টেক্সে আরোহণ করে এবং গ্লোমারুলাসের বাহমেরুর (vascular pole) কাছাকাছি অগ্রসর হয়। এই অংশে ইহা দূরসংবর্ত রেচননালিকার (distal convoluted tubules) সংগে একীভূত হয়। ইহা ঘনতলাকৃতি কোষের দ্বারা গঠিত, তবে কোষের উচ্চতা লুপের পুরোবাহুর পুরু খন্ডাংশের কোষের উচ্চতার চেয়ে অনেক কম। তাছাড়া এই অংশের কোষগুলো অনেকটা সংকীর্ণ, তাই তাদের নিউক্লিয়াস খুব সন্নিকটে অবস্থান করে। সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রে কোষপ্রান্তে কোন ব্রাশ বর্ডার দেখা যায় না, তবে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে স্বল্পসংখ্যক ক্ষুদ্রাকার মাইক্রোভিলাস দেখা যায়। কোষের গোড়ার দিকে কোষঝিল্লির অসংখ্য অন্তর্ভাজ এবং মাইটোকনড্রিয়ার সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া সোডিয়ামের পাম্পক্রিয়ায় সক্রিয়কারী বিশেষ একধরনের কোষেরও সাক্ষাৎ এই অংশে পাওয়া যায়। সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রে এই কোষগুলোই বেসাল স্ট্রায়েশন (basal striation) বা ভিত্তিমূলীয় ডোরার জন্য দায়ী।

3. **দ্বিতীয় বা দূরসংবর্ত রেচননালিকা** (Second or distal convoluted tubules)ঃ প্রথম বা পরসংবর্ত রেচননালিকার মত এই অংশও বৃক্কের বহিঃস্তর বা কর্টেক্সে অবস্থান করে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 5 মিলিমিটারের মত এবং ব্যাস 22-50μ সম্পন্ন। মাইটোকনড্রিয়া যুক্ত ঘনতলাকৃতি আবরণীকলার দ্বারা এই অংশ গঠিত। কোষের সাইটোপ্লাজম দানাদার। মাইটোকনড্রিয়াব সংখ্যাও কম। ব্রাশ-বর্ডার বা মাইক্রোভিলাস এই অংশে অনুপস্থিত।

দূরসংবর্ত রেচননালিকার প্রথমাংশ সরাসরি অনুরূপ অন্তর্মুখী রক্তনালীর গ্লোমারুলাস-সন্নিহিত কোষের (guxtaglomerular cells) সংস্পর্শে আসে। অন্তর্মুখী রক্তনালী এবং বহির্মুখী রক্তনালীর একাংশের সন্নিহিত এই রেচননালিকার কোষগুলো অধিকতর দীর্ঘ এবং শীর্ণ যা অন্য কোন অংশে দেখা যায় না। কোষের নিউক্লিয়াসসমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রে এই অঞ্চলকে অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, তাই একে **ম্যাকুলা ডেনসা** (macula densa) নামে অভিহিত করা হয়। একটি সূক্ষ্ম

বনিয়াদীঝিল্লি (basement membrane) ম্যাকুলা ডেন্‌সা কোষকে **অন্তর্মুখী উপধমনীর** গ্লোমারুলাস সন্নিহিত কোষ থেকে পৃথক করে রাখে।

4. **সংগ্রহনালিকা** (Collecting tubules)ঃ দূরসংবর্ত রেচননালিকা এরপর সংগ্রহনালিকায় প্রবেশ করে। সংগ্রহনালিকা ধূসর ঘনতলাকৃতি কোষস্তর নিয়ে গঠিত। এরা এরপর সংগ্রহনালীতে (collecting ducts) প্রবেশ করে, যা মেডালা ও প্যাপিলার মধ্য দিয়ে (ক্ষুদ্র **বেলিনির** নালী হিসাবে) সাইনাস গহ্বরে প্রবেশ করে।

গ্লোমারুলাস সন্নিহিত যন্ত্র
Juxtaglomerular Apparatus

1. **গ্লোমারুলাস সন্নিহিত যন্ত্রের গঠন** (Structure of Juxtaglomerular Apparatus)ঃ দূরসংবর্ত রেচননালিকার অগ্রভাগ গ্লোমারুলাসের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী রক্তনালীর যে অংশে এসে মিলিত হয় ঠিক সেই অবস্থানেই **গ্লোমারুলাস সন্নিহিত যন্ত্র** (juxtaglomerular apparatus) গঠিত হয়। গ্লোমারুলাস সান্নিহিত যন্ত্র 3টি উপাদানে গঠিতঃ (a) অন্তর্মুখী রক্তনালীর দানাদার **গ্লোমারুলাস সন্নিহিত কোষ** বা **জাক্সটাগ্লোমারুলার সেল** (JG cell), (b) দূরবর্তী রেচননালিকার অগ্রভাগের **ম্যাকুলা ডেনসা** (macula densa) এবং (c) অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী রক্তনালীর অন্তর্বর্তী বাঁকের সংযোগীকলায় নিহিত **লেসিস কোষ** (Lacis cells) বা **পলকিসেন কোষ** (Polkissen Cells) (15-1,15-6 নং চিত্র)।

(a) **গ্লোমারুলাস সন্নিহিত কোষ** (J G Cells)ঃ অন্তর্মুখী রক্তনালী যে স্থানে গ্লোমারুলাসে প্রবেশ করে, দানাদার এই কোষগুলো রক্তনালীর সেই অংশেই অবস্থান করে। এই কোষগুলোর মধ্যে নিহিতদানা ঝিল্লিতে আবদ্ধ থাকে। এরা আসলে রূপান্তরিত পেশীকোষ। **রেনিনের উৎস** এই গ্লোমারুলাস সন্নিহিত কোষ।

(b) **ম্যাকুলা ডেনসা** (Macula Densa)ঃ অন্তর্মুখী রক্তনালীর সংস্পর্শে আসা একই নেফ্রোনের দূরবর্তী রেচনালিকার রূপান্তরিত আবরণী কোষকে **ম্যাকুলা ডেনসা** (macula densa) বলা হয়। ম্যাকুলা ডেনসা কোষের ভিত্তিঝিল্লি (basement membrane) থাকে না এবং গলগি বডি নিউক্লিয়াস ও বহিঃপ্রান্তের মধ্যভাগে অবস্থান করে।

গ্লোমারুলাসের দিকে নালিকাকোষগুলো লম্বাটে ও পাতলা হয়।

(c) **লেসিস কোষ** (Lacis Cells) : এই কোষগুলো দানাদার বা অদানা-
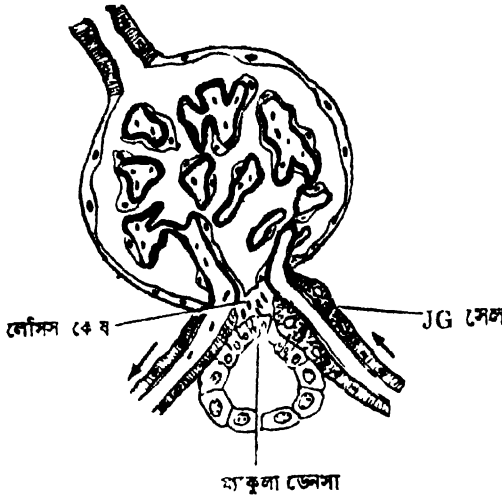
15-6 নং চিত্র : গ্লোমারুলাস সন্নিহিত যন্ত্র।

দার হতে পারে। এই কোষগুলো একদিকে ম্যাকুলা ডেনসা এবং অপরদিকে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী নালী দ্বারা সৃষ্ট নালী শীর্ষের (vascular pole) সংস্পর্শে থাকে।

2. **গ্লোমারুলাস সন্নিহিত যন্ত্রের কার্য** (Functions of Juxtaglomerular Apparatus) : গ্লোমারুলাস সন্নিহিত যন্ত্র **রেনিন** (renin) এবং **ইরীথ্রোজেনিন** (erythrogenin) বা রেনাল ইরীথ্রোপোয়েটিক ফ্যাকটর (REF) উৎপন্ন করে। প্রথমটি রক্তচাপবৃদ্ধি ও অ্যালডোস্টারোন ক্ষরণে উদ্দীপনা দেয়, পরেরটি রক্তের লোহিতকণিকার উৎপাদনে উদ্দীপনা দান করে।

(a) **রেনিন** (Renin) : রেনিনের উৎস গ্লোমারুলাস সন্নিহিত কোষ। পদার্থটি একাধারে হরমোন ও এনজাইম। এটি একটি গ্লাইকোপ্রোটিনবিশেষ আণবিক ওজন 42,000। বৃহদাকারের নিষ্ক্রিয় রেনিনকে **প্রোরেনিন** (prorenin) বলা হয়, যার আণবিক ওজন প্রায় 60,000। রক্ত সংবহনে হাফ লাইফ 80 মিনিট বা তারও কম। রেনিন প্রোটিনবিশ্লেষকারী এনজাইম হিসাবে কাজ করে এবং রক্তের গ্লোবিউলিনকে ভেংগে অ্যানজিওটেনসিন উৎপন্ন করে।

রেনিনের সক্রিয়তা (Action of Renin)ঃ রেনিনকে ইনজেকসনের মাধ্যমে রক্তে প্রবেশ করালে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। প্রোটিনবিশ্লিষ্টকারী এনজাইম
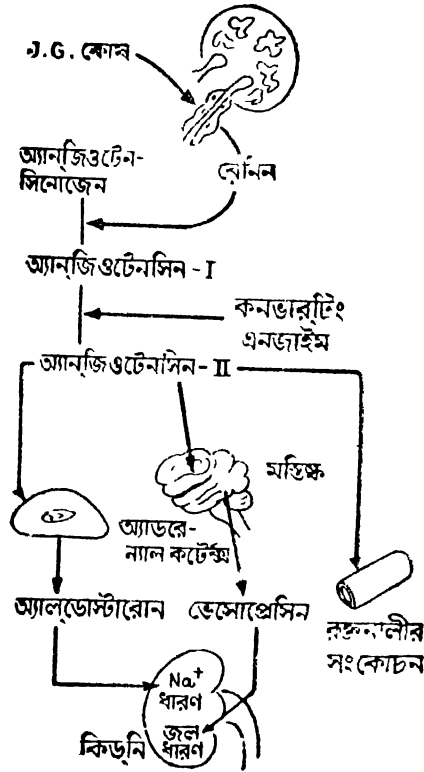
15-7 নং চিত্রঃ রেনিন-অ্যানজিওটেনসিন সম্পর্ক।

হিসাবে রক্তে প্রবেশ করে এই পদার্থটি α_2-গ্লোবিউলিনকে ভেংগে ডেকাপেপ-টাইড **অ্যানজিওটেনসিন-I** তৈরী করে। α_2-গ্লোবিউলিন যকৃতে উৎপন্ন হয় এবং তাকে **অ্যানজিওটেনসিনোজেন** নামে অভিহিত করা হয়। অ্যানজিও-টেনসিন-I এর উপর এরপর **কনভারটিং এনজাইম** (converting enzyme) কাজ করে এবং শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয় অ্যানজিওটেনসিন-I থেকে হিসটিডিল-লিউসিনকে (histidyl-leucine) অপসারণ করে। ফলে **অ্যান-জিওটেনসিন-II** উৎপন্ন হয়। এই পরিবর্তন প্রধানত ফুসফুসের রক্তে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। এই পদার্থ রক্তনালীর সংকোচন ঘটায়। ফলে সিস-টোলিক ও ডায়াসটোলিক উভয়বিধ রক্তচাপই বৃদ্ধি পায়। অ্যানজিওটেনসিন-

II নরএডরেন্যালিনের চেয়েও 4-8 গুণ বেশী রক্তনালী সংকোচক। এছাড়া এই পদার্থটি সরাসরি অ্যাড্রেন্যাল কর্টেক্সের উপর ক্রিয়া করে অ্যালডোস্টারোন ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়; (2) অ্যাড্রেনার্জিক নিউরোনের উপর ক্রিয়া করে ক্যাটেকোলামিন ক্ষরণ বৃদ্ধি করে, (3) সম্ভবত মস্তিষ্কের পস্ট্রেমা (postrema) এবং সার্কামভেন্ট্রিকুলার অর্গানে (circumventricular organs)-এর উপর ক্রিয়া করে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। ADH ক্ষরণেও উদ্দীপনা দেয়। অ্যানজিওটেনসিন-IIIও রক্তচাপ বৃদ্ধি করতে পারে (40%) এবং অ্যালডোস্টারোন ক্ষরণে উদ্দীপনা দিতে পারে।

রেনিন ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Renin secretion) ঃ যে সব কারণ রক্তচাপ ও ECF বা কোষবহির্ভূত তরলের পরিমাণ হ্রাস করে তারা রেনিনের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। স্বতন্ত্র (sympathetic stimulator) স্নায়ুর উদ্দীপনা থেকেও রেনিন ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। সোডিয়ামের পরিমাণ হ্রাস, ডাইইউরেটিকস্, হাইপোটেনশন, রক্তক্ষরণ, বৃক্কের রক্তনালীর সংকোচন, দেহে জলের পরিমাণ হ্রাস, সোজা দেহভংগি প্রভৃতি রেনিন ক্ষরণে উদ্দীপনা যোগায়।

(b) **ইরীথ্রোপোয়েটিন** (Erythropoietin) ঃ ইরীথ্রোপোয়েটিন প্লাজমাস্থিত গ্লোবিউলিন থেকে REF বা **ইরীথ্রোজেনিন** এর সক্রিয়তায় উৎপন্ন হয়। ইরীথ্রোজেনিন (erythrogenin) বা রেনাল ইরীথ্রোপোয়েটিক ফ্যাক্টর (RLF) বৃক্ক বা কিডনী থেকে উৎপন্ন হয়। দেহে অক্সিজেন-ঘাটতি বা হাইপোক্সিয়া এই পদার্থটির উৎপাদনে উদ্দীপনা দেয়। এছাড়া অ্যানড্রোজেন এবং কোবাল্ট সল্টও এর উৎপাদন বৃদ্ধি করে। রেনিনের মত এই পদার্থ রক্তে প্রবেশ করে প্লাজমাস্থিত গ্লোবিউলিনের উপর ক্রিয়া করে ইরীথ্রোপোয়েটিন নামক হরমোনের উৎপাদন ঘটায় যা অস্থিমজ্জার কিছু সংখ্যক **'স্টেম সেলকে'** প্রোইরীথ্রোব্লাস্টে রূপান্তরিত করে। ফলে লোহিতকণিকার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
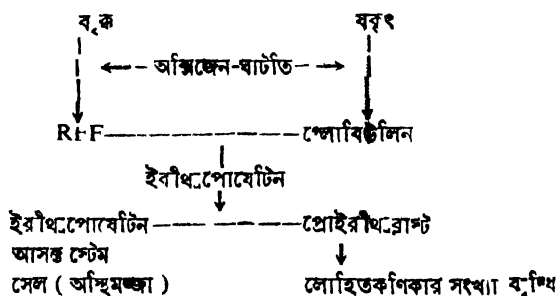
বৃক্কের কার্যাবলী
Function of Kidney

বৃক্ক যে সব শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পন্ন করে, তাদের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে বিবৃত করা হল : (a) রক্তের ও কলাকোষের **অভিস্রবণচাপ** বজায় রাখতে সহায়তা করে। (b) বিভিন্ন প্রকার **প্রতিবিষ ও ওষুধ** ইত্যাদিকে দেহ থেকে নির্গত করে। (c) দৈহিক জলের **সাম্যাবস্থা** বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং এভাবে রক্ত বা প্লাজমার পরিমাণ বজায় রাখে। (d) দেহরসের H^+ **আয়নের** তীব্রতা ও **তড়িদ্‌বিশ্লেষ্যের** সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে : (e) পছন্দসই পুনর্বিশোষণের দ্বারা **রক্তের কোন কোন উপাদানের** সঠিক তীব্রতা বজায় রাখে। (f) প্রোটিনের বিপাকলব্ধ **নাইট্রোজেন** ও **সালফারযুক্ত** পদার্থসমূহকে দেহ থেকে নির্গত করে। (g) **অ্যামোনিয়া, হিপ্‌পিউরিক অ্যাসিড** এবং **অজৈব ফসফেট** উৎপন্ন করতে পারে।

মূত্র উৎপাদন প্রণালী
MECHANISM OF URINE FORMATION

তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি মূত্র-উৎপাদনের সংগে জড়িত। এই তিনটি পদ্ধতি হল : (1) **গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ** (glomerular filtration), (2) **বৃক্ক নালিকার পুনর্বিশোষণ** (লিউমেন থেকে রক্ত) এবং (3) **বৃক্কনালিকার ক্ষরণ** (রক্ত থেকে লিউমেনে)। প্রতিটি নেফ্রোন এই তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে মূত্র উৎপাদন করে। প্রথম পদ্ধতি গ্লোমারুলাসে শুরু হয় এবং প্লাজমার পৃথকীকরণের দ্বারা প্রোটিনমুক্ত তরল বা আলট্রাফিলট্রেট উৎপন্ন হয়। গ্লোমারুলাসের রক্তজালিকা থেকে এভাবে উৎপন্ন প্রোটিনমুক্ত তরল বোম্যান ক্যাপসুলে প্রবেশ করে এবং নেট পরিস্রাবণ চাপের সাহায্যে বৃক্কনালিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। পরবর্তী পদ্ধতি দুটো বৃক্কনালিকায় সম্পন্ন হয়। বৃক্কনালিকার বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় এই দুটো পদ্ধতির দ্বারা পদার্থের পরিমাণ ও উপাদানের আমূল পরিবর্তন হয় এবং স্বাভাবিক মূত্র উৎপন্ন হয়, যা সাইনাস গহ্বর ও গবিনীর মাধ্যমে মূত্রথলীতে জমা হয় (15-3 নং চিত্র)।

গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ
Glomerular Filtration

গ্লোমারুলাস পরিস্রাবণযন্ত্র বা আলট্রাফিলটার হিসাবে কার্য করে। প্লাজমার কোলয়েডপদার্থ বা প্রোটিন ছাড়া প্রায় সব উপাদানকেই এটি ছেঁকে

পৃথক করে নিতে পারে অর্থাৎ গ্লোমারুলাস যান্ত্রিক ছাঁকনি হিসাবে কার্য করে। এভাবে গ্লোমারুলাসে যে তরল পদার্থ তৈরী হয় তাকে গ্লোমারুলার ফিলট্রেট বা গ্লোমারুলাসের পরিস্রুৎ বলা হয়।

1. **গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ হারের পরিমাপ** (Measuring glomerular Filtration rate) : গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ হারের (GFR) পরিমাপের জন্য এমন একটি পদার্থ দরকার যা গ্লোমারুলাসের মধ্য দিয়ে বিনা বাধায় পরিস্রুত হতে পারে এবং পদার্থটি রেচননালিকার দ্বারা ক্ষরিত বা বিশোষিত হয় না (1 নং তালিকা)। এরকম একটি পদার্থ কতটুকু রেচিত হয় এবং প্লাজমাতে তার পরিমাণ কত তার পরিমাপ করে পরিস্রাবণ হারের নির্ধারণ করা যায়। একক সময়ে এজাতীয় পদার্থ যে পরিমাণ মূত্রে নির্গত হয় তা ঠিক সেই আয়তন প্লাজমা থেকেই আসে যাতে সে দ্রবীভূত থাকে। অতএব এজাতীয় একটি পদার্থকে m দ্বারা চিহ্নিত করলে নিম্নলিখিত সূত্রের দ্বারা গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ হারের (GFR) নির্ধারণ করা যায় :

$$GFR \quad \frac{U_x V}{P_m}$$

যেখানে U_x = মূত্রে পদার্থটির পরিমাণ

V = একক সময়ে মূত্রের প্রবাহ

P_m = ধমনীর প্লাজমায় পদার্থের মাত্রা।

এই মানকে পদার্থটির ক্লিয়ারেন্স (C_x) বা অপসারণও বলা হয়। ধমনী রক্তসংবহনের সর্বত্রই Pm এর মাত্রা সমান থাকে।

1 নং তালিকা : GFR পরিমাপে ব্যবহৃত পদার্থের বিশেষত্ব

বিনা বাধায় পরিস্রুত হয়
রেচননালিকার দ্বারা বিশোষিত বা ক্ষরিত হয় না
বিপাকিত হয় না
বৃক্কে সঞ্চিত হয় না
প্রোটিনে আবদ্ধ থাকে না
বিষাক্ত নয়
পরিস্রাবণ হারের উপর প্রভাব ফেলে না
সহজে প্লাজমা ও মূত্রে পরিমাপ করা যায়

1 নং তালিকায় যেসব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে **ইনুলিন** (inulin) নামক পদার্থে তার সবকটি বিশেষত্বই খুঁজে পাওয়া যায়। ডালিয়ার স্ফীতকন্দে (tubers) এই পদার্থটিকে পাওয়া যায়। পদার্থটি ফ্রাকটোজের একটি পলিমার। এর আণবিক ওজন 5200।

GFR পরিমাপের সময় পদার্থটিকে নির্দিষ্ট মাত্রায় শিরারক্তে প্রবেশ করান হয় এবং ধমনীরক্তে তার এই মাত্রাকে বজায় রাখার জন্য অনবরত প্রবেশ করান হয়। দেহতরলের সংগে ইনুলিন যখন সাম্যাবস্থায় আসে তখন সতর্কতার সংগে নির্দিষ্ট সময় ধরে মূত্রের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং নমুনা সংগ্রহের মধ্যপথে প্লাজমারও একটি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্লাজমা ও মূত্রে ইনুলিনের গাঢ়ত্ব নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ :

$$U_{IN} = 29 \text{ মিলিগ্রাম/মিলি}$$

$$V = 1{\cdot}1 \text{ মিলি/মিনিট}$$

$$P_{IN} = 0{\cdot}25 \text{ মিলিগ্রাম/মিলি}$$

$$GFR = \frac{U_{IN}V}{P_{IN}} = \frac{2{\cdot}9 \times 1{\cdot}1}{0{\cdot}25}$$

$$= 128 \text{ মিলি/মিনিট।}$$

কুকুর, বিড়াল, র‍্যাবিট এবং আরও বহু স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ক্রিয়েটিনের ক্লিয়ারেন্সকে GFR নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়। মানুষ ও বনমানুষ জাতীয় প্রাণীতে এই পদার্থটিকে রেচননালিকা যেমন ক্ষরণ করে তেমনি বিশোষণও করে। এছাড়া পদার্থটি রক্তে কম পরিমাণে থাকলে সঠিকভাবে পরিমাণ করা সম্ভব হয় না। তবু পদার্থটিকে প্রায়ই ব্যবহার করা হয় কারণ দেখা গেছে ইনুলিনের ব্যবহার করে যে GFR মান পাওয়া যায়, ক্রিয়েটিনকে ব্যবহার করে যে মান পাওয়া যায় তা এর সংগে সংগতিপূর্ণ।

2. **স্বস্ভাবিক** GFR (Normal GFR) : বয়স্ক ও স্বাভাবিক মানুষে GFR প্রায় 125 মিলি/মিনিট। উপরিতলের ক্ষেত্রফলের সংগে এর মান সংগতিপূর্ণ, তবে স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে এই মান 10% কম। 125 মিলি/মিনিট এর মানে 7·5 লিটার/ঘণ্টা বা 180 লিটার/দিন। অপরপক্ষে, প্রতিদিনের স্বাভাবিক মূত্র উৎপাদনের পরিমাণ 1 লিটার। অতএব 99% বা তারও বেশী পরিস্রুৎ স্বাভাবিকভাবে পুনর্বিশোষিত হয়। 125 মিলি./মিনিট হারে কিডনি

বা বৃক্ক প্রতিদিন যে তরল পদার্থ উৎপন্ন করে তা দেহতরলের 4 গুণ, বহিঃকোষীয় তরলের 15 গুণ এবং প্লাজমা পরিমাণের 60 গুণ।

3. **গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণের নিয়ন্ত্রণ (Control of glomerular Filtration) :** যেসব কারণ গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ হারকে প্রভাবিত করে তাদের 2 নং তালিকায় প্রদর্শিত হয়েছে। অন্যান্য রক্তজালিকার মত

2 নং তালিকা : যেসব ফ্যাকটর গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

1. বৃক্কের রক্তপ্রবাহের পরিবর্তন
2. গ্লোমারুলাসের রক্তজালিকার জলচাপের পরিবর্তন
   a) ধমনী রক্তচাপের পরিবর্তন
   b) অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী উপধমনীর সংকোচন
3. বোম্যান ক্যাপসুলের জলচাপের পরিবর্তন
   a) গবিনিতে বাধাসৃষ্টি
   b) দৃঢ় ক্যাপসুলের নিচে বৃক্কের শোথ
4. প্লাজমাপ্রোটিনের গাঢ়ত্বের পরিবর্তন
5. বিভিন্ন কোষে গ্লোমারুলাসের ঝিল্লির ভেদ্যতার পরিবর্তন
6. গ্লোমারুলাসের রক্তজালিকাস্থানের মোট ক্ষেত্রফলের হ্রাস

গ্লোমারুলাসের রক্তজালিকার মধ্য দিয়ে পরিস্রাবণের হার প্রধান 3টি চাপের উপর নির্ভর করে : (1) রক্তজালিকার অভ্যন্তরস্থ রক্তচাপ (Pb), (2) প্লাজমা-প্রোটিনের অভিস্রবণচাপ (Po) এবং (3) বোম্যান ক্যাপসুলের আভ্যন্তরীণ চাপ (P_a)। গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ হারকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\text{সক্রিয় পরিস্রাবণচাপ} = K[(Pb - Pa) - Po]$$

K একটি ধ্রুবক, যা প্রধানত গ্লোমারুলাসস্থিত রক্তজালিকার ক্ষেত্রফল ও ভেদ্যতার সংগে সম্পর্কযুক্ত। অতএব গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ প্রধানত যেসব কারণের উপর নির্ভরশীল তাদের বর্ণনা নিম্নরূপ :

1. **রক্তজালিকার অভ্যন্তরস্থ রক্তচাপ (Pb) :** গ্লোমারুলাসের মধ্যে অবস্থিত রক্তজালিকার অভ্যন্তরস্থ রক্তচাপ (3নং তালিকা) গ্লোমারুলাসের

পরিস্রাবণের হারকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যান্য কারণসমূহ অপরিবর্তিত থাকলে অন্তর্মুখী উপধমনীর (arterioles) সংকোচন গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণকে হ্রাস করে এবং প্রসারণ পরিস্রাবণকে বৃদ্ধি করে। বৃক্ক স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার (autoregulation) মাধ্যমে গ্লোমারুলাসের উপধমনীর প্রতিরোধব্যবস্থাকে

3 নং তালিকা ঃ বিড়ালের গ্লোমারুলাসের উপধমনীর অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রান্তে চাপের মান (mmHg)

	অন্তর্মুখীপ্রান্ত	বহির্মুখী প্রান্ত
P_b	45	45
P_B	−10	−10
P_o	−20	−35
	15	0

নিয়ন্ত্রিত করে গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণকে স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিতিশীল রাখে (15-8 নং চিত্র)।
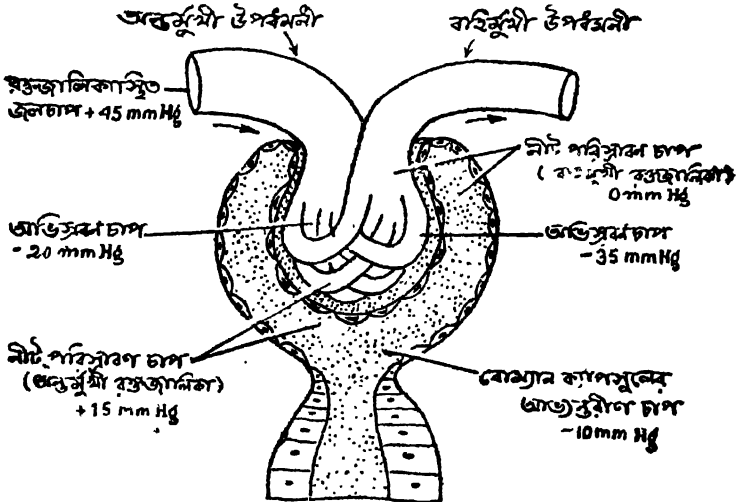
15-8 নং চিত্র ঃ গ্লোমারুলাসের প...স্রাবণে যেসব চাপ কাজ করে তাদের অবস্থান।

2. **প্লাজমাপ্রোটিনের অভিস্রবণচাপ** (Po) ঃ প্লাজমাপ্রোটিনের অভিস্রবণ চাপ প্রায় 20 থেকে 35 মিলিমিটার পারদ চাপের সমান। এই চাপ গ্লোমারু-

লাসের পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় বাধাদান করে। অতএব রক্তজালিকাস্থিত জলচাপ যখন এই চাপের সমপর্যায়ে নেমে আসে, তখন গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ বন্ধ হয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্লাজমাপ্রোটিনকে হঠাৎ লঘু করলে (সমসারক সোডিয়ামক্লোরাইডের দ্রবণ প্রবেশ করিয়ে) গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ ও মূত্রের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

3. **বোম্যানক্যাপসুলের আভ্যন্তরীণ চাপ** (Pb) : স্বাভাবিক অবস্থায় বোম্যানক্যাপসুলের আভ্যন্তরীণ চাপের পরিবর্তনে গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ সামান্যই পরিবর্তিত হয়। তবে নালীতে কোন কারণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে বোম্যান ক্যাপসুলের আভ্যন্তরীণ রক্তচাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, ফলে গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়।

4. **পরিস্রাবণঝিল্লির ভেদ্যতা** : স্বাভাবিকভাবে পরিস্রাবণঝিল্লির ভেদ্যতা প্রতি একক সক্রিয়তলে নির্দিষ্ট থাকে। পরিস্রাবণ-ঝিল্লিতে যে পরিস্রাবণরন্ধ্রের অস্তিত্ব রয়েছে তাদের ব্যাস প্রায় 100 Å। এই রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে সিরাম অ্যালবুমিন, সিরাম গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন প্রভৃতি বৃহদাকার অণুগুলো প্রবেশ করতে পারে না, তবে জিলাটিন, ডিমের অ্যালবুমিন প্রভৃতি সহজে অতিক্রম করতে পারে। অর্থাৎ 70,000 আণবিক ওজনসম্পন্ন অণু (6-7mμ আকৃতি) পরিস্রাবণঝিল্লিতে ভেদ্য হলেও, তার চেয়ে অধিক আণবিক ওজনসম্পন্ন পদার্থ একেবারেই ভেদ্য নয়। তবে রোগগ্রস্ত বৃক্কের পরিস্রাবণঝিল্লির ভেদ্যতা পরিবর্তিত হয়।

5. **পরিস্রাবণঝিল্লির সক্রিয় ক্ষেত্রফল** : পরিস্রাবণঝিল্লির সক্রিয় ক্ষেত্রফল প্রধানত দুটো জিনিষের ওপর নির্ভর করে : (a) একই সংগে সক্রিয় গ্লোমারুলাসের সংখ্যা এবং (b) প্রতিটি গ্লোমারুলাসে কর্মরত রক্তজালিকার সংখ্যা। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় মানুষের বৃক্কস্থিত সবকটি গ্লোমারুলাসই মূত্র উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে।

গ্লোমারুলাসস্থিত রক্তজালিকা দেহের অন্যান্য অংশের রক্তজালিকার চেয়ে আলাদা। এদের ভেদ্যতা দেহের অন্যান্য অংশের রক্তজালিকার ভেদ্যতার চেয়ে প্রায় 100 গুণ বেশী। অতএব প্রতিটি গ্লোমারুলাসের সবকটি রক্তজালিকাই যদি একই সংগে সক্রিয়ভাবে কাজ করে তবে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

রেচননালিকার কার্য
Tubular Function

গ্লোমারুলাসে কোন পদার্থ কতটুকু পরিস্রুত হল তার পরিমাণ GFR ও প্লাজমাতে পদার্থটির মাত্রার গুণফলের (GFRPm) সমান। রেচননালিকার কোষ এই পরিস্রুত তরলে কোন পদার্থকে যোগ করতে পারে (**রেচননালিকার ক্ষরণ**), কোন পদার্থকে অংশত বা সম্পূর্ণরূপে বিশোষণ করতে পারে, (**রেচননালিকার পুনর্বিশোষণ**) অথবা উভয় কার্যই করতে পারে। মূত্রে যে পদার্থটি রেচিত হয় তার পরিমাণ (UxV) পেতে গেলে গ্লোমারুলাসের পরিস্রুতে পদার্থটির পরিমাণের সংগে কতটা পদার্থ হস্তান্তরিত (transferred) হল তা যোগ করতে হয়। হস্তান্তরিত পদার্থের পরিমাণকে Tx দ্বারা চিহ্নিত করলে যখন পদার্থটি রেচননালিকার দ্বারা ক্ষরিত হবে তখন Tx এর মান ধনাত্মক হবে এবং যখন রেচননালিকার দ্বারা পুনর্বিশোষিত হবে তখন **Tx-এর মান ঋণাত্মক** হবে। কোন হস্তান্তর না হলে Tx শূন্য হবে (15-9 নং চিত্র)। মাইক্রোপাংকচার (micropuncture) কলাকৌশল ব্যবহার করে
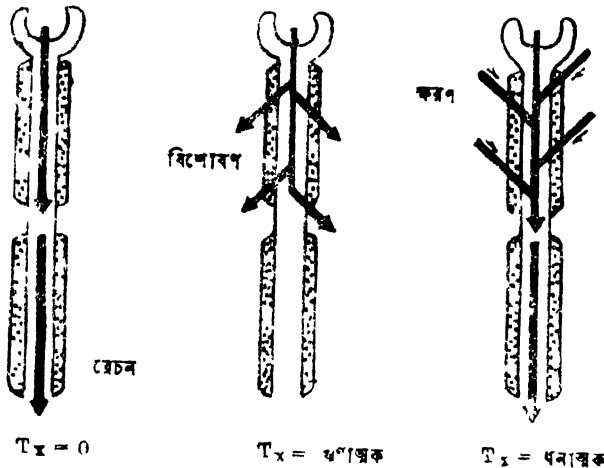
15-9 নং চিত্র : রেচননালিকার কার্যবিষয়ে ব্যাখ্যা।

গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ ও রেচননালিকার কার্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া গেছে (15-10 নং চিত্র)। এই কলাকৌশলে একটি মাইক্রোপিপেটকে জীবন্ত কিডনি

বাউবকের ব্যোমান ক্যাপসুলে বা নালিকায় প্রবেশ করিয়ে তার নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এবং সূক্ষ্ম রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার উপাদানের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। এই পদ্ধতির ব্যবহার করে অধুনা বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর কিডনিকে অনুশীলন করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে ইঁদুরের গ্লোমারুলাস, অগ্রভাগের রেচননালিকা প্রথম 70% হেনলি লুপের শীর্ষদেশ, দূরবর্তী রেচননালিকার সব অংশ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে তাদের উপাদানের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।
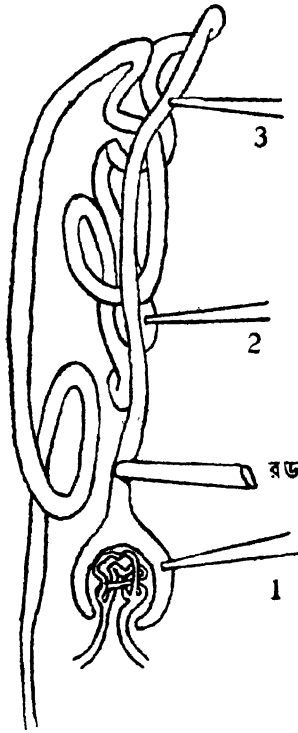
15—10 নং চিত্র : মাইক্রোপাংকচার পদ্ধতি 1, মাইক্রোপিপেটের দ্বারা গ্লোমারুলাসের পরিস্রুৎ সংগ্রহ। 2, 3-নেফ্রোনের অগ্রভাগ থেকে নমুনা সংগ্রহ।

রেচননালিকা পুনর্বিশোষণ ও ক্ষরণের মাধ্যমে কোন পদার্থকে রক্তে ফেরৎ নিয়ে আসে বা নালিকার তরলে ছেড়ে দেয়। পুনর্বিশোষণ **সক্রিয়** (active) ও **নিষ্ক্রিয়** (passive) পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। রেচননালিকার বিভিন্ন অংশ থেকে যেসব পদার্থ সক্রিয়ভাবে রক্তে পুনর্বিশোষিত হয় তাদের মধ্যে প্রধান : গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, Na^+, K^+, ফসফেট, সালফেট, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যাসকোরবিক অ্যাসিড, বিটাহাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড, অ্যাসিটো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন ইত্যাদি। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সামান্য প্রোটিন প্লাজমা থেকে পরিস্রুত হয় তা রেচননালিকার অগ্রভাগের ব্রাসবর্ডারে **পিনোসাইটোসিস** পদ্ধতিতে পুনর্বিশোষিত হয়। নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে প্রধানত জল ও ইউরিয়া পুনর্বিশোষিত হয়। ক্ষরণ পদ্ধতিতে যে সব পদার্থ নালিকা পরিমাণ তরলে মিশে তাদের মধ্যে প্রধান : প্যারাঅ্যামাইনো হিপ্পিউরিক অ্যাসিড

(PAH), ফেনোল রেড, পেনিসিলিন, ডায়োড্রাস্ট, আয়োপেক্স প্রভৃতি। এছাড়া K^+, H^+ ও ক্রিয়েটিনিনও রেচননালিকার দ্বারা ক্ষরিত হয়।

রেচননালিকায় প্রতিটি সক্রিয় পরিবহন সংস্থা সর্বাধিক যে পরিমাণ বস্তুকে একক সময়ে পরিবহণ করতে পারে তাকে তার **সর্বাধিক পরিবহন মাত্রা** (transport maximum) বলা হয়। দেখা গেছে Tm পর্যন্ত কোন পদার্থের বিশোষণের হার গ্লোমারুলাসের পরিস্রুতে নিহিত পদার্থটির পরিমাণের সংগে সমানুপাতিক। পরিস্রুতে পদার্থটির পরিমাণ আরোও বৃদ্ধি পেলে পরিবহন সংস্থা সংপৃক্ত হয়ে পড়ে, ফলে বিশোষণের হার আর তেমন বৃদ্ধি পায় না। কোন কোন সংস্থার Tm এত বেশী যে তাদের সংপৃক্ত করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

1. **গ্লুকোজ** (Glucose) ঃ গ্লুকোজ সক্রিয় পরিবহন পদ্ধতির মাধ্যমে মূত্র থেকে অপসারিত হয় এবং রক্তে প্রবেশ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মিনিটে প্রায় 100 মিলিগ্রাম গ্লুকোজ (80 মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার ×125 মি.লি./মি,) গ্লোমারুলাসে পরিস্রুত হয়। মাইক্রোপাংকচার অনুশীলনের দ্বারা জানা গেছে পরিস্রুত লুকোজের সবটুকুই রেচননালিকার প্রথম অংশ থেকে পুনর্বিশোষিত হয়। গ্লুকোজ বিশোষণের হার পরিস্রুত গ্লুকোজের পরিমাণের সংগে সমানুপাতিক এবং TmG পর্যন্ত প্লাজমা-গ্লুকোজের মাত্রার (PG) সংগে সমানুপাতিক ; কিন্তু TmG পেরিয়ে গেলে মূত্রে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুরুষে TmG প্রায় 375 মিলিগ্রাম/মিনিট এবং স্ত্রীলোকে 300 মিলিগ্রাম/মিনিট।

প্লাজমাতে গ্লুকোজের যে মাত্রায় মূত্রে এই শর্করার প্রথম আবির্ভাব হয় তাকে **রেনাল থ্রেশোল্ড** (renal threshold) বলা হয়।300 মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার (mg/dl) অর্থাৎ 375 মিলিগ্রাম/মিনিট-কে 125 মিলি/মি. (GFR) দ্বারা ভাগ করলে রেনাল থ্রেশোল্ড পাওয়া যায়। ধমনীস্থিত প্লাজমার প্রকৃত রেনাল থ্রেশোল্ড প্রায় 200 mg/dl , শিরারক্তে যার অনুরূপ মান প্রায় 180 mg/dl।

রেচননালিকায় গ্লুকোজের সক্রিয় পরিবহন প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে এখনও জানা সম্ভব হয়নি। উদ্ভিদজাত গ্লাইকোসাইড **ফ্লোরিজিন** (phlorhizin) গ্লুকোজের পুনর্বিশোষণে বাধা দেয়। জানা গেছে, এই পদার্থ জারণক্রিয়া ও অ্যাডেনিলিক অ্যাসিডের ফসফরাস সংযুক্তিতে বাধা দেয়, ফলে পুনর্বিশোষণের

জন্য ব্যয়িত জৈব শক্তি ব্যয়িত হতে পারে না (অ্যাডেনিলিক অ্যাসিড ফসফেটের সংগে যুক্ত হয়ে ATP উৎপন্ন করে)।

2. **সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্লোরাইড** (Na^+, K^+ ও Cl^-) : এই তিনটি আয়নই সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে পুনর্বিশোষিত হয়। এদের Tm নিম্ন মান থেকে উচ্চমানে পরিবর্তিত হয়, ফলে সঠিকভাবে তা এখনও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। রেচননালিকার প্রথম অংশ থেকেই প্রধানত এরা সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে পুনর্বিশোষিত হয়। Na^+ এছাড়াও রেচননালিকার দ্বিতীয় অংশ ও সংগ্রহনালিকা থেকেও সক্রিয়ভাবে পুনর্বিশোষিত হয়। Cl- হেনলী লুপের পুরু অগ্রবাহুতে সক্রিয়ভাবে পুনর্বিশোষিত হয়।

Na^+ প্রথমে রেচননালিকার নালীপথ (lumen) থেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে নালিকাপ্রাচীরের আবরণীকোষে এবং এবপর সক্রিয় পাম্পের মাধ্যমে আবরণী কোষ থেকে কলারসে প্রবেশ করে। নালিকাপ্রাচীরের আবরণী
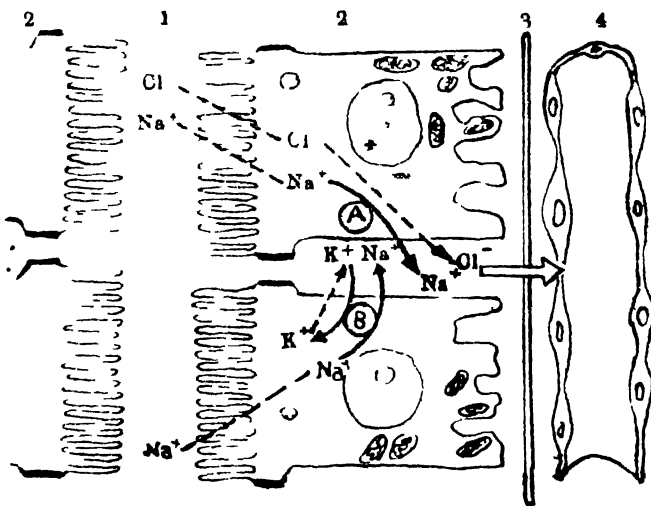
15—11 নং চিত্র : Na^+ এর সক্রিয় পরিবহনের দুটো পৃথক প্রক্রিয়া। অভগ্ন তীরচিহ্ন সক্রিয় পরিবহণ এবং ভগ্ন তীরচিহ্ন নিষ্ক্রিয় পরিবহণের পরিচায়ক। A পাম্প শুধু Na^+ কে পরিবহণ করে। অপরপক্ষে B পাম্প Na^+–K^+ বিনিময় পাম্প হিসাবে কাজ করে। 1-নালিকাপথ, 2-নালিকাকোষ, 3-ভিত্তিঝিল্লি, 4-রেচননালিকা বেষ্টিত রক্তনালী।

কোষের সংযোগস্থল নালীপথের দিকে খুব দৃঢ় (tight), কিন্তু পরবর্তী অংশে পার্শ্বদেশে কোষের অন্তবর্তী স্থান বেশ ফাঁকা। এই

ফাঁকা স্থানকে **পার্শ্বদেশীয় আন্তরকোষীয় স্থান** (lateral intercellular spaces) বলা হয়। Na^+ এই ফাঁকা স্থানেই কোষ থেকে সক্রিয় পাম্পের মাধ্যমে প্রবেশ করে (15—11 নং চিত্র)।

রেচননালিকায় 2টি পৃথক Na^+ পাম্প কাজ করে (1) প্রথম পাম্পটি Na^+ আয়নকে সক্রিয় পদ্ধতিতে কলারসে নির্গত করায় এবং Cl^- আয়ন নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে Na^+ এর সংগে বেরিয়ে আসে। নালিকারস থেকে ব্যাপনপ্রক্রিয়ায় কোষের Cl^- আয়ন প্রতিস্থাপিত হয়। এই পাম্পকে **ইলেক্ট্রোজেনিক Na^+ পাম্প** (electrogenic Na^+ pump) নামে অভিহিত করা হয় (15-11 নং চিত্রে A)। (2) দ্বিতীয় পাম্পটি যুগ্ম পরিবহণ পাম্প হিসাবে কাজ করে এবং প্রতিটি Na^+ আয়নের কোষ থেকে কলারসে প্রবেশের সংগে একটি K^+ আয়নের কলারস থেকে কোষে পরিবহণ হয়। এজাতীয় পরিবহনের ফলে উভয় পাশে আধানের কোন পরিবর্তন হয় না ফলে নালিকা প্রাচীরের কোষের ঝিল্লিবিভবের উপর কোন প্রভাব ফেলে না।

ইলেকট্রোজেনিক Na^+ পাম্প **ইথাক্রিনিক অ্যাসিডের** (ethacrynic acid) দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, অপরপক্ষে $Na^+ - K^+$ বিনিময় পাম্পকে **ওয়াবেইন** (Ouabain) নামক পদার্থ বাধা দেয়।

3. **অন্যান্য পদার্থের সক্রিয় বিশোষণ** (Other Substances Reabsorbed Actively) : অ্যামাইনো অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যাস্কোরবিক অ্যাসিড, কিটোন বডি, সালফেট, ফসফেট, প্রভৃতি সক্রিয় পরিবহণের মাধ্যমে বিশোষিত হয় এবং প্রধানত প্রথম সংবর্ত রেচননালিকার প্রথম চতুর্থাংশ থেকে। অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিবহণের বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে। দেখা গেছে, অধিকাংশ অ্যামাইনো অ্যাসিডের বাহকের সংগে সংযুক্তিতে Na^+ ও K^+ এর উপস্থিতি কাম্য।

4. **PAH এর ক্ষরণ :** সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে PAH রেচনালিকার তরলে ক্ষরিত হয়। রক্তের প্লাজমায় এই পদার্থটির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মূত্রে এর ক্ষরণও বৃদ্ধি পায় যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্ষরণ সর্বাধিক মাত্রায় (Tm PAT) পোঁছয়। দেখা গেছে, প্লাজমায় এর মাত্রা কম হলে অপসারণের হার (Clearance) বেশী হয়, কিন্তু প্লাজমায় PAH এর মাত্রা Tm PAH এর চেয়ে বৃদ্ধি পেলে পদার্থটির অপসারণ পর্যায়ক্রমে হ্রাস পায়।

5. **অন্যান্য পদার্থের ক্ষরণ** (Secretion of other substances): PAH ছাড়াও তার লব্ধ পদার্থ, ফেনোল রেড, পেনিসিলিন, আয়োডিনযুক্ত বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ যেমন ডায়োড্রাস্ট (diodrast) প্রভৃতি সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে রেচননালিকার মধ্যে ক্ষরিত হয়। এছাড়া দেহে স্বাভাবিকভাবে যে সব পদার্থ রেচননালিকার তরলে ক্ষরিত হয় তাদের মধ্যে প্রধান: বিভিন্ন ধরনের ইথারিয়েল সালফেট, স্টেরোয়েড, অন্যান্য গ্লুকুরোনাইড, 5-হাইড্রোক্সি ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং সেরোটোনিনের বিপাকলব্ধ পদার্থ। এদের প্রত্যেকেই মৃদু অ্যাসিড, তাই ক্ষরণের সময় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উদাহরণ স্বরূপ, PAH অ্যালডোস্টারোন লব্ধ পদার্থ 18-গ্লুকুরোনাইড ও 3-গ্লুকুরোনাইড এই উভয় পদার্থের ক্ষারণকে হ্রাস করে। অতএব একক পরিবহন সংস্থা এদের ক্ষরণে সক্রিয় আছে বলে জানা গেছে। এই পরিবহন সংস্থা প্রধানত রেচননালিকার প্রথম অংশেই সীমিত রয়েছে।

6. **ইউরিয়া** (Urea): কোন কোন প্রাণীতে ইউরিয়ার পরিবহন সক্রিয়, তবে মানুষের এখনও তা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়নি। দেখা গেছে, গ্লোমারুলার পরিস্রুতে নিহিত ইউরিয়া তখনই ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসে যখনই তার গাঢ়ত্ব পরিস্রুতের আয়তনহ্রাসের ফলে বৃদ্ধি পায়। যখন মূত্রের প্রবাহ হ্রাস পায় তখন রেচননালিকা থেকে বেশী পরিমাণ ইউরিয়া বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়, ফলে 10-20% এর বেশী ইউরিয়া মূত্রে রেচিত হয় না। তবে মূত্রের প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে 50-70% ইউরিয়া রেচিত হয়।

ইউরিয়া মেডালাস্থিত পিরামিডের কলারসে সঞ্চিত হতে থাকে কারণ ভ্যাসা রেকটার (vasa recta) প্রতিপ্রবাহী বিনিময় (countercurrent exchange) তাকে সেখানে আবদ্ধ করে রাখে।

জলের রেচন
Excretion of Water

স্বাভাবিক অবস্থায় গ্লোমারুলাসে প্রতিদিন প্রায় 180 লিটার পরিস্রুৎ উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে গড়ে প্রতিদিন 1 থেকে 1·5 মূত্র হিসাবে নির্গত হয়। গ্লোমারুলাসে পরিস্রুত জলের কমপক্ষে 88% রেচননালিকার প্রথম অংশে (proximal part) বিশোষিত হয়, এমনকি পরিস্রুতের পরিমাণ যখন 23 লিটারে নেমে আসে তখনও। পরিস্রুত জলের বাকী অংশের বিশোষণ মোট রেচিত পদার্থের উপর প্রভাব বিস্তার না করেই বাড়তে বা কমতে পারে।

1. **অগ্রবর্তী রেচননালিকা** (Proximal Renal Tubules) : রেচন-নালিকার প্রথম অংশ থেকে বহু পদার্থ সক্রিয়ভাবে পুনর্বিশোষিত হয়। তবু মাইক্রোপাংকচার পদ্ধতিতে অগ্রবর্তী রেচননালিকার প্রথম 70% ভাগ থেকে যে তরলপদার্থ সংগ্রহ করা গেছে তার থেকে জানা যায় এই তরল পদার্থ প্লাজমার সংগে সমঅভিস্রবণ সম্পন্ন। অগ্রবর্তী রেচননালিকার শেষাংশ অবধি এই সমতা বজায় থাকে। অতএব অগ্রবর্তী রেচননালিকায় পদার্থের সক্রিয় পরিবহনের দ্বারা সৃষ্ট অভিস্রবণচাপের নতিমাত্রায় জল নিষ্ক্রিয়ভাবে রেচন নালিকা থেকে বেরিয়ে আসে এবং সমসারক অবস্থা (isotonicity) বজায় রাখে। অগ্রবর্তী রেচননালিকার শেষপ্রান্তের তরলে নিহিত ইনুলিন এবং প্লাজমায় নিহিত ইনুলিনের গাঢ়ত্ব যেহেতু 4, অতএব এর থেকে প্রমাণিত হয় পরিস্রুত জল ও পরিস্রুত পদার্থের 75% অগ্রবর্তী রেচননালিকা থেকেই বিশোষিত হয়।

2. **হেনলীর লুপ** (Loop of Henle) : হেনলীর লুপের নিম্নবাহু জলভেদ্য, তাই এই অংশ থেকে অধিক পরিমাণে জলের বিশোষণ হয়, ফলে
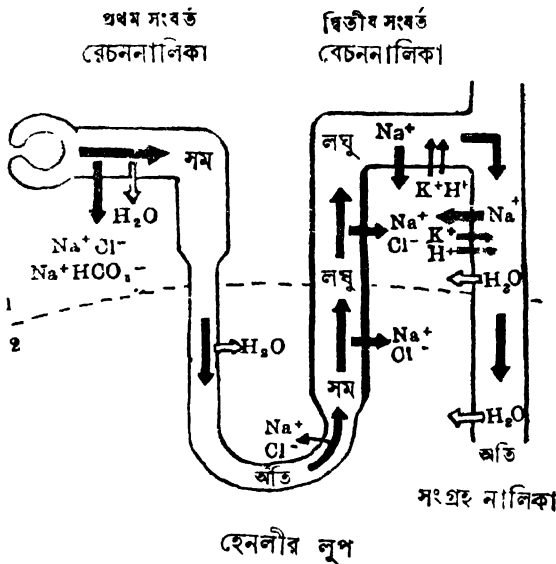
15-12 নং চিত্র : নেফ্রোনের বিভিন্ন অংশে মূত্রের অভিস্রবণ চাপের পরিবর্তন।
1. কর্টেক্স। 2. মেডালা।

নিম্নবাহুর মধ্যদিয়ে প্রবাহিত তরল অতিসারক (hypertonic) হয়ে পড়ে (15-12 নং চিত্র)। এই প্রক্রিয়াকে জলের **বাধ্যতামূলক পুনর্বিশোষণ**

(obligatory reabsorption) বলা যায়। হেনলীর লুপের ঊর্ধ্ব বাহুতে জলের এধরণের পুনর্বিশোষণ ব্যবস্থা না থাকায় সেখানে সক্রিয় পুনর্বিশোষণের মাধ্যমে Cl^- নির্গত হয় এবং Na^+ অ্যানায়ন হিসাবে তার সংগে বেরিয়ে আসে। ফলে হেনলীর লুপের ঊর্ধ্ব বাহুর তরল প্রথমে সমসারক ও পরে Na^+ ও Cl^- আরও বেরিয়ে গেলে লঘুসারকে (hypotonic) পরিণত হয়। হেনলীর লুপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় আরো 5% তরল হ্রাস পায়, এভাবে রেচন-নালিকার দূরবর্তী অংশে প্রবেশের আগে গ্লোমারুলাস পরিস্রুত তরলের 80% হ্রাস পায় (4 নং তালিকা)। হেনলীর লুপ আসলে **প্রতিপ্রবাহী বিবর্ধক** (countercurrent multiplier) হিসাবে কাজ করে যার শক্তি জুগান দেয় হেনলীর ঊর্ধ্ববাহুর পুরু অংশের মধ্য দিয়ে Cl^- এর সক্রিয় পরিবহণ। এছাড়া মেডালা ও প্যাপিলায় অতিসারক অবস্থার সৃষ্টিতে বিভিন্ন খণ্ডকের বিভিন্ন ভেদ্যতাও এর সহায়ক। মেডালা ও প্যাপিলাতে গাঢ়ত্বের নতিমাত্রা (concentration gradient) প্রতিষ্ঠার পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ: (a) হেনলীর লুপের জলের প্রতি ভেদ্যতা এবং অন্যান্য দ্রাব বস্তুর প্রতি অভেদ্যতা, (b) হেনলীর লুপের পাতলা অংশের N^+ ও Cl^-

4নং তালিকা: নেফ্রোনের বিভিন্ন অংশে জলের পুনর্বিশোষণ। মাইক্রোপাংকচার পরীক্ষায় C^{14} ইনুলিনের নালিকাতরল / প্লাজমা অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছে।

অবস্থান	ইনুলিনের (C^{14}) নালিকা তরল/প্লাজমা অনুপাত	গ্লোমারুলার পরিস্রুতের অবশিষ্ট অংশ (%)	প্রতিস্রুত জলের পুনর্বিশোষিত অংশ (শতাংশে)
বোম্যান ক্যাপসুল	1	100	75 (অগ্রবর্তী রেচননালিকায়)
অগ্রবর্তী রেচননালিকার মধ্য ও শেষ তৃতীয়াংশের সংযোগস্থল	3	33	
অগ্রবর্তী রেচননালিকার শেষপ্রান্ত	4	25	
দূরবর্তী রেচননালিকার শুরু	5	20	5 (হেনলীর লুপ)
দূরবর্তী রেচননালিকার শেষপ্রান্তে	20	5	15 (দূরবর্তী রেচন-নালিকায়) 4 86
গবিনি	6 90	0 14	(সংগ্রহনালিকায়)

এর প্রতি সহজ ভেদ্যতা এবং ইউরিয়ার প্রতি তুলনামূলকভাবে কম ভেদ্যতা,

(c) পুরু ঊর্ধ্ব বাহুতে ক্লোরাইডের সক্রিয় পরিবহন। (d) সংগ্রহ নালিকার জলের প্রতি ভেদ্যতা ও প্যাপিলাস্থিত সংগ্রহ নালিকার ইউরিয়ার প্রতি ভেদ্যতা এবং (e) ভাসা রেকটাতে রক্তপ্রবাহ থাকা।

3. **দূরবর্তী রেচননালিকা ও সংগ্রহনালিকা** (Distal Tubule & Collecting Duct) : দূরবর্তী রেচননালিকা ও সংগ্রহনালিকায় জলের ও অভিস্রবণচাপের পরিবর্তন পশ্চাৎ-পিটুইটারী নিঃসৃত **ভেসোপ্রেসিন** বা **অ্যাণ্টিডাইউরেটিক হরমোনের** (A D H) উপব নির্ভর করে। এই হরমোন নালিকাপ্রাচীরের আবরণীকোষের জলের প্রতি ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে। মানুষ এবং বানরে এই হরমোনটি শুধুমাত্র সংগ্রহনালিকার উপর কাজ করে; অন্যান্য প্রাণীতে দূরসংবর্ত রেচননালিকার উপরও ক্রিয়া করে জলের ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে (15-13 নং চিত্র)। ফলে এই অংশে জলের পুনর্বিশোষণ বৃদ্ধি পায়। একে জলের **বিভাগীয় পুনর্বিশোষণ** (facultative reabsorption) বলা হয়। রক্তে ADH এর মাত্রা হ্রাস পেলে মূত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এর অভাবে **বহুমূত্র রোগের** (diabetes insipidus) সৃষ্টি হয়।
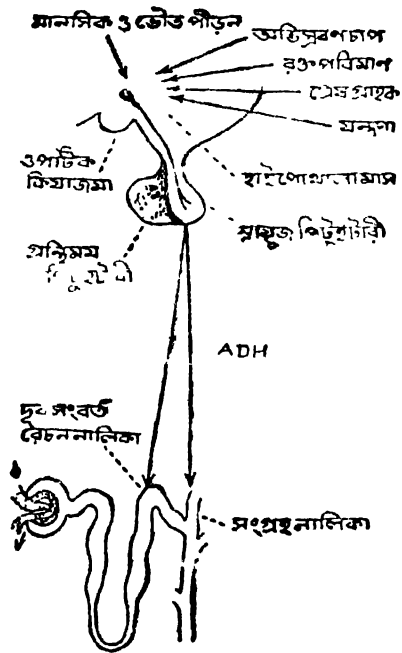
15-13 নং চিত্র : জলের পুনর্বিশোষণে ADH হরমোনের প্রভাব।

ইঁদুরে ভেসোপ্রেসিনের উপস্থিতিতে জল দূরবর্তী রেচননালিকা থেকে বেরিয়ে আসে, ফলে নালিকার মধ্যবর্তী অংশে তরল সমসারক দ্রবণে পরিবর্তিত হয়। Na^+ সক্রিয় পাম্পক্রিয়ায় বেরিয়ে আসে এবং তারও সংগে আরো কিছু পরিমাণ জলও নির্গত হয়; এভাবে তরলের পরিমাণ আরোও হ্রাস পায়। সমসারক দ্রবণ এরপর সংগ্রহনালিকায় প্রবেশ করে এবং অতিসারক দ্রবণ মেডালারী পিরামিডের মধ্য দিযে প্রবাহিত হয়, যার প্রভাবে নালিকা থেকে জল আরো

বেরিয়ে আসে, ফলে নালিকাতরল আরও গাঢ় হয়। এভাবে নালিকাতরল পুনরায় অতিসারক হয়ে পড়ে। দেখা গেছে, জলাভাবগ্রস্ত ইঁদুরে এভাবে পরিস্রুত জলের প্রায় 99 86% পুনর্বিশোষিত হয় এবং মূত্র প্লাজমার চেয়ে প্রায় 6·4 গুণ বেশী গাঢ় হয়ে ওঠে।

প্রতিপ্রবাহী প্রক্রিয়া
The Countercurrent Mechanism

কিডনি বা বৃক্কের মেডালারী পিরামিড বরাবর ক্রমবর্ধমান অভিস্রবণ চাপের নতিমাত্রা বজায় রাখতে হেনলীর লুপ ও ভাসা রেকটার ভূমিকাই প্রধান, কারণ
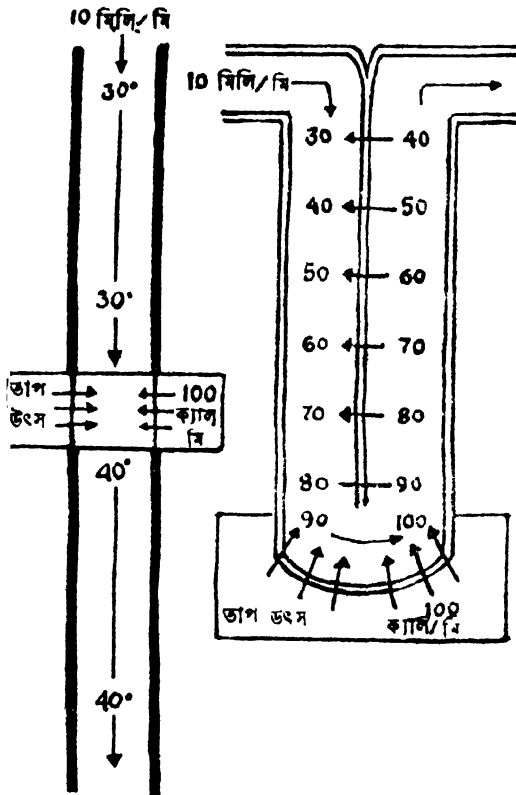
15-14 নং চিত্র: প্রতিপ্রবাহী সংস্থার কার্যপদ্ধতি। বাঁপাশে একটি পাইপের চারিপাশে তাপযন্ত্র পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তাপমাত্রাকে 10° ডিগ্রি বৃদ্ধি করে।

হেনলীর লুপ **প্রতিপ্রবাহী বিবর্ধক** (Countercurrent multipliers) এবং

ভাসারেকটা প্রতিপ্রবাহী বিনিময় সহায়ক (counter current exchanger) হিসাবে কাজ করে। প্রতিপ্রবাহী সংস্থা হল এমন একটি সংস্থা যেখানে অন্তঃপ্রবাহ কিছুদূর পর্যন্ত বহিঃপ্রবাহের সংগে সমান্তরালভাবে কিন্তু বিপরীত মুখে অন্তরঙ্গভাবে প্রবাহিত হয়। এরকম একটি সংস্থার সক্রিয়তা 15 14 নং চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে যেখানে পাইপের একটি লুপের শীর্ষদেশে তাপ প্রয়োগে উষ্ণতাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহির্মুখী তরলের তাপ অন্তর্মুখী তরলের তাপমাত্রাকে এমন ভাবে বৃদ্ধি করে যাতে যে সময়ে এটি তাপযন্ত্রে (heater) পেঁছয় তখন তার তাপমাত্রা 30° বদলে 90° সেলসিয়াসে উন্নীত হয় এবং তাপযন্ত্র বা হিটার তরলের এই তাপমাত্রাকে 30° থেকে 40° ডিগ্রির বদলে 90° থেকে 1C0° ডিগ্রিতে তুলে আনে। হেনলীয় লুপও অনুরূপভাবে কাজ করে। হেনলী লুপের নিম্নগ শাখা তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন পদার্থের প্রতি অভেদ্য, কিন্তু জলের প্রতি অতিভেদ্য। অতএব জল অন্তঃ কোষীয় তরলে বা কলারসে প্রবেশ করে এবং নালিকাতরলে Na^+এর গাঢ়ত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। হেনলী-লুপের পাতলা উর্ধ্ব বাহু তুলনামূলকভাবে জলের প্রতি অভেদ্য কিন্তু Na^+ ও ইউরিয়ার প্রতি ভেদ্য, শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইউরিয়ার চেয়ে Na^+ এর ভেদ্যতা বেশী। ফলে Na^+ গাঢ়ত্বের নতিমাত্রায় নিষ্ক্রিয়ভাবে নালিকা থেকে নির্গত হয়।

হেনলী লুপের উর্ধ্বগ পুরু বাহু জল ও বিভিন্ন পদার্থের প্রতি তুলনামূলকভাবে অভেদ্য, কিন্তু Cl-এই অংশে সক্রিয়ভাবে পুনর্বিশোষিত হয় এবং Na নিষ্ক্রিয়ভাবে তাকে অনুসরণ করে। দূরসংবর্ত রেচনালিকা ও সংগ্রহ-নালিকার বাইরের অংশ তুলনামূলক ভাবে ইউরিয়ার প্রতি অভেদ্য কিন্তু ভেসোপ্রেসিনের উপস্থিতিতে জলের প্রতি ভেদ্য। ফলস্বরূপ জল নালীপথ থেকে বেরিয়ে আসে এবং তরলে ইউরিয়াব গাঢ়ত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সবশেষে, সংগ্রহ নালিকার অন্তঃস্থ মেডালা অংশ ইউরিয়ার প্রতি ভেদ্য হয় এবং ভেসোপ্রেসিনের উপস্থিতিতে জলের প্রতিও ভেদ্য হয়। ইউরিয়া তাই নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্তঃকোষীয় তরলে নির্গত হয় ও মেডালারী পিরামিডের অধিক অভিস্রবণচাপ বজায় রাখে। অতিরিক্ত জলও নালিকা থেকে নির্গত হয় এবং তরল অতিশয় গাঢ় হয়ে ওঠে।

Na^+ ও ইউরিয়া রক্তসংবহনের মাধ্যমে অপসারিত হলে মেডালারী পিরামিডের অভিস্রবণচাপের নতিমাত্রা আর বজায় থাকে না। ভাসা রেক্টা

প্রতিপ্রবাহী বিনিময় সহায়ক হিসাবে কাজ করার ফলে এই পদার্থগুলো প্রধানত পিরামিডে থেকে যায়। কর্টেক্সের দিকে প্রবাহিত রক্তনালী থেকে এসব পদার্থ বেরিয়ে আসে এবং নিম্নদিকে মেডালা অভিমুখী যেসব রক্তনালী প্রভাবিত হয় তাতে প্রবেশ করে। বিপরীতক্রমে, নিম্নগামী রক্তনালী থেকে জল বেরিয়ে আসে এবং উর্ধ্বপ্রবাহী রক্তনালীতে প্রবেশ করে। অতএব দ্রাবপদার্থের মেডালাতেই সংবহনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং জলের প্রবণতা এদের থেকে দূরে সরে যাওয়া, যাতে অতিসারকত্ব (hypertonicity) বজায় থাকে। পিরামিডে সংগ্রহনালিকা থেকে যে জল অপসারিত হয় তা ভাসা রেকটার দ্বারাও অপসারিত হয় এবং সাধারণ রক্তসংবহনে প্রবেশ করে। তবে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিপ্রবাহী বিনিময় একটি নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি এবং ভাসা রেকটার ভেদ্য প্রাচীরের মধ্য দিয়ে জল ও দ্রাবপদার্থের উভয়মুখী ব্যাপনের উপর এটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তাছাড়া প্রতিপ্রবাহী বিনিময় হেনলী লুপের প্রতিপ্রবাহী বিবর্ধন ব্যতিরেকে পিরামিড বরাবর অভিস্রবণচাপের নতিমাত্রা বজায় রাখতে পারেনা।

মূত্র উৎপাদনের উপর প্রভাববিস্তারকারী কারণসমূহ

Factors Affecting the Formation of Urine

যে সব কারণ মূত্রউৎপাদনের উপর প্রভাববিস্তার করে তারা নিম্নরূপ ঃ

1. **জলগ্রহণ** (Water Intake) ঃ জল প্রচুর পরিমাণে (1-2 লিটার) গ্রহণ করলে 15-30 মিনিট বিরতির পরই তরল মূত্রের উৎপাদন বা **ডাইউরেসিস** (diuresis) শুরু হয়। দ্বিতীয় ঘণ্টায় মূত্র উৎপাদন সর্বাধিক হয় এবং মূত্রত্যাগ ঘণ্টায় 130 মিলিলিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে (স্বাভাবিক মূত্র উৎপাদন ঘটায় 50 মিলিলিটার)। এরপরই মূত্রউৎপাদন হ্রাস পায় এবং ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এমন কি 5 লিটার জলকে ঘণ্টা দুয়েক ধরে পান করলেও বৃক্ক তাকে 4 থেকে 5 ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে সমর্থ হয়।

2. **স্যালাইন ইনজেকশন** (Saline injection) ঃ প্রচুর পরিমাণে স্যালাইনকে শিরায় ইনজেকট করলে মিনিট কয়েক বিরতির পরই লবু মূত্র-উৎপাদন শুরু হয়। দ্বিতীয় ঘণ্টায় ইহা সর্বাধিক হয় এবং তারপরই ধীরে ধীরে

হ্রাস পায়। রেচননালিকার পুনর্বিশোষণের হ্রাসপ্রাপ্তিই এর প্রধান কারণ। এছাড়া রক্ত লঘু হবার ফলে কোলয়েড অভিস্রবণ চাপ হ্রাস পায়। ফলে লঘু-মূত্র উৎপাদনের ইহা অংশগ্রহণ করে।

3. **স্যালাইনের গ্রহণ** (Intake of saline): সমসারক লবণজল 1 লিটার পর্যন্ত পান করলেও মূত্রউৎপাদনের কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। তবে ঘণ্টায় 3 লিটার লবণজল গ্রহণ করলে মাঝারি ধরনের ডায়উরেসিস দেখা যায় এবং সর্বাধিক 300 মিলিলিটার মূত্র নির্গত হতে দেখা যায়। এছাড়া মূত্রত্যাগ এরপরও 24 ঘণ্টা ধরে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী থাকে (ঘণ্টায় 100 মিলিলিটারের উর্ধ্বে)।

4. **অধিক বা কম পরিমাণে লবণের গ্রহণ** (Intake of excess or less salts): পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, 28 গ্রাম NaCl গ্রহণ করলে মূত্রউৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ঘণ্টায় 1∠0 মিলিলিটারে দাঁড়ায়। 3-12 ঘণ্টার মধ্যে মূত্রে NaCl-এর পরিমাণ সর্বাধিক (3·4%) দেখা যায় (স্বাভাবিক 1%)। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বলা যায়, লবণের রেচন তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

অপরপক্ষে খাদ্যে লবণ না গ্রহণ করলে অথবা অত্যধিক স্বেদক্ষরণের মাধ্যমে দেহ থেকে লবণ বর্জন করলে, প্রথমে প্লাজমা ক্লোরাইডের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং মূত্রেও ক্লোরাইডের রেচন হ্রাস পায়। পরিশেষে পুনর্বিশোষণের দরুণ মূত্রে Cl-এর রেচন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় বৃক্কের স্বাভাবিক কার্য বিশেষভাবে ব্যাহত হয়, যদিও রক্তচাপ অপরিবর্তিত থাকে। গ্লোমারুলার পরিস্রাবণ প্রায় 30% হ্রাস পায়, ইউরিয়া-অপসারণের 40-80% হ্রাস প্রাপ্তি ঘটে, রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এভাবে ইউরেমিয়ার প্রকাশ ঘটে।

5. **জলাভাব** (Water deprivation): বয়স্ক লোকে জলাভাবে বৃক্কীয় রক্তসংবহনের কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। প্লাজমা পরিমাণ বা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না, কারণ কলাস্থান থেকে তরলপদার্থ রক্তে প্রবেশ করে। তবে দৈহিক ওজন প্রায় 3-5 কেজি হ্রাস পায়। গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ প্রায় ৮০ শতাংশ হ্রাস পায় এবং মূত্রের পরিমাণ ঘণ্টায় 30-40 মিলিলিটার হ্রাস পায়। এই পরিস্থিতিতে মূত্রে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ফসফেট এবং অন্যান্য কঠিন পদার্থের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রতি

ঘণ্টায় মূত্রের রেচন 30 মিলিলিটারের চেয়েও হ্রাস পেলে মূত্রের সংগে কঠিন পদার্থের রেচন হ্রাস পায় এবং রক্তে তাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।*

শিশুদের ক্ষেত্রে জলাভাব দুরবস্থার সৃষ্টি করে, কারণ শিশুদের বৃক্ক সম্পূর্ণভাবে বিকাশলাভ করতে পারে না এবং মূত্রকে গাঢ় করতে পারে না। অতএব নির্দিষ্ট পরিমাণ কঠিন পদার্থকে দেহ থেকে নির্গত করতে হলে অধিক জলের প্রয়োজন হয়। ফলে জলাভাবে (উদরাময়, বমি ইত্যাদিতে) রক্তে ইউরিয়া ও অন্যান্য নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং ইউরেমিয়া উৎপন্ন করে।

6. **পেশীসঞ্চালন** (Exercise) **:** পেশীসঞ্চালন মূত্রের পরিমাণ হ্রাস করে। আবেগময় পরিস্থিতিতে একই ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ধারণা করা হয় পেশীসঞ্চালন ও আবেগময় পদ্ধতি হাইপোথালামো-পিটুইটারী প্রক্রিয়ার উপর ক্রিয়া করে ADH-এর ক্ষরণ বৃদ্ধি করে ও মূত্রের পরিমাণ হ্রাস করে। ভারী পেশীসঞ্চালনের পর মূত্রের পরিমাণ আরও হ্রাস পায় এবং এক্ষেত্রে মূত্র অম্লধর্মী হয়ে পড়ে।

মূত্রবিবর্ধক

Diuretics

যেসব পদার্থ মূত্রের জল বা তড়িদ্‌বিশ্লেষ্যের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে তাদের **মূত্রবিবর্ধক** বা **ডাইউরেটিক্স** (diuretics) বলা হয়। এসব মূত্রবিবর্ধকের ক্রিয়াপদ্ধতি 5 নং তালিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইথাইল অ্যালকোহল সরাসরি হাইপোথালামাসের উপর ক্রিয়া করে। জ্যানথিনের (xanthines) মূত্রবিবর্ধক ক্রিয়া দুর্বল। NH_4Cl-ও দেহে মূত্রবিবর্ধক হিসাবে কাজ করতে পারে। দেহে NH_4Cl-কে প্রবেশ করালে NH_4^+ বিয়োজিত হয়ে H^+ ও NH উৎপন্ন করে। NH_3 ইউরিয়াতে রূপান্তরিত হয়, ফলে NH_4Cl অনেকটা HCl এর মত কাজ করে। H^+ আয়ন প্রশমিত হয় এবং Cl-আয়ন Na এর সংগে পরিস্রুত হয়। এভাবে তড়িৎ প্রশমন বজায় থাকে। রেচননালিকা থেকে কোন Na^+ আয়ন H^+ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত না হতে পারলে Na^+ ও জল মূত্রে নির্গত হয়। অ্যাসিড উৎপাদক অন্যান্য লবণও একইভাবে মূত্রবিবর্ধক হিসাবে কাজ করে।

কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ক্রিয়ায় বাধাদানকারী ওষুধ মোটামুটিভাবে মূত্র বিবর্ধক হিসাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু এরা কার্বনিক অ্যাসিডের

সরবরাহ বন্ধ করে অ্যাসিডের ক্ষরণে বাধাদান করে সেহেতু H^+ আয়নের ক্ষরণ হ্রাস পাওয়ার ফলে শুধুমাত্র Na^+ এর রেচনই বৃদ্ধি পায় না তার সংগে HCO_3^--এর পুনর্বিশোষণও হ্রাস পায়; এবং যেহেতু H^+ ও K^+ আয়ন পরস্পর এই Na^+ আয়নের সংগেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, সেক্ষেত্রে H^+ এর ক্ষরণের হ্রাসপ্রাপ্তি K^+ এর ক্ষরণ ও রেচনকে বৃদ্ধি করে।

K^+ কি হারে ক্ষরিত হবে তা আর একটি অবস্থার উপর নির্ভর করে। তা হল দূরবর্তী রেচননালিকায় Na^+-K^+ 'বিনিময়' স্থলে কতটা Na^+ সরবরাহ করে তার উপর। দেখা গেছে থায়াজাইড (thiazides), ফিউরোসেমাইড (furosemide), ইথাক্রিনিক অ্যাসিড (ethacrynic acid) এবং বুমেটেনাইড (bumetanide) এই বিনিময়স্থলের সামান্য উপরে কাজ করে। ফলে Na^+ এর সরবরাহ বৃদ্ধির সংগে K^+ এর ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। থায়াজাইড Cl-এর পরিবহনেও বাধা সৃষ্টি করে, বিশেষত প্রান্তীয় কর্টেক্সের হেনলী লুপের ঊর্ধ্ববাহু ও দূরসংবর্ত রেচননালিকার প্রথম অংশে। অপরপক্ষে ফিউরোসেমাইড, ইথাক্রিনিক অ্যাসিড এবং বুমেটেনাইড মেডালার হেনলীলুপের পুরু ঊর্ধ্ব বাহুতে Cl-এর পরিবহনে বাধাদান করে।

5 **নং তালিকা** ঃ বিভিন্ন ধরনের মূত্রবিবর্ধকের ক্রিয়াপদ্ধতি।

পদার্থ	ক্রিয়াপদ্ধতি
জল	ভেসোপ্রেসিনের ক্ষরণে বাধা দেয়
ইথাইল অ্যালকোহল	ভেসোপ্রেসিনের ক্ষরণে বাধা দেয়
জ্যানথিন (ক্যাফেইন, থিওফাইলিন)	Na^+ এর পুনর্বিশোষণ হ্রাস করে এবং GFR বৃদ্ধি করে
NH_4Cl, $CaCl_2$ প্রভৃতি অ্যাসিড উৎপাদক লবণ	অ্যাসিড সরবরাহ করে
পারদের জৈব লবণ ঃ মারক্যাপটোমেরিন (থায়োমেরিন), মেরালুরাইড (মারকিউহাইড্রিন)	মেডালার হেনলী লুপের পুরু বাহুতে Cl^--এর পুনর্বিশোষণে বাধা; K^+ ক্ষরণে বাধা।

পদার্থ	ক্রিয়াপদ্ধতি
কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজকে বাধাদানকারী পদার্থ (ডায়ামোক্স)	নেফ্রোনের সর্বত্র H^+ ক্ষরণ হ্রাস করে এবং Na^+ ও K^+ রেচন বৃদ্ধি করে।
থায়াজাইড (ডাইউরিল), মেটোলাজোন (জারোক্সোলিন)	হেনলী লুপের দূরবর্তী কর্টেক্স অংশ এবং দূরসংবর্ত রেচননালিকার প্রথম অংশে Cl-এর পুনর্বিশোষণে বাধা সৃষ্টি।
ফিউবোসেমা ড, এথাক্রিনিক অ্যাসিড ও বুমেটেনাইড।	মেডালার হেনলীলুপের ঊর্ধ্ব প্রবাহের Cl-এর পুনর্বিশোষণে বাধা সৃষ্টি।

মূত্রের পরিমাণ ও বিশেষত্ব

Volume and Characteristics of Urine

1. **পরিমাণ** (Volume) : প্রতিদিন গড়ে 1 থেকে 1·5 লিটার মূত্র উৎপন্ন হয়। তবে একজন স্বাভাবিক বয়স্ক লোকে এর পরিমাণ 600 মিলিলিটার থেকে 2500 মিলিলিটার পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। মূত্রের প্রায় অর্ধেক ঘুমের সময় উৎপন্ন হয়। এছাড়া জলগ্রহণ, খাদ্য, পরিবেশীয় উষ্ণতা, মানসিক অবস্থা, শারীরিক অবস্থা প্রভৃতির উপর মূত্র উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে।

2. **বর্ণ** (colour) : মূত্রের বর্ণ কিঞ্চিৎ হলদে। ইউরোক্রোম (urochrome) নামক রঞ্জক পদার্থের উপর মূত্রের এই বর্ণ নির্ভর করে। এছাড়া মূত্রের পরিমাণ ও গাঢ়ত্বের পরিবর্তনে বর্ণের পরিবর্তন আসে। জ্বরের সময় মূত্র গাঢ় হলুদ বা পিঙ্গল বর্ণের হয়। ভিটামিন রাইবোফ্লেভিন গ্রহণ করলে মূত্রে তা নির্গত হয় এবং মূত্রকে আরো হলুদ করে তুলে। যকৃৎরোগে পিত্তরঞ্জক কণার উপস্থিতির জন্য মূত্রের বর্ণ সবুজ, বাদামী বা গাঢ় হলুদ হতে পারে। রক্ত ও হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির জন্য ধোঁয়াটে থেকে লাল বর্ণের হতে পারে। হমোজেনটেসিক অ্যাসিড, মেথেমোগ্লোবিন প্রভৃতির উপস্থিতিতে মূত্রের বর্ণ গাঢ় বাদামী হয়।

3. **আপেক্ষিক গুরুত্ব** (Specific Gravity) : স্বাভাবিক মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1 01 থেকে 1.05 এর মধ্যে থাকে। অত্যধিক জলগ্রহণে আপেক্ষিক গুরুত্বের মান 1·003 তে নেমে আসে, আবার রক্তের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি

পেলে এর মান 1·0 40 এ উন্নীত হতে পারে। দ্রাব পদার্থের উপস্থিতির সংগে মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব সমানুপাতিক ; অপরপক্ষে মূত্রের পরিমাণের সংগে ব্যস্তানুপাতিক।

4. **বিক্রিয়া** (Reaction) ঃ তাজা মূত্র স্বচ্ছ ও অম্লধর্মী। মূত্রের pH 4·5 থেকে 8·2 পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে। 24 ঘণ্টায় সংগৃহীত মিশ্র মূত্রের গড় pH 6। মূত্রকে ফেলে রেখে দিলে তা ক্ষারধর্মী হয়ে ওঠে ; এর কারণ মূত্রের ইউরিয়া NH_3 ও CO_2-এ পরিণত হয়। অত্যধিক বমির পর মূত্র সাধারণ ক্ষারধর্মী হয়ে পড়ে। এ ছাড়া পাকস্থলীতে অত্যধিক HCl উৎপন্ন হলেও মূত্র ক্ষারধর্মী হয়ে পড়ে।

5. **ঘোলাটেভাব** (Turbidity) ঃ সাধারণভাবে তাজা মূত্র স্বচ্ছ, কিন্তু ক্ষারীয় মূত্রকে কিছুক্ষণ রেখে দিলে সাদা মেঘের মত অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে। ক্যালসিয়াম ফসফেটের অধঃক্ষেপ সৃষ্টিই এর কারণ। অসুস্থ অবস্থায় মিউকোয়েড, মিউকোপ্রোটিন, আবরণীকোষ, পুঁজকোষ প্রভৃতির উপস্থিতির জন্য মূত্র ঘোলাটে হতে পারে।

6. **গন্ধ** (Odour) ঃ মূত্রের একটি নিজস্ব বিশেষ গন্ধ আছে। উদ্বায়ী জৈব পদার্থের উপস্থিতির জন্য এর গন্ধ খানিকটা অ্যারোমেটিক (aromatic)। এছাড়া দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ ইউরিনোডের (C_6H_8O) উপস্থিতির জন্য মূত্রের গন্ধ হয়। মধুমেহ রোগে মূত্রে মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়, তবে মধুমেহের তীব্রতার বৃদ্ধিতে মূত্রে অ্যাসিটোনের গন্ধ পাওয়া যায়। স্বাভাবিক মূত্রকে ফেলে রেখে দিলে অ্যামোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়, কারণ ইউরিয়া অ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত হয়।

মূত্রের উপাদান

Composition of Urine

মূত্রের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উপাদানের পর্যালোচনা নিম্নে করা হল ঃ

1. **মূত্রের স্বাভাবিক উপাদান** (Normal Composition of Urine) ঃ মিশ্র আহার্যগ্রহণকারী একজন বয়স্ক লোকের পুরো একটা দিনের বা 24 ঘণ্টার সংগৃহীত মূত্রে যে সব বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় 6নং তালিকায় তা' সন্নিবেশিত হল। মূত্রের pH গড়ে 6 এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.002-1.040 (মূত্রের গাঢ়ত্বের সংগে সমানুপাতিক)। প্রতি লিটার মূত্রের প্রায় 50 গ্রাম কঠিন পদার্থ থাকে। কঠিন পদার্থের মধ্যে জৈব ও অজৈব

এই উভয় প্রকার পদার্থের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। অজৈব পদার্থের মধ্যে যেমন সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড, ফস্‌ফরাস, সালফার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়োডিন প্রভৃতি প্রধান, তেমনি, জৈব পদার্থের মধ্যে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিন, প্রোটিন, হিপ্‌পিউরিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড, কিটোন বডি, পিউরিন বেস, অ্যালানটোইন ফেনোল প্রভৃতি প্রধান।

2. **মূত্রের অস্বাভাবিক উপাদান** (Abnormal Constituents of the Urine): মূত্রে যে সব অস্বাভাবিক উপাদান সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় সংক্ষেপে তাদের নিম্নে বিবৃত করা হল :

(a) **প্রোটিন :** স্বাভাবিক অবস্থায় মূত্রে 30-200 মিলিগ্রামের বেশী প্রোটিন দেখা যায় না। মূত্রে অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিনের অস্বাভাবিক উপস্থিতিকে **প্রোটিনুরিয়া** (proteinuria) বলা হয়। প্রোটিনুরিয়াকে 3 ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় : (i) **শারীরবৃত্তীয় প্রোটিনুরিয়া,** (ii) **বিকারতত্ত্বীয় প্রোটিনুরিয়া,** এবং (iii) **বেনস্‌-জোনস্‌ প্রোটিন।**

(i) শারীরবৃত্তীয় প্রোটিনুরিয়া : অত্যধিক শ্রমসাধ্য কাজ বা পেশী-সঞ্চালন বা অধিক প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ প্রভৃতি কারণে প্রায় 0·5 শতাংশ প্রোটিন মূত্রে নির্গত হয়। এছাড়া 30-35 শতাংশ ক্ষেত্রে এজাতীয় প্রোটিনুরিয়া স্ত্রীলোকের গর্ভবিস্থার সংগে জড়িত।

(ii) বিকারতত্ত্বীয় প্রোটিনুরিয়া : বিভিন্ন বৃক্করোগে মূত্রে প্রোটিন নির্গত হয়। যেমন, মূত্রের নির্গমনপথের নিম্নাংশে প্রদাহ, গ্লোমারিউলাসস্থান প্রদাহ (glomerulonephritis), শোথযুক্ত বৃক্ককাঠিন্য (nephrosclerosis) প্রভৃতি রোগে বিকারতত্ত্বীয় প্রোটিনুরিয়ার উদ্ভব ঘটে।

(iii) বেনস্‌জোনস্‌ প্রোটিন : গ্লোবিউলিনজাতীয় এই বিশেষ ধরনের প্রোটিনটি মাল্‌টিপল্‌ মায়েলোমা, লিউকোমিয়া, হজ্‌কিন্‌ রোগ, লিম্ফোস্যার্‌-কোমা প্রভৃতি রোগ মূত্রে দেখা যায়।

(b) **গ্লুকোজ :** স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিদিন 1 গ্রামের বেশী গ্লুকোজ মূত্রে নির্গত হয় না। যে অবস্থায় মূত্রে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বেনেডিক্‌ট ও ফেলিংগের বিকারককে বিজারিত করতে সক্ষম হয়, তাকে **গ্লুকোসুরিয়া** (glucosuria) বলা হয়। গ্লুকোসুরিয়া দুরকমের হয় : (i) **সাময়িক গ্লুকোসুরিয়া :** নানাপ্রকার মানসিক আবেগ, উত্তেজনা প্রভৃতি

6 নং তালিকা ঃ মূত্রের স্বাভাবিক উপাদান।

পরিমাণ	ঃ 600—2500 মিলিলিটার
pH	ঃ 6 0 (4 7—8)
আপেক্ষিক গুরুত্ব	ঃ 1 010—1·040
কঠিন পদার্থ	ঃ 50 গ্রাম লিটার (30—70 গ্রাম)

অজৈব পদার্থ ঃ

NaCl	... 10 গ্রাম (9-16)	ক্যালসিয়াম	0 2 গ্রাম (0 1-0 2)
KCl	... 2 গ্রাম	ম্যাগনেসিয়াম	..0 15 গ্রাম (0 05-0 2)
ফসফরাস	... 2 2 গ্রাম (2-2·5)	আয়োডিন	...50·250 মাইক্রোগ্রাম
সালফার	... 2 গ্রাম (0 7-3 5) (SO_2 হিসাবে)	আরসেনিক	.05 g বা আরো কম
		সীসা	..50 μg বা কম

জৈব পদার্থ ঃ

নাইট্রোজেন (মোট)	..25 35 গ্রাম	ইউরিক অ্যাসিড	...0 7 গ্রাম (0 5-0 8)
ইউরিয়া	25-30 গ্রাম	ক্রিয়েটিন	...50-150 মিলিগ্রাম
ক্রিয়েটিনিন	. 1 4 গ্রাম (1-1 8)	প্রোটিন	...0-0 2 গ্রাম
অ্যামোনিয়া	...0 7 গ্রাম (0.3-1)	হিপপিউরিক অ্যাসিড	...0 7 গ্রাম

অন্যান্য জৈব পদার্থ ঃ

অক্সালিক অ্যাসিড	.15-20 মিলিগ্রাম	কিটোনবডি	3-15 মিলিগ্রাম
ইনডিক্যান	...4 20 মিলিগ্রাম	অ্যালানটোইন	30 মিলিগ্রাম
পিউরিন বেস	...10 মিলিগ্রাম	ফেনোল	...0 2-0 5 গ্রাম

শর্করা ঃ ভূরিভোজনের পর 50 শতাংশ লোকের ক্ষেত্রে প্রতি 100 মিলিলিটার মূত্রে 2-3 মিলিগ্রাম শর্করা দেখা যায়। মধুমেহে প্রতিদিন 100 গ্রাম শর্করা রেচিত হতে পারে।

অ্যাসকোরবিক অ্যাসিড ঃ বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে প্রতিদিন 15-50 মিলিগ্রাম অ্যাসকরবিক অ্যাসিড রেচিত হয়।

জাত এবং (ii) মধুমেহজাত গ্লুকোসুরিয়া। 15 শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, গ্লুকোসুরিয়া মধুমেহজাত নয়।

(c) **অন্যান্য শর্করা :** (i) দেহে শুধুমাত্র ফ্রাক্‌টোজের বিপাক কোন কারণে ব্যাহত হলে, মূত্রে **ফ্রাক্‌টোজ** নির্গত হয় (ফ্রাক্‌টোসুরিয়া)। এই অবস্থা সচরাচর দেখা যায় না। (ii) গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী স্ত্রীলোকের মূত্রে **গ্যালাক্‌টোজ** ও **ল্যাক্‌টোজ** নির্গত হতে পারে (গ্যালাক্‌টোসুরিয়া ও ল্যাক্‌টোসুরিয়া)। (iii) কুল, জাম, আম, আঙুরফল, খেজুর প্রভৃতি পেন্‌টোজ শর্করাসম্পন্ন ফল অধিক পরিমাণে খেলে সাময়িকভাবে **পেন্‌টোজ** মূত্রে নির্গত হয় (পেন্‌টোসুরিয়া)। **এল জাইলুলোজের ত্রুটিসঞ্জাত বিপাকক্রিয়ার ফলে বংশজাত পেন্‌টোসুরিয়া দেখা যায়।**

(d) **কিটোনবডি :** স্বাভাবিকভাবে 3-15 মিলিগ্রাম কিটোকনবডি মূত্রে নির্গত হয়। অনশনে, কার্বহাইড্রেটের বিপাকক্রিয়া ব্যাহত হলে (মধুমেহে), স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায়, ইথার প্রয়োগে, কোন কোন ক্ষারাধিক্যজনিত অবস্থা প্রভৃতিতে মূত্রে কিটোনবডির নির্গমণ বৃদ্ধি পায়।

(e) **স্নেহদ্রব্য :** অ্যাল্‌কোহল ও ফসফরাস বিষক্রিয়ায় মূত্রে স্নেহদ্রব্য নির্গত হয় (লাইপুরিয়া)। নানাপ্রকার বৃক্করোগেও স্নেহদ্রব্য মূত্রে নির্গত হয়।

(f) **বিলিরুবিন :** পাণ্ডুরোগে (jaundice) মূত্রে বিলিরুবিন নির্গত হয়।

(g) **রক্ত :** বৃক্কপ্রদাহরোগে (হেমাচুরিয়া), মূত্র নির্গমনপথের বা বৃক্কের ক্ষত বা আঘাত প্রভৃতি থেকে মূত্রে রক্ত নির্গত হয়। কালাজ্বর, তীব্র অগ্নিদগ্ধ অবস্থা প্রভৃতি কারণে রক্তের বিনাশ (hemolysis) দ্রুত বৃদ্ধি পেলে মূত্রে হিমোগ্লোবিন নির্গত হয় (হিমোগ্লোবিনুরিয়া)। মূত্রে রক্ত নির্গত হলে তার বর্ণ ধোঁয়াটে রক্তিম হয়।

বৃক্কের কার্য সম্বন্ধীয় পরিক্ষাবলী

Renal Functional Tests

বৃক্ককে বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। কোন কোন অবস্থায় বৃক্কের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী সরাসরি পরিবর্তিত হয়, যার ফলে তার মধ্যে বিকারতত্ত্বীয় পরিবর্তন (pathological changes) সংঘটিত হয়। অন্যান্য অবস্থায় পরোক্ষভাবে বৃক্কের কার্যাবলীর পরিবর্তন আসে এবং এক্ষেত্রে বৃক্কের গঠনগত কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। এসব অবস্থা বা পরিস্থিতিতে

বৃক্কের কার্যবলীর পরিবর্তনের প্রকৃতি ও পরিমাণ কতটুকু তার নির্ধারণ করা যায় কিছুসংখ্যক পরীক্ষার মাধ্যমে। এই পরীক্ষার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে বিবৃত হল :

1. **মূত্র পরীক্ষা** (Urine Analysis) : শুধুমাত্র মূত্র পরীক্ষার মাধ্যমে বৃক্কের কার্য সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। (a) **আপেক্ষিক গুরুত্ব :** মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণের মাধ্যমে রেচন নালিকার অভিস্রবণ বিষয়ক কার্য-ক্ষমতার নির্ধারণ করা যায়। ক্রোনিক নেফ্রাইটিজে (chronic nephritis) রেচননালিকার এ ক্ষমতার বিলোপ পায় ফলে, নিম্নআপেক্ষিক গুরুত্বের (1010) মূত্র রেচিত হয়। (b) **স্বাভাবিক উপাদানের অস্বাভাবিক উপস্থিতি :** জল, লবণ, অ্যামোনিয়া, অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন প্রভৃতি কমবেশী মূত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু মূত্রে এদের উপস্থিতি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেলে বৃক্কের কোনরূপ বিকার তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। যেমন, কোন সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই যখন দেখা যায় 4-5 লিটার মূত্র নির্গত হয়, তখন তা দূরসংবর্ত রেচন নালিকায় ত্রুটিপূর্ণ জল বিশোষণের ইংগিত দেয় (বহুমূত্র রোগ)। তেমনি মূত্র উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেলে নেফ্রাইটিজের (nephritis) ইংগিত দেয়। একইভাবে মূত্রে অস্বাভাবিক লবণের উপস্থিতি রেচননালিকার ত্রুটিপূর্ণ বিশোষণের ইংগিত দেয় (অ্যাডিসোন রোগ)। (c) **আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা :** আণুবীক্ষণিক যন্ত্রের সাহায্যে মূত্রে লোহিতকণিকা, পুঁজকোষ, বিছিন্ন আবরণী কোষ প্রভৃতির উপস্থিতি সনাক্ত করা যায়, যা বৃক্কের অস্বাভাবিক অবস্থার উল্লেখ করে।

2. **রক্ত পরীক্ষা** (Blood analysis) : রক্তের ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন, কোলেসটারোল, অ্যালবুমিন / গ্লোবিউলিন অনুপাত প্রভৃতির নির্ধারণ করে বৃক্কের কার্যবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

3. **রেনাল বায়োপ্সী** (Renal biopsy) : বৃক্কের রেনাল বায়োপ্সী-নীড্‌ল প্রবেশ করিয়ে বায়োপ্সী পদার্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর। এর থেকে বৃক্কের কার্যাবলীর মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

4. **রেনোগ্রাম, পাইলোগ্রাফি ইত্যাদি** (Renogram, Pylography etc) : ক্যাথেটারের সাহায্যে বৃক্কধমনীতে বর্ণ প্রবেশ করিয়ে তার ছবি তোলা সম্ভবপর হয়। এর দ্বারা বৃক্কের রক্তনালীর বিন্যাস সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য জানা সম্ভবপর। তেমনি অন্তঃশিরা বা প্রতীপ পাইলোগ্রাফির (retrogaphy) দ্বারা বৃক্কের কার্যাবলী সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

5. **অপসারণ পরীক্ষা** (Clearance test) : প্রতি মিনিটে কোন পদার্থের যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ মূত্রে নির্গত হয়, তা যে পরিমাণ প্লাজমার মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারে, পরিমাণগতভাবে প্লাজমার সেই অংশকে পদার্থটির **প্লাজমা-অপসারণ** (plasma clearance) বা শুধু **অপসারণ** বলা হয়।
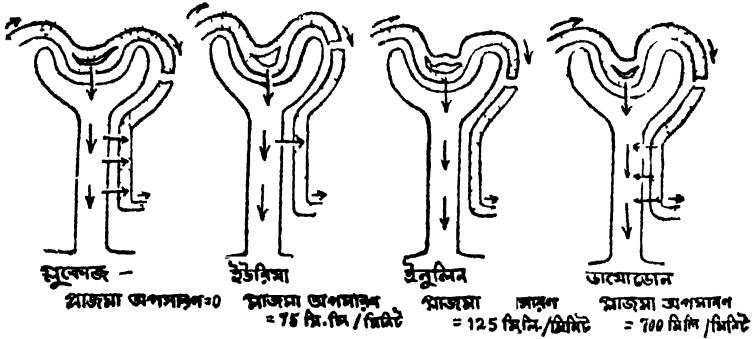
15-15 নং চিত্র : অপসারণ।

যেমন প্রতি মিনিটে কোন পদার্থ যদি 4 মিলিগ্রাম হিসাবে মূত্রে নির্গত হয় এবং 120 মিলিলিটার প্লাজমা এই নির্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থকে প্রতি মিনিটে সরবরাহ করে, তবে পদার্থটির প্লাজমা-অপসারণ 120 মিলিলিটারের সমান হবে। অর্থাৎ 120 মিলিলিটার প্লাজমা গ্লোমারুলাসের মাধ্যমে পরিস্রুত ও বৃক্কনালিকার দ্বারা পুনর্বিশোষিত হয়ে প্রতি মিনিটে পদার্থটি থেকে আলাদা হয়। অতএব বলা চলে, বৃক্ক যে ক্ষমতাবলে বিভিন্ন পদার্থটিকে প্লাজমা থেকে অপসৃত করতে পারে তারই সূচক প্লাজমা-অপসারণ। পর পর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট প্লাজমা-অপসারণমূল্য নির্ণয় করে বিভিন্ন রোগে এর কী পরিবর্তন হয়, তার তুলনা করা যায় এবং এভাবে বৃক্কের সক্ষমতার যাচাই করা সম্ভবপর হয়। নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে কোন পদার্থের অপসারণ মান নির্ণয় করা যায় :

$$\text{প্লাজমা-অপসারণ} = \frac{UxV}{Pm}$$

এখানে, Ux = প্রতি 100 মিলিলিটার মূত্রে পদার্থের পরিমাণ,

V = প্রতি মিনিটে মূত্র-নির্গমনের পরিমাণ,

Pm = প্রতি 100 মিলিলিটার প্লাজমাতে m-পদার্থের পরিমাণ।

উদাহরণ : প্রতি 100 মিলিলিটার প্লাজমা ও মূত্রে ইনুলিনের (inulin) পরিমাণ যথাক্রমে 50 মিলিগ্রাম (0.05 গ্রাম) ও 6.25 গ্রাম হলে এবং প্রতি মিনিটে 1 মিলিলিটার মূত্র নির্গত হলে, ইনুলিনের প্লাজমা-অপসারণ হবে :

$$\text{ইনুলিন প্লাজমা-অপসারণ} = \frac{6.25}{0.05} = 25 \text{ মিলিলিটার / মিনিট।}$$

3 প্রকার অপসারণ মান পাওয়া সম্ভবপর। যথা :

(a) ব্যবহৃত পদার্থ যদি গ্লোমারুলাসে পরিস্রুত হয় কিন্তু বৃক্কনালিকার দ্বারা পুনর্বিশোষিত বা ক্ষরিত না হয়, তবে সেই পদার্থের প্লাজমা-অপসারণ গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ হারের সমান হবে (15-15 নং চিত্র)। যেমন, **ইনুলিন অপসারণ** (inulin clearance-125 মিলিলিটার / মিনিট)।

(b) যখন কোন পদার্থ গ্লোমারুলাসের দ্বারা পরিস্রুত হয় এবং বৃক্কনালিকার দ্বারা কিয়দংশ পুনর্বিশোষিত হয়, তখন তার অপসারণমান গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণহারের চেয়ে কম হয়। যেমন, **ইউরিয়া-অপসারণ** (urea clearance-75 মিলিলিটার / মিনিট)।

(c) যখন কোন পদার্থ গ্লোমারুলাসের দ্বারা পরিস্রুত হয় এবং বৃক্কনালিকার দ্বারাও ক্ষরিত হয়, তখন তার অপসারণমান গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণ-হারের চেয়ে বেশী হয়। যেমন, **ডায়োডোন-অপসারণ** (diodone clearancc 700 মিলিলিটার / মিনিট)।

(d) গ্লুকোজ গ্লোমারুলাসে পরিস্রুত হবার পর যেহেতু সম্পূর্ণভাবে পুনর্বিশোষিত হয়, সেহেতু তার অপসারণমান শূন্য হয় (15-15 নং চিত্র)।

অম্লক্ষারকের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ
Regulation of Acid-Base Balance

দেহরসের H^+ আয়নের তীব্রতাকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখার পদ্ধতিকে **অম্লক্ষারকের সাম্যাবস্থার নিয়ন্ত্রণ** নামে অভিহিত করা হয়। দেহে প্রধানত H^+ আয়ন বা প্রোটোনের উৎপাদন, তাদের ব্যবহার ও রেচনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে এই সাম্যাবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বৃক্ক এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সংগে বিশেষভাবে জড়িত। দেখা গেছে, রক্তে H^+ আয়নের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে (অম্লাধিক্যে) নালিকারস থেকে ক্ষারকীয় পদার্থের পুনর্বিশোষণ বৃদ্ধি পায় এবং মূত্রের অম্লত্ব প্রায় 1000 গুণ অধিক হয়। **অপরপক্ষে রক্তে H^+** আয়নের

তীব্রতা যখন স্বাভাবিকের চেয়ে হ্রাস পায় (ক্ষারাধিক্যে), তখন বৃক্কনালিকা থেকে অম্লপদার্থের পুনর্বিশোষণ বৃদ্ধি পায়।

বৃক্ক যে সব পদ্ধতির মাধ্যমে অম্লক্ষারের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে তা নিম্নরূপ :

(a) **বৃক্কনালিকার দ্বারা H^+ আয়নের ক্ষরণ :** বৃক্কনালিকাস্থিত কোষসমূহ (হেনলী লুপ ছাড়া) নালিকারসে H^+ ক্ষরণ করে এবং একই সংগে ক্ষারকীয় আয়ন বিশোষণ করে। নালিকাকোষের মধ্যে যে বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, তা নিম্নরূপ :

$$CO_2+H_2O \xrightarrow{\text{কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ}} H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$$
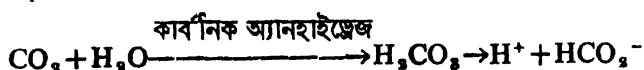
এভাবে উৎপন্ন H^+ আয়ন কোষঝিল্লির মাধ্যমে নির্গত হয় এবং Na^+ কোষ-ঝিল্লির মধ্য দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে ও বাইকার্বনেট উৎপন্ন করে। সোডিয়াম বাইকার্বনেট এরপর কোষ থেকে দেহরসে প্রবেশ করে। বৃক্কনালিকায় যে

প্লাজমা	নালিকাকোষ	নালিকারস
	H_2O+CO_2	
	কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ $\rightleftharpoons$	$Na^+HCO_3^-$
	H_2CO_3 ↓	↓
$Na^+HCO_3^-$ ←	← HCO_3^-	← Na^+
	+ H^+ →	+ → HCO_3^-
	↑	↓ H_2CO_3 ↓
	$H_2CO_3 \rightleftharpoons H_2O+$ ←	CO_2 + H_2O

H^+ আয়ন প্রবেশ করে তা' অম্লধর্মী আয়নের সংগে বিক্রিয়া করে Na^+ আয়নকে মুক্ত করে। নালিকারসের HCO_3^- আয়ন হাইড্রোজেন আয়নের সংগে যুক্ত হয়ে H_2CO_3 উৎপন্ন করে, যা বিশ্লিষ্ট হয়ে CO_2 এবং H_2O উৎপন্ন করে। এভাবে উৎপন্ন CO_2 নালিকাকোষে প্রবেশ করে সমপরিমাণ H_2CO_3 উৎপন্ন করে, যা বিশ্লিষ্ট হয়ে $H^+ - Na^+$ বিনিময়ের H^+ ও HCO_3^- আয়নের জোগান দেয়।

(b) **ফসফেট প্রক্রিয়া ঃ** অম্লাধিক্যে অধিক পরিমাণে অম্ল ফসফেট এবং ক্ষারাধিক্যে অধিক পরিমাণে ক্ষারকীয় ফসফেট মূত্রে নির্গত হয়। নালিকারসে

প্লাজমা	নালিকাকোষ	নালিকারস
CO_2 ——	——————→ CO_2 ←——	—CO_2
	CO_2 ↑ (বিপাক) + H_2O ↓ H_2CO_3 ↓	$Na_2H^+PO_4^=$ ↓
$NaHCO_3$ ←	——————— HCO_3^- ←——	—Na^+
	+ H^+ ———	→ $Na^+HPO_4^=$ ↓ $Na^+H_2PO_4^-$ (মূত্রে)
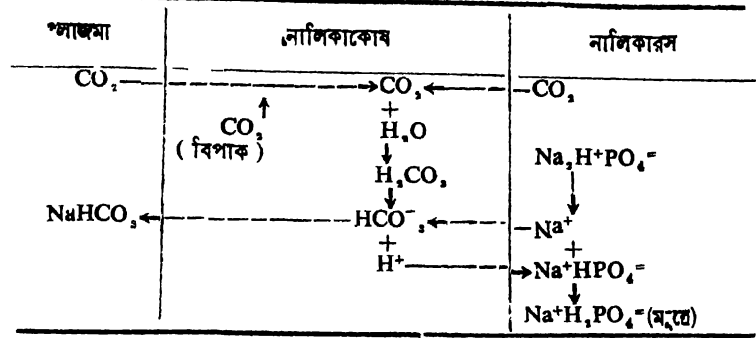
HPO_4^- আয়ন প্রধানতঃ H^+-গ্রাহক হিসাবে কাজ করে এবং $Na^+H_2PO_4^-$ (অম্ল ফসফেট) হিসাবে মূত্রে নির্গত হয়। Na^+ এবং HCO_3^- প্লাজমাতে প্রবেশ করে এবং H^+ আয়ন মূত্রে নির্গত হয়।

(c) **অ্যামোনিয়া উৎপাদন ও অম্লক্ষারের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ ঃ** বৃক্কের নালিকাকোষে **ডিঅ্যামাইনেজ** এনজাইমের উপস্থিতির দরুণ গ্লুট্যামিক অ্যাসিড ও অন্যান্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। গ্লুট্যামিক অ্যাসিড থেকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য অ্যামাইনোঅ্যাসিড থেকে এক-তৃতীয়াংশ অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া নালিকারসে
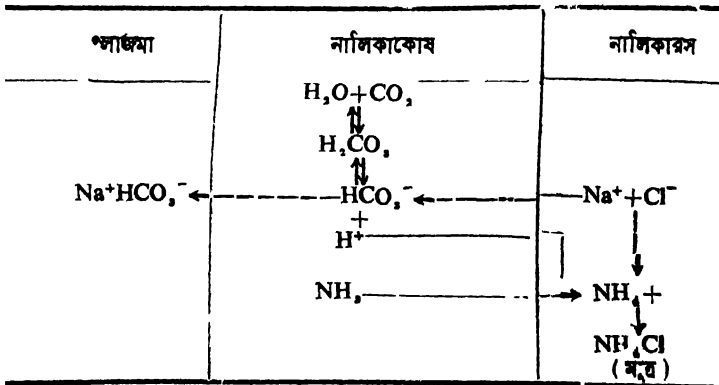
প্রবেশ করে এবং অ্যাসিড মূলকের সংগে যুক্ত হয়ে ক্ষারক (Na^+, K^+ ইত্যাদি) মুক্ত করে, যারা পুনর্বিশোষিত হয়ে দেহরসের ক্ষারের পরিমাণ বজায় রাখতে সহায়তা করে।

(d) **অ্যাসিডক্ষরণ ঃ** বৃক্ক কিছু সংখ্যক অ্যাসিডকে (ইউরিক অ্যাসিড, হিপ্‌পিউরিক অ্যাসিড, অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, বিটা-হাইড্রোক্সিবিউটিরিক অ্যাসিড প্রভৃতিকে) সরাসরি রেচন করে দেহের অম্লক্ষারের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে কিছুটা সহায়তা করে।

(e) **ক্ষারকীয় পদার্থের ক্ষরণ ঃ** বৃক্ক অধিক ক্ষারকীয় পদার্থের রেচন করে অম্লক্ষারের সাম্যাবস্থায় অংশগ্রহণ করে।

মূত্রত্যাগ প্রণালী
Micturition

বৃক্কে যে মূত্র উৎপন্ন হয় তা দুটো গবিনীর মাধ্যমে মূত্রথলীতে প্রবেশ করে। মূত্র সেখানে জমা হয় এবং সময়ে সময়ে দেহের বাইরে নিঃসৃত হয়। মূত্র-থলীতে যখনই প্রায় 400 মিলিলিটার মূত্র জমা হয়, তখনই মূত্রত্যাগের ইচ্ছে জাগে।

1. **মূত্রথলী** (Urinary bladder) **:** মূত্রথলী দুটো অংশের সমন্বয়ে গঠিত ঃ (1) **ত্রিকোণাঞ্চল** (trigone) এবং (2) **দেহ** (body)। ত্রিকোণাঞ্চলে গবিনী ও মূত্রনালী যথাক্রমে প্রবেশ করে ও নির্গত হয়। গবিনীর প্রবেশমুখে পুরু পেশীদ্বারা গঠিত যে তির্যক কপাটিকাসদৃশ রন্ধ্র থাকে, তা মূত্রথলী থেকে গবিনীতে মূত্রের প্রবেশে বাধাদান করে। মূত্রনালীর নির্গমনমুখে **অন্তঃস্থ পেশীবলয়** এবং একটু দূরে **বহিঃস্থ পেশীবলয়** অবস্থিত। বহিঃস্থ-পেশীবলয় দুটো ঐচ্ছিক পেশীস্তর নিয়ে গঠিত এবং এটি ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্তঃস্থ পেশীবলয় টানটান অবস্থায় সংকুচিত হতে থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত মূত্রথলীর মূত্রচাপ বৃদ্ধি পেয়ে তাকে উন্মুক্ত করে। অন্তঃস্থ পেশীবলয় হাইপোগ্যাসট্রিক স্নায়ু (কটিখণ্ডক) এবং পেলভিক স্নায়ু বা শ্রোণীস্নায়ু (ত্রিকাস্থিখণ্ডক) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (15-16 নং চিত্র)।

ফাঁকা মূত্রথলী **ডেট্রুসোর** (detrusor) পেশী দ্বারা গঠিত। অভ্যন্তরভাগ পরিবর্তনশীল আবরণীকলা দ্বারা গঠিত। মূত্রসঞ্চয়ের সময় মূত্রথলী প্রসারিত হয় এবং মূত্রত্যাগের সময় পেশীসমূহ সংকুচিত হয়। এই সংকোচন মূত্রত্যাগ প্রতিবর্তের অধীন।

2. **মূত্রথলীর স্নায়ুসংযোগ ও স্নায়ুসমূহের কার্যাবলী** (Innervation of bladder and the functions of the nerves) ঃ (a) **চেষ্টীয়স্নায়ু ঃ স্বতন্ত্র ও পরাস্বতন্ত্র** এই উভয় উৎস থেকেই চেষ্টীয় স্নায়ু উৎপন্ন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় কটিখণ্ডক থেকে স্বতন্ত্র স্নায়ু উৎপন্ন হয়ে পার্শ্বদেশীয় স্বতন্ত্র চেন, সেমিলুনার, সুপিরিওর এবং মেসেনটেরিক গ্যানগ্লিয়ন-এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে এবং পরিশেষে প্রিস্যাকরাল (presacral) স্নায়ুতে গিয়ে প্রবেশ [illegible] শংযোক্ত স্নায়ু দুটো হাইপোগ্যাসট্রিক স্নায়ুতে দ্বিধা বিভক্ত হয় ও হাইপোগ্যাসট্রিক গ্যানগ্লিয়নে গিয়ে শেষ হয়। গ্যানগ্লিয়ন থেকে নির্গত স্নায়ুতন্তু (postganglionic fiber) মূত্রথলীর অন্তঃস্থ পেশীবলয় এবং গবিনির প্রথমাংশে স্নায়ুসরবরাহ করে। পরাস্বতন্ত্র স্নায়ু প্রধানতঃ দ্বিতীয় ত্রিকাস্থিখণ্ডক (এবং সম্ভবত তৃতীয় ত্রিকাস্থিখণ্ডক) থেকে উৎপন্ন হয়ে পেলভিক স্নায়ুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় হাইপোগ্যাসট্রিক গ্যানগ্লিয়নে গিয়ে প্রবেশ করে। গ্যানগ্লিয়ন থেকে উৎপন্ন স্নায়ু মূত্রথলীতে প্রবেশ করে।

15-16 নং চিত্র ঃ L-কটিখণ্ডক, S-ত্রিকাস্থিখণ্ডক

কার্য ঃ স্বতন্ত্র হাইপোগ্যাসট্রিক স্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রযোগ করলে মূত্রাশয়ের পেশী প্রসারিত হয় এবং অন্তঃস্থ পেশীবলয় সংকুচিত হয়। এই স্নায়ু তাই মূত্রাশযে প্রসারণ ঘটায় এবং মূত্রাশয়েব সুষ্ঠু পূর্তিতে সহায়তা করে। এই কার্য সম্পাদন করে বলে হাইপোগ্যাসট্রিক স্নায়ুকে **পূর্তিস্নায়ু** (nerve of filling) নামে অভিহিত করা হয।

অপরপক্ষে, পরাস্বতন্ত্র পেলভিক স্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রদান করলে মূত্রাশয়ের তীব্র সংকোচন ঘটে এবং অন্তঃস্থ পেশীবলয়ের প্রসারণ ঘটে, ফলে মূত্রাশয় শূন্য বা খালি হয়। এই কার্য সম্পাদনের জন্য পেলভিক স্নায়ুকে

শূন্যকারীস্নায়ু (nerves of emptying) বা **মূত্রত্যাগের স্নায়ু** (nerve of micturition) নামে অভিহিত করা হয়।

(b) **সংজ্ঞাবহ স্নায়ু** (Afferent fibers) : মূত্রাশয়, অন্তঃস্থ পেশীবলয় এবং গবিনির প্রথম অংশ থেকে সংজ্ঞাবহ স্নায়ু উৎপন্ন হয়ে স্বতন্ত্র স্নায়ুর মধ্য দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় কটিখণ্ডক ও নিম্ন বক্ষখণ্ডকে প্রবেশ করে। এছাড়া শ্রোণীগত পরাস্বতন্ত্র স্নায়ুর মাধ্যমেও তারা সুষুম্নাকাণ্ডে প্রবেশ করে, বিশেষত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রোণীখণ্ডকে।

কার্য : সংজ্ঞাবহ স্নায়ু দুটি কার্য সম্পাদন করে : (a) মূত্রাশয়ের প্রসারণ কতটুকু হয়েছে তার ইংগিত দেয় এবং (b) মূত্রাশয় থেকে যন্ত্রণার অনুভূতি পরিবহন করে।

3. **মূত্রত্যাগের পদ্ধতি** (Mechanism of Micturition) : মূত্রথলীকে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূত্রশূন্য করা হয় তার নাম মূত্রত্যাগ। 400 মিলিলিটার মূত্র যখন মূত্রথলীতে জমা হয় এবং প্রায় 10/15 সেণ্টিমিটার জলচাপের সৃষ্টি করে তখনই কোন বয়স্ক লোকের মূত্রত্যাগের ইচ্ছা প্রকট হয়ে ওঠে। অবশ্য জোর করে এই ইচ্ছাকে থামিয়ে রাখা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মূত্রের পরিমাণ দ্বিগুণিত হচ্ছে এবং প্রায় 100 সেণ্টিমিটার জলচাপ সৃষ্টি করছে। এই সময়ে অনুভূতি যন্ত্রণাদায়ক হয় এবং মূত্রত্যাগকে তখন আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

3,(a) **মূত্রত্যাগ প্রতিবর্ত** (Micturition Reflex) : মূত্রত্যাগ একটি প্রতিবর্ত প্রক্রিয়া। মূত্রথলীতে মূত্রের সঞ্চয়ের ও চাপবৃদ্ধির ফলে মূত্রথলীর প্রাচীরগাত্রের সংজ্ঞাবহ স্নায়ুপ্রান্তে উদ্দীপনার উদ্ভব হয়, যা সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মাধ্যমে স্নায়ুকেন্দ্রে পেঁছয়। স্নায়ুকেন্দ্র চেষ্টীয় স্নায়ুর মাধ্যমে যে স্নায়ুপ্রবাহ প্রেরণ করে তা (i) মূত্রথলীর প্রাচীরস্থ সমগ্র পেশীতে ছড়িয়ে পড়ে (ফলে ডেট্রুসোর পেশী সংকুচিত হয়) এবং (ii) পেশীবলয়ের টানটান সংকোচনে বাধাদান করে (ফলে পেশীবলয় উন্মুক্ত হয়)। এই দুটো প্রক্রিয়া সম্মিলিত-ভাবে মূত্রথলীস্থ পদার্থকে সম্পূর্ণভাবে বাইরে নিক্ষিপ্ত করে।

যে 6টি প্রতিবর্ত মূত্রত্যাগের সংগে জড়িত ব্যারিংটোন (Barrington) তাদের নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিন্যাস করে। এদের **ব্যারিংটোন প্রতিবর্ত** নামে অভিহিত করা হয় (7 নং তালিকা)

(I.) **মূত্রথলীর** প্রসারণ থেকে এই প্রতিবর্ত শুরু হয় এবং ডেট্রুসোর

পেশীর সংকোচনে শেষ হয়। পশ্চাৎমস্তিষ্কে (hindbrain) এই প্রতিবর্তের স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত। অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী স্নায়ু পেলভিক নার্ভে অবস্থান করে।

II. মূত্রনালীর মধ্য দিয়ে মূত্রের প্রবাহ এই প্রতিবর্তের সূচনা করে এবং ডেট্রুসোর পেশীর সংকোচনে তা শেষ হয়। এই প্রতিবর্তের স্নায়ুকেন্দ্রও পশ্চাৎ-মস্তিষ্কে অবস্থিত। অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী স্নায়ু যথাক্রমে পিউডেনডাল ও পেলভিক নার্ভে অবস্থান করে। মূত্রত্যাগ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিবর্ত সক্রিয় থাকে।

III. মূত্রনালীর পশ্চাদংশের প্রসারণে এই প্রতিবর্ত শুরু হয় এবং ডেট্রুসোর পেশীর সংকোচনের মাধ্যমে এটি শেষ হয়। সুষুম্নাকাণ্ডে এই প্রতিবর্তের স্নায়ুকেন্দ্রের অবস্থান। অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী স্নায়ু হাইপো-গ্যাসট্রিক নার্ভে অবস্থান করে।

IV. মূত্রনালীর মধ্য দিয়ে মূত্রের প্রবাহ এই প্রতিবর্তের সূচনা করে এবং মূত্রনালীর প্রসারণে তা শেষ হয়। এই প্রতিবর্তের স্নায়ুকেন্দ্রও সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত। অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী স্নায়ু পিউডেনডাল (Pudendal) নার্ভে অবস্থান করে।

V. মূত্রথলীর প্রসারণে এই প্রতিবর্ত শুরু হয় এবং মূত্রনালীর প্রসারণে শেষ হয়। এই প্রতিবর্তের কেন্দ্রও সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থান করে। অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী স্নায়ু যথাক্রমে পেলভিক ও পিউডেনডাল নার্ভে অবস্থান করে।

VI. মূত্রথলীর প্রসারণে এই প্রতিবর্ত শুরু হয় এবং মূত্রথলীর পশ্চাদংশের প্রসারণে তা শেষ হয়। এই প্রতিবর্তের কেন্দ্রও সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থান করে। অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী স্নায়ু পেলভিক নার্ভে অবস্থান করে।

এই 6টি প্রতিবর্তের সম্মিলিত প্রয়াসে মূত্রত্যাগ সম্পূর্ণ হয়।

3(b). **মূত্রত্যাগ স্নায়ুকেন্দ্র** (Micturition Center) : যে সব স্নায়ুকেন্দ্র মূত্রত্যাগ প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করে তারা প্রধানত গুরুমস্তিষ্ক, হাইপোথালামাস, মস্তিষ্ককাণ্ড ও মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থান করে। এসব স্নায়ুকেন্দ্র প্রতিবর্তের মাধ্যমে মূত্রত্যাগ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং মূত্রত্যাগ সম্পূর্ণ করে।

(1) **গুরুমস্তিষ্কের ভূমিকা** (Role of cerebral cortex) : গুরু-

মস্তিষ্কের মটর এরিয়া বা নিয়ামক অঞ্চল এবং পোস্টসেন্ট্রাল জাইরাসের ঊর্ধ্ব অংশ মূত্রত্যাগের নিয়ন্ত্রণ করে। গুরুমস্তিষ্কের এসব অঞ্চল থেকে উৎপন্ন স্নায়ুতন্তু পিরামিডাল স্নায়ুর পাশাপাশি অবস্থান করে এবং স্পাইনোসেরিবেলার নার্ভের সংগে মিশে যায়।

7 **নং তালিকা :** ব্যারিংটোনের মূত্রত্যাগ প্রতিবর্ত।

প্রতিবর্তের নাম	উদ্দীপনার উৎস	সংজ্ঞাবহ স্নায়ু	চেষ্টীয় স্নায়ু	প্রতিবর্তী কেন্দ্র	প্রতিক্রিয়া
১ম	মূত্রথলীর প্রসারণ	পেলভিক	পেলভিক	পশ্চাৎ মস্তিষ্ক	ডেট্রুসোর পেশীর সংকোচন
২য়	মূত্রনালীতে মূত্রের প্রবাহ	পিউডেনডাল	পেলভিক	পশ্চাৎ মস্তিষ্ক	ডেট্রুসোর পেশীর সংকোচন
৩য়	মূত্রনালীর পশ্চাদংশের প্রসারণ	হাইপো-গ্যাস্ট্রিক	হাইপো-গ্যাস্ট্রিক	সুষুম্না-কাণ্ড	ডেট্রুসোর পেশীর সংকোচন
৪র্থ	মূত্রনালীতে মূত্রের প্রবাহ	পিউডেনডাল	পিউডেনডাল	সুষুম্না-কাণ্ড	মূত্রনালীর প্রসারণ
৫ম	মূত্রথলির প্রসারণ	পেলভিক	পিউডেনডাল	সুষুম্না কাণ্ড	মূত্রনালীর প্রসারণ
৬ষ্ঠ	মূত্রথলির প্রসারণ	পেলভিক	পেলভিক	সুষুম্না-কাণ্ড	মূত্রনালীর পশ্চাদংশের প্রসারণ

ঐচ্ছিক প্রচেষ্টার দ্বারা মূত্রত্যাগের উপর যথেষ্ট প্রভাববিস্তার করা সম্ভবপর হয়।

এই প্রচেষ্টার দ্বারা মূত্রত্যাগকে যেমন দীর্ঘসময় ধরে অবদমিত করে রাখা যায়, তেমনি প্রয়োজনের পূর্বেই মূত্রত্যাগ সম্ভবপর হয়। ধারণা করা হয় ঐচ্ছিক প্রচেষ্টার সময় গুরুমস্তিষ্ক মূত্রাশয়ের উপর আরোপিত প্রতিবন্ধকতাকে (inhibition) অপসারণ করে, ফলে নিম্নদেশীয় স্নায়ুকেন্দ্রাবলীর অবমুক্তি ঘটে। এভাবে মূত্রত্যাগ শুরু হল। মূত্রথলী সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ না হলেও ঐচ্ছিক প্রচেষ্টায় পেলভিক স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে মূত্রাশয়ের সংকোচন ঘটানো যায়। তাছাড়া উদরীয় পেশী ও মধ্যচ্ছদার ঐচ্ছিক সংকোচনের মাধ্যমে উদরীয় চাপের বৃদ্ধি করা যায় এবং এভাবে মূত্রাশয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে মূত্রাশয় প্রতিবর্তসমূহকে সক্রিয় করে তুলা যায়।

(2) **হাইপোথালামাসের ভূমিকা** (Role of Hypothalamus) : হাইপোথালামাসের সম্মুখ স্নায়ুকেন্দ্রে (anterior nuclei) উদ্দীপনা প্রদান করলে ডেট্রুসোর পেশীর পেশীটান বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, হাইপোথালামাসের পশ্চাৎস্নায়ুকেন্দ্রে উদ্দীপনা প্রদান করলে পেশীটান হ্রাস পায়।

(3) **মস্তিষ্ককাণ্ডের ভূমিকা** (Role of Brain Stem) : সুপিরিওর কলিকুলাসের নিম্নদেশে ব্যবচ্ছেদ ঘটালে মূত্রাশয় এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে মাত্র কয়েক মিলিমিটার মূত্র তাতে জমা হলে মূত্রত্যাগ শুরু হয়ে যায়। ইনফিরিওর কলিকুলাসের নিম্নদেশে ব্যবচ্ছেদ করলে মূত্রত্যাগ অসম্পূর্ণ হয় এবং মূত্রাশয়ে মূত্র থেকে যায়। ব্যারিংটোনের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিবর্তের প্রধান কেন্দ্র নিম্নমস্তিষ্কে অবস্থান করে।

(4) **সুষুম্নাকাণ্ডের ভূমিকা** (Role of spinal cord) : এই স্নায়ুকেন্দ্রাবলী সুষুম্নাকাণ্ডের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রিকাস্থি খণ্ডকে অবস্থিত। এই কেন্দ্রাবলী যখন বিনষ্ট হয়, তখন মূত্রত্যাগ অনৈচ্ছিক ও অসম্পূর্ণ হয়। এই কেন্দ্রাবলীকে আবার বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনার মাধ্যমে প্রতিবর্তভাবে উদ্দীপিত করা যায়। এসব স্নায়ুকেন্দ্র গুরুমস্তিষ্ক এবং মধ্যমস্তিষ্কের প্রতিরোধধর্মী নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বহুবিধ জটিলতর প্রতিবর্তের মাধ্যমে মূত্রত্যাগ সংগঠিত হয়। একাধারে ইহা স্বতন্ত্র ও দেহগত স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কৃত্রিম বৃক্ক
Artificial Kidney

কোন প্রাণী থেকে উভয় বৃক্ক বা কিডনিকে অপসারিত করলে অথবা মানুষের কিডনি স্বাভাবিকভাবে মূত্রউৎপাদন না করতে পারলে **ইউরেমিয়া** (uremia) দেখা দেয়, ফলে রোগী ক্রমান্বয় দুর্বল হয়ে পড়ে, শ্বাসকার্যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং ছয় কি সাত দিনের মধ্যে মারা যায়। এর প্রধান কারণ রেচিত না হওয়ার ফলে প্রোটিনের বিপাক-লব্ধ পদার্থ রক্তে বৃদ্ধি পায়। যেমন, ১.৩ 100 মিলিলিটার রক্তে স্বাভাবিক-ভাবে যেখানে 30 মিলিগ্রাম ইউরিয়া থাকে। ইউরেমিয়াতে তা 900 মিলিগ্রামে বেড়ে যেতে পারে।

মানুষে একটি কিডনিও স্বাভাবিকভাবে কাজ করলে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে, ফলে মূত্রের উৎপাদন ও তার উপাদান ও পরিমাণের অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায় না।

কিডনি স্বাভাবিকভাবে কাজ না করলে রক্তে জমে যাওয়া বিভিন্ন পদার্থকে ঝিল্লিবিশ্লেষণের (dialysis) মাধ্যমে অপসারণ করার জন্য কৃত্রিম বৃক্ককে
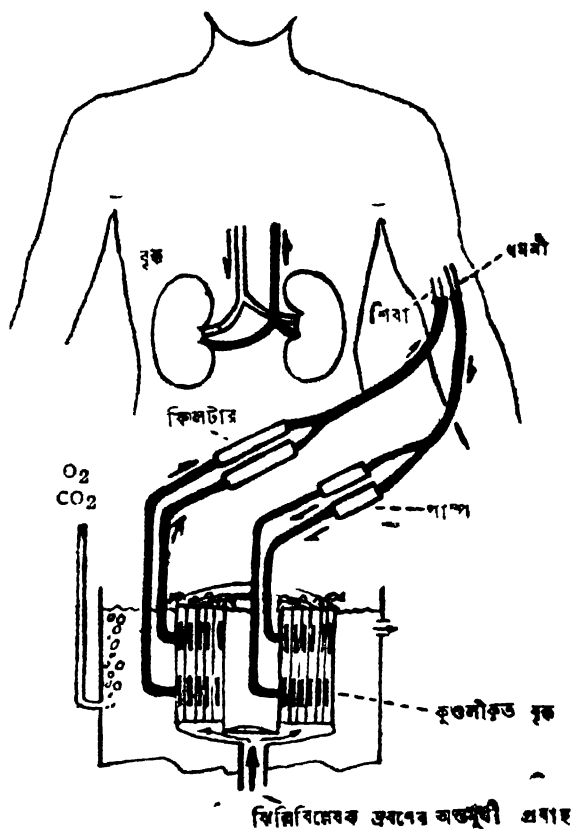
15-17 নং চিত্র : রোগীর দেহে সংযুক্ত কৃত্রিম বৃক্ক।

(artificial kidney) কাজে লাগানো হয় (15-17 নং চিত্র)। 1943 সাল থেকে কৃত্রিম বৃক্ক বা কিডনির ব্যবহার চলে আসছে। এই যন্ত্রের দ্বারা রক্তে জমে ওঠা নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থকে সাময়িকভাবে অপসারণ করা সম্ভব হয়। যন্ত্রটি একটি পাতলা শাঁখের মত কুণ্ডলীকৃত সেলোফান (cellophane) টিউব বা নালীদ্বারা গঠিত যা অর্ধভেদ্য পর্দার কাজ করে। এই টিউবটিকে

এমন একটি পাত্রে রাখা হয় যার মধ্য দিয়ে 37°C তাপমাত্রায় সমসারক (isotonic) স্যালাইন দ্রবণকে প্রবাহিত হতে দেওয়া হয়। টিউবটিকে দুটো ক্যানুলার (cannula) সংগে যুক্ত করা হয় যার একটিকে ধমনী ও অন্যটিকে শিরার সংগে সংযুক্ত করা হয়। রক্ত যখন এই টিউবটির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন রক্তে দ্রবীভূত নানারকম পদার্থ ঝিল্লিবিশ্লেষণের মাধ্যমে নিমজ্জিত স্যালাইন দ্রবণে বেরিয়ে আসে। কৃত্রিম কিডনির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টায় 6 থেকে 16 গ্রাম বা তারও বেশী ইউরিয়াকে দেহ থেকে অপসারণ করা সম্ভবপর। যেসব রোগীর কিডনি অকেজো হয়ে গেছে তাদের এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বহুবছর বাঁচিয়ে রাখা যায়। প্রতি সপ্তাহে 2 বা 3 বার কৃত্রিম কিডনির মাধ্যমে রক্তের ঝিলিবিশ্লেষণ করতে হয়।

বৃক্কীয় রক্তসংবহন
Renal circulation

1. **রক্তনালীর বিন্যাস** (Arrangement of Blood Vessels): উদরীয় মহাধমনীর দুপাশ থেকে **বৃক্ক ধমনী** প্রায় সমকোণে বেরিয়ে আসে। বৃক্ক বা কিডনির হিলাসে (hilus) প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্তে বৃক্ক ধমনী সম্মুখ ও পশ্চাৎ এই দুটো ভাগে বিভক্ত হয়। উভয় ভাগ থেকে নির্গত প্রধান শাখাগুলো বৃক্কের দুটি বিভাগে রক্তনালী সরবরাহ করে (সম্মুখ, শীর্ষ, ঊর্ধ্ব মধ্য, নিম্ন মধ্য, নিম্ন ও পশ্চাদ্দেশীয়)। এই শাখাগুলোকে **বিভাগীয় ধমনী** (segmental arteries) বলা হয়।

প্রতিটি বিভাগীয় ধমনীর এক একটি শাখা এরপর প্রতিটি পিরামিডের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। পিরামিডের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থিত এসব শাখাগুলোকে **ইনটারলোবার** বা **আন্তরলতি ধমনী** (interlobar arteries) বলা হয় (15-18 নং চিত্র)। এই ধমনীগুলো পিরামিডের গোড়াতে এসে বিভক্ত হয় এবং ধনুকের মত বেঁকে যায়। এদের তাই **আরকুয়েট** বা **ধানুকী ধমনী** (arcuate arteries) বলা হয়। এসব ধমনীর কোন যোগসূত্র নেই। এরা আরো বিভক্ত হয়ে **ইনটারলোবুলার** বা **আন্তর উপলতি ধমনী** (interlobular arteries) গঠন করে ও বহির্দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধমনীগুলো এরপর বিভক্ত হয়ে গ্লোমারুলাসের **অন্তর্মুখী উপধমনী** (afferent arteries) গঠন

করে। গ্লোমারুলাসে প্রবেশ করে এই উপধমনী প্রায় 50টি রক্তজালিকায় বিভক্ত হয় এবং গ্লোমারুলাসের জালিকপিণ্ড (tuft of capillaries) গঠন করে। রক্তজালিকা পুনরায় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গ্লোমারুলাসের বহির্মুখী
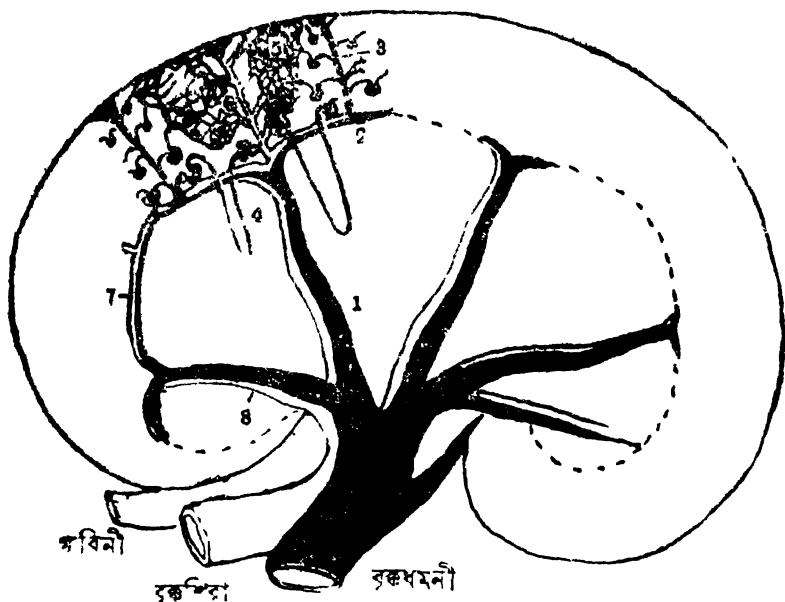
15-18 নং চিত্র : বৃক্কের রক্তসংবহনের তথা রক্তনালী বিন্যাসের বিশেষত্ব।
1 – আন্তরলতি ধমনী, 2—ধানুকী ধমনী, 3—আন্তর উপলতি ধমনী,
4—রক্তজালক, 7—ধানুকী শিরা, 8—আন্তরলতি শিরা।

উপধমনী (efferent arterioles) গঠন করে। গ্লোমারুলাস থেকে নির্গত হবার পরই এই উপধমনীসমূহ দ্বিতীয়বার রেচননালিকার চারিপাশে রক্ত-জালিকায় বিভক্ত হয়। একে নালিকাবেষ্টিত জালক (peritubular net-work) নামে অভিহিত করা হয়। গ্লোমারুলাস থেকে রেচননালিকা পর্যন্ত ধমনীবিভাগকে **পোর্টাল সংস্থা** (portal system) বলা হয় এবং গ্লোমা-রুলাসের রক্তজালিকাই দেহের একমাত্র রক্তজালিকা যারা পুনরায় মিলিত হয়ে উপধমনীতে প্রবেশ করে।

মেডালাস্থিত অন্তর্মুখী রক্তনালী অনেক সময় গ্লোমারুলাসে প্রবেশ না করে রেচননালিকার চারিপাশের রক্তজালিকার সংগে সরাসরি যুক্ত হয়। এভাবে

যে উপপথ (bypass) সৃষ্টি করে তাকে **লাডউইগ শানট** (Ludwig shunt) বলা হয়। জরুরীকালীন অবস্থায় এই উপপথের গুরুত্ব খুব বেশী।

কিডনির কর্টেক্সের নেফ্রোনকে ঘিরে যে রক্তজালিকা ছড়িয়ে থাকে তারা নালিকাবেষ্টিত জালক বা পেরিটিউবুলার নেটওয়ার্ক (peritubular network) গঠন করে, কিন্তু মেডালাসন্নিহিত গ্লোমারুলাস (Juxtamedullary glomeruli) থেকে যেসব বহির্মুখী উপধমনী নির্গত হয় তারা চুলের কাঁটার
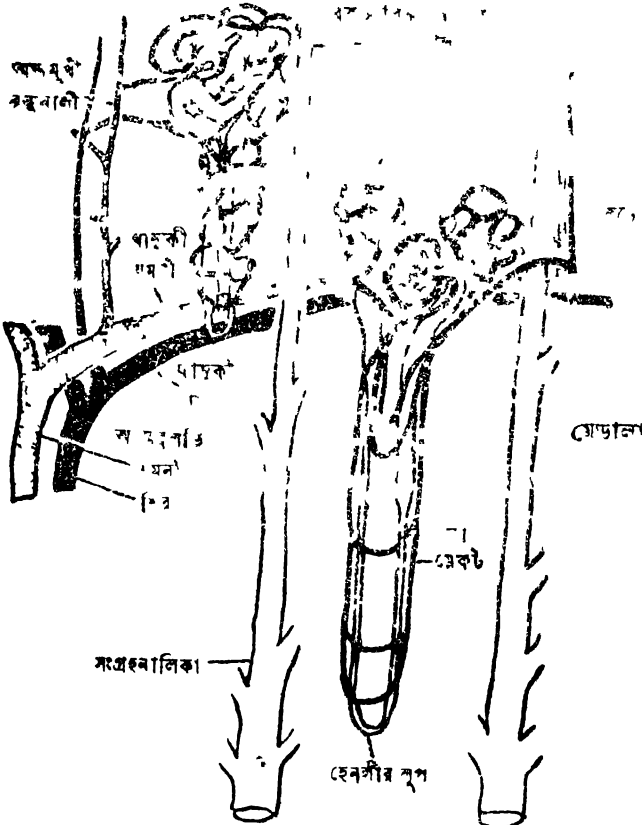
15-19 নং চিত্র : বৃক্কীয় রক্তসংবহনের ছক। ছবিতে কর্টেক্স ও মেডালার নেফ্রোনের সংবহনের পার্থক্য লক্ষণীয়।

মত (hairpin) লুপের সৃষ্টি করে নিচের দিকে নেমে আসে। এই রক্তনালী-গুলোকে **ভাসা রেকটা** (vasa recta) বলা হয় (15-19 নং চিত্র)। এই

লুপগুলো হেনলীর লুপের পাশ দিয়ে মেডালার গভীরে প্রবেশ করে। মানুষে বৃক্কীয় রক্তজালিকার তলীয় ক্ষেত্রফল এবং রেচননালিকার তলীয় ক্ষেত্রফলের মান প্রায় সমান। উভয় ক্ষেত্রেই এর মান 12m²।

বৃক্কের কর্টেক্সের রক্তজালিকা এরপর শিরাজালক (venous network) গঠন করে। শিরাজালকের রক্তনালী পরস্পর মিলিত হয়ে **ইন্টারলোবুলার** বা **আন্তরউপলতি শিরা** (interlobular vein) গঠন করে এবং ধমনী বরাবর নেমে আসে। এই শিরাগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে **আরকুয়েট** বা **ধানুকী শিরা** (arcuate veins) গঠন করে। ধানুকী শিরা এরপর যুক্ত হয়ে **ইনটারলোবার** বা **আন্তরলতি শিরা** (interlobar vein) উৎপন্ন করে। শেষোক্ত শিরা পরিশেষে **বৃক্ক শিরার** সংগে মিলিত হয়।

2. **রক্তসংবহন :** বৃক্কের রক্তসংবহনকে তাদের রক্তবাহের বিন্যাস অনুযায়ী দুভাবে বিভক্ত করা যায় : (I) দীর্ঘ রক্তসংবহন এবং (ii) হ্রস্ব রক্তসংবহন। দীর্ঘ রক্তসংবহন প্রায় 85 শতাংশ রক্তকে পরিবহন করে এবং প্রথমে বৃক্কের কর্টেক্স
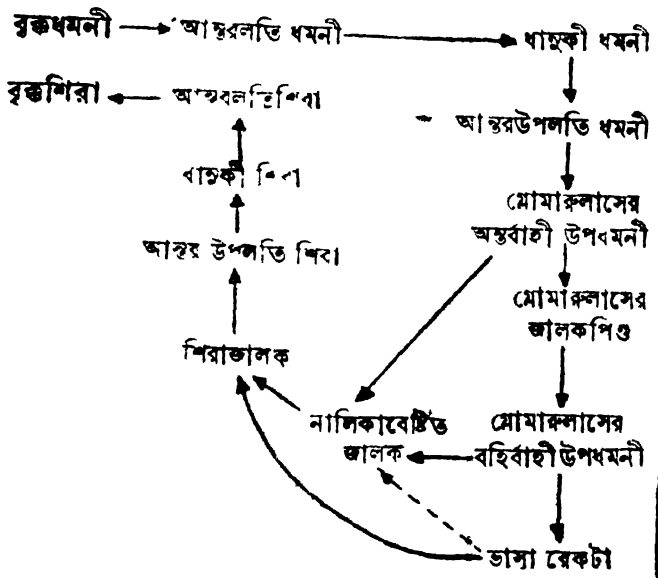
15-20 নং চিত্র : বৃক্কের শারীরস্থানিক সংবহনের ছক।

বা বহিঃস্তরের গ্লোমারুলাসে প্রবেশ করে। সেখান থেকে রেচন নালিকার চারিপাশের রক্তজালিকায় প্রবেশ করে এবং পরিশেষে বৃক্কশিরার মাধ্যমে নির্গত•

হয়। হ্রস্ব রক্তসংবহন স্বাভাবিক অবস্থায় মাত্র 15 শতাংশ রক্ত পরিবহন করে এবং মেডালাস্থিত গ্লোমারুলাসের মধ্যে প্রবেশ করে। এই রক্ত এরপর ভাসা রেকটার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে প্রধানত বৃক্কশিরায় প্রবেশ করে। বৃক্কের রক্তসংবহনকে 15-20 নং নকশায় প্রকাশ করা হয়েছে।

3. **রক্তপ্রবাহ** (Blood Flow): বিশ্রামরত অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের কিডনিতে প্রতি মিনিটে প্রায় 1·2-1·3 লিটার রক্ত প্রবাহিত হয়, যা হার্দ উৎপাদের প্রায় 25%। তড়িৎ-চুম্বকীয় (electromagetic) বা অন্যান্য শ্রেণীর প্রবাহমাপক যন্ত্রের (flow meter) দ্বারা অথবা ফিকের মূলনীতি প্রয়োগ করে কিডনি বা বৃক্কের রক্তপ্রবাহ নির্ধারণ করা যায়। প্যারা-অ্যামাইনোহিপ্‌পিউরিক অ্যাসিড (PAA) বা ডায়োড্রাস্ট (diodrast) দেহে প্রবেশ করিয়ে এবং মূত্র ও প্লাজমায় এদের গাঢ়ত্ব নির্ণয় করে সাধারণত বৃক্কের রক্তপ্রবাহের পরিমাপ করা হয়। এই পদার্থগুলো যেহেতু গ্লোমারুলাসের দ্বারা পরিশ্রুত হয় আবার রেচননালিকার দ্বারা ক্ষরিতও হয় সেহেতু এদের **নিষ্কাশন অনুপাত** (extraction ratio) খুবই বেশী। ধমনী-শিরার গাঢ়ত্বের পার্থক্যকে পদার্থের ধমনীর গাঢ়ত্ব দিয়ে ভাগ করলে এই অনুপাতটি পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, দেখা গেছে খুব কম মাত্রায় PAH কে দেহে প্রবেশ করালে বৃক্কের মধ্য দিয়ে রক্তের একবার প্রবাহের সময়ই প্রায় 90% PAH ধমনী রক্ত থেকে অপসারিত হয়। অতএব PAH এর বৃক্কের শিরার মাত্রাকে গণনার মধ্যে না এনে মূত্রে PAH এর পরিমাণকে প্লাজমার PAH এর পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে বৃক্কের রক্তপ্রবাহ পাওয়া যায়। এভাবে রক্ত প্রবাহের যে মান পাওয়া যায় তাকে **কার্যকরী বৃক্কীয় প্লাজমাপ্রবাহ** (ERPF, effective renal plasma flow) নামে অভিহিত করা হয়। মানুষে ERPF গড়ে 625 মিলিলিটার/মিনিট।

সুতরাং $ERPF = \frac{U_{PAH}V}{P_{PAH}}$

= PAH এর অপসারণ।

সেখানে, U_{PAH} = মূত্রে PAH এর পরিমাণ

P_{PAH} = প্লাজমায় PAH এর পরিমাণ

V = মিনিটে মূত্রের প্রবাহ।

উদাহরণ : ধরা যাক,

$$\text{মূত্রে PAH এর গাঢ়ত্ব} = 14\ mg/ml = V_{PAH}$$

$$\text{প্লাজমায় PAH এর গাঢ়ত্ব} = 0{\cdot}02\ mg/ml = P_{PAH}$$

$$\text{মূত্রের পরিমাণ } V = 0{\cdot}9 ml/min$$

$$\text{সুতরাং, } ERPF = \frac{14 \times 0{\cdot}9}{0{\cdot}02} = 630 ml/min$$

বৃক্কের কর্টেক্সের রক্তপ্রবাহ মেডালার চেয়ে অনেক বেশী। কুকুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে যেসব মান পাওয়া গেছে তা হল কর্টেক্সে প্রতি মিলিগ্রাম কলায় 4-5 মিলিলিটার, বহির্মেডালাতে 1-2 মিলিলিটার এবং অন্তঃস্থ মেডালাতে 0·3-0·6 মিলিলিটার/গ্রাম/মিনিট।

4. **বৃক্কীয় রক্তনালীর চাপ** (Pressure in Renal Vessels) : গ্লোমারুলাসের রক্তজালিকার চাপ এখন সরাসরি ইঁদুরে নির্ধারণ করা সম্ভবপর। ইঁদুরে পরীক্ষালব্ধ মান পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্ধারিত মানের চেয়ে অনেক কম। দেখা গেছে গ্লোমারুলাসের রক্তজালিকায় রক্তচাপ তন্ত্রীয় সংবহনের প্রায় 50% এবং নালীকাবেষ্টিত রক্তজালিকায় (peritubular capillaries) এর মান প্রায় 15 মিলিমিটার পারদচাপের সমান।

5. **বৃক্কীয় রক্তপ্রবাহের স্বনিয়ন্ত্রণ** (Autoregulation of Renal Blood Flow) : একটা নির্দিষ্ট রক্তচাপের ঊর্ধ্বে বৃক্ক নিজের রক্তপ্রবাহকে নিজেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। বৃক্কের এই ক্ষমতাকে **স্বনিয়ন্ত্রণ** (autoregulation) বলা হয়। বৃক্ককে স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ থেকে আলাদা করে নিলেও এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় থাকে। দেখা গেছে রক্তচাপ বৃদ্ধির সংগে সংগে বৃক্কীয় রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। তবে রক্তচাপ যখন প্রায় 90 মিলিমিটার পারদচাপে পেঁছয় তখন বৃক্কের স্বকীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কার্যকরী হয়। এরপর চাপবৃদ্ধির সংগে রক্তপ্রবাহ আর বৃদ্ধি পায় না। অবশ্য রক্তচাপ যখন 250 মিলিমিটার পারদ-চাপের ঊর্ধ্বে ওঠে তখন বৃক্কের স্বকীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ব্যাহত হয়।

বৃক্কের স্বকীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ছাড়া আর যে সব কারণসমূহ বৃক্কের রক্ত-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে, তাদের মধ্যে প্রধান : (1) অক্সিজেন-অভাব, অম্লাধিক্য ইত্যাদি স্নায়ুর মাধ্যমে ক্রিয়া করে এবং রক্তপ্রবাহের পরিবর্তন

ঘটায়, (2) বৃক্কধমনীর প্রতিবন্ধকতা। বৃক্কধমনীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট হলে বৃক্ক রেনিন (renin) নামক একটি এনজাইম উৎপন্ন করে, যা প্লাজমাপ্রোটিনের উপর ক্রিয়া করে অ্যানজিওটেনসিন-I নামক একটি নিষ্ক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন করে। প্লাজমাস্থিত এমজাইম এই পদার্থের ওপর ক্রিয়া করে অ্যানজিওটেনসিন-II উৎপন্ন করে, যা বাহসংকোচন ঘটিয়ে তন্ত্রীয় রক্তচাপ বৃদ্ধি করে ফলে গ্লোমারুলাসে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। (3) অধঃতাপীয় অবস্থা (hypothermia)ঃ দেহের তাপমাত্রা হ্রাস পেলে কাঁপুনির সাহায্যে দেহে যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রয়াস পায়, তখন বৃক্কীয় রক্তসংবহন কিছুটা বৃদ্ধি পায়, তবে তাপমাত্রা অধিক হ্রাস পেলে বৃক্কীয় রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায়। (4) হরমোনঃ অ্যাড্রেন্যালিন ও নরঅ্যাড্রেন্যালিন, অধিক মাত্রায় পিট্রেসিন বৃক্কীয় রক্তপ্রবাহের সংকোচন ঘটায় ও রক্তপ্রবাহ হ্রাস করে।

প্রশ্নাবলী

1. বৃক্কের একটি চিত্র অংকন কর। মূত্র-উৎপাদনের সময় বৃক্কের কোন্ কোন্ অংশে পরিস্রাবণ ও পুনর্বিশোষণকার্য সংঘটিত হয় আলোচনা কর। (C U. '62)

2. চিত্রসহ নেফ্রোন বা বৃক্কনালীর বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও এবং তাদের কার্যাবলী বিবৃত কর। (C. U. '69, '71)

3. বিভিন্ন অংশের আণুবীক্ষণিক গঠনের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখসহ মানুষের নেফ্রোনের একটি চিত্র অংকন কর। পরসংবর্ত রেচননালিকার কার্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C. U. '75)

4. পরিচ্ছন্ন চিত্রসহ নেফ্রোনের ম্যালপিঘিয়ান কণার আণুবীক্ষণিক গঠনের বর্ণনা দাও এবং কিভাবে গ্লোমারুলাসের পরিস্রুৎ উৎপন্ন হয় আলোচনা কর। (C. U. '77)

5. (a) গ্লোমারুলাসের পরিস্রুৎ কি প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় তা বর্ণনা কর।

(b) নিম্নলিখিত অস্বাভাবিক উপাদানগুলোর মধ্যে যেকোন দুটির মূত্রে উপস্থিতির তাৎপর্য এবং তাদের সনাক্তকরণের রাসায়নিক পরীক্ষার উল্লেখ কর। গ্লুকোজ, অ্যাসিটোন, রক্ত অ্যালবুমিন এবং বেন্স-জোন্স প্রোটিন।

(c) ইনুলিন-অপসারণ পরীক্ষা ও তার তাৎপর্য কি? (C U. '81)

6. (a) নেফ্রোনের কলাস্থানিক গঠনের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর। (b অম্ল-ক্ষারক নিয়ন্ত্রণে বৃক্কের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C. U. 86)

7. (a) আমাদের দেহে মূত্রউৎপাদনে বৃক্ক নালিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। (b) বৃক্কীয় রক্তসংবহনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (C. U. 85)

8. দেহে মূত্র-উৎপাদন প্রণালীর বর্ণনা দাও।

9 মূত্রের স্বাভাবিক উপাদানসমূহের বর্ণনা দাও। মূত্র উৎপাদনে যেসব কারণ প্রভাববিস্তার করে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C. U. '72)

10 মূত্রের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উপাদানের বর্ণনা দাও এবং পরীক্ষাগারে এসব উপাদানের যে সব সহজ পরীক্ষা সম্পন্ন করা যায় তাদের উল্লেখ কর। (C. U '67)

11 মূত্রের নিম্নলিখিত উপাদানগুলির মধ্যে কোনগুলি অস্বাভাবিক উপাদান :

অ্যাসিটোন, ইউরিক অ্যাসিড, পটাসিয়াম, অ্যামোনিয়া, গ্লুকোজ, সালফেট, ক্রিয়েটিনিন হিমোগ্লোবিন, হিপ্‌পিউরিক অ্যাসিড এবং অ্যালবুমিন।

12 মূত্রত্যাগের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (C U '78)

মূত্রের স্বাভাবিক উপাদানের বর্ণনা দাও এবং প্রতিটি উপাদানের সহজ পরীক্ষার উল্লেখ কর।

13 মানুষের মূত্রের অস্বাভাবিক উপাদানের উপস্থিতির তাৎপর্য আলোচনা কর। (C U H '81)

14 তোমার বৃক্ক কিভাবে দেহতরলের অভিস্রবণ মাত্রা বজায় রাখে আলোচনা কর। (C U H '81)

15 স্বাভাবিক মূত্রে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ কোনগুলো ? তাদের উৎস সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C U '63)

16. বৃক্কের কর্মক্ষমতা বর্ণনা করা যায় এমন কতকগুলো সহজ পরীক্ষার উল্লেখ কর। (C, U '69)

17 বৃক্কের কার্যসম্বন্ধীয় পরীক্ষাবলীর বর্ণনা দাও। (C U H '76)

18. রক্তের অম্লক্ষারকের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে বৃক্ক যে ভূমিকা গ্রহণ করে তার বর্ণনা দাও। (C U, '69 83)

19 মূত্রত্যাগ প্রণালীর বর্ণনা দাও। (C U 65, '70, 79, C U H '77, 81 82)

20 (a) মূত্রথলি কি প্রক্রিয়ায় পূর্ণ হয় ? (b) মানবদেহে মূত্রথলি ও মূত্রনালীর নার্ভ-সংযোগ দেখাও। (c) ব্যারিংটন বর্ণিত মূত্রত্যাগের প্রতিবর্তগুলো লিখ। (d) ইনুলিন অপসারণ পরীক্ষার তাৎপর্য কি ? (e) ডাইউরেটিক কাকে বলে ? (C U 84)

21 কারণসহ ব্যাখ্যা কর :

(a) দু'গ্লাস জলপানের পরই কেন প্রচুর পরিমাণে লঘুসারক মূত্র পৌঁছে হয় ?

(b) দূরসংবর্ত রেচন নালিকায় মূত্রের অম্লীভবন সংঘটিত হয় কেন ?

(c) চেষ্টীয় হাইপোগ্যাস্ট্রিক ও পিউডিক স্নায়ুকে প্রতিবর্তভাবে উদ্দীপিত করলে কেন মূত্রাশয়ের পূর্তি বৃদ্ধি পায় অথচ পেলভিক স্নায়ুকে উদ্দীপিত করলে ইহা শূন্যগর্ভ হয়। (C U '76)

22. বৃক্কীয় রক্তসংবহনের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। প্রতি মিনিটে বৃক্কের মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয় ? (C U '81 83)

23 সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(a) গ্লোমারুলাসের পরিস্রাবণে রক্তের অভিস্রবণ চাপের ভূমিকা কি ? (C U 85)

(b) লেসিসকোষের কাজ কি ? এর অবস্থান কোথায় ? (C U 85)

(c) ইরীথ্রোপোয়েটিনের রাসায়নিক প্রকৃতি কি ? এটি কখন ও কোথায় উৎপন্ন হয়। (C U 85)

ষোল

দেহের পেশী

MUSCLES OF THE BODY

প্রাণীর চলাফেরা যাবতীয় অংশের নড়াচড়া, চলন প্রভৃতি পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের উপর নির্ভর করে। পেশীসংকোচন জীবন্ত মেশিনারীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উদ্দীপনা থেকে পেশীতে দুধরনের যান্ত্রিকপরিবর্তন আসেঃ (1) পেশী-টানের উদ্ভব ঘটে এবং (2) সংকোচনের মাধ্যমে পেশী বোঝার বিরুদ্ধে যান্ত্রিক কার্য সম্পন্ন করে। অবশ্য এই উভয়বিধ পরিবর্তন সমান হয় না। কোন বিষয়ে একধরনের পেশী সক্রিয় হলে অন্য বিষয়ে তারা অধিকতর কম সক্রিয় হয় বা মিতব্যয়ী হয়।

গঠন, কার্য ও অবস্থানের ভিত্তিতে দেহের পেশীকে তিনভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়ঃ

(1) **অস্থিপেশী বা ঐচ্ছিক পেশী**, (2) **মসৃণ পেশী বা অনৈচ্ছিক পেশী** এবং (3) **হৃৎপেশী**। অস্থিপেশী কণ্ডরার সাহায্যে অস্থির সংগে যুক্ত থাকে এবং তাদের প্রয়োজনীয় বিচলনে সহায়তা করে। এরা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ঐচ্ছিক ক্রিয়া এবং প্রতিবর্তের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে তাদের ঐচ্ছিক পেশী নামে অভিহিত করা হয়। অপরপক্ষে হৃৎপেশী ও অনৈচ্ছিক পেশী আন্তর যন্ত্রের প্রাচীরগাত্রে অবস্থান করে এবং আন্তরযন্ত্রীয় তরল উপাদানে চাপ-প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করে। হৃৎপেশী ও অনৈচ্ছিক পেশীর সংকোচন স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও তারা প্রধানত তাদের সহজাত ছন্দে সংকুচিত হয়। স্নায়ুজ নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হলেও হৃৎপেশী আপন ছন্দে সংকুচিত হতে পারে। হৃৎপেশী ও

1৫-2নং চিত্র : মানুষের অস্থিপেশী।

অনৈচ্ছিক পেশীর এই স্বয়ংক্রিয়তা দেহের অন্তর্জগতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
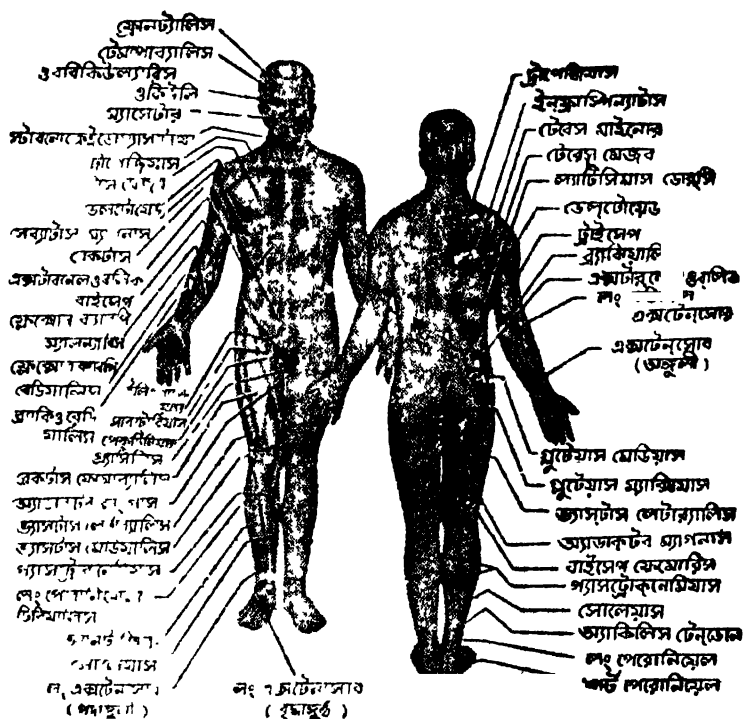
অস্থিপেশী
Skeletal Muscle

অস্থিপেশীর মাধ্যমে প্রাণী তার বহির্জগতের সংগে প্রতিক্রিয়ায় মিলিত হয়। সেকেনোভের (Sechenov) মতে **মস্তিষ্কক্রিয়ার** বহিঃপ্রকাশে যে **সীমাহীন বৈচিত্র্য লক্ষ্য** করা যায়, তার পরিণতি হয় একটি মাত্র ঘটনায়, তা হল পেশীর **সংকোচন**। শেরিংটোনও অস্থিপেশীর সংগে মস্তিষ্কের গুরুত্বের উল্লেখ **করেছেন**। তার মতে মস্তিষ্কস্থিত যে কোন স্নায়ুপথ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে **পেশীর সংগে যুক্ত থাকে**।

মানবদেহে ঐচ্ছিক পেশীর মোট ওজন দৈহিক ওজনের **40-45 শতাংশ**। **প্রতিটি মানুষের দেহে প্রায় 434টি** ঐচ্ছিক পেশী বা অস্থিপেশী রয়েছে। **16-2নং** চিত্রে এবং **1নং** তালিকায় কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ অস্থিপেশীর উল্লেখ করা হয়েছে। এসব **অস্থিপেশীর** মধ্যে মোট পেশীতন্তু বা পেশীকোষের সংখ্যা **প্রায় $2{\cdot}5 \times 10^{8}$ লক্ষ**।

অস্থিপেশীর একপ্রান্তে চলমান অংশের সংগে এবং অপর প্রান্ত স্থির-প্রান্তের **সংগে যুক্ত থাকে**। পেশীর চলমান প্রান্তকে ইনসারশন (insertion) বা প্রবেশ-প্রান্ত এবং নিশ্চল প্রান্তকে ওরিজিন (origin) বা স্থিরউৎস বলা হয়। যেমন, গ্যাসট্রকনেমিয়াস পেশীর প্রবেশপ্রান্ত ফিমারে এবং স্থির উৎস পায়ের গোড়ালী-**অস্থি** বা ক্যালকেনিয়ামে অবস্থিত। এই পেশী যখন সংকুচিত হয়, তখন **চলমান** পদতল সম্প্রসারিত হয়।

অস্থিপেশীর নামকরণও বিভিন্ন ভাবে করা হয়। যেমনঃ (1) আকৃতি **অনুসারেঃ** ডেলটোয়েড, (2) পেশীতন্তুর অভিমুখ অনুযায়ী, উদরের রেকটাস পেশী, (3) অবস্থান অনুযায়ীঃ পেকটোর‍্যালিস মেজর এবং (4) কার্যভিত্তিক ; ফ্লেক্সোর, এক্সটেনসোর ইত্যাদি। যেসব পেশীর সংকোচনে দেহাংশ সন্ধিতে বেঁকে যায় (যেমন, বাহু), তাদের ফ্লেক্সোর বা সংকোচক পেশী বলা হয়। আবার যে পেশীর সংকোচনে দেহাংগ সম্প্রসারিত হয় তাদের এক্সটেনসোর বা প্রসারক পেশী বলা হয়। আবার যেসব পেশী দেহের কোন অংশকে দেহের মধ্যরেখার দিকে টেনে আনে, তাদের অ্যাডাকটর (adductors) বা অভিকেন্দ্রী-পেশী এবং যারা দেহাংশকে মধ্যরেখা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় তাদের অ্যাবডাকটর (abductor) বা অপকেন্দ্রী পেশী বলা হয়।

কোন এক শ্রেণীর পেশী অন্যশ্রেণীর প্রতিপক্ষ হিসাবে কাজ করলে তাদের

অ্যান্টাগোনিস্ট (antagonist) বা প্রতিদ্বন্দ্বী পেশী বলা হয়। যেমন, ফেক্সোর এক্সটেনসোরের এবং অ্যাবডাকটর অ্যাডাকটরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তেমনি কোন এক শ্রেণীর একটি সন্ধিকে অংশত স্থিতিশীল রাখলে অন্যটি চলমান হয়। যেমন, ফেক্সোর কব্জিকে যখন স্থিতিশীল করে রাখে, তখন হাতের আঙুল সম্প্রসারিত হয়। এ জাতীয় পেশীকে তাই সহযোগী পেশী (synergists) বলা হয়।

1নং তালিকা : মানুষের অস্থিপেশীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পেশীর নাম (name of muscles)	উৎস (origin)	প্রবেশ-প্রান্ত (insertion)	কার্যাবলী (functions)
মস্তক ও গ্রীবা :			
1. ম্যাসেটার (masseter)	পার্শ্বচোয়াল	নিম্নচোয়ালের পশ্চাৎপ্রান্ত	মুখ বন্ধ করে
2. টেম্পোর্যালিস (temporalis)	পার্শ্বকরোটি	নিম্নচোয়ালের ঊর্ধ্বকোণ	মুখ বন্ধ করে
3. ডাইগ্যাস্ট্রিক (digastric)	পার্শ্বকরোটি	চোয়ালের সম্মুখ ভাগ	মুখ খোলে
4 স্টার্নোক্লেইডোম্যাস্টোয়েড (sternocleido-mastoid)	অক্ষক ও উরঃফলক	পার্শ্বকরোটি ও পশ্চাৎকরোটি	মস্তকের আবর্তন ও বাঁকান
5 ট্রাপেজিয়াস (trapezius)	গ্রীবা ও বক্ষস্থ কশেরুকা	অংসফলক	অংসফলকের বিচলনে সহায়তা
মধ্যদেহ			
1. পেক্টোর্যাল (pectoral)	অক্ষকাস্থি ও উরঃফলক	হিউমারাস	বাহুর ফেক্সোর পেশীকে আকর্ষণ করে ও ঘুরাতে সাহায্য করে।
2. উদরের রেক্টাস (rectus of abdomen)	পাঁজর ও উরঃফলক	পিউবিস	ধড়ের আনতিতে সাহায্য করে।
3. উদরের বহিঃস্থ তির্যক পেশী (external oblique)	নিম্নদেশী 8টি পাঁজর	উদরের মধ্যরেখা	উদরের সংকোচন
বাহু :			
1. ডেলটোয়েড (deltoid)	অংসফলক ও অক্ষক	হিউমারাস	বাহুকে দূরে সরিয়ে দেয়
2. বাইসেপ (biceps)	অংসফলক	রেডিয়াস	বাহুকে সন্ধিতে বাঁকাতে ও ঘুরাতে সহায়তা করে।

পেশীর নাম (name of muscles)	উৎস (origin)	প্রবেশ-প্রান্ত (insertion)	কার্যাবলী (functions)
3. ট্রাইসেপ (triceps)	অংসফলক ও হিউমারাস	আল্না	ঊর্ধ্ব বাহুকে সম্প্রসারিত করে।
4 ফ্লেক্সোর (flexor)	হিউমারাস	মেটাকার্পাল	হাত ও কব্জিকে সন্ধিতে বাঁকাতে সাহায্য করে।
5. এক্সটেন্সোর (extensor)	হিউমারাস	হাতের আঙুল	আঙুলের প্রসারণে সহায়তা করে।

পা ঃ

1. সেমিটেন্ডিনাস (semitendinus)	ইস্‌চিয়াম	টিবিয়া	পায়ের ফ্লেক্সোর এবং উরুর অ্যাবডাক্টর।
2 বাইসেপ (biceps)	ইস্‌চিয়াম ও ফিমার	টিবিয়া ও ফিবুলা	পায়ের ফ্লেক্সোর এবং উরুর অ্যাবডাক্টর।
3. ভাস্টাস ও রেক্টাস ফিমোরাস	ইলিয়াম ও ফিমার	টিবিয়া	পায়ের নিম্নাংশের সম্প্রসারণ করে।
4. গ্যাসট্রোক্নেমিয়াস (gastrocnemius)	ফিমার	ক্যাল্কেনিয়াস	পদতলের সম্প্রসারণ করে।
5. পেরোনিয়াস (peroneus)	ফিবুলা ও টিবিয়া	মেটাকার্পালের মূলদেশ এবং পায়ের তলদেশ	পদতলের প্রসারণ ও আবর্তনের সহায়তা করে।
6. অ্যান্টেরিওর টিবিয়ালিস	টিবিয়া	পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথম মেটাকার্পাল	পদতলের ফ্লেক্সোর।
7. এক্সটেন্সোর (পায়ের আঙুল)	টিবিয়া ও ফিবুলা	পায়ের আঙুল	পায়ের আঙুলের উত্তোলন।

পেশীর ভ্রূণজ উৎস এবং বৃদ্ধি (Origin and development of muscle) **ঃ** মস্তিষ্কের পেশী ছাড়া দেহের অন্যসব ঐচ্ছিক পেশী ভ্রূণের মেসোডার্মের কঠিন পদার্থ (মায়োটোম) থেকে বিকাশ লাভ করে। মস্তকের পেশী শিথিল মেসেনকাইম কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। যেসব কোষ পেশীকলার বিকাশ ঘটায় তাদের মায়োব্লাস্ট (myoblast) নামে অভিহিত করা হয়। মায়োটোমে (myotome) এদের আকৃতি সুষম বেলনাকার, কিন্তু পর্যায়ক্রমে এরা সম্প্রসারিত, দুমুখ সূচাল ও সমান্তরাল পেশীগুচ্ছে পরিণত হয়। ডোরাদাগ ও বহু নিউক্লিয়াস সম্পন্ন পেশীতন্তু পরিশেষে বিকাশলাভ করে। পেশীতন্তুর বহু নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি সম্বন্ধে তিনটি মতবাদ রয়েছে ঃ (1) কোষবিভাজনের সময় যে হারে নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয় সে হারে সাইটোপ্লাজমের হয় না, ফলে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, (2) বৃদ্ধির সময়ে বহু মায়োব্লাস্ট একীভূত হয় এবং (3) উভয় পদ্ধতি হয়ত একই সংগে ঘটে থাকে।

অস্থিপেশী কণ্ডরার মাধ্যমে অস্থির সংগে সংযুক্ত থাকে। কণ্ডরা ঘন সন্নিবিষ্ট অস্থিতিস্থাপক শ্বেততন্তুর সমন্বয়ে গঠিত। সংযোগস্থলে কণ্ডরা এক-প্রান্তে যেমন অস্থির পেরিওস্টিয়ামের সংগে যুক্ত থাকে, অপরপ্রান্ত তেমনি পেশীর স্যারকোলেমার সংগে সংযুক্ত থাকে (16-3 নং চিত্র)। বারসা যান্ত্রিক বাফার হিসাবে কাজ করে। পেশীর চতুঃপার্শ্বস্থ অ্যারিওলার কলা সংযোগ-স্থলকে আরও সুদৃঢ় করে তুলে।

বিভিন্ন প্রকার সংযোগরক্ষাকারী কলা অস্থিপেশীকে অবলম্বন দান করে। এদের মধ্য দিয়ে রক্তনালী ও স্নায়ুতন্তু পেশীতে অনুপ্রবেশ করে। সমগ্র পেশীকে যে সংযোগরক্ষাকারী কলাস্তর আবৃত করে রাখে, তাকে **এপিমাই-সিয়াম** (epimysium) বলা হয়। সমগ্র পেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণ্ডেলে বিভক্ত হয়। প্রতিটি বাণ্ডেলের আবরণকারী সংযোগরক্ষাকারী কলাস্তর **পেরিমাই-সিয়াম** (perimysium) নামে পরিচিত। প্রতিটি ব্যাণ্ডেল আবার পেশীতন্তু বা পেশীকোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি পেশীতন্তুকে আবৃতকারী সূক্ষ্ম অ্যারিওলার কলাকে **এনডোমাইসিয়াম** (endomysium) বলা হয়।

এনডোমাইসিয়াম বরাবর একটি করে রক্তজালিকা দেখা যায়। সংযোগ-রক্ষাকারী কলার পরিমাণ বিভিন্ন পেশীতে বিভিন্ন হয। যে সব অস্থি সূক্ষ ও সঠিক বিচলনে অংশ গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে সংযোগ-রক্ষাকারী কলা দেখতে পাওয়া যায়।

অস্থিপেশীর শ্রেণীবিন্যাস
Classification of skeletal muscle

পক্ষী, বিড়াল, র‍্যাবিট (rabbit) প্রভৃতি প্রাণীতে দু প্রকারের ঐচ্ছিক পেশীর সন্ধান পাওয়া যায। মানুষ এবং বানরেও এরা বর্তমান। প্রথম প্রকারের পেশীকে **লোহিত পেশী** (red muscle) বা **কৃষ্ণাভ পেশী** (dark muscle) বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার পেশীকে **শ্বেত** (white) বা **ধূসর পেশী** (pale muscle) বলা হয়। লোহিত পেশী তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র পেশীতন্তু বা পেশীকোষ নিয়ে গঠিত। অণুবীক্ষণযন্ত্রে এদের অস্বচ্ছ (opaque), দানাদার, অত্যধিক স্যারকোপ্লাজমযুক্ত এবং স্পষ্ট লম্বালম্বি ডোরাদাগযুক্ত দেখায়। এদের তির্যক ডোরা (cross striation) অস্পষ্ট।

এই পেশীর বৈশিষ্ট্য হল, তুলনামূলকভাবে এরা ধীরে সংকুচিত হয়, ধীরে অসাড় হয় (fatigue) এবং ধীরে তাদেব অবিরাম সংকোচন (tetanus) ঘটে। পাখি এ জাতীয় পেশীর অধিকারী বলেই ঘন্টার পর ঘন্টা আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে। অপরপক্ষে শ্বেতপেশীব শ্বেততন্তু অর্ধস্বচ্ছ, সুস্পষ্ট তির্যক ডোরা-সম্পন্ন এবং কম স্যারকোপ্লাজমযুক্ত। এবা দ্রুততব গতিবিধির জন্য দায়ী। শ্বেত-তন্তু দ্রুত সংকুচিত হয় এবং দ্রুত অসাড় বা অবিবাম পেশীসংকোচনদশা প্রাপ্ত
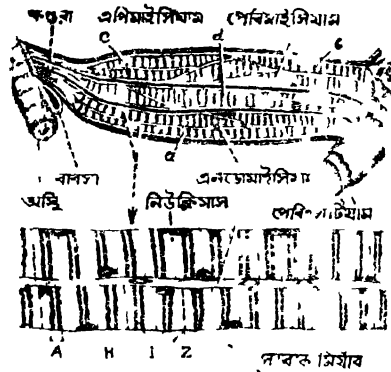
16 ৭ নং চিত্র: পেশীব পর্যায়ক্রমিক গঠন: (a) বাণ্ডেলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত পেশীকোষ, (b) ও (c) বাণ্ডেলেব এক প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে মাঝামাঝি অঞ্চলে বিস্তৃত পেশীকোষ এবং (d) উভয় প্রান্ত বাণ্ডেল উপাদানে নিহিত পেশী কোষ। এছাড়া অ্যাকটিন ও ম্যায়োসিনের বিন্যাসও চিত্রে দেখান হয়েছে।
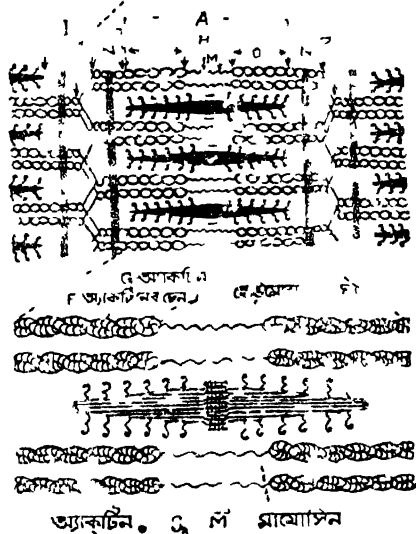
হয়। মানুষের অংগসংকোচক (flexor) পেশী এজাতীয় শ্বেততন্তুব সমন্বয়ে এবং অংগবিস্তারক](extensor) পেশী উভয় প্রকাব পেশীতন্তুর দ্বারা গঠিত।

অস্থিপেশীর কলাস্থানিক গঠন

Histology of skeletal muscle

ঐচ্ছিক পেশী অসংখ্য সমান্তরাল বেলনাকার পেশীতন্তু বা পেশীকোষের সমন্বয়ে (16-3 নং চিত্র) গঠিত। প্রতিটি কোষে অনেকগুলো নিউক্লিয়াসের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি পেশীকোষ 1-40 মিলিমিটার দৈর্ঘ্য এবং 10-100μ ব্যাসসম্পন্ন। হুবর (Hubor) অস্থিপেশীতে তিন ধরনের পেশী-কোষ দেখতে পেয়েছেন : (a) কিছু সংখ্যক পেশীকোষ বান্ডেলের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, (b) অপর কিছু সংখ্যক পেশীকোষ বান্ডেলের এক প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে বান্ডেলের মাঝামাঝি যে কোন স্থানে শেষ হয় এবং (c) কিছু সংখ্যক পেশী কোষের উভয়প্রান্ত বান্ডেলের উপাদানের মধ্যে নিহিত থাকে 16-3 নং চিত্র)।

1. **স্যারকোলেমা** (sarcolemma) **:** প্রতিটি পেশীকোষ স্যারকোলেমা নামক স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম কোষঝিল্লির দ্বারা আবৃত থাকে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখা গেছে, স্যারকোলেমা শুধুমাত্র কোষঝিল্লি নয় ; ইহা অনিয়তাকার (amorphous) পদার্থ ও জালকতন্তুর বনিয়াদীঝিল্লির (basement membrane) দ্বারা আবৃত থাকে। স্যারকোলেমা প্রায় 100Å পুরু এবং অন্যান্য কোষ ঝিল্লির মত তিনটি স্তরের দ্বারা গঠিত : (a) বহিঃস্থ মিউকোপ্রোটিনের স্তর, (b) মধ্যস্থ ফসফোলিপিডের দুটো স্তর এবং (c) অন্তঃস্থ প্রোটিনের স্তর। স্যারকোলেমার নীচেই থাকে নিউক্লিয়াস এবং ডোরাদার মায়োফাইব্রিল।

2. **স্যারকোপ্লাজম :** মায়োফাইব্রিলের চারপাশে এবং নিউক্লিয়াসের

পেশী বান্ডেল	পেশী কোষ	মায়োফাইব্রিল	অ্যাক্টিন	মায়োসিন
100μ	10 40μ	1-2 μ	40 50 Å	100 110 Å
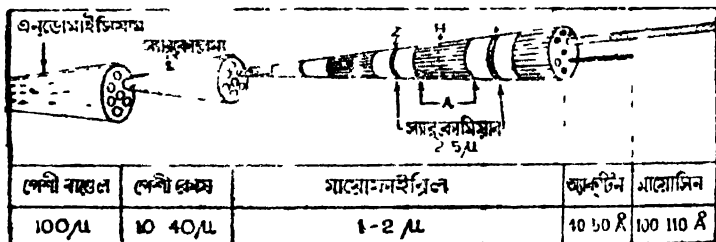
16-4 নং চিত্র : পেশীর পর্যায়ক্রমিক গঠনের পরিচিতি।

সন্নিকটে যে তরল পদার্থ জমা হয়, তাকে স্যারকোপ্লাজম বলা হয়। অন্যান্য কোষের মতই স্যারকোপ্লাজমে অসংখ্য মাইটোকনড্রিয়া এবং প্রতিটি নিউক্লিয়াসের

সন্নিকটে ক্ষুদ্র একটি গলজি বডি দেখা যায়। এছাড়া স্যারকোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (T-নালিকা ও L-নালিকা), মায়োফাইব্রিল (16-3 এবং 16-4 নং চিত্র), মায়োগ্লোবিন, লিপিড, গ্লাইকোজেন প্রভৃতির সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

নিউক্লিয়াস : প্রতিটি পেশীতন্তুতে অসংখ্য নিউক্লিয়াস থাকে। দেখা গেছে একটি সাধারণ আকৃতির পেশীকোষে কয়েকশত নিউক্লিয়াসও থাকতে পারে। সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ছাড়া শুধুমাত্র নিউক্লিয়াসের বিভাজন থেকে এধরনের বহুনিউক্লিয়াস সম্পন্ন কোষের উদ্ভব ঘটে। স্যারকোলেমার ঠিক নিচেই নিউক্লিয়াসের অবস্থান। তারা চেপ্টা, ডিম্বাকার বা কখনও লম্বাটে হতে পারে। তাজা কোষে নিউক্লিয়াসসমূহকে সব সময় সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় না, তবে কলাসংরক্ষণে তাদের মধ্যে ক্রোমাটিন সূত্র ও ক্রোমাটিন দানার শিথিল জালক (network) দেখা যায়।

4. **মায়োফাইব্রিল :** প্রতিটি পেশীকোষের স্যারকোপ্লাজমে অসংখ্য সমান্তরাল প্রোটিনতন্তু বা মায়োফাইব্রিল দেখা যায়। প্রতিটি মায়োফাইব্রিলের ব্যাস 1-2μ। কখনও কখনও 0·5μ ব্যাসসম্পন্ন মায়োফাইব্রিলও পাওয়া যায়। প্রতিটি মায়োফাইব্রিল অনেক **মায়োফিলামেন্ট** নিয়ে গঠিত (16-3 ও 16-4 নং চিত্র)। **অ্যাকটিন** ও **মায়োসিন** এই দুধরনের মায়োফিলামেন্ট প্রধানত মায়োফাইব্রিলে বিন্যস্ত থাকে। প্রতি পেশীতন্তু বা পেশীকোষে এদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। ফিলামেন্টের অন্তর্বর্তী স্থান দ্রবীভূত লবণ ও প্রোটিনে পূর্ণ থাকে।

মায়োফাইব্রিলে অ্যাকটিন ও মায়োসিনের বিশেষ বিন্যাসের জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পেশীকে **তির্যক ডোরাদার** মনে হয় বা পর্যায়ক্রমিক আলো-আঁধারের ব্যান্ড হিসাবে দেখা যায়। উর্ধ্ব ও নিম্ন প্রতিসরাংকসম্পন্ন অঞ্চলের পর্যায়ক্রমিক সহাবস্থানে এই তির্যক ডোরার আবির্ভাব ঘটে। উর্ধ্ব প্রতিসরাংক অঞ্চলকে **A-ব্যান্ড** এবং নিম্ন প্রতিসরাংক অঞ্চলকে **I-ব্যান্ড** বলা হয়। I-ব্যান্ডের কেন্দ্রগামী উর্ধ্ব প্রতিসরাংক রেখা Z-লাইন* এবং A-ব্যান্ডের কেন্দ্রস্থ নিম্ন

* Z-লাইন জার্মান শব্দ Zwischenscheibe থেকে এসেছে ; যার মানে চাকতির মধ্যে। H, আবিষ্কর্তা Hensen এবং জার্মান শব্দ Hell এই উভয় শব্দ থেকে এসেছে। Hell-এর মানে উজ্জ্বল বা শ্বেতাভ।

প্রতিসরাংক ধূসর অঞ্চল H-অঞ্চল নামে পরিচিত। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে
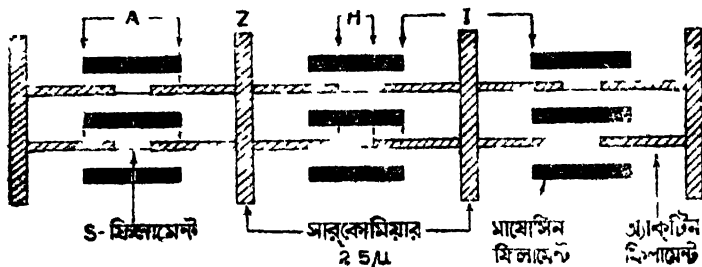
৮-১ নং চিত্র : অ্যাক্‌টিন ও মায়োসিনের সম্পর্ক।

Z-লাইনকে এক আঁকাবাঁকা বা সর্পিল রেখা হিসাবে দেখা যায় (16-6নং চিত্র)। কারও কারও মতে ইহা মায়োফাইব্রিলে অনুপ্রস্থে সম্প্রসারিত ঝিল্লির দ্বারা গঠিত। Z-লাইনের উভয়পার্শ্বে অধিকতর গাঢ় ও সরু যে তির্যক লাইন দেখা যায় তাদের Z-লাইন বলা হয়। দুটো Z-লাইনের অন্তর্বর্তী দূরত্বকে **স্যারকোমিয়ার** (sarcomere) বলা হয়। শ্লথ পেশীতে স্যারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্য প্রায় 2-3μ হয়। স্যারকোমিয়ারকে পেশীর **সংকোচী একক** (contractile unit) হিসাবে গণ্য করা হয়। H-অঞ্চলের মধ্যভাগে যে সংকীর্ণ কৃষ্ণাভ রেখা দেখা যায় তাকে M-ব্যান্ড বলা হয়। H-অঞ্চল থেকে I-ব্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে **O-ব্যান্ড** বলা হয়।

A-ব্যান্ডের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত মায়োসিন ফিলামেন্ট সম্প্রসারিত থাকে। O-ব্যান্ডে অ্যাক্‌টিন ও মায়োসিন ফিলামেন্ট একে অপরের মধ্যে অবস্থান করে। একটি মায়োসিনের পরই দুটো অ্যাক্‌টিন বিন্যস্ত থাকে (16-3নং চিত্র)। কখনও একটি মায়োসিনের পর একটি অ্যাক্‌টিন থাকে (16-5 ও 16-6 নং চিত্রে তাই আছে)। H-অঞ্চলে অ্যাক্‌টিন ফিলামেন্ট অনুপস্থিত। দুটো অ্যাক্‌টিনপ্রান্ত এই অঞ্চলে সূক্ষ্ম **S-ফিলামেন্টের** দ্বারা যুক্ত থাকে। M-ব্যান্ডে মায়োসিন ফিলামেন্ট অধিকতর পুরু হয়। I-ব্যান্ডে Z লাইনের উভয় পার্শ্বে শুধুমাত্র অ্যাক্‌টিন ফিলামেন্ট বিস্তৃত থাকে। Z-লাইনে অ্যাক্‌টিন কুন্ডলীকৃত-ভাবে বিস্তৃত থাকে, ফলে N-লাইনের আবির্ভাব ঘটে। প্রতিটি অ্যাক্‌টিন ফিলামেন্ট মনে হয় Z-লাইনে 4-টি সূক্ষ্ম অপসৃত ফিলামেন্টের সংগে একীভূত হয়। Z-লাইন এর ফলে

আঁকাবাঁকা হয়। অপসৃত ফিলামেন্টগুলোকে Z-ফিলামেণ্ট বলা হয়। এরা প্রোটিন ট্রপো-মায়োসিনের দ্বারা গঠিত। অন্য আর একটি মডেলে বলা হয়েছে, অ্যাক্‌টিনের দুটো চেন থেকে নির্গত ট্রাপোমায়োসিন Z-লাইনে চুলের কাঁটার লুপের মত মিলিত হয় এবং সন্নিহিত স্যার্‌কোমিয়ারের অনুরূপ লুপের সংগে সংযুক্ত হয়। পেশীর সর্বাধিক সংকোচনের সময় আঁকাবাঁকা Z-লাইন সোজা হয়, ফলে অ্যাক্‌টিন Z-লাইনের আরও কাছে সরে যেতে পারে, স্যারকোমিয়ারকে আরও অধিকতর সংকুচিত হতে সুযোগ দেয় এবং পেশীর স্থূলতা বৃদ্ধি পায়।

16-6 নং চিত্র ঃ অস্থিপেশীর গঠন ব্যাণ্ডেল থেকে আণবিক।

মায়োসিন ফিলামেন্ট ঃ মায়োসিন অধিকতর বৃহৎ ফিলামেন্ট। এর ব্যাস প্রায় 100 Å এবং দৈর্ঘ্য 1·5μ। মায়োসিনের পশ্চাৎপ্রান্ত (tail) M-ব্যাণ্ডে নিহিত থাকে। প্রতিটি মায়োসিন ফিলামেণ্ট এই স্থানে সন্নিহিত মায়োসিনের সংগে তির্যকভাবে বিন্যস্ত 40 Å ব্যাসসম্পন্ন সূক্ষ্ম ফিলামেণ্টের (M-ব্যাণ্ড ফিলামেণ্ট) দ্বারা যুক্ত থাকে। **M-ব্যাণ্ড ফিলামেণ্ট** আবার সূক্ষ্ম **সমান্তরাল ফিলামেন্টের** দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। এই দুধরণের সূক্ষ্ম ফিলামেণ্টের সংযোগস্থলকে **M-ব্যাণ্ডফিলামেন্ট ব্রিজ** বলা হয় (16-6নং চিত্র)। M-ব্যাণ্ড ফিলামেণ্টের সঠিক রাসায়নিক প্রকৃতি যদিও জানা যায়নি, তথাপি
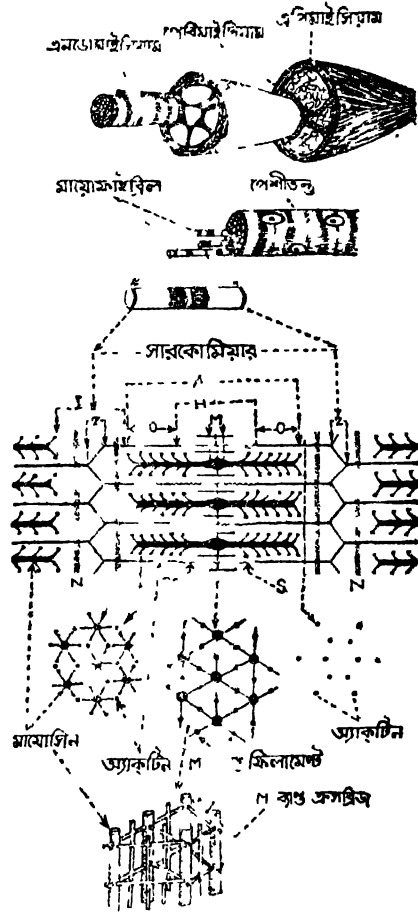
সংকোচনের সময় সহযোগী হিসাবে কাজ করে তাতে সন্দেহ নেই। এই সূক্ষ্ম ফিলামেন্টগুলোকে অ্যাক্টিন ও মায়োসিনের অন্তর্বর্তী ক্রসব্রিজের (cross-bridges) সংগে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে। ক্রসব্রিজ পেশীর সংকোচনক্রিয়ার সংগে সম্পর্কযুক্ত।

মায়োসিন ফিলামেন্ট দুটো ভাগে বিভক্ত থাকে: (1) **লাইট মেরোমায়োসিন** (light meromyosin) এবং (2) **হেভিমেরোমায়োসিন** (heavy meromyosin)। লাইট মেরোমায়োসিনের আকৃতি রডের মত। এদের ব্যাস 20Å এবং দৈর্ঘ্য 1000Å। এরা পরস্পর দৈর্ঘ্য-বরাবর অবস্থান করে এবং মায়োসিনের গঠন-কাঠামো হিসাবে কাজ করে। হেভি মেরোমায়োসিন (300Å দীর্ঘ) আবার দুটো অংশের সমন্বয়ে গঠিত। (a) রডাকৃতি অংশ এবং (b) গোলাকৃতি মস্তক (40Å ব্যাসযুক্ত)। রডাকৃতি অংশ লাইট মেরোমায়োসিনের সংগে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবং গোলকাকৃতি মস্তক পার্শ্বদেশে অ্যাক্টিন ও মায়োসিনের মধ্যবর্তী **ক্রস-ব্রিজ** হিসাবে অবস্থান করে। M-ব্যাণ্ডে প্রায় 0·2μ বিস্তৃত স্থানে ক্রস-ব্রিজ অনুপস্থিত। M-ব্যাণ্ডের উভয়প্রান্তের মায়োসিনে ক্রসব্রিজ বিপরীত মুখে অবস্থান করে।

16–7 নং চিত্র: অ্যাক্টিন (উপরে) ও মায়োসিনের (নীচে) আণবিক গঠন।

হেভি মেরোমায়োসিনের গোলাকৃতি মস্তক বা ক্রস-ব্রিজে **অ্যাডেনোসিন ট্রায়ফস্‌ফাটেজ** (ATP-ase) এনজাইম ও **অ্যাক্টিন বাঁধক স্থান** (actin binding site) বর্তমান। মায়োসিনের 400Å দীর্ঘ একটি খণ্ডাংশে প্রায় 6টি ক্রসব্রিজ থাকে এবং তারা পেঁচাল অবস্থায় 60° কোণে মায়োসিনের চারি পাশে একটি মাত্র আবর্তনে অবস্থান করে। ক্রস্‌ব্রিজগুলো প্রতিটি পৃথক অ্যাক্টিনের-অভিমুখে এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে, যাতে প্রত্যেক অ্যাক্টিনের

ক্ষেত্রে ক্রসব্রিজ প্রায় 450Å দূরত্বে অবস্থান করে। ক্রস ব্রিজের দৈর্ঘ্য অর্ধ-স্যারকোমিয়ারের 5 শতাংশ।

অ্যাকটিন ফিলামেন্ট ঃ অ্যাকটিন অধিকতর শীর্ণ ফিলামেন্ট। এদের ব্যাস 50Å এবং দৈর্ঘ্য 1μ। প্রতিটি অ্যাকটিন ফিলামেন্ট দুটো তন্তুময় **F-অ্যাকটিনের** চেনের দ্বারা গঠিত। এই চেন বা স্ট্র্যান্ড (strand) দুটো পাকান দড়ির মত কুণ্ডলীকৃতভাবে পেছান থাকে। **F-অ্যাকটিন** আবার ক্ষুদ্র গোলাকার একক **G-অ্যাকটিনের** সমন্বয়ে গঠিত। হেলিক্সের প্রতিটি পাকে 13টি করে G-অ্যাকটিন থাকে (16-7নং চিত্র)। প্রতিটি F-অ্যাকটিনের চেনে 300 400টি G-অ্যাকটিন থাকে। এছাড়া **ট্রপোমায়োসিন** (tropomyosin) এবং **ট্রপোনিন** (troponin) নামক দুটো প্রোটিন অ্যাকটিন হেলিক্সের খাঁজে অবস্থান করে। (16-8নং চিত্র)। ট্রপোমায়োসিনের প্রতিটি ফিলামেন্টে
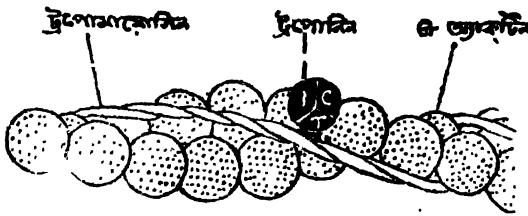
16-8 নং চিত্র ঃ অ্যাকটিনের পেঁচাল খাঁজে ট্রপোমায়োসিন ট্রপোনিনের অবস্থান।

প্রায় 40-60টি অণু থাকে এবং এরকম দুটো ফিলামেন্ট দড়ির মত পেছান থাকে। ট্রপোনিনও গোলাকার একক। এরা ট্রপোমায়োসিন ফিলামেন্ট বরাবর একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করে। প্রতিটি ট্রপোনিন তিনটি উপবিভাগ নিয়ে গঠিত। T-ট্রপোনিন অংশটি অন্যান্য অংশকে ট্রপোমায়োসিনের সংগে বেঁধে রাখে, I-ট্রপোনিন অংশ অ্যাকটিনের সংগে মায়োসিনের সংযুক্তিতে বাধাদান করে এবং C-ট্রপোনিন অংশ Ca^{++} আয়নের সংগে যুক্ত হয়, যার ফলে পেশী সংকোচনের সূত্রপাত ঘটে। Z-লাইনের কোন একপাশে অ্যাকটিনের যে বিন্যাস দেখা যায়, অপর পাশে তার বিপরীত বিন্যাস দেখা যায়। A ব্যান্ডের দুটো অর্ধাংশে অ্যাকটিন ও মায়োসিনের এজাতীয় বিপরীত বিন্যাস থেকে ধারণা করা সহজ নয়, সংকোচনের সময় অ্যাকটিন ফিলামেন্ট স্যারকোমিয়ারের যে কোন পার্শ্বে বিপরীত দিকে অর্থাৎ স্যারকোমিয়ারের কেন্দ্রের দিকে গতিশীল হয়। তাছাড়া আকটিন হেলিক্সের যে উচ্চতর বিন্দু-

সমূহ মায়োসিনের কাছাকাছি থাকে, প্রধানত তারাই ক্রিয়াস্থান (active site) হিসাবে সক্রিয়তা প্রদর্শন করে এবং ক্রসব্রিজের সংগে যুক্ত হয়।

5. **পেশীনালিকা বা স্যারকোটিউবুল** (Sarcotubule) : স্যারকো-প্লাজমে দুপ্রকারের পেশীনালিকা বা স্যারকোটিউবুল দেখা যায় : (1) তির্যক-ভাবে বিন্যস্ত পেশীনালিকা (T-সংস্থা) : মানুষ বা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে
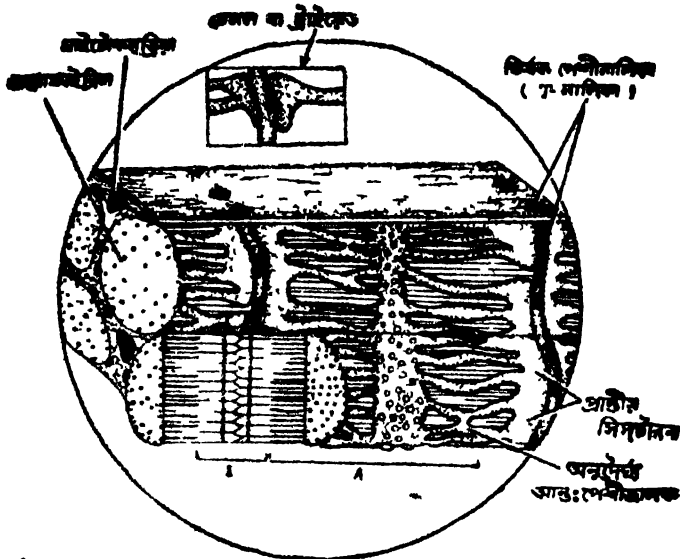
16-9 নং চিত্র : ব্যাঙের পেশীনালিকার বিন্যাস।

এরা স্যারকোলেমা থেকে উন্মুক্ত হয়ে নিয়মিতভাবে প্রতিটি A ও I-ব্যান্ডের সীমারেখা দিয়ে পেশীকোষে প্রবেশ করে এবং কোষের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। ব্যাঙের ক্ষেত্রে এরা Z-লাইন দিয়ে পেশীকোষে প্রবেশ করে (16-9 নং চিত্র)। হৃৎপেশীতেও শেষোক্ত বিন্যাস দেখা যায়, তবে প্রান্তীয় সিসটারনা থাকে না। তির্যক পেশীনালিকা স্যারকোলেমার অন্তর্মুখী সম্প্রসারণবিশেষ এবং তাদের প্রাচীরঝিল্লির গঠন স্যারকোলেমার গঠনের মতই। এই পেশীনালিকাগুলোর অন্তঃস্থ ব্যাস প্রায় 300A এবং ইহা পেশীকোষের চতুঃপার্শ্বস্থ সংযোগরক্ষাকারী কলা ও তরলের সংগে সরাসরি যুক্ত থাকে। (2) **অনুদৈর্ঘ্য পেশীনালিকা** বা **স্যারকোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম** : এরা মায়োফাইব্রিলের অন্তর্বর্তী স্থানে মায়োফাইব্রিলের সংগে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবং অসংখ্য পার্শ্বশাখার

মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত হয়। ব্যাঙের অস্থিপেশীর পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, অনুদৈর্ঘ্য পেশীনালিকার পার্শ্বশাখা A ব্যান্ডে মায়োফাইব্রিলের চারিপাশে সছিদ্র বেষ্টনী রচনা করে এবং Z লাইন বরাবর তির্যক পেশীনালিকার উভয়-পার্শ্বে প্রশস্ত হয়ে প্রান্তীয় থলি বা সিসটারনা গঠন করে। (3) **ট্রাইয়েড** (triad): তির্যক পেশীনালিকা এবং তার উভয়পার্শ্বস্থ দুটো প্রান্তীয় সিসটারনাকে নিয়ে এক একটি ট্রাইয়েড বা তেনল গঠিত হয়। ব্যাঙের পেশীতে ট্রাইয়েড Z-লাইনে থাকে, ফলে প্রতি স্যারকোমিয়ারে একটি মাত্র ট্রাইয়েড সম্ভবপর। অপরপক্ষে মানুষ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এদের A ও I এর সংযোগস্থলে দেখা যায়, ফলে প্রতিটি স্যারকোমিয়ারে দুটি করে ট্রাইয়েড থাকে। তির্যক পেশীনালিকার উভয়পার্শ্বস্থ সিসটারনাতে Ca^{++} আয়ন আবদ্ধ থাকে। তির্যক পেশীনালিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ-উদ্দীপনা সিসটারনার ঝিল্লিভেদ্যতার পরিবর্তন ঘটায়, ফলে Ca^{++} আয়ন সিসটারনা থেকে নির্গত হয় এবং মায়োসিন এনজাইমকে (ATP ase) সক্রিয় হতে সাহায্য করে। পেশীসংকোচনের পর Ca^{++} আয়নকে সিসটারনাতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। **রিলাক্সিং ফ্যাক্টর** (relaxing factor) বা **মার্শফ্যাক্টর** (Marsh factor) বলে কথিত একটি উপাদান সক্রিয়ভাবে সিসটারনার সংগে যুক্ত থাকে এবং ATP-এর উপস্থিতিতে Ca^{++} আয়নকে সিসটারনাতে ধরে রাখতে পারে। কারও মতে এই ফ্যাক্টর সিসটারনার ঝিল্লিনিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেসিকলবিশেষ (vesicles), সিসটারনার ঝিল্লি থেকে এরা উৎপন্ন হয় এবং ATP এর উপস্থিতিতে Ca^{++} আয়নকে ধরে রাখতে পারে।

পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের পদ্ধতি

Mechanism of muscular contraction and relaxation

হ্যানসোন ও হাক্সলে (Hanson and Huxley) স্থির পেশী ও সংকুচিত পেশীকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন স্থির পেশীর তুলনায় সংকুচিত পেশীতে অ্যাকটিন ও মায়োসিন স্যারকোমিয়ারের সমগ্র দৈর্ঘ্যে পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। তাদের এসব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পেশীসংকোচনের আধুনিক মতবাদ **স্লাইডিং ফিলামেন্ট থিওরি** (sliding filament theory) বা **ফিলামেন্টের গড়িয়ে চলন** মতবাদের উদ্ভব ঘটে। স্থির পেশীতে অ্যাকটিন ও মায়োসিন পরস্পর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ

থাকে না, কারণ স্থির পেশীকে টেনে তাদের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের অধিকতর দৈর্ঘ্যে সম্প্রসারিত করা যায়। পেশীসংকোচনের সময় মায়োসিন ফিলামেন্টের ক্রসব্রিজ সন্নিহিত অ্যাকটিন ফিলামেন্টের ক্রিয়াস্থানের (active site) সংগে পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয়ে তাকে A ব্যান্ডের কেন্দ্রের দিকে টেনে নেয়, ফলে স্যারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়। এভাবে পেশী সংকুচিত হয়। এই মতবাদের ভিত্তিতে পেশীসংকোচনের সংগে সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়াসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়ঃ (1) ট্রাইয়েডের সক্রিয়তা ও Ca^{++} আয়নের অবরোধ-মুক্তি, (2) অ্যাডেনোসিন ট্রায়ফসফাটেজ এনজাইমকে সক্রিয়করণ ও ATPএর বিশ্লিষ্টভবন এবং (3) হেভিমেরোমায়োসিনস্থিত ক্রসব্রিজের সংগে অ্যাকটিনের ক্রিয়াস্থানের সংযুক্তি।

1. **ট্রাইয়েডের সক্রিয়তা ও Ca^{+} আয়নের অবরোধমুক্তি** (triad activity and release of Ca^{++}) ঃ পেশীর সংগে যুক্ত স্নায়ুতে উদ্দীপনা প্রদান করলে পেশীতন্তুর স্যারকোলেমায় যে তড়িৎউত্তেজনা বা ডিপোলারাইজেশন ওয়েভ (depolarisation wave) বিস্তারলাভ করে, তা T-টিউবুল বা তির্যক পেশীনালিকার প্রাচীরঝিল্লিতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং কোষের গভীর অঞ্চলের দিকে সঞ্চালিত হয়। ট্রাইয়েড স্থানে এই প্রবাহ T-নালিকা থেকে উভয় পার্শ্বস্থ প্রান্তীয় সিস্টারনা দুটোর ঝিল্লিতে বিস্তারলাভ করে এবং তার ভেদ্যতার পরিবর্তন ঘটায়। ফলে Ca^{++} আয়ন সিসটারনাতে তার সঞ্চয়স্থান ভেদ্যতার পরিবর্তন ঘটায়। ফলে Ca^{++} আয়ন সিসটারনাতে তার সঞ্চয়স্থান থেকে আলাদা হয়ে স্যারকোপ্লাজমে নির্গত হয়। **রিলাক্সিং ফ্যাক্টর** বা **ম্যার্শ ফ্যাক্টর** বলে কথিত একটি উপাদান সিসটারনার ঝিল্লিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে এবং ATP-এর উপস্থিতিতে Ca^{++} আয়নকে ধরে রাখে। কারও কারও মতে **কালসেকুয়েস্ট্রিন** (calsequestrin) নামক প্রোটিন Ca^{++} আয়নকে বেঁধে রাখে। আবার অন্যদের মতে এই উপাদান সিসটারনার ঝিল্লি-নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেসিকলবিশেষ। সিসটারনার ঝিল্লি থেকে এরা উৎপন্ন হয় এবং ATPএর উপস্থিতিতে Ca^{++} আয়নকে সিসটারনায় ধরে রাখে।

2. **অ্যাডেনোসিন ট্রায়ফস্ফাটেজের সক্রিয়করণ ও ATP এর বিশ্লিষ্টভবন** (Activation of ATP-ase and breakdown of ATP) ঃ স্যারকোপ্লাজমে নির্গত Ca^{++} আয়ন এরপর অ্যাক্টিন ফিলামেন্টস্থিত প্রোটিন ট্রপোনিনের

সংগে যুক্ত হয়ে সংকোচনের সূত্রপাত ঘটায়। স্থির পেশীতে I-ট্রপোনিন দৃঢ়ভাবে অ্যাকটিনের সংগে আবদ্ধ থাকে এবং মায়োসিনের প্রান্তদেশ অ্যাকটিনের যে স্থানে সংযুক্ত হয়ে ক্রসব্রিজ তৈরী করে তাকে ট্রপোমায়োসিন ঢেকে রাখে। এভাবে ট্রপোনিন-ট্রপোমায়োসিনের সংযুক্তি (complex) **প্রসারক-প্রোটিন** (relaxing protein) হিসাবে কাজ করে যা অ্যাকটিন ও মায়োসিনের সংযুক্তিতে বাধাদান করে। মুক্ত Ca^{++} আয়ন যখন C-ট্রপোনিন অংশের সংগে সংযুক্ত হয় তখন I-ট্রপোনিনের সংগে অ্যাকটিনের বাঁধন দুর্বল হয়ে পড়ে ; ফলে ট্রপোমায়োসিন পার্শ্বদেশে সরে যায়। সরে যাবার ফলে মায়োসিনের প্রান্তদেশ (হেভী মেরোমায়োসিন) অ্যাকটিনের যে স্থানে যুক্ত হয় তা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, ফলে ATP ভেংগে যায় এবং পেশীসংকোচন শুরু হয়। একটিমাত্র ট্রপোনিন অণু এভাবে Ca^{++} আয়নের দ্বারা আবদ্ধ হলে সাতটি মায়োসিন-বাঁধক স্থান উন্মুক্ত হয়।

3. **হেভিমেরোমায়োসিনের ক্রস-ব্রিজের সংগে অ্যাকটিনের ক্রিয়াস্থানের সংযুক্তি** (Union of heavy meromyosin cross bridges to the active sites of action) : A-ব্যাণ্ডের যে স্থানে অ্যাকটিন ও মায়োসিন পরস্পরকে আচ্ছাদন (overlap) করে সেই স্থানের হেভি মেরোমায়োসিনের ক্রসব্রিজে পেশী সংকোচনের প্রয়োজনীয় বলের উদ্ভব ঘটে ; দেখা গেছে একটি ATP বিশ্লিষ্ট হলে হেভিমেরোমায়োসিনের একটি ক্রসব্রিজ এপাশে এবং ওপাশে আন্দোলিত হয়। হেভিমেরোমায়োসিনের সংগে লাইট মেরোমায়োসিনের শিথিল (flexible) সংযুক্তির ফলে মায়োসিন ক্রসব্রিজ এভাবে সহজে আন্দোলিত হয়ে অ্যাকটিন ক্রিয়াস্থানের সংগে যুক্ত হয়। এভাবে একটি ক্রসব্রিজ অ্যাকটিনের ক্রিয়াস্থানে প্রথমে যুক্ত হয় এবং তাকে A-ব্যাণ্ডের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। এরপর নিজেই সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং দোলনার মত দোল দিয়ে পরবর্তী ক্রিয়াস্থানের সংগে যুক্ত হয়।

এভাবে অ্যাকটিন ফিলামেন্ট গড়িয়ে A-ব্যাণ্ডের কেন্দ্রের দিকে অনুপ্রবেশ করে। এজাতীয় পেশীসংকোচনের ফলে পেশীর দৈর্ঘ্য হ্রাস পেলে তাকে **সমটান পেশীসংকোচন** (isotonic contraction) বলা হয়। অপরপক্ষে সংকোচন থেকে পেশীর দৈর্ঘ্য হ্রাস না পেলে তাকে **সমদৈর্ঘ্য পেশী সংকোচন** (isometric contraction) বলে। সমদৈর্ঘ্য পেশীসংকোচনে হেভি মেরো-মায়োসিনের ক্রসব্রিজ অ্যাকটিনের ক্রিয়াস্থানে যুক্ত হয়ে তাকে A ব্যাণ্ডের

কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে নেয় এবং সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দোল খেয়ে পুনরায় অ্যাক্‌টিনের পরবর্তী ক্রিয়াস্থানের সংগে যুক্ত হবার চেষ্টা করে, তখনই
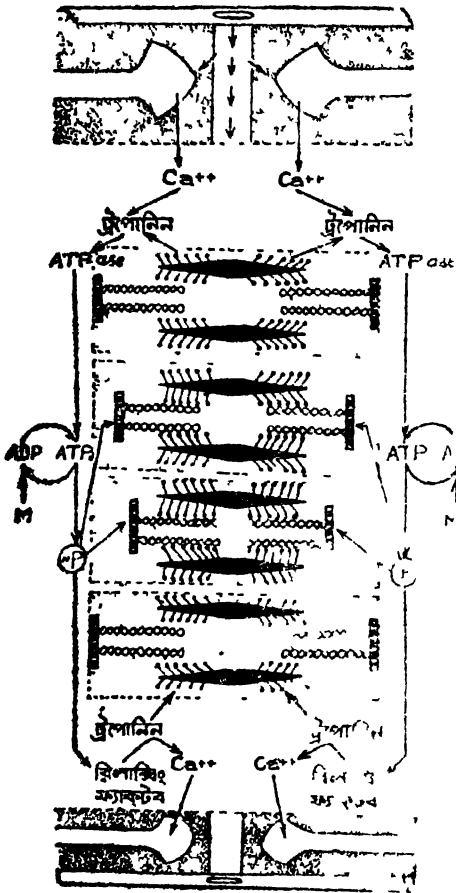
16-10 নং চিত্র: পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের পদ্ধতি। চিত্রের উভয়প্রান্তে দুটো ট্রায়েড দেখান হয়েছে। একটিমাত্র স্যার্‌কোমিয়ারের সংকোচন ও প্রসারণ প্রদর্শিত। M জৈবশক্তি উৎপাদন (গ্লাইকোলাইসিস ও TCA চক্র ইত্যাদি)।

অ্যাক্‌টিনের এগিয়ে যাওয়া ক্রিয়াস্থানটি সমেত অ্যাক্‌টিন পেছনে স্বস্থানে ফিরে আসে। ফলে নির্দিষ্ট ক্রসব্রিজটি অ্যাক্‌টিনের একটিমাত্র ক্রিয়াস্থানেই বার বার সংযুক্ত হয়। এভাবে মায়োসিন ও অ্যাক্‌টিন স্থির হয় এবং পেশীর দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি সীমিত হয়। সমদৈর্ঘ্য পেশীসংকোচনে পেশীটানের (tension) উদ্ভব ঘটে। পেশীটানের মান নির্ভর করে কত সংখ্যক ক্রস ব্রিজ সংকোচনের সময় অ্যাক্‌টিনের ক্রিয়াস্থানের সংগে যুক্ত হয় তার উপর। Ca^{++}আয়নের সিসটার্না থেকে মুক্ত হবার কিছুক্ষণ পরই পেশীজালক (Sarcoplasmic

reticulum) Ca^{++}আয়নকে সংগ্রহ করতে শুরু করে। Ca^{++}আয়নকে সক্রিয় পদ্ধতিতে পেশীজালকের দীর্ঘ কেন্দ্রীয় অংশে গৃহীত হয় এবং প্রান্তীয় সিসটারনার দিকে প্রেরিত হয়। একবার Ca^{++} আয়নের গাঢ়ত্ব একটি নির্দিষ্ট সীমার নীচে নেমে এলে অ্যাকটিন ও মায়োসিনের সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয় এবং পেশী প্রসারিত হয়। দেখা গেছে Ca^{++} আয়নের সক্রিয় পরিবহনে বাধা সৃষ্টি করলে পেশী প্রসারণ সম্ভবপর হয় না। সক্রিয় পরিবহনের প্রয়োজনীয় শক্তি আসে ATP থেকে। অর্থাৎ সংকোচন ও প্রসারণ উভয় ক্ষেত্রেই ATP প্রয়োজন।

সংকোচনের সময় একটি অস্থিপেশীর আণুবীক্ষণিক পরিবর্তন

Microscopic changes in the skeletal muscle during contraction

মায়োফাইব্রিলযুক্ত একটি টাটকা পেশীকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে তাকে সংকুচিত হতে দিলে তার অন্তরংগ অংগসংস্থানের (intimate structures) মধ্যে যে সব পরিবর্তন সাধিত হয় তা লক্ষ্য করা যায়। সামগ্রিকভাবে পেশীতন্তুর দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় এবং ইহা অধিকতর স্থূল হয়। প্রতিটি স্যারকোমিয়ারের হ্রাসপ্রাপ্তির সংগে I-ব্যান্ডের দৈর্ঘ্যও হ্রাস পায় এবং স্থির পেশীর দৈর্ঘ্যের 50 শতাংশ সংকোচনের সময় ইহা অদৃশ্য হয়ে যায়। A-ব্যান্ডের দৈর্ঘ্যের কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় না। H-অঞ্চলের বিস্তার স্যারকোমিয়ারের সংগে সমানুপাতিকভাবে হ্রাস পায় এবং অদৃশ্য হয়। বিপরীতক্রমে মায়োসিন ফিলামেন্টে পিস্টনের মত অ্যাকটিন ফিলামেন্টের অনুপ্রবেশ সমানুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্যারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্য 2 মিউ (μ) অপেক্ষা হ্রাস পেলে (অর্থাৎ স্যার-
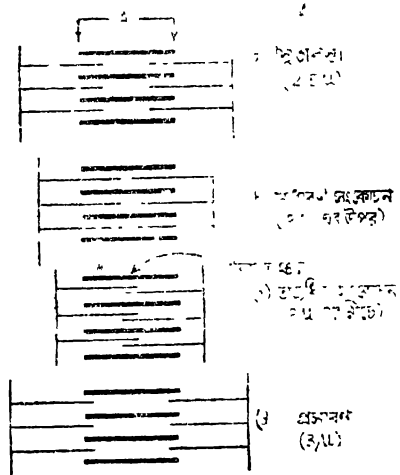
16-11 নং চিত্র : সংকোচন ও প্রসারণের সময় স্যারকোমিয়ারের পরিবর্তন।

কোমিয়ারের উভয়প্রস্থ অ্যাক্‌টিনের মোট দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম হলে) A-ব্যাণ্ডের মধ্যভাগে একটি নিবিড় (dense) অঞ্চলের আবির্ভাব ঘটে। স্যারকোমিয়ারের উভয় প্রস্থ অ্যাক্‌টিনের উপর্যুপরি চেপে বসার ফলে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয় (16-11 নং চিত্র)।

স্যারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্য 1·5μ বা তদপেক্ষা হ্রাস পেলে ফিলামেণ্টের অনিয়মিত বিন্যাসসহ Z-লাইনের উভয় প্রান্তে একটি নিবিড় অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। Z-লাইনের মায়োসিন ফিলামেণ্টের ভাঁজ সৃষ্টি থেকে এই পরিবর্তন ঘটে।

প্রসারণকালে পেশীতে সংকোচনের বিপরীত পরিবর্তনসমূহ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ স্যারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি, H-অঞ্চলের বিস্তার-বৃদ্ধি, অনুপ্রবিষ্ট অ্যাকটিনের মায়োসিন ফিলামেণ্ট থেকে নিষ্ক্রমণবৃদ্ধি ইত্যাদি। স্যারকোমিয়ারের 3·5 মিউ দৈর্ঘ্যবৃদ্ধিতে অ্যাকটিন ফিলামেণ্ট সম্পূর্ণরূপে মায়োসিনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে।

সংকোচনকালে অস্থিপেশীতে যান্ত্রিক পরিবর্তন

Mehchanical changes of skeletal muscle during contraction

উদ্দীপনা পেলে পেশীতে যে টান (tension) বৃদ্ধি পায়, তার বিরুদ্ধে সংকুচিত হয়ে (বোঝার পরিমাণ অধিক না হলে) যান্ত্রিক কার্য সম্পন্ন করার মধ্যে পেশীকলার বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। পেশীতে পর্যায়ক্রমে টান বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে তা বোঝার উপযোগী হয়ে ওঠে। সংকোচনের সংগে পেশীর দৈর্ঘ্য হ্রাস ঘটলে টানকে বোঝা ও গতিবেগের সমতুল্য হতে হয়।

পেশীসংকোচন দুপ্রকারের। * যথা: (1) **সমটান পেশীসংকোচন** (isotonic contraction) এবং (2) **সমদৈর্ঘ্য পেশীসংকোচন** (isometric contraction)।

1. **সমটান পেশীসংকোচন:** সমটান পেশীসংকোচনে পেশীকোষ বা পেশীতন্তুর দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় এবং স্থূলতা (thickness) বৃদ্ধি পায়, তবে আয়তন প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। পেশীর সংকোচী উপাদানের সংগে স্থিতিস্থাপক উপাদানও হ্রাস পায় (16-12 নং চিত্র)। দৈর্ঘ্য হ্রাসের সময় বোঝার পরিমাণ একই থাকে। সমটান পেশীসংকোচনে বাহ্যিক কার্য সম্পন্ন হয়। পেশী এক্ষেত্রে বোঝাকে স্থানান্তরিত করে। এধরনের পেশীসংকোচন প্রধানত চলাফেরা, হাঁটা বা বোঝা উত্তোলনের সময় দেখা যায়।

কোন যন্ত্রকে যদি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়, যেখানে পেশীর

সংকোচন শুরু হওয়ার ঠিক পরেই বোঝা পেশীতে কার্যকারী হয়, তবে এক্ষেত্রে পেশীকে **পশ্চাৎভারবাহী পেশী** (afterloaded muscle) বলা হয়। বোঝা সংকোচনের আগে থেকে কার্যকরী হলে পেশীকে **মুক্ত ভারবাহীপেশী** (free loaded muscle) বলা হয়। সমটান পেশীসংকোচনে পেশী যে কার্য সম্পন্ন করে তার পরিমাণ = বোঝার ওজন × দূরত্ব।
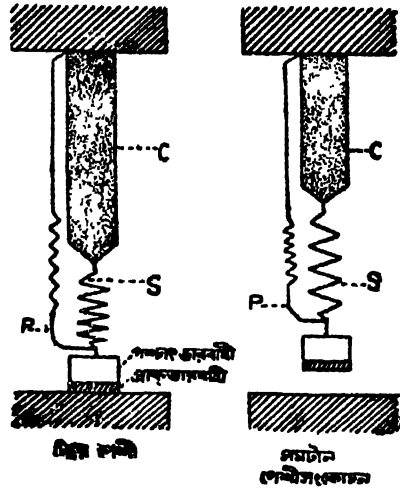
16-12 নং চিত্র : পেশীর ত্রি-উপাদান ভিত্তিক মডেল। C-সংকোচী উপাদান, S-শ্রেণীবদ্ধ স্থিতিস্থাপক উপাদান, P-সমান্তরাল স্থিতিস্থাপক উপাদান।
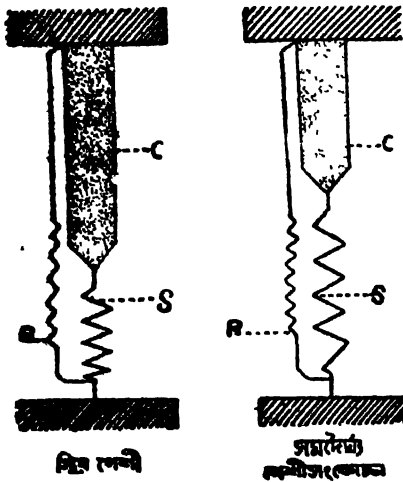
2. **সমদৈর্ঘ্য পেশী সংকোচন :** সমদৈর্ঘ্য পেশীসংকোচনে পেশীর দৈর্ঘ্য প্রায় অপরিবর্তিত থাকে, তবে টান বৃদ্ধি পায়। টান ধাপে ধাপে বোঝার সংগে সমানুপাতিকভাবে বাড়ে। অবশ্য টানবৃদ্ধি আকস্মিক ও দ্রুত হয় এবং সমটান পেশীসংকোচনের চেয়ে এর পরিমাণও অধিক হয়। পেশীসংকোচনে যে তাপের উদ্ভব হয় তার পরিমাণও এক্ষেত্রে বেশী। এজাতীয় পেশীসংকোচনে বাহ্যিক কার্য সম্পন্ন হয় না। দৈনন্দিন জীবনে ইহা প্রধানত অভিকর্ষের বিরুদ্ধে দেহভংগি বজায় রাখে। মায়োফাইব্রিলের দৈর্ঘ্য অবশ্য হ্রাস পায় (16-13 নং চিত্রে C) এবং পেশীটানের বৃদ্ধি ঘটে। স্থিতিস্থাপক

16-13 নং চিত্র : C-সংকোচী উপাদান, S-শ্রেণীবদ্ধ স্থিতিস্থাপক উপাদান, P-সমান্তরাল স্থিতিস্থাপক উপাদান।

উপাদানের দৈর্ঘ্য হ্রাস ঘটে না। পেশীটানের বৃদ্ধি আবার পেশীর প্রারম্ভিক দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। পেশীর স্থিতাবস্থাব দৈর্ঘ্যকে টেনে দ্বিগুণ করলে (এ ক্ষেত্রে স্যারকোমিয়ার প্রায় 3·6μ হয়,) উদ্দীপ্ত পেশীর পেশীটান শূন্যতে নেমে আসে। এর কারণ, অ্যাকটিন মায়োসিনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার ফলে এই উভয় ফিলামেন্টের মধ্যে ক্রসব্রিজের সংযুক্তি ঘটতে পারে না। আবার পেশীকে অত্যধিক সংকুচিত হতে দিলে (এক্ষেত্রে স্যারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্য প্রায় 1·3μ হতে পারে) অ্যাকটিন ও মায়োসিনের মধ্যে যে অত্যধিক অনুপ্রবেশ ঘটে, তা ক্রসব্রিজের সংযুক্তিতে বাধা দান করে, ফলে পেশীটান শূন্যেতে নেমে আসে।

অস্থিপেশী যেহেতু লিভারের মাধ্যমে বহিঃস্থ বাধার বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে, সেহেতু এই পেশীতে কতগুণ পেশীটানের উদ্ভব হবে তা নির্ভর করে লিভার-অস্থির বিন্যাসের উপর। 16-14 নং চিত্রে পেশীর যে অবস্থান দেখান হয়েছে তাতে বাহুর ফ্লেক্সোর বা বাইসেপ একটি ওজনকে ধরে রেখেছে। ওজনটিকে ঐ ভাবে ধরে রাখতে গেলে বাইসেপে যে পেশীটানের উদ্ভব হয়, তার পরিমাণ বোঝার উপর সক্রিয় অভিকর্ষবলের 10 গুণ। অর্থাৎ 10 কেজি ওজনকে এভাবে হাতে ধরে রাখতে গেলে বাইসেপকেএই ওজনের 10 গুণ অর্থাৎ 100 কেজি বল প্রয়োগ করতে হবে, কারণ বোঝার লিভার (l) এ ক্ষেত্রে বাইসেপ লিভারের 10 গুণ। বাইসেপকে তার এই 90° অবস্থান থেকে অধিকতর সম্প্রসারিত বা সংকুচিত করলে বাইসেপ লিভারের দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়, অতএব একই ওজনকে এভাবে ধরে রাখতে হলে পেশীটানের বৃদ্ধি ঘটাতে হয়।
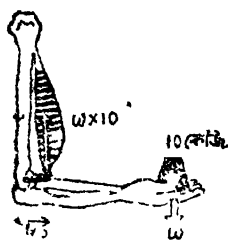
16-14নং চিত্র : লিভারঅস্থি।

একটি শক্তিশালী স্প্রিং-এর সংগে পেশীকে সংযুক্ত করে পেশীর সমদৈর্ঘ্য পেশীসংকোচনের লেখচিত্র (curve) রেকর্ড করা সম্ভব হয়। এই লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্য হল, এর লীনকাল (latent period) এবং সংকোচনকাল (contraction period) দীর্ঘ হয়, তবে প্রসারণকাল অধিকতর পর্যায়ক্রমিক হয়।

দলবদ্ধ পেশী

Muscle group

অস্থিপেশী কখনও এককভাবে কাজ করে না। দলবদ্ধভাবে বা বিভিন্ন গ্রুপে দেহের কংকাল বা অস্থিকে চলমান করে তুলে। যেসব দলবদ্ধ পেশী দেহের

চলনক্রিয়ার সংগে জড়িত তাদেরে **দ্বন্দ্বীপেশী** বা **অ্যাগোনিস্ট** (agonist) এবং চলনক্রিয়ায় যারা বাধাদান করে তাদের **প্রতিদ্বন্দ্বী পেশী** বা **অ্যান্টাগোনিস্ট** (antagonist) বলা হয়। দ্বন্দ্বীপেশী যখন সক্রিয় হয়ে উঠে, প্রতিদ্বন্দ্বী পেশী তখন প্রতিবর্তভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, হাতকে কনুইয়ে দেহের সংগে সমকোণে আনত করে করতলে কোন ওজন চাপালে বাইসেপে (এক্ষেত্রে দ্বন্দ্বী পেশী) পেশীটান উৎপন্ন হয়, কিন্তু ট্রাইসেপ (এক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী পেশী) শ্লথ হয়ে উঠে। আবার আনত হাতকে টেবিলের উপর চেপে ধরা হলে ট্রাইসেপ সংকুচিত হয় কিন্তু বাইপেস শ্লথ হয়। তবে হাতকে সম্প্রসারিত করে কনুইকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করলে বাইসেপ ও ট্রাইসেপ উভয়েই সংকুচিত হয়।

এছাড়া অন্য একশ্রেণীর দলবদ্ধ পেশী **যৌথ পেশী** (synergists) নামে পরিচিত। এদের সংকোচন ব্যতিরেকে দেহের কোন চলনক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে না। কব্জিতে হাতের কেন্দ্রাকর্ষণে (adduct) এ ধরনের সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ করা যায়। ফ্লেক্সোর ক্যারপি অ্যালনারিস একাধারে গ্রন্থিসংকোচন ও কেন্দ্রাকর্ষণের জন্য দায়ী, তাই শুধুমাত্র কেন্দ্রাকর্ষণক্রিয়া সম্পাদন করতে গেলে এক্সটেনসোর ক্যারপি অ্যালনারিসকে এমনভাবে সক্রিয় করে তুলতে হবে যাতে গ্রন্থিসংকোচন (flexion) বিলোপ পায় এবং এরপর ফ্লেক্সোর ক্যারপি আলনারিসের দ্বারা হাতের কেন্দ্রাকর্ষণ সম্পন্ন হয়।

সংকোচনকালে অস্থিপেশীর রাসায়নিক পরিবর্তন

Chemical changes in skeletal muscle during contraction

সংকোচনের সময় পেশীর অভ্যন্তরে যেসব রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা: (1) প্রারম্ভিক পর্যায় (initial step), (2) দ্বিতীয় পর্যায় (second step) এবং (3) অন্তিম পর্যায় (final step))।

1. **প্রারম্ভিক পর্যায়:** পেশীসংকোচনের প্রয়োজনীয় শক্তির প্রাথমিক উৎস পেশীকোষের স্যারকোপ্লাজমস্থিত **অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট** (ATP)। পরবর্তী সময়ে কার্বহাইড্রেট প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করে। পেশীসংকোচনের প্রাক্কালে ATP বিশ্লিষ্ট হয়ে যে ফসফেট আয়নের মুক্তি ঘটায়, প্রধানত সেটিই পেশীসংকোচনের শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে।

পেশীতে উদ্দীপনা দিলে, সেই উদ্দীপনা স্যারকোলেমা থেকে T-পদ্ধতিতে বিন্যস্ত সূক্ষ্ম পেশীনালিকার মধ্য দিয়ে পেশীকোষের সংকোচী উপাদানে পৌঁছয় এবং সিসটারনাতে আবদ্ধ Ca^{++} আয়নকে স্যারকোপ্লাজমে মুক্তি দেয়। মুক্ত Ca^{++} আয়ন ক্রসব্রিজস্থিত মায়োসিন এনজাইমকে (ATP-ase) সক্রিয় করে তোলে, যা ATP-কে ভেংগে দেয়, ফলে ফসফেট আয়ন মুক্ত হয়:

$$ATP \xrightarrow{\text{মায়োসিন এনজাইম}} ADP + \sim P$$
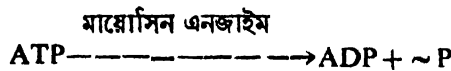
ATP ততক্ষণই সক্রিয় থাকে, যতক্ষণ Ca^{++} আয়ন মুক্ত অবস্থায় থাকে। এই প্রক্রিয়ার পরমুহূর্তেই ATP-এর পুনঃসংশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। এই সময়ে জরুরীভিত্তিক ATP-এর সংশ্লেষণ ঘটাতে **উচ্চশক্তিসম্পন্ন ক্রিয়েটিন ফসফেট** (creatine phosphate) নামক পদার্থ বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। এই পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট-যোজককে ADP-তে স্থানান্তরিত করে, ফলে, ATP সংশ্লেষিত হয়। ক্রিয়েটিন ফসফাটেজ (creatine phosphatase) নামক এনজাইম এই পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করে:

$$\text{ক্রিয়েটিন ফসফেট} + ADP \xrightarrow{\text{এনজাইম}} \text{ক্রিয়েটিন} + ATP$$
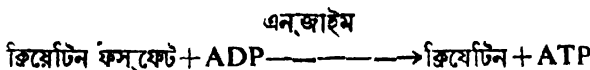
তবে এই প্রক্রিয়ার পরিধি সীমিত, ইহা শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজনই মেটাতে সক্ষম।

2. **দ্বিতীয় পর্যায়:** দ্বিতীয় পর্যায়ে **গ্লাইকোলাইসিস** (glycolysis) পদ্ধতিতে পেশীকোষস্থিত গ্লাইকোজেন পর্যায়ক্রমে ভেংগে যায় এবং পাইরুভিক অ্যাসিড বা ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদন করে। এই পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণে যে শক্তিসম্পন্ন ফসফেট আয়নের ($\sim$ P) মুক্তি ঘটে তা ATP সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। অবায়বীয় (anaerobic) গ্লাইকোলাইসিসে প্রতি 6-টি কার্বনযুক্ত শর্করা থেকে চারটি মাত্র ATP অণুর সংশ্লেষণ ঘটে। বায়বীয় (aerobic) গ্লাইকোলাইসিসে 10টি ATP অণুর সংশ্লেষণ ঘটে। পেশীতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিলে (ভারী পেশীসঞ্চালনে) উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় এবং পেশীতে জমা হতে থাকে। পেশী এদের

সামান্যই পুনরায় গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করতে পারে। প্রধানত **কোরিচক্রের** (Cori cycle) মাধ্যমে এই ল্যাকটিক অ্যাসিড পুনরায় পেশী-গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন ল্যাকটিক অ্যাসিড পেশীকোষ থেকে নির্গত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে, রক্ত থেকে যকৃতে পৌঁছয় এবং যকৃৎ-গ্লাইকোজেন উৎপন্ন করে যা পুনরায় ভেংগে গিয়ে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে, যা রক্তের মাধ্যমে পেশীতে পৌঁছয়। এই গ্লুকোজের দ্বারা পেশী পুনরায় গ্লাইকোজেন উৎপন্ন করে।
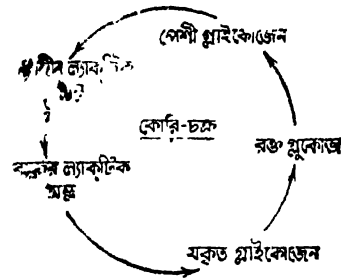
16-15 নং চিত্র : কোরি চক্র

2 নং তালিকা : বায়বীয় ও অবায়বীয় গ্লাইকোলাইসিসে মোট ATP উৎপাদন।

বিক্রিয়া	এনজাইম	অবায়বীয়	বায়বীয়
গ্লিসারাল্ডিহাইড-3 P (×2) →1, 3-ডাইফস্ফোগ্লিসারেট	ডেহাইড্রোজেনেজ	›	6ATP
1, 3-ডাইফস্ফোগ্লিসারেট (×2) →3-ফস্ফোগ্লিসারেট	ফস্ফোকাইনেজ	2A[illegible]	2ATP
ফস্ফো-এনোল পাইরুভেট (×2) →পাইরুভেট	ফস্ফোকাইনেজ	[illegible]ATP	[illegible]ATP
	মোট	4ATP	10ATP

গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতি 'বিপাকক্রিয়া' (metabolism) অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় (16-16 নং চিত্র), ফসফোরিলেজ (phosphorylase) এনজাইমের সাহায্যে গ্লাইকোজেন অজৈব ফসফেটের (inorganic phosphate) সংগে সং[illegible] হয়ে প্রথমে গ্লুকোজ-1-ফসফেট নামক পদার্থ উৎপন্ন করে। এরপর পর্যায়ক্রমে যথাযথ এনজাইমের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ-6-ফসফেট ফ্রাকটোজ-6-ফসফেট, ফ্রাকটোজ 1-6-ডাইফসফেট, দুটো ট্রায়োজ ফসফেট অণু, 1-3-ডাইফসফোগ্লিসারেট, 3-ফসফোগ্লিসারেট,

2-ফসফো-গ্লিসারেট, 2-ফসফো এনোল পাইরুভেট এবং পরিশেষে পাইরুভেট বা পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এরপর অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড অ্যাস-টাইল কো-এ বা সক্রিয় অ্যাসিটেটে রূপান্তরিত হয় এবং TCA চক্রে প্রবেশ করে। অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে পদার্থটি ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। এই উভয় পরিস্থিতি যথাক্রমে বায়বীয় ও অবায়বীয় গ্লাইকোলাইসিস নামে পরিচিত। এই উভয় পদ্ধতিতে যত সংখ্যক ATP উৎপন্ন হয়, তার মোট সংখ্যা 2 নং তালিকায় উপস্থাপিত করা হয়েছে।
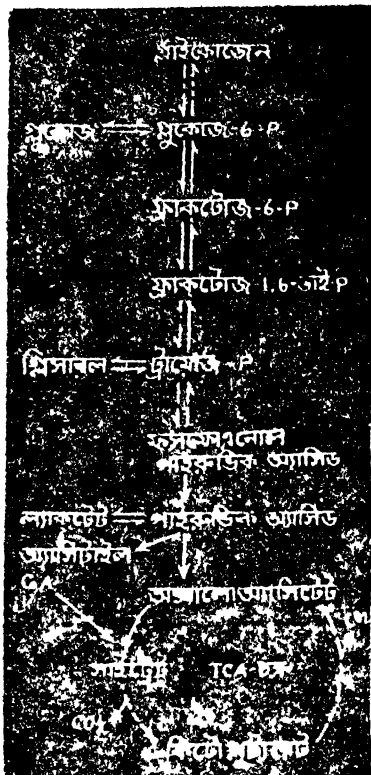
16- 6 নং চিত্র : সংক্ষেপে গ্লাইকোলাইসিস ও TCA চক্র। ভগ্নরেখা অন্তর্বর্তী বিক্রিয়া-সমূহকে বোঝাবে।

উভয় প্রক্রিয়াতেই একটি করে ATP ফ্রাকটোজ-6-ফসফেট থেকে ফ্রাকটোজ-1, 6-ডাইফসফেট অণু উৎপন্ন হতে খরচ হয়।

২. **অন্তিম পর্যায় :** অন্তিম পর্যায়ে, উৎপন্ন পাইরুভিক ও ল্যাকটিক অ্যাসিড অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারিত হয়ে কার্বনডাইঅক্সাইড, জল এবং ATP উৎপন্ন করে। এই দুটো পদার্থের পর্যায়ক্রমিক অবনয়নে (degradation) ক্রেবসচক্র (Krebs cycle) বা TCA-চক্র (tricarboxylic acid cycle) কাজ করে। এই পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া থেকে ও ইলেকট্রন পরিবহন সেতুর মাধ্যমে যেসব শক্তিসম্পন্ন ফসফেট আয়ন (~P) উৎপন্ন হয়, তারা ATP-এর সংশ্লেষণ ঘটায়। এই পদ্ধতিতে প্রতি 6-টি কার্বনযুক্ত শর্করা থেকে প্রায় 30টি ATP

উৎপন্ন হয়। এই ATP থেকে বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার (reverse reation) সাহায্যে ক্রিয়েটিন ফসফেটের পুনঃসংশ্লেষণ সংঘটিত হয়।

TCA-চক্র একটি জটিল পদ্ধতি। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, এনজাইম এবং ইলেকট্রন বাহক এই পদ্ধতির সংগে জড়িত। পাইরুভিক অ্যাসিডের অণু থেকে কার্বনডাইঅক্সাইডের একটি অণু নির্গত হলে পদার্থটি সক্রিয় অ্যাসিটেটে (active acetate) রূপান্তরিত হয় এবং ক্রেবসের চক্রে প্রবেশ করে। পরবর্তী পর্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা বিপাকক্রিয়া অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। 16-16 নং চিত্রে এর সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে।
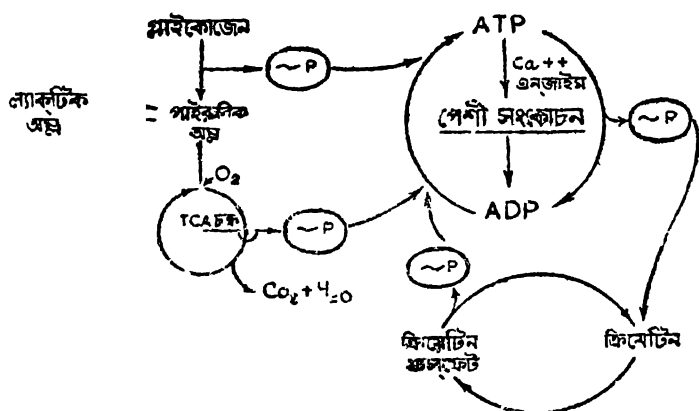
16-17 নং চিত্র : পেশীসংকোচনের সময় রাসায়নিক পরিবর্তনের তিনটি পর্যায়।

পেশীসংকোচনের সময় রাসায়নিক পরিবর্তনের যে তিনটি পর্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে, 16-17 নং চিত্রে তারই সংক্ষিপ্ত স্বরূপ দেখানো হয়েছে।

এভাবে উৎপন্ন ATP বিশ্লিষ্ট হয়ে ফসফেট আয়ন মুক্ত করে যা সাময়িক-ভাবে মায়োসিনের ক্রসব্রিজের সংগে অ্যাকটিনের ক্রিয়াস্থানের সংযোগ ঘটায়। মায়োসিনের ক্রসব্রিজ এভাবে পর্যায়ক্রমে অ্যাকটিনের ক্রিয়াস্থানে যুক্ত হয়ে তাকে A-ব্যান্ডের কেন্দ্রের দিকে টেনে নেয়। এভাবে পেশীসংকোচন ঘটে। Ca^{++} আয়ন পেশীনালিকার সিসটারনাতে পুনরায় ফিরে গেলে দুটো ফিলামেন্টের মধ্যবর্তী ক্রসব্রিজের সংযুক্তি অদৃশ্য হয় এবং পেশী স্থিতাবস্থায় ফিরে আসে।

সংকোচনকালে অস্থিপেশীর তাপীয় পরিবর্তন
Thermal changes in skeletal muscle during contraction

পেশীসংকোচনের সময় ATP থেকে মুক্ত শক্তির একাংশ তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই তাপশক্তি পেশীর উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। উষ্ণতা বৃদ্ধি

যৎসামান্য হলে থার্মোপাইল (thermopile) যন্ত্রের সাহায্যে তার সঠিক পরিমাপ সম্ভবপর। একক পেশীসংকোচনে (single muscle twitch) যে তাপের উদ্ভব হয়, তার পরিমাণ প্রতি গ্রাম পেশীতে প্রায় 0'003 ক্যালোরি। এ. ভি. হিল (A. V. Hill) এই তাপ-উৎপাদনকে 3 ভাগে ভাগ করেছেন। যথা: (a) **সক্রিয়কারী তাপ** (heat of activation), (b) **হ্রস্বীভবন তাপ** (heat of shortening) এবং (c) **প্রসারণ তাপ** (heat of relaxation)। সক্রিয়কারী তাপ প্রতিটি সংকোচন শুরু হবার পরমুহূর্তেই উৎপন্ন হয়। এর পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে এবং সংকোচন চলাকালে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। সক্রিয়কারী তাপের পরিমাণ সর্বাধিক হ্রস্বীভবন তাপের চেয়ে খানিকটা কম এবং ইহা শুধুমাত্র সমদৈর্ঘ্য পেশীসংকোচনে দেখতে পাওয়া যায়।

হ্রস্বীভবন তাপ পেশীর সংকোচন চলাকালে উৎপন্ন হয়। এর পরিমাণ পেশীসংকোচনের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। পেশীর সংকোচনে পেশীর দৈর্ঘ্যহ্রাস অধিক হলে এর পরিমাণ বেশী হয় এবং কম হলে এর পরিমাণও কম হয়। অর্থাৎ হ্রস্বীভবন-তাপ পেশীসংকোচনের দৈর্ঘ্য হ্রাসের মানের সংগে সমানুপাতিক।

প্রসারণ-তাপ পেশীর অবস্থার উপর নির্ভর করে। সংকোচনের প্রাক্কালে পেশী যদি বোঝা দ্বারা প্রসারিত হয় (extended), তবে প্রসারণ-তাপের উদ্ভব হয়। ভারবাহী পেশীতে (loaded muscle) যে যান্ত্রিকশক্তি স্থিতিশক্তি (potential energy) হিসাবে সঞ্চিত থাকে, প্রসারণ-তাপ তারই সমান হয়। পেশী বোঝা দ্বারা প্রসারিত না হলে প্রসারণ-তাপ শূন্য হয়।

সংকোচনের সময় পেশী যদি W-কার্য সম্পন্ন করে, তবে মোট যে তাপ-শক্তির (E) উদ্ভব হয়, তার পরিমাণ সক্রিয়কারী তাপ (A), হ্রস্বীভবন তাপ (ax) এবং যান্ত্রিক কার্য W-এর যোগফলের সমান হয়। অর্থাৎ,

$$E = A + ax + W,$$

এখানে x, সংকোচনের মাধ্যমে পেশীর দৈর্ঘ্যহ্রাস কতটুকু হয়েছে তার নির্ধারক এবং a একটি ধ্রুবক। W যদি Px (বোঝা × দূরত্ব) হয়, তবে উপরের সমীকরণটিকে নিম্নলিখিতভাবে লেখা চলে,

$$E = A + ax + Px = A + x(a + P)$$

পেশীর কর্মক্ষমতা (efficiency) নির্ধারণ করতে এই সমীকরণকে ব্যবহার করা হয়। যথা,

$$\text{কর্মক্ষমতা} = \frac{W}{E} = \frac{Px}{A+x(a+p)}$$

তাপ উৎপাদনের এই নূতন জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে হিল পরীক্ষাগতভাবে পেশীর যে কর্মক্ষমতা নির্ণয় করেছেন তার পরিমাণ প্রায় 40%।

সংকোচনকালে অস্থিপেশীতে বৈদ্যুতিক পরিবর্তন

Electrical changes observed in the muscle during contraction

কোন পেশীর কর্তিত অংশের সংগে অক্ষত অংশের উপরিতলকে তড়িৎ-দ্বার দ্বারা সংযুক্ত করলে গ্যালভানোমিটারের (galvanometer) কাঁটা বিক্ষিপ্ত হয়। দেখা গেছে কর্তিত অংশ বা উদ্দীপ্ত অংশ অপর অংশের সংগে তুলনামূলকভাবে ঋণাত্মক হয়। পেশীর এই বৈদ্যুতিক পরিবর্তন যখন সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, তখনই পেশীর যান্ত্রিক পরিবর্তন শুরু হয়। লীনকালের (latent period) গোড়ার দিকে এই পরিবর্তন সর্বাধিক হয়। **ক্রিয়াবিভব** (action potential) এবং যান্ত্রিক সংকোচনতরংগ (wave of mechanical contraction) একই হারে প্রবাহিত হয় (প্রতি সেকেণ্ডে 3-4 মিটার)। পেশীর বৈদ্যুতিক পরিবর্তন ও স্নায়ুর বৈদ্যুতিক পরিবর্তনের প্রকৃতি একই রকম। অতএব পেশীর সক্রিয় অবস্থায় স্নায়ুর মতই ক্রিয়াবিভবের উদ্ভব ঘটে, যা পেশীতন্তুর স্যারকোলেমায় ও পরিশেষে স্যারকোটিউবুলে বিস্তারলাভ করে।

অস্থিপেশীর ধর্ম

Properties of skeletal muscle

অস্থিপেশীর ধর্মকে মোটামুটি 5 ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা: **(1)** উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া এবং সংকুচিত হওয়া (excitability and contractility), (2) পরিবাহিতা (conductivity), (3) নিঃসাড়কাল (refractory period), (4) পেশীটান (tonicity) এবং (5) প্রসারণক্ষমতা (extensibility) ও স্থিতিস্থাপকতা (elasticity)।

1. উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া ও সংকুচিত হওয়া: সঠিক উদ্দীপনা পেলে ঐচ্ছিক পেশী উত্তেজিত হয় এবং সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়। উদ্দীপনার প্রকৃতি রাসায়নিক, যান্ত্রিক, তাপীয় বা বৈদ্যুতিক হতে পারে। উদ্দীপনায় সাড়া

দেওয়ার ক্ষমতা বিভিন্ন কলাকোষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। এজন্য দুটো কারণ দায়ী : (i) উদ্দীপনার ন্যূনতম শক্তি (minimum strength of stimulus) এবং (ii) উদ্দীপনার স্থিতিকাল (duration of stimulus)। এই দুটো বিষয়ের মধ্যে একটা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক (inverse relation) রয়েছে। অর্থাৎ উদ্দীপনার শক্তি অধিক হলে তার স্থিতিকাল কম হবে এবং উদ্দীপনার শক্তি কম হলে তার স্থিতিকাল অধিক হবে। অবশ্য এই পরিবর্তন একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

উদ্দীপনার স্থিতিকালকে **ক্রোনাক্সি** (chronaxie) এবং শক্তিকে **রিওবেস** (rheobase) নামে চিহ্নিত করা হয়। উদ্দীপনার প্রকৃতি বৈদ্যুতিক হলে ক্রোনাক্সি ও রিওবেসের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া যায় : **রিওবেস** হল এমন **ন্যূনতম গ্যালভানিক প্রবাহ** (minimal galvanic current), যাকে কোন কলার মধ্য দিয়ে **অনির্দিষ্টকাল** প্রবাহিত হতে দিলে কলাটি উত্তেজিত হয়। রিওবেসের **দ্বিগুণ প্রবাহকে** কোন কলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে দিলে **যে সময়ে** কলাটি উত্তেজিত হয় তাকে **ক্রোনাক্সি** বলা হয় (16-18 নং চিত্র)।
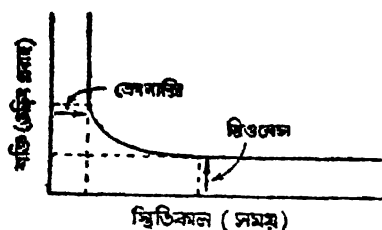
1৫-18 নং চিত্র : উদ্দীপনার শক্তি ও স্থিতিকালের সম্পর্ক।

ক্রোনাক্সি কোন কলার উদ্দীপনায় সাড়া দেবার প্রকৃত পরিমাপক হিসাবে কার্য করে। ক্রোনাক্সি কম হলে কোন কোন কলা উদ্দীপনায় অধিকতর দ্রুত সাড়া দেয় এবং বেশী হলে ধীরে সাড়া দেয়। ঐচ্ছিক পেশীর ক্রোনাক্সি অনৈচ্ছিক ও হৃৎপেশীর ক্রোনাক্সির চেয়ে কম। আবার লোহিতপেশীর চেয়ে শ্বেতপেশীর ক্রোনাক্সি কম হয়।

2. **পরিবাহিতা :** পেশীতে উদ্দীপনা দিলে, উদ্দীপনাস্থানে সংকোচন-তরংগের আবির্ভাব ঘটে এবং তা উভয়দিকে পেশীতন্তু বরাবর প্রবাহিত হয়। উষ্ণ শোণিত (warm blooded) প্রাণীর ঐচ্ছিক পেশীর পরিবাহিতা প্রতি সেকেণ্ডে 6-12 মিটার এবং ব্যাঙের পেশীতে 3 থেকে 4 মিটার।

3. **নিঃসাড়কাল :** প্রথম উদ্দীপনা প্রয়োগের পরবর্তী যে ক্ষণিক সময়ে দ্বিতীয় উদ্দীপনা পেশীতে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় না, তাকে নিঃসাড়কাল

বলা হয়। ঐচ্ছিক পেশীর নিঃসাড়কাল খুবই কম। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে এই সময় 2 মিলিসেকেন্ড এবং ব্যাঙের ক্ষেত্রে 5 মিলিসেকেন্ড। অর্থাৎ প্রথম উদ্দীপনা প্রয়োগের পর এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে পেশীতে কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

4. **পেশীটান :** দেহস্থিত (intact) পেশীতে সবসময়েই একটা টানটান ভাব দেখা যায়, যা ব্যবচ্ছেদ করা পেশীতে অনুপস্থিত। ঐচ্ছিক পেশীর এই টানটান ভাবকে পেশীটান বলা হয়। একে প্রতিবর্তপুষ্ট অংশত পেশীসংকোচন নামে অভিহিত করা হয়। পেশীর চেষ্টীয় স্নায়ুকে (motor nerve) ব্যবচ্ছেদ করলে ইহা বিনষ্ট হয়। পেশীটান হল একটি প্রতিবর্ত পদ্ধতি (reflex process), যার কেন্দ্র মেরুদণ্ডে অবস্থিত।

প্রসারণক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা : পেশীকে টানলে তা প্রসারিত হয় এবং মুক্ত করলে স্থিতাবস্থায় ফিরে আসে। পেশীকোষের মধ্যবর্তী অংশে স্থিতি-স্থাপক তন্তুর উপস্থিতিই পেশীর স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্য দায়ী। তবে পেশীর স্থিতিস্থাপক ধর্ম রবারজাতীয় (rubber) স্থিতিস্থাপক পদার্থের ধর্মের সমতুল্য নয়। পেশীর স্থিতিস্থাপকতা অনেক কম এবং টানার পর ইহা খানিকটা মন্থরগতিতে স্থিতাবস্থায় ফিরে আসে।

পেশীকম্পন
Contracture

কোন কোন অবস্থায় পেশীর একাংশে কিছুক্ষণ ধরে যে ঘন ঘন কম্পন লক্ষ্য করা যায় তাকে পেশীকম্পন বলা হয়। ক্লান্তি বা অসাড়তা, অনেকক্ষণ ধরে তীব্র ও বহুমুখী উদ্দীপনার সম্মুখীন হওয়া, বিভিন্ন রোগ ইত্যাদি অবস্থায় পেশীর কম্পন দেখতে পাওয়া যায়। অবিরাম পেশীসংকোচন (tetanus) এবং অন্যান্য পেশীসংকোচন থেকে এর পার্থক্য হল : প্রথমত, ইহা পেশীর একাংশে সংঘটিত হয় এবং অন্য অংশ স্থিতাবস্থায় থাকে, দ্বিতীয়ত, ইহা সংঘটিত হবার সময় পেশীতে ক্রিয়াবিভবের (action potential) কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় না।

মরণসংকোচ
Rigor Mortis

মৃত্যুর পর পেশী দৃঢ় বা কঠিন হয়ে ওঠে। পেশীর এই দৃঢ়তা বা কাঠিন্য-দশা প্রাপ্তির নাম **মরণসংকোচ**। ব্যবচ্ছেদ করা পেশীতে মরণসংকোচ দশার

উদ্ভব হয়। মরণসংকোচ অবস্থায় পেশীর মধ্যে যেসব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে প্রধান : পেশীর (a) দৈর্ঘ্য হ্রাস, (b) স্থূলতাবৃদ্ধি, (c) অস্বচ্ছ হয়ে ওঠা এবং অধিকতর সান্দ্র হওয়া, (d) অ্যাসিড বৃদ্ধি (pH-5·8), (e) গ্লাইকোজেন অদৃশ্য হওয়া এবং (f) উদ্দীপনধর্মের বিলোপ ঘটা ইত্যাদি। মরণসংকোচ সব রকম পেশীতে একই সময়ে আবির্ভূত হয় না। প্রথমে ইহা নীচের চোয়াল, এরপর পর্যায়ক্রমে মুখমণ্ডল, ঘাড়, বক্ষ, উদর ইত্যাদিতে আবির্ভূত হয়। মৃত্যুর দ্বিতীয় ঘণ্টা থেকে মরণসংকোচ শুরু হয় এবং 3 ঘণ্টার পর তা সম্পূর্ণ হয়।

মরণসংকোচকে পেশীর **অপরিবর্তনযোগ্য স্থায়ীসংকোচ** বলা হয়। ATP-এর অভাবে অ্যাক্টিন ও মায়োসিন ফিলামেণ্টে যে চিরস্থায়ী সংযোগ স্থাপিত হয়, তারই ফলে মরণসংকোচদশার উদ্ভব হয়। এই অবস্থায় পেশী-প্রোটিন অপ্রাকৃত (denatured) হয়ে পড়ে। পেশীস্থিত এনজাইমের পরিপাকের ফলে মৃত্যুর 12-36 ঘণ্টার মধ্যে মরণসংকোচ তিরোহিত হয়। এর নাম **অটোলাইসিস** (autolysis)। এই এনজাইমগুলো অ্যাসিড মাধ্যমে অধিক সক্রিয় হয়।

পেশীর ভৌত আচরণের অনুশীলন
Study of Physical Behaviour of Muscle

পরীক্ষাগারে কুনো ব্যাঙের **গ্যাস্ট্রোক্নেমিয়াস** পেশীকে (gastrocnemius muscle) অন্তর্বিত করে পেশীর ভৌত আচরণের অনুশীলন করা হয়। কুনো ব্যাঙকে প্রথমে মজ্জাঘাত (pith)[1] করে তার মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুকেন্দ্রকে বিনষ্ট করা হয় (একক মজ্জাঘাত)[2]। করোটি ও প্রথম কশেরুকার (first vertebra) সন্ধিস্থলে **ফোরামেন ম্যাগ্নাম**-এর (foramen magnum) অবস্থানে তীক্ষ্নাগ্র কাঁটা (needle) প্রবেশ করিয়ে কাঁটাকে মেরুমজ্জার ভেতর দিয়ে নীচের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় (16-19নং চিত্র)। এরপর মজ্জাঘাতী (pithed) কুনো ব্যাঙকে ব্যবচ্ছেদ করে সায়াটিক-গ্যাসট্রোকনেমিয়াস (sciatic gastrocnemius) স্নায়ুপেশীকে প্রস্তুত করা হয়। পেশীর জানুসন্ধিকে

1 প্রাচীন ইংরাজী : pitha—মজ্জা।

2. মজ্জাঘাতের মাধ্যমে শুধুমাত্র মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুকেন্দ্র অথবা মস্তিষ্কস্নায়ুকেন্দ্রের বিনাশসাধনকে একক মজ্জাঘাত (single pithing) এবং একত্রে উভয়ের বিনাশসাধনকে দ্বৈত মজ্জাঘাত (double pithing) বলা হয়।

মায়োগ্রাফে (myograph) মোমের সংগে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে অ্যাকিলিস পেশীকণ্ডরাকে (tendo-achilles) লিভারের সংগে এ'টে দেওয়া হয়।

16-19 নং চিত্র : কুনো ব্যাঙের ফোরামেন ম্যাগনামস্থানে যেভাবে মজ্জাঘাত করা হয় তার প্রদর্শন।

এরপর সায়াটিক স্নায়ু অথবা সরাসরি পেশীতে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা (electrical stimulus)* প্রয়োগ করে পেশীর যে সংকোচন পাওয়া যায়, তাকে
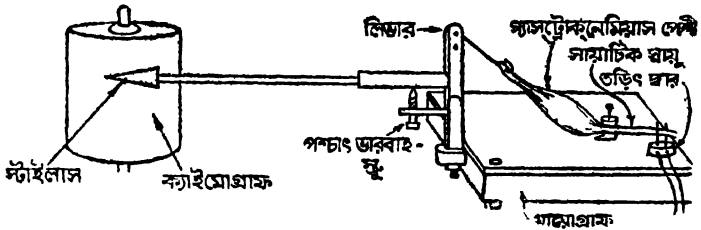
16-20 নং চিত্র : সমটান পেশীলিভারের ব্যবস্থাপনা।

লিভারের (lever) সাহায্যে গতিশীল ধূমায়িত ড্রামে রেকর্ড করা হয়। দুধরনের লিভারকে এ ব্যাপারে ব্যবহার করা যায় : (1) **সমটান লিভার** (isotonic lever) এবং (2) **সমদৈর্ঘ্য লিভার** (isometric lever)। সমটাম লিভারের ব্যবস্থাপনা 16-20 নং চিত্রে দেখান হয়েছে। এই লিভারকে ব্যবহার করে ঐচ্ছিক পেশীর সংকোচনের সময় যেসব লেখচিত্র পাওয়া যায় তাদের সম্ভাব্য আলোচনা নিম্নে দেওয়া হল।

1. **সরল পেশীরেখ** (Simple Muscle Curve) : উপরিউক্ত ব্যবস্থাপনায় স্নায়ুপেশীর স্নায়ু অথবা পেশীতে একক আবিষ্ট উদ্দীপনা

* ডু বোয়েজ রেমোণ্ড আবেশ কুণ্ডলীর ('Du-Bois Reymond' induction coil) দ্বারা স্নায়ু বা পেশীতে আবিষ্ট প্রবাহ (induced current) পাঠান হয়।

প্রয়োগ করলে পেশীর একক সংকোচন পাওয়া যায়। পেশীর এই একক সংকোচনকে গতিশীল কাইমোগ্রাফে (kymograph) রেকর্ড করলে যে লেখচিত্র পাওয়া যায়, তাকে **সরল পেশীরেখ** বলা হয় (16-21 নং চিত্র)। এই লেখচিত্রের নীচে টিউনিং ফর্কের (tuning fork) সাহায্যে সময়রেখা (time-
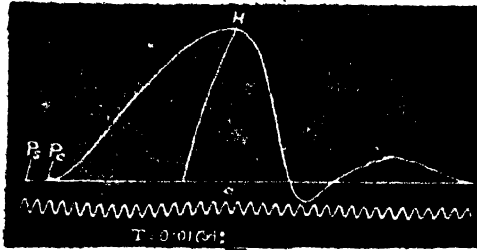
16-21 নং চিত্র : সরল পেশীরেখ। Ps-উদ্দীপনার প্রয়োগবিন্দু, Pc-সংকোচনের প্রারম্ভবিন্দু, H-সর্বাধিক সংকোচন।

tracing) টানা হয়। সময়-রেখের প্রতিটি বিভাগ বা তরংগ 0·01 সেকেন্ডের সমান। এই রেখচিত্রের সাহায্যে স্থিতিকালের পরিমাপ করে দেখা গেছে, কুনো
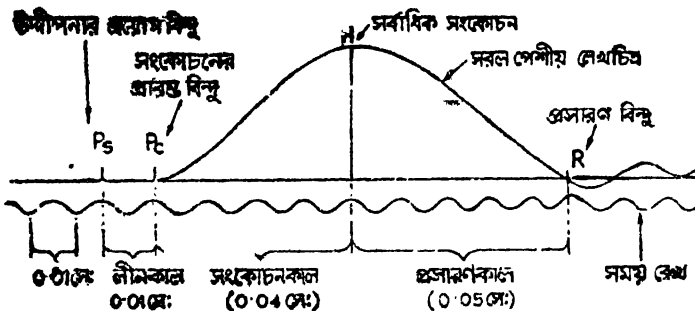
16-22 নং চিত্র : একটি সরল পেশীরেখার তিনটি স্থিতি কালের সম্পর্ক।

ব্যাঙের সরল পেশীরেখের মোট স্থিতি 0·1 সেকেন্ড। এই স্থিতিকালকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : (i) লীনকাল (latent period), (ii) সংকোচনকাল (contraction period) এবং (iii) প্রসারণকাল (relaxation period)।

(i) **লীনকাল** : উদ্দীপনার প্রয়োগবিন্দু থেকে সংকোচনের প্রারম্ভবিন্দু পর্যন্ত অন্তবর্তী সময়কে লীনকাল বলা হয়। সংকোচন শুরু হবার প্রাক্কালে এই সময়ের প্রয়োজন হয় দুটো কারণে : (a) উদ্দীপনা-স্থান থেকে স্নায়ুপেশী-

সংযোগের মধ্য দিয়ে স্যারকোলেমা ও স্যারকোটিউবুলে স্নায়ুপ্রবাহের পরিবহন এবং (b) পেশীসংকোচনের সংগে জড়িত রাসায়নিক পরিবর্তনের সংঘটন। গ্যাসট্রোক্‌নেমিয়াসে এই সময়ের পরিমাণ 0·01 সেকেণ্ড।

(ii) **সংকোচনকাল :** সংকোচন শুরু হওয়া থেকে সর্বাধিক সংকোচন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়কে সংকোচনকাল বলা হয়। এই সময়ের পরিমাণ 0·04 সেকেণ্ড।

(iii) **প্রসারণকাল :** সর্বাধিক সংকোচন থেকে স্থিতাবস্থায় ফিরে আসতে পেশীর যে সময় লাগে তাকে প্রসারণকাল বলা হয়। এই সময়ের পরিমাণ 0·05 সেকেণ্ড।

2. **উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধিতে সরল পেশীরেখের পরিবর্তন :** পেশীর উষ্ণতাবৃদ্ধিতে সরল পেশীরেখের মোট স্থিতিকাল হ্রাস পায় (লীনকাল, সংকোচনকাল এবং প্রসারণকাল তিনটিই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়), তবে সংকোচন-উচ্চতার (height of contraction) বৃদ্ধি ঘটে (16-23নং চিত্র)। 34°-45° ডিগ্রি সেল্‌সিয়াসে উদ্দীপনা ছাড়াই পেশী সংকুচিত হতে পারে। এর ঊর্ধ্বে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে পেশীতে **তাপীয় সংকোচ** (heat rigor) লক্ষ্য করা যায়।
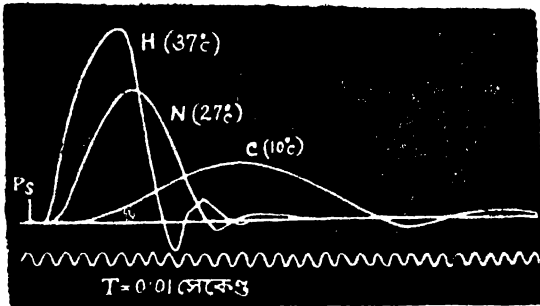
16-23 নং চিত্র : সরল পেশীরেখের উপর উষ্ণতার প্রভাব।
N, স্বাভাবিক লেখচিত্র, H, উষ্ণতা বৃদ্ধি, C উষ্ণতা হ্রাস।

কারণ : উষ্ণতাবৃদ্ধিতে (i) পেশীর সংকোচনের সংগে জড়িত রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ ত্বরান্বিত হয় (এন্‌জাইমের সক্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য) এবং (2) পেশী-কলার সান্দ্রতা হ্রাস পায়। স্থিতিজাড্যের (inertia) জন্য সংকোচন উষ্ণতার বৃদ্ধি ঘটে। 34°-45°C উষ্ণতায় স্বতঃস্ফূর্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া-সংঘটনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর ঊর্ধ্বে তাপমাত্রায় পেশীস্থিত প্রোটিন তঞ্চিত হয়।

পেশীর উষ্ণতার হ্রাস ঘটালে উষ্ণতাবৃদ্ধির বিপরীত পরিবর্তনসমূহ পেশীতে লক্ষ্য করা যায় এবং লেখচিত্র অনেকটা চেপ্টা আকার ধারণ করে। উষ্ণতা 5° ডিগ্রি সেল্‌সিয়াসে নামিয়ে আনলে পেশীর সংকোচনে সাড়া দেবার ক্ষমতা (threshold of excitability) হ্রাস পায়। 5° ডিগ্রির নীচে উষ্ণতার অবনতিতে পেশীর সংকোচন-ক্ষমতা অবলুপ্ত হয়।

কারণ : পেশীর উষ্ণতা হ্রাস পেলে (1) পেশীসংকোচনের সংগে জড়িত রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ মন্দীভূত হয় (এন্‌জাইমের সক্রিয়তা হ্রাসের জন্য) এবং (2) সান্দ্রতার বৃদ্ধি ঘটে। উষ্ণতার অধিক অবনতি ঘটালে কোষঝিল্লির ভেদ্যতার (permeability) পরিবর্তন ঘটে।

উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধিতে পেশী মোট যে কার্য সম্পাদন করে তার কোনরূপ পরিবর্তন হয় না।

3. বোঝার পরিবর্তনে সরল পেশীরেখের পরিবর্তন : পেশীতে ক্রমান্বয়ে বোঝার ওজন বৃদ্ধি করলে সরল পেশীরেখের যে পরিবর্তন হয় তা নিম্নরূপ : (i) **লীনকাল :** লীনকাল সাধারণতঃ হ্রাস পায়, তবে লেখচিত্রের নিজের সংকোচন-উচ্চতার-সংগে তুলনামূলকভাবে অপরিবর্তিত থাকে।
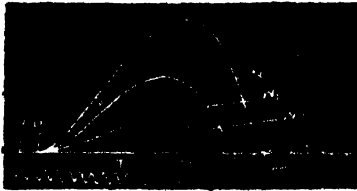
16-24 নং চিত্র : পেশীসংকোচনে বোঝার প্রভাব। N-বহিঃস্থ বোঝামুক্ত লেখচিত্র, W_1-বোঝা (2 গ্রাম), W_2-বোঝা (4 গ্রাম)।
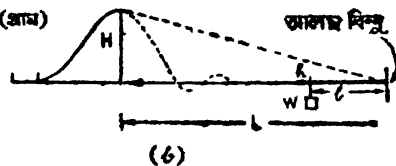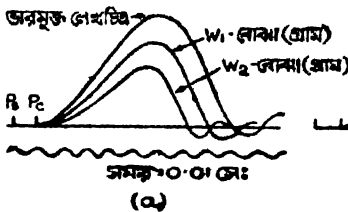
16-25 নং চিত্র।

(ii) সংকোচন-উচ্চতা : প্রথমে বৃদ্ধি পেতে পারে, সাধারণত বোঝা-বৃদ্ধির সংগে আনুপাতিকভাবে হ্রাস পায়। প্রসারণকাল হ্রাস পায় (16-24 এবং 16-25 নং চিত্র)।

পেশীকৃত কার্যের পরিমাণ (Works done by the muscle) ঃ পেশীতে পর পর বোঝার ওজন বৃদ্ধি করলে পশ্চাৎ-ভারবাহী (after-loaded) বা মুক্ত-ভারবাহী (free-loaded) পেশী সংকুচিত হয়ে যে কার্য সম্পাদন করে তা নিম্নলিখিত উপায়ে হিসাব করা যায় (16-25 নং চিত্র)।

ধরা যাক,

L = আলম্ববিন্দু থেকে লেখনীর প্রান্তবিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব,
= 20 সেণ্টিমিটার

l = আলম্ববিন্দু থেকে বোঝার (W) দূরত্ব = 1·5 সেণ্টিমিটার

H = লেখচিত্রের সর্বাধিক সংকোচন উচ্চতা = 5 সেণ্টিমিটার

h = প্রকৃত দূরত্ব (যে দূরত্বে পেশী বোঝাকে উত্তোলিত করে)

$= \frac{l}{L} \times H$ (যেহেতু, $\frac{H}{h} = \frac{L}{l}$ = লিভারের বিবর্ধন)

$= \frac{1 \cdot 5}{20} \times 5 = 0 \cdot 375$ সেণ্টিমিটার

W = উত্তোলিত বোঝার ওজন = 10 গ্রাম।

সুতরাং, কৃতকার্যের পরিমাণ = W × h

= বোঝার ওজন × প্রকৃত দূরত্ব = 10 × 0·375 = 3·75 গ্রাম সেণ্টিমিটার।

এভাবে পেশীতে বোঝার ওজন পরপর বাড়িয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে পেশীর কৃতকার্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

L এবং *l*-এর মান প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান হবে। সমগ্র পর্যবেক্ষণকে এরপর তালিকার আকারে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ

উত্তোলিত বোঝার ওজন (W)	সর্বাধিক সংকোচন উচ্চতা (H)	প্রকৃত দূরত্ব ($h = lH/L$)	কৃতকার্যের পরিমাণ ($= W \times h$)
10 গ্রাম	5 সেণ্টিমিটার	0·375 সে মি	3 75 গ্রাম-সেণ্টিমিটার
15 গ্রাম	3 সেণ্টিমিটার	0·225 সে. মি	3 375 গ্রাম-সেণ্টিমিটার

4. দুটো পর্যায়ক্রমিক উদ্দীপনার সংকলন লেখচিত্র (Summation curve produced by two successive stimuli) **:** প্রথম উদ্দীপনার লীনকালে দ্বিতীয় আর একটি উদ্দীপনা যদি পেশীতে প্রয়োগ করা হয় এবং উভয় উদ্দীপনাই অধঃবৃহত্তম (submaximal) হয়, তবে দ্বিতীয় উদ্দীপনাটি প্রথমটিতে সংযুক্ত হয়। সেক্ষেত্রে উৎপন্ন লেখচিত্রের সংকোচন-উচ্চতা একক উদ্দীপনাপ্রসূত লেখচিত্রের সংকোচন-উচ্চতা থেকে অনেক বেশী উচ্চ হয়। এই প্রক্রিয়াকে দুটো পর্যায়ক্রমিক উদ্দীপনার সংকলন (summation) বলা হয় (16-26 নং চিত্র)।
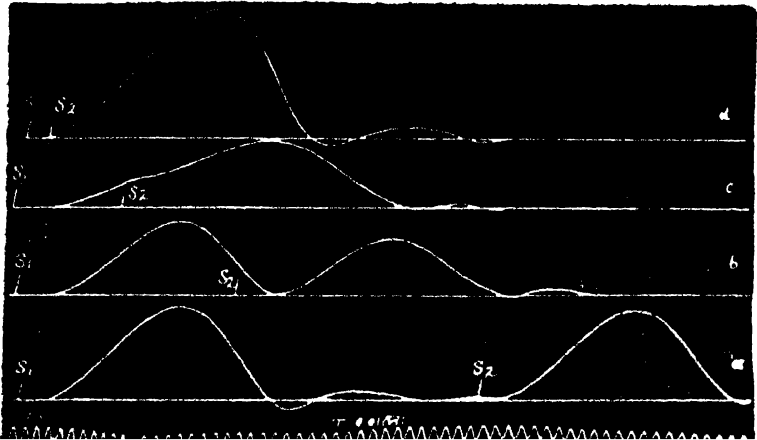
16-26 নং চিত্র : পেশীসংকোচনের উপর দুটো পর্যায়ক্রমিক উদ্দীপনার প্রভাব। S_1-প্রথম উদ্দীপনা। S_2-দ্বিতীয় উদ্দীপনা, (a) যথেষ্ট সময় দূরত্বে দুটো উদ্দীপনা প্রযোগ করা হয়েছে,
(b) প্রথম রেখচিত্রের প্রসারণকালে দ্বিতীয় উদ্দীপনা প্রয়োগ করা হয়েছে,
(c) প্রথম রেখচিত্রের সংকোচনকালে দ্বিতীয় উদ্দীপনা প্রয়োগ করা হয়েছে,
(d) প্রথম রেখচিত্রের লীনকালে দ্বিতীয় উদ্দীপনা প্রয়োগ করা হয়েছে।

কারণ : দুটো উদ্দীপনার সংকলনের ফলে একক উদ্দীপনার চেয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক পেশীতন্তু পেশীসংকোচনে অংশগ্রহণ করে।

(e) ক্লোনাস ও টিটেনাস লেখচিত্র (Clonus and tetanus curve) **:** স্নায়ু বা পেশীতে যদি পরপর উদ্দীপনা প্রয়োগ করা হয় এবং প্রতিটি উদ্দীপনা যদি পূর্ব উদ্দীপনার প্রসারণকালের মধ্যে পড়ে তবে পেশীসংকোচনের যে লেখ-

চিত্র পাওয়া যায় তার ঊর্ধ্বাংশ তরংগায়িত হয়। এই পর্যায়ক্রমিক তরংগসৃষ্টির প্রকৃতি নির্ভর করে প্রযুক্ত উদ্দীপনার কম্পনাংকের (frequency) উপর। পেশীর এজাতীয় সংকোচনকে **ক্লোনাস** (clonus) বা অসম্পূর্ণ টিটেনাস (incomplete tetanus) বলা হয় (16-27 নং চিত্র)।

উদ্দীপনার কম্পনাংক যদি আরো বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রতিটি উদ্দীপনা পূর্ব উদ্দীপনার সংকোচনকালের মধ্যে পড়ে, তবে পেশীসংকোচনের লেখচিত্রটি একটি স্থির রেখায় রূপান্তরিত হয় এবং হঠাৎ উপরের দিকে উঠে গিয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সর্বাধিক পেশী সংকোচন সংঘটিত হয়। এজাতীয় উদ্দীপনা প্রয়োগ পেশীতে সর্বাধিক টান (বৃহত্তম একক উদ্দীপনাপ্রসূত টানের তিন থেকে চারগুণ) উৎপন্ন হয় এবং যতক্ষণ উদ্দীপনা প্রয়োগ করা হয় ততক্ষণ এই টান বজায় থাকে। পেশীর এজাতীয় সংকোচনকে **টিটেনাস** (tetanus) বলা হয় (16-27 নং চিত্র)।
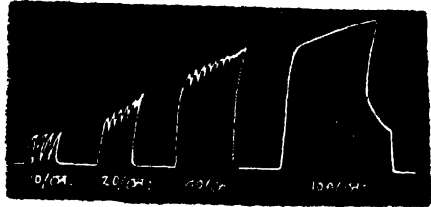
16-27 নং চিত্র : ক্লোনাস ও টিটেনাস লেখচিত্র।

5. **পেশীর অসাড়তা** (Muscular fatigue) : পেশীকে অবিরাম কাজ করতে দিলে অথবা তার উপর পুনঃপুনঃ উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে, পেশীর উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় এবং একসময় তা লোপ পায়। পেশীর এই অবস্থার নাম **অসাড়তা**। অবিরাম পর্যায়ক্রমিক সংকোচনের ফলে পেশীতে অধিক পরিমাণে ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য বিপাকীয় পদার্থ জমা হতে থাকে। অক্সিজেনের অভাবে এসব পদার্থ পেশী থেকে অপসারিত হতে পারে না। ফলে পেশীকে এরা অসাড় করে তোলে।

পেশীর অসাড়তার উৎসস্থান (seat of fatigue) বিভিন্ন হয়। সরাসরি পেশীতে উদ্দীপনা দিলে তা পেশীতে, চেষ্টীয় স্নায়ুমারফৎ উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে তা স্নায়ুপেশীর সংযোগস্থলে (neuromuscular junction) এবং স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় পেশীসঞ্চালনে (exercise) স্নায়ুসন্নিধিতে (synapse) পরিলক্ষিত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, অসাড়তা তুলনামূলকভাবে প্রথমে শুরু

হয় স্নায়ুসন্নিধিতে, এরপর স্নায়ুপেশীর সংযোগস্থলে এবং পরিশেষে পেশীতে।

ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি
Electromyography

দেহের পেশীতে সৃষ্ট তড়িৎ-বিভবকে লিপিবন্ধ করার পদ্ধতির নাম **ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি।** ইলেকট্রোমায়োগ্রাফির দ্বারা লিপিবন্ধ তড়িৎবিভবের রেখচিত্রকে **ইলেকট্রোমায়োগ্রাম** (EMG) বলা হয়।

পেশীসংকোচনের সময়ে মানুষের অস্থিপেশীতে ক্রিয়াবিভবের (action potential) **সৃষ্টি হয়, তার একাংশ দেহের** উপরিতলে বিস্তার লাভ করে, কারণ মানুষের দেহ **আয়তন পরিবাহী** (volume conductor) হিসাবে কাজ করে। দেহের কোষবহিঃস্থ তরলই আসলে আয়তন পরিবাহী হিসাবে কাজ করে, যার মধ্য দিয়ে সক্রিয় কোষে উৎপন্ন ক্রিয়াবিভব সমগ্র দেহে বিস্তার লাভ করে। তাই সংকোচনরত পেশীর উপরিস্থিত দেহচর্মে যথাযথ তড়িৎ-দ্বার স্থাপন করে বা সিরিঞ্জের সূচে তৈরী একটি এককেন্দ্রিক তড়িৎ-দ্বারকে সক্রিয়পেশীতে সরাসরি প্রবেশ করিয়ে, উৎপন্ন ক্রিয়াবিভবকে লিপিবন্ধ করা যায়। দেখা গেছে, পেশী যখন স্থিতাবস্থায় থাকে, তখন ইলেকট্রোমায়োগ্রামে কোন প্রবাহ (impulse) লিপিবন্ধ হয় না। কিন্তু পেশী যখন সজোরে সংকুচিত হয়
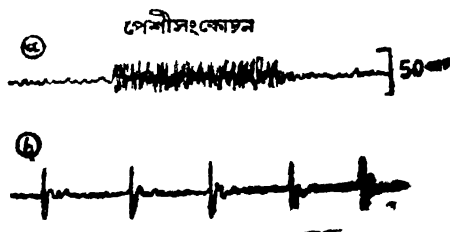
16-28 নং চিত্র : a—পেশী সংকোচনের সময় চার্ম তড়িৎ-দ্বার থেকে লিপিবন্ধ EMG, b-এককেন্দ্রিক তড়িৎ-দ্বারের সাহায্যে লিপিবন্ধ EMG।

তখন সক্রিয় পেশীর উপরিস্থিত চার্ম তড়িৎ-দ্বার থেকে 50 মিলিভোল্ট বিভবসম্পন্ন তড়িৎপ্রবাহ লিপিবন্ধ করা যায়। এই বিভবের প্রকৃতি এক্ষেত্রে অনেকটা উদ্ভট এবং তুলনামূলকভাবে অর্থহীন, কারণ ইহা বহু বিভিন্নপ্রকার পেশীতন্তুর অনিয়ন্ত্রিত তথা সংকলিত (summated) বিভববিশেষ। অপর-পক্ষে এককেন্দ্রিক তড়িৎ-দ্বারের সাহায্যে যেহেতু পেশীর খুব সামান্য অংশের

তড়িৎবিভবকে লিপিবন্ধ করা যায়, সেহেতু এক্ষেত্রে রেখচিত্র অধিকতর ছন্দময় হয় (16-28b নং চিত্র)। আসলে একটি চেষ্টীয় একক (motor unit) বা গুটিকয় চেষ্টীয় একক থেকে এজাতীয় বিভব লিপিবন্ধ হয়ে থাকে।

EMG থেকে একাধারে যেমন পেশীক্রিয়ার নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তেমনি এর সাহায্যে স্নায়ুপেশীগত রোগসম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়।

1. **EMG ও পেশীসংকোচন :** সমটান ও সমদৈর্ঘ্য পেশীসংকোচনের সংগে EMG এর সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেছে। (i) ঐচ্ছিক সমদৈর্ঘ্য পেশী-সংকোচনে EMG তে যে ক্রিয়াবিভব লিপিবন্ধ হয় তা পেশীতে প্রযুক্ত পেশীটানের সংগে সমানুপাতিক। (ii) পেশীসংকোচনের সময় একটি নির্দিষ্ট হারে পেশীর দৈর্ঘ্যহ্রাস বা দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি ঘটলে, EMGতে লিপিবন্ধ তড়িৎ-বিভব পেশীটানের সমানুপাতিক হয়। (iii) একটি সুনির্দিষ্ট পেশীটানে পেশীর তড়িৎ-সক্রিয়তা তার দৈর্ঘ্যহ্রাসের গতিবেগের সংগে সমানুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়, তবে পেশী-প্রসারণের গতিবেগের সংগে তার কোন সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না।

2. **শিক্ষণ ও অশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশী এবং EMG** (Trained and untrained muscles and EMG)। EMG-এর দ্বারা আর যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান : (i) কোন পেশী বা পেশীর কোন অংশ

16-29 নং চিত্র : করাতচালনায় অনাড়ী (A) ও সুশিক্ষিত (B) পেশী।
1—ট্রাইসেপ, 2—বাইসেপ।

সক্রিয় হয়েছে, (ii) কোন একটা কার্যসম্পাদনে কোন্ কোন্ পেশী পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করেছে এবং (iii) প্রতিটি বিচলনে প্রত্যেক পেশীর সংকোচনের

স্থায়িত্ব ও মান কতটুকু। এজাতীয় তথ্য পেশীচর্চায় একক পেশীর বৃদ্ধিকে সহজতর করে, তাছাড়া শিক্ষণ ও অশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশীর সক্রিয়তার মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাও নির্ধারণ করা যায়। যেমন, করাত চালনার মত চক্রাকার কায়িক বিচলনে শিক্ষণ ও অশিক্ষণপ্রাপ্ত বাইসেপ ও ট্রাইসেপ পেশীর তড়িৎ-সক্রিয়তা EMGতে লিপিবদ্ধ করে দেখা গেছে, অনুশীলনের পূর্বে এই পেশীদ্বয়ের সক্রিয়তা যেমন সমন্বয়ধর্মী নয়, তেমনি ইহা ঝাকিপূর্ণ হয় (16-29 নং চিত্র)। শিক্ষণ প্রাপ্তির পরে পেশীদ্বয়ের বিচলন অধিকতর সুসমঞ্জস্য ও সুচারু হয় এবং প্রতি চক্রাকার বিচলন বাঁধাধরা নিয়মে সম্পন্ন হয়। এছাড়া EMGতে স্বল্পকালীন বিরতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং পেশীদ্বয়ের উদ্দীপনকাল (period of excitation) সুস্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে যায়।

3. **পেশীঅবসাদ ও EMG :** পেশী অবসাদে EMGতে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পেশী অবসাদে EMG-র বিস্তৃতি বৃদ্ধি পায় কিন্তু ছন্দ (rhythm) মন্দীভূত হয়। প্রবাহমোক্ষণ (discharge) যুগপৎ-ধর্মী ও সমষ্টিধর্মী হয়। পেশী-স্পিনডেল থেকে প্রবাহমোক্ষণেব হ্রাসপ্রাপ্তি এর জন্য অংশত দায়ী। EMGতে অত্যধিক মন্দীভূত তরংগের উপস্থিতি পেশীর স্থানীয় অসাড়তা বা অবসাদের সংগে সম্পর্কযুক্ত। এই সময়ে ব্যক্তিবিশেষে যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির উদ্ভব ঘটে এবং ব্যক্তিটি পেশীটান বজায় রাখতে অসমর্থ হয।

4. **স্নায়ুপেশীগত রোগ ও EMG :** যে সব রোগে EMGতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে প্রধান : (1) **ফাইব্রিলেশন** (fibrillation) : পোলিওরোগ বা অন্য কোন রোগে পেশীর স্নায়ুসংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে, বিচ্ছিন্ন হবার প্রায় একসপ্তাহ পরে এবং পেশীর ক্ষয় হবার পূর্বপর্যন্ত পেশীতে প্রতি কয়েক সেকেন্ড অন্তর যে স্বয়ংক্রিয় প্রবাহমোক্ষণ ঘটে (কিন্তু পেশীসংকোচন হয় না), তাকে এককেন্দ্রিক তড়িৎ-দ্বারের দ্বারা EMGতে লিপিবদ্ধ করা যায়। EMG এক্ষেত্রে অনিয়মিত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ, 10-20μv বিভবসম্পন্ন এবং 1-2 মিলিসেকেন্ড স্থায়িত্বসম্পন্ন। (2) **ফ্যাসিকিউলেশন** (fasciculation) : স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজক প্রক্রিয়া থেকে এক বা একাধিক চেষ্টীয়-একক সংকুচিত হলে পেশীতে যে তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয়, তাকে চার্ম তড়িৎ-দ্বারের সাহায্যে EMG-তে লিপিবদ্ধ করা যায়। যেমন, পোলিওরোগের প্রারম্ভিক সংক্রমণে (infection) মেরুদণ্ডের সম্মুখ স্নায়ুশৃংগস্থ (anterior horn) কোষ থেকে

1-3 দিন ধরে যে স্বয়ংক্রিয় ও অবিরাম প্রবাহমোক্ষণ ঘটে, তা চেষ্টীয় একককে সক্রিয় করে, ফলে পেশীসংকোচন ঘটে। অতএব পঙ্গুত্বপ্রাপ্তির পূর্বেই পোলিও-রোগকে EMG এর দ্বারা সনাক্ত করা যায়। (3) **মায়োটনিয়া** (myotonia) ঃ পেশীর স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত না-হতে পারাকে মায়োটনিয়া বলা হয়। পেশীপ্রসারণের সংগে জড়িত প্রক্রিয়ার ত্রুটি থেকে এই বিকারদশার উদ্ভব ঘটে। EMGতে এই দীর্ঘায়িত প্রসারণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। (4) **মায়্যাসথেনিয়া গ্রেভিস** (myasthenia gravis) ঃ এই পেশীরোগের বৈশিষ্ট্য হল, পেশী-দৌর্বল্য এবং পেশীঅবসাদ। EMGতে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা হল, তরংগের বিস্তৃতির প্ররিবর্তন ঘটা এবং কোন কোন তরংগ সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হওয়া। স্নায়ুপেশীর সংযোগস্থলের ত্রুটি থেকে এই বিকারদশার উদ্ভব ঘটে।

হৃৎপেশী

Cardiac Muscle

1. **কলাস্থানিক গঠন** (Histology) ঃ হৃৎপেশী পেশীতন্তু বা পেশীকোষের সমন্বয়ে গঠিত। পেশীতন্তু অনিয়মিতভাবে পাশাপাশি সহাবস্থান করে এবং পেশীজাল (network) গঠন করে। মানুষে পেশীতন্তুব পেশীজাল সংযোগরক্ষাকারী কলার দ্বারা ব্যান্ডেল ও ফলকে (lamina) বিভক্ত হয়। কোন একটি বান্ডেলের অন্তর্বর্তী পেশীকোষ মোটামুটিভাবে সমান্তরাল। তবে ব্যান্ডেলসমূহ গভীরতর স্তরে বা অধিকতর উপরিতলীয় স্তরে বিভিন্ন অভিমুখে অবস্থান করে, ফলে হৃৎপেশীর যে কোন ছেদে (section) তাদের অনুদৈর্ঘ্য, অনুপ্রস্থ বা তির্যকভাবে বিন্যস্ত দেখা যায়।

পেশীতন্তু (Muscle fibers): বয়স্ক হৃৎপেশীতে পেশীকোষ এত নিবিড়ভাবে সহাবস্থান করে যে, সাধারণভাবে অণুবীক্ষণযন্ত্রে তাদের **সিনসিটিয়াম** (syncytium) বা প্রোটপ্লাজমীয় যোগসূত্র বলে ভ্রম হয় (16-30 নং চিত্র)। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা গেছে হৃৎপেশীর মধ্যে কোন গঠনগত সিনসিটিয়াম নেই, তবে ক্রিয়াগত সিনসিটিয়াম বজায় আছে। হৃৎপেশীর তার একটি বৈশিষ্ট্য হল

ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক
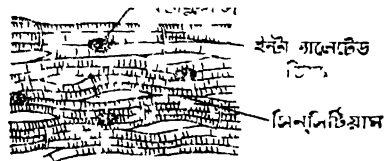
সিনসিটিয়াম

16-30 নং চিত্র ঃ হৃৎপেশীর কলাস্থানিক গঠন।

ইন্‌টারক্যালেটেড ডিস্ক (intercalated disc)। দৈর্ঘ্যে সম্প্রসারিত ও শাখাপ্রশাখাসমন্বিত পেশীকোষগুলো এই ইন্‌টারক্যালেটেড ডিস্কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

বয়স্ক হৃৎপিণ্ডে পেশীকোষের ব্যাস প্রায় 14μ. নবজাতকে 6-8μ অর্থাৎ পরিণত পেশীকোষের পেশীতন্তুর ব্যাসের প্রায় অর্ধাংশ। হৃৎপিণ্ডের আয়তন বৃদ্ধিতে (hypertrophy) পেশীতন্তুর ব্যাস 20μ বা তারও বেশী হতে পারে।

স্যার্‌কোলেমা ঃ অস্থিপেশীর মত হৃৎপেশীর পেশীতন্তুতে নিজস্ব স্যার-কোলেমা বা কোষঝিল্লি রয়েছে, কিন্তু ইহা এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তাকে পৃথক করা যায় না। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোষঝিল্লির যে গঠন দেখা যায়, তা প্রধানত স্যার্‌কোলেমা, স্যার্‌কোলেমার বহিঃস্থ প্রোটিন-পলিস্যা-কারাইডের বনিয়াদ স্তর (basal lamina) এবং তার সন্নিহিত জালক তন্তু (reticular fiber) নিয়ে গঠিত।

নিউক্লিয়াস ঃ নিউক্লিয়াস পেশীতন্তুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। প্রতি কোষে সাধারণত একটি করে নিউক্লিয়াস থাকে, কখনও কখনও অবশ্য দুটো নিউক্লিয়াসও দেখা যায়। নিউক্লিয়াসের আকৃতি ডিম্বাকার ও সুবৃহৎ হয়—কখনও কখনও পেশীতন্তুর ব্যাসের অর্ধেক।

মায়োফিলামেন্ট ঃ অস্থিপেশীর মত হৃৎপেশীতেও দুধরনের মায়োফিলা-মেন্ট দেখা যায়। একটি স্থূল (মায়োসিন) এবং অপরটি সূক্ষ্ম (অ্যাকটিন), তবে অস্থিপেশীর চেয়ে হৃৎপেশীতে মায়োফাইব্রিল অধিকতর অনিয়মিত থাকে এবং প্রায়ই তারা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে। একটি মায়োফাইব্রিলস্থিত মায়োফিলামেন্টের বাণ্ডেল প্রায়ই সন্নিহিত মায়োফাইব্রিলের সংগে মিশে যায়, ফলে অস্থিপেশীর মত মায়োফাইব্রিলসমূহ সুনির্দিষ্ট সীমারেখার দ্বারা পৃথক হয়ে থাকে না।

স্যার্‌কোপ্লাজম ঃ নিউক্লিয়াসসন্নিহিত অঞ্চলে স্যার্‌কোপ্লাজম দেখা যায়। স্যার্‌কোপ্লাজমে কোন মায়োফাইব্রিল দেখা যায় না। এর মধ্যে বিশেষ ধরনের মায়োফিলামেন্ট, একটি স্যারকোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, ফ্যাট্‌কণা এবং গ্লাইকোজেন থাকে। বয়স্ক হৃৎপিণ্ডে **লাইপোক্রোম পিগ্‌মেন্ট** (lipochrome pigment) দেখা যায়। অস্থিপেশীর চেয়ে হৃৎপেশীতে অনেক বেশী মাইটোকনড্রিয়া দেখা যায় এবং তাদের অসংখ্য ক্রিস্টা থাকে। এরা প্রধানত

নিউক্লিয়াসের চারিপাশে, স্যারকোলেমার নিম্নদেশে এবং মায়োফিলামেণ্টের বাণ্ডেলের অন্তর্বর্তীস্থানে অবস্থান করে। শেষোক্ত স্থানে প্রতি স্যারকোমিয়ারে একটি বা দুটি মাইটোকনড্রিয়া থাকে। নিউক্লিয়াসের সন্নিহিত অঞ্চলে গলজি বডি দেখা যায়।

স্যারকোপ্লাজমিক রেটিকুলাম: হৃৎপেশীর পেশীতন্তুতেও দুধরনের স্যারকোটিউবুল বা পেশীনালিকা দেখা যায়। (a) **সিস্টারনা:** এরা অনুদৈর্ঘ্যে বিস্তৃত থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যোগসূত্র (anastomoses) স্থাপন করে, ফলে তাদের জালের মত বিন্যস্ত দেখায়। এরা একটা স্যারকোমিয়ার থেকে অপর স্যারকোমিয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, কিন্তু Z-লাইনকে বেষ্টন করে না বা অন্য কোথাও তাদের প্রান্তীয় সিসটারনা থাকে না। বিভিন্ন বিন্দুতে সিসটারনার ঝিল্লি, T-নালিকা এবং স্যারকোলেমা পরস্পর খুব সন্নিকটে আসে। এই সংযোগস্থল উদ্দীপনা-প্রবাহ ও সংকোচন-প্রক্রিয়ার সংগমস্থল হিসাবে কাজ করে। (b) **T-নালিকা:** ব্যাঙের অস্থিপেশীর মত তির্যক পেশীনালিকা Z-লাইন বরাবর পেশীকোষে অনুপ্রবেশ করে।

16-31 নং চিত্র: ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক।

অস্থিপেশীর T-টিউবুল বা পেশীনালিকার চেয়ে এদের পেশীনালিকার আভ্যন্তরীণ ব্যাস (lumen) অনেক বেশী হয়। T-নালিকা সাধারণত একটি মাত্র সিসটারনার সংগে যুক্ত থাকে এবং **ডায়েড** (diad) গঠন করে। অবশ্য তারা ট্রাইয়েড (triad) হিসাবেও থাকতে পারে (Peachy)। স্যারকোলেমার

নীচে যেসব সিসটারনা অবস্থিত, তারা স্যারকোলেমার সংগে যুগ্মভাবে ডায়েড গঠন করতে পারে। T-নালিকার প্রাচীরঝিল্লি যেহেতু অনুপ্রবিষ্ট স্যারকোলেমা ছাড়া কিছু নয়, সেহেতু T-নালিকা বা স্যারকোলেমার সংগে **সম্পর্কযুক্ত** সিস্‌টারনা আসলে **সাব্‌স্যারকোলেম্যাল সিস্‌টারনা** (Fawcett and Mc Nutt, 1969)।

ইন্‌টারক্যালেটেড ডিস্ক : এরা পেশীকোষস্থিত 0·5-1μ ব্যাসসম্পন্ন অনুপ্রস্থ ব্যান্ডবিশেষ। এদেরে প্রায়ই অনিয়মিত বা সিঁড়ির মত দেখায়। ইলেক্‌ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইন্‌টারক্যালেটেড ডিস্ককে পেশীকোষের বিশেষ সংযোগস্থল হিসাবে দেখা যায়, যার মধ্যে বিভিন্ন গঠনগত বৈশিষ্ট্য ও জটিল বিন্যাস লক্ষ্য করা গেছে : (1) কোন কোন স্থানে, বিশেষ করে যেখানে দুটো পেশীকোষের প্রান্তদেশ এসে মিলিত হয়েছে সেখানে সন্নিহিত কোষের কোষঝিল্লির অন্তর্দেশীয় অঞ্চল অত্যধিক ইলেক্‌ট্রন-ঘন (electron dense) হয়। এই অংশে সন্নিহিত কোষের কোষঝিল্লিদ্বয় একটি সমপ্রস্থ স্থানের (200 Å) দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে থাকে। এই অংশের আকৃতি তাই আবরণীকোষের **ডেস্‌মোসোমের** (desmosome—macula adhaerentes) মত। ডেস্‌মোসোমের অন্তর্বর্তী দৃঢ় সংযোগস্থল ম্যাকুলা ওক্‌লুডেন্ট (macula occludentes) নামে পরিচিত। এই অংশ প্রধানত কোষের আসঞ্জনে বা কোষকে পাশাপাশি ধরে রাখার কাজে অংশগ্রহণ করে। (3) পেশীকোষ যেখানে পার্শ্বদেশে মিলিত হয়, সেখানকার কোষঝিল্লির সংযোগস্থলকে **নেক্‌সাস** (nexus) বা **ফাটল সংযোগ** (gap junction) বলা হয়। ফাটলের অন্তর্বর্তী দূরত্ব প্রায় 20Å (Fawcett and McNutt)। এই সংযোগস্থল কোষ থেকে কোষে তাড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালনে সহায়তা করে। হৃৎপেশীর ধর্ম 'হৃৎপিণ্ড' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের অনুশীলন
Study of Toad's Heart

পরীক্ষাগারে শারীরবৃত্তের ছাত্রদের প্রায়ই কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের উপর ব্যবহারিক পরীক্ষা চালাতে হয়। এসব পরীক্ষার উদ্দেশ্য, সহজে হৃৎপেশীর বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলন করা। নিম্নে ব্যবহারিক পরীক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

একটি কুনো ব্যাঙকে দ্বৈত-মজ্জাঘাত (double pith) করে, প্যারাফিন ট্রেতে চিৎ করে শুইয়ে তার উদরস্থ ত্বককে লম্বালম্বিভাবে চোয়াল পর্যন্ত কাটা হয়। উদরপেশীর লম্বচ্ছেদ ও স্কন্ধচক্রের (shoulder girdle) কর্তনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডকে অনাবৃত করা হয় এবং তার উপরের পেরিকার্ডিয়াম পর্দাকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। এরপর কুনো ব্যাঙকে মায়োগ্রাফে উপস্থাপন করে, হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগকে সূচীবিদ্ধ করে লিভারের সংগে সংযুক্ত করা হয়। মধ্যে মধ্যে ব্যাঙের জন্য ব্যবহৃত **প্রশমিত লবণ জল** (toad's normal saline)[2] হৃৎপিণ্ডের উপরে প্রয়োগ ক'রে তাকে আর্দ্র রাখতে হয়। এই ব্যবস্থাপনার সাহায্যে কাইমোগ্রাফে হৃৎপিণ্ডের যে স্বাভাবিক রেখচিত্র পাওয়া যায়. নিম্নে তারই আলোচনা করা হল।

1. **স্বাভাবিক হৃৎরেখচিত্র** (Normal heart tracing) : কুনো ব্যাঙের স্বাভাবিক হৃৎরেখচিত্রে অনেক সময় চারিটি সংকোচনই লিপিবদ্ধ করা যায় : (a) সাইনাসের সংকোচন, (b) অলিন্দের সংকোচন, (c) নিলযের সংকোচন এবং (d) কোনাস বা আওর্টিক বালবের সংকোচন। 16-32X নং চিত্রে প্রথম তিনটি সংকোচন, এবং 16-32Y-তে চারিটি সংকোচনকেই লিপিবদ্ধ করা গেছে। সাইনাসের সংকোচনে প্রথম ধনাত্মক b তরংগের সৃষ্টি হয়। এরপরই পর্যায়ক্রমে d তরংগ (অলিন্দের সংকোচন), f তরংগ (নিলযের সংকোচন) এবং h তরংগের (কোনাসের সংকোচন) সৃষ্টি হয়। নিলয়ের সংকোচনে বৃহৎ f তরংগের সৃষ্টি হয়। নিলয়ের সংকোচনের পরই খানিকটা বিরতি লক্ষ্য করা যায় অথবা কোনাসের সংকোচন লিপিতে পাওয়া যায়। তবে পরীক্ষাগারে এই চারিটি
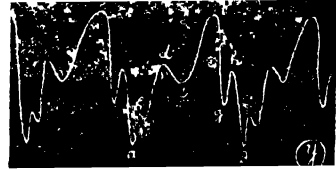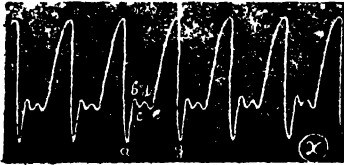
16-32 নং চিত্র : কুনো ব্যাঙের স্বাভাবিক হৃৎরেখচিত্র

a-b=সাইনাসের সংকোচন, b-c=সাইনাসের প্রসারণ, c-d=অলিন্দের সংকোচন d-e=অলিন্দের প্রসারণ, e-f=নিলয়ের সংকোচন, f-g=নিলয়ের প্রসারণ, g-h=কোনাসের সংকোচন এবং h-i=কোনাসের প্রসারণ।

সংকোচন সব সময়ে স্বাভাবিক রেখচিত্রে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় না। স্বাভাবিকভাবে দুটো সংকোচন-তরংগ পাওয়া যায় : (a) সাইনাসের সংকোচন এবং (b) নিলয়ের সংকোচন। অলিন্দের সংকোচন কখনও সাইনাস কখনও নিলয় সংকোচনের সংগে একীভূত হয়ে পড়ে।

2. 0·6 গ্রাম% NaCl এর দ্রবণ।

হৃৎপিণ্ড পরিপূর্ণ থাকলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচ যেমন শক্তিশালী হয় তেমনি দ্রুতগতি কাইমোগ্রাফে রেখচিত্রের শীর্ষভাগকে গোলাকার মালভূমির (round plateau) মত দেখায়। হৃৎপিণ্ড শূন্যগর্ভ হলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনে সূচালশীর্ষ রেখচিত্র পাওয়া যায়।

2. **হৃৎপেশীর সক্রিয়তার উপর উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির প্রভাব** (Effects of variation of temperature on the activity of cardiac muscle): গ্যাসট্রোকনেমিয়াস ঐচ্ছিক পেশীর মতই উষ্ণতাবৃদ্ধিতে হৃৎপেশীর সক্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং উষ্ণতাহ্রাসে মন্থর হয়ে পড়ে। সমগ্র হৃৎপিণ্ডের উপর উষ্ণ শমিত লবণ জল প্রয়োগ করলে হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তায় যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নরূপ: (1) হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায় (increase of heart rate), (2) সংকোচন-উচ্চতার বৃদ্ধি ঘটে (increase of height of contraction) এবং (3) পেশীসংকোচনের স্থিতিকাল হ্রাস পায়।

45° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বা তারও অধিক উষ্ণতায় হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তা অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং **সংকোচন অবস্থায়** (systolic state) হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ হয়ে পড়ে। উষ্ণতাবৃদ্ধিতে হৃৎপিণ্ডের এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণগুলো হল: (i) স্পন্দনপ্রবাহের উৎপত্তির হার বৃদ্ধি (acceleration of the rate of inititation of impulse): Na^+ ও K^+ আয়নের ভেদ্যতার পরিবর্তন এর জন্য দায়ী; (ii) পেশীসংকোচনের গতিবেগ বৃদ্ধি (acceleration of the speed of contraction): সান্দ্রতার হ্রাস ও অত্যধিক এনজাইম বিক্রিয়ার গতিবৃদ্ধি প্রধানত এর জন্য দায়ী এবং (iii) পেশী-সংকোচন বলের বৃদ্ধি (increase of force of contraction): অধিক Ca^{++} আয়নের অবরোধ-মুক্তি ঘটে এবং অধিক সংখ্যক অ্যাকটিন ও মায়োসিন সংস্পর্শে আসতে পারে।

উষ্ণতা হ্রাসে বিপরীত প্রক্রিয়াসমূহ লক্ষ্য করা যায়। উষ্ণতা হ্রাস অত্যধিক হলে ভেগাসের উদ্দীপনা থেকে বা অ্যাসিটাইলকোলিনের (acetylcholine) প্রয়োগে হৃৎপিণ্ডের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

45° ডিগ্রী বা তারও অধিক উষ্ণতা-প্রয়োগে হৃৎপেশী বিনষ্ট হয় এবং **তাপীয় দৃঢ় সংকোচনদশা** (state of heat rigor) প্রাপ্ত হয়।

3. **হৃৎপেশীর সক্রিয়তার উপর আয়নের প্রভাব** (Effects of ions on the activity of cardiac muscle): কিছুসংখ্যক ধাতব আয়ন হৃৎপেশীর সংকোচন-বল (force of contraction) ও সংকোচন-মাত্রা (extent of contraction) বৃদ্ধি করে, অন্যেরা হৃৎপিণ্ডের পূর্ণ প্রসারণে সহায়তা করে।

ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{++}): ক্যালসিয়াম আয়ন হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বল এবং সংকোচনের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করে। ক্যালসিয়াম আয়নের প্রয়োগে হৃৎপিণ্ড সজোরে সংকুচিত হয় এবং নিলয় সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত হতে সক্ষম হয়।

না। অধিক ক্যালসিয়ামের প্রয়োগে হৃৎপিণ্ড **পেশীসংকোচন অবস্থায়** (systolic state) নিস্পন্দ হয়ে পড়ে।

কারণ : মুক্ত ক্যালসিয়াম আয়ন মায়োসিন এনজাইমকে সক্রিয় করে এবং হৃৎপেশীর অ্যাকটিন ও মায়োসিনের সংযুক্তিকে দ্রুততর করে তোলে। ফলে অধিক পরিমাণ ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতে অধিক সংখ্যক **সংকোচী একক** পরস্পর সংযুক্ত হয়ে সংকুচিত হয় এবং যতক্ষণ Ca^{++} আয়ন মুক্ত অবস্থায় তাদের কাছাকাছি থাকে ততক্ষণ তারা এই অবস্থা বজায় রাখে। পেশীর এই অবস্থাকে **ক্যালসিয়াম দৃঢ়সংকোচ** (calcium rigor) বলা হয়।

পটাসিয়াম ও সোডিয়াম আয়ন (K^+ and Na^+) **:** পটাসিয়াম ও সোডিয়াম আয়ন প্রধানত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-প্রবাহের উৎপত্তি ও বিস্তারের জন্য দায়ী। প্রমাণিত হয়েছে, K^+ আয়ন অ্যাকটিন ও মায়োসিনের সংযুক্তিতে সহায়ক নয়। পটাসিয়াম আয়নের প্রয়োগে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ইহা অধিক পরিমাণে প্রসারিত হয়। অধিক পরিমাণ পটাসিয়াম আয়নের প্রয়োগে হৃৎপিণ্ড ধীরে ধীরে **পেশীপ্রসারণ অবস্থায়** (diastolic state) থেমে যায়।

কারণ : পটাসিয়াম বা সোডিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে হৃৎপেশীর ক্যালসিয়াম আয়নের ব্যবহার হ্রাস পায়। ফলে অ্যাকটো-মায়োসিন সংযুক্তি সম্পূর্ণভাবে হতে পাবে না। কলারসে অধিক পটাসিয়াম বা সোডিয়াম আয়নের উপস্থিতি স্যারকোটিউবুল (sarcotubules) বা পেশীনালিকা থেকে ক্যালসিয়াম আয়নের অবরোধমুক্তিতে বাধা দেয়।

অনৈচ্ছিক পেশী
Smooth Muscle

অনৈচ্ছিক পেশী ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা এরা পরিচালিত হয়।

1. কলাস্থানিক গঠন (Histology) **:** অনৈচ্ছিক পেশীর পেশীকোষের আকৃতি নির্ভর করে তাদের অবস্থানের উপর। যেমন ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরে এরা সুদীর্ঘ এবং সরু; ক্ষুদ্র ধমনীগাত্রে হ্রস্ব এবং তুলনামূলকভাবে স্থূল; বৃহদাকার ধমনীগাত্রে এরা স্থিতিস্থাপক তন্তুর দ্বারা সভাজ এবং পাকান অবস্থায় থাকে। পেশীকোষের সর্বাধিক ব্যাস 3-8μ এবং সর্বাধিক দৈর্ঘ্য 15-200μ। অবশ্য গর্ভকালীন জরায়ুতে এদের দৈর্ঘ্য 500μ পর্যন্ত হতে পারে। সব ক্ষেত্রেই এদের দুটো প্রান্ত সাধারণত সুঁচাল হয় (16-33 নং চিত্র)।

16-33 নং চিত্র : অনৈচ্ছিক পেশীতন্তু।

প্রতিটি কোষে এক বা দুটি নিউক্লিয়াস থাকে। প্রস্থচ্ছেদে নিউক্লিয়াসকে ডিম্বাকৃতি এবং দৈর্ঘ্যচ্ছেদে রডের মত দেখায়। সাইটোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়া, গলজি বডি, সেনট্রিওল, অন্তঃকোষজালক এবং রাইবোসোম দেখা যায়। এছাড়া সাইটোপ্লাজমে সামান্য পরিমাণে গ্লাইকোজেন এবং কখনও কখনও স্নেহকণা দেখা যায়।

পেশীসংকোচনের প্রয়োজনীয় উপাদান মায়োফাইব্রিল অনুদৈর্ঘ্যে বিন্যস্ত

থাকে। তবে সাধারণ ছেদে (section) এদের দেখা যায় না। তাজা পেশীকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার উপযোগী করে নাইট্রিক অ্যাসিড বা ট্রাইক্লোরোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে নিলে তবেই তাদের দেখা যায়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এদেরে পুঞ্জীভূত মায়োফিলামেণ্ট হিসাবে দেখা যায়। অস্থিপেশী বা হৃৎপেশীর মত এরা বিন্যস্ত থাকে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে অধিকাংশ মায়োফিলামেণ্টকেই অপর দুধরনের পেশীর অ্যাকটিনের মত দেখায়। কোন কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীতে মায়োসিন ফিলামেণ্টকে দেখা গেছে, তবে তারা পুঞ্জীভূত হিসাবে থাকে না (Panner and Honing, 1970)। রাইস (Rice, 1970) প্রভৃতিদের মতে পেশীর টান-বৃদ্ধির সময়ে এদেরে দেখা যায়।

অনৈচ্ছিক পেশীতে অ্যাকটিন ফিলামেণ্ট প্রায়ই তির্যকভাবে অবস্থান করে এবং সাধারণত কোষঝিল্লির অন্তর্দেশীয় অঞ্চলের সংগে যুক্ত থাকে। অ্যাকটিন ফিলামেণ্টের বাণ্ডেলের অন্তর্বর্তী স্থানে এবং ফিলামেণ্ট যেখানে কোষঝিল্লির সংগে মিলিত হয়েছে, সেই স্থানে ইলেকট্রন-ঘন অঞ্চল দেখা যায়। এরা ডোরাযুক্ত পেশীর Z-লাইনেব মত। এর মধ্যে আকটিন ফিলামেণ্ট আবদ্ধ থাকে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে মায়োসিন ফিলামেণ্টকে ভালভাবে দেখতে না পাওয়া গেলেও রাসায়নিক পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, অ্যাকটিন ও মায়োসিন এই উভয় প্রকার ফিলামেণ্টই অনৈচ্ছিক বা মসৃণ পেশীতে রয়েছে, তবে তারা সুশৃংখলভাবে বিন্যস্ত থাকে না।
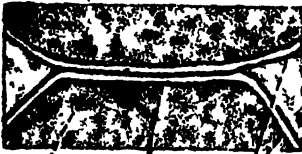
16-34 নং চিত্র : সন্নিহিত কোষের সংযোগস্থল বা নেকসাস।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে স্যারকোলেমাকে ত্রিস্তরীয় (trilamilar) ব্যাণ্ড হিসাবে দেখা যায়। কোন কোন স্থানে সন্নিহিত কোষের ঝিল্লিদ্বয়ের মধ্যে যে বিশেষ সংযোগ গঠিত হয় তাকে **নেকসাস** (nexus) বা **ফাটল** বলা হয়। এটি কোষের অন্তরংগ মিলনস্থল হিসাবে কাজ করে এবং সম্ভবত কোষ থেকে কোষে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালনে সহায়তা করে।

3. **অনৈচ্ছিক পেশীর ধর্ম** (Properties of smooth muscle) : অনৈচ্ছিক পেশীর ধর্মকে 5 ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় : (a) উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া ও সংকুচিত হওয়া (excitability and contractility), (b) পরিবাহিতা (conductivity), (c) ছন্দময়তা (rhythmicity), (d) নিঃসাড়কাল (refractory period) এবং (e) পেশীটান (tonicity)।

(a) **উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া ও সংকুচিত হওয়া :** অনৈচ্ছিক পেশী উদ্দীপনায় অপেক্ষাকৃত কম উত্তেজিত হয় এবং ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়। আরও একটা বৈশিষ্ট অনৈচ্ছিক পেশীতে লক্ষ্য করা যায়, তা হল একটা বিশেষ

উদ্দীপনা পেশীকে যেমন সংকুচিত করে, তেমনি তা আবার ঐ পেশীকে প্রসারিত করতেও পারে। দেখা গেছে পেশী যখন স্থিতাবস্থায় (resting state) থাকে, তখন তার উপর উদ্দীপনার প্রয়োগে পেশী সংকুচিত হয়। অপর পক্ষে পেশী যখন সংকুচিত অবস্থায় থাকে তখন তার উপর একই উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে পেশী প্রসারিত হয়।

অনৈচ্ছিক পেশীর সমগ্র সংকোচনকাল অনেক দীর্ঘ। লীনকাল 0·2-2·0 সেকেন্ডের মধ্যে থাকে। সংকোচনকাল ও প্রসারণকাল তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ হয়।

(b) **পরিবাহিতা :** অনৈচ্ছিক পেশীর পরিবাহিতা তুলনামূলকভাবে অনেক মন্থর। দেখা গেছে পেশীর সংকোচন-তরংগ (wave of contraction) সমগ্র পেশীতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়, কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ একটা পেশীতন্তু থেকে আর একটা পেশীতন্তুতে পরিভ্রমণ করে। অনৈচ্ছিক পেশীকোষের স্যারকোলেমা যে স্থানে নেক্সাস গঠন করে সে-স্থান তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালনে সহায়তা করে। তড়িৎপ্রবাহ তাই এক পেশীতন্তু থেকে অন্য পেশীতে পরিবাহিত হয়। অন্যদের মতে প্রতি পেশীতন্তুর চারিপাশে অসংখ্য স্নায়ুপল্লবের (twig) পারস্পরিক যোগাযোগ থাকায় তারাই পেশী থেকে পেশীতে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালনে সহায়ক হয়।

(c) **ছন্দময়তা :** অনৈচ্ছিক পেশীর এই ধর্ম হৃৎপেশীর মত স্বয়ংক্রিয় নয়। দেখা গেছে অনৈচ্ছিক পেশীতন্তুকে টেনে সামান্য প্রসারিত করলে তার মধ্যে এই ধর্মের বিকাশ ঘটে, যতক্ষণ এই প্রসারণটান বজায় রাখা যায়। ততক্ষণ অনৈচ্ছিক পেশীব এই ছন্দময়তা বজায় থাকে। পেশী এই ধর্মের সংগে স্নায়ুর কোন যোগাযোগ নেই, ইহা সম্পূর্ণভাবে পেশীজাত (myogenic)।

ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক ও হৃৎপেশীর তুলনা

বৈশিষ্ট্য	ঐচ্ছিক পেশী	অনৈচ্ছিক পেশী	হৃৎপেশী
1. **উপাদান :**			
(a) গ্লাইকোজেন, প্রোটিন, ATP, ক্রিয়েটিন ফসফেট ক্যার্নোসিন	অধিক	কম	কম
(b) নিউক্লিওপ্রোটিন ও সোডিয়াম	কম	অধিক	অধিক
(c) ফস্ফোলিপিড ও কোলেস্টারোল	কম	কম	অত্যধিক
2. **শ্রেণী :**	লোহিত ও শ্বেত	নেই	নেই

বৈশিষ্ট্য	ঐচ্ছিক পেশী	অনৈচ্ছিক পেশী	হৃৎপেশী
3. আণুবীক্ষণিক গঠন			
(a) কোষের আকৃতি ও আয়তন	বেলনাকার, 1-40 মি. মি. দৈর্ঘ্য, 10-100μ ব্যাসযুক্ত	সরুবাটে, উভয়পার্শ্ব সূচাল, 15-200μ দৈর্ঘ্য 3-8μ ব্যাস-সম্পন্ন	বেলনাকার বা আয়তাকৃতি, প্রস্থ-চ্ছেদ বহুভুজাকার
(b) ডোরাদাগ	তির্যক ও অনুদৈর্ঘ্য	অনুদৈর্ঘ্য	তির্যক ও অনুদৈর্ঘ্য
(c) স্যারকোলেমা	স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ	আছে ও সম্পূর্ণ	আছে ও সম্পূর্ণ
(d) নিউক্লিয়াস	অনেক এবং স্যারকো-লেমার ঠিকনীচেথাকে	এক বা দুটি, কেন্দ্র-স্থলে থাকে	একটি কেন্দ্রস্থলে থাকে
(e) পেশী নালিকা	T-নালিকা A-I সংযোগস্থলে থাকে, প্রশস্থ প্রান্তীয় সিস্টার না	আছে, তবে বিশেষত্বহীন	T নালিকা Z-লাইনে থাকে প্রান্তীয় সিস্টারনা থাকে না
(f) শাখাপ্রশাখা	নেই	নেই	প্রচুর ও সর্বমুখী পেশীজাল গঠন করে।
(g) কোষ থেকে কোষে পরিবহণ	নেই	নেক্সাসের মাধ্যমে	ইন্টারক্যালেটেড-ডিস্কের নেক্সাসের মাধ্যমে
4. অবস্থান	শুধুমাত্র অস্থিতে	নলাকার অঙ্গ ফাঁপা আন্তরযন্ত্র ত্বক ইত্যাদি	শুধুমাত্র হৃদযন্ত্রে
5. ধর্ম			
(a) সংকোচন-ক্ষমতা	দ্রুত সংকোচন	মন্থর সংকোচন, সমগ্র সংকোচনকাল দীর্ঘ	পেশী প্রসারণ-কালের চেয়ে পেশী সংকোচনকালদীর্ঘ হয়

বৈশিষ্ট্য	ঐচ্ছিক পেশী	অনৈচ্ছিক পেশী	হৃৎপেশী
(b) পরিবাহিতা	অতি দ্রুত	মন্থর	মন্থর এবং বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন
(c) ছন্দময়তা	নেই	আছে	আছে, বৈশিষ্ট্য পূর্ণ
(d) নিঃসাড়কাল	হ্রস্ব, লীনকালের মধ্যে সীমিত	অধিকতর দীর্ঘ	অধিকতর দীর্ঘ
(e) পেশীটান	স্নায়ুর উপর নির্ভরশীল	স্নায়ুর উপর নির্ভরশীল নয়	স্নায়ুর উপর নির্ভরশীল নয়
(f) টিটেনাস ও অসাড়তা	সম্ভবপর	সম্ভবপর	সম্ভবপর নয়
6 নিয়ন্ত্রণ	ইচ্ছামত	ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়	ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়
7. স্নায়ুসরবরাহ	কেন্দ্রীয় স্নায়ু, বিশেষ ধরনের স্নায়ুপ্রান্ত	স্বয়ংক্রিয়, মুক্ত স্নায়ু-প্রান্ত ও গ্যাংগ্লিয়নসহ	অনৈচ্ছিক পেশীর মত
8. আয়ন ক্রিয়া			
(a) সোডিয়াম	উদ্দীপক	উদ্দীপক	হৃৎস্পন্দন শুরু করে ও বজায় রাখে
(b) পটাসিয়াম	উদ্দীপনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা হ্রাস করে এবং অসাড়তা ত্বরান্বিত করে	সম্ভবত একই রকম	সংকোচনে বাধা দেয় এবং প্রসারণ ঘটায়
(c) ক্যালসিয়াম	পেশী সংকোচনের সময় ATP-এজের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে	একই রকম	হৃৎসংকোচনের শক্তি ও স্থিতিকাল বৃদ্ধি করে
9. বিপাক ক্রিয়া			
(a) গ্লাইকোজেন	মধুমেহ ও অনশনে হ্রাসপায়	একই রকম	বৃদ্ধি পায়
(b) ল্যাকটিক অ্যাসিড	যৎসামান্য জারিত হয়	একই রকম	গ্লুকোজের চেয়ে দ্রুত ও সম্পূর্ণ জারিত হয়

(d) **নিঃসাড়কাল ঃ** অনৈচ্ছিক পেশীর নিঃসাড়কাল অনেক দীর্ঘ। এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে পেশীতে কোনরূপ সাড়া জাগে না।

(e) **পেশীটান ঃ** অনৈচ্ছিক পেশীতেও সামান্য টান সব সময় বজায় থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. ঐচ্ছিক পেশীর আণুবীক্ষণিক গঠন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কর। (C U. '70)

2. পেশীসংকোচনের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

3. অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রাখা একটি ঐচ্ছিক পেশীর অন্তরংগ অংগসংস্থানের সংকোচন ও শিথিল হবার সময় কী কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ? (C, U, '69)

4. অস্থিপেশীর সমটান ও সমদৈর্ঘ্য পেশীসংকোচনের সময় তন্তুময় প্রোটিনের গঠনগত বিন্যাসের যে পরিবর্তন হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C, U, H, '76 '78)

5. পেশীসংকোচনের সময় পেশীতে কী কী রাসায়নিক পরিবর্তন হয় লিখ। (C, U, '71)

6. পেশীসংকোচনে কী কী যান্ত্রিক ও তাপীয় পরিবর্তন হয় ? তাপীয় পরিবর্তন থেকে কর্মক্ষমতা কি করে নির্ণয় করা যায় ?

7. সর্বাধিক বা একেবারেই নয় সূত্র কাকে বলে ? ঐচ্ছিকপেশীর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য কি ? সংকোচনকালীন ঐচ্ছিকপেশীর রাসায়নিক ও তড়িদবিভবীয় পরিবর্তনগুলো আলোচনা কর। (C, U, '81)

8 পেশীসংকোচনের যন্ত্র-রাসায়নিক ভিত্তির আধুনিক ধারনা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (C, U, H, '81)

9. পরীক্ষাগারে সম্পন্ন করেছ এমন একটি পরীক্ষাসহ ঐচ্ছিক পেশীর ধর্মের বর্ণনা দাও। (C, U, '68)

10 বিচ্ছিন্ন ঐচ্ছিক পেশীকে নিয়ে কিভাবে তার ভৌত আচরণের পরীক্ষা করবে ? চিত্রসহ সরল পেশীবেধের বিস্তৃত বিবরণ দাও। উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধিতে সরল লেখচিত্রের কী কী পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এবং কেন ?

11. ইলেকট্রমায়োগ্রাফি সম্বন্ধে যা জান লিখ।

12 হৃৎপেশীর আণুবীক্ষণিক গঠনের বর্ণনা দাও এবং তার ধর্মের আলোচনা কর। জীবন্ত প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে অবসাদ আসে না কেন ? (C, U, '68, '7১)

13. পরীক্ষার দ্বারা হৃৎপেশীর মর্মাবলী কিভাবে প্রদর্শন করবে ? (C,U '74)

14 ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশীর আণুবীক্ষণিক গঠনের চিত্র অংকন কর এবং তাদের ধর্মের বর্ণনা দাও। (C, U, '62)

15 ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক ও হৃৎপেশীর নিম্নলিখিত ধর্মের তুলনা কর ঃ (i) উদ্দীপনধর্ম (ii) নিঃসাড়কাল, (iii) পরিবাহিতা। (C,U, H, '77)

16. ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক ও হৃৎপেশীর বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনা কর। (C,U, '62)

17 টীকা লিখ ঃ (a) অনৈচ্ছিক পেশী (74) (b) সারকোমিয়ার (76), (c) স্যারকোটিউবুল, (d) সংকোচী, উপাদান, (e) সমদৈর্ঘ্য পেশীসংকোচন (75), (f) সমটান পেশীসংকোচন (75) (g) টিটেনাস, (h) ক্রোনাক্সি ও রিওবেস (i) পেশীর অসাড়তা (j) শ্বেত ও লোহিত পেশী, (k) ঐচ্ছিক ও হৃৎপেশীর ধর্ম (75) (l) মসৃণপেশী ও হৃৎপেশীর গঠনগত পার্থক্য (77), (m) অধিক পরিশ্রমে ঐচ্ছিক পেশীর অবসাদ দেখা যায় কিন্তু হৃৎপেশীর অবসাদ দেখা যায় না কেন ? (C, U 86)